বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ

ঢাকার ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]
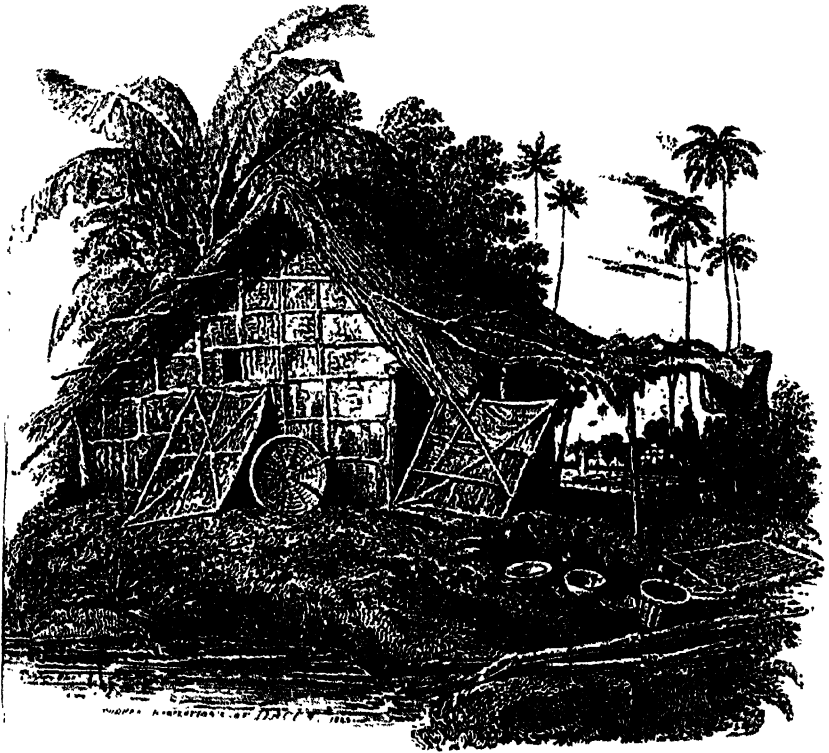
PUBLISHED BY NARENDRA NATH MAZUMDER

Research House—Mymensingh.

CALCUTTA

70, BARANOSI GHOSE'S STREET
"INDIAN PATRIOT PRESS"
PRINTED BY FAKIR CHUNDER DAS

বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ

ঢাকার ইতিহাস

(দু'খণ্ড একত্রে)

যতীন্দ্রমোহন রায়

কেদারনাথ মজুমদার

সম্পাদনা/সংযোজন

কমল চৌধুরী

জানুয়ারি ২০০০

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

কৃতী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী

সংকর্ষণ রায়কে

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জব চার্নকের প্রতি হিন্দু বাঙালির উচ্ছ্বাস যেমন বছরে বছরে উদ্বেল হয়ে ওঠে, ঢাকা নিয়ে তেমন কোন উচ্ছ্বাসের কথা শোনা যায়নি। ঢাকা কিন্তু বাঙালি মাত্রেরই গর্বের শহর। কলকাতার অনেক আগেই তার জন্ম। আর জন্ম থেকেই শহরটি ছিল স্বাতন্ত্রধর্মী। বিক্রমপুর ও সোনারগাঁর পতনের পর ঢাকার আবির্ভাব। অবশ্য এই শহরটি গড়ে ওঠে মোঘল শাসকদের আনুকূল্যে। প্রথম থেকেই হিন্দু বসতির তুলনায় মুসলমান বসতি ছিল বেশি। জনসংখ্যায়ও ছিল তারা অনেক এগিয়ে। শহর হিসাবে ঢাকার আধুনিক বিকাশ শুরু ইংরেজ আমলে। ততদিনে হিন্দু জমিদার, উকিল, ডাক্তার, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী এবং ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়ে পড়তে থাকে। ফলে শহরের জনজীবনে এই ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল হিন্দুসমাজের শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু মুসলমান সমাজ বিবিধ কারণে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে সুদীর্ঘকাল দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল। বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর এই দূরত্ব আরও বাড়ছিল। যা তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। পূর্ববাংলার প্রধান শহর হিসাবে ঢাকার খ্যাতির আড়ালে হিন্দু ব্যবসায়ী, জমিদার, আইনজীবী, সরকারি কর্মীদের অবদান ঐতিহাসিক সত্য। দেশভাগ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঢাকার জনবিন্যাসে ঘটেছে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। শহরটির আয়তন কেবল বাড়েনি, নগরায়নের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যময় ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। একদা যারা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র থেকে ছিল দূরে, তারাই আজ এই ঐতিহাসিক শহরের বিকাশে অন্যতম কারিগর। ধর্মমত নির্বিশেষে বাঙালির এই প্রিয় শহরটিকে নতুন করে জানার প্রয়াসেই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা।

ঢাকার ইতিহাস যতীন্দ্রমোহন রায়ের লেখা একখানি বিখ্যাত বই। যতীন্দ্রমোহনের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে। ঢাকার জপসা গ্রামে ছিল তার পৈতৃক নিবাস। ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বে ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। গোটা পূর্ব বাংলা ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন প্রত্ন নিদর্শন। ঢাকার ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল অর্জিত জ্ঞানের প্রকাশ। এই বই সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমে লিখেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। দ্বিতীয় খণ্ড তিনি লেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংগৃহীত সমস্ত তথ্যাবলী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই বই আর প্রকাশিত হয়নি। আশা করেছিলেন তাঁর লেখা বইটিকে আধুনিককাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। যতীন্দ্রমোহনের আগে লেখা হলেও কেদারনাথ মজুমদারের 'ঢাকার বিবরণে' ইংরেজ আমলের তথ্যও আছে বিস্তৃতভাবে। কেদারনাথের জন্ম ময়মনসিংহে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর জন্ম কিশোরগঞ্জের কাপাসিয়া গ্রামে। আবার কারো মতে গাচিহাটা গ্রামে। কেদারনাথের জন্ম ১৮৭০ খ্রিঃ (১২৭৭-এর জ্যৈষ্ঠ)। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণায় তিনি সেকালেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর লেখা বই-এর মধ্যে আছে ময়মনসিংহের ইতিহাস (১৩১২), ময়মনসিংহের বিবরণ (১৩১১), ময়মনসিংহের সহচর (১৯০৮), ঢাকার বিবরণ ও ফরিদপুরের বিবরণ। আরও কিছু গবেষণামূলক বই লিখেছিলেন। কথাসাহিত্যেও তাঁর সুনাম ছিল। কেদারনাথ সম্পাদিত

পত্রিকাগুলি হল ঃ 'সৌরভ', 'আরতি', 'কুমার', 'বাদশা' এবং শিক্ষা। মারা যান ১৯৩০ খ্রিঃ। "ঢাকা সহচর" লিখেছিলেন ছাত্রদের জন্য। সেই বইটির কিছু প্রয়োজনীয় অংশ বর্তমান সংস্করণে সংযুক্ত হয়েছে।

সংযোজন অংশে আছে বিশ শতকের প্রথম থেকে বর্তমান কালের বিবরণ। যার ফলে বইটিতে একটি শহর এবং জনবিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ ছবি ধরা পড়বে পাঠকের চোখে।

ঢাকার বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বইগুলির সব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যে কয়েকটি পাওয়া গেছে, তাও বহু অনুসন্ধানের পর। বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন নয়া উদ্যোগের শ্রীপার্থশঙ্কর বসু। শেষ মুহূর্তে শরীফউদ্দিন আহমেদ-এর "ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন" সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীসুভাষচন্দ্র দে। বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে শ্রীশুভংকর দে নিয়ে আসেন মুনতাসীর মামুন-এর "ঢাকা-স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী"। এটি কাজে লেগেছে। আধুনিক ঢাকার ইতিহাসকার অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বেশ কিছু বই লিখেছেন ঢাকা সম্পর্কে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংকলনও করেছেন কয়েকটি খণ্ডে। এইসব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে স্বীকৃতিসহ। ঢাকা সম্পর্কে লেখা দুষ্প্রাপ্য বেশ কয়েকখানি বই পরে হাতে এসেছে। সেগুলি, বর্তমান দুটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না। পরবর্তী কোন সময়ে প্রকাশিত হবে।

ঢাকা সম্পর্কে কাজ শুরু করি বছর পাঁচেক আগে। তখন যতীন্দ্রমোহনের 'ঢাকার ইতিহাস' বইটি হাতে আসে। প্রথম থেকেই আমাদের পরিকল্পনায় ছিল বইটির বিবরণকে সম্পূর্ণতা দেওয়া। যতীন্দ্রমোহনের বইটি নতুনভাবে প্রকাশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সংকর্ষণ রায়। যতীন্দ্রমোহনের অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার অনুরোধ জানান বারবার। যতীন্দ্রমোহনের ছবিটিও তিনি দিয়েছেন গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য। শ্রী রায়ের অনুমতি ও সহযোগিতা না পেলে বইটির সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হত না। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করলাম।

যাঁর একান্ত আগ্রহ এবং উৎসাহে বইটি প্রকাশ সম্ভব হল, তিনি হলেন দে'জ পাবলিশিং-এর অন্যতম কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে। এই প্রকাশন সংস্থা থেকে দুষ্প্রাপ্য ইতিহাস গ্রন্থাদি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকখানি মূল্যবান বই। আরও বই প্রকাশের অপেক্ষায়।

কমল চৌধুরী

১৪/৩ বিবেকানন্দ সরণি
কলুপুকুর, বারাসত
২৪ পরগণা (উত্তর)
দূরভাষ : ২৫৬২-৪৯৫৯

সূচীপত্র

যতীন্দ্রমোহন রায়

জন্ম : ১৪ কার্তিক ১২৮৩

মৃত্যু : ২২ নভেম্বর ১৯৪৫

যতীন্দ্রমোহন রায়

ঢাকার ইতিহাস

(১ম খণ্ড)

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব
৺দুর্গামোহন রায় মহাশয়ের
ও পুণ্যবতী মাতৃঠাকুরানী
স্বর্গগতা কামিনীদেবীর
পুণ্যনামে ভক্তিসহকারে
তাঁহাদিগের অকৃতি দীন সন্তান কর্তৃক
এই গ্রন্থখানা উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশের ইতিহাস। স্বদেশপ্রাণ কতিপয় মনস্বী সাহিত্যসেবী বঙ্গের অনেকানেক জেলার ইতিহাস লিখিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ঢাকার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস নাই। যে স্থান বহু পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিবুধজনশোভিত হইয়া একদিন ভারতের কু-মধ্য (O°. Meridian) বলিয়া গণ্য হইত, যে স্থানের প্রতি ধূলিকণার সহিত অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান সাধক, পীর ও মহাপুরুষের প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে স্থান সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বঙ্গের রাজধানী পরিগণিত ছিল, যে স্থানের ভাষার আদর্শে বঙ্গভাষা গঠিত হইয়াছে, তথাকার বিস্মৃত বিবরণ জানিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষত ঢাকার বিস্তৃত একখানা ইতিহাস প্রকাশিত হয়, ঢাকা জেলার অধিবাসী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ ইচ্ছা হওয়া একান্তই-স্বাভাবিক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "টেভার্নিয়ার তিন ক্রোশ দীর্ঘ যে ঢাকা নগরে তিনটি মাত্র পাকাবাড়ি দর্শন করিয়াছিলেন, সেখানকার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজনীয়তাই বা কি এবং তথায় উপকরণই বা এমন কি আছে?" বলা বাহুল্য যে, এরূপ উক্তি নিতান্তই অসার এবং ভিত্তিহীন। টেভার্নিয়ার আমির-উল-ওমরা নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রথম সুবাদারি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হইলেও পূর্ব পূর্ব সুবাদারগণ মগ ও পর্তুগিজ দস্যু এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজন্যবর্গের সহিত সর্বদা যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকায় রাজধানীর উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তখনও নবাব ইসলাম খাঁর "প্রাচীন দুর্গ", সা সুজার আদেশে আবুল কাশেম কর্তৃক নির্মিত "ছোট কাটরা", মীর মোরাদের "হুসেনি দালান", "মকিমের কাটরা", "ইদগা", মহারাজ বল্লালের প্রস্তুত "ঢাকেশ্বরীর মন্দির" প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্যরাজি, স্থাপত্যকৌশলে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে মেসার্স সিয়ারম্যান বার্ড, ক্রিম্প, জন মেন্ডেল, জেমস গ্রেহাম প্রভৃতি মনস্বীগণ ঢাকার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্তিকলাপাদি সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। "Respecting the city of Dacca we must observe, that it has had more than one period of decay. During the reign of the Emperor Aulumgeer, its splendour was at the hight : and judging from the magnificence of many of the ruins, both in the heart of the present city and its environs, such as bridges, brick cause-ways, mosques, seraisgates, palaces, and gardens, most of them, least in the environs, now overgrown with wood, it must have vied in extent and riches with any of the great cities we know of in Bengal, not perhaps excepting Gour". বিশপ হিবার ঢাকা শহরকে মস্কোনগরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি পুস্তাপ্রাসাদ সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "The architecture is precisely that of the Kremlin of Moscow of which city, indeed, I was repeatedly reminded in my progress through the town."

স্বাধীনতার পুণ্যপীঠ, বীরত্বের কেন্দ্রস্থল, রামপাল, সাভার, মাধবপুর, ধামরাই, গান্ধারিয়া, শাইটহালিয়া, শৈলাট, দীঘলিরছিট, রাজাবাড়ি, সাতখামাইর, বর্মিয়া, এগারসিন্ধু, একডালা,

চৌরা, সোনারগাঁও, খিজিরপুর, কোঙরসুন্দর, মোগরাপাড়, শ্রীপুর, রঘুরামপুর, নপাড়া, রাজনগর প্রভৃতি স্থানের পুঞ্জীভূত কীর্তিরাজির চিহ্ন ও বহু প্রবাদবাক্য অতীতের গৌরব-মণ্ডিত পবিত্র স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।

শুধু কিংবদন্তী ও প্রবচনের উপরে ইতিহাসের ভিত্তি গ্রথিত করিতে যাওয়া নিতান্ত উপহাসনীয় হইলেও উহা একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। তিমিরজলদাবৃত অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকারে পথহারা বিপন্ন পথিক যেমন তড়িত-রেখার ক্ষণিক আলোকে স্বীয় গন্তব্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রবাদের ক্ষীণ-বর্তিকা হস্তে, অতি সন্তর্পণে, আমাদিগকে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের বিলুপ্ত-প্রায় কীর্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব হইতে সমতট দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ বঙ্গদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও তাম্রলিপ্তকে সবিশেষ সমৃদ্ধশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আসরফপুরের তাম্রশাসনে খড়্গা-বংশীয় নরপতিগণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রথম রাজা। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গা, জাতখড়্গোর পুত্র দেবখড়্গা এবং দেবখড়্গোর পুত্রের নাম রাজরাজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবখড়্গোর মন্ত্রীর নাম ছিল পুরোদাস।

ইদিলপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে বিক্রমপুরের একটি অভিনব রাজবংশের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশীয় প্রথম রাজার নাম সুবর্ণচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র চন্দ্রদেব। তিব্বতের তারানাথকৃত মগধের রাজবংশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, পূর্বজনপদাধীশ্বর শ্রীচন্দ্রের সভায় খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন।

বেলাবর নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বিক্রমপুরাধিপতি বজ্রবর্মা, জাত্রবর্মা, শ্যামলবর্মা ও ভোজবর্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বর্মবংশীয় রাজা হরিবর্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন অসম্পূর্ণাবস্থায় ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জ্যোতিবর্মা ও হরিবর্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট হরিবর্মদেবের সচিব ছিলেন। ভবদেব ভট্টের অপর নাম বালভট্ট বা বালবলভিভুজঙ্গ, ইহার পিতার নাম গোবর্ধন। ইনি খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবর্মদেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্বিজয়ী জৈন ভূপতি রাজেন্দ্র চোল গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও দণ্ডভুক্তিকা জয় করিতে এই সময়ে আগমন করেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞসমাপনান্তে ব্রাহ্মণ-পঞ্চককে বাস করিবার জন্য যে পাঁচখানা গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদয় গ্রাম "পঞ্চসার" "পাঁচগাঁও" ইত্যাদি নাম লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।

সেনবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীনে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধনৈশ্বর্যে ভারতের-গৌরবের সামগ্রী ছিল। লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরেই ভূমিষ্ঠ হন।

পালবংশীয় যশোপাল, হরিশ্চন্দ্র, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ মাধবপুরে, সাভারে এবং ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে দীঘলিরছিট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া এতদঞ্চল শাসন করিতেন। দীঘলিরছিট নামক স্থানের নিকবর্তী শৈলাট গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে শিশুপালের পুষ্পবাটিকা ছিল।

বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। রামপালের অধঃপতনের

পর বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ও ভাগ্যলক্ষ্মী চিরতরে অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ বলেন রামপাল সুপ্রাচীন সমতটেরই নামান্তর মাত্র। শেষ হিন্দু-নরপতি, মোসলমান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের পর, সপরিবারে তথা হইতে পলায়ন করিয়া পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী রামপাল নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রামপালে এবং সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপনপূর্বক নিরাপদে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তদীয় বংশধরগণ শতাধিক বৎসরকাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাজগণের শাসনপ্রভাব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোসলমানগণের দুর্ধর্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ-পতনের বহুকাল পরে পূর্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই বাংলার স্বাধীনতার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়, বাঙালির দাসত্ব ও জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়।

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রামপালের অধঃপতন সংঘটিত হইলে সোনারগাঁয়ের উন্নতি আরম্ভ হয় এবং মোসলমানগণ লিখিত ইতিহাসে উহা গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বারণি সর্বপ্রথম সোনারগাঁয়ের উল্লেখ করেন। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়েই সোনারগাঁয় মোসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সোনারগাঁ পূর্ববঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। এই সময়েই সোনারগাঁয়ের উন্নতির একশেষ হয়। সোনারগাঁর অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মসলিন-বস্ত্র সভ্যজগতের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়া সোনারগাঁকে সুপরিচিত করে। সোনারগাঁয়ের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারতবর্ষের নানা স্থানের ন্যায় সিংহল, পেগু, চীন, জাভা, মলক্কস, সুমাত্রা প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশে এমনকি সুদূর ইউরোপে পর্যন্ত প্রেরিত হইত। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ সুদূর আরব ও ইউরোপ হইতে ভারতে উপনীত হইয়া, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করিয়াও সোনারগাঁর সমৃদ্ধি-গৌরব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা স্পৃহনীয় বোধ করিতেন। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগাঁর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সোনারগাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাংলা দিল্লিশ্বরের অধীনতা পাশ ছিন্নকরত স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রায় দ্বিশতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই ঢাকার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমালঙ্কৃত করিয়াছে। যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, তথায় মোঘল সম্রাটের সেনা-সন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বাংলার রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তৎকাল হইতে শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণভাবে 'বিদ্যমান থাকে। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সহিত সোনারগাঁর সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হইত। ঢাকার সুদৃঢ় দুর্গ হইতে রণ-দুর্মদ মোঘল অনিকিনী বহির্গত হইয়া আসাম, বিহার, চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া দিল্লিশ্বরের শাসন-প্রভাব বিস্তার করিত। দিল্লির সম্রাটের বংশধর ও প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ঢাকার সুবাদারি পদ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইতেন। দিল্লিশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করা গৌরবজনক মনে করিতেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে রাজধানী নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে ঢাকায় নায়েব-নাজিমগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ববঙ্গ শাসন করিতে থাকেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর রণাভিনয়ের পর বঙ্গের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ নবাবদিগকে শাসনকার্য হইতে অপসৃত করিয়া পেনসন প্রদান করেন। এই সময়ে ইহাদিগের নবাব উপাধি মাত্র থাকে ; এই উপাধিও ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাধিকারী অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির অধিকার হইলে হুজুরি ও নিজামত নামক দুই বিভাগ দ্বারা ঢাকা জেলা শাসিত হইতে থাকে। হুজুরি বিভাগের কার্য একজন দেওয়ান দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া একজন ডেপুটি দ্বারা জেলার কার্য সম্পন্ন করাইতেন। রাজস্বসংক্রান্ত সমুদয় কার্যই ডেপুটির হস্তে ন্যস্ত ছিল। নিজামত বিভাগ দ্বারা ফৌজদারি ও আদালতের কার্য সম্পন্ন হইত। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে হুজুরি ও নিজামত এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন রাজস্ব-পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইহাকেই কালেক্টর উপাধি প্রদান করা হয়। ঐ সনে মহম্মদ রেজা খাঁর নিকট হইতে দেওয়ানি বিভাগের কার্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেক্টর দেওয়ানি আদালতের সুপারিনটেন্ডেন্ট হন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি আদালতের কার্যনির্বাহ করার জন্য নায়েব পদের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রিসভা দেওয়ানি আদালতের নিষ্পত্তির বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা উঠিয়া গিয়া কালেক্টরি ও দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ঢাকার কালেক্টর "চিফ" নামে অভিহিত হইত।

এইসময়ে ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কালেক্টরি হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর এবং ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলাকে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাও ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসন সময়ে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যতীত এতদ্দেশে অন্য কোনও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ১৯০৫ সনে শাসন-সৌকর্যার্থে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী সংস্থাপিত হয় কিন্তু সমগ্র বঙ্গব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে সহৃদয় ভারত-সম্রাট ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করিয়া দেন। ফলে ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী পুনরায় বিলুপ্ত হয়।

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে এতদঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার জের মিটে নাই। এই বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। তৎকালে শত শত বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও সংঘারাম হইতে ভগবান অমিতাভের সাম্যসংস্থাপক নির্বাণমুক্তির অমিয়বাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। আসরফপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়, খড়্গাবংশীয় রাজা দেবখড়্গের শাসন সময়ে আসরফপুরের অনতিদূরবর্তী স্থানে "বুদ্ধমণ্ডপ" প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহারই সন্নিকটস্থিত "বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়" একগণ্ডিভুক্ত করিয়া কুমার রাজরাজ ভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবৃন্দকে দশ দ্রোণাধিক নব পাটকভূমি প্রদান করা হইয়াছে। অপর শাসনভূমি "রত্নত্রয়োদ্দেশ্যে" শালিবর্দকস্থিত আচার্য সংঘামিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরমসৌগত পুরোদাস কর্তৃক তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ইদিলপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব কুশলী সতট পদ্মবাটি বিষয়ান্তর্গত কুমার তালকা মণ্ডল মধ্যবর্তী লেলিয়া গ্রাম দান করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাজাসনের পার্শ্ববর্তী নান্নার গ্রাম মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাসস্থান ছিল। মুণ্ডিত-মস্তক পুরুষকে এতদঞ্চলবাসী জনগণ এখনও "নাইন্নামুন্না" বা শুধুই "নাইন্না" এবং উক্তরূপ স্ত্রীলোককে "নান্নীমুন্নী" বা শুধুই "নান্নী" বলিয়া থাকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে "নাণ্ডা মুণ্ডা" শব্দ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। আধুনিক চলিতভাষায় "নাড়া মুড়া"। "নান্না" ও "নান্নী" শব্দ ঐ অপভ্রংশ

"নাগুা মুগুা" শব্দের বিকৃতি। এই "নান্না" ও "নান্নী" হইতে নান্নার গ্রামের নামকরণ হওয়া অসম্ভব নহে। নান্নার ও সুয়াপুরের সন্ধিস্থলে যে সমুদয় উচ্চ মৃৎস্তূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে একসময়ে সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল "বাজাসন" বা "বজ্রাসন" বিহার। বিশাল প্রস্তর স্তম্ভ-মালা-শোভিত যে হর্ম্যরাজি একদা এই বিহারের শোভাবর্ধন করিত, এখনও মৃত্তিকা নিম্নে তাহার নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে। এই বজ্রাসন বিহারেই পরমজ্ঞানী বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন।

মৌর্য-সম্রাট মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য মধ্যে যে চুরাশি হাজার ধর্মরাজিকা বা কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন, ধামরাই তাহারই একটি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলাদিতেও ধামরাই "ধর্মরাজি" বলিয়াই উল্লিখিত হইত। সুতরাং দেখা যায়, ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্মরাজিই ছিল। ধর্মরাজিয়া দলিলের নকল আমরা এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ধামরাইর নিকটবর্তী সভার গ্রাম প্রাচীন সভার প্রদেশের অতীত স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

সুয়াপুর গ্রামের একটি পাড়ার নাম ছিল "রাজার পাড়া"। এইস্থানের ভিটার নিচে ভূপ্রোথিত অট্টালিকার চিহ্ন আছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "সুয়াপুরে শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস মহাশয়দের দেড়শত বৎসরের প্রাচীন ইষ্টকালয় ভাঙিয়া গেলে, উক্ত গৃহের ভিত খুড়িতে বহু নিম্নে একটি প্রাচীরের অগ্রভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রাচীর সমসূত্রে মৃত্তিকা খনন করিলেই পরিদৃষ্ট হয়, উহা এক সুবৃহৎ পাড়ার সমুদয়টা জুড়িয়া আছে। ঐ স্থানের অনতিদূরে "পিলখানা" ও "কোটবাড়ি" বলিয়া স্থান আছে। হিন্দু রাজত্বসময়ে দুর্গকে "কোট" বা "গড়" বলিত। সুতরাং ঐ কোটবাড়িতে প্রাচীনকালে কোনও দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। "রাজার পাড়ার" একটি পুষ্করিণীর মধ্যে সম্প্রতি একটি সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে"।

মহারাজ বল্লালের বহু পূর্ব হইতেই এতদ্দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারের চেষ্টা হইতেছিল। আমাদের বিবেচনায় বৌদ্ধধর্মের স্থানে প্রথমত শৈবমত প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। শিব ও বুদ্ধ উভয়েই মহাযোগী, বৌদ্ধ ও শৈবমতে প্রাণীবধ মহাপাপজনক। এজন্য সহজেই বৌদ্ধ মতের স্থলে শৈবমত পরিগৃহীত হইয়াছিল। এইসময়ে বৌদ্ধাচার্যগণ সাধারণ লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই তান্ত্রিক মত প্রচলিত করিয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত কোনও কোনও দেবী ভারতের বাহির হইতে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। কুব্জিকাতন্ত্র মতে তারাদেবীর পূজা ভারতের বাহির হইতেই ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। রুদ্রযামলের মতে বশিষ্ঠদেব চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে তারাদেবীকে এদেশে আনয়ন করেন।

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার চিহ্ন অদ্যাপি এই জেলার নানাস্থানে বর্তমান রহিয়াছে। ধামরাই, নান্নার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বনদুর্গা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। বনদুর্গা বুড়াঠাকুরাণীরই নামান্তর মাত্র। বুড়াঠাকুরাণী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, সোনারগাঁও অঞ্চলেও পূজোপচার পাইয়া থাকেন। তবে, বনদুর্গার পূজা ও বুড়াঠাকুরাণীর পূজায় একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেবাধিষ্ঠিত প্রাচীন বটপর্কটি মূলে বনদুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বুড়াঠাকুরাণী জনসাধারণের গৃহমধ্যে সদ্যরোপিত শেওড়া শাখামূলে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বুড়াঠাকুরাণীর পূজায় বলি প্রদত্ত হয় না। কিন্তু বনদুর্গা পূজায় অন্যান্য বলির সহিত শূকরবলির প্রথা এই জেলার অনেকানেক স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বনদুর্গা দুর্গার সন্তান। বনে জন্ম হইয়াছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ধ্যানে ইনি দানবমাতা বলিয়া পরিকীর্তিতা। মানিকগঞ্জের শিবযুগি জাতি দ্বারা পূজিত হইতেছে। যুগিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজগণের পুরোহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল অঞ্চলেই সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পালবংশের ধ্বংসের পরে ভাওয়ালের অন্তর্গত রাজাবাড়ি নামক স্থানে চণ্ডাল জাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মোগ্‌গী নাম্নী তাঁহাদের এক মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের উৎপীড়নে ভাওয়াল জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে উহারা ভয়ানকরূপে নির্যাতন করিতেন। এতদঞ্চলে "খাইডা ডোস্কা" নামধেয় জনৈক রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার নাম নানাবিধ কিংবদন্তীর সৃষ্টি করিয়া বেলাই বিলের সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কীয় যে ভাটের গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ইনি কায়েত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু নাম পর্যালোচনায় ইনি তিব্বতদেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। "খাইডা ডোস্কা" কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়া যাইতেছিলেন, ভাট পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্মাধিপত্য বিস্তৃত ছিল তাহা সর্ববাদীসম্মত। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়নচঙের সমতট বর্ণনা প্রসঙ্গে সমতট বৌদ্ধধর্ম-প্লাবিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নগরের নিকটে অশোকস্তূপ বিদ্যমান ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সোনারঙ্গের গোঁসাই বাড়িতে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, একমাত্র উহাই বিক্রমপুরের বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্যের চিহ্ন বলিলে যথেষ্ট হইবে।

পীঠসমূহের বিবরণ পাঠ করিলে অনুমিত হয় বৌদ্ধধর্ম দূরীকরণ মানসেই হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৫১টি স্থান ভৈরব ও শক্তি আরাধনার কেন্দ্রস্থল করেন। মহারাজ বল্লাল ভূপতি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন। ঢাকেশ্বরী তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরটি পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া অভিনব আকারে পরিণত হইলেও উহার পশ্চাদ্ভাগ প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে উহা বহু প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। এজন্যই এই মন্দিরটির পশ্চাদ্ভাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ববাংলার মোসলমান শাসনের প্রারম্ভকালে রামপালের সন্নিকটে জগন্নাথ বণিক নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জগন্নাথ নানা সৎকার্যে ধনরাশির বিনিয়োগ করিয়াছিল। কথিত আছে, ইনি অষ্টোত্তরশত দেউল প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক দেউলের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকের স্তূপাকারে জোড়াদেউল, পানাম, সুখবাসপুর, দেওসার, সোনারঙ্গ প্রভৃতি গ্রামে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেউলগুলি বিপুলায়তন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক একটি দেউলের ভগ্নাবশেষ দ্বারা কোন কোন স্থানে ২-৩ বিঘা ভূমি, তৎচতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা ৮-৯ হাত উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জোড়াদেউল গ্রামে এইরূপ দুইটি একস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহা জোড়াদেউলের নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা এই সমুদয় দেউলের গঠনপ্রণালি ও নির্মাণকৌশল জানিবার উপায় নাই। দেউলবাড়িসমূহ খনন করিলে বহু পুরাতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

রামপালের সমৃদ্ধির সময়ে এস্থানে তাঁতি, শাখারি প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত ছিল। পানহাটা (পানিহাটি), শাঁখারি দিঘি, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থান রামপাল নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বল্লালচরিত পাঠে রামপালের অনতিদূরে দুর্গাবাড়ি নামক স্থানের অবস্থান অবগত হওয়া যায়। রামপালের সন্নিকটবর্তী দুর্গাবাড়ি গ্রামই যে বল্লাল চরিতোক্ত দুর্গাবাড়ি তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মহারাজ আদিশূরানিত মুখ্য ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের প্রথম অধ্যুষিত স্থান বলিয়া একটি গ্রাম অদ্যাপি "পঞ্চসার" নামে খ্যাত আছে। রামপাল হইতে এই স্থান প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে অবস্থান করিয়াই তাঁহারা আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী হন।

ধলেশ্বরী নদী হইতে তালতলার খালে প্রবেশলাভ করিলে ফেগুনাসারের মঠটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই মঠ প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর যাবৎ ঁশ্যামসুন্দর রায় কর্তৃক তদীয় মাতৃশ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! ফেগুনাসারের যে অংশে এই মঠটি অবস্থিত তাহা "শ্যামরায়ের পাড়া" বলিয়া অভিহিত। মঠের পশ্চিমদিকস্থ দির্ঘিকার উত্তরদিকে তদীয় প্রাচীর-বেষ্টিত দ্বিতল অট্টালিকা এবং সিংহদরজার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। শ্যামরায় শ্রীহট্টের নবাবের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমান ও অতিথিসেবক ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। শ্যামরায়ের মাতার প্রবর্তিত চড়কপূজার গজারি গাছটি এখনও রহিয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে চড়ক পূজা ও মেলা হয়। অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দির্ঘিকা এবং বিশাল বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা লালা যশোবন্ত রায়ের বাড়ি বলিয়া কথিত হয়। লালা যশোবন্ত মহারাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক।

বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া যাহারা জলপথে তালতলার খাল বাহিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই দ্বিপাড়ার মঠটি সন্দর্শন করিয়াছেন। প্রায় দ্বিশত বৎসর অতীত হইল এই মঠটি স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই মঠের উর্ধ্বভাগ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান নন্দকুমার মহারাজ রাজবল্লভের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান নন্দকুমারের বাড়ির উত্তরদিকে প্রকাণ্ড পরিখা এবং ঐ পরিখার সমসূত্রে পূর্ব-পশ্চিমে দুইটি প্রকাণ্ড দির্ঘিকা এবং মধ্যস্থলে ইহার প্রাসাদতুল্য বাড়ি ও এই বাড়ির দক্ষিণে অপর একটি বিশালায়তন জলাশয় বিদ্যমান আছে। দিঘি এবং ঐ পরিখার পূর্ব-পশ্চিমদিকে বাড়িতে প্রবেশ করিবার সিংহদরজা ছিল, এখনও ঐ সকল স্থানে সিংহদরজার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে কেবল দুর্গামণ্ডপটি বিশাল ভগ্নস্তূপের মধ্যে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উক্ত দির্ঘিকাদ্বয়ের দক্ষিণপারে দেওয়ান নন্দকুমারের মাতৃশ্মশানোপরি একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। নবাব মীরকাসিমের আদেশে তদীয় সেনাপতি আগাবাকর রাজনগর লুণ্ঠন করিয়া নন্দকুমারের বাড়িও লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। দ্বিপাড়ার ন্যায় দির্ঘিকা-বহুল গ্রাম বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীনগর গ্রামে লালা কীর্তিনারায়ণের বর্তমান জমিদারদিগের উর্ধ্বতম অষ্টমপুরুষ ঁকৃষ্ণজীবন বসু পৈত্রিক বাসস্থান ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়া সপুরোহিত বেজগ্রামে আগমন করেন। বেজগায়ে ঁকৃষ্ণজীবন বসুর ভদ্রাসন অদ্যাপি "বসুর বাড়ি" বলিয়া খ্যাত। লালা কীর্তিনারায়ণ কৃষ্ণজীবনের পৌত্র। কীর্তিনারায়ণের সমুদয়' সম্পত্তিই তদীয় কুলদেবতা অনন্তদেবের নামে ক্রীত। অনন্তদেবের বাসস্থান "বৈকুণ্ঠধাম" নামে অভিহিত হইত বলিয়া তিনি তদীয় অর্জিত পরগণার নাম "বৈকুণ্ঠপুর" রাখিয়াছিলেন। তদবধি ইহারা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বলিয়া খ্যাত। কীর্তিনারায়ণের সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় গ্রাম "রায়েস বরের" নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রীনগর নামে উহা অভিহিত করেন। গ্রামের চতুর্দিকে পরিখা এবং গ্রামের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়াদি খনন করিয়াছিলেন। এই জলাশয়গুলি মধ্যে একটি দ্বাদশ শিবের ও অন্য একটি ঁঅনন্তদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কীর্তিনারায়ণ তদীয় বাড়ি প্রকাণ্ড ইষ্টকালয়ে পরিণত করেন। তন্মধ্যে একটি অট্টালিকা "সাহানিয়া" নামে খ্যাত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ হস্ত, প্রস্থ ৪১ হস্ত এবং উচ্চতা ২০ হস্ত হইবে। ভিতরের দেয়ালে ছাদে নানাবিধ সুদৃশ্যকারুকার্য ছিল। এতদ্ব্যতীত "রংমহাল" "কমলাসন" নামে দুইটি সুরম্যহর্ম্যের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়।

তারপাশার "মহাশয়গণ" বিবিধ সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া সর্বসাধারণের নিকটে "মহাশয়" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাশয়গণের আবাসবাটি সুরম্য হর্ম্যরাজিতে পরিশোভিত ছিল। তাহাদিগের বাসভবন বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বাটির চতুর্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে বাটিস্থ পুরুষগণ ব্যতীত অপরের প্রবেশলাভ

নিষিদ্ধ ছিল। মহাশয়গণের কীর্তিকলাপ কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়া স্বপ্নের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কালীপাড়ার পূর্ব নাম ছিল কাওলিপাড়া ও কাপালিকপাড়া। বহু পূর্বে ঐ স্থান কাপালিকগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া উহা কাপালিকপাড়া নামে অভিহিত হইত। কালীপাড়ার জমিদারবংশের পূর্বপুরুষ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাচরপাশা গ্রাম হইতে ঐ স্থানে বাস স্থাপন করিয়া উহাকে কালীপাড়া আখ্যা প্রদান করেন। এখানে জয়কালী নাম্নী এক মৃন্ময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালীপাড়া বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

শ্যামসিদ্ধি গ্রামে একটি উচ্চ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। বিক্রমপুরের মধ্যে অন্য কোথাও এত বড় মঠ আর নাই। এই মঠের কারুকার্য ও স্থাপত্যকৌশল অতি সুন্দর।

আবিরপাড়ার মঠটি পঞ্চরত্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মঠটিও অতি প্রাচীন। সাধারণ মঠ হইতে ইহার গঠনপ্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কতিপয় বৎসর অতীত হইল প্রাকৃতিক বিপ্লবে মঠটি ভগ্ন এবং কতকাংশ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

লৌহজঙ্গের পালচৌধুরিগণের নির্মিত নবরত্ন ও একুশ রত্ন বিক্রমপুর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে রাজনগর ও লৌহজঙ্গের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালি বিদ্যমান ছিল ; তাহা "নয়ানদী রথখলা" নামে অভিহিত হইত। পালচৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ নন্দরাম পালের রংপুরে তামাকের ব্যবসায় ছিল। তাহাতেই তিনি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। কথিত আছে, তদীয় পুত্র রামপালের নামে রংপুরে "রামচন্দ্রী" পাথর বলিয়া তামাক ওজনের একপ্রকার বাটখাড়া প্রচলিত হইয়াছিল। পালচৌধুরিগণ যে ঁলক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, শ্রীধর চক্র ও ঁলক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা নন্দরামপাল দৈব সংযোগে প্রাপ্ত হয়। লৌহজঙ্গের পালচৌধুরিগণের কীর্তিকলাপ কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে।

ধাইদার মঠটিও অতি প্রাচীন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর রেনেল এই মঠের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেল এই স্থান হাটখোলা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধাইদাকে দাগদিয়া বলিয়া লিখিয়াছেন।

কামারখাড়ার মঠ, চৌদ্দহাজারির মঠ, টঙ্গিবাড়ির মঠ, বেজগাঁয়ের সতীঠাকুরাণীর মঠও উল্লেখযোগ্য।

হিঃ ১০৭২ সনের ১৮ই রবিয়লআউল মীরজুম্‌লা ঢাকা হইতে কুচবিহার অভিযানে প্রস্থান করিলে এহিতিসিম খাঁ অস্থায়ীভাবে সুবাদারের কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। মগদস্যুদিগকে দমন করিবার উদ্দেশে তিনি অধিকাংশ সময়ই খিজিরপুরে অবস্থান করিতেন এজন্য বাদশাহের দেওয়ান রায় ভগবতী দাসের হস্তে রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যভার অর্পিত হয় এবং রাজকীয় জটিল বিষয়ের সুমীমাংসার ভার খাজা ভগবানদাস "সুজাইর" হস্তে ন্যস্ত ছিল। তৎকালে মহম্মদ মকিম রাজকীয় নৌবিভাগের দারোগা পদে সমাসীন ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। এইসময়ে মহম্মদ মকিম ঢাকা নগরীতে যে একটি "কাটরা" নির্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপি "মকিমের কাটরা" নামে সুপ্রসিদ্ধ।

নবাব জাফর খাঁ (ইনি ইতিহাসে কাতরলব খাঁ ও মুর্শিদকুলি খাঁ নামে প্রসিদ্ধ) ঢাকা নগরীতে একটি মসজিদ ও বাজার নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মসজিদটি জাফরি মসজিদ নামে খ্যাত। উহা ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর উত্তরাধিকারী গুজনফার হুসেন খাঁর কন্যা হাজি বেগমের তত্ত্বাবধানে ছিল বলিয়া তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

গড় কাশিমপুর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত "জরুন" এবং "সুরাবাড়ি" নামক স্থানদ্বয়ে পালবংশীয় যশোপাল রাজার কীর্তিকলাপের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল জরুন গ্রামে মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় ; পরে মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভস্থিত বহু অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্থানে রাজা যশোপালের অন্যতর বাসভবন ছিল। সুরাবাড়ি গ্রামেও একটি

অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "বড়ইবাড়ি" গ্রামে যশোপালের বহু কীর্তিচিহ্নাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি তুরাগ নদীর অনতি উত্তরে সংস্থিত। একটি সমুন্নত মৃৎস্তূপের উপরে প্রাচীন কীর্তিকলাপের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

"জাঠালিয়া" এবং "বক্ষরি" নামক স্থানদ্বয়েও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাও পালবংশীয় রাজগণের বিলুপ্তপ্রায় অতীত স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। "গাজিবাড়ি" গ্রাম "গাজিখালি" নদীতটে অবস্থিত। এই স্থানে যশোপালের অন্যতম আবাস স্থান ছিল। রাজবাটির চতুর্দিক সুপ্রশস্ত পরিখাবেষ্টিত। বাটির দক্ষিণদিকে বহু দূরব্যাপী বিল এবং অপর তিনদিকেই পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিখার পার্শ্বে স্থানে স্থানে মৃৎপ্রাকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবাটির পশ্চিমদিকস্থ পরিখা হইতে প্রায় অর্ধমাইল পশ্চিমদিকে গাজিখালি নদী প্রবাহিত। গাজিখালির পশ্চিম তটদেশে মাধবচালা গ্রামে অবস্থিত। এই মাধবচালা গ্রামের দক্ষিণদিকেই উপরোক্ত বিল বিস্তৃত রহিয়াছে।

বর্তমান জাগির বন্দরের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ধলেশ্বরীর পশ্চিমতটসংস্থ "মেঘশিমূল" নামক স্থানে চাঁদগাজির পিতা দেলওয়ার খাঁ নৌকাযোগে আগমন করিলে ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ দেখিয়া একটি শিমূলগাছে তাঁহার নৌকা বন্ধন করেন। তাহাতেই ঐ স্থানের নাম "মেঘ শিমুলিয়া" হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে। দেলওয়ার উহার নিকটে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। উহাকে সাধারণ লোকে রাজবাড়ি বলিয়া থাকে। ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাতে মেঘশিমুলিয়া ও রাজবাড়ি এই উভয়স্থানই ভগ্ন হইয়া পুনরায় নতুন চড়াতে পরিণত হইয়াছে।

মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুতুনি একটি প্রাচীন গ্রাম। চারিশত বৎসর পূর্বে ক্ষীরাই ও কান্তাবতী নদীর স্রোতোপ্রাবল্যে বুতুনি গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরে আবার বালুকাচরে পরিণত হয়। এই সময়ে কতিপয় ভদ্রবংশীয় মোসলমান এই স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ইহাদিগের মধ্যে দানেশ খাঁ নামক একব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার নামানুসারেই এই স্থান দানেস্তা নগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অদ্যাপি বুতুনি গ্রামের দক্ষিণে গ্রামের সংলগ্ন যে একটি বড় হালট আছে উহা দানেস্তানগরের হালট বলিয়া কথিত হয়। ঐসময়ে এখানে একটি বন্দর ছিল। মোসলমানগণ গ্রামের কেন্দ্রস্থল "সাহেবো জাদম" বাগবাড়ি ও বর্তমান চৌধুরি পাড়ায় বাস করিতেন। ইহাদের একটি পাকা মসজিদ ছিল, বর্তমানে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি ঐ মসজিদের ইষ্টকস্তূপ ভূগর্ভে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা মসজিদভিটি বলিয়া উক্ত হয়। ঐ ভিটিতে যে একখণ্ড প্রস্তর আছে তাহা "গাজির পাটা" বলিয়া পরিচিত। সন্নিকটে গাজির দরগা ছিল। মৃত্তিকা খনন করিলে আজও এই স্থানে ইষ্টকরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুতুনি গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বড় "কুপ" ছিল। উহা ক্রমে ভরাট হইয়া প্রকাণ্ড গড়ে পরিণত হইয়াছে। এই গড় "ভূতের গড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কলাকোপা গ্রামে মহাত্মা দাতা খেলারামের বাসস্থান ছিল। খেলারামের নির্মিত নবরত্ন ও দির্ঘিকা এখনও বিদ্যমান আছে। এখানে ক্ষেপারাণীর আখড়া বলিয়া বাউল-সম্প্রদায়ের একটি আখড়া আছে। সাধুতা দ্বারা ক্ষেপরাণী বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল।

যন্ত্রাইল গ্রামে মাঘী সপ্তমীর দিন একটি মেলার অধিবেশন হয়। এখানে প্রতিবৎসর ১লা আশ্বিন তারিখে নদীগর্ভে যে নৌকার বাইচ হইয়া থাকে তাহা দর্শনযোগ্য।

পাঠানকান্দির তারাবাড়ির মঠ ও মসজিদ, জয় কৃষ্ণপুরের অভয়াচরণ বসুর মঠ, বাগমারার কৃষ্ণমোহন সাহার মঠ, যন্ত্রাইল জয়কৃষ্ণ ঘোষের মঠ, নবাবগঞ্জের ব্রজসুন্দর বাবুর মঠ প্রসিদ্ধ। মামুদপুরের মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

পারজোয়ারের অন্তর্গত পূবদি গ্রামের ঝুলন প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ালের অন্তর্গত রাজবাড়ি নামক স্থানে, "চাড়াল রাজার" বাড়ির অনতি দূরে অবস্থিত "মোগ্‌গির মঠ"টি প্রতাপ ও প্রসন্নের মহাপ্রতাপশালিনী সহোদরা মোগ্‌গির নাম সজীব রাখিয়াছে।

চৌরাগ্রামে গাজি বংশীয় পালোয়ান সাহ ও কায়েম সাহের সমাধি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত সমাধির সন্নিকটে এখনও একটি ধ্বংসমুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে। মসজিদের এক মাইল পশ্চিমদিকে আর একটি প্রাচীরবেষ্টিত সমাধি মন্দির আছে। লাক্ষ্যানদীর সমীপবর্তী বালি গাঁ নামক স্থানের সান্নিধ্যে মাতাব গাজির পিতা বাহাদুর গাজির নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদ বিদ্যমান ছিল। উহা ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তর ফলকখানা অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

ভাওয়ালের অন্তর্গত টেঁপির বাড়ি নামক স্থানে একটি প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষ ও প্রকাণ্ড একটি দির্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেওয়া গ্রামেও একটি ভগ্ন মঠ ও প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গজারচালা নামক স্থানে অনেক ইষ্টকস্তূপ বিদ্যমান আছে, উহা এত উচ্চ যে দেখিলে একটি মঠের ন্যায় অনুমিত হয়।

সুবর্ণগ্রামে বাস্তুভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পঞ্চমীঘাটের উত্তর হইতে মহজুমপুর পর্যন্ত এবং মহেশ্বরদীর অনেকানেক স্থানে বাসোপযোগী পতিত বাস্তুভূমিসমূহ দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে যে ঐ সকল স্থান পুরাকালে সমৃদ্ধিশালী বহু লোক-সমাকীর্ণ জনপদ ছিল। এইসকল পতিত স্থানের মধ্যে প্রায়ই দিঘি পুষ্করিণী এবং মনুষ্য বসতির অন্যবিধ বহুতর চিহ্ন আজও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সঙ্গমস্থানের উত্তরাংশে, কোথাও কোথাও অনুচ্চ টিলাও দৃষ্ট হয়।

সোনারগাঁয়ের অনেক স্থানে কোচদিগের খনিত দির্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বরাব নামক গ্রামের পূর্বদিকে একটি সুবিস্তৃত জলাশয় রহিয়াছে, উহা কোচের খনিত বলিয়া কথিত।

আমিনপুর গ্রামের একটি বাড়ি "ক্রোড়িবাড়ি" বলিয়া অভিহিত। বৈদ্যবংশীয় বলরামদাস নবাব সরকারে, কোষাধ্যক্ষের কর্ম করিয়া ক্রোড়ি উপাধি প্রাপ্ত হন, এজন্য বলরামের অধ্যুষিত ভদ্রাসন "ক্রোড়িবাড়ি" বলিয়া কথিত হয়। বলরামদাস মহারাজ বল্লালের সেনাপতি পন্থ দাসের অনন্তর বংশ।

কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস্‌ রেনেল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ প্রভৃতি নদ-নদীসমূহের জরিপ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ Rennell's Memoir নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত পুস্তক হইতে বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের নদনদীসমূহের প্রবাহ-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৎকালে ঢাকাজেলার নদনদীগুলির অবস্থান কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। এতদুদ্দেশ্যে এ স্থলে রেনেলের ডায়েরির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

বিস্তারের বিশালতা এবং স্রোতের প্রাবল্য নিবন্ধন বদরসন খালের মোহানা হইতে পদ্মানদী অতিক্রম করিতে রেনেলের চার ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। পদ্মা পার হইয়া ঢাকায় পৌঁছিবার জন্য তাঁহাকে নলুয়ার খাল আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। নলুয়া হইতে ঢাকা চব্বিশ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। উক্ত খাল পথে হাটখোলা হইয়া তিনি দাগদিয়া (ধাইদা) নামক স্থানে উপনীত হন। রেনেল ধাইদার "উচ্চ শ্বেতবর্ণ মঠ"টি সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতেই তিনি মীরগঞ্জ (তালতলা) ও ইছামতী নদীতে উপনীত হন। তালতলার পুলের নিম্ন দিয়া তাঁহার বজরা অনায়াসে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মীরগঞ্জ

হইতে ধলেশ্বরী নদী অতিক্রম করিয়া বুড়িগঙ্গার মুখে পৌঁছিতে তাহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই।

রাজাবাড়ি ৫/৬ মাইল দক্ষিণে চণ্ডীপুর বা লড়িকুলের খাল আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। মেঘনাদ হইতে লড়িকুল এবং রাজনগরের পথে, গঙ্গানগর বা চিকন্দির নিকটে, পদ্মায় প্রবেশ লাভ করিবার উহাই একমাত্র সোজা পথ বলিয়া বিবেচিত হইত। চণ্ডীপুর হইতে চিকন্দি ১১ মাইলের অধিক দূরবর্তী ছিল না। পদ্মা ও মেঘনাদ এই উভয় নদী এতাদৃশ সান্নিধ্য প্রবাহিত থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই সম্মিলিত হইতে পারিয়াছিল। লড়িকুলের খালের জলরাশি পদ্মা হইতে মেঘনাদ অভিমুখে প্রবাহিত হইলেও মেঘনাদের উচ্ছ্বসিত স্রোতপ্রাবল্যে চিকন্দির খালের প্রবাহ পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই, উহা বরাবর পূর্ববাহিনীই ছিল। রাজাবাড়ির সন্নিকটে, নদীগর্ভে বহু দ্বীপ ও বালুকাময় চড়াভূমি বিদ্যমান ছিল। দ্বীপসমূহ গঠিত হওয়ায় পদ্মার আয়তন অপেক্ষাকৃত খর্বতাপ্রাপ্ত হইলেও চণ্ডীপুরের সন্নিকটে নদীর প্রশস্ততা শীতকালেও ৭½ মাইল ছিল বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। এই চণ্ডীপুর হইতে মুলফৎগঞ্জ, লড়িকুল, জপসা, রাজনগর ও চিকন্দি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়াই তাঁহাকে গঙ্গানগরের খালে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। জপসার অভ্রভেদি মঠটি পদ্মা ও মেঘনাদ এই উভয় নদী হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন।

বুড়িগঙ্গার প্রশস্ততা ২৫০ গজের অনধিক ছিল। এই নদীটিকে তিনি গঙ্গার পূর্বতন শাখা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। D'Anvile ঢাকা নগরীকে গঙ্গার উত্তরতটে, জলঙ্গি নদীর মোহানা হইতে ৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি বুড়িগঙ্গাকেই গঙ্গানদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অনুমিত হয়।

সোনারগাঁয়ের ৭ মাইল দূরে মেঘনাদ তটে সংস্থিত নবাবদী গ্রামকে রেনেল নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নলদি ও নরসিংদি এতদুভয় স্থানের মধ্যবর্তী নদীটি সুপ্রশস্ত, খরস্রোতা এবং দ্বীপবহুল, অনেক স্থানেই ইহার পরিসর ২½ মাইলের উপর। এই নদীর পশ্চিমতটদেশ হইতে প্রায় ১৪০ মাইল অন্তর সুলতালসিদ্ধির মঠ অবস্থিত।[১] ব্রহ্মপুত্রের এক প্রকাণ্ড শাখানদী ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং ৭ মাইলের অধিক প্রস্থ বিশিষ্ট একটি দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া নরসিংদির সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহই[২] চিলমারি ও গোয়ালপাড়া যাইবার সোজাপথ। নরসিংদির অনতিদূরে আর একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালি মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালি দিয়া মেঘনাদ হইতে লাক্ষ্যা নদীতে অতি অল্প সময়ে যাওয়া যায়। নরসিংদির ৮ মাইল উর্ধ্বে একটি সুবৃহৎ খাল দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাল আলিনিয়ার অনতিদূরে মেঘনাদে পতিত হইয়াছে।[৩]

রেনেল দয়াগঞ্জের পুল ও নারান্দিয়ার খালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। নারান্দিয়ার ইষ্টকনির্মিত সেতু ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি দয়াগঞ্জ হইতে ডেমরা হইয়া বর্মিয়ার খালে প্রবেশ করেন। বর্মিয়ার খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত শিমুলিয়ার নিকটে লাক্ষ্যা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এই খালটি অত্যন্ত কুটিলগতিতে প্রবাহিত, এবং ইহার তীরভূমি ভীষণ অরণ্যানীসঙ্কুল। বর্মিয়ার ৪ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে বাইগনবাড়ি হইতে অপর একটি খাল আসিয়া উপরোক্ত খালটিতে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ধলেশ্বরী এক্ষণে জাফরগঞ্জের ১০ মাইল দূরে যমুনা হইতে প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তৎকালে উহা গঙ্গার উত্তরদিকস্থ প্রবাহ হইতে বহির্গত হইয়া জাফরগঞ্জের পাদদেশ বিধৌত করিয়াই প্রবাহিত হইত এবং বহুবিধ ঝিলরাশির মধ্য দিয়া অঙ্গ মিশাইয়া ১০/১২ মাইল পথ অতিক্রমকরতঃ পয়লাপুর ও সাপুরের নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল।

রেনেল বলেন "হাজিগঞ্জের উত্তর সন্নিকটবর্তী স্থান হইতে গঙ্গার দুইটি ক্ষুদ্র শাখা নদীর সম্মিলনের ফলেই ইছামতী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। ঠাকুরপুরের খাল ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া বুড়িগঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছে। এই খালটি বর্ষাকালেও ২১/২ হস্তের অধিক গভীর নহে। এই খালটি এরূপ কুটিলগতিবিশিষ্ট ও অপ্রশস্ত যে, বৃহৎ তরণী সমূহ মোড় ঘুরিতেও পারে না। ঠাকুরপুরের খাল বুড়িগঙ্গার গর্ভস্থিত অষ্টকোণ সমন্বিত দ্বীপের বিপরীত দিকে ও ঢাকা হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামের সান্নিধ্যে, ধলেশ্বরীর সহিত বুড়িগঙ্গার সংযোগ সাধন করিয়াছে। ধলেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি দ্বারাই ইহার পরিপুষ্টি হইত।"

"তুলসী খাল বা ইছামতীর পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহটি ঠাকুরপুর গ্রামের ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, এই খাল বাহিয়াই ঢাকা হইতে হাজিগঞ্জ অভিমুখে যাতায়াত করিতে পারা যায়। অতি অপ্রশস্ত ও বক্রগতি সম্পন্ন হইলেও এই খালটি অত্যন্ত গভীর। ইহার দৈর্ঘ্য ৬ মাইল। ইছামতী আকিয়া বাঁকিয়া ধীর মন্থরগতিতে প্রবাহিত। ইছামতী হইতে দুইটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালি উদ্ভব হইয়া সাপুরের কিঞ্চিৎ নিম্নে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইটি খাল দিয়া কেবলমাত্র বর্ষাকালেই ডিঙ্গি নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। নবাবগঞ্জের নিকটস্থ ইছামতীর গভীরতা শীতকালে এক হস্তের অধিক নহে, কিন্তু সাবদিচড় অথবা মেগালার নিকটবর্তী নদীটি গভীরতর। ঐ শাখা দুইটি গঙ্গার সান্নিধ্যে কির্দপুর নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, এবং ইছামতীর প্রধান প্রবাহটি পাথরঘাটার[৪] সন্নিকটে ধলেশ্বরীর স্রোতমধ্যে বিলীন হইয়াছে।"

"সাপুরের[৫] সন্নিকটে ধলেশ্বরী হইতে অপর একটি খাল উৎপন্ন হইয়া ইছামতীর সহিত ধলেশ্বরীর সংযোগ ঘটাইয়াছে। এই খাল বারোমাসই নৌবাহনযোগ্য। সাপুরের ৪১/২ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে গাজিখালি নদীর উদ্ভব হইয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ধলেশ্বরীর সংযোগ সাধন করিয়াছে। কুরুয়ার সন্নিকটে এই নদী আবার ধলেশ্বরী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গাজিখালির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হীরা ও কনুই নদীদ্বয় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।"[৬]।

"পয়লাপুরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগদ্বয়ের সীমান্ত স্থানে, গোয়ালপাড়া নামক স্থান অবস্থিত। এই স্থানেই আন্দিয়াদহ ও করতোয়াগঙ্গা মিলিত হইয়াছে।"

"কান্তাবতী নদী আত্রেয়ীর সহিত মিলিত হইয়া ৫ মাইল পথ অতিক্রমকরতঃ জাফরগঞ্জের সন্নিকটে বড়গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

"গ্রীষ্মকালে হাজিগঞ্জ হইতে জলপথে ঢাকায় যাতায়াত করিতে হইলে ৬৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। হাজিগঞ্জ হইতে মেগালার খাল বাহিয়া কির্দপুরের সন্নিকটে ইছামতী নদীতে এবং তথা হইতে নবাবগঞ্জ ও চূড়ানের পথে তুলসিখাল বাহিয়া ধলেশ্বরী নদীতে প্রবেশ করিতে হয়। পরে ঠাকুরপুর ও ফতেপুর অতিক্রমকরতঃ বুড়িগঙ্গা বাহিয়া ঢাকায় যাইতে হয়"। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই আলোচিত হইয়াছে।

কোনও দেশের শিল্পকলার অনুশীলন করিলে দৃষ্ট হয় যে সেই শিল্পে সেই দেশের জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে। ঢাকা শিল্পপ্রধান স্থান। বিভিন্ন শিল্পীর একত্র সমাবেশ বঙ্গের অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু শাসনসময়ে বিক্রমপুরের শিল্পাচার্যগণ একত্র বিমিশ্র বিভিন্ন ধাতুর পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি ধাতু পৃথক করিয়া লইবার প্রণালি অবগত ছিলেন। মোগল শাসনসময়ে এই শিল্প বিক্রমপুর হইতে ঢাকার অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

সূক্ষ্ম তারের উপরে সুবর্ণ ও রৌপ্যের বিচিত্র মনোরম কারুকার্য করিবার এক অভিনব ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঢাকা কামারনগরের শ্রীআনন্দহরি রায় দেশের মুখোজ্জ্বল

করিয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত প্রণালিটি এরূপ সহজ-সাধ্য যে, স্ত্রীলোকেও উহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।

সম্প্রতি বঙ্গের গভর্নর মহানুভব শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ঢাকার স্বনামধন্য নবাব শ্রীযুক্ত খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর জি. সি. আই. ই. মহোদয়কে তদীয় দার্জিলিঙ্গস্থ শৈলাবাস সুসজ্জিত করিবার মানসে কাষ্ঠনির্মিত দুইটি হস্তী তথায় প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। গভর্নমেন্ট সমক্ষে ঢাকার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিবার এই শুভ অবসর উপেক্ষা করা সহৃদয় নবাববাহাদুর সমীচীন জ্ঞান করিলেন না। অচিরে তিনি তদীয় স্টেটের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি শিল্পী নির্বাচনের ভার অর্পণ করেন। অনুকূলবাবু ঢাকার অন্যতম শিল্পীকুল-বরেণ্য মুক্তারাম দাসের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার হস্তে এই কার্যভার ন্যস্ত করেন। বয়সে নবীন হইলেও বিনোদের শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি যথেষ্ট আছে। স্বীয় সহোদরার সাহায্যে বিনোদ তিন সপ্তাহ কাল মধ্যেই সেগুন কাষ্ঠ দ্বারা দুইটি সুবৃহৎ হস্তী নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। হস্তী দুইটির ওজন হইয়াছিল ৩ মন। কাঠের মূল্য ও পারিশ্রমিক বাবদে ২৫০ টাকা বিনোদের প্রাপ্য হইয়াছে। হস্তী দুইটির নির্মাণকৌশল এরূপ চমৎকার যে, উহা জীবিত বলিয়াই ভ্রম হয়। স্বয়ং গভর্নর বাহাদুরও নির্মাতার শিল্পচাতুর্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

এস্থলে সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত ভাটপাড়া নিবাসী অপর একটি রমণীরত্নের বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন। ইহার নাম শ্রীযুক্তা অক্ষয়কুমারী দেবী। ইনি কাগজের উপরে বহুবিধ শিল্পবিন্যাস করিতে সমর্থ। ইহার নির্মিত নানাবিধ দ্রব্যাদি চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইলে, তথাকার শিল্পাচার্যগণ এই বর্ষিয়সী মহিলার গুণপনার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল ঢাকার স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে "হুসনি দালান",—"তাজমহল",—"আহসান মঞ্জিল"— প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্যরাজি সুবর্ণ ও রৌপ্যের সূক্ষ্ম তার দ্বারা নির্মাণ করিয়া আনন্দহরি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন। আনন্দ হরির পিতা লক্ষ্মণ রায়ই কাগজের পুতুল দ্বারা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর বড় চৌকি সজ্জিত করিতে প্রথম আরম্ভ করেন। তৎপূর্বে অপর কেহ এই অভিনব প্রথা অবলম্বন করে নাই। সুবর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যে ঢাকা কামারনগরের রাজবল্লভ রায় ও জরিয়াচুলির গোবিন্দ কর্মকার যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার সুখলাল, চুনিলাল, পুরুষোত্তম ও মুন্নালাল প্রভৃতি শিল্পীগণ সেতার নির্মাণকার্যে শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের প্রস্তুত সেতার ও এস্রাজ ভারতের নানাস্থানে সাদরে নীত হইয়া থাকে।

উদ্দীপনা না পাইলে সুপ্ত উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হইতে পারে না। শুধু যন্ত্রাদির উদ্ভাবনও সকল সময়ে ঈপ্সিত ফল প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকে। প্রচুর অর্থশক্তির সাহায্যেই সকল দেশে শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হইতেছে। রাজশক্তির বিশেষ আনুকূল্য ঘটিলে ঢাকার বিলুপ্ত শিল্পবাণিজ্যের পুনরভ্যুদয় এখনও সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের সহৃদয় রাজপুরুষগণ দেশীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অধুনা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইতেছে।

ঢাকার ইতিহাস ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভূতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, প্রাচীন কীর্তি, তীর্থস্থান ও পুণ্যস্থান, দেবালয় এবং ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে লিখিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড হইতেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু শাসনকাল হইতে বারভূঞার আমল পর্যন্ত

এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসনকালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ, পল্লি বিবরণ এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।

পদে পদে স্বীয় অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াও এতদুদ্দেশ্যে আমি বহুকাল যাবৎ ঢাকার নানা স্থান পর্যটনপূর্বক ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। ভূতপূর্ব সুধা-সম্পাদক কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, তোষিণী-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, ঢাকা প্রকাশের ভূতপূর্ব সহ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী, স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত এবং শ্রীমান দ্বিজেননাথ রায় প্রমুখ বন্ধুবর্গ ঢাকার একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। এই বিরাট ব্যাপারে গুরুত্ব অনুভব করিয়া আমি কিন্তু প্রথমত এই কার্যের হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের নির্বন্ধাতিশয় ঔৎসুক্য আমি কোনও মতে প্রত্যাখান করিতে সক্ষম হইলাম না। ফলে ১৩০৮ সনের পৌষের ভারতীতে সর্বপ্রথম "ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করি। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া ঢাকার রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সুযোগ্য ইন্‌সপেক্টর খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন এবং বঙ্গের অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক সাহিত্যাচার্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। পরে, ১৩০৯ সনে সুধা পত্রিকায় "ঢাকার প্রাচীন কাহিনী" শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমালোচনা ক্ষেত্রে "সাহিত্য" "ঢাকা গেজেট", 'ইষ্ট", "ঢাকা প্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকায় ঐ সন্দর্ভগুলির সমালোচনা আমার নিকটে নিতান্ত উৎসাহের কারণ হইয়াছিল। ঢাকার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন", "প্রতিভা", "জাহ্নবী", "সুপ্রভাত", "বিশ্ববার্তা" প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। "ঢাকা প্রকাশ", "ঢাকা গেজেট", "শিক্ষা সমাচার" প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে কোনও কোনও প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদকগণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের ফলে সংসারের গুরুভার ভীষণ অশনিপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পতিত হয়। কিয়ৎকাল পরে মাতৃপ্রতিম ধাত্রীমাতার বিয়োগ এবং পরম স্নেহশীল জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পরলোক গমন এই দুইটি বিপৎপাতে আমার হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। এইসময়ে দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া সাহিত্যচর্চায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও আমার সোদর-প্রতিম প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। ইহারা উভয়েই এই বিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সাদর আহ্বান আমি আর উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সুতরাং ১৩১৭ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতেই আমার দশবর্ষ ব্যাপী আরাধনার ফল পুস্তকাকারে একত্র গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট হই। এইসময়ে পূর্ববঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের দৃষ্টান্ত আমার নিকটে তড়িতবৎ কার্যকরী হইয়াছিল। বিবিধ বিপৎপাতের মধ্যেও জরাজীর্ণ দেহ লইয়া খুল্লতাত মহাশয় যেরূপ বিপুল উদ্যোগে তদীয় "বারভূঞা" ও "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণয়ন করিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই যুবকেরও অনুকরণীয়। তিনি সর্বদাই আমাকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। বস্তুত এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে আমি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "তুমি যেরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে উহা সম্পন্ন হইবার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবার প্রত্যাশা করি না, তবে অন্তত উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যাইতে পারিলেও অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিব। ভগবানের কৃপায় এবং তাঁহার

আশীর্বাদে আজ তাঁহার স্নেহ-বারিসিঞ্চিত তরুর প্রথম স্তবকটি যে লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের সর্বপ্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করি।

অন্নের সংস্থান জন্য চিরজীবন দাসত্ব করিয়া ইতিহাসের বন্ধুর পথে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, অবসর মতে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করাও যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিজেকে কতকটা সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি। বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, দেবোপম চরিত্র শ্রীযুক্ত বি, এম, চ্যাটার্জি মহোদয়ের আশ্রয়ে একটি বড় স্টেটের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াও ইতিহাস আলোচনায় অনেকটা অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। বস্তুত এই মহাত্মার অমায়িক ব্যবহার, উৎসাহ, এবং সাহায্যপ্রাপ্তি না ঘটিলে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কখনও সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ। ইহার স্নেহঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমত্যানুসারে আপিল আদালত ও সার্কিট জজগণ কর্তৃক এই জেলার প্রাচীন কীর্তি সমূহ সংগ্রহের চেষ্টা হইলে "East India Affair" নামক গ্রন্থে উক্ত জজদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কতিপয় ইংরেজবন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিম নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর পারস্য ভাষায় "তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নসরৎজঙ্গের মৃত্যুর পরে তদীয় আরজবেগির পুত্র সৈয়দ আবদুল গনি ওরফে হামিদ মীর কর্তৃক ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলিও তাহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে Sir Charles D' Oyles "Antiquities of Dacca" নামে কতিপয় চিত্র সম্বলিত একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার টেইলারের "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" নামক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত উভয় গ্রন্থই এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তদানীন্তন এসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি ক্লে "ঢাকার বিবরণী" প্রকাশ করেন। Hunter's Statistical Account of Bengal গ্রন্থের ৫ম ভলুমে ঢাকা বিভাগের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাঃ ওয়াইজ, মিঃ ব্লকম্যান প্রভৃতি মনস্বীগণও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে অনেক সারগর্ভ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Notes on the Antiquities of Dacca, "Echoes from Old Dacca", Some Reminiscences of Old Dacca, Romance of an Eastern Capital "তারিখ-ই-ঢাকা", Mr. Brenand's Report, Mr. A. C. Sen's Report on the Agricultural Resources of Dacca District, History of the Cotton Manufacture of Dacca District, প্রভৃতি পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়ায় এই জেলার ইতিহাস চর্চার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে।

১২৭৬ সনে পশ্চিমপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় "ঢাকা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৩১৬ সনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় "ঢাকার বিবরণ" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত পাচদোনা নিবাসী স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, মহোদয় কর্তৃক ঢাকার প্রাচীন কাহিনী শীর্ষক কতিপয় সারগর্ভ প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত গ্রন্থকার ও লেখকদিগের নিকটে আমি ঋণপাশে আবদ্ধ আছি। এতদ্ব্যতীত, অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস", শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" এবং "ভাওয়ালের বিবরণী"ও "মসনদ আলি ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্ সুহৃদ্বয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, মহোদয় বিলাতের বোডলিয়ান লাইব্রেরি

হইতে ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস কৃত "ফাতইয়া-ই-ইব্রিইয়া" নামক পারসি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহার অনুবাদকার্য সমাধা করিয়াছেন। উক্ত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি বন্ধুবর আমাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দেওয়ায় সায়েস্তা খাঁ ও মীরজুম্‌লার শাসন সময়ের অনেক অভিনব তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অন্যান্য যে যে গ্রন্থ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যথা স্থানে এই গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশগুপ্ত, আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকের জন্য আলোকচিত্রাদি তুলিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

অপর পরমাত্মীয় শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, এই গ্রন্থের প্রায় আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহার এবম্বিধ সাহায্য না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরও অনেক বিলম্ব ঘটিত।

মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইলে বালিয়াদির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কাজমউদ্দীন সিদ্দিকী চৌধুরি, খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন, সুহৃদয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি. এ. শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে অর্থ সাহায্য না করিলে এই গ্রন্থ লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এই দীন লেখক উপরোক্ত মহাত্মাগণের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিল। কমলা প্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সেন মহাশয় এই গ্রন্থের উৎকর্ষতা সাধন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

এই পুস্তকের জন্য হেরেল্ড পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় ৩ খানা, বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয ৩ খানা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, এম, ও মহাশয় ১ খানা এবং প্রতিভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ. বি. এল মহাশয় ১ খানা ব্লক আমাকে প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. ও. শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরি, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিহর আচার্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পীযূষকিরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এ. শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বর্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ, শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়, শ্রীযুক্ত আবদুল সামাদ, শ্রীযুক্ত আনিছউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সৈয়দ এমদাদ আলী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবরণ সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন সময়ে সুলেখক শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি মহাশয়গণ সাভার ও ভাওয়াল সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, তাহাদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতেও বিস্তর সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি। আসরফপুর তাম্রশাসন সম্বন্ধে আমার সতীর্থ স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম. ও. মহাশয়ের পাঠ অনুসরণ করিয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম. এ. ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম. এ. বি. এল.

প্রভৃতি মহোদয়গণের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে বেলাব লিপি অনুবাদ করিবার সময়ে যথেষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার ন্যায় অকৃতি লেখকের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থমধ্যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। মুদ্রাকর প্রমাদও অনেক রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ মধ্যে অনুগ্রহপূর্বক কেহ কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলিভূক্ত করা হইল। ইতি

জপসা, ছয় হাবেলি
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি
১৩১৯ বঙ্গাব্দ

যতীন্দ্রমোহন রায়

১. সুলতাল সিদ্ধির মঠ রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু List of Ancient Monunents গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।
২. রেনেলের এই নদীকে ছোট ব্রহ্মপুত্র বা "পগুলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন।
৩. Mr. Plaisted শ্রীহট্টস্থ নদনদী সমূহের জরিপ করিবার সময়ে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।
৪. পাথরঘাটার দুইটি মসজিদের বিষয় রেনেল উল্লেখ করিয়াছেন।
৫. সাপুরের প্রাচীন মঠের বিষয় রেনেল উল্লেখ করিয়াছেন।
৬. রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

প্রথম খণ্ড : সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
উপক্রণিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ বর্ত্ম

সপ্তম অধ্যায়

বন

অষ্টম অধ্যায়

পরগনা

নবম অধ্যায়

কৃষি

দশম অধ্যায়

ভেষজ

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

শিল্প

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ শিল্প

চতুর্দশ অধ্যায়

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাণিজ্য

ষোড়শ অধ্যায়

মেলা

সপ্তদশ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিপ্লব

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিবিধ

বিংশ অধ্যায়

জমি ও জমা

একবিংশ অধ্যায়

তীর্থস্থান

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রাচীন কীর্তি

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান, দেবাধিষ্ঠিত স্থান, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক স্থান

পরিশিষ্ট (ক)

প্রশস্তি পরিচয়

পরিশিষ্ট (খ)

পরিশিষ্ট (গ)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

উপক্রণিকা : বঙ্গ-হরিকেল-সমতট

বিষয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৌর্যবংশ

তৃতীয় অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

চতুর্থ অধ্যায়

যশোধর্মন, ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব, শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মা

পঞ্চম অধ্যায়

শূর বংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

খড়্গ রাজগণ

সপ্তম অধ্যায়

পালরাজগণ

অষ্টম অধ্যায়

চন্দ্র রাজগণ

নবম অধ্যায়

বর্ম রাজগণ

দশম অধ্যায়

সেন রাজগণ

একাদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভূস্বামীগণ

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

সীমা :

ঢাকা জেলা বাংলার একটি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম স্থান। এই জেলার উত্তর সীমা ময়মনসিংহ। ব্রহ্মপুত্র, বানার ও বানচেরা, নদ-নদীত্রয় ঢাকা ও ময়মনসিংহের সীমা রক্ষা করিতেছে। জাঙ্গিরপুর গ্রামের উত্তরদিক দিয়ে বানচেরা নদী ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। জাঙ্গিপুর হইতে যমুনানদী তীরবর্তী সুলপোগ্রাম পর্যন্ত এই দুই জেলার মধ্যে কোনও নৈসর্গিক সীমা নাই। পশ্চিম সীমা ফরিদপুর ও পাবনা জেলা। যমুনা নদী দ্বারা এই জেলা পাবনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। দক্ষিণ সীমা পদ্মা ও কীর্তিনাশা। পূর্ব সীমা ত্রিপুরা। মেঘনাদ নদ ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার সীমান্ত স্থান দিয়া প্রবাহিত।

আয়তন :

এই জেলার পরিমাণ ফল ২৭৮২ বর্গমাইল। দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় সমান। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮৪ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে, জাফরগঞ্জ থানার পশ্চিম হইতে রায়পুরা থানার পূর্ব, মেঘনাদ নদ পর্যন্ত, প্রায় ৭৫ মাইল বিস্তৃত। অধিবাসীর সংখ্যা, গত আদমসুমারি মতে প্রায় ৩০ লক্ষ।

অবস্থান :

ঢাকা জেলা উত্তর নিরক্ষ ২৩°-১৪′ ও ২৪°-২০′ কলার মধ্যে এবং পূর্বদ্রাঘিমা ৮৯°-৪৫′ ও ৯০°-৫৯′ কলার মধ্যে অবস্থিত। ঢাকা শহর উত্তর নিরক্ষ ২৩°-৪৩′-২০″ এবং পূর্বদ্রাঘিমা ৯০°-২৬′-১০″ মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান হইতে ৮ মাইল উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ :

ঢাকা জেলা সাধারণত তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ পুনরায় লাক্ষ্যা নদী দ্বারা পশ্চিম এবং পূর্ব এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মেঘনাদ ও লাক্ষ্যা নদ-নদীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ব ঢাকা ; লাক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী স্থান পশ্চিম ঢাকা ; এবং ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী স্থান দক্ষিণ ঢাকা বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক বিবরণ[১] :

পশ্চিমঢাকার অধিকাংশ স্থানই উচ্চ। রক্তিমাভ কঙ্করপরিপূর্ণ মৃত্তিকাই ইহার বিশেষত্ব। ঢাকানগরী হইতে মধুপুর পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ মাইল ও পশ্চিমে চামতারা হইতে পূর্বে নান্দিনা পর্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল প্রশস্ত ভূ-ভাগ পশ্চিম ঢাকার অন্তর্গত। এই ভূভাগের স্থানে স্থানে অসংখ্য গণ্ডশৈলমালা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহাদের উচ্চতা ২০ হইতে ৫০ ফুট পর্যন্ত হইবে। এই বিভাগের পশ্চিম এবং পশ্চিমোত্তর দিকেই এই গণ্ডশৈলসমূহের সংখ্যা ও উচ্চতা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া পরিশেষে নাতিক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণিতে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের

মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণে লৌহের সংমিশ্রণ আছে। পার্বত্য প্রদেশস্থ ভূখণ্ডের ন্যায় এই স্থানের নদীগুলির আয়তনও ক্ষুদ্র।[১] সুতরাং অধিকাংশ ভূমিই অনুর্বর। ফলে এতদঞ্চল গভীর অরণ্যানীসঙ্কুল হইয়া নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর ক্রীড়া-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। পূর্বঢাকার অধিকাংশ স্থানই জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই ভূভাগের উত্তরাংশের, প্রধানত, মেঘনাদ নদের নিকটবর্তী স্থানসমূহের মৃত্তিকা অতিশয় রক্তবর্ণ। পশ্চিমঢাকা হইতে এই স্থানের ভূমি অধিকতর উর্বরা ; সুতরাং অধিকাংশ স্থানেই কৃষিকার্য হইয়া থাকে। দক্ষিণঢাকার স্থান সমূহই এই জেলার মধ্যে উর্বরতম। বর্ষার প্লাবনে পলিমাটি পড়িয়া মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উত্তরভূভাগস্থ পললময় মৃত্তিকাতে বালুকা এবং অভ্রের সংমিশ্রণ জন্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের চরামাটি পদ্মার চরামাটি অপেক্ষা লঘুতর এবং শুষ্ক। বানার ও বংশী নদীর জলে চুন মিশ্রিত আছে ; কিন্তু চুনের অংশ পদ্মার সলিলরাশির মধ্যেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উত্তর ভূভাগের মৃত্তিকায় লৌহের অংশ বেশি। কিন্তু দক্ষিণঢাকার মৃত্তিকার মধ্যে চুনের পরিমাণ অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকায় ব্রহ্মপুত্রের সলিল অপেক্ষা পদ্মার সলিল ঘোলা। দক্ষিণভূভাগস্থ কোন কোন স্থানের মৃত্তিকাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন। এরূপ কৃষ্ণবর্ণ যে, উহা চূর্নীকৃত করিয়া মসীর উপাদান স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে বলিয়া লিখিতে টেইলার সাহেব দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্বে সমুদয় বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। গঙ্গার 'ব-দ্বীপে' অদ্যাপি যে প্রণালিতে চর উদ্ভূত হইতেছে, পূর্বেও সেইপ্রকারেই এই সমুদয় স্থান গঠিত হইয়াছে।[২] ভূমিকম্প নিবন্ধন গাঙ্গেয় 'ব-দ্বীপ' জলগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয় বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন।[৩]

সাধারণ বিভাগ :

ঢাকা জেলাকে সাধারণত প্রধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা : (১) ভাওয়াল ; (২) সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও) ও মহেশ্বরদি ; (৩) বিক্রমপুর ; (৪) বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ ; (৫) পারজোয়ার।

(১) ভাওয়াল—উত্তরসীমা ময়মনসিংহ জেলা (কাওরাইদের নদী) ; পূর্বসীমা লাক্ষ্যা নদী, মহেশ্বরদি ও সোনারগাঁও ; দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী ; পশ্চিমসীমা তুরাগ নদী ও চন্দ্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোনও কোনও স্থান তুরাগ নদীর পশ্চিম ও পূর্ব পারে অবস্থিত ; কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ঐ সকল স্থান চন্দ্রপ্রতাপ ও সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। এই বিভাগের দক্ষিণাংশে ঢাকানগরী সংস্থাপিত।

মৃত্তিকার স্তর ও অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থা দৃষ্টে ভাওয়াল অতিশয় প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ভাওয়ালের গভীর অরণ্যানী মধ্যে অনেক স্থানে প্রাচীন ভগ্নবাটিকা ও দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। ইহাতে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে একসময়ে এই স্থান বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিশোভিত ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের সমসাময়িক কীর্তির নিদর্শনও এখানে বর্তমান আছে। এতৎসম্বন্ধে ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

প্রবাদ আছে, কুরুক্ষেত্র সমরে ভদ্রপাল ও ভবপাল প্রদেশের রাজা, কুরুকুলপতি দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্বক ভীষণ রণরঙ্গে মত্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান ভাওয়ালকেই অনেকে ভদ্রপাল ও ভবপাল রাজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।[৪] রামকমল সেন বিরচিত অভিধানের ভূমিকায় এই স্থানে মহাভারতোক্ত ভগদত্তের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহার মতে "ভগালয়" হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে "ভদ্র" প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

পূর্বে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের (প্রাগ্জ্যোতিষপুর) অন্তর্গত ছিল। মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে, সমুদয় পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমোত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ

পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। যোগিনী-তন্ত্রে, নেপালের কাঞ্চনগিরি, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম, করতোয়া অবধি দিক্করবাসিনী পর্যন্ত; এবং উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্ষু নদী আর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষ্যানদীর সঙ্গম যাবৎ স্থান কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্য উপবীথি, বীথি, উপপীঠ, পীঠ, সিদ্ধ-পীঠ, মহাপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, বিষ্ণুপীঠ ও রুদ্রপীঠ এই নবপীঠ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল।[৫]

খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন পাল-রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। শৈলটি ও দীঘলিরছিট গ্রামে এবং ভাওয়ালের অন্যান্য স্থানে পালরাজগণের শাসনকালের বিক্ষিপ্ত চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। পাল-বংশীয় শিশুপালের রাজবাটির বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশিপূর্ণ পরিখা, তন্মধ্যবর্তী ভগ্ন-ইষ্টকালয়সমূহ এবং পুষ্পবাটিকার শেষ চিহ্ন আজিও অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাড়ি নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহাদের অত্যাচারে ভাওয়াল জনহীন হইয়া পড়ে। মৃগ্‌ণী নাম্নী তাহাদের এক প্রতাপশালিনী সহোদরার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের রাজ্য সম্ভবত কতিপয় গ্রামমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জয়দেবপুরের উত্তরপূর্ব দিকে ইহাদিগের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। লোকে উহা চণ্ডালরাজার বাড়ি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া আমাদিকের বিশ্বাস।[৬] দুর-দুরিয়া গ্রামে সেন-বংশীয় রাজগণের একটি ক্ষুদ্র রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

ভাওয়ালের স্বধর্ম-নিষ্ঠ, স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের জীবিতকালে কাপাসিয়া গ্রামের সন্নিকটবর্তী বড়-চালা নামক স্থানের গভীর অরণ্য মধ্যে সুবৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ইষ্টকাদি স্থানান্তরিত করিবার সময়ে ৪/৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গ ও একখানা প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ঐ ফলকের এক পৃষ্ঠে বাসুদেব মূর্তি; অপর পৃষ্ঠে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্তি খোদিত। মৃজাপুর নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ঐ প্রকার একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে দুইটি যজ্ঞকুণ্ড এবং তন্মধ্যে যজ্ঞীর ভস্মের ন্যায় কতকগুলি ভস্ম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমিত হয় যে ভাওয়াল প্রদেশে অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

পালবংশীয় রাজগণের তিরোধানের পর সুবিখ্যাত গাজিবংশ ভাওয়ালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গাজিবংশীয় রাজন্যগণ লাক্ষ্যানদী তীরবর্তী চৌরাগ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। গাজিদিগের সময়ে ভাওয়ালের রাজস্ব ৪৮৩০০ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। চৌরাগ্রামের চতুর্দিক প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। ইহার অনতিদূরে গাজিদিগের রণতরী রাখিবার "কোষাখালি" নামক খালের চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে মোগলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঢাকা ও তন্নিকটবর্তী কতিপয় স্থান ভাওয়ালের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী গাজিবংশীয়গণের হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়া রাজধানীভুক্ত করা হয়। তৎপর হইতেই বর্তমান ঢাকা নগরীর উত্তর ও পূর্বাংশের কতক স্থান লইয়া শাহাউজিয়াল পরগনার সৃষ্টি হইয়াছে। লোহাইদ, কীর্তনীয়া, পীরজালি ও মির্জাপুর নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহের করকচ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের করকচ উত্তোলন কালে অনেক সময় নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মোগল শাসন সময়ে এতদঞ্চলে লৌহের খনির অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া যায়।[৭] গর্ভনমেন্ট হইতে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা খনন করিলে ভাওয়ালের অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ভাওয়াল, সরকার বাজুহার অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। তৎকালে এই বিভাগের রাজস্ব ছিল ১৯৩৫১৬০ দাম।[৮]

ঈশ্বরপুর, একডালা, কমলাপুর, খিলগ্রাম, কদমা, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, কামারজুরি, কীর্তনীয়া, কুমুন, কেশরিতা, কেওয়া, গাছা, চান্দনা, চৌরা, জয়দেবপুর, টঙ্গী, ছাতিয়াইন, টেপির বাড়ি, টোক, ডেমরা, তেজগাঁও, দুরদুরিয়া, দক্ষিণভাগ, দীঘলির ছিট, দেওরা, ধৌর, নাগরি, পলাসোনা, পীরজালি, পুবাইল, বড়চালা, বক্তারপুর, ব্রাহ্মণগাও, ব্রাহ্মণকীর্তি, বর্মিয়া, বলধা, বাড়িয়া, বিলাসপুর, ভাদুল, মণিপুর, মারতা, মাধবচালা, মালীবাগ, মির্জাপুর, রাজেন্দ্রপুর, রাজাবাড়ি, লতিবপুর, লোহাইদ, শাইটহালিয়া, শৈলাট, শ্রীপুর, সাকোসার, সাতখামার প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মীরপুর, বিরলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রামও নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ইহার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে টঙ্গী নদীর উত্তর, জয়দেবপুরের দক্ষিণ, লাক্ষ্যানদীর পশ্চিম এবং তুরাগনদীর পূর্ব এই চতুঃসীমার মধ্যেই অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস।

(২) সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদি—পশ্চিমসীমা লাক্ষ্যা, বানার ও লাঙ্গলবন্ধের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদ ; পূর্বসীমা ব্রহ্মপুর ও মেঘনাদ ; দক্ষিণসীমা মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী নদীর কিয়দংশ (কলাগাছিয়ার ঠোঠা পর্যন্ত) ; উত্তরসীমা সিংশ্রী নদী, নয়ানবাজার, রামপুরহাট ও বেলাব নামক স্থানের উত্তরস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ। এই বিভাগ; কলাগাছিয়া হইতে দক্ষিণে এগার-সিন্ধু পর্যন্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮ মাইল ; এবং মুড়াপাড়া হইতে বারদির পূর্বস্থ মেঘনাদ পর্যন্ত প্রস্থে প্রায় ১০ মাইল। উত্তর দিকে সা সাহেবের দরগা হইতে আইরল খাঁ নদীর উৎপত্তিস্থল বেলাব নামক স্থানের পূর্বস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল। প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম, স্বাভাবিক পরিখায় পরিবেষ্টিত ও শত্রুমণ্ডলী হইতে সুরক্ষিত। ব্রহ্মপুত্রের এক স্রোত সোনারগাঁও পরগনাকে পূর্ব সোনারগাঁও এবং পশ্চিম সোনারগাঁও এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিমভাগের অধিকাংশ ভূমি রক্তবর্ণ, কঙ্করময় ও উন্নত ; পূর্বাংশের মৃত্তিকা প্রায়শ বালুকাময়। পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগ দিয়া তিনটি নদী প্রবাহিত থাকায় শস্যাদির প্রচুর উপকার সাধন করিতেছে।

"নিষাদ, রাক্ষস, উপবঙ্গ, ধীবর, রিষিক, নীলমুখ, কেরল, ওষ্ঠকর্ণ, কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, কুমার এবং স্বর্ণভূষিত জাতির অধ্যুষিত দেশের মধ্য দিয়া হ্লাদিনী বা ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। স্বর্ণভূষিত জাতি, ঢাকার নিকটবর্তী মোসলমান সময়ের পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর সোনারগাঁ নামক স্থানের সমীপস্থ ব্রহ্মপুত্রের উভয়কুলস্থিত ভূভাগের আদিম অধিবাসী"।[৯] কাহারও কাহারও মতে এই স্বর্ণভূষিত হইতেই সুবর্ণগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

জনশ্রুতি যে, মহারাজ দ্রুহ্যুর অনন্তরবংশ্য মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা সুবর্ণগ্রাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে ইহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত হইত।[১০] সুবর্ণগ্রামে কিরাতব্যবসায়ী আদিম শূদ্রের আজিও অসদ্ভাব ঘটে নাই। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ দ্রুহ্য ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ ত্রিবেগ বা ত্রিবেণি নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপনপূর্বক কিরাতদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুবর্ণবৎ পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব নহে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে মুম্বাই শহরে প্লাটিনাম বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চিন দেশে বালুকা বৃষ্টি এবং ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে হাঙ্গেরিতে রক্তবৃষ্টির বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

যোগিনী তন্ত্রে কামরূপ রাজ্যের যে সীমা নির্দেশিত হইয়াছে তাহাতে অনুমিত হয় যে একসময় এই ভূভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।[১১] যোগিনীতন্ত্রোক্ত সুবর্ণপীঠকে কেহ কেহ সুবর্ণগ্রাম অঞ্চল বলিয়া নির্দেশিত করিয়া থাকেন। সুবর্ণপীঠ হইতে সুবর্ণগ্রাম নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

"মহেশ্বর নামা জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তি প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের ও তদ্‌বহিস্থ অনেক স্থান স্বনামে এক নম্বর ভুক্তে বন্দোবস্ত করেন, তাহাই ধীরে ধীরে মহেশ্বরদি নামে পরিচিত হইয়া

পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উভয়কূলেই এমন কি শহর সোনারগাঁর অনতিদূরেও কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রাম তপ্পে মহেশ্বরদির অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দোবস্ত সময়ে সুবর্ণগ্রামের বহিঃস্থ অনেক অনেক স্থান, সুবিধামতে বন্দোবস্তকারকগণ, একনম্বরভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ এগারসিন্ধুর উত্তরস্থ মেঘনাদের পূর্ববর্তী, লাক্ষ্যার পশ্চিমস্থ মহেশ্বরদি, উত্তরশাহাপুর, কাটারব, গোবিন্দপুর, রায়পুর, কাশীপুর, ভবানীপুর, মহজুমপুর, কামড়াপুর প্রভৃতি পরগনার বহিঃস্থ অংশ বাদে যাহা, তাহাই প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম"[১২] কোনও কোনও লোকের বিশ্বাস যে, মোসলমানদিগের সাময়িক রাজধানী মোগড়াপার ও তৎসন্নিহিত কতটুকু ভূমির নামই সুবর্ণ গ্রাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুবর্ণগ্রাম একটি বিস্তৃত সুবিখ্যাত প্রাচীন ভূখণ্ডের সাধারণ সংজ্ঞা। সোনারগাঁয়ের উত্তর অংশ মহেশ্বরদি নামে পরিচিত। ইহার কিয়দংশ ময়মনসিংহ জেলাতেও আছে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সঙ্গমস্থানে, উত্তরাংশে কোথাও কোথাও অনুচ্চ টিলা দৃষ্ট হয়। বেলাবর সন্নিকটে ২/৩টি লৌহ স্তূপ আছে। প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের পশ্চিম বিভাগ হইতে পূর্ব বিভাগে বসতি ও উন্নতি অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ পশ্চিম ও পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গৌড় ও সুবর্ণ গ্রাম রাজধানীদ্বয়ের অধীনে পৃথকভাবে শাসিত হইত, সেইসময়ে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য লৌহিত্য নদের পূর্বদিকে বঙ্গদেশ এবং সেইবঙ্গে স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত বলিয়া লিখিয়াছেন।[১৩] এজন্য কেহ কেহ বলেন যে স্মার্ত ভট্টাচার্য ব্রহ্মপুত্রের সর্ব পশ্চিমস্থ প্রবাহকেই বঙ্গের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে লৌহিত্যের পূর্বদিক বঙ্গ এবং পশ্চিমস্থ তাবৎ ভূভাগ গৌড় বলিয়া কথিত হইত। সম্ভবত এই সময়েই ব্রহ্মপুত্র ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আইরল বিল মধ্যে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল।

আবার বঙ্গের সীমা শক্তি সঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে নির্দিষ্ট হইয়াছে :

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব সিদ্ধি প্রদর্শকঃ।।"

সুতরাং প্রকৃত বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারেই অবস্থিত ; সেজন্যই এখনও বঙ্গ, বঙ্গজ ও বাঙ্গাল শব্দ পূর্ববঙ্গের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান জলা ও অরণ্যসঙ্কুল ছিল।

ইউংলো কর্তৃক চিনসম্রাট হইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাহার অনুসন্ধানের জন্য মাহুয়ান পশ্চিম মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তিনি সোনা-উরকং (Sona-urh-kong) এবং পান-কো-লো (Pan Ko-lo) রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সোনা উরকং যে সোনারগাঁও এবং পান-কো-লো যে বঙ্গদেশ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে পরশুরাম লৌহিত্য তীর্থের সৃষ্টি করেন। সম্ভবত পরশুরাম প্রথম এই প্রদেশে একটি আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। জনপ্রবাদ, পাণ্ডবগণ মেঘনাদের পূর্বতীরবর্তী প্রদেশ সমূহের অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মেঘনাদের অপর পারে পদার্পণ করিয়াই, অপর ভ্রাতৃগণকে গালি দিতে লাগিলেন ; ভীমের এবম্বিধ স্বভাব বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে যুধিষ্ঠির তাহাকে ডাকিয়া পাঠান, তদবধি মেঘনাদের পূর্বদিকস্থ প্রদেশসমূহ পাণ্ডব-বর্জিত দেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। ফল কথা আর্যগণ এই অঞ্চলে বহুকাল পরে আগমন করিয়াছিলেন।[১৪]

সুবর্ণগ্রামের অনেক স্থানের ভূমি রক্তবর্ণ। প্রবাদ এই যে, দেবাসুরের যুদ্ধকালে শোণিত পাতহেতু মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেবাসুরের যুদ্ধ ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আর্যদিগের সংঘর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বহুকালব্যাপী যুদ্ধের

পরেই যে আর্যগণ এসকল প্রদেশে আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হোয়েন্‌সাং ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি হর্ষবর্ধনকে কাম্বাজ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাবৎ ভূভাগের সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত দেখেন! তাহা হইলে সুবর্ণগ্রাম যে ঐ সময়ে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মালবদেশের অন্তর্গত মন্দসোরনগরের নিকটে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভদ্বয়ে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে লিখিত আছে। মহারাজ যশোধর্ম পূর্বদিকে লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া "গহনতালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা" পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগ উপভোগ করিয়াছিলেন।

খড়্গবংশীয় প্রথম রাজা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ বর্ষে উৎকীর্ণ তাম্র-শাসনদ্বয় রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রথম রাজা। খড়্গোদ্যমের পুত্র জহাখড়্গ ও জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। দেবখড়্গের পুত্রের নাম রাজরাজ। পরমসৌগত পুরদাস কর্তৃক জয়কর্মান্ত বাসক হইতে উক্ত তাম্রশাসনদ্বয় লিখিত হইয়াছে। দেবখড়্গের মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। উদীর্ণখড়্গ নামধেয় রাজবংশীয় জনৈক ব্যক্তির নামও তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসরফপুরের সন্নিহিত "বৌদ্ধমণ্ডপে" তৎকালে আচার্যবন্দ্য সংঘামিত্র নামক জনৈক সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য সময়ে রায়পুরা, ধামগড়, পলাশ প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই তাম্রশাসনোক্ত পলশত, বর্মি, তালপাটক, দত্তকটক প্রভৃতি গ্রাম আধুনিক পলাশ, বর্মিয়া, তালপাড়া এবং দত্তগাও হওয়া অসম্ভব নহে।

এই অঞ্চলে কোনও সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের, পরে বঙ্গেশ্বরের এবং মধ্যে মধ্যে ত্রিপুরাধিপের শাসনাধীন ছিল। যে সময়ে ভাওয়ালে পালবংশীয় নরপতিগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তৎকালে ইহা তাহাদিগের অধীনেই ন্যস্ত ছিল। ভাওয়ালের বিবরণ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে একসময়ে সুবর্ণগ্রাম ভাওয়ালের অধীনেই শাসিত হইত। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে, পুরাকালে বিনুসিংহ নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি স্বীয় ভুজবলে কামরূপ, সৌমার ও পঞ্চগৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। যথা—"একোহি জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গৌড়পঞ্চমান।"

সেনবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থান তাহাদিগের ছত্রাধীন হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেন (প্রথম) একডালার দুর্গ নির্মাণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণ মধ্যে কেহ কেহ একডালাতে বাস করিয়াই এতদঞ্চল শাসন করিতেন। খ্রিষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সুবর্ণগ্রামে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন কোঙরসুন্দর নামক স্থানে তদীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কোঙরসুন্দরেই শেষ হিন্দু রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পর হইতেই সুবর্ণগ্রাম মোসলমান শাসনাধীনে আসে। পাঠান-ভূপতিগণ পূর্ববঙ্গে তাহাদিগের অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য এখানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পাঠান রাজগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদআলি সুবর্ণগ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর ইহা মোগল শাসনাধীন হইয়া পড়ে।

অর্জুনদি, আটপাকিয়া, আঠারদিয়া, আমদিয়া, আড়াইহাজার, আদমপুর, আমিনপুর, ইউসুফগঞ্জ, উত্তর শাহাপুর, উদ্ধবগঞ্জ, উচিতপুর, একদুয়ারিয়া, এগারসিন্ধু, কর্ণঘোপ, কলাগাইছা, কাটারব, কামারগাঁও, কাউয়াদি, কাইকারটেক, কান্দাইল, কাচপুর, কাশীপুর, কুড়িপাড়া, কুলচরিত্র, কেওঢালা, কোঙরসুন্দর, কুসুরা, কৃষ্ণপুরা, খন্দসারদি, খামারদি, খিজিরপুর, গয়েসপুর, গাজারিয়া, গাবতলি, গোবিন্দপুর, গোতাসিয়া, গোয়লদি, চরপাড়া-বাশটেকি, চন্দ্রকীর্তি, চাকদা, চাপাতলি, চারিভালুক, চালাকচর, চাদপুর, চিনিসপুর, চৈতাব,

চৌঘরিয়া, জয়রামপুর, জয়মঙ্গল, জাঙ্গালিয়া জোকারদিয়া, ঝাউগাড়া, টাইটকা, ডাঙ্গা, ডৌকাদি, তোটক, ত্রিবেণি, দত্তপাড়া, দক্ষিণদাওড়া, দামোদরদি, দাবুরপুড়া, দেওয়ানবাগ, দোগাছিয়া ধর্মগঞ্জ, ধানুয়া, ধামগড়, ধুপতারা, নপাড়া, নরসংদি, নবীগঞ্জ, নন্দপুর, নৈলাকোট, পরমেশ্বরদি, পলাশ, পঞ্চমী ঘাট, পাঁচদোনা, পানাম, পারুলিয়, পাঁচগাঁ, পাকরিয়া, পাঁচরুখা, পুটে, বরাব, বন্দর, বাগাদি, ব্রাহ্মনদী, বারপাড়া, বানিয়াদি, বানেশ্বরদি, বালিয়াহানী, বিরামপুর, বেহাকৈর, বেলাব, বৈদ্যেরবাজার, বৈদ্যনাথের মঠখলা, ভাটপাড়া, মদনগঞ্জ, মহজমপুর, মদনপুর, মনোহরদি, মাছিমপুর, মাছিমাবাদ, মাথরা, মাধবপাশা, মাধবদি, মাত্রা, মাইলতা, মূড়াপাড়া, মুন্থলি, মুন্সিরাইল, মৈকুলি, মোগড়াপারা, রায়পুরা, রানীঝি, লক্ষ্মণখোলা, লক্ষ্মীবর্দী, লস্করদি, লাঙ্গলবন্ধ, লাকরশী, লালাটি লাধুরচর, শালখলা, সম্মান্দি, সাতাপাইকা, সাতিরপাড়া, সাতগাঁও, সাগরদি, সাদীপুর, সাপাদি, সাতভাইয়াপাড়া, সিদ্ধেশ্বরী, সুলতানশাহাদি, সৈকাচর, সোল্লাপাড়া, সোনাকান্দা, হবিবপুর, হাইড়া, হামছাদি, হোসানাবাদ প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের মধ্যে অবস্থিত।

(৩) **বিক্রমপুর**—উত্তরে ধলেশ্বরীনদী, পূর্বসীমা মেঘনাদ, পশ্চিমসীমা পদ্মা ও চন্দ্রপ্রতাপের কিয়দংশ এবং আরিয়ল বিলের অপর পারস্থ দোহার, গালিপুর (উহা চন্দ্র প্রতাপ ও বিক্রমপুরের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থান; দক্ষিণসীমা ইদিলপুর। পদ্মানদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ-বিক্রমপুর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুনের গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ঐ সনের ১লা আগস্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, লোনসিংহ, কার্তিকপুর, ফতেজঙ্গপুর, নগর, বিঝারি, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, মুলফৎগঞ্জ, পালং পোড়াগাছা, কুড়াশি, পারগাও প্রভৃতি ৪৫৮ খানা গ্রামসহ দক্ষিণ বিক্রমপুর, বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গ্রামগুলি মুলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্বেই মুলফৎগঞ্জ থানার শাসনসংক্রান্ত কার্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জসহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পদ্মার যে শাখা উত্তর বাহিনী হইয়া বহর, পালিগা, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা আবার উত্তর বিক্রমপুরকে পূর্ব বিক্রমপুর ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বর্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত। খ্রিষ্টিয় নবম শতাব্দী পর্যন্তও এই স্থান সমতট নামে পরিচিত ছিল। মিঃ কানিংহাম হইতে আরম্ভ করিয়া ফার্গুসন, ওয়ার্টার্স প্রভৃতি অনেকেই সমতটের স্থান নির্ণয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; কিন্তু ওয়াটার্সের মতই আমাদিগের নিকটে সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন উহা "ঢাকার দক্ষিণে এবং ফরিদপুর জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত।"

প্রবাদ এই যে, উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য রাজধানী স্থাপনপূর্বক কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি করেন বলিয়া এই স্থান বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রখ্যাতনামা মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে কখনও এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে বঙ্গপরতাল বর্ণনে এক স্থলে লিখিত আছে, "বিক্রম ভূপ বাসত্বাৎ বিক্রমপুর মতো বিদুঃ"। বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থে সেনবংশীয় বিক্রম সেনকেই বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—

"তদ্বংশে বিক্রম সেনো জাতঃ পরম ধার্মিকঃ।
কৃতবান বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।।"

বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ও তন্ত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং বিক্রমসেন যে একটি কাল্পনিক নাম নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিল্লির নিকটবর্তী একটি লৌহস্তম্ভে চন্দ্র নামক একজন নৃপতি বঙ্গদেশসমরে দলবদ্ধ বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত ইনি বিক্রমপুরাধিপ চন্দ্রবেদ হইবেন। পদ্মপুরাণে গঙ্গাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় সুষেন নামক এক রাজার নাম উক্ত হইয়াছে। ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে।

যশোবর্মা মগধ দেশ জয় করিয়া সমুদ্রতীরবর্তী বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে বঙ্গেশ্বর তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির, "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের নয়ভাগের উল্লেখ করিয়া পূর্বদেশে সমতট, এবং অগ্নিকোণে বঙ্গ এবং উপবঙ্গের অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন।

হোয়েন সাং লিখিয়াছেন, "সমতট রাজ্য চক্রাকৃতি, তাহার বেষ্টন তিন সহস্র লি, ইহা সমুদ্রতীরবর্তী। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লি, ভূমি নিম্ন ও উর্বরা। জলবায়ু প্রতিকর, অপর্যাপ্ত শস্য জন্মে। অধিবাসীগণ খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ও কষ্টসহিষ্ণু, রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম উভয়ই প্রচলিত। ত্রিংশৎটি সংঘারামে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজ্যে প্রায় একশত দেবমন্দির আছে। অসংখ্য উলঙ্গ নির্গ্রন্থ বাস করেন। নগরের নিকটে অশোকস্তূপ বর্তমান আছে; পূর্বকালে তথাগত তথায় সপ্তাহকাল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। উহার পার্শ্বে চারিজন বুদ্ধের উপবেশন স্থান দৃষ্ট হয়। স্তূপের নিকটস্থ সংঘারামে হরিৎ প্রস্তর নির্মিত ৮ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্তি দৃষ্ট হয়।" হোয়েনসাং-এর বিবরণ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী, মঠবাড়ি, বেজনীসার, কুমারভোগ, তেলিরবাগ, রায়পুরা, সোনারং; সুবর্ণগ্রামের ধামগড়, বর্মিয়া, পলাশ এবং বাজুর অন্তর্গত বাজাসন, ধুল্লা, নান্নার, দোহার, ফুলবাড়িয়া, দেবতারপটি, যন্ত্রাইল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। হুয়েন সাঙের অব্যবহিত পরে, বৌদ্ধ পর্যটক ইৎচিং সমতটরাজ্যে উপনীত হন। তৎকালে সমতটে "হো-লো-শে-পো-তা" (Ho-lo-she-po-ta) নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইৎচিং কথিত রাজার প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন, হর্ষভট, কেহ বলেন রাজভট, আবার কেহ কেহ উহা হর্ষবর্ধনের নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বলা হইয়াছে। বিশ্বরূপ সেন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগস্থিত পূর্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গল ভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপ্পী গ্রাম ভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপ্পী জঙ্গাল সীমা এই চুতঃসীমাবচ্ছিন্ন পোঞ্জীকাপ্পী গ্রাম মধ্যস্থিত ভূমি দান করিয়াছেন। কেশবসেন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগস্থিত প্রশস্ত লতাটঘড়া ঘাটকে পূর্বে সত্রকাধি গ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবসান্ত ভূঃসীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাহবয়সর গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলিঞ্চিগাতাত্তদ্যমানভূঃ সীমা ইহার মধ্যবর্তী ভূমি তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে চণ্ডভণ্ডদিগকে শাসন করিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছেন। আদিশূর, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে বিক্রমপুরের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্যামলবর্মার তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আধুনিক ইদিলপুরের অন্তর্গত নাগাকুণ্ডা, ধীপুর, লঙ্কাচুয়া, ফুলকণ্ঠি প্রভৃতি গ্রাম তৎকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।

লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্কসুবর্ণ বর্ষের ৭৩৪ শাকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তিনি বঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। মগধের সিংহাসন লইয়া গুপ্ত ও মৌখরি বংশের বিবাদে উভয় বংশ হীনবল হইয়া পড়িলে শূরবংশ বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বজ্রযোগিনীর উত্তর পূর্বকোণে অবস্থিত রঘুরামপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্বক এতদঞ্চল শাসন করিতেন। পালবংশীয়গণ বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তিগুলি এই বিষয়ের জ্বলন্ত নিদর্শন। শত শত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম ও চৈত্য হইতে বৌদ্ধদেবের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী বাণীর প্রতিধ্বনি প্রত্যহ শ্রুত হইত। বর্মবংশীয়-জ্যোতিবর্মা, হরিবর্মা ও শ্যামলবর্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবর্মার ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানা তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্তাপাঠে জানা যায়, হরিবর্মা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

বিক্রমপুরের জোড়াদেউল, রাউৎভোগ, সুয়াসপুর, দেওসার, সোনারং, চূড়াইন, কুমারভোগ, কুমরপুর, বজ্রযোগিণী, বেজিনীসার, তেলিরবাগ প্রভৃতি স্থানে দেউলবাড়ি ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু স্থানীয় কিম্বদন্তী অন্য প্রকার। সেন রাজগণের রাজধানী রামপাল ও তৎসন্নিহিত স্থান খনন করিলে বাংলার ইতিহাসের অনেক লুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

পালবংশীয় পরমসৌগত রাজা নারায়ণপাল তদীয় রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষের ৯ই বৈশাখ একখানা তাম্রশাসন দ্বারা তীরভুক্ত (ত্রিহুত) প্রদেশের অন্তর্গত মকুয়াতি গ্রাম পাশুকাত আচার্যের শিষ্য শিবভট্টারককে প্রদান করেন। নারায়ণপালের মন্ত্রী ভট্টগুরবমিশ্র ইহার শ্লোক রচনা করেন। সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র মদ্যদাস কর্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

অতঃপর সেনবংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরেই ভূমিষ্ঠ হন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল নগরীই সেন-রাজগণের রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণ প্রদত্ত তাম্র-শাসনগুলিতে "বিক্রমপুর" শব্দের পূর্বে গৌরবব্যঞ্জক "শ্রী" এই শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; আরও একটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় যে, সমুদয় তাম্রশাসনগুলিই জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। জয়স্কন্ধাবার রাজধানীকেও বুঝাইতে পারে। যাহারা বলেন, বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা এই যে, বিক্রমপুরে আগমন করিলেই কি সেনরাজগণের তাম্রশাসনাদি প্রদান করিবার কথা মনে পড়িত?

রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক পালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে বঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সুযোগেই বর্মবংশীয়গণ বিক্রমপুরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবভূমি-বার্তায় লিখিত আছে, হরিবর্মা একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্ম কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে ঢাকাই ভারতবর্ষের পূর্বসীমা ছিল এবং ভারতের কোনও স্থানের পরিমাণ বা দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে ঢাকার তুলনাতেই করা হইত। অর্থাৎ ঢাকা তৎকালে ভারতবর্ষীয় ভৌগোলিকদিগের কুমধ্য (O. Meridian) বলিয়া গণ্য ছিল। টলেমি আন্তিবলকে ভারতের পূর্বসীমা বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন।[১৫]

খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রিক্ বণিক আরব্যসমুদ্রবহির্বাণিজ্য-বিবরণ নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ "পেরিপ্লুস অব দি এরিথ্রিয়ানসি" নামে

ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। খ্রিষ্টিয় দ্বি-শতাব্দীতে টলেমি তাঁহার ভূবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত গ্রিক বণিকের বিবরণে ও টলেমির গ্রন্থের কিরাদিয়া নামক প্রদেশের ও গাঙ্গী নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। কিরাদিয়া সম্ভবত কিরাত প্রদেশ ; প্রাচীনকালে সুবর্ণগ্রামের কোনও কোনও স্থান কিরাত প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। পেরিপ্লুস গ্রন্থে লিখিত আছে, "কিরাদিয়া প্রদেশে তেজপত্র উৎপন্ন হয়। উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তথা হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই প্রদেশের সীমান্তভাগে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়। তথায় চিনদেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যায়।" মুন্সিগঞ্জের অনতিদূরে যথায় কার্তিকবারুণীর মেলা বসিয়া থাকে উহাই টলেমির লিখিত "গঙ্গারেজিয়া" বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।[১৬] কিরাদিয়া প্রদেশের সহিত পাশাপাশি ভাবে 'গঙ্গা রেজিয়া'র উল্লেখ থাকায়, এবং চৈনিক বণিকগণের বাণিজ্যব্যপদেশে ঐ মেলায় আগমন করিবার কথা উল্লিখিত হওয়ায়, উক্ত মত আমাদের নিকট সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান সময়েও কার্তিকবারুণীর মেলাতে বিস্তর তেজপত্র বিক্রীত হইয়া থাকে।

খ্রিষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমপুরের হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। মোসলমানগণ কর্তৃক গৌড় রাজ্য বিজিত হইলে সেনরাজগণ বহুকাল পর্যন্ত বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ে আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পরেই হিন্দু স্বাধীনতাসূর্য চিরকালতরে অস্তমিত হইয়া যায়।

পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভে বিক্রমপুরের শাসনকার্য কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাজিগণের নামানুসারেই "কাজিরগাঁও" এবং "কাজি কসবা" গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। পাঠান শাসন সময়েও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাধান্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে এক প্রকার স্বাধীনভাবেই থাকিতেন। উহারা "ভূঞ্যা" নামে পরিচিত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বীরাগ্রগণ্য চাঁদ রায় ও তদীয় সহোদর কেদার রায় মাতৃভূমির উদ্ধার কামনায় যে বীরব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক দিকে নরপিশাচ জল-দস্যু মগ ও পর্তুগিজগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে প্রপীড়িত পূর্ববঙ্গ-বাসিজনগণকে রক্ষা করিবার জন্য বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সফল প্রয়াস, আবার অন্য দিকে মোগলকুলধুরন্ধর আকবরের প্রেরিত রণদুর্মদ মোগল অনিকানির পুনঃ পুনঃ গতিরোধের জন্য রণোদ্যম বাঙালির গৌরবের সন্দেহ নাই। রায়মহাশয়দিগের সময়ে বিক্রমপুরের বিলুপ্ত গৌরবরশ্মি স্তিমিত প্রদীপের শিখার ন্যায় ক্ষণতরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই শ্রীপুর সমৃদ্ধি গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীপুরে একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ছিল। পর্তুগিজগণও জলযুদ্ধে বিধ্বস্ত রণতরীসমূহের সংস্কারসাধন এখানেই সম্পন্ন করিতেন। শ্রীপুরের কর্মকারগণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকরণেও সিদ্ধহস্ত ছিল। কেদারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মোগলের বিজয়বৈজয়ন্তী বিক্রমপুরের উড্ডীন হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বিক্রমপুর সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। রাজস্ব ধার্য ছিল ৩৩৩৫০ ৫২ দামে। কতকগুলি মহলের সমষ্টিতে বিক্রমপুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

আইড়ল, আউটশাহী, আটপাড়া, আবদুল্লাপুরা, আমুদপুর, ইছাপুরা, কনকসার, কমলাঘাট, কউরহাট, কলমা, কাজিরগাঁও, কাটিয়াপাড়া, কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া, কান্দনীসার, কামারখাড়া, কুচিয়ামোড়া, কুর্মিরা, কুমারভোগ, কুকুটিয়া, কুমরপুর, কেওর, কেওটখালি, কৈচাল, কোলা, কোরহাটি, খিলপাড়া, খিদিরপাড়, গাউপাড়া, গাউদিয়া, গুনগাও, ঘাসিরপুকুরপাড়, চন্দনভোগ, চাচুরতলা, চারিআনি, চিত্রকোট, চুড়াইন, চৌদ্দহাজারী, জৈনসার, জোয়াররাজাদিয়া, টঙ্গীবাড়ি, তরতিয়া, তালতলা, তারপাশা, তাজপুর, তেলিরবাগ, তেয়টিয়া, দিঘলি, দ্বিপাড়া, দেভোগ,

দেউলভোগ, দোগাছি, ধরণ্ডি, ধলছত্র, ধাইদা, ধনকুনিয়া, ধীপুর, নয়না, নশঙ্কর, নাগরভোগ, নেত্রাবতী, নোয়াদ্দা, পশ্চিমপাড়া, পয়সাগাও, পঞ্চসার, পাঐলদিয়া, পাইকপাড়া, পাঁচগাও, পুসাইল, পুরাপাড়া, ফেগুনাসার, ফুরসাইল, বহর, বজ্রযোগিনী, বটেশ্বর, বলাসিয়া, বয়রাগাদি, বারৈখালি, বাঘিয়া, বাসিরা, বাহেরক, বাসাইল, বালিগাঁও, বানরী, বাইনখাড়া, ব্রাহ্মগাঁও, বিদগাঁও, বেতকা, বেজগাঁও, বেলতলি, ভরাকর, ভবানীপুর, ভাটপাড়া, ভাগ্যকূল, মধ্যপাড়া, মালখানগর, মাইজগাঁও, মাইজপাড়া, মাকোহাটি, মালপদিয়া, মালদা, মুলচর, মেদেনিমণ্ডলং, যশোলং, রঘুরামপুর, রস্যুনিয়া, রাজখাড়া, রাউৎভোগ, রামপাল, রোষদি, লস্করপুর, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, শ্রীধরখোলা, শেখরনগর, শিমুলিয়া, শ্যামসিদ্ধি, ষোলঘর, সানিহাটি, সাতগাঁও, সাওগাও, সিংটিয়া, সিলিমপুর, সিয়ালদি, সুবচনী, শোহাগদল, সোনারং, হলদিয়া, হাসাইল, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রাম উত্তরবিক্রমপুরের মধ্যে অবস্থিত।

(৪) **বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ ও সেলিম-প্রতাপ**—এই বিভাগের উত্তরসীমা ময়মনসিংহ জেলা ; দক্ষিণসীমা পদ্মা ; পশ্চিমসীমা যবুনা ও পূর্বসীমা তুরাগ, ভাওয়াল ও বিক্রমপুরের কিয়দংশ। ধলেশ্বরীনদী এই বিভাগের দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের যে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা সংস্থাপিত হইলে, উহা ফরিদপুরের সামিল ছিল এবং তৎকালে মাদারিপুরের কতক অংশ ও আটিয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আটিয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্তিত হয়।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক গাজিবংশীয় চাঁদগাজির নামানুসারে চাঁদপ্রতাপ পরগনার নামকরণ হয়। চাঁদগাজির ভ্রাতা সেলিমের নামানুসারে সেলিমপ্রতাপ পরগনা এবং সুলতানের নামানুসারে সুলতানপ্রতাপ এবং কাশিমগাজি হইতে কাশিমপুর পরগনার নামকরণ হয় বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এই সমুদয় পরগনা সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে ; এবং এই পরগনাগুলির কর একত্র ধার্য হওয়াতে অনুমিত হয় যে উহা একই ভূম্যধিকারীর অধীন ছিল, পরে তিন ভ্রাতার নামানুসারে তিনটি বিভিন্ন পরগনার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজস্ব ধার্য ছিল ৪৬২৫৪৭৫ দাম। বিলাসব্যসনানুরক্ত গাজিবংশীয়গণের অধঃপতন সংসাধিত হইলে চাঁদগাজির সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার বংশধরগণ উহাদের জমিদারি হস্তগত করিয়া পরগনার জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[১৭] বালিয়াদির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ হজরৎ সা কুতুবুদ্দিন সিদ্দিকি দিল্লির বাদশাহের নিকট হইতে পরগনা তালিপাবাদ, আমিনাবাদ ও চন্দ্রপ্রতাপ জায়গির স্বরূপ লাভ করেন।

বৃহৎসংহিতাতে লিখিত আছে, মৈত্র দৈবত নক্ষত্রে কেতু দ্বারা আধুনিক বা স্পৃষ্ট হইলে, পুণ্ড্রপতির এবং শ্রবণা কেতুদ্বারা ঐরূপ হইলে বঙ্গাধিপতির অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে জানা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গরাজ্য একটি গণনীয় রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৌরাণীক যুগে আধুনিক বঙ্গদেশ অঙ্গ, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, উপবঙ্গ, ভার্গব, অন্তগিরি, বহির্গিরি, তঙ্গন, বরেন্দ্র, রাঢ়, সূক্ষ্ম, প্রসুহ্ম, ভল্লুক, প্রবিজয়, কৌশিকী কচ্ছ, ব্রহ্মোত্তর, কর্বট, উদয়গিরি, ভদ্র, গৌড়ক, জোতিষ, কান্তার, প্রভৃতি বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালে বঙ্গ বলিতে আধুনিক ঢাকা জেলাই বুঝাইত।

কোন্ সময়ে বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইয়া পড়ে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার জলস্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইত। তৎকালে উচ্চ আঁল বাঁধিয়া অধিবাসীগণ জলপ্লাবন হইতে স্বীয় বাসস্থান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত ; তজ্জন্য বঙ্গ আঁল্ হইতেই বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালা নাম যে মোসলমান আগমনের

পূর্বেই উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ; কারণ রাজেন্দ্রচালের তিরু-মলয়ের শিলালিপিতে বঙ্গাল শব্দটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ কনিষ্কের সময়ে এতদঞ্চলে মহাযান মত প্রচলিত হয়। কনিষ্কের পুত্র হুবিষ্কের সময়ে বঙ্গদেশ তদীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর মিহিরকুল বঙ্গদেশ জয় করেন। আদিত্যসেনের সময়ে বঙ্গদেশ মগধসাম্রাজ্যভুক্ত হয় ; যবদ্বীপবাসীগণ ও তিব্বতীয়গণ সময়ে সময়ে এতদঞ্চল আক্রমণ করিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজগণ এতদঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পালরাজগণের অধীনস্থ সামন্তরাজগণ ভৌমিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহাদিগের অধিকৃত স্থান ভূম বলিয়া কথিত হইত। পাল রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গে 'বারভূঞা' নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হন। রাজেন্দ্রচোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও বিক্রমপুরাধিপ হরিবর্মাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

হরিশ্চন্দ্রমহিষী কর্ণাবতী ও ফুলেশ্বরীর নামানুসারেই কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া নামক স্থানদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছে। উদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। হরিশচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ধর্মের জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকেও বলি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বীয় রাজ্যের মধ্যে তিনি ৫০টি জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণেও সর্বসাধারণের নিকটে "সাড়ে বার গণ্ডা" বলিয়া পরিচিত। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদরা রাজেশ্বরীর গর্ভসম্ভূত দামোদর মাতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি এতদঞ্চলে দামুরাজা বলিয়া পরিচিত। রাজা দামোদর হইতে একাদশ অধস্তন রাজা শিবচন্দ্র নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে এই রাজবংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলে, উহারা সর্বেশ্বরনগরী পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন।

ছাইলা কাসমা নামক স্থানে লম্বা প্রাচীবাকার উচ্চমঞ্চে চাঁদমারি অর্থাৎ সৈনাদিগের তীরচালনা দ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার স্থান ছিল। "চাইরাচৌমাথা" ও "মোরিখোলা" নামক স্থানে পালরাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুইটি বাজার ছিল। চারিটি বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমস্থলে বাজার অবস্থিত ছিল বলিয়া উহা "চাইরাচৌমাথা বাজার নামে অভিহিত হইত। কর্ণপাড়ায় একটি মাটির উচ্চমঞ্চ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মঞ্চের তলস্থ ভূমির পরিমাণ প্রায় একবিঘা হইবে। উহার ভিত্তিও অর্ধদিঘাপরিমিতস্থানব্যাপী। সাভারে হরিশচন্দ্র এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে মাধবপুরে যশোপাল রাজত্ব করেন। গান্ধারপুরে রাবণরাজার বাড়ির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইনি রাজাহরিশচন্দ্রের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সর্বেশ্বরনগরের (সাভার) পূর্বাংশে বলিমেহার নামক স্থানে হরিশচন্দ্রের পরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কর্ণপাড়া, কুমরাইল, রাজাসন, ফুলবাড়িয়া, রাজাঘাট, কোঠবাড়ি, সেনাপাড়া প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয় নৃপতিগণের কীর্তিকলাপের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যশোপাল কর্তৃক ধামরাই-এর মাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা যশোমাধব নামে সুপরিচিত। সুয়াপুর গ্রামের পূর্বে, নান্নার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন নামক মৌজায় কৈকুড়িবিলের তীরে বহুকালের পতিত "ভিটা" ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বাজাসন বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে কোনপ্রকার বৌদ্ধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ এই যে "শক্তি সম্প্রদায়ী সুয়াপুর গ্রামবাসী জনগণের পূজিত পুষ্পাঞ্জলি জবা

প্রভৃতি পুষ্প জলে ভাসিতে দেখিয়া বাজাসনবাসী লোকদিগের উক্ত পুষ্পদ্বারা দেবার্চন করিতে ইচ্ছা হয়। উহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ছিল। এই ঘটনার পরে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শাক্ত গুরুর শিষ্য হয়। নান্নারগ্রামে অদ্যাপি এক চণ্ডাল বাড়িতে বনদুর্গার নিকট বন্যবরাহ বলি প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের অনেকানেক স্থানেই বনদুর্গার নিকটে বরাহবলির প্রথা প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পালবংশীয় নরপতিগণের অধঃপতনের পর এতদঞ্চল গাজিবংশীয়গণের হস্তগত হয়। মোসলমান শাসন সময়ের প্রারম্ভে এবং গাজিবংশীয়গণের প্রাধান্য লাভের পূর্বে কাজিদিগের হস্তেই বিচারভার ন্যস্ত ছিল। কাজিগণ সভার গ্রামে বাস করিতেন। কাজিগণের নামানুসারেই "কাজির গঙ্গা" নদীর নামকরণ হইয়াছে।

আগলা, আমতা, আটিগ্রাম, ইলিচপুর, উথুলি, উলাইল, কর্ণপাড়া, কলতা, কলাকোপা, কাঞ্চনপুর, কালিয়াকৈর, কাশমপুর, কালিকাপুর, কিরঞ্জি, কুমরগঞ্জ, কুশুড়া, কুমরাইল, কুশুকহাটী, কৈলাল, কোঠবাড়ি, খলসি, গড়পাড়া, গালা গালিমপুর, গোবিন্দপুর, চান্দহর, চোরাইল, চৌহাট, ছনকা, জয়মণ্ডপ, জয়পুরা, জয়কৃষ্ণপুর, জাগির, জাফরগঞ্জ, ঝাউকান্দা, ঝিটকা, তরা তুইতাল, তেঁতুলঝোড়া, তেওতা, দত্তগ্রাম, দাসরা, দাউদপুর, দেবতারপটি, দোহার, ধানকোড়া, ধামরাই, ধুল্লা, নবগ্রাম, নয়াবাড়ি, নটাখোলা, নবাবগঞ্জ, নারিশা, নালি, নান্নার, পারাগাঁও, পৈলী, ফিরিঙ্গিপাড়া, ফুলবাড়িয়া, বরাদিয়া, বর্ধনপাড়া, বানিয়াজুরি, বালিশুর, বালিয়াটি, বায়রা, বান্দুরা, বুতুনি, বেতুলিয়া, মত্ত, মহাদেবপুর, মামুদপুর, মাধবপুর, মাহিন্নারি, মাণিকগঞ্জ, মাণিকনগর, মাসাইল, মিতরী, মুকসুদপুর, মৈনট, যন্ত্রাইল, যাদবপুর, রঘুনাথপুর, রাইপাড়া, রাজাসন, রাজারামপুর, রাজখারা, রূপসা, রোয়াইল, লক্ষ্মীকোল, লেছরাগঞ্জ, শিকারিপাড়া, শিবালয়, সাটঘর, সরুপাই, সাতুরিয়া, সাভার, সানপুকুর, সিঙ্গৈর, সিয়ালোআর্চা, সুয়াপুর, সুঙ্গর, সুরগঞ্জ, সেনাপাড়া, সোল্লা, হরিশকুল, হাটিপাড়া, হোসনাবাদ প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৫) **পারজোয়ার**—এই স্থানটি দ্বীপাকার ; উত্তর ও পূর্বসীমা বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ধলেশ্বরী। "জোয়ার" শব্দের অর্থ "অঞ্চল" এবং "পার" অর্থ "তট" ; এজন্য ধলেশ্বরী (ইছামতী) ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী এই দ্বীপাকার ভূখণ্ডের নাম "পারজোয়ার" হইয়াছে। পূর্বে ইহা সমতটের অন্তর্গত ছিল। পারজোয়ারের মৃত্তিকাতে বালুকার অংশই অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানের পুষ্করিণী খনন করিলে তাহা শীঘ্রই ভরাট হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পারজোয়ার স্থানটি ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার চর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্বরা। পারজোয়ার স্থানটিকে ঢাকা শহরের দ্বারদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আটি, আলিতা, আড়াকুলা আইন্তা, কলাতিয়া, কলসতা, কেরানিগঞ্জ, কোণ্ডা, খাগাইল, জিঞ্জিরা, ঠাকুরপুর, তেঘরিয়া, দৌলেশ্বর, ধীৎপুর, ধুলপুর, নয়ামাটি, নরণ্ডি, নদিয়াপাড়া, নাজিরপুর, নোয়াদ্দা, পশ্চিমদী, পটকাঝোড়, পাইনা, পানগ্রাম, পারাগাঁও, পাচলী, পুর্বদি, বরিশুল, বনগ্রাম, বাছণ্ডী, বাঘৈর, বাসতা, ব্রহ্মণকীর্তা, বেঞ্চারা, বেলনাট, বোয়াইল, মদনমোহনপুর, মালঞ্চ, মান্দাইল, মীরেরবাগ, রোহিতপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, শ্রীধরপুর, শিয়ালি, শুভড্যা, শাক্তা প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

---

১. Vide Clay's Report, Taylor's Topography of Dacca and Mr. A. C. Sen's Report.

২. See Lyall's Principles of Geology Vol. I.

৩. ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।

স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা। ব্রহ্মখণ্ড—১২/৩

৪. যোগিনীতন্ত্র একাদশ পটল ১৬—১৮ শ্লোক।

৫. যোগিনীতন্ত্র একাদশ পটল ২৫ শ্লোক।
সৌমারপীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও সুবর্ণপীঠ এই চারিভাগে কামরূপ রাজ্য বিভক্ত বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

৬. বৌদ্ধধর্মের অবসানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজাকে ঘৃণার চক্ষে চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা অসম্ভব নহে। রাজবাড়িতে প্রাপ্ত একখণ্ড প্রস্তরলিপি লণ্ডনের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এতৎসম্বন্ধে আমরা ২য় খণ্ডে আলোচনা করিব।

৭. See Gladwin's Translation of Ayni Akbari.

৮. ৪০ দামে এক টাকা।

৯. ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫১ অধ্যায়।
See Asiatic Researches Vol. VIII. Page 331 & 332.

১০. "তপ্তং কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি।..."
ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ভারতের পূর্বদিক কিরাত-ভূমি বলিয়া লিখিত আছে।

১১. "উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে!
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব স্যাং গিরিকন্যাকে।।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি!
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ।।" যোগিনী তন্ত্র

১২. সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

১৩. "লৌহিত্যাৎ পূর্বতঃ বঙ্গঃ। বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ।"

১৪. যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব বনবাস কালে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন। পঞ্চমীঘাটে তাঁহারা যথায় স্নান ও তর্পণাদি করিয়াছিলেন, আজিও যাত্রীগণ আগমনপূর্বক তত্তৎ স্থান দর্শন ও তথায় স্নান তর্পণাদি করিযা থাকে। লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটও পবিত্র তীর্থস্থান। ফলতঃ পঞ্চপাণ্ডবের সহিত যে পঞ্চমীঘাটের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

১৫. "It is the Dhakka or old Ganges river, and seems to have been the limits of India, and the point from which measurements, and distances relating to countries in India were frequently made". Mc. Crindles translation of Ptolemy

১৬. Vide History of the Cotton manufacture of Dacca District.

১৭. "বারভূঞা"—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উষ্ণোৎস ও নদনদী
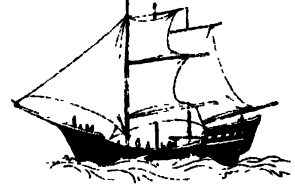
(ক) উষ্ণোৎস :
মধুপুরের রক্তবর্ণ কঙ্কর পরিপূর্ণ মৃত্তিকাতে, ঢাকা নগরীর উত্তরে মির্জাপুর গ্রামে এবং বর্মী ও পলাশের সন্নিকটে উষ্ণোৎস পরিলক্ষিত হয়।

(খ) নদনদী :
ঢাকা জেলা নদীমাতৃক স্থান ; বহুসংখ্যক নদনদী এই জেলার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদনদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ, পদ্মা, কীর্তিনাশা, যবুনা, ধলেশ্বরী, ইছামতী, লাক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা ও বানার প্রধান। বংশী, তুরাগ, বালু, সিংসহ, এলামজানী, আলম, ভিরুজখা, রামকৃষ্ণদি, ইলিসামারী, তুলসীখালি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী। এতদ্ব্যতীত সালদহ, লবণদহ ও গোয়ালিয়ার প্রভৃতি পার্বত্যনদী মধুপুরজঙ্গলস্থিত কঠিন মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সাধারণত যবুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও মেঘনাদ এই কয়টি প্রধান নদনদী হইতেই অন্যান্য সমুদয় স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত চারিটি নদীর সহিত অপরাপর পয়োপ্রণালিগুলির সম্বন্ধ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(ক) **এলামজানী** (ধলেশ্বরীর উর্ধ্বতন নূতন প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—

১) আলম নদী চৌহাট ঝিলে পতিত হইয়াছে।

২) যবুনা (ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ও পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—ধলেশ্বরী হইতে—

৩) গাজিখালি নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। ২) সুঙ্গার নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। ৩) বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

৪) বয়রাগাদি নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(ক) তালতলা খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।

৫) সিঙ্গড়া নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

৬) মীরকাদিমের খাল সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

(খ) **ধলেশ্বরী** (উর্ধ্বতন প্রাচীনপ্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—

(১) ঘিয়র খাল ইছামতীতে পড়িয়াছে। (২) তরানদী কালীগঙ্গাতে পড়িয়াছে। (৩) ইছামতী নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(ক) মহাদেবপুরের খাল কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। (খ) তুলসীখালি ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। (গ) গোয়ালখালি ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। (ঘ) কুচিয়ামোড়া খাল ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। (ঙ) শ্রীনগরের খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।

২) **ব্রহ্মপুত্র** (প্রাচীন ও পূর্বদিকস্থ প্রবাহিত) হইতে উৎপন্ন

১) বংশীনদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। (বংশীনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) তুরাগনদী বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে (তুরাগ হইতে উৎপন্ন)

(ক) টঙ্গীনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে। (টঙ্গীনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) বালুনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে। (বালুনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) দোলাইখাল বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে।

২) বানার (এই নদীর নিম্নপ্রবাহ লাক্ষ্যা নামে পরিচিত) নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। (৩) আরালিয়া খাল লাক্ষ্যায় পড়িয়াছে। (৪) কাইঠাদি নদী ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। (৫) আড়িয়লখাঁ বা পাহাড়ি নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে।

(৩) **পদ্মানদী** হইতে উৎপন্ন

(১) মৈনটখাল ইছামতীতে পড়িয়াছে। (২) ইলিসামারী ইছামতীতে পড়িয়াছে। (৩) তরতিয়া খাল ইছামতীতে পড়িয়াছে। (৪) বহরের খাল ইছামতীতে পড়িয়াছে। (৫) কীর্তিনাশা পদ্মায় পড়িয়াছে।

(৪) **মেঘনাদ** হইতে উৎপন্ন

(১) সেরাজাবাদের নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে। (২) কাচিকাটা কীর্তিনাশায় পড়িয়াছে। মেঘনাদ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালি বহির্গত হইয়াছে ; উহাদের নির্দিষ্ট কোনও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(৫) **মধুরপুরজঙ্গল** হইতে উৎপন্ন—

(১) সালদহ তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে। (২) লবণদহ তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে।

(৩) গোয়ালিয়ার খাল তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র :

"১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে Lieutenant Henry Strachy এবং ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে Mr. Jodince মহাত্মাদ্বয় তিব্বতদেশীয় "যার কিউসাংপো"-কে ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এই যার কিউসাংপো হিমালয়ের পূর্বোত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া বঙ্কিমভাবে গতি পরিবর্তন করিয়া মিসমি জাতীর বাস পর্বতের মধ্য দিয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। তদনন্তর, ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়া সদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি প্রভৃতি আসামস্থ অনেক স্থান অতিক্রম করিয়া রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া টোকচাঁদপুরের নিকট ঢাকা জেলার উত্তরসীমায় পড়িয়াছে ; এবং তথা হইতে পূর্বাভিমুখে চারিমাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছে, এবং রায়পুরা থানার পূর্বদিকে আসিয়া মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। টোকচাঁদপুর হইতে মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থান প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্বদিকস্থ যে প্রবাহ ঢাকা জেলাস্থ টোক নামক স্থান স্পর্শ করিয়া ভৈরববাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, উহা এই জেলাকে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা হইতে পৃথক করিয়াছে। কৈঠাদি হাটের নিকট হইতে ইহার এক শাখা দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত হইয়া ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলাব নামক স্থানের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে পুনরায় প্রধান প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের একস্রোত মঠখোলা নামক স্থানে বানারের সহিত মিলিত হইয়া একডালার নিম্নে শীতললক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। অপর একস্রোত দক্ষিণমুখে সরল গতিতে সুবর্ণগ্রামের

অন্তর্গত নরসিংদি, পাচদোনা, মাধবদি, মনোহরদি, বালিয়াপাড়া, মহজুমপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, কাইকারটেক হইয়া সোনারগাঁও পরগনার দক্ষিণে শীতললক্ষ্যার শেষ সীমায় মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, এই স্রোত ও মেঘনাদ পুরাকালে একস্রোতই ছিল।

বেলাব হইতে এক শাখা আড়িয়লখাঁ নামে প্রবাহিত হইয়া নরসিংহদীর সন্নিকটে মেঘনাদে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে এই আড়িয়লখাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়া হাড়িধোয়া নামে এক ক্ষুদ্র শাখা নাগরদি গুপ্তপাড়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এক স্রোত সোনারগাঁ পরগনাকে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন-খাত :

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র টোকচাঁদপুরের পূর্বদিকে আসিয়া সোনারগাঁও—মহেশ্বরদি পরগনার মধ্য দিয়া ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া শহর সোনারগাঁয়ের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার সন্নিকটে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদে পতিত হইত। এই নদী এখন মরা নদী বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারই তীরে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট অবস্থিত।

লৌহিত্য :

রামায়ণে ব্রহ্মপুত্রের নাম পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মহাভারতে এই নদীর নাম লৌহিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র নামই দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বিশ্বামিত্রবংশীয়গণের দশবিধ শাখার এক শাখার নামানুসারে ইহার নাম "লৌহিত্য" হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে "লোহিত্যাৎ সরসোজাতো লৌহিত্যাখ্যস্ততোহভবৎ"। পরশুরাম নাকি পার্বত্য পথ দিয়া ইহাকে ভারতে অবতারিতা করেন। বৌদ্ধদিগের মতে মঞ্জু ঘোষ ব্রহ্মপুত্রকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে "কৈলাস শৈলের দক্ষিণ পূর্বদিকে পিশঙ্গ নামক সুবৃহৎ পর্বতের পার্শ্বদেশে "লোহিত" নামে এক হেমশৃঙ্গশৈল অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশস্থ লোহিত নামক সরোবর হইতে পূণ্যতোয়া "লৌহিত্য নদ" প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।"।

কূর্মপুরাণে লিখিত আছে, পুণ্ড্ররাজ্যের অধিবাসীগণ লৌহিণীর জলপান করিয়া থাকে ; কূর্মপুরাণের 'লোহিণী' লৌহিত্যেরই নামান্তর মাত্র বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

Ptolemy বলেন যে গঙ্গার পূর্বতন শাখার নাম ছিল 'আন্তিবল' বা 'আহ্লাদন'! হ্লাদিণী বা হ্রদন শব্দ নদার্থক। বিলফোর্ড বলেন (Asiatic Researches vol XIV P. 444) ব্রহ্মপুত্রের এক নাম হ্রদন (Hradana) ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত হ্লাদিণী নদীকেই সম্ভবত তিনি Hradana বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকিবেন। মৎস্যপুরাণে ৫১ অধ্যায়ে হ্রদিনীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা এই নদীকে Blue river বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক Da Barros ব্রহ্মপুত্রের নাম দিয়াছেন Caor নদী।

লৌহিত্য সাগর :

অনেকানেক লেখকই লৌহিত্য সাগরের অবস্থান-সম্বন্ধে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে "মহাবল পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য কিয়দ্দুর পরে হেমশৃঙ্গ গিরি ভেদ করিয়া, কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া এই নদকে প্রবাহিত করিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন লোহিত। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত বলিয়া

উহার আর একটি নাম লৌহিত্য। ব্রহ্মপুত্র নদ, জলরাশি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠ প্লাবিত ও সর্বতীর্থ গোপন করিয়া দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চালিয়াছে"।

মহাপ্রস্থান কালে অর্জুন উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সাগরে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উদয়াচলের প্রান্তসীমা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরবর্তী ভূভাগ এই লৌহিত্য সাগর গর্ভে বিলীন ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, বর্তমান ময়মনসিংহ জেলাসহ বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই লৌহিত্য সাগরের কুক্ষিগত ছিল।

মেঘনাদ :

মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পূর্বোত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই মেঘনাদ নামে পরিচিত। মেঘনাদ অতঃপর ঢাকা জেলার পূর্বসীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। এই নদী দ্বারা ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদের প্রবাহ ঢাকা জেলার দক্ষিণপূর্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত মেঘনাদ প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ। সাধারণতঃ কন্দর্পপুরের মোহানাই পূর্বে পদ্মা ও মেঘনাদের সম্মিলন স্থান ছিল।

গাড়ো, কাছাড় এবং শ্রীহট্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পার্বত্য স্রোতস্বতীর সম্মিলনেই মেঘনাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহজেলাস্থিত নিম্নভূমি ও ঝিলসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে মেঘনাদের উপরিভাগের উচ্চতার পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র। এজন্যই মেঘনাদের ন্যায় এরূপ সুবিশাল নদের প্রবাহ অতি মন্থর ; এবং প্রবাহও একটি মাত্র খাতমধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহুসংখ্যক শাখানদী ও নালার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের সংমিশ্রণহেতু এই নদীর জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং অপেয়। কিন্তু এজন্যই মেঘনাদে মৎস্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনও স্রোতস্বতীতেই মৎস্যের এরূপ প্রাচুর্য দৃষ্ট হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মেঘনাদকে Cosmin বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] মেগাস্থিনিস এই নদীর নাম দিয়াছেন "মেগোন"[২]!

পদ্মা :

পদ্মানদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে আসিয়া ঢাকাজেলার পশ্চিম সীমায় যবুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। মুগিডাঙ্গার নিকট "ভেলবারিয়া" ফ্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট যবুনার সহিত ইহার সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই সংযোগ সাধারণত "বাইশকোদালিয়ার মোহানা" নামে পরিচিত। বর্ষার সময় উহার জলস্রোত এরূপ প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে যে অতি বেগগামী আসাম স্টিমার পর্যন্ত উহা ভেদ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের এক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ বৎসর ৬ খানা ফ্লাটসহ স্টিমার পদ্মা-যবুনা-সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায় কতকদিন পর্যন্ত গোয়ালন্দে লঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কর্নেল গেস্টন কর্তৃক পরিমাপে তৎসময়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্মকালেও ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

যবুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জেলার পূর্বদক্ষিণকোণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মা, মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।

পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ :

পূর্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়লখাঁ নামে পরিচিত।

পদ্মার গতি পরিবর্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোন স্টিমার সপ্তাহকাল পূর্বে যে স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তৎপরবর্তী সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে যে স্থান ক্ষীণতোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে, পরিলক্ষিত হয়।

এই নদী কোনও সময়ে মধুমতী ও হরিণাঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য একটি প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদিয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে। নৌকাযোগে পূর্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশসমূহেও যাতায়াত করিতে পারা যাইত এবং স্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিল না। এখন মধুমতী ও হরিণাঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্যে অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাইতে হয়।

পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবীভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড ৩১ অধ্যায়ে পদ্মা-গঙ্গা-সঙ্গম তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন সময়ে পদ্মানদী কাহালগায়ের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, এবং অমৃতির নিকট উহা পুনরায় পৃথক হইয়া পড়ে। কৌশিকী নদীর জলস্রোত প্রবলবেগে আসিয়া গঙ্গার প্রবাহকে পদ্মার সলিলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করায় ক্রমে পদ্মা প্রবল হইয়া উঠে। ফলে উহার উপরদিকস্থ প্রবাহটির বিলোপ সাধন হয়।[৩]

আইন ই আকবরি এবং ডি বেরোসের মানচিত্রে পদ্মাকে বড় নদী বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

কীর্তিনাশা :

পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার নাম কীর্তিনাশা. প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহাই কীর্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেনেল ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মানদী বিক্রমপুরের বহু পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন "কীর্তিনাশা" বা "নয়াভাঙ্গনী" নামে কোনও নদীর অস্তিত্ব ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালি মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্নমাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া, মুলফৎগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামসমূহ কালীগঙ্গার তটে বিদ্যমান ছিল। পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্তিনাশা নদীর উৎপত্তি হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনী নদী উদ্ভুত হইয়া ইদিলপুরের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া পদ্মা ও মেঘনাদ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র মেঘানাদের সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না, এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপই কীর্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গনী নদীর উদ্ভব।

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মানচিত্রে কীর্তিনাশার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে "কাথারিয়া" বা "কীর্তিনাশা" নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চাঁদ ও কেদার রায়ের এবং নওপাড়ার চৌধুরিদিগের কীর্তি ধ্বংস করায় উহার নাম কীর্তিনাশা হইয়াছে। এই নদীর দ্বারা বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ধলেশ্বরী :

ধলেশ্বরী যবুনার একটি শাখানদী। বর্তমান সময়ে এই নদী যবুনার শাখানদী বলিয়া পরিচিত হইলেও যবুনা হইতে এই নদী অনেক প্রাচীন। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট যবুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রথমত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়, তৎপর কিয়দ্দুর পর্যন্ত পূর্ববাহিনী হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে গমন করিয়াছে, এবং পুনরায় দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত আগমন করিয়া ক্রমে সাভার পর্যন্ত পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। সাভার হইতে ফুলবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থান হইতে ক্রমে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদির নিকট দিয়া গমন করিয়া পাইনার দক্ষিণে সিংদহ নামক ইহার একটি শাখা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমদি, সরাইল, কোণ্ডা প্রভৃতি স্থান দিয়া কতকদূর পর্যন্ত পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভুইরার সন্নিহিত স্থান হইতে নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জ বন্দরদ্বয়ের দক্ষিণে লাক্ষ্যানদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব দিকে মেঘনাদ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। লাক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনাদ এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল অত্যন্ত ভয়ানক। এই স্থানকে "কলাগাছিয়া" বলে। মুন্সিগঞ্জ, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবিবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুরশাইল, বযরাগাদি প্রভৃতি গ্রাম ইহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

যবুনার উৎপত্তির পূর্বে ধলেশ্বরী, করতোয়া ও আত্রেয়ী এই নদীত্রয়ের সম্মিলিত প্রবাহ চূরাসাগরের সহিত মিলিত ছিল। যবুনার উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরী নদীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে যবুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে যবুনার একটি শাখা নদী রূপে পরিণত করিয়া ফেলে। আলমনদি খুলিয়া যাওয়ায় পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরী নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

কালীগঙ্গা :

পারাগায়ের সন্নিকটে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া চারিগাঁয়ের নদীতে পড়িয়াছে। পারাগাঁও, মাতাবপুর, কোণ্ডা, মুষ্টিগ্রাম, ফতেপুর, কুমিল্লি প্রভৃতি গ্রাম ইহার তীরে অবস্থিত।

বিক্রমপুরে কালীগঙ্গা নামে একটি স্রোতস্বতীর ক্ষীণ রেখা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্বে এই উভয় নদী একই নদী বলিয়া পরিচিত ছিল। পরে, পদ্মার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে মুলফৎগঞ্জ ও কোঁয়রপুরের সন্নিকটে শেষোক্ত কালীগঙ্গা নদীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

কালীগঙ্গা নদীতে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বানার ও লাক্ষ্যা বা শীতললক্ষ্যা :

এই নদীর উত্তরাংশ বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা এগারসিন্ধু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে টোকের নিকট বানার নাম ধারণ করিয়া গমন করিয়া লাখপুরের নিকটে লাক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। এই লাক্ষ্যা নদী পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা নদী ছিল। কিন্তু আরালিয়া হইতে লাখপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, একমাত্র

বানারের প্রবাহই এই নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে বানারের সম্প্রসারণ মাত্র করিয়া ফেলিয়াছে। লাখপুর হইতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে ৫ মাইল পর্যন্ত আসিয়া একুটার সন্নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। এই স্থান হইতে লাক্ষ্যানদী পলাশ, মুড়াপাড়া, হাজিগঞ্জ, নদীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান দিয়া ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্বদিকস্থ প্রবাহ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে; কেবলমাত্র বর্ষাকালেই নৌবাহনযোগ্য থাকে। সুতরাং এক্ষণে বানার ও লাক্ষ্যানদীই ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকস্থ পয়ঃপ্রণালির প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

লাক্ষ্যা নদীর তীরভূমি অতি উচ্চ ও বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। ইহার জল অতি নির্মল ও সুস্বাদু; এজন্য এই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী শীতললক্ষ্যা নামে অভিহিত।

বর্মি, কাপাসিয়া, লাখপুর, কালীগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুড়াপাড়া, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ প্রভৃতি বন্দর লাক্ষ্যাতীরে অবস্থিত।

যোগিনীতন্ত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যে সীমা নির্দেশিত হইয়াছে তাহাতে লাক্ষ্যানদীর উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুড়িগঙ্গা :

বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা নদী। সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ফুলবাড়িয়ার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। প্রথমত এই নদী কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৎপর উত্তর-পূর্ববাহিনী হইয়া কেরানিগঞ্জের নিকট হইতে শামপুর, মীরেরবাগ দিয়া ফতুল্লা পর্যন্ত পূর্বদিকে গমন করিয়াছে। ফতুল্লার নিকট হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভবানীগঞ্জ দিয়া ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বুড়িগঙ্গা প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। এই নদী ২৬ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬ মাইল প্রস্থ ভূখণ্ডকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বীপাকার ভূভাগই পারজোয়ার নামে অভিহিত। বুড়িগঙ্গা ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড়া পড়িয়া যাইতেছে।

কালিকাপুরাণে এই নদীর নাম উক্ত হইয়াছে। লিখিত আছে, নাটকশৈলে একটি সরোবর আছে, উহার মধ্যদেশ হইতে শঙ্কর কর্তৃক অবতারিতা, গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী বৃদ্ধগঙ্গানদী উদ্ভূত হইয়াছে।

"অস্তি নাটক শৈলে তু সরো মানস সন্নিভম্।
যত্র সার্দ্ধৎ শৈল পুত্র্যা জল ক্রীড়াং সদা হরঃ॥
মধ্যভাগাৎ সৃতা যাতু শঙ্করেণাবতারিতা।
বৃদ্ধ গঙ্গাহ্বয়া সাতু গঙ্গৈব ফল দায়িণী"॥

কালিকাপুরাণ অশীতিতম অধ্যায় দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক।

ঐ পুরাণেই লিখিত আছে, বৃদ্ধ গঙ্গার জলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত। পূর্বকালে জগৎপতি মহাদেব, তথায় হয় গ্রীবকে বধ করেন।

"বৃদ্ধ গঙ্গা জলস্যান্ত স্তীরে ব্রহ্মসুতস্য বৈ।
বিশ্ব নাথোহরয়ো দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ॥

বিশ্বদেবী মহাদেবী যোনি মণ্ডল রূপিণী।
হয় গ্রীবেন যুযুধে তত্র দেবো জগৎপতিঃ॥
হয় গ্রীবং যত্র হত্বা মণিকুটং পুরা গতম্"।

কালিকাপুরাণ, অশীতিতম অধ্যায় ২৩—২৫ শ্লোক।

যবুনা (যমুনা বা যিনাই) :

যবুনা ব্রহ্মপুত্রের নতুন প্রবাহ। এই প্রবাহ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কালীগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বর্গিগত হইয়া যিনাই বা যবুনা নাম ধারণ করিয়া ঢাকা জেলার পশ্চিমসীমায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যবুনার সঙ্গমস্থানের নাম বাইশকোদালিয়ার মোহানা। বর্ষার সময়ে এই মোহানা অতি ভীষণাকার ধারণ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবুনার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু কালিকাপুরাণে এই নদীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তৎকালে ইহা দিব্যযমুনা নামে পরিচিত ছিল।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"প্রাগেব দিব্য যমুনাং সত্যক্ত্। ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশ যোজনম্"।

কালিকাপুরাণ, ৮৩ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

কোনও সময়ে অতিবর্ষানিবন্ধন মাঠে জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে জনৈক কৃষক পরিবারের দ্বাবিংশতটি লোক প্রত্যেকে এক এক খানা কোদালিসহ কৃষিক্ষেত্রে উপনীত হয়, এবং বপনকার্য অচিরে সম্পন্ন করিবার জন্য পদ্মা-যবুনাভিমুখস্থ ভূখণ্ড খননপূর্বক ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমনের পথ করিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যবুনার প্রবাহ ব্রহ্মপুত্রের দিকে মন্থর গতিতে চলিয়া এই পয়ঃপ্রণালির শাহায্যে দ্রুতবেগে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে; এবং ২/৩ বৎসর মধ্যে এইরূপে পদ্মা-যবুনার সংযোগে বহুগ্রাম ও প্রান্তর স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া অত্যন্ত প্রশস্ততা লাভ করে। বাইশকোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহা "বাইশকোদালিয়া" নামে পরিচিত হইয়া ওঠে।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরিবর্তন হইলে তিস্তা নদী গঙ্গা হইতে বিছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। এই প্রবাহ যবুনার মধ্য দিয়া নতুন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ইহাই ব্রহ্মপুত্র অথবা যবুনার প্রধান প্রবাহ।

তুরাগ :

এই নদী ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া দরিয়াপুরের নিকটে ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিয়া রাজাবাড়ি, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া পূর্ববাহিনী হইয়াছে। শেনাতুল্লার সন্নিকটে মোড় ঘুড়িয়া প্রায় সরলভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং মৃজাপুর, কাশিমপুর, ধীতপুর, বিরলিয়া, উয়ালিয়া, বনগাঁও প্রভৃতি স্থান তীরে রাখিয়া মীরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

টঙ্গী নদী তুরাগের শাখা।

শালদহ, লবণদহ, গোয়ালিয়ার নদী মধুপুরের জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তুরাগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বংশী :

ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী; ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া সাভারের সন্নিকটে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

বালু :

লাক্ষ্যার উপনদী; রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে ডেমরার নিকটে লাক্ষ্যাতে পতিত হইয়াছে।

ইছামতী :

সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণঢাকাস্থ নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরা সাগরের বিপরীত দিকে নাথপুরের ফ্যাক্টরির নিকট হইতে

উৎপন্ন হইয়া মুন্সিগঞ্জের নিকটে যোগিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণের ফলে এই নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ধলেশ্বরী নদী ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইলে সিঙ্গের ও সাভারের মধ্যবর্তী গাজিখালিনদী, বংশীনদীর কতকাংশ, পাথরঘাটা ও রামকৃষ্ণদির মধ্যস্থিত ইছামতী ও বয়রাগাদি ও মুন্সিগঞ্জের মধ্যবর্তী ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর সামিল হইয়া পড়ে।

বর্তমান সময়ে এই প্রাচীন নদীটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যস্থান আছে। ইহার উভয় তীরবর্তী প্রদেশসমূহ শস্য সম্পদে ঢাকা জেলায় শীর্ষস্থানীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতিশয় রমণীয়।

পুরাণাদিতে এই নদী ইক্ষুনদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মিত বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছিল ইক্ষুনদী[৪]। মেগাস্থিনিস ইহাকে অক্সিমাতিস (Oxymatis) এবং তিসিয়াস (Ctesias), হাইপোবারাস (Hypobarus) বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

এলামজানি :

যবুনার পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহটি এলামজানি নামে সুপরিচিত। এই নদী তাসরির নীল কুঠির পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধ্য দিয়া তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মীরপুরের নদীতে :

স্থানে স্থানে ঝিনুক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত ঝিনুকের অধিকাংশের মধ্যেই মুক্তার সূক্ষ্ম দানা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় উৎকৃষ্ট মুক্তাও মীরপুরের নদীর ঝিনুকে পাওয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে মীরপুরের নদীর এই এক চমৎকার বিশেষত্ব রহিয়াছে।

আলম নদী :

এলামজানি হইতে উৎপন্ন হইয়া চৌহাট ঝিলে পড়িয়াছে। এই নদী প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুঙ্গার, সিংড়া, তড়া, কাইঠাদির নদী, সেরাজাবাদের নদী, কাচিকাটা, গাজিখালি, রামগঙ্গা, কালীগঙ্গা, নারায়ণীগঙ্গা, খোদাদাদপুরের নদী, চিলাই, ,চারিগাঁনদী প্রভৃতি আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ঢাকা জেলার বক্ষদেশে উপবীতবৎ শোভা পাইতেছে। ঢাকা জেলার নদীসমূহ হইতে প্রায় ১৫০০০০ টাকা জলকর আদায় হইতে পারে বলিয়া হান্টার সাহেব অনুমান করেন।

১. See Malte Brun's Geography vol III, Page 122.

২. Asiatic Researches vol. XIV.

৩. পুরাকালে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথীর সলিলরাশি ভেদ করিয়াই চলিয়াছিল। কিংবদন্তি আছে, কোন দৈত্য গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া লইয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় রূপকচ্ছলে পলিমাটিকেই দৈত্য বলিয়া এখানে কল্পনা করা হইয়াছে।

৪. "ইক্ষু লোহিত ইত্যেতা হিমবৎ পাদ নিঃসৃতাঃ" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

তৃতীয় অধ্যায়

নদ নদীর গতি পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়[১] ও তাহার কারণ নির্দেশ এবং ব-দ্বীপের উৎপত্তি
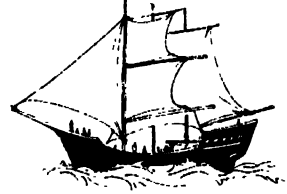
নদী প্রবাহের নিত্য পরিবর্তন ঢাকা জেলার বিশেষত্ব। শত বৎসরের মধ্যে এতদঞ্চলে নদী কর্তৃক এমন পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে, জলভাগ স্থলে এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটি প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে।

ফাগুর্সন সাহেব বলেন, "ব-দ্বীপস্থ নদীসমূহ বক্রভাবে বিকম্পিত হয়। প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ অনুসারে এই বিকম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলে, নদীর এক পাড় উচ্চ ও সোজাসুজিভাবে খাড়া হইয়া পড়ে এবং অপরপাড়ে ভাঙ্গনীর পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া সমতলভূমিতে পরিণত হয়। নদীপ্রবাহ ভাঙ্গনীপাড়ের তটভূমি ভেদ করিয়া অভিনব পথে বহির্গত হইবার জন্য সতত যত্নবান হয়। তীরভূমি নদীগর্ভ হইতে নিম্ন হইলে তথায় নূতন নদীর উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী"।[২]

ইছামতী নদী[৩] :

পশ্চিম ঢাকার নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্বপেক্ষা প্রাচীন। মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরাসাগরের মোহনার বিপরীত দিকে নাথপুরের ফ্যাক্টরির নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সিগঞ্জের সন্নিকটবর্তী যোগিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদীর উৎপত্তি ও খাত আলোচনায় মেজর রেনেল, ডাক্তার টেইলার, কাপ্তান সেরউইল এবং হান্টার প্রভৃতি মনীষীবর্গ মধ্যে অনেকেই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রের সহিত এই নদীর সঙ্গম স্থলের অনতিদূরেই যে রামপাল নগরী অবস্থিত তদ্বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। ১৭৮০ খ্রিঃ অঃ হইতে ১৮৪০ খ্রিঃ অঃ মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ধলেশ্বরী নদী দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উহার স্রোতোবেগ এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, কতিপয় বৎসর পর্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ফলে, পশ্চিম ঢাকার স্থানসমূহের বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পাথরঘাটা হইতে রামকৃষ্ণদি এবং বয়রাগাদি হইতে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত ইছামতীর নিম্নপ্রবাহ ধলেশ্বরী নদীর সামিল হইয়া পড়ে ; কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার হইতে মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীর বর্তমান সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নদীর অংশটি কতিপয় বৎসর পূর্বেও ইছামতী নামেই পরিচিত ছিল।

হান্টারসাহেব ফিরিঙ্গিবাজার ও ইদ্রাকপুর নামক স্থানদ্বয় ইছামতীর শাখানদীতীরে অবস্থিত বলিয়াই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ স্থানদ্বয় শাখানদীতীরে নহে ; ইছামতীর প্রধান প্রবাহের তীরেই অবস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণে এই স্থানে নদীর প্রসারতা বৃদ্ধি পাইলেও ইছামতী নামটির বিলোপ সাধন হয় নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার ও বয়রাগাদির মধ্যস্থিত নদী নামটি আর ইছামতী রহিল না।

ইছামতী অতি প্রাচীন নদী। এক সময়ে ইহা পশ্চিম ঢাকার একটি প্রধানতম নদী বলিয়া পরিচিত ছিল ; একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই নদীতীরে তীর্থঘাট, আগলা, সোলপুর,

বারুণীঘাট এবং যোগিনীঘাট এই পঞ্চতীর্থ ঘাট বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগিনীঘাট, ব্রহ্মপুত্র ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

জাফরগঞ্জের উত্তরে ইছামতীর প্রবাহ নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। প্রাচীন ম্যাপের সহিত বর্তমান সময়ের ম্যাপ তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, জাফরগঞ্জের নিকটে নদীপ্রবাহের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইয়াছে।[৪] মেজর রেনেলের জরিপ সময়ে গঙ্গানদী জাফরগঞ্জের নিকট দিয়াই প্রবাহিত হইত। ধলেশ্বরী তৎকালে গঙ্গার শাখানদী বলিয়াই পরিচিত ছিল। উহার প্রাচীন নাম ছিল গজঘাটা। এই প্রবাহ এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই নদীর উত্তরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী করতোয়া হইতে বহির্গত হইয়া দিনাজপুরের মধ্য দিয়া আসিয়া ঢাকার ইছামতী নদী যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দিনাজপুরের ইছামতী নদীর বিষয় বুকানন হ্যামিল্টন উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদীটি ক্রমে শুষ্ক হইয়া ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িলেও ইহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। মেজর রেনেল তদীয় মানচিত্রে যেরূপভাবে উহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকার ইছামতী ও দিনাজপুরের ইছামতী অভিন্ন; করতোয়ার একটি শাখানদীই দিনাজপুরের মধ্য দিয়া জাফরগঞ্জ হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ধলেশ্বরীনদী পরে উদ্ভূত হইয়া ইছামতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উৎপত্তিস্থল হইতে উহাকে বিছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে হিন্দুগণ করতোয়া নদীতে তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। ঠিক ঐ দিনই পূর্ববঙ্গের হিন্দু নরনারী ইছামতীর পঞ্চতীর্থ ঘাটে স্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। ইহা হইতেও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঢাকার ইছামতী নদী পুণ্যতোয়া করতোয়ারই একটি শাখানদী মাত্র।

অপর একটি ইছামতী নদী পাবনার সন্নিকটে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া জাফরগঞ্জের বিপরীত দিকে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে বলিয়া মেজর রেনেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইছামতী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা গঙ্গা ও যমুনার শাখানদী। এই নদীর স্রোত কখনও গঙ্গা হইতে যমুনার দিকে আবার কখনও বা যমুনা হইতে গঙ্গাভিমুখে প্রবাহিত হয়।

আর একটি ইছামতী নদী নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্য দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। মিঃ এ. সি. সেন বলেন "ঢাকা জেলার ইছামতী নদীতীরস্থ ধীবরগণ মধ্যে বংশপরম্পরাগত প্রবাদ এই যে, উক্ত তিনটি ইছামতী পূর্বে একই নদী ছিল।" এই প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার পরিত্যক্ত খাত দিয়াই ইছামতী ও কুশীনদী প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গার প্রবাহ পূর্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় নবগঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। এইসময়েই যশোহরের ইছামতী নদী প্রথমত পাবনা জেলাস্থিত উহার উত্তরদিকস্থ প্রবাহ হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে গঙ্গার প্রবাহ পুনরায় পরিবর্তিত হইয়া পদ্মার উৎপত্তি হইয়াছে।

ধলেশ্বরী ও আলমনদী :

ধলেশ্বরীর ঊর্ধ্বতন প্রবাহের প্রাধান্য অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর এই অংশ দিয়া শীতকালে নৌকা চলাচল করিতে পারে না। প্রবাহ ক্রমে উত্তর দিকে সরিয়া পড়িতেছে। প্রথমত গজঘাটার খাল দিয়া, পরে সিলিমাবাদের খাল দিয়া এবং অধুনা পোড়াবাড়ির খাল দিয়া ইহা প্রবাহিত হইতেছে। আলমনদী খুলিয়া যাওয়ায়, পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরীনদী শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই আলমনদী প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হইয়া কানাইনদীর পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন প্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে চৌহাট ঝিলটিই মাত্র কানাইনদীর চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আলমনদী ক্রমশ প্রবলাকার ধারণ করিলে সাভারের নিকটস্থ ধলেশ্বরীর প্রবাহ আরও

পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে বুড়িগঙ্গা নদীটির অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

ধামরাইয়ের নিকটে আলমনদীর সহিত বংশীনদীর সম্মিলন ঘটিবার কিছু বিলম্ব থাকিলেও উহাই যে একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তদন্যথায়, হীরানদীর প্রাচীন খাতটি খুলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

বানার :

বানার ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকস্থ প্রবাহের একটি শাখানদী মাত্র; উহাই লাক্ষ্যানদীর ঊর্ধ্বতম প্রবাহ। কিন্তু পূর্বে তাহা ছিল না। বহুকাল পূর্বে ইহা একটি স্বতন্ত্র নদী ছিল। তৎকালে উহার উৎপত্তি স্থান ছিল মধুপুর জঙ্গলের মধ্যবর্তী গুপ্তবৃন্দাবনের সন্নিকটে। লাখপুরের নিকটে এই নদীর সহিত লাক্ষ্যানদীর সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহ শুষ্ক হইয়া গেলে এই নদী তদীয় জলস্রোতের একাংশ ভৈরববাজার অভিমুখে প্রেরণ করে এবং অপরাংশ রক্তবর্ণ মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া নূতন প্রবাহপথ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত বানারনদীর সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। এই পয়ঃপ্রণালির স্রোতোবেগ প্রবল থাকায় বানারনদীর ঊর্ধ্বতম প্রবাহ ইহার অংশীভূত হইয়া পড়ে। ফলে, এগার সিন্ধু হইতে লাখপুর পর্যন্ত সমুদয় নদীটিই বানার নাম ধারণ করে। লাক্ষ্যানদীও কিয়ৎকাল পর্যন্ত বানার নামেই অভিহিত হইত; কিন্তু নাওন্দসাগরের উত্তর দিকস্থ প্রকৃত বানারনদীর নামটি বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। সম্ভবত এই নতুন বানারনদীর সহায়তায় লাক্ষ্যানদী প্রবল হইয়া পড়ায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহটি কলাগাছিয়ার নিকটে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্র :

ব্রহ্মপুত্রের বর্তমান পূর্বদিকস্থ প্রবাহ ভৈরববাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। একমাত্র বুকানন হ্যামিল্টন ব্যতীত সমুদয় পূর্ববর্তী লেখকগণই ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকস্থ প্রবাহ নির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। বুকানন হ্যামিল্টন বলেন, "এগার সিন্ধু অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকস্থ যে পয়ঃপ্রণালি প্রবাহিত হইতেছে, উহা প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল না।" পাচদোনা হইতে ধলেশ্বরী নদীর কলাগাছিয়া মোহানা পর্যন্ত একটি নদীর প্রাচীন খাত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই তীরে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট অবস্থিত। এই নদীটি এখন পর্যন্তও ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচত। এখানেই অসংখ্য হিন্দু নরনারী অশোকাষ্টমীতে তীর্থস্থান করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রাচীন প্রবাহটিই যে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের একাংশমাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্মার্তভট্টাচার্যও এই পয়ঃপ্রণালিটিকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাক, এই প্রবাহটির সহিত এগার সিন্ধুর উত্তর দিকস্থ প্রবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে কিনা। রেভিনিউ ম্যাপে আরালিয়া গ্রাম হইতে এগার সিন্ধুর এক মাইল দক্ষিণস্থ লাখপুর গ্রাম পর্যন্ত নদীর একটি প্রাচীন খাত অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং লাখপুর হইতে উক্ত প্রবাহটি দক্ষিণপূর্ববাহিনী হইয়া পূর্বোল্লিখিত লাঙ্গলবন্ধের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খাতটিই যে ব্রহ্মপুত্রের সর্বপ্রাচীন প্রবাহ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রেভিনিউ ম্যাপে আরালিয়া হইতে লাখপুর পর্যন্ত প্রসারিত খাতটিকে ভ্রমবশত লাক্ষ্যানদীর প্রাচীন খাত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। লাখপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে একটি শাখা লাক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সম্ভবত লাখপুর গ্রামের নামের সহিত লাক্ষ্যা নদীর সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে।

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার মোহানা পর্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত হয় নাই। উহা রামপালের পার্শ্বভেদ করিয়া রাজবাড়ির দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। জপসানিবাসী সাধক কবি লালারামগতি সেন সার্ধশত বৎসর পূর্বে তদীয় "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর"॥

অশোকাষ্টমীতে অদ্যাপি প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক নরনারী কমলাপুর নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রমপুরের পূর্বদিকে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহা পূর্বে ব্রহ্মপুত্রেরই প্রবাহ ছিল।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার পূর্বদিকস্থ ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালিটি এবং তন্নিকটবর্তী নদীর কতকাংশ যাহা সেরাজাবাদের নদী বলিয়া এক্ষণে পরিচিত, উহাই ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহাংশের শেষ চিহ্নমাত্র। এই অনুমানের সপক্ষে যে কয়েকটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১ম। রেভিনিউসার্ভেম্যাপে সেরাজাবাদের নদীকেই ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২য়। এই নদী তীরে একটি তীর্থঘাট আছে, এবং লাঙ্গলবন্ধও পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে তীর্থস্নানের প্রথা প্রবর্তিত আছে, এখানেও অদ্যাপি লোকে ঠিক সেই তারিখেই তীর্থস্নান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের এই দক্ষিণদিকস্থ প্রবাহ কোন্ সময়ে কলাগাছিয়ার উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্ববাহিনী হইয়া আইরল খাঁ নদীর মধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমত নরসিংদির নিকটে, পরে ভৈরব বাজারের নিম্নে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পর্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ থাকায়, উহার প্রাচীন শুষ্ক খাত কর্তনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর[৫] :

স্থানীয় কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে ভুবনেশ্বর নামে একটি নদী জাফরগঞ্জের কিঞ্চিৎ-উত্তর দিক হইতে আসিয়া তেওতা গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইত। ফরিদপুর জেলার ভুবনেশ্বর নদীটি এই নদীরই নিম্নাংশ হওয়া অসম্ভব নহে। টেইলার সাহেবের টপোগ্রাফি গ্রন্থ পাঠেও ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। মেজর রেনেল সাহেবের জরিপ সময়েও এই নদীর অনেক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। পদ্মানদী ফরিদপুরের পশ্চিমদিকস্থ খাতটি পরিত্যাগ করিয়া জাফরগঞ্জ পর্যন্ত প্রবাহিত হইত এবং এখান হইতেই ধলেশ্বরী নদীর উদ্ভব হয়। রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে "মরা পদ্মা" বলিয়া ফরিদপুরের পশ্চিমাংশস্থিত পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পদ্মানদীর এইরূপে উত্তরবাহিনী হইবার প্রয়াস পাওয়ার সময়ে ব্রহ্মপুত্রনদের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকার ভয়ানক পরিবর্তন ঘটে। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবাহিত পলিমাটি দ্বারা দেওয়ানগঞ্জ ও ভৈরববাজার এতদুভয় স্থানের মধ্যবর্তী ভূমি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ক্রমশ সরিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ পরিবর্তনের ফলেই যমুনার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমত ব্রহ্মপুত্র হইতে জামালপুরের নিকটে দুইটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উদ্ভব হয়। এই দুইটি প্রবাহ জামালপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত হইয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ ৫০ মাইল অতিক্রম করিয়া পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। উহার পূর্বদিকের নদীই উল্লিখিত ভুবনেশ্বরের উর্ধ্বাংশ এবং পশ্চিমদিকস্থ নদীটি এলামজানি নামে সুপরিচিত।

এলামজানি নদী :

এলামজানি নদী তাসরির নীল কুঠির পার্শ্বদেশ দিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধ্য দিয়া তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যমুনা ও ভুবনেশ্বরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মাকে দক্ষিণ দিকে তাড়িত করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে যমুনা ও ভুবনেশ্বরের প্রসারতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নাটোরের নদীগুলি জাফরগঞ্জের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হওয়ায় ইহার বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যমুনা এই নদী-সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক আটিয়ার নিকটে মোড় ঘুরিয়া এলামজানি নদীতে পতিত হইয়া ধলেশ্বরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সময়েই ধলেশ্বরীনদী ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হইয়া উঠিল। প্রায় এই সময়েই সিঙ্গৈব ও সাভারের মধ্যবর্তী গাজিখালিনদী, বংশীনদীর কিয়দংশ, পাথরঘাটা ও রামকৃষ্ণদির মধ্যস্থিত ইছামতী এবং বয়রাগাদি ও মুন্সিগঞ্জের মধ্যবর্তী ইছামতীনদী ধলেশ্বরীর সামিল হইয়া পড়ে।

গাজিখালি :

পূর্বে পশ্চিম ঢাকার গাজিখালি নদী একটি প্রধান নদী বলিয়া পরিগণিত ছিল। কানাই নদী আটিয়ার উত্তরদিক হইতে আসিয়া সাভারের নিকটে বংশীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল ; এই কানাইনদীর সহিত বংশীনদীর একটি প্রবাহের সম্মিলনের ফলেই গাজিখালি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হীরানদী :

হীরানদী পূর্বে ধামরাই-এর উত্তরদিক দিয়া আসিয়া সিঙ্গৈরের নিকটে গাজিখালি নদীর সহিত বংশীনদীর সংযোগ সাধন করিয়াছিল। এই নদীর নিম্নাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা রঘুনাথপুরের ঝিল মধ্যে ইহার সামান্য একটু চিহ্নমাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা :

ধলেশ্বরীনদী পূর্বে সাভারের ৮ মাইল দূরবর্তী সিঙ্গৈর নামক স্থান হইতে চান্দর পর্যন্ত প্রায় সোজাসুজি ভাবেই প্রবাহিত হইত। পরে উহার প্রবাহ কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া সিঙ্গৈরের নিম্নস্থ গাজিখালিনদীর সমুদয় অংশ আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এবং সাভার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে।

সম্প্রতি ধলেশ্বরী প্রবলাকার ধারণ করিয়া মীরগঞ্জের প্রায় অর্ধেক স্থান স্বীয় কুক্ষিগত করিয়াছে।

বুড়িগঙ্গানদী পূর্বে বংশীনদীরই সম্প্রসারণ মাত্র ছিল, কিন্তু পরে ধলেশ্বরীর শাখা নদী রূপে পরিণত হইয়া ইহার বল বৃদ্ধি হয় এবং তুরাগনদীর নিম্নপ্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মেজর রেনেল ঢাকার উত্তরাংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সম্মিলন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উহাই ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোত ছিল। রেনেলের জরিপের প্রায় অর্ধশতাব্দী কালমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া এবং প্রাচীন জিনাই (যবুনা) নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ রেনেলের উল্লেখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাচ্চরের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজাবাড়ির মাঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। রেনেলের জরিপ সময়ে এই সম্মিলন স্থান পদ্মা-মেঘনাদের সম্মিলন স্থান হইতে সোজাসুজি উত্তরে অবস্থিত ছিল। পূর্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ নামক স্থান পর্যন্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২০ মাইল দৈর্ঘ্য হইবে। উহা দক্ষিণ-পূর্বদিক হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে

পরিবর্তিত হইয়া দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত চণ্ডীপুরের দিকে গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল). রেনেলের ম্যাপের (২৩° নিরক্ষ) শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনী নামে একটি নতুন নদীর উদ্ভব হইয়া মেঘনাদকে পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ[৬] :

একাধিক গ্রন্থকারগণ স্বীকার করিয়াছেন যে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যাই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ। তিস্তানদী গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রবাহ জিনাই (যবুনা) নদীর মধ্যদিয়া নতুন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ইহাই ব্রহ্মপুত্র অথবা যবুনার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবল বন্যা পদ্মা ও মেঘনাদের দক্ষিণেও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রাচীন কাগজপত্রাদি হইতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, তিস্তার বন্যাস্রোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক স্রোত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের মধ্য দিয়া এবং অপর স্রোত গোয়ালন্দের নিম্নে পদ্মা ও যবুনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রচিন প্রবাহের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। প্রাচীন দলিলাদি দ্বারাও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রেনেল সাহেব মেঘনাদের পূর্বতীরস্থ চাঁদপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে মোহনপুর নামক স্থান জরিপ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন কাগজপত্রাদিতে দৃষ্ট হয় যে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নদীর প্রবাহ ভয়ানক রূপে পরিবর্তিত হইয়া উহা নদীর পশ্চিম পাড়ে গিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষনে নদী পুনরায় সাবেক খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যাপ্রবাহে ত্রিপুরা জেলার মেঘনাদ তীরবর্তী প্রায় ১৬ বর্গমাইল পরিমিত স্থান নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে আবার পশ্চিমতীরস্থ ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর পরগনার জল প্লাবন ও ভাঙ্গনী আরম্ভ এই ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দেই সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই নদীর ভাঙ্গনী এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সমুদয় ইদিলপুর পরগনাটাই মেঘনাদ গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিয়া ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সমুদয় মৌজায় ভাঙ্গনী খুব বেশি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তিনি রিপোর্ট করিয়াছিলেন, ৭ বৎসর পরে ঠিক সেই স্থান দিয়াই নয়াভাঙ্গনী নদীর ধ্বংশকারী প্রবাহ শ্রীরামপুর যোজকের মধ্যদিয়া মনারপুরের (এক্ষণে চরমনপুর বলিয়া অভিহিত) নিকটে পদ্মার সহিত মেঘনাদের সম্মিলন ঘটাইয়াছে। বস্তুত জল প্লাবন হেতুই যে ঢাকার উত্তর হইতে বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ পর্যন্ত ভূভাগের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ভীষণ জল প্লাবনের ফলেই নয়াভাঙ্গনী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, এতৎসাপক্ষে প্রমাণাবলি অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিস্তানদীই যে ভয়ানক পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ এবম্বিধ অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যা স্রোতে রাজনগর পরগনাটিরই ক্ষতি বিশেষরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা মেঘনাদ দ্বারা স্পর্শিত হয় নাই। রাজনগর পরগনা সাধারণত পদ্মা ও কালীগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গানদী খুলিয়া যাওয়ায় ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে পদ্মানদী মেঘনাদ নদে প্রবেশ লাভ করিবার অভিনব পথপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই অভিনব পথটিই স্বনামধন্যা কীর্তিনাশা। যে সময়ে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রে অধিকাংশ সলিলরাশি যবুনার মধ্যদিয়া জাফরগঞ্জের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইতেছিল, তৎসময় হইতে এবম্বিধ পরিবর্তন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ের যবুনার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপুত্র সন্তর্পণে প্রবাহিত হইতেছিল। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার উত্তরদিকস্থ প্রাচীন নদীটিই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিচিত হইত। "ব" দীপস্থ সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল না। ক্রমে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া স্থান পরিবর্তন দ্বারা অথবা ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই উহা সংঘটিত হইয়াছে।

প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, তিস্তানদীর প্রবাহ পরিবর্তনের গোলমালেই দুইটি নতুন নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এখানেই নদীগুলির তুমুল সংগ্রাম পুনরায় আরব্ধ হইয়াছিল। তিস্তার ভীষণ আক্রমণের ফলে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্যই ঢাকার উত্তরদিকের সঙ্গমস্থলে উহা মেঘনাদের সহিত আটিয়া উঠিতে পারে নাই।

"যখন দুইটি প্রকাণ্ড নদী একত্র মিলিত হয় তখন উহাদের সঙ্গমস্থলসমূহের অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সার্ভেয়ার ফার্গুসন সাহেব আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ, গড়াইনদী দিয়াই বহির্গত হইবে। বস্তুত গড়াই যেরূপ আকার ধারণ করিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, সেরূপ হয় নাই"। ফার্গুসনের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ালন্দের দক্ষিণদিকে পদ্মানদী দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার দক্ষিণশাখা ফরিদপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর খাত এখন শীতকালে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়, উত্তর পূর্বদিকে এইভাবে প্রবাহিত হওয়ায় নদী দক্ষিণদিকে ভাঙ্গিতে পারে নাই।

রেনেলের সময়ে পদ্মা, কালীগঙ্গা ও মেঘনাদের অবস্থা :

রেনেলকৃত সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্র দৃষ্টে ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে, একমাত্র কালীগঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষোদেশে উপবীতবৎ শোভিত হইত। মেঘনাদ হইতে একটি পয়োনালি বহির্গত হইয়া, প্রথমত দক্ষিণতটে মুলফৎগঞ্জ ও উত্তরতটে ফুলবাড়ির নিকটে প্রবাহিত হইয়া, পরে তথা হইতে দুইটি শাখানদী বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের নিকটে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফুলবাড়িয়া, রাজনগর, সমকোট, ঘাঘটিয়া রাধানগর প্রভৃতি স্থান এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্তমান ছিল। দক্ষিণদিকের শাখাতটে মুলফৎগঞ্জ, নবিপুর, জপসা, লড়িকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা, চিকন্দি, গঙ্গানগর, সামপুর এবং উত্তর দিকের শাখার উত্তরতটে চণ্ডীপুর, দাগদিয়া, ধানকুনিয়া, নুনকিশোর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। তৎকালে কার্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণভাগে মেঘনাদতটে এবং রাজাবাড়ি কালীগঙ্গার উত্তরভাগে মেঘনাদতটে বিদ্যমান ছিল। পূর্বে রাজাবাড়ি ও চণ্ডীপুর এতদুভয় স্থান কালীগঙ্গার উত্তরদিকে ছিল। শ্যামপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ইদ্রাকপুর, ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুল্লাপুর, মীরগঞ্জ, মাকহাটি, সেরাজদি, রাজাবাড়ি, শেখর নগর, হাসারা, ষোলঘর, বারইখালি, নুরপুর, ধাউদিয়া, বলিগাঁ, নুনকিশোর, রাজাবাড়ি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থান রেনেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও কালীগঙ্গার উভয়তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রেনেল কালীগঙ্গার নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন। গঙ্গানগর হইতে লড়িকুল এবং মুলফৎগঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম কালীগঙ্গা। তিনি ইহার উত্তরের নদীটিকে কালীগঙ্গা বলিয়াছেন। যাহা হউক, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মার প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমন কি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পদ্মা দক্ষিণবিক্রমপুরের পশ্চিমদিক দিয়াই প্রবাহিত হইত। এই নদী তখনও পদ্মা নামে এবং নতুন নদীটি কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হইত। এই নতুন নদীটি বাস্তবিক পক্ষে রেনেলের তথাকথিত কালীগঙ্গার বিস্তৃতি মাত্র। এইসময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দুইটি নদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুত্র, কীর্তিনাশার সাহায্যে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া

মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। ফলে, সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী প্রবাহিত হইল। রেনেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম ছিল "নয়ানদী রথ খোলা"। উহার অন্তত ২০০ বৎসর পূর্বে কোন নদী এই যোজকের সহিত মিলিত হয় নাই।

কীর্তিনাশার স্রোত খুব প্রবল ছিল। পদ্মাও মেঘনাদের তলের (level) পার্থক্যই ইহার স্রোতোবেগের প্রাবল্যের কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। রাজাবাড়ির দক্ষিণপূর্বে রেনেল কর্তৃক প্রদর্শিত পোম্মামারা নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হইয়া যাওয়ায় মেঘনাদ নদ কর্তৃক উত্তরদিকস্থ দ্বীপগুলি ভরাট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড একটি যোজকের সৃষ্টি হইল। এদিকে কীর্তিনাশা মেঘনাদের পশ্চিমতীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নতুন নদীটির গতির স্থিরতা ছিল না। স্রোতের প্রাবল্য হেতু ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুলফৎগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে মেঘনাদ প্রবলাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, এবং নতুন নদীটি উত্তরদিকে সরিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুমিত হয় যে, পদ্মার স্রোত উত্তরদিকে প্রবল ছিল। এই নতুন নদী হইতে মেঘনাদের পশ্চিমপাড় পর্যন্ত দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড চর পড়িয়া দ্বীপের চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশি চর পড়িয়াছিল যে, কীর্তিনাশার মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ইহা অন্যদিক দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নুরপুর হইতে পাচ্চারের ধার দিয়া প্রায় ভদ্রাসন পর্যন্ত কীর্তিনাশা পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর দক্ষিণ প্রবণতা পুনরায় প্রকাশ পায়, এবং গতি চাঞ্চল্যবশত ইহা খাগুটিয়ার (সম কোটের) ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুরাতন কীর্তিনাশার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত দেবমন্দিরাদি সহ খাগুটিয়া গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ফলে রাজনগর হইতে মূলফৎগঞ্জ পর্যন্ত আর একটি নতুন নদীর সৃষ্টি হয়। এই সময়ে (১৮৫৮-৬০) মেঘনাদের সহিত নতুন নদীর সঙ্গমস্থানে, পশ্চিমতীরে, নতুন নদীতে চর উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পদ্মা নতুন পথে বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তাহা হয় নাই। নতুন নদী খুব ভরাট হইতে আরম্ভ করিল এবং এই সময়েই কীর্তিনাশার মূল স্রোত উহার পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মেঘনাদের স্রোতোপ্রাবল্য কীর্তিনাশা নতুন পথে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কীর্তিনাশা রাজনগরের পূর্বদিকস্থ নতুন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। এই বারের জলস্রোতের সমস্ত বেগ চণ্ডীপুরের নিকটে একত্রিত হয় ; ফলে কীর্তিনাশা পূর্বের ন্যায় আর একবার পূর্ব মূর্তি ধারণ করিয়া মেঘনাদের পশ্চিম তীরস্থ সমুদয় চর বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে রাজনগরের সমস্ত কীর্তি নদী গর্ভে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণদিকস্থ ভাঙ্গনী বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল না। ১৮৬৬/৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লড়িকুল ও জপসা দেবমন্দিরাদিসহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়। ইহারই কিঞ্চিৎকাল পূর্বে তারপাশা, বাঘিয়া, কাঁচাদিয়া, কালীপাড়া, লৌহজঙ্গল, পোড়াগাছা, বিলাসপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়।

বর্তমান তারপাশা নামীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর তীরব্যাপী চর পদ্মা-মেঘনাদের সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তারিত হওয়ায় চর রাজনগর পুনরায় নদীগর্ভস্থ হওয়ার সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা নদী যেন কৃষ্ণনগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, পালঙ্গ, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া কীর্তিনাশা ও আড়িয়লখাঁর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাধারণ কারণ :

দক্ষিণ ঢাকাস্থ নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময়ে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রাপ্ত ভাগে পদ্মা ও মেঘনাদের সঙ্গমস্থলের নিকটে উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

নদী প্রবাহের নিত্য পরিবর্তনের ফলে নিকটবর্তী স্থানসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদীর পরিত্যক্ত খাল ঝিলে পরিণত হইলে, দ্বীপ-উৎপাদনকারী স্রোতস্বতীর বক্রতাহেতু পার্শ্ববর্তী ভূমি অপেক্ষা ঝিলসমূহের উচ্চতা অধিক হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে সময়ক্রমে নদীপ্রবাহ উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হয় ; ফলে নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের নিকটবর্তী হইলে উহা ক্ষুদ্র খাড়িতে পরিণত হয়।[৭]

ফার্গুসন সাহেবের মতে নদীপৃষ্ঠের ক্রমনিম্নতা এক মাইলের মধ্যে ছয় ইঞ্চির অধিক হইলে উহা তীরধ্বংসনীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমনিম্নতা উহা অপেক্ষা কম হইলে স্রোতোবাহিত পলিমাটি তলদেশে সঞ্চিত হইতে থাকে।[৮]

খাতের সমীপবর্তী স্থানসমূহের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া প্রবাহের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন দ্বারা বদ্বীপস্থ অধিকাংশ ভূমি অধিকার করিবার জন্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগ্রাম এবং তাহার ফলাফল ফার্গুসন সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অধুনা বদ্বীপের যে পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি মধুপুর অঞ্চলস্থিত ভূমির উচ্চতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিকে এই বনভূমি প্রসারিত হইয়া সমতল ক্ষেত্র হইতে এক শত ফুট পর্যন্ত উচ্চ হইয়াছে। এজন্য ব্রহ্মপুত্র ক্রমশ পূর্বদিকে সরিয়া যাইয়া শ্রীহট্টস্থ ঝিলমধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে[৯]। ফলে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবাহিত পলিমাটি ঐ ঝিল মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে ; উহা মেঘনাদের স্রোতের সহিত সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এজন্যই সমুদ্রের সম্মুখস্থ বদ্বীপের প্রান্তভাগ পূর্ব দিকে উপসাগরের ন্যায় বঙ্কিমভাব ধারণ করিয়াছে[১০]।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বদ্বীপের এবম্বিধ বক্রতা আরও বেশি ছিল ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র পলিমাটি সঞ্চিত করিয়া শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের উচ্চতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে কতিপয় বৎসর মধ্যেই ইহার গতি পরিবর্তিত হইয়া পূর্বদিক পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিক দিয়া নতুন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রবাহ পরিবর্তন দ্বারা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল[১১]। এই দুইটি প্রকাণ্ড নদী পরস্পর নিকবর্তী হওয়ায় বদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে সঞ্চয়কার্য এত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল যে, তাহাতে অনতিকাল মধ্যে অতি ত্বরায় অভিনব চরসমূহের উদ্ভব হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, উহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বন্যাস্রোত মন্থর গতিতে সমুদ্র মুখে অগ্রসর হওয়ায় বদ্বীপের ঐ স্থানসমূহের বিশেষ কোনও পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল না।

দেশ প্লাবিত করিয়া প্রবল বন্যাস্রোত সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইবার সময়ে ঝিলমধ্যস্থিত স্থির জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে, উহার স্রোতোবেগের খর্বতা সাধিত হয়। ফলে স্রোতোবাহিত পলিমাটি তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে এবং প্রবাহ ও একটি মাত্র খাত মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া উচ্চ তটভূমি ভেদ করিয়া অসংখ্য নালার সৃষ্টি করিয়া থাকে[১২]।

হিমাচলের পাদ ও উত্তর বঙ্গের উচ্চ ভূমি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীসমূহ প্রখর গতিতে সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতরণ পূর্বক পরস্পরের সংযোগে পুষ্ট কলেবর হইয়া এক একটি প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে এতদঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী মালাই ঢাকা অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চ স্থান সমূহ বিধৌত করিয়া এই নদীমালা নিম্ন বঙ্গের নিম্ন ভূমিতে একটি মৃৎস্তর আনিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্বরতা শক্তি এতাদৃশ অধিক যে, যে স্থানে ঐরূপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রূপ নদীজালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্যক্ষেত্র সমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

"ব-দ্বীপের" উৎপত্তি :

বাংলার এই নদী বাহুল্য দেখিয়াই কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, হিমালয়ের গাত্র ধৌত হইয়া যে মৃত্তিকারাশি নদীমুখে সাগরগর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে

নদীমুখে সেই ধৌত মৃত্তিকারাশি জমিয়া বাংলা দেশের উদ্ভব করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, "নদীপ্রবাহ সঞ্চারিত ঐরূপ মৃত্তিকারাশি সমুদ্রগর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে মোহানাস্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ অতি অল্প পরিসর যুক্ত স্থানসমূহকে কর্তন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় ; এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ ভূখণ্ড নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক অংশ দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপ শ্রেণির মধ্যে যেটি সকলের মধ্য স্থানে অবস্থিত, সেটি অল্প বিস্তর লম্বা আকার প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই, অথবা ভাল রূপে জমাট বাধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্র জলের স্রোতবেগ আর তাহার গাত্র কর্তন করিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কর্তন করিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমি জল ছাড়াইয়া উঠিলে এই সকল গভীর রেখাই তখন "বদ্বীপ" মধ্যে বৃহৎক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদিত ভূমি ভাগ উহাদের জল ক্রিয়া দ্বারা পুনর্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতার প্লাবিত হইয়া পলি মাটি দ্বারা পুনঃনির্মিত হইলে একরূপ চিরস্থায়িতা প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে, তথায় পুনরায় তথাবিধ রূপে নির্মাণের কার্য করিতে থাকে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে।" আবার কেহ কেহ বলেন যে পদ্মা বা মেঘনাদ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল। পরে নদীগর্ভে পর্যবসিত হইয়াছে। ইউসিন যুগে যে সাগর জল হিমালয় পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ক্রমশ লঙ্কাস্থানে সরিয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের বিস্তৃত ভূখণ্ডও ঐ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে পুনর্গঠন করে। নদীকূলে এই সাক্ষ্য বলবৎ। অনুমান হয় তাহাতেই বা ক্রমে নিম্নবঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে[১৩]।

অন্য মতাবলম্বীগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচিন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা পঞ্চনীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ ও কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ ও পীঠস্থানের উল্লেখ করিয়া বঙ্গের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করেন, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, ইরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ইহারা নর্মদা নদীর মোহানাস্থিত খাম্বাজ উপসাগর, ইউফ্রেটিস নদী-মুখস্থিত পারস্য উপসাগর এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদীদ্বয়ের মোহনায় অবস্থিত শ্যামউপসাগরের উৎপত্তির বিষয় উপস্থাপিত করেন। তাহারা বলেন, "এই রূপে প্রত্যেক বেগবতী নদীর মুখে এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ উপসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। নদীর এক স্থান ভাঙ্গে এবং সেই মাটি দ্বারা অন্য স্থানে চরা পড়ে। সুতরাং নদীদ্বারা অতি অল্প মৃত্তিকারাশিই সাগর সঙ্গমে নীত হয়। তদ্দ্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত, তবে হোয়াংহো ও ইয়াংকিসিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমাজন, মিসিসিপি প্রভৃতি নদ-নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু সর্বত্রই যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সমধিক সঙ্গত"।

বস্তুত বাংলা দেশ নতুন নহে ; বাংলার নদীবাহুল্যও নতুন নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই নদীবহুল বাংলা বর্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্বে কোন সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল : তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানেও পূর্বে জনপদ ছিল ;

পরে মগ ও পর্তুগিজগণের ভীষণ অত্যাচারের ফলে ঐ স্থানের অধিবাসীগণ স্থানান্তরিত হওয়ায়, উহা অরণ্যানীসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

১. মেঃ বুকানন হ্যামিল্টন, ফার্গুসন, সেরউইল, এ. সি. সেন, এঙ্কলি, মেজর রেনেল ও প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ ও প্রবন্ধাদি হইতে এই অংশ প্রণয়ন কালে যথেষ্ট শাহায্য পাইয়াছি।
২. See Mr. Fergusson's paper J. G. S. XIX 1863 p. 321 & 330
৩. রেনেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।
৪. রেনেলের ষষ্ঠ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।
৫. রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।
৬. J. A. S. B. 1910
৭. Geology of India pt. I (Page 406—408) by Medicott and Blanford.
৮. See Mr. Fergusson's paper. I. G. S. XIX 1863. p 321 and 330.
৯, ১০. Ibid.
১১. See Geology of India pt. I (pages 406—408) by Medlicott and Blanford.
১২. Ibid.
১৩. বিশ্বকোষ।

চতুর্থ অধ্যায়

খাল
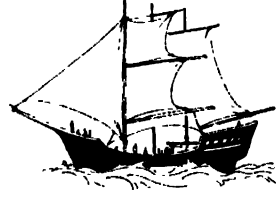
ঢাকা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে। তন্মধ্যে তালতলার খাল, দোলাইখাল, মেন্দিখালি, তাতিবাড়ির খাল, আকালের খাল, আড়ালিয়ার খাল, ইলিসামারী, তুলসীখালি, ব্রাহ্মণখালির খাল, মীরকাদিমের খাল, গোয়ালখালি, কুচিয়ামোড়ার খাল, মৈনটের খাল, যাত্রাবাড়ির খাল, শিববাড়ির খাল ও পাইনার খাল সুপ্রসিদ্ধ।

তালতলার খাল :

এই খাল তালতলার নিকটে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মালখানগর, ফেগুনাসার, কেচাল, সিলিমপুর, বালিগাঁও প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া বহরের নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে। এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালি খনিত হওয়ায় ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে। কীর্তিনাশা ও মেঘনাদ ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই রাস্তা ২০/২৫ মাইল সোজা। সুতরাং বরিশালবাসী মহাজনগণের নৌকাপথে ঢাকায় মাল আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শীতকালে এই খালের জল অনেক কমিয়া যায়, সুতরাং ঐ সময়ে মাল বোঝাই করা বড় নৌকা এই পথে যাতায়াত করিতে পারে না।

প্রবাদ এই যে, মহারাজা বাজাবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস দেওয়ান কর্তৃক এই খালটি খনিত হইয়াছিল ; কেহ কেহ ইহা রাজবল্লভের অন্যতম কীর্তি বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় রামদাস অথবা রাজবল্লভ এই খালটির সংস্কার সাধন করিয়া ছিলেন মাত্র। কারণ, এই খালের উপরে যে একটি অতি প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত ভগ্নসেতু অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বল্লালী পুল বলিয়া খ্যাত। ইহার স্থাপত্যশিল্প দৃষ্টে উহাকে সেন রাজগণের কীর্তির অন্যতম নিদর্শন স্বরূপই মনে হয়। যদি তাহা হয়, তবে রাজবল্লভ বা রামদাস কর্তৃক খালটি কি প্রকারে খনিত হওয়া সম্ভবপর হয়? খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল হইবে।

দোলাই খাল :

এই খাল বালু নদী হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা ফরিদাবাদের নিকটে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালের একটি শাখা ঢাকা শহরের মধ্য দিয়া বাবুর বাজারের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে[১]। দোলাই খাল ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ব্যয়ে সংস্কৃত হয়। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই খালের মাসুল ধার্য হয়। ময়মনসিংহবাসী মহাজনগণের এই পথে মাল লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ ব্যয়ে দোলাই খালের উপর লৌহনির্মিত সেতু প্রস্তুত হয়। এই সময়ে ওয়ালটার সাহেব ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই খাল খননকার্যে প্রায় ২৫০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

মেন্দিখাল :

কাইকারটেকের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া বৈদ্যের বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তাতিবাড়ির খাল :

সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত "দার্মশরণ" বিল হইতে বালুসাই গ্রামের মধ্য দিয়া এই খালটি মেঘনাদে পতিত হইয়াছে। পূর্বে এই খালের পাড়ে তন্তুবায়গণ বাস করিত বলিয়াই ইহা তাতিবাড়ির খাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আকালের খাল :

মৈকুলির নিকটবর্তী হাফানিয়ার বিল হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দীপুর, বেহাকৈর, বরাব, দেওয়ানবাগ, মদনপুর, চাদরপুর, কাশীপুর ও চাপাতলার পার্শ্বদেশ দিয়া কুড়িপাড়ার নিকটে লাক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ আলি কর্তৃক এই খালটি খনিত হইয়াছিল। চাপাতলা গ্রামে এই খালের উপর প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত একটি প্রকাণ্ড সেতু বিদ্যমান আছে। খিজিরপুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপর দিয়া ঢাকা পর্যন্ত প্রসারিত আছে।

যাত্রাবাড়ির খাল :

এই খাল লাক্ষ্যা নদী হইতে হামছাদি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হামছাদি গ্রামের বৈদ্যবংশীয় সুবিখ্যাত কৃষ্ণদেব বক্‌সী কর্তৃক এই খাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খনিত হয়।

পাইনার খাল :

এই খাল ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে কর্তিত হয। কালীগঞ্জের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া শুভড্যা ও পাইনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

আড়ালিয়ার খাল :

ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া লাক্ষ্যা নদীতে পড়িয়াছে।

ত্রিবেণির খাল :

সোনাকান্দার নিকটে লাক্ষ্যা হইতে বহির্গত হইয়া কাইকারটেকের অপর পাড়ে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

জোলাখালি :

বুড়িগঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকীত্তার পার্শ্বদেশ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

করিমখালি :

এই খালটি বুড়িগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া পারজোয়ারের বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

শ্রীনগরের খাল :

ধলেশ্বরী হইতে বর্হিগত হইয়া শ্রীনগর, ব্রাহ্মণগাঁও প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া লৌহজঙ্গের নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে; লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহার একটি শাখা বাহির হইয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

গোয়ালখালির খাল ও কুচিয়ামোড়ার খাল :

ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

মৈনটের খাল :

পদ্মা হইতে বাহির হইয়া ইছামতী নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মীরকাদিমের খাল :
এই খালটি ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

ইলিসামারীর খাল :
এই খাল ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বন্দুরা, হোসনাবাদ, জয়পাড়া হইয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণখালির খাল :
ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া বালিয়াখালির মধ্য দিয়া নবগ্রামের বিলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ঘিয়রের খাল :
পুরাতন ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ইছামতী নদীতে পড়িয়াছে।

শিববাড়ির খাল :
এই খাল ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া বরাদিয়া, উথুলী, শিবালয়, নালি, হরিরামপুর, লক্ষ্মীকোল ও নয়াবাড়ির মধ্য দিয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।

এই খালের একটি শাখা হাটিপাড়া, হোসনাবাদ, দেবীনগর হইয়া নারিসার নিকটে পদ্মায় প্রবেশ করিয়াছে।

তেতুলঝোড়ার খাল :
রাজফুলবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বর্হিগত হইয়া মীরপুরের নদীতে পড়িয়াছে।

হরিশকুলের খাল :
এই খাল জমসার সমতল ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালীগঙ্গা নদীর সহিত ইছামতী নদীর সংযোগ সাধন করিয়াছে। এই খালটি প্রায় শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় জমসা অঞ্চলের কৃষিজীবি লোকের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

চুড়াইনের খাল—গালিমপুর গোবিন্দপুরের খাল :
ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া আইরল বিলে পড়িয়াছে। এই খাল দিয়া বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর, হাসারা, ষোলঘর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। বর্ষাকালে এই খালপথে পদ্মা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া চলে। বর্তমান সময়ে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই খালটি শুষ্ক হইয়া যায়।

কিরঞ্জির খাল :
এই খালটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বারমাস জল থাকে। কিরঞ্জি গ্রাম হইতে ভুরাখালি পর্যন্ত নৌকা পথে সকল সময়েই যাতায়াত করিতে পারা যায়।

ভাসননের খাল :
কালীগঙ্গা নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া চাইরগা নদী পর্যন্ত এই খালটি বিস্তৃত।

ভুরাখালি :
এই খালটি খুব প্রশস্ত। কালীগঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সাতরাখালি পর্যন্ত এই খালে বারমাস জল থাকে।

এই জেলার কয়েকটি প্রধান খালের সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে এক দিকে যেমন যাতায়াত ও অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধা হইবে তেমন আবার দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষেও যথেষ্ট শাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় তালতলার

খাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। তালতলার খালে এখন বারমাস নৌকা চলাচল করিতে পারে না। এজন্য ফরিদপুর ও বরিশালবাসী মহাজন এবং অপরাপর জনসাধারণ ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা ও মেঘনাদ ঘুরিয়া ঢাকায় উপনীত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই খালটি কর্তিত হইলে ঢাকা হইতে উপরোক্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিবার প্রায় ৩০ মাইল পথ সোজা হইয়া যায়। খালে বারমাস জল থাকিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হইয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সংসাধিত হইবে।

হরিশকুলের খালটি সংস্কার ইহলে বহুলোকের উপকার হইবে। জেলার এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখানকার জল এরূপ অপকৃষ্ট যে প্রতিবৎসরই বর্ষা অন্তে খাল ও বিলে মৎস্যের মড়ক দেখা দেয়। ফলে ঐ জল আরও দুর্গন্ধময় হইয়া নিতান্ত অপেয় হইয়া দাঁড়ায়। জমসার সমতল ক্ষেত্রে যে সমুদয় লোক কৃষিকার্য করিয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইছামতী নদীতীরবাসী, সুতরাং এই খালটিতে বারমাস জল না থাকায় কৃষকগণের দুর্দশার একশেষ হয়। সম্বৎসর মাঠে পরিশ্রম করিয়া সুশস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও ক্ষেত্র হইতে শস্য বাড়ি লইয়া যাইতেই তাহাদিগের প্রাণান্ত হয়। পূর্বে তাহারা ধান্যাদি শস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া বাড়ি লইয়া যাইত ; কিন্তু এক্ষণে মাঠের পার্শ্বেই অস্বাস্থ্যকর নিম্নভূমিতে অস্থায়ী ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করিয়া ধান্য হইতে চাউল তৈয়ার করিবার জন্য প্রায় মাসাধিক কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়।

---

১. কামারনগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহার একটি শাখা বংশালের মধ্য দিয়া টঙ্গীব নদীতে মিলিত হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বিল ও ঝিল
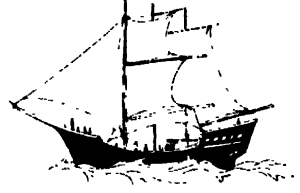
ঢাকা জেলার বিলগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম : উন্নতভূমিস্থ :

বেলাই বিল, সালদহের বিল, লবণদহের বিল, এই শ্রেণিভুক্ত। সালদহ ও লবণদহের বিল মধুপুরের জঙ্গলের অন্তর্গত ; এবং মির্জাপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে, ভাওয়াল ও কাশিমপুরের অরণ্যানীর সীমান্তস্থানে অবস্থিত। এই শ্রেণির মধ্যে ভাওয়ালের অন্তর্গত বেলাই বিল সুপ্রসিদ্ধ। এই সুবৃহৎ বিলটির কোনও কোনও স্থানে বারমাসই জল থাকে। বর্তমান সময়ে যে জলভাগ বেলাই বিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ফল প্রায় ৮ বর্গ মাইল। বাড়িয়া, ব্রাহ্মণগাঁও, বক্তারপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি এই বিলের মধ্যভাগে অবস্থিত। চারিশত বৎসরের পূর্বে এই বিলমধ্যে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালে এই বিলটি একটি খরস্রোতা স্রোতস্বতীরূপে বিরাজমান ছিল। প্রবাদ এই যে, ভাওয়ালের তদানীন্তন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভূস্বামী খট্টেশ্বর ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এই পয়ঃপ্রণালিটি হইতে ৮০টি খাল কর্তন করিয়া নদীজল নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। তদবধি ইহা একটি প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় একটি ভাটের গান দ্বারা এই প্রবাদটি সমর্থিত হয়। আমরা ঐ গানটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম!

"খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা—[১]
খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে,
কত দালান কোঠা তৈয়ার কর্ল্ল ভাওয়াল জঙ্গলে,
সে যে আপন মনে।
সে যে আপন মনে প্রতাপেতে রাজ্য শাসন করে,
কত সুখ শান্তি বিরাজ করে প্রজার ঘরে ঘরে,
নানা স্থানে স্থানে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্কর্ণি কাটিল,
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল,
ভাই অদ্ভুত কাহিনী"।

ভাওয়ালের পূর্বাঞ্চলস্থ স্থানগুলির অন্তর্বাণিজ্য সাধারণত এই বিল দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে এই বিলটি ভরাট হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে বোরো ও আমন প্রভৃতি ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধীবরগণ এই বিলের স্থানে স্থানে মৎস্যের "ডাঙ্গা" খনন করিতেছে। গত বৎসর একটি ডাঙ্গা খনন করিতে মৃত্তিকার নীচে সারি সারি কাঁঠাল গাছের গোড়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বিল হইবার পূর্বে ঐ স্থানটি একটি জনপদ ছিল অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় : সমতলভূমিস্থ :

সমতলভূমিস্থ বিলগুলি প্রায়ই নদীর ভরাট অথবা নদী প্রাচীন খাত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গের সমতলস্থ ঝিলও বিলগুলির অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। এগুলির অধিকাংশই উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে এক শ্রেণিবদ্ধভাবে বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গঙ্গানদীর প্রাচীন প্রবাহ পূর্বে এই স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইত। কালক্রমে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়া প্রাচীন খাতগুলি বিলে অথবা ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অথবা তাহার শাখানদীগুলির প্রবাহ পরিবর্তনহেতু রায়পুরা অঞ্চলের ঝিলগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

সুপ্রসিদ্ধ আইরল বা চূড়াইন বিল, হাসারার বিল,[২] জমসার বিল, নরা ঝিল, রঘুনাথপুরের ঝিল, চৌহাট ঝিল, কলাকোপার বিল, খলসি বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাটিপাড়ার গোং, নান্নার গোং[৩], সারারিয়া নল বিল, রপ্তাই বিল, লাঙ্গলাই বিল, শ্যামপুরের বিল, কিরঞ্জির বিল, হাফানিয়ার বিল, দামশরণ বিল, ভাণ্ডারিয়া বিল প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত।

খালসি বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাটিপাড়ার গোং, নান্নার বিল, রঘুনাথপুরের বিল, ভাণ্ডারিয়া বিল, হাফানিয়ার বিল প্রভৃতিতে বার মাস জল থাকে এবং প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঢাকা জেলায় বিলের সংখ্যাধিক্যবশত মৎস্যের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ভূমি অতিশয় নিম্ন। মেজর রেনেল ও বুকানন হ্যামল্টন প্রভৃতি মনীষীগণ উহা গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া অনুমান করেন। পূর্ণিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বরিশাল পর্যন্ত স্থান মধ্যে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নদী নিম্নবঙ্গের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে, আয়তন অনুসারে উহাদের গভীরতা অত্যন্ত বেশি বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই নদীগুলির নামেরও একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিয়ার বনগঙ্গা ঢাকা জেলার কালীগঙ্গা, নারায়ণীগঙ্গা, পোড়াগঙ্গা, বুড়ি গঙ্গা, যশোহরের নবগঙ্গা, বরিশালের হরগঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলির প্রত্যেকেরই নামের অন্তে "গঙ্গা" শব্দ থাকায় উহারা যে গঙ্গারই শাখানদী মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রেনেল বলেন "গঙ্গা" শব্দ এখানে নদ্যর্থক ; কিন্তু তাহা হইলে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের নদীগুলিরও ঐপ্রকার নাম হওয়া স্বাভাবিক ছিল। নামের এবম্বিধ সামঞ্জস্য ও বিশেষত্বটুকু বড়ই আশ্চর্যজনক। হ্যামিল্টনের পূর্বোল্লিখিত যুক্তির সহিত নদীর নামগুলির বিশেষত্ব ও অবস্থান প্রভৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, উহাই সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না কি?

প্রাচীন ম্যাপ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জাফরগঞ্জ হইতে বিলের এই শ্রেণি বারবার দক্ষিণ পূর্বদিকে চলিয়াছে। জাফরগঞ্জ হইতে এই শ্রেণি আইরল বিলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্ব দিকে বরিশাল জেলার অন্তর্গত হরিণঘাটার মোহানা পর্যন্ত যাইয়া শেষ হইয়াছে। নদী শুষ্ক হইয়া অথবা উহার প্রবাহ পরিবর্তনহেতুই যে বিল অথবা ঝিলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইছামতী নদীর বর্তমান শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টেও উপলব্ধি হইতে পারে[৪]।

ঢাকা জেলার বিলগুলির মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আইরল বিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। টেইলার সাহেব উহাকে চূড়াইন বিল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই সুপ্রশস্ত বিলটি পূর্ব পশ্চিমে ১২ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৭ মাইল প্রশস্ত। আইরল বিলের দক্ষিণ প্রান্তে দয়হাটা, শ্যামসিদ্ধি, প্রাণীমণ্ডল, গাজিঘাট, উত্তর রাড়িখাল, উত্তরে শ্রীধর খোলা, বারুইকালি, শেখরনগর, মদনখালি, আলমপুর, তেঘরিয়া ; পূর্বপ্রান্তে হাসারা, ষোলঘর, তেওটখালি, মোহনগঞ্জ ; পশ্চিমে কামারগাঁও, জগন্নাথপট্টি, কাঠালবাড়ি, মহতপাড়া প্রভৃতি।

সম্ভবত রাজশাহীর চলন বিল এবং ঢাকার আইরল বিলেই অতি প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে[৫]। ব্রহ্মপুত্রের 'ব'দ্বীপস্থ বর্তমান 'ঠোঠা' দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থান হইতে রাজশাহী জেলার 'চলন' বিল পর্যন্ত ভূমি অতিশয় নিম্ন ছিল। এই বিষয় ফার্গুসন সাহেব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বদিক হইতে ব্রহ্মপুত্রের গতি পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল, এই নদী উল্লিখিত নিম্নভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ যে আইরল বিল মধ্যেই গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যা আরম্ভ হইলে জলস্রোত উক্ত পথ দিয়াই আইরল বিল অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। সাময়িক প্রবল বন্যার ফলে ঐ অঞ্চলের ফসলসমূহের ক্ষতি হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়[৬]।

দামশরণ বিল :
সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত বালুসাই গ্রামের পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ "দামশরণ" নামে একটি প্রকাণ্ড মাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে উহা একটি তাড়াদাম পূর্ণ বিল ছিল। ঐ তাড়াদাম ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ প্রভৃতি বহু বন্যজন্তুর আশ্রয়স্থল ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর হইল এই বিল ভরাট হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কিরঞ্জির বিল :
সুপ্রসিদ্ধ আইরল বিলের পরে এরূপ সুবৃহৎ বিল ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীয়টি নাই। উত্তর পশ্চিমে মাণিকগঞ্জ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নবাবগঞ্জ। কালীগঙ্গা নদী এই বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। চান্দর, আগলা, সোলা, সিঙ্গের, সিঙ্গরা প্রভৃতি গ্রাম এই বিলের পাড়ে অবস্থিত। শিকারিপাড়া গ্রাম এই বিলের মধ্যে পড়িয়াছে।

নলগোড়া বিল, জালনি বিল, নাড়াঙ্গি বিল, নওগাঁকাঠারর বিল, ঘোষপাড়ার বিল প্রভৃতি নবাবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। এই সমুদয় বিলে বারমাসই জল থাকে। কলাকোপার বিল, খাড়ই বিল, গোজড়া বিল, বান্দুরার বিল প্রভৃতি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বিল আছে। এই সমস্ত বিলে বারমাস জল থাকে না।

নদীমাতৃক ঢাকা জেলাতে প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ঝিলের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রায়পুরা অঞ্চলে এইপ্রকার কতিপয় জলাশয় বিদ্যমান আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই সমুদয় জলাশয়কে "কুর" বলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে মহেশপুরের কুর, গোকুল নগরের কুর এবং আমিরাবাদের কুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কুরগুলির জল অত্যন্ত সুস্বাদু, স্বচ্ছ ও তরল।

নদ-নদীর প্রবাহ পরিবর্তন এই জেলার বিশেষত্ব, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ ও উহাদিগের শাখানদীসমূহের প্রবাহের নিত্য পরিবর্তনহেতু স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে সর্বদাই পরিণত হইয়াছে। নদীগুলির প্রবাহ পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সন্নিকটবর্তী রায়পুরা অঞ্চলের ঝিলগুলি উক্ত নিয়মেই হইয়াছে।

মহেশপুরের কুর[৭] :
এই কুরটির প্রাকৃতিক সংস্থান অতি সুন্দর। ইহা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় একমাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ইহার জলপান করিয়া পূর্বে অনেক লোক নিরাময় হইয়াছে। আকরিক পদার্থের সংমিশ্রণ জন্য ইহার জলরাশির এরূপ অদ্ভুত রোগমুক্তির ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য নহে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। সোনারগাঁ পরগনার লাক্ষ্যা ও

মেঘনাদ তীরবর্তী স্থানসমূহের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, উহাতে অভ্র ও লৌহের সংমিশ্রণ রহিয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সুতরাং উক্ত প্রবাদবাক্য একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

১. খাইড়া ডোম্বা কায়স্থের নাম হওয়া সম্ভব কিনা তাহা বিচার্য বিষয়। কেহ কেহ ইহাকে চণ্ডালজাতীয় বলিয়াও অনুমান করিয়া থাকেন। "খাইডা ডুমফা" হই'ব কি?
২. প্রকৃতপক্ষে উহা চূড়াইন বিলেরই অন্তর্গত।
৩. পূর্ববঙ্গে নদীকে গাং বলিয়া থাকে ; এই গাং হইতে গোং শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।
৪. See A. C. Sen's report
৫. Ibid.
৬. Mr. A B. Sen's report.
৭. প্রতিভা ১৩১৮ চৈত্র সংখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ বর্ত্ম

প্রাচীন রাস্তা :

মোসলমান শাসনসময়ে শেরশাহ শহর সোনারগাঁ হইতে নীলাব পর্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করেন। এতদঞ্চলে উহা 'শাহী রাস্তা' নামে সুপরিচিত। তৎপরে মোগল সুবাদার মীরজুমলা, সায়েস্তা খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক সৈন্যগণের গমনাগমনের জন্য কয়েকটি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল।

রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে কয়েকটি প্রাচীন রাস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওযা যায়। প্রাচীন কালীগঙ্গা দক্ষিণতীরস্থ মুলফৎগঞ্জ নামক স্থান হইতে একটি রাস্তা করাতিকাল, নবীপুর ও লড়িকুলের মধ্য দিয়া রাজনগর পর্যন্ত পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল, তথা হইতে এই রাস্তা উত্তরদিকে গমন করিয়া নূন কিশোর হইয়া ধানকুনিয়া পর্যন্ত উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাস্তাটি পূর্ববাহিনী হইয়া ধাওদিয়া গ্রামের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া মেঘনাদ নদতীরবর্তী রাজাবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই রাস্তাই সুপ্রসিদ্ধ 'কাচকির দরজা' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই রাস্তাটির অনেকাংশ এক্ষণে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইদিনপুরের নিকটস্থ বুড়িরহাট ও দেওভোগ নামক স্থান হইতে উহার একশাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তরদিকে ধলেশ্বরী নদীর তট পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। বর্মবংশীয় রাজগণ কর্তৃক এবং সেনরাজগণের সময়ে যে সমুদয় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়, সুতরাং এই রাস্তাটির সমুদয় অংশ রায় মহাশয়গণের কৃত নয়। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা পরে কোথাও ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথাও বা লোকালয়ে এবং অবশিষ্ট শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় যে চাঁদ-কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায়, জননীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকি গুড়ানামে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্য পৌঁছতে পারে, তন্নিমিত্তই রায় মহাশয়গণ কর্তৃক এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকি মৎস্য ধৃত কবিরা ব্যপদেশে উহার সৃষ্ট এই কিম্বদন্তীই চলিয়া আসিতেছে, এবং এইজন্য রাস্তার নামও "কাচকির দরজা হইয়াছিল"।[১]

রেনেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে যে কয়েকটি প্রাচীন রাস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

একটি রাস্তা বুড়িগঙ্গাতীরবর্তী গাট্টা নামক গ্রামের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া পারজোয়ারের পূর্ব প্রান্তস্থিত মানুরদি কলাতিয়া নামক স্থানের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটি কাটাখালি খালের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবেই চলিয়াছে। পরে ধলেশ্বরী অপর পারস্থিত সিহারতপুর, রিপুসা, মূলবর্গ, মদুপুর, কম্বোপারা, সাপোর, সুনিগর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

বুড়িগঙ্গা তীর হইতে অপর একটি রাস্তা পারজোয়ারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া শুভড্ড্যার সন্নিকটে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। পরে একশাখা ধলেশ্বরী তীরস্থিত ঠাকুরপুর নামক গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং অপর শাখা কোয়ারাখোলা গ্রামের মধ্যে দিয়া ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমি পর্যন্ত গিয়াছে। ঠাকুরপুর গ্রাম হইতে অপর একটি রাস্তা কোমারতা গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া এই শেষোক্ত শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ধলেশ্বরী দক্ষিণতীরস্থিত মুসুমপুর নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্বদিক দিয়া উপরোক্ত রাস্তাটির সম্প্রসারণ চলিয়াছে, এবং উহা চুড়ান, গোবিন্দপুর, বাঘমারা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া নবাবগঞ্জের নিকট দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, উহার একশাখা বান্দুরী, বারুয়াখালি, বোয়ালি, জলেশ্বর দানিশপুর, যাত্রাপুর, ঝিটকা, সাঙ্করাল, উথুলী, রাধাকান্তপুর হইয়া জাফরগঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথা হইতে সুর্দা পর্যন্ত এই রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে।

অপর শাখা ইগ্রাসী, লটাখোলা, মৈনট, দেহরো, পুরালিয়া, কান্দিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া পদ্মা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ইহার সম্প্রসারণ হাজিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। মৈনট হইতে এই রাস্তার একটি ক্ষুদ্র শাখা নুরুল্লাপুর হইয়া পদ্মাতীর পর্যন্ত গিয়াছে। পদ্মাতীরবর্তী আলিপুর হইতে অপর একটি রাস্তা চরমুন্ডিয়া, হাজিগঞ্জ ও পাটপাসার হইয়া ফরিদপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

ইছামতী তীরবর্তী পাথরঘাটা নামক স্থান হইতে একটি রাস্তা বাসাইলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একশাখা কাজিশাল, সুয়েলপুর, আসোরা, আলমপুর, শিতলখোলা, বারৈখালি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া চুড়াইনের নিকট সুর্দার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। আসোরা হইতে ইহার অপর একটি শাখা ষোলঘর, চানচিদ, বায়ারকোল প্রভৃতি স্থান হইয়া নুরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।

অপর শাখাটি রাঙ্গামালিয়া হইয়া দুরাজদি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তথা হইতে একটি রাস্তা মীরগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গি বাজার প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া ইছামতী তীরবর্তী ইদ্রাকপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। মীরগঞ্জ হইতে ইহার একটি ক্ষুদ্র শাখা সুগুট-চিনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। অপর রাস্তাটি নুন্দকিচেল অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঢাকা হইতে একটি রাস্তা জাফরাবাদ, মীরপুর, সিবদি, পাচকুনিয়া, সালিপুর, বাগুরতা, মসাপুর, জামোরা, বুরারিয়া, সাভার, মুকুলিয়া, বারিগাও, ধামরাই হইয়া দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঢাকা হইতে অপর একটি রাস্তা, বসুর বাগান, আম্বার্স ব্রিজ এবং তেজগায়ের সন্নিকটবর্তী ফরাসি ও ওলন্দাজদিগের বাগানের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া নিয়াহাট, সলপুর এবং টঙ্গীরপুলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অপর একটি রাস্তা নুনপাড়া, নওরাহাট, ইছাপুর, বৌলন, মুতারাগঞ্জ হইয়া ভাওয়াল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথা হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া ফুলপাড়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে টঙ্গীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে।

অপর একটি প্রাচীন রাস্তা ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামপুর ও ফতুল্লা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত ; এবং উহা লাক্ষ্যা নদীর অপর তীরবর্তী বন্দর নামক স্থান হইতে কলাগাছিয়া, সোমাপুর, তিরেপুর, কুটাপুর, ফুলদি, ববচর হইয়া মেঘনাদ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তা দাউদকান্দি হইয়া মতলবগঞ্জ, মহব্বৎপুর ও লক্ষ্মীপুরের মধ্য দিয়া শ্রীহট্ট পর্যন্ত গিয়াছে।

ঢাকা হইতে অপর একটি রাস্তা কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ গ্রামের মধ্য দিয়া লাক্ষ্যাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ; এবং লাক্ষ্যা নদীর অপর তীরবর্তী মোনাপাড়া, বালিয়া, পাচদোনা, ভাটপাড়া, পারুলিয়া, কাপি, গুরবাড়িয়া, কুলচেন্দি, ছানান্দিয়া, নুন্না প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া

এগারসিন্ধু অপর তীরস্থ সাগরদি নামক স্থান পর্যন্ত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। পাচদোনার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে এই রাস্তাটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে, এবং অপর শাখাটি মেঘনাদ তীরবর্তী নরসিংদি বন্দর পর্যন্ত গমন করিয়াছে।

১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ডিবেরোস তদানীন্তন বাংলার একটি মানচিত্র অঙ্কিত করেন। উক্ত মানচিত্র অবলম্বন করিয়া ১৬৬০ অব্দে ভ্যান ডেক ব্রুক যে বঙ্গদেশের ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে একটি রাজপথ ঢাকা হইতে ধলেশ্বরী পার হইয়া পর পারে পীরপুর এবং ধলেশ্বরী ও যমুনার বিচ্ছেদস্থল বেদ্‌লিয়া দিয়া পাবনা জেলার অন্তর্বর্তী শাহজাদপুর ও হাড়িয়াল পর্যন্ত গিয়াছে।[২]

অপর একটি রাস্তা পদ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ফতেবাদ (বর্তমান ফরিদপুর) হইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে।

বর্ধমান হইতে একটি রাস্তা সেলিমাবাদ, হুগলী, যশোহর, ভূষণা হইয়া সত্রজিৎপুর স্পর্শ করিয়া ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলে ইদ্রাকপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

নতুন রাস্তা :

ঢাকা হইতে শ্যামপুর, ফতুল্লা, পাগলা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ৮ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তাটি ইংরেজ গভর্নমেন্টের ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে এবং নারায়ণগঞ্জের অপর তীরবর্তী নবিগঞ্জ নামক স্থান হইতে এই রাস্তাটি পুনরায় আরম্ভ হইয়া কাইকারটেক, ও মোগরাপাড়া হইয়া বৈদ্যের বাজার পর্যন্ত পৌনে ৭$\frac{৩}{৪}$ মাইল প্রসারিত। এই উভয় রাস্তার ধারেই প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি রোপিত আছে।

ঢাকা হইতে অপর একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা টঙ্গী, সিঙ্গছাড়ি, উলুসারা হইয়া টোক পর্যন্ত সাড়ে ৪৬$\frac{১}{২}$ মাইল বিস্তৃত। এই সু-বৃহৎ রাস্তাটি ডিস্ট্রিক্ট ফেরি ফাণ্ডের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে। ইহাই ঢাকা জেলার সর্বপ্রধান পথ। এই রাস্তার উপরে স্থানে স্থানে পুল আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ টঙ্গীর পুল এই রাস্তায় পড়িয়াছে। মোগল সুবাদার মীরজুমলা সর্বপ্রথম এই রাস্তাটির পত্তন ও পরিসমাপ্তি করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। টঙ্গীর পুলটি মীরজুমলার নির্মিত বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন সা টঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই রাস্তার একটি শাখা কুন্দা হইয়া জয়দেবপুর পর্যন্ত ৫ মাইল বিস্তৃত।

ঢাকা শহর হইতে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাস্তা পৌনে ২ মাইল দূরবর্তী মগবাজার নামক স্থান পর্যন্ত প্রসারিত।

মুন্সিগঞ্জ হইতে অপর একটি রাস্তা ফিরিঙ্গিবাজার রিকাববাজার, মীরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ইছাপুর, সিঙ্গপাড়া হইয়া ১৮ মাইল দূরবর্তী শ্রীনগর নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই রাস্তাটি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ৩/৪ বৎসরের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ঢাকা-গোয়ালন্দ রাস্তা—এই বৃহৎ রাস্তাটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শীলপুর, সুলতানগঞ্জ, জাফরাবাদ প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া মীরপুর পর্যন্ত ১১ মাইল বিস্তৃত। এই রাস্তাটির পার্শ্বে গাছ আছে। দ্বিতীয় অংশ, মীরপুর হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া তুরাগ নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পুনরায় নদীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈলেরপুর, জামুর হইয়া নন্দখালির নিকটে ধলেশ্বরী নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত প্রসারিত। ধলেশ্বরীর পশ্চিমতীর হইতে এই রাস্তাটি ভাকুন, জয়মণ্ডপ ও সিঙ্গের হইয়া বায়রা পর্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত। তৃতীয় অংশ বাঙ্গুরা, বানিয়াজুরি, জোকা, মহাদেবপুর ও উথুলি প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া বোয়ালির নিকটে যমুনা-তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই অংশের দৈর্ঘ্য সাড়ে ১৫$\frac{১}{২}$ মাইল। পার্শ্বে গাছ আছে।

নবাবগঞ্জ হইতে একটি রাস্তা কলাকোপা, পাল্লামগঞ্জ হইয়া মৈনট পর্যন্ত সাড়ে ৭ মাইল বিস্তৃত। মৈনট হইতে একটি প্রাচীন রাস্তা পুরুলিয়া নয়াবাড়ি, জালালদি, পশ্চিমচর, রোস্তমপুর, মনসুরাবাদ প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া পদ্মাতীর পর্যন্ত গিয়াছে।

কলাতিয়ার রাস্তা কেরাণিগঞ্জ, বরিশুর, খাগাইল প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া আটি পর্যন্ত ৭ মাইল বিস্তৃত।

ঝিটকা হইতে এক রাস্তা কলতা, সরুপাই হইয়া নবগ্রাম পর্যন্ত ৭৩/৪ মাইল বিস্তৃত।

শ্যামপুর হইতে একটি রাস্তা ফুলবাড়িয়া, কর্ণপাড়া হইয়া সাভার পর্যন্ত গিয়াছে।

ডাঙ্গা হইতে পাকুরিয়া, মাত্রা, পাচদোনা ও নরসিংদি পর্যন্ত সোয়া ৯১/৪ মাইলব্যাপী একটি রাস্তা আছে।

শ্রীপুর—গোসিঙ্গার রাস্তা ৪১/২ মাইল ব্যাপী। শ্রীপুর ও গোসিঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম ইহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

ডেমরার রাস্তা ১ মাইল ব্যাপী ; দয়াগঞ্জ ও কাজলা এই রাস্তার পার্শ্বদেশে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এই রাস্তাটি ঢাকা শহর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। রাস্তার ধারে বৃক্ষ আছে।

এতদ্ব্যতীত ১১/২ মাইল বিস্তৃত জৈনসারের রাস্তা, ২৩/৪ মাইলব্যাপী বজ্রযোগিনীর রাস্তা, ১ মাইলব্যাপী কাটাখালির রাস্তা, এবং ১১/২ মাইল বিস্তৃত সা আলী সার দরগার রাস্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা হইয়াছে।

১. নির্মাল্য ১৩০৭ বারভুঞা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২. Van Den Brouche's map in valentynes works—referred to by Dr. Blochmann.

সপ্তম অধ্যায়

বন

ঢাকা জেলার উত্তরভাগ ভীষণ অরণ্যানীসঙ্কুল। এই অরণ্যানীর পূর্বভাগ ভাওয়ালের গড় এবং পশ্চিমভাগ কাশিমপুরের গড় নামে পরিচিত। এই উভয়ভাগকেই মধুপুর বনভূমির অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

এই জনসমাগমশূন্য বিরল বসতি বিপুল অরণ্যানীর মধ্যে স্থানে স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ ও বিশাল দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, মধুপুর অঞ্চল একসময়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এই বিশাল অরণ্যানীর কোথায়ও অযত্ন গ্রথিত লতাবিতানে পুঞ্জীকৃত বনপুষ্প, কোথায়ও খণ্ড নীলিমাতুল্য বাপীজলে সলিললীলা-চঞ্চল শুভ্র জলজ ফুলদল, কানন কুন্তলা ধরিত্রীর শ্যাম অঙ্গে শোভা পাইতেছে। ইহার পশ্চিমোত্তর অংশ প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন ও শ্বাপদসঙ্কুল।

অবস্থান :

ঢাকা শহর হইতে এই বিশাল বনভূমি উত্তরে ৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত পাথরঘাটা হইতে ব্রহ্মপুত্রতীরবর্তী বেলাব নামক স্থান পর্যন্ত এই বনের পরিসর প্রায় ৪৫ মাইল হইবে। ইহার পশ্চিম দিকস্থ গণ্ডশৈলমালা সমতলভূমি অপেক্ষা প্রায় ৪০ ফুট হইতে ১০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। পশ্চিম দিক হইতে এই গণ্ডশৈলমালা ক্রমশ নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়া আড়িয়ল খাঁ নদী পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রসারতা লাভ করিয়াছে।[১]

সীমা :

বংশীনদীকে এই বনভূমির পশ্চিম সীমা বলা হইতে পারে। উত্তর ও পূর্ব সীমায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত এবং আড়িয়ল খাঁ নদী। দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী। নদরাজ ব্রহ্মপুত্র যৎকাল পর্যন্ত এই জেলার পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত না হইয়াছিল, এবং বুড়িগঙ্গানদী ধলেশ্বরীর শাখা নদীতে পরিণত হইয়া সাভার ও ফুলবাড়িয়ার মধ্যস্থিত বানার নদীর অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারিয়াছিল, তৎকাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীদ্বয় দ্বারাই মধুপুর গড়ের সীমা সংরক্ষিত ছিল। পূর্বদিকস্থ প্রাচীনতম প্রবাহটি এই গড়ের উত্তর ও পূর্ব সীমা রক্ষা করিত, এবং বানার নদী পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত থাকিয়া সমতলভূমি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করিত। ব্রহ্মপুত্রের "ব-দ্বীপ"-এর ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা তদন্তর্গত নহে।[২]

ভূতত্ত্ব :

এই বনভূমির মৃত্তিকার প্রথম স্তর অতিশয় কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহের সংমিশ্রণ আছে, কিন্তু বালুকার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম স্তরের নিম্নের এক অংশ রক্তবর্ণ বালুকা পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ঐ বালুকারাশি অজয় ও বরাকর নদের তলভাগস্থ বালুকারাশির অনুরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিন্ধ্যপর্বতস্থিত বালুকারাশি ও মধুপুর গড়ের মৃত্তিকামিশ্রিত বালুকারাশির তুল্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ঐ মৃত্তিকা ও বালুকারাশিতে জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

এই বনভূমির অবস্থান সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ ও বাম ভাগস্থ ভূমি অতিশয় নিম্ন। পূর্বদিকস্থ গহ্বরশ্রেণি উত্তরে গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গিরিমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উভয় গিরিমালার উৎপত্তি ও অবস্থান মধুপুর গড়েরই অনুরূপ সন্দেহ নাই।

এই গহ্বরশ্রেণির উত্তরাংশে শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং এই নিম্ন ভূমির সমুদয় অংশই মেঘনাদ অথবা উহার শাখানদী ও উপনদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মিঃ হুকার, শ্রীহট্ট অঞ্চল পরিভ্রমণকালে, বায়ুমানযন্ত্র সহযোগে উক্ত ঝিলগুলির উচ্চতা নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি হইতে ঐ ঝিলস্থ জলরাশির উচ্চতা অতি সামান্য মাত্র অধিক বলিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুপুর গড়ের পশ্চিমদিকস্থ গহ্বর শ্রেণির উচ্চতা সম্বন্ধে মেজর রেনেলও উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্তন সংঘটিত হইলে ঢাকা জেলাস্থ উক্ত গহ্বরশ্রেণির বিশেষ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। ফলে উহা অনেক উচ্চতা লাভ করিয়াছিল। আইরল বিল, জমসা, ধামরাই ও জলপুরার নিম্ন ভূমি এবং চৌহাট ঝিল মধ্যে অদ্যাপি গহ্বরশ্রেণির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মধুপুর বন নিরবচ্ছিন্ন শৈলমালা সমাকীর্ণ নহে, অথবা উচ্চভূমির নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলের ন্যায়, মৃত্তিকার স্তূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে; মধ্যে মধ্যে গহ্বরসমূহ ও ঝিলরাশি বিদ্যমান থাকিয়া এই উচ্চ বনভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনীষীবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে।

ফার্গুসন ও ব্ল্যানফোর্ডের সিদ্ধান্ত[৩] :

মধুপুর বনাঞ্চলস্থিত ভূমির এতাদৃশ উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান জন্য অনেক মনীষীবর্গই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। মধুপুর বনভূমির উচ্চতা নিবন্ধনই ঢাকার উত্তরদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু, শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের নিম্নতাও উহার প্রবাহ-পরিবর্তনের কারণ হইতে পারে। ব-দ্বীপের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ও তাহার বিশ্লেষণ করিলে উক্ত মতই অধিকতর সমীচিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার প্রকৃতির যে অননুলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীনে নদ-নদীগুলি স্রোতবাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা ভরাট হইতেছে এবং পুনরায় ঐ ভরাট স্থান দিয়াই অভিনব পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহার আলোচনা করিলে উপরোক্ত দুইটি সিদ্ধান্তের কোনও একটিতেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

এই বনভূমির উত্তর-পশ্চিমদিকস্থ স্থানসমূহ, ব্রহ্মপুত্রের বর্তমান উপত্যকা অথবা শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের সন্নিকটবর্তী উহার প্রাচীন উপত্যকাভূমি হইতে অনেক উচ্চ। সুতরাং মধুপুর অঞ্চল এবম্বিধ উন্নতাবস্থায় পরিণত হইবার পরেই তৎসন্নিহিত ভূমির পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এসম্বন্ধে মিঃ ব্ল্যানফোর্ড যে তিনটি অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১ম। নৈসর্গিক কারণে উন্নতাবস্থা প্রাপ্তি[৪]।

২য়। সমীপবর্তী কতক স্থানসমূহের নিম্নতা[৫]।

৩য়। ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত অপর কোনও স্রোতস্বতীর প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইয়া উচ্চতা প্রাপ্তি[৬]।

উপরোক্ত তিনটি অনুমান মধ্যে মিঃ ব্ল্যানফোর্ড শেষোক্তটি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, "গঙ্গার শাখা নদীসমূহের নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শ্রীহট্টস্থ নদ-নদীসমূহ স্রোতের সহিত অতি অল্প পরিমাণেই পলিমাটি বহন করিয়া আনয়ন করে। সুতরাং ঐ সমুদয় নদী কর্তৃক পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া মধুপুর অঞ্চলের

এবম্বিধ উচ্চতা প্রাপ্তি একপ্রকার অসম্ভব।" মিঃ ব্ল্যানফোর্ডের মতে ভূকম্প অথবা এতৎসাদৃশ অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণ সমবায়েই এই স্থান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে'।[৭] "নিম্নবঙ্গ ও আসাম প্রদেশসমূহেই ভূ-কম্পের মাত্রা কিছু অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের আসামস্থিত উপত্যকা ও শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের নিম্নতাপ্রাপ্তি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেই সংঘটিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ভূকম্পের ফলে আসাম ও শ্রীহট্ট প্রদেশের কতকাংশ ভূমি নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে ইহা স্বীকার করা গেলেও ঢাকার উত্তরাংশস্থিত ভূমিও যে এই কারণেই উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না"।[৮]

"মধুপুর অঞ্চলের অবস্থান এবং উহার প্রাকৃতিক পরিবর্তনাদির বিষয় পর্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, আংশিক উন্নতানত অবস্থা গঠন ও ক্ষয়নীতি অনুসারেই সংঘটিত হইয়াছে। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভীষণ ভূ-কম্পনে কচ্ছ প্রদেশের পশ্চিমাংশস্থিত কতক স্থানের স্ফীত এবং তৎপার্শ্ববর্তী অপরাংশের নিম্নতা প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।"[৯]

ব্ল্যানফোর্ডের সিদ্ধান্ত আমাদিগের নিকটে সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধুপুর অঞ্চল নিরবচ্ছিন্ন শৈলমালা সমাকীর্ণ নহে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উচ্চ মৃত্তিকাস্তুপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রথম স্তরস্থিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার নীচেই লাল বালুকারাশি পরিলক্ষিত হয়। কূপ খনন করিয়া বিভিন্ন মৃৎস্তরের বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে উহা কোনও কালে বিপর্যস্ত হয় নাই।

নদীবাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারাই প্রথমত এই স্থান উন্নত হইয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে ক্রমশ নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে নদীস্রোত যুগযুগান্তক্রমে ইহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, প্রবল স্রোতবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এতদঞ্চল উন্নতানত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রক্তবর্ণ মৃৎস্তরের সমাবেশ পরিলক্ষিত হওয়ায় মনে হয়, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে নদীর স্রোতবাহিত যে পলিমাটি এখানে সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা তাহারই শেষ নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে যে নিয়মে বঙ্গদেশ নদী মেখলায় পরিবেষ্টিত আছে তৎকালে ইহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ছিল। বস্তুত সেই সময়ে নদ-নদীসমূহ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মাধীনেই প্রবাহিত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তরবস্থিত শাখানদীসমূহ মধুপুর বনভূমি বিদীর্ণ করিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইত। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ও গাড়ো পর্বতের অবস্থানের বিশেষত্বহেতু নদীপ্রবাহ এতদঞ্চল কর্তন করিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে মধুপুর অঞ্চলস্থিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকারাশি সুর্মা, মেঘনাদ ও গঙ্গার স্রোতোবাহিত মৃত্তিকা রাশি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং সমুদয় বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে ব্ল্যানফোর্ডের উপেক্ষিত তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচিন বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহোদয় মধুপুরের বনভূমি পরীক্ষা করিয়া এইখানে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থান অনুসন্ধান ও পরিদর্শন জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক একজন রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিও সেন মহাশয়ের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই বনভূমি "গড়গজালি" বলিয়া সুপরিচিত। এই গড়ের গজারি বৃক্ষ দ্বারা ঘরের খাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। জ্বালানিকাষ্ঠ রূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে এতদঞ্চলে হাতির খেদা প্রস্তুত হইত এবং তাহাতে অনেক বন্য হস্তী ধৃত হইত। বর্তমান সময়ে এই সুবৃহৎ বনভূমি হইতে হস্তী একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হিংস্রজন্তুরও তেমন প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

পরগনা ও তপ্পা, থানা, ফাঁড়িথানা, রেজেস্ট্রি অফিস, গ্রাম, মহকুমা প্রভৃতি

পরগনা :

আগলা, আদিমবাদ, আটিয়া, ঔরঙ্গাবাদ, আজিমপুর বনগাও, বাগমারা কাশিমপুর, বহর, বৈকুণ্ঠপুর, বলৌর, বলরামপুর, বন্দরখোলা, বন্দর একরামপুর, বাঙ্গরা, বরদাখাত, বড়বাজু, ভবানীপুর, ভাওয়াল, বিরোল, বিক্রমপুর, বিরমোহন, বোয়ালিয়া, চান্দপ্রতাপ, চন্দ্রদ্বীপ, চরহাই, চুনাখালি, দক্ষিণ শাহাবাজপুর, দক্ষিণ শাহাপুর, দোহার, দুর্গাপুর, ফতেজঙ্গপুর, ফতুল্লাপুর, গঞ্জ শাখরাবাদ, গির্দবন্দর, গোবিন্দপুর, গুণানন্দি, হবিবপুর, হাসনাবাদ, হাসারা, হজরৎপুর, ইব্রাহিমপুর, ইদগা, ইদিলপুর, ইস্রাকপুর, একরামপুর, এনায়েৎপুর, এনায়েৎনগর, ইশাখাবাদ, ইসলামপুর, জাফরউজিয়াল, জাহানাবাদ, জাহাঙ্গীরনগর, জোয়ানশাহী, কার্তিকপুর, সুজাবাদ, কাশিমনগর, কাশিমপুর, কাশিমপুর কল্যাণশ্রী, কাশিমপুর শাসন বাসন, কাশীপুর, কাটারমুলিয়া, খলিলাবাদ, খাঞ্জাবাহাদুরনগর, খানপুর, খড়গপুর, খিজিরপুর, কোসা, মাদারিপুর, মহিয়াদিপুর, মজিদপুর, মাজুমপুর, মকসুদপুর, মিরকপুর শাহবন্দর, মোবারকউজিয়াল, মহবৎপুর মকিপুর, মুকুন্দিয়াচর, মকিমাবাদ, নরসিংহপুর, নসরৎশাহী, নয়াবাদ, তালিপাবাদ, নুরুল্লাপুর, পাটপাসার, পুখুরিয়া পুরচণ্ডী, রায়নন্দলালপুর, রায়পুর, রাজনগর, রামপুর, রামপুরনয়াবাদ, রামপুর শ্যামপুর, রপ্তাপ, রসিদপুর, রসুলপুর, রোকন্দপুর, সাহেবাবাদ, সৈয়দপুর, সাজাপুর, সালেশ্বরী, সলিমপ্রতাপসদরপুর, সরাইল, সতরখণ্ড, শাহাবন্দর, সাউজিয়াল, সাজাদপুরতিল্লি, শিবপুর, শিবপুর শ্যামপুর, সিন্দুরি, সিঙ্গের, সোনারগাঁও, সুজাবাদ কুতুবপুর, সুজাপুর সাজাপুর, সুলতান প্রতাপ, সুলতানপুর, শ্যামপুর, তালিপাবাদ, তেলিহাটি, উত্তর শাহপুর, ইয়ারপুর।

তপ্পা :

আখরা কণাকোপা, আলিপুর, অম্বরপুর, আমিরাবাদ ; আমিরপুর, আওলিয়ানগর, ঔরঙ্গাবাদ, বাকীপুর, বলরামপুর, বারৈকান্দী, ভবানীনগর, বিরমোহন, দানিস্তানগর, দৌলতপুর, দিয়ানৎপুর, গোবিন্দপুর, গোপালপুর, হায়দরাবাদ, হাজিখানপুর, হাজিপুর গোপালপুর, হকিয়ৎপুর, হাসনাবাদ, হাবেলীজাহানাবাদ, হাবেলী মামুদপুর, হাবেলী, ইরাদাৎপুর, ইছাপুর, ইতবারনগর, জাফরনগর, কলমা, কামরাপুর, কাষ্টসাগরা, কাটারব, খলসী, খুর্দধামরাই, কুড়িখাই, মহেশ্বরদি, মুকসদপুর, বাহাদুরপুর, মীরাকপুর, মির্জাপুর, নন্দলালপুর, নারান্দিয়া, নাজিরপুর, নিখলি, পাচভাগ, বারিল, রাধাকান্তপুরখুর্দ, রায়পুর, রামকৃষ্ণপুর, রণভাওয়াল, রসুলপুর, সফিপুরখুর্দ, সাকিয়ার্দিপুর, সাখিলি, সাফরিদনগর, সায়েস্তানগর, সরিফপুর, সিংড়া, শ্রীধরপুর, সুজানগর, সুজাপুর, তৈলপুর, তায়েবনগর।

মহকুমা, থানা, গ্রাম প্রভৃতি :

ঢাকা জেলায় সর্বশুদ্ধ ৮৬৯৫ থানা গ্রাম ও নগর আছে। সদর মহকুমা ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ,

মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এই তিনটি মহকুমা লইয়া ঢাকা জেলা গঠিত। থানার সংখ্যা ১৩টি, ফাড়ি থানা ৮টি এবং রেজেস্ট্রি অফিস ১৩টি।

থানা :

সদর মহকুমা—সদর কোতয়ালী, কেরাণীগঞ্জ, কাপাসীয়া, সাভার, নবাবগঞ্জ।
নারায়ণগঞ্জ মহকুমা—নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ, রায়পুরা।
মুন্সিগঞ্জ মহকুমা—মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর. লৌহজঙ্গ।
মানিকগঞ্জ মহকুমা—ঘিয়র, হরিরামপুর।

ফাড়ি থানা :

সদর—কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর।
নারায়ণগঞ্জ—নরসিংদি, মনোহরদি, কালীগঞ্জ।
মুন্সিগঞ্জ—রাজাবাড়ি, লৌহজঙ্গ।
মানিকগঞ্জ—শিয়ালো, আরিচা।

রেজেস্ট্রি অফিস :

সদর—সদর, কালীগঞ্জ, সাভার, জয়কৃষ্ণপুর।
নারায়ণগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জ, রায়পুরা।
মুন্সিগঞ্জ—মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর. লৌহজঙ্গ, রাজাবাড়ি।
মানিকগঞ্জ—মাণিকগঞ্জ, ঘিয়র, হরিরামপুর।

গ্রাম :

কোতালী থানায় ১৫ থানা—ঢাকা, ব্রাহ্মণচিরাণ, চৌধুরিবাজার, রায়ের বাজার, কালুনগর, মধুপুর, সোনাটেঙ্গর, চরকঘাটা, রাজমুসুরী, বিবিরবাজার, সুলতানগঞ্জ, সুরাইজাফরাবাদ, উত্তরবাজার প্রভৃতি।
কেরাণীগঞ্জ থানায় ১০৬৪ থানা—কেরাণীগঞ্জ, সুভড্যা, তেঘরিয়া, বরিশুর, কুণ্ডা, পশ্চিমদী, রোহিতপুর, পাইনা, শাক্তো, কলাতয়া, মীরপুর, মান্দাইল, আটি, পানিয়া, নাজিরপুর, মদনমোহনপুর, শীয়ালী, বেলনা, শুভানীপুর, নয়াবাড়ি, বাগাশুর, সুন্দিয়া, শ্রীধনপুর, নোয়াদ্দা, পীৎপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, দৌলেশ্বর, বিয়ারা, ডেমরা, মাতাইল, কুর্মীটোলা, টঙ্গী, বোয়ালী, গাছা, জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর, পূবাইল, দক্ষিণখাঁ, ধীরাশ্রম, হাইদ্রাবাদ, খাইলকুড়ি প্রভৃতি।
কাপাসীয়া থানায় ৮৫৪ থানা—কাপাসীয়া, করিহাতা, সিঙ্গারদিঘী, লাখপুর, মামুদপুর, পারলীয়া. কালীগঞ্জ, ব্রাহ্মণগাঁও, বলধা, ঘাগটিয়া, বর্মি, শ্রীপুর, উলুসারা, ধনদিয়া, কাওরাইদ, টোকচাদপুর, ঘোড়াশাল, জাঙ্গালিয়া, বক্তারপুর, গোসিঙ্গা, খোদাদিয়া, সম্মানিয়া, টোকনগর, রাথুরা, কান্দনীয়া, একডালা, ধলজুরি, বালিগাঁও, বরাব, চরসিন্দুর প্রভৃতি।
নবাবগঞ্জ থানায় ৩৬৫ থানা—নবাবগঞ্জ, আগলা, মাসাইল, হরিশকুল, গোবিন্দপুর, দোহার, নারিসা, মুকসুদপুর, কালীকাপুর, দেবীনগর, কাওনিয়াকান্দা, মামুদপুর, মৈনট, হোসেনাবাদ, কলাকোপা, নয়াবাড়ি, জয়কৃষ্ণপুর, দাউদপুর, বান্দুরা, শ্রীরামপুর, অন্ধরকোটা, বিনোদপুর, কুসুমহাটি, পল্লামগঞ্জ, নবগ্রাম, শিকারিপাড়া, বক্সনগর, চূড়াইন, গালিমপুর, যন্ত্রাইল, জয়পাড়া, খুলিয়ারা, নয়ানশ্রী, বাহ্রা, সোল্লা, সুতারপাড়া, মাতাবপুর, সুরলিয়া প্রভৃতি।
সাভার থানায় ১১৯৯ থানা—সাভার, রাজফুলবাড়িয়া, তেতুলঝোড়া, সুঙ্গর, রোয়াইল, অলকদিয়া, রঘুনাথপুর, কেস্তি, সুয়াপুর, নাম্নার ভাকুরতা, বালিশুর, শুশুরা, কাটিগ্রাম, আমতা, চৌহাট্, যাদবপুর, বলিয়াদি, গজারিয়া গোসত্র, গোয়ালচালা, কালিয়াকৈর, শ্রীফলতলি, আশুলিয়া, সিমুলিয়া, কাশিমপুর, বাইগনবাড়ি, বিরুলিয়া, বনগাঁও, ধামরাই, দেবতার পটি,

কাজিপুর, কাহেতপাড়া, গণকবাড়ি, রাঙ্গামাটিয়া, ফিরিঙ্গিপাড়া, নলুয়া, ঢালজোড়া, দেওয়াইর, উল্টাপাড়া প্রভৃতি।

নারায়ণগঞ্জ থানায় ৭৬৩ থানা—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্লা, নবীগঞ্জ বা কদমরসুল, হরিহরপুর, গন্ধর্বপুর, তারবো, আমিনপুর, লাঙ্গলবন্ধ, বৈদ্যেরবাজার, বারপাড়া, আটি, বারদি, লক্ষ্মীবারদি, মুড়াপাড়া, রুকসি, ধুপতারা, বানিয়াপাড়া, দমদমা, মোগড়াপাড়া, কাইকারটেক, পানাম, আজিমপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, ধামগড়, পঞ্চমীঘাট, হোসনপুর, হাড়িয়া, গাবতলী, যাত্রাবাড়ি, কাচপুর, টাইটকা, ভেকৈর, জালকুড়ি, গোদ্‌নাইল, ধর্মগঞ্জ, হরিহরপাড়া, গোপালনগর, গোপচর, দেওভোগ, বন্দর, কুড়িপাড়া, সম্মানদি, সোনাকান্দা, গাবতলি প্রভৃতি।

রূপগঞ্জ থানায় ৯৮৪ থানা—রূপগঞ্জ, মাঝিনা, নোয়াগাও, সাবাসপুর, পিতলগঞ্জ, পসি, ব্রাহ্মণকীর্তি, বিরাব, আড়াইহাজার, মনোহরদি, সুলতানশাহাদী, পাচদোনা, শিলমন্দি, নরসিংদি, নজরপুর, হোসেনহাটা, দাসপাড়া, কাঞ্চনজোয়ার, নওগাও, দামোদরদি, ডাঙ্গা, মাধবদী, ভাটপাড়া, চম্পকনগর, সাটিরপাড়া, রামচন্দ্রদী, সদাসরদি, আলগী, নগরদৈকাদী, মনোহরপুর, রসুলপুর, খিদিরপুর, তুলসীপুর, নাগরী, গোতিয়াব, মুড়াপাড়া, বরুণা, গোলাকান্দাইল, মাওলা, ভোলাব, মুরাদনগর, পাচরুখী, ধুপতারা, পাচগাও, সিলমানদী, চিনিসপুর, কান্দাপাড়া প্রভৃতি।

রায়পুরা থানায় ৮১৬ থানা—রায়পুরা, আমিরাব, রামনগর, মামুদাবাদ, বেলাব, গোতাসিয়া, চালাকচর, নরেন্দ্রপুর, সিমুলিয়া, একদোয়ারিয়া, লাখপুর, জয়নগর, পুঠিয়া, চক্রধা, শিবপুর, হোসেনপুর, বোয়ালমারা, রামপুরহাট, কসবা, নয়াবাদ, বাজনাব, ব্রাহ্মণদী, মনোহরদি, রসুলপুর, রহিনারায়ণপুর, আলিনগর, পাচকান্দি, পালপাড়া, কুমড়াদি, পুরন্দী, শঙ্করদি, দুলালপুর, আলিপুর, জামালপুর, কাচিকাটা, কালিয়াকুর, মজলিসপুর, মাছিমপুর, সাধারচর, খড়িয়া, ডৌকেরচর, বাইয়াকান্দি, আমিরগঞ্জ, বাহেরচর, রামনগর, মহেশপুর, পলাশতলি, হাসিমপুর, নারায়ণপুর প্রভৃতি।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ৫৩৫ থানা—মুন্সিগঞ্জ, পঞ্চসার, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গীবাজার, মীরকাদিম, রামপাল, বেতকা, পাইকপাড়া, কৈচাল, আউটশাহী, সোনারং, ব্রজযোগিনী, কেওর, সিলিমপুর, বালিগাও, পুড়াপাড়া, কুড়মিড়া, আড়িয়ল, সিমুলিয়া, রাউতভোগ, যশোলঙ্গ, বাঘিয়া, কলমা, বাসিরা, পাচগাও, ভরাকৈর, স্বর্ণগ্রাম, মুলচর, তেলিরবাগ, বহর, সাওগাও, টঙ্গীবাড়ি, কাঠাদিয়া, মিতারা, বানরী, বিদগাও, চাচুরতলা, রাজাবাড়ি, বাহেরেক, বাহেরপাড়া, গুণগাও প্রভৃতি।

শ্রীনগর থানায় ৪৭৭ থানা—শ্রীনগর, রাজানগর, ষোলঘর, হাসারা, শেখরনগর, কুমারভোগ, সেরাজদিঘা, কোলা, ভাগ্যকুল, পাওলদিয়া, মালখানগর, ফেগুনাসার, বয়রাগাদী, কুকুটিয়া, তালতলা, তন্তর, মেদিনীমণ্ডল, কাজিরপাগলা, কোরহাটি, হলদিয়া, তেওটিয়া, ব্রাহ্মণগাঁও, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, কনকসার, বেজগাও, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি।

মানিকগঞ্জ থানায় ৭২২ থানা—পয়লা, তিল্লি, বেতিলা, শাস্কা, ধানকোড়া, সাতুরিয়া, চামটা, গরকুল, দরগ্রাম, আটিগ্রাম, জাগির, চান্দর, ললিতগঞ্জ, মত্ত, দাসোরা, নবগ্রাম, উথলি, ধুল্লা, মিতারা, হাতিপাড়া, বালিয়াটি, শিঙ্গাইর, জয়মণ্টপ, বলধারা, বায়রা, বানিয়ারা, শিমুলিয়া, ছনকা, বঙ্খরা প্রভৃতি।

হরিরামপুর থানায় ৩৩৮ থানা—বল্লা, ঝিটকা, রাজখাড়া, খাড়াকান্দী, গালা, ভুবনপুর, মানিকগর, হরিহরদিয়া, লটাখোলা, গোপীনাথপুর, উজানকান্দী, মালুচী, বালিয়াকান্দী, বাহাদুরপুর, আধারমানিক, মৃজানগর, পাটগ্রাম, গঙ্গারামপুর, সুতালড়ি, আজিমনগর, লক্ষ্মীকুল, কাজিকান্দা, ইব্রাহিমপুর, লেছরাগঞ্জ, ভাটিকান্দি, কাঞ্চনপুর, কালিকাপুর।

ঘিয়র থানায় ৫৯০ থানা—বরটিয়া, জিওনপুর, খলসী, চকমিরপুর, দৌলতপুর, আশাপুর, বানিয়াজুরি, ঘিয়র, শ্রীবাড়ি, মহাদেবপুর, বাসুদেববাড়ি, ঠাকুরকান্দী, নীলুয়া, রামচন্দ্রপুর,

টেপ্রি, শিবালয়, আরিচা, ইলিচপুর, তরা, বুতুনী, ধুসুর, শিবালয়, আরিচা, দাসকান্দী, বাউলকান্দী, মরিচা, আরাইবাড়ি, ঝাটপাল, তেওতা, নালি প্রভৃতি।

মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জেলার শাসনকার্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐ সনেরই মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। তৎকালে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জেলার অধীন এবং মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত পালঙ্গ ৪৫৮ থানা গ্রাম ঢাকা জেলার সামিল ছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আটিয়া থানা এই জেলা হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অধীন হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার কার্যভার চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

কৃষি
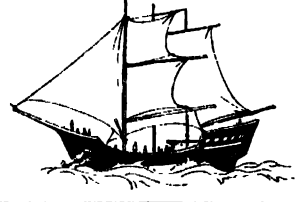
মৃত্তিকার অবস্থা ও রকম :

এই জেলার মৃত্তিকা সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) পাহাড়িয়া বা আঠালিয়া, (২) দোয়াসা (ঝিল সমূহের মৃত্তিকা এই শ্রেণিভুক্ত), (৩) চরা।

আঠালিয়া মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে ; কিন্তু তুলা, ইক্ষু ও পাট প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে এই মাটিই সুপ্রশস্ত। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় ফসল আঠালিয়া মাটিতেই ভাল জন্মে।

দোয়াসা বা বিলের মাটি ধান্য, খেসারি ও মটর প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী।

পদ্মা ও যমুনার দিয়ারা চরা জমি অপেক্ষা মেঘনাদের চরা জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশি।

অবস্থাভেদে উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের জমি আবার চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :

(১) **ভিটিজমি**—ইহাতে বাড়ি-ঘর প্রভৃতি নির্মিত হইয়া থাকে।

(২) **নালজমি**—এই জমি চাষবাসের উপযোগী। নালজমি চতুর্বিধ যথা :

- (ক) বর্ষার—নিম্নভূমি ; ইহাতে আমন ধান্য জন্মে।
- (খ) খামা—অপেক্ষাকৃত উচ্চ। খাসাধান্য এই জমিতে উৎপন্ন হয়।
- (গ) ততি—এই জমিতে দুই হাত বা আড়াই হাত পরিমিত জল ওঠে। আশ্বিনি, কিরণ ও বজল ধান্য এই জমিতে উৎপন্ন হয়।
- (ঘ) সালি—উচ্চভূমি। রোয়াধান্য উৎপাদনের উপযোগী।

(৩) **আউসজমি**—এই জমি দ্বিবিধ, যথা :

- (ক) রোয়া—নালজমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই জমি আউস ধান্য উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত।
- (খ) বুনা—নদীতটস্থ বালুকাময় উচ্চ ভূমি। এই জমিতেও আউস ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৪) **বোরোজমি**—এই জমি ত্রিবিধ, যথা :

- (ক) ঝিল অথবা মধুপুর বনান্তর্গত পার্বত্য নদীর কিনারার জমি এই শ্রেণিভুক্ত। ইহা বোরো ধান্য উৎপাদনের উপযোগী।
- (খ) যে নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় এরূপ নদীর কিনারার জমি এই পর্যায়ভুক্ত।
- (গ) লেপি—কর্দমময় চরা জমি। এই জমিতে লাঙ্গল দিতে হয় না, শুধু লেপি করিয়া ধান্য বপন করিতে হয়।

এই জেলায় মোট ২৭৮২ বর্গমাইল জমি। তন্মধ্যে—

আবাদি	...	...	...	১৪৩২	বর্গমাইল
বাগাবাগি চা	...	...	...	৩০০	বর্গমাইল
রাস্তাঘাট	...	...	...	১০০	বর্গমাইল

জলেডুবা	...	...	...	২০০	বর্গমাইল
আবাদের যোগ্য পতিত	...	...	...	৫০০	বর্গমাইল
অনাবাদী	...	...	...	২৫০	বর্গমাইল
				২৭৮২	বর্গমাইল

কৃষিজ দ্রব্য

ধান্য—ধান্যের চাষ এই জেলায় প্রায় সর্বত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে এই ফসলের প্রায় তৃতীয়াংশই আউস ও বোরো জাতীয়। আমন, আউস ও বোরো ভেদে ধান্য ত্রিবিধ।

(১) **আমন**—আমন ধান্য দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা : বুনা ও রোয়া।

(ক) বুনা—রায়েন্দা, বাওয়া, খামা ও সাধারণ এই চতুর্বিধ প্রকারের বুনা ধান্য জন্মে। অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকায় এবং যে জমিতে বর্ষার জল ৬/৭ ফুট পর্যন্ত উঠে, এরূপ স্থানে, এই জাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। আইরল বিল, জমসার চক. জয়পুরার চক, সালদহ, পুবাইলের বিল, লবণদহ, পারজোয়ারের বিল ও শ্যামপুরের চক প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান্যের ডাটও সেই পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাকে। এই জাতীয় ধান্যের ডাট ২০ ফুট পর্যন্তও লম্বা হয়। ধান্য কর্তিত হইলে ডাটের নিম্ন ভাগ নাড়ারূপে ব্যবহৃত হয়।

রায়েন্দা ও বাওয়া ধান্য মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে উপ্ত হয়, কিন্তু অপর জাতীয় আমন ধান্যের ন্যায় উহাও অগ্রহায়ণ পৌষ মাসেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(খ) রোয়া—সাইল ও সাধারণ রোয়া ভেদে এই জাতীয় ধান্য দ্বিবিধ। খুব কঠিন মৃত্তিকায় এবং যে জমিতে বর্ষাকালে প্রায় এক ফুট পরিমাণ জল উঠিয়া থাকে, তথায় ইহা উৎপন্ন হয়। মধুপুর অঞ্চলের নিম্নভূমিতে এবং আইরলখা নদীতীরে এই ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ও এই জাতীয় ধান্য কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) **আউস**—আউস ধান্য দ্বিবিধ, সাধারণ ও লেপি।

(ক) সাধারণ—ভেসলান, বোয়াইলা, সাইতা, সূর্যমণি প্রভৃতি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। বালুকাময় উচ্চভূমিই এই জাতীয় ধান্যের উৎপত্তি স্থান। মেঘনাদ, যবুনা ও ধলেশ্বরী উচ্চ তীরভূমিতে এবং মধুপুর বনান্তর্গত ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। বোয়াইলা ও সাইতা বালুকাময় ভূমিতে দুই ফুটের অধিক জল উঠিয়া থাকে ,তথায় ইহা জন্মে না। আউস ধান্যের জমিতে পাটের চাষ ভাল হয় বলিয়া পাটের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধান্যের চাষ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। আউস ধান্যই কৃষিজীবির প্রাণস্বরূপ, সুতরাং ইহার চাষ কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদিগকেও ধান্য ক্রয় করিতে হইতেছে। মাঘ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম সময় পর্যন্ত ইহার রপনকার্য চলিতে পারে। আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্যন্ত এই ধান্য কাটিবার সময়। মেঘনাদের চরা জমিতে মাঘ মাসেই ইহার বপনকার্য আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু মাণিকগঞ্জের উত্তরাংশে ইহা বৈশাখ মাসেও উপ্ত হয়। এই জাতীয় ধান্যের 'নিড়ানি' বড়ই কঠিন।

(খ) লেপি—পলিপড়া নতুন চরা জমিতে এই ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদ্মার কোনও কোনও চরে সাইতা ধান্য প্রচুর জন্মে।

(৩) **বোরো**—এই ধান্যও সাধারণ ও লেপিভেদে দ্বিবিধ।

(ক) সাধারণ—রায়পুরা থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে, মেঘনাদের তীরবর্তী প্রদেশে, মীরপুর ও কালিয়াকৈর প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসাল জমিই এই জাতীয় ধান্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(খ) লেপি—নতুন জমিতে এই ধান্য জন্মিয়া থাকে। কালিয়াকৈর ও পদ্মার চরা জমিতে

ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। মধুপুর অঞ্চলের বিলে ও পয়োনালির খাতে, মেঘনাদের চরা জমিতে ও উহার তীরবর্তী স্থানসমূহে, এবং পদ্মার কোনও কোনও চরে ইহা জন্মিয়া থাকে। যে কর্দমময় মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে তথায় এই ধান্য ভাল জন্মে। কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহেই চারা জন্মাইতে হয় এবং পৌষ মাসে এই চারা রোয়া হইয়া থাকে। সাইতা ধান্যের ন্যায় এই ধান্যও বৈশাখ মাসেই কর্তিত হয়।

বোরো ধান্যের জমিতে "দোন" লাগাইয়া সময়ে সময়ে জল সেচন করা আবশ্যাক হয়। মীরপুর অঞ্চলের কৃষকগণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এই প্রকারে জল সেচন করিয়া থাকে।

বোরোধান্য উৎপাদনের ব্যয় কম, অথচ ফসলও বেশি উৎপন্ন হয়।

প্রতি বিঘায় আমন ধান্য ৩ মণ হইতে ১০ মণ, আউস ধান্য ৪ মণ হইতে ৬ মণ, এবং বোরো ধান্য ৪ মণ হইতে ১২ মণ পর্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

এই জেলাতে আমন এবং আউস এই উভয়বিধ ধান্যই একই জমিতে একত্র বপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রথার একটি সুবিধা এই যে, যদি কোনও কারণে একটি ফসল নষ্ট হয় তবে অপরটি দ্বারা তাহা পূরণ হইতে পারে। ভাল জন্মিলে সম্বৎসরে দুইটি ফসলই পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই দুইটি ফসল উৎপাদন করিলে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

পাট—পশ্চিম লাক্ষ্যানদী এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের নিম্নাংশ, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব ও দক্ষিণে মেঘনাদ, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান মধ্যে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। বিক্রমপুরের বিলে এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলেও কম পাট জন্মে না। সাতুরিয়ার পূর্বদিকস্থ সমতল ক্ষেত্রে, মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমিতে, এবং মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। হরিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও শ্রীনগর থানায় এবং সাভারের উত্তর পশ্চিমাংশে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে। মেঘনাদের চরা জমিতে উৎপন্ন পাটই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, জাফরগঞ্জ, ঘিয়র, সাতুরা, বায়রা, কেরাণীগঞ্জ, পাইনা, কালীগঞ্জ, লাখপুর, তালতলা, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পাট কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে।

কোন্ সময় হইতে এই জেলায় পাটের চাষ প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত রূপে অবধারণ করা যায় না। শত বৎসর বয়স্ক প্রাচীন কৃষকের মুখেও শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহার বাল্যকাল হইতেই ইহার চাষ দেখিয়া আসিতেছে। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তুলার চাষ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলেই, এই অভিনব কৃষিশিল্পের দিকে কৃষকদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রতিমণ পাট আট আনার অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত না।[১] পশ্চিমঢাকায় এই চাষের প্রবর্তন অনেক পরে হইয়াছিল। তথায় কুসুমফুলের চাষ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সূচনা হয়।

উৎপন্নের হার এই জেলার সর্বত্র সমান নহে। কোন্ অঞ্চলে কত মণ পাট প্রতি বিঘায় জন্মিয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

ব্রহ্মপুত্রের চরাজমিতে	প্রতি বিঘায়	৫	মন হইতে	১০	মণ পর্যন্ত জন্মে
মেঘনাদের চরাজমিতে	প্রতি বিঘায়	৪	মন হইতে	৭	মণ পর্যন্ত জন্মে
মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে	প্রতি বিঘায়	৪	মন হইতে	৬	মণ পর্যন্ত জন্মে
মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে	প্রতি বিঘায়	৩	মন হইতে	৬	মণ পর্যন্ত জন্মে
মধুপুরের উচ্চভূমিতে	প্রতি বিঘায়	৬	মন হইতে	৭	মণ পর্যন্ত জন্মে

কি উচ্চভূমি কি দিয়ারা চর সর্বত্রই পাট হইতে পারে। যে ভূমিতে ৪ ফুট পর্যন্ত জল উঠিয়া থাকে তথায়ও পাট জন্মিবার পক্ষে বাধা ঘটে না। যে দোয়াসা মৃত্তিকায় উপচিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে তথায় ইহা ভাল জন্মে। কিন্তু সকল প্রকারের মৃত্তিকাতেই পাট জন্মিতে পারে।

আড়িয়ল খা নদী তীরবর্তী প্রদেশসমূহে, বৎসরের প্রথমভাগে পাট উঠিয়া গেলে, ঐ জমিতে পুনরায় আমন ধান্য বপন করা হয়।

পাটের সার :

মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমিতে এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরবর্তী প্রদেশ সমূহে গোময় ভস্ম দ্বারা জমিতে সার দেওয়া হয়। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ গ্রাম সমূহে সার দেওয়ার প্রণালি অন্যপ্রকার। তথায় জমিতে প্রথমত কলাই উৎপাদন করিয়া পরে উহা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত হয়। বর্ষার জলপ্লাবনে যে ভূমিতে পলিমাটি পড়ে তথায় সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

মেঘনাদের চরা জমিতে ফাল্গুন মাসেই বীজ বপন করা হয়। কারণ ঐ সমুদয় স্থান বর্ষাকালে জলমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু মধুপুরের উচ্চভূমিতে বৈশাখ মাসেও উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

উড়চুঙ্গা এবং ছেঙ্গা পোকা পাটের অনিষ্ট সাধন করে। কৃষকগণকে এজন্য সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

প্রতি বিঘা ২$\frac{১}{৪}$ সের বীজ বপন করিলে বিঘা প্রতি ৫ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই জেলায় চতুর্বিধ প্রকারের পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। (১) করিমগঞ্জী, (২) ভাওয়ালি (৩) বাকরা বাদী (৪) ভাটিয়াল।

আঁশ, বর্ণ ও দৈর্ঘ্য হিসাবে করিমগঞ্জী পাটই সর্বোৎকৃষ্ট। দৈর্ঘ্যে ভাওয়ালী পাটও কম লম্বা হয় না, কিন্তু অন্যান্য হিসাবে ইহা অপকৃষ্ট। ভাটিয়াল পাট সাধারণত আমিরাবাদ পরগনাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থিরজলে ধৌত করা হয় বলিয়া ইহার আঁশ নরম হয়, এবং বর্ণের উজ্জ্বলতাও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। দৈর্ঘ্যে ভাটিয়াল পাট কম বড় হয় না। বাকরাবাদী পাটের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল ; কারণ ইহাতে উদ্ভিজ্জ তৈল অধিক মাত্রায় থাকে। ইহার আঁশগুলিও খুব শক্ত।

এতদ্ব্যতীত মেস্তা, মিছট, বিদাসুন্দী, মিথি, নালিয়া (বা নালিতা) রজত প্রভৃতি অপকৃষ্ট পাটও জন্মিয়া থাকে।

বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে উপরোক্ত সর্ববিধ পাটগুলিকেই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :

(১) ধলসুন্দর—ইহার রং ঈষৎ সবুজ বর্ণ। এই জাতীয় পাটই এই জেলায় অধিক জন্মে।

(২) লাল—ইহার ডাট ও পাতাগুলি রক্তিমাভ।

এই পাট অপেক্ষাকৃত কম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জেলার পূর্বাংশে পাটকে নালিয়া বা নালিতা বলে, কিন্তু পশ্চিমাংশে উহা পাট বলিয়াই অভিহিত হয়। পাটের আঁশ, পাট অথবা কোষ্ঠা বলিয়াই জেলার সর্বত্র পরিচিত।

তুলা :

পূর্বে ঢাকা জেলায়, বিশেষত ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদ-নদীর প্রাচীন খাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানসমূহে ও রামপাল অঞ্চলে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইত। বানার নদী তীরবর্তী কাপাসিয়া গ্রামে এত অধিক পরিমাণে তুলা জন্মিত যে, এজন্য ঐ স্থান কাপাসিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়ে। তুলাসার, কাপাসপাড়া প্রভৃতি গ্রামেও যে পূর্বে তুলার চাষ হইত তাহা ঐ গ্রামগুলির নাম দ্বারা সূচিত হইতেছে।

বানার নদীতীরবর্তী তুরগাও গ্রামে (এই গ্রাম কাপাসিয়া থানার ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত) এবং রামপাল নামক স্থানে এখনও সামান্য পরিমাণে তুলার চাষ হইয়া থাকে। বানচিরা নদীতীরবর্তী কতিপয় গ্রামে গাড়ো অধিবাসীগণ কর্তৃক তুলার চাষ অদ্যাপি সংঘটিত হইতেছে।

"ঢাকা শহরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ইদিলপুর পর্যন্ত প্রসারিত ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রশস্ত মেঘনাদ তীরবর্তী ভূভাগে, অর্থাৎ কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর এবং ইদিলপুর প্রভৃতি পরগনায়, পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মরিসস এবং বরবোন প্রবেশজাত তুলা প্রতীচ্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও উহা ঢাকা জেলাস্থ উপরোক্ত স্থানসমূহের তুলার নিকটে অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল[২]। "সমুদ্রের সান্নিধ্যই উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনীষীগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লবণাক্ত বালুকামিশ্রিত পলিময় ভূমিতেই উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিয়া থাকে"[৩]।

ধলেশ্বরী নদী হইতে আরম্ভ করিয়া লাক্ষ্যানদী তীরবর্তী রূপগঞ্জ নামক স্থান পর্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ এবং ধলেশ্বরী নদীর উত্তরস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদতীরবর্তী কতিপয় স্থানেও খুব উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত ; বলদাখাল, ভাওয়াল, আলেপসিং এবং রাজশাহী জেলান্তর্গত ভূষণা নামক স্থানেও অল্প পরিমাণে ফুটিতুলা উৎপন্ন হইত। ১৮৯০/৯১ খ্রিষ্টাব্দে এই জাতীয় তুলা উৎপাদনের একবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহা সফলতা লাভ করিয়াছিল না[৪]।

মিঃ টি, এল্যান, ওয়াইজ সাহেব ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে ময়মনসিংহের জর্জ সাহেবের নিকটে এতদঞ্চলে তুলার চাষ প্রবর্তন করা সম্বন্ধে যে একখানি সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"ঢাকার পশ্চিমস্থিত সাতমজিল নামক স্থানে, কাপাসিয়া, সোনারগাঁও ও বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইত। কতিপয় বৎসর পূর্বেও ঐ সমুদয় স্থানে অতিউৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত।

"এই জেলার অধিকাংশ ভূমিই নদীর স্রোতোবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সুতরাং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলার মৃত্তিকা অপেক্ষা এই স্থানের মৃত্তিকা লঘুতর। ঢাকার উত্তরাংশের ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত। তথায় আবাদিভূমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে ঐ স্থান ভীষণ অরণ্যাণিসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকার উত্তর পূর্বদিকস্থ কাপাসিয়া গ্রাম জঙ্গলময় হইলেও তথায় তুলার চাষোপযোগী স্থানের অভাব নাই। ঢাকার "টেঙ্গরী তুলা" জেলার উত্তরাংশস্থিত উচ্চ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকাতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে"[৫]।

ঢাকা জেলার কোন্ অঞ্চলের তুলা উৎকৃষ্ট এবং কোন্ অঞ্চলের তুলা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। বেব সাহেব বলেন "জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলস্থিত স্থানসমূহে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইত"। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের তুলা অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মিঃ ল্যাম্বলসাহেব ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তিনি বলেন "গঙ্গামেঘনাদের তীরভূমিতে অথবা উহাদের সঙ্গমস্থলে কিংবা তন্নিকটবর্তী প্রদেশে (অর্থাৎ জেলার দক্ষিণাংশেই) উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত, এবং তাহা হইতেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইত"। আবার, ওয়াইজ সাহেব চরাজমির পক্ষপাতী। মিঃ প্রাইস পূর্বোক্ত কোনও জমিই মনোনীত করেন নাই ; তাহার মতে বংশীনদীর উচ্চ তীর ভূমিই উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদনের উপযোগী। 'উক্ত স্থান উচ্চ ; সুতরাং জলপ্লাবনের আশঙ্কাবিহীন এবং উহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণ ও কঠিন ; বালুকা ও কর্দমের ভাগ এক তৃতীয়াংশ মাত্র ; এই সমুদয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি ঐ স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন।

কাপাসিয়া অঞ্চলের ভূমি এরূপ কঠিন যে বারি পতন হইয়া মৃত্তিকা নরম এবং হলকর্ষণোপযোগী না হইতে তথায় বীজ বপন করা এক প্রকার অসাধ্য। বানার নদী তীরবর্তী কাশিমপুর পরগনার জমি ও ব্রহ্মপুত্রতীরবর্তী ভূমি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চরাজমি হল কর্ষণের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া তিনি উহারও প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে এই জেলায় কার্পাস উৎপাদনের জন্য গভর্নমেন্ট প্রায়

৩০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন[৬]। তন্মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের বেতনাদি বাবদে ২৩৩৫৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার মৃত্তিকা যে কার্পাস উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই[৭]। কারণ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নদী বা সমুদ্রের চর, লোনা ভূমি, উচ্চস্থান, কঙ্কর বা বালুকাময় স্থান সর্বত্রই কার্পাসের চাষ হইতে পারে। যে সকল ভূমিতে অন্যান্য দ্রব্যের চাষ ভাল হয় না, সেরূপ স্থানেই ইহা উৎপন্ন হয়। অতিশয় আর্দ্র, কর্দমময়, আঁঠাল মাটিতে তুলার চাষ ভাল হয় না ; এবং জমি অত্যধিক সারবান হইলে বৃক্ষের তেজ অধিক হয়, সুতরাং অধিক তুলা জন্মে না।

ফুলবাড়িয়া, কর্ণপাড়া, বানারতীরবর্তী রণভাওয়াল অঞ্চল, মাণিকগঞ্জ, সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, কাপাসিয়ার নিকটবর্তী সুতিপুর, টোক, বক্তাবলির চর প্রভৃতি স্থানে মিঃ প্রাইস ও ওয়াইজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্পাস উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল[৮]। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অভাবেই যে তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই বলিয়া ওয়াইজ সাহেব বলিয়াছেন[৯]। আমাদের বিবেচনায় কার্যকরী জ্ঞানের অভাব এবং ব্যয়বাহুল্যতাই তাহাদিগের উদ্যম ব্যর্থ হইবার কারণ[১০]।

Dr. Roxburgh তদীয় Flora Indica গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"The Dacca Cotton is a veriety of gossypium berbaceum, and differs from other varieties of this species in the following respects :

1st.—In the plant being more erect with fewer branches and the lobes of the leaves more pointed.

2nd.—In the whole plant being tinged of a reddish colour, even the petiols and nerves of the leaves, and being less pubescent.

3rd.—In having the peduncles which support the flowers longer and the exterior margins of the petals tinged with red.

4th.—In the staple of the cotton being much longer, much finer, and much softer. It was from the produce of this particular variety of cotton that the finest Dacca Muslins were made.

অর্থাৎ—

প্রথমত—এই কার্পাস চারার শাখাগুলি সরলভাবে উত্থিত হয় ; এবং উহাদের সংখ্যাও কম। বিভক্ত পাতাগুলির অগ্রভাগ অধিকতর তীক্ষ্ণ।

দ্বিতীয়ত—সমুদয় গাছটিই ঈষৎ লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে, এমন কি পাতার বোঁটা এবং শিরাগুলি যে সূক্ষ্ম কোমল তন্তু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তাহাও রক্তিমাভ।

তৃতীয়ত—পুষ্পের বৃন্তগুলি অধিকতর লম্বা এবং পাপড়িগুলির বহির্প্রাপ্ত ভাগ রক্তবর্ণে রঞ্জিত।

চতুর্থত—তলার আঁশগুলি অধিকতর সূক্ষ্ম, কোমল এবং দীর্ঘায়তনবিশিষ্ট।

বৎসরে তুলার দুইটি ফসল জন্মিত। একবার এপ্রিল ও মে মাসে এবং পুনরায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। এপ্রিল ও মে মাসে উৎপন্ন ফসলই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে ধান্য বপন করিয়া অক্টোবর মাসে উহা কর্তিত হইলে, ক্ষেত্রস্থিত নাড়াগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে হইত। পরে হলকর্ষণ করিয়া জমি তুলা উৎপাদনের উপযোগী করিবার জন্য কৃষকগণ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত।

বর্ষাকালে বীজগুলি তুলার সহিত জড়িত করিয়া রাখা হইত এবং যাহাতে বীজে শৈত্য

না লাগিতে পারে তজ্জন্য মৃণ্ময়পাত্র ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা সুমার্জিত করিয়া তন্মধ্যে উহা রক্ষিত হইত।

নভেম্বর মাসই বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। বীজগুলি ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে উহা জল নিষিক্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য। বিক্রমপুর অঞ্চলে অন্যপ্রকার প্রথা অবলম্বিত হইত। তথায় বীজগুলি একস্থানে রোপণ করিয়া পরে চারা উৎপন্ন হইলে অন্যত্র লাগান হইত।

ক্রমাগত ৩ বৎসর পর্যন্ত একই জমিতে তুলা উৎপাদন করা যায়। চতুর্থ বৎসরে জমি পতিত ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু জমিতে পর্যায়ক্রমে তুলার সহিত ধান্য ও তিল বপন করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণত বারুজীবিগণ দ্বারাই তুলার চাষ হইত।

৮০ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে ২১/৪ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে সবীজ ২১/৪ মণ তুলা জন্মিতে পারে। ৮০ সিক্কা ওজনের ১ সের কার্পাস মধ্যে ৬৫ সিক্কা বীজ এবং ১৫ সিক্কা বিবিধ প্রকারের তুলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ১৫ সিক্কা পরিমাণ তুলার মধ্যে ৫ সিক্কামাত্র সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। তুলার যে অংশগুলি বীজের সহিত সংলগ্ন ও সংবদ্ধ থাকে তাহা হইতেই অতিসূক্ষ্ম সূত্র নির্মিত হইয়া ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। উহাকে তুলার প্রথম স্তর বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের তুলা অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ; কিন্তু তৃতীয় স্তরের তুলাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ফুটি, নুর্মা ও বয়রাতি ভেদে, ত্রিবিধ প্রকারের কার্পাস ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইত[১১]। এতদ্ব্যতীত সেরোঞ্জ ও ভোগা জাতীয় কার্পাস হইতে নির্মিত সূতাও ব্যবহৃত হইত। সেরোঞ্জ তুলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মির্জাপুর নামক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঢাকায় আমদানি হইত। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম হইতে ভোগা জাতীয় তুলা বিস্তর আসিত। পূর্বে আরাকান হইতেও যথেষ্ট তুলা আমদানি হইত ; কিন্তু ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

খাগরি, ধলসুন্দর, মারকুলি, কাজলী, লাল বোম্বাই, সারঙ্গ, সাদা বোম্বাই বা গেণ্ডেরী, এই সপ্তবিধ ইক্ষু ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বোম্বাই ইক্ষু উৎকৃষ্ট। কাপ্তান স্লিম্যান সাহেব মরিসস দ্বীপ হইতে লাল বোম্বাই জাতীয় ইক্ষু সর্বপ্রথমে এতদঞ্চলে আনয়ন করেন। প্রথমে এই ইক্ষু ঢাকা জেলাতে খুব জন্মিত, কিন্তু এক্ষণে অতি সামান্য মাত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধুপুর জঙ্গলের সন্নিকটে এবং ঢাকা মীরপুর অঞ্চলে এবং লাক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের তীরভূমিতে, দোলাই খালের ধারে এবং রামপালে ও নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ নামক স্থানে প্রচুর ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। তেওতা হইতে নরসিংদি এবং কাওরাইদ হইতে লৌহজঙ্গ পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় হাটেই, দোলাই খালের তীরবর্তী স্থানেও ইক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়। ইক্ষুর ক্ষেত্রে গোময় ও খৈল সাররূপে ব্যবহৃত হয়। বালুকাময় ভূমিতে অথবা পুনঃ পুনঃ উৎপাদন জন্য ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে প্রথমত উলুখড় জন্মাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই জেলাতে বিস্তর ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও তদনুপাতে গুড় কম প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ৭ মণ হইতে ২০ মণ পর্যন্ত গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণত খাগরী ও ধলসুন্দর জাতীয় ইক্ষুই গুড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইক্ষুর ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক। একব্যক্তি ৪ বিঘা জমিতে প্রথম বৎসর ৩৫০ দ্বিতীয় বৎসর ৪০০ এবং তৃতীয় বৎসর ৩০০ একুনে ১০৫০ টাকার ইক্ষু উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়, কিন্তু এই তিন বৎসরে তাহার ৫০০ টাকার অধিক খরচ হইয়াছিল না[১২]।

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের উচ্চতীরভূমিতে মারকুলিও, কাজলী এবং ধন বাজারে সারঙ্গ জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়।

সাদা বোম্বাই বা গেণ্ডেরী ইক্ষু দোলাই খালের সন্নিকটবর্তী গেণ্ডেরিয়া নামক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এখানকার ইক্ষু সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থানের নামানুসারে সাদা বোম্বাই ইক্ষু গেণ্ডেরি আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গম :

ঢাকা জেলার গম বেশি উৎপন্ন হয় না। মোসলমান ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পূর্বে ইহা পাটনা হইতে আমদানি হইত, পরে উহারাই এতদঞ্চলে এই শস্যের চাষ প্রবর্তিত করে।

ইছামতী ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমস্থল পাথরঘাটা নামক স্থানের সন্নিকটে, রোয়াইল গ্রামের উত্তর এবং পূর্বাংশে স্থিত নিম্নভূমি সমূহে এবং তেওতার সন্নিকটে, পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গম জন্মিয়া থাকে ইহা কার্তিক মাসে উপ্ত এবং চৈত্র মাসে কর্তিত হয়। প্রতি বিঘায় ২ মণ হইতে ৫ মণ পর্যন্ত গম জন্মিয়া থাকে।

গমের ক্ষেতে দুলালিও শিয়ালি নামক আগাছা জন্মিয়া শস্যের হানি করে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিতে হয়।

যব :

যমুনা, পদ্মা, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীর দিয়ারাচরে বার্লি জন্মিয়া থাকে। বালুকামিশ্রিত পলিময় ভূমিতেই ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহা উপ্ত হয়। প্রতি বিঘায় ১০ সের। ১২ সের বীজ উপ্ত হইলে ২ মণ ৩ মণ বার্লি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্তিকায় বালুকার অংশ অধিক পরিমাণে থাকিলে ফসল পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। মধুপুর অঞ্চলে ইহা জন্মে না।

চিনা :

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় ইহা অধিক জন্মে। যে ভূমিতে চিনা উৎপন্ন হয় তথায় অন্য কোনও ফসল হয় না। ঝিলের সন্নিকটস্থ কর্দমময় ভূমি চিনা উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। পৌষ মাসে ভূমি কর্ষণ করিয়া মাঘ মাসে বীজ বপন করা হইলে ৭/৮ দিবস মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদগম হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে চিনা ভাল জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ৪ মণ পরিমাণ চিনা উৎপন্ন হয়।

চিনার গাছ ৬/৭ ইঞ্চি লম্বা হইলেই ক্ষেত নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কাঐন :

বিক্রমপুর ও মাণিকগঞ্জের উত্তরাংশে কাঐন অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বালুকাময় মৃত্তিকা এই ফসল উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্ষেতে জল উঠিলে ফসল নষ্ট হইয়া যায় ; এমন কি বৃষ্টির জল ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ক্ষেত্রে জমিয়া থাকিলেই সমুদয় শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়। মাঘ মাসের মধ্য ভাগ হইতে চৈত্রের প্রথম পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কর্তিত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ২ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে ৫ মণ পর্যন্ত কাঐন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উলু :

কাওলা ও উলুখড় দ্বারা ঘরের ছাউনি করা হয়। বিক্রমপুর এবং আরালিয়া অঞ্চলে, ঢাকার উত্তরস্থিত কোনও কোনও স্থানে উলুখড় প্রচুর উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতেও উলুখড় জন্মিয়া থাকে। কাওলা মধুপুর অঞ্চলেই বেশি জন্মে।

ক্ষেতে উপর্যুপরি ২/৩ বৎসর পর্যন্ত উলুখড় জন্মিলে, উহার উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত

হয়। ইক্ষুর ক্ষেত অনুর্বর হইয়া পড়িলে ৩/৪ বৎসর পর্যন্ত উলুখড় জন্মাইতে হয়; তাহা হইলেই উহা অন্যান্য ফসল উৎপাদনের উপযোগী হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে উলুখড় জন্মাইতে হইবে, তাহাতে প্রথমত পশ্বাদির মল দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সার দেওয়া কর্তব্য, পরে ২/৩ বৎসর পর্যন্ত উহা গোচারণের মাঠ স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। উলুখড় গজাইতে আরম্ভ করিলেই উহাতে পশ্বাদির যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহা সমুদয় মাঠে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা কর্তিত হয়; গড়ে প্রতি বিঘায় ৩৫ বোঝা উলুখড় জন্মিয়া থাকে।

লটাঘাস :

মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও পদ্মার চরে প্রচুর পরিমাণে লটাঘাস বা খাইলা জন্মে। মুন্সিগঞ্জ মহকুমার পশ্চিমাংশে ইহা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

লটাঘাস গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। ইহা খাইলে গরুর দুগ্ধ বেশি হইয়া থাকে এবং স্বাদও সুমিষ্ট হয়।

একবার লাগাইলে তিন বৎসর পর্যন্ত ইহা ভোগ করা যায়। বর্ষাকালে মুন্সিগঞ্জের পূর্বাঞ্চলস্থ হাটসমূহে ইহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ভীষণজল প্লাবনে ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইলে এই ঘাস সহস্র সহস্র পশ্বাদির জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়; ৫০ মাইল দূরবর্তী প্রদেশ হইতেও লোক সকল উহা ক্রয় করিবার জন্য মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলের হাট সমূহে আগমন করিত[১৩]।

পিয়াজ :

এই জেলা মধ্যে নবাবগঞ্জ ও হরিরামপুর এই থানাদ্বয়ের অন্তর্গত গ্রামসমূহেই প্রচুর পিয়াজ জন্মিয়া থাকে। ছাতিয়া হইতে ঝিটকা পর্যন্ত ইছামতীর উভয় তীরবর্তী স্থান সমূহই পিয়াজ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ছাতিয়ায় পিয়াজ, শ্রীহট্ট, কাছার এবং অন্যান্য স্থানেও রপ্তানি হইয়া থাকে[১৪]।

এই জেলায় কেবল মাত্র ছোট পিয়াজই উৎপন্ন হয়; বড় পিয়াজ জন্মে না। বালুকাময় মৃত্তিকা পিয়াজ উৎপাদনের উপযোগী নহে। অতিশয় শৈত্যের জন্য কর্দমময় ভূমিতেও ইহা ভাল জন্মে না। গঙ্গা ও যমুনার প্রাচীন পললময় মৃত্তিকার সহিত পুরাতন ইছামতীর মৃৎস্তরের সংমিশ্রণ হওয়ায় ইছামতী তীর-প্রদেশস্থ ঈষৎ পীতাভ মৃত্তিকা পিয়াজ উৎপাদনের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পিয়াজ ক্ষেত্রে অন্য ফসল জন্মে না। ফসল উঠিয়া গেলে, ভূমিতে খড় আস্তীর্ণ করিয়া উহাতে লাঙ্গল দিতে হয়। ঐ খড় পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা ভাল সারের কার্য করিয়া থাকে; ভূমিতে অন্য কোনও প্রকার সার দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। ক্ষেত খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা উচিত, এজন্য ৩/৪ বার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ক্ষেতে জল জমিয়া গেলে উহা শস্যের হানি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং সামান্য মাত্র বৃষ্টির জল জমিলেও উহা অনতিবিলম্বে নিঃসারিত করিয়া ফেলিতে হয়।

পিয়াজ অগ্রহায়ণ মাসে রোয়া হয়, চৈত্র মাসেই শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিলাবৃষ্টি পিয়াজের অনিষ্টকারক। সুজন্মার বৎসরে প্রতি বিঘায় ৫০ মণ জন্মে; কিন্তু সচরাচর ৩০ মণের অধিক প্রতি বিঘায় প্রায়ই জন্মে না।

রসুন :

ইছামতী নদীতীরে করিমগঞ্জের সন্নিকটে প্রচুর রসুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জমিতে বর্ষাকালে আউস ধান জন্মে তথায়ই সাধারণত রসুন উৎপাদন করা হয়।

কার্তিক মাসে আউস ধানের খড় মাঠে পুড়িয়া ফেলিতে হয়, পরে ঐ ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া রসুন রোয়ার উপযোগী করিতে হয়। চারা ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলেই প্রথমে নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির জলে গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গেলে পিয়াজের ন্যায় ইহার গোড়াও খুড়িয়া দিতে হয়।

কার্তিক মাসে রোয়া হয়, এবং চৈত্রমাসেই রসুন জন্মে। সাধারণত প্রতি বিঘায় ৩০ মণ রসুন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কচু :

চতুর্বিধ প্রকারের কচু এই জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে নারিকেলি কচুই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

যে মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে এবং যে মৃত্তিকা শৈত্যগুণ বিশিষ্ট তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কচু জন্মিয়া থাকে। এজন্যই, ঝিলের কিনারায়, নদীর পরিত্যক্ত প্রাচীন খাতে, এবং যে সমুদয় পুষ্করিণী উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপাদনহেতু ভরিয়া গিয়াছে তথায় কচুর উৎপত্তি বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

অগ্রহায়ণে কচু লাগাইলে শ্রাবণ মাসেই উহা উৎপন্ন হয়।

কলা :

এই জেলার প্রায় সর্বত্রই কদলী জন্মিয়া থাকে কিন্তু রামপাল এবং তন্নিকটবর্তী কতিপয় স্থানের কদলীই বঙ্গের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মধুপুর জঙ্গলের ভূমিও উৎকৃষ্ট কদলী উৎপাদনের উপযোগী। রামপাল অঞ্চলের ভূমি খুব উচ্চ এবং মৃত্তিকা পীত বর্ণ।

করবী, সবরি, চিনিচম্পা, অমৃতভোগ, মর্তমান, অগ্নিশ্বর, আঠ্যা কানাইবাশী প্রভৃতি নানাবিধ কদলী রামপাল অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। সবরি সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু কিন্তু করবী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে জমি চষিয়া কার্তিক মাসে ঐ জমিতে প্রতি বিঘায় দেড় সের পরিমাণ সরিষা বুনন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে সরিষা কর্তিত হইলে পুনরায় ঐ জমিতে হাল চালনা করা হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে পুকুরের কর্দমরাশি ৬/৭ ইঞ্চি পুরু করিয়া জমিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। বৈশাখ মাসে ভূমি পুনরায় ৩/৪ বার কর্ষিত হইলে ৬/৭ ফুট ব্যবধান এক একটি চারা রোপিত হইয়া থাকে। তৎপরে কোদালি দ্বারা, চারার সারির মধ্যে ১৫ ইঞ্চি অন্তর এক একটি ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া উহাতে হলদি অথবা আদা রোপণ করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই চারা হইতে নতুন পত্রের উদগম হয়। বর্ষাকাল জমি পুনঃ পুনঃ নিড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য, কারণ তাহা না করিলে মৃত্তিকা শক্ত হইয়া পড়ে এবং আগাছা জন্মিয়া চারার অনিষ্ট সাধন করে।

শীতকালে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই আদা ও হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চৈত্র মাসেই কলা গাছের ফুল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পুরাতন পত্রগুলি পুনঃ পুনঃ ছাঁটিয়া দেওয়া কর্তব্য। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ করে। গাছের গোড়ায় যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা ১ ফুট পরিমাণ উচ্চ রাখিয়া কর্তন করিয়া ফেলা কর্তব্য। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে ঝাড়টি খুব সাবলতা লাভ করে। রামপাল অঞ্চলের কৃষকগণ পূর্বোক্ত প্রণালিতে কদলীর চাষ করিয়া থাকে। তাহারা একঝাড়ে একটির অধিক গাছ রাখে না।

মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রামপাল অঞ্চলে প্রতি বিঘার কদলী চাষে প্রায় ৪৮ টাকা ২ আনা পাই খরচ পড়িত এবং আদা, সরিষা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ৮৭ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

আদা :

রামপাল এবং মধুপুর অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রামে প্রচুর পরিমাণে আদা জন্মে। প্রতি বিঘায় ১৫ হইতে ২৫ মণ পর্যন্ত আদা উৎপন্ন হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে খুব বৃষ্টি হইলে এই ফসলের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

হরিদ্রা :

এই জেলায় খুব কম জন্মে। পাটনা ও যশোহর অঞ্চল হইতে হরিদ্রা আমদানি হইয়া এই জেলার অভাব দুর করিয়া থাকে। মধুপুর অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে এবং রামপাল গ্রামে হরিদ্রা উৎপন্ন হয়। প্রতি বিঘায় ৩০ মণ হরিদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহা শুষ্ক হইয়া ৫ মণে পরিণত হয়।

গোলআলু :

এই জেলায় গোলআলুর চাষ প্রায় নাই বলিলেও চলে। ভাওয়াল, আটি, কলাতিয়া এবং রোহিতপুর গ্রামে গোলআলুর চাষ হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব মিঃ ওয়াইজ গোলআলুর চাষ এই জেলায় সর্বপ্রথমে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার গোলআলু অতি উৎকৃষ্ট। দোয়াসা মাটি গোলআলু উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। প্রতি বিঘায় ৩০ হইতে ৪০ মণ পর্যন্ত গোলআলু উৎপন্ন হয়।

শুধু বোম্বাই আলুই এখানে উৎপন্ন হয়। ইহার বীজ শ্রীহট্ট এবং খাসিয়ার পার্বত্য প্রদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

তিল :

বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে তিল উৎপন্ন হয়। শুধু শ্বেত তিলই এখানে জন্মে। আমন অথবা আউস ধানের সহিত এক ক্ষেতে তিল উপ্ত হইতে পারে।

শিলাবৃষ্টি এই শস্যের হানিজনক।

প্রতি বিঘায় প্রায় ৫ মণ তিল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেগুন :

খাল অথবা ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী-তীরস্থ বালুকাময় ভূমি বেগুন উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। বচিলা ও আটি গ্রামে প্রচুর বেগুন উৎপন্ন হয়। রামপালের বেগুন অতি উৎকৃষ্ট। মধুপুর জঙ্গলের ভান্তা বেগুন অপকৃষ্ট।

আশ্বিন মাসে বীজ উপ্ত হয়। কার্তিক মাসে চারা উত্তোলনপূর্বক এক হস্ত অন্তর এক একটি চারা মাঠে লাগাইতে হয়। মাঘ মাসের প্রথমেই গাছে ফল ধরে। জ্যৈষ্ঠমাসে বেগুন গাছ মরিয়া যায়।

পোকা ধরিয়া অনেক সময়ে বেগুন নষ্ট হইয়া যায় ; এজন্য কৃষকগণ গাছে ছাই দেয়।

মরিচ :

এই জেলার পূর্বাংশে, মেঘনাদ, ব্রহ্মপুত্র এবং লাক্ষ্যা নদ-নদী তীরবর্তী প্রদেশে প্রচুর মরিচ উৎপন্ন হয়। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে চারা রোপিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে মরিচ পক্ক হইতে আরম্ভ করে। প্রতি বিঘায় ৪ মণ শুষ্ক মরিচ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই জেলায় পাট অথবা আউস ধান্য উঠিলেই মরিচের চাষ আরম্ভ হয়।

তামাক :

মেঘনাদ ও লাক্ষ্যা তীরস্থ বালুকামিশ্রিত মাটিতে তামাক উৎপন্ন হয়। বিলাতি, দেশি, কান্তাভোগী, সিবারজাতা, বিলাইকানি, বাঙ্গলা ও হিঙ্গলী এই কয় প্রকার তামাক এই জেলায় জন্মিয়া থাকে।

পাট উঠিয়া গেলেই তামাকের চাষ আরম্ভ হয়।

সাগরকন্দ আলু :
মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ বালুকাময় ভূমিতে সাগরকন্দ আলু বা মিঠা আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ভাদ্রমাসের প্রথমে জমিতে চাষ দিয়া চারা লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে আলু জন্মে। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩০ মণ আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুসুম ফুল :
পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদী দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানসমূহে, মাণিকগঞ্জ, হরিরামপুর এবং নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় এবং বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে, পূর্বে প্রচুর কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত। বর্তমান সময়ে কুসুম ফুলের চাষ একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবলমাত্র, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সাভার থানায় এবং ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী কয়েকটি গ্রামে এখনও সামান্য পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। পাথরঘাটা গ্রামে উৎপন্ন কুসুম ফুলের রং সর্বাপেক্ষা মনোরম।

ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। ৫ সের বীজ হইতে ১ সের পরিমাণ তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারিত ; সরিষার তৈল অপেক্ষা ইহা দরে সস্তা ছিল।[১৫]

কৃষকগণ সর্করা ও দুগ্ধ সংযোগে ইহার বীজ ভক্ষণ করিত ; পত্র ও ডাটের ভস্ম বস্ত্র ধৌতকার্যে ব্যবহৃত হইত।[১৬]

প্রতি বিঘায় অর্ধমণ পর্যন্ত কুসুম ফুল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন "কুসুম ফুল ১৬ টাকা হইতে ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইত। প্রতি মণ উৎপাদনের খরচ ৭ টাকার অধিক পড়িত না ; সুতরাং প্রতি বিঘায় ৩ টাকা ৮ আনা লভ্য হইত।[১৭]

ঢাকা জেলার ন্যায় উৎকৃষ্ট কুসুম ফুল ভারতবর্ষের অন্য কোথাও জন্মিত না ; চিন দেশীয় কুসুম ফুল পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ; লন্ডনের বাজারে এক সময়ে চিনা কুসুম ফুলের পরেই ঢাকার কুসুম ফুলের সমাদর ছিল।[১৮]

কুসুম ফুল হইতে লাল ও পীত এই দ্বিবিধ রং প্রস্তুত হইত।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় উৎপন্ন যাবতীয় কুসুম ফুল ঢাকার বস্ত্র রঞ্জনকার্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল ; ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ইহার চাষ এতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল যে স্বীয় জেলার বস্ত্র রঞ্জন কারীকরগণের অভাব বিমোচন করিয়াও প্রায় ২০০ শত মণ কুসুম ফুল ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া ছিল। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০ মণ কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত।[১৯] ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ২০০০ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮২৪/২৫ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুল আমদানি হয় ; ইহার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ২৯০৭৫৫ ৮ আনা ৬ পাই। ইহার মধ্যে প্রায় $^{১}/_{৩}$ অংশ মালই ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইয়াছিল।[২০]

গিমিকুমরা :
ঢাকা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা ব্যতীত ইহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ইহা সাধারণত পানের বরজ মধ্যেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু জাফরগঞ্জ ও তেওতার সন্নিকটবর্তী যমুনার দিয়ারা চরে ও ইহার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তরমুজ :
যমুনা ও পদ্মার চরে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

করলা :

মধুপুরের অরণ্যানি মধ্যে খুব বড় বড় করলা উৎপন্ন হয়। পুবাইলের হাট করলার জন্য ঢাকা জেলায় বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত করলা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাওয়ালে ও ধলেশ্বরীর চরা জমিতেও করলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উচ্ছে :

ধলেশ্বরীর চরা জমিতে এবং ভাওয়াল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উচ্ছে জন্মিয়া থাকে।

ফুটি :

ধলেশ্বরীর চরা জমিতে যথেষ্ট ফুটি উৎপন্ন হয়। চৈত্র মাসে ফুটি পক্ক হইয়া থাকে।

ক্ষিরাই :

ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্রই ক্ষিরাই জন্মে। অগ্রহায়ণ মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফসল উৎপন্ন হয়।

মটর :

দ্বিবিধ প্রকারের মটর এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; (১) ছোট, (২) পাটনাই বা কাবুলী মটর। ধলেশ্বরী তীরবর্তী সুন্দর নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া টাঙ্গাইলের উত্তরস্থিত যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই মটরের চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় সোয়া ২ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে ৭/৮ মণ মটর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খেসারি :

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত প্রায় সমুদয় বিলেই খেসারি উৎপন্ন হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয় এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফসল কর্তিত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ৩ মণ খেসারি উৎপন্ন হয়। ইহার খড় গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য।

মাষকলাই :

এই জেলায় দ্বিবিধ প্রকারের মাষকলাই জন্মে। (ক) ঠিকরা, (খ) মাষকলাই বা কলাই।

পললময় ভূমি মাষকলাই উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা ত্রিবিধ প্রকারে উপ্ত হইতে পারে :—

(১) ক্ষেত্রে আমন ধানের গাছ থাকিতে থাকিতেই অনেকে মাষকলাই বপন করিয়া থাকে।

(২) বর্ষার জলপ্লাবনে যে ভূমিতে পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হয়, তথায় বিনা কর্ষণেও উপ্ত হইতে পারে।

(৩) অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃত্তিকায় দুইবার কর্ষণ করিয়াও বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। বপন করিবার জন্য প্রতিবিঘায় ২১/২ সের বীজ আবশ্যক হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং মাঘ মাসে ফসল কর্তিত হয়। প্রতি বিঘায় ২/৩ মণ মাষকলাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুগ :

মুগ ত্রিবিধ : (১) সোনামুগ, (২) ঘাসীমুগ, (৩) ঘোড়ামুগ। ইহার মধ্যে সোনামুগই সর্বোৎকৃষ্ট।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদতীরবর্তী কোনও কোনও স্থানে মুগ উৎপন্ন হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়। পৌষ-মাসে ফসল জন্মে। প্রতি বিঘায় মণ প্রতি ২ সের ৩ সের বীজ উপ্ত হইলে ত্রিশ সের হইতে দেড় মণ পর্যন্ত মুগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধঞ্চে :

পদ্মা ও ধলেশ্বরীর চরে এবং বিক্রমপুরের বিলে প্রচুর ধঞ্চে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধঞ্চে

জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঁশ পাটের ন্যায় কার্যকরী হয় কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার বিষয় বটে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করা হইলে উহা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেই কর্তিত হইতে পারে।

সাধারণত নতুন চরে অথবা পললময় ভূমিতেই ইহা ভাল জন্মে।

শন :

লাক্ষ্যানদীর দিয়ারা চরে শণ প্রচুর জন্মে। বালুকা ও কর্দমমিশ্রিত দোয়াসা জমিই শণ উৎপাদনের উপযোগী। নদীতীরে অথবা ঝিলের কিনারায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদ্মার তীরবর্তী প্রদেশে এবং লাক্ষ্যার পূর্ব কুলে সোনারগাঁও অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শণ জন্মে।

"১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় প্রায় (১০০০০) দশ হাজার মণ শন উৎপন্ন হইয়াছিল ; ঢাকার ইংরেজ কোম্পানির কুঠিয়াল ইংলণ্ডীয় রণপোত সমূহের ব্যবহারার্থ ঐ বৎসর প্রায় ৫৫০০০ হাজার মণ শন খরিদ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[২১] এক্ষণে শনের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। মৎস্য ধরিবার জাল এবং নৌকার "গুণ" প্রস্তুত করিবার জন্যই এক্ষণে শণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ৩ মণ শণ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

শর্ষপ :

এই জেলায় ত্রিবিধ প্রকারের শর্ষপ উৎপন্ন হয়। (১) মাঘী বা লাল শর্ষপ ; (২) রাই বা শ্বেত শর্ষপ ; (৩) কৃষ্ণ শর্ষপ।

মাঘী শর্ষপ মাঘ মাসে উৎপন্ন হয় ; সাধারণত ইহা চরা জমিতেই ভাল জন্মিয়া থাকে। পুরাতন চরা জমি এবং মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমি কৃষ্ণ শর্ষপ উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী।

প্রতি বিঘায় ১ মণ হইতে ৮ মণ শর্ষপ জন্মিতে পারে।

মুলা :

রামকৃষ্ণদী হইতে রাজানগর পর্যন্ত ইছামতী নদীতীরবর্তী প্রায় সমুদয় স্থানেই প্রচুর মুলা উৎপন্ন হয়। রাজানগরের মুলা এই জেলার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

কুমরা ও লাউ :

এই জেলায় যথেষ্ট জন্মে।

কালিজিরা :

ঢাকা শহরের সন্নিকটে সামান্য পরিমাণে কালিজিরা উৎপন্ন হয়।

কফি :

ঢাকা শহরের উত্তরাংশে কফির চাষ হয়।

চা :

বহুপূর্বে এই জেলায় চা চাষের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। ঢাকার স্বনামধন্য স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুল গনি কে, সি, এস, আই মহোদয় তদীয় বেগুনবাড়ি নামক স্থানে এবং ভাওয়ালের স্বধর্মনিরত স্বর্গগত মহাপ্রাণ রাজা কালীনারায়ণ রায় মহোদয় ভাওয়ালে চায়ের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায়ও সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

পান :

ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্রই পানের বরজ আছে। মীরকাদিম ও সোনারগাঁও অঞ্চলে প্রচুর পান

উৎপন্ন হয়। সোনারগাঁও কাইকারটেকের "এলাচ" ও "কাফ্রিপান" অতি প্রসিদ্ধ। মোগল সুবাদার এবং আমীর ওমরাহগণ প্রত্যহ "কাফ্রিপান" ব্যবহার করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঢাকার বর্তমান নবাব বাহাদুর এই পানের অত্যন্ত পক্ষপাতী; এজন্য অদ্যাপি কাইকারটেক হইতে নবাব বাহাদুরের ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ ইহা ঢাকাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই পান অত্যন্ত সুরস ও সুগন্ধযুক্ত।

নীল :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এতদঞ্চলে নীলের চাষ আরম্ভ হয়, এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ইহার প্রসারতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্তমান সময়ে এই জেলায় নীলের চাষ নাই।

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় মাত্র ২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীলের কুঠি সংস্থাপিত ছিল। রাজানগর, সিরাজাবাদ, ইছাপাশা, সাভার প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্মিত হওয়ায় নীলের ব্যবসা অত্যন্ত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কতিপয় বৎসর মধ্যে নীলের চাষ এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে কুঠিয়ালগণ ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় ৩১টি নীলের কুঠি সংস্থাপিত করিয়া ছিলেন।[২২] প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় ২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত। নীলকরগণ এই ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসরে প্রায় ত্রিশলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

সাধারণত নতুন চারা জমিতে এবং যে জমিতে আউস ধান জন্মে তথায়ই প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত বলিয়া জানা যায়।

নীলকরগণের ভীষণ পাশব অত্যাচারের কবলে পতিত হইয়া তৎকালে অনেক কৃষককে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

১. Report on the Agriculture and Agriculteral Statistics of Dacca District by Mr. A. C. Sen. ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পাটের মণ ১১/৪ হয়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে অব্দে বৃদ্ধি পাইয়া ২১/২ টাকাতে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ৭১/২ হইতে ১০ টাকা মণ চলিতেছে।

২. History of the Cotton manufacture of Dacca District.

৩. Remarks of the Commercial Resident of Dacca in 1800.

৪. Letter from the Commercial Resident of Dacca to the Board of Trade. Calcutta dated 30th. November 1800.

৫. Narrative Cotton Hand Book.

৬. Ibid.

৭. In parts of the Dacca district. Cotton of excellent quality can be. and has been. profitably grown. not only with in the limits of the true Gagetic alluvium. but on lands actually subject of annual innudation
Narrative Cotton Handbook. Page 41

৮. Ibid.

৯. "Mr. J P Wise stated his belief that whatever causes the failure might be due. it ought not to be attributed to the Dacca district being unsuited for the growth of exotic conton.
"The record of Mr. Price's misfortune may. at all events. be taken as proving that some thing more than jealous perseverence and untiring energy is needed to command success where he so signally failed"—Ibid.

১০. It is not to be taken for granted that this experiment of cultivating American cotton at Dacca was "so well conducted as to be conclusive".

১১. ওয়াইজ সাহেব নয় প্রকার কার্পাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

১২. Report on the system of Agriculture and Agricultural statistics of the Dacca District by A. C. Sen C. S. published by government.

১৩. Mr. A. C. Sen's Report Page 38

১৪. ছাতিয়া হইতে প্রতি বৎসর প্রায় তিন সহস্র মণ পিয়াজ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৫. "An oil is procured from the seeds, which is used for burning : it sells in the bazars at half the price of mustard oil"—Dr. Taylor's Topography of Dacca.

১৬. Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 134.

১৭. Ibid.

১৮. "The Dacca safflower, however, is superior to any that is grown in India and ranks next to China safflower in the London market."

১৯. History of Cotton manufacture of Dacca.

২০. Ibid and Dr. Taylors Topography of Dacca.

২১. Taylor's Topography of Dacca Page 137.
১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ঢাকা জেলার কৃষকদিগকে শণের চাষ করিতে অনুরোধ করেন ; ফলে কতিপয় বৎসর পর্যন্ত এই জেলায় প্রচুর শণের চাষ চলিয়াছিল।

২২. Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 135 and 136.

দশম অধ্যায়

ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, ফলমূল, পুষ্পাদি

ভেষজ :

যজ্ঞ ডুম্বর, গাম্ভারী, পারুলী, গনিয়ারি, সোনা (নাও সোনা), বেল, শ্রীফল, খদির, রক্তচন্দন, জয়ন্তী, জবা, রক্তকরবী, শ্বেতকরবী, মাধবীলতা, সোনালি, আম আদা, পিপুল, কটকরজা, জয়পাল, শতমূল, বট, অশ্বত্থ, পাকুর, মাসানী, রাস্না, ভাণ্ডি, কলকাসন্দ, শিরিষ, ঘৃতকুমারী, বালা, নাগকেশর, চামেলী, পূনর্ণবা, মনসাসিজ, নিসিন্দা, মহাকাল, জ্যৈষ্ঠমধু, রক্ত এরণ্ড, ভ্রঙ্গরাজ, ভূমিকুষ্মণ্ড, অপরাজিতা, ভাঙ্গ, তেজপত্র, ঢেরস, বাবুই তুলসী, আকন্দ, লজ্জাবতী, মুর্ব, পলাশ, হাতিশুড়া, আমলকি, হরিতকি, বয়রা, হিন্তাল, তাল, গুরুচী, চৈ, চিতা, গোরক চাকলা, ছাইতান, বাসক, মুথা, মানকচু, কেয়া, শ্যামলতা, আমরুল, ঝিন্টি, লালকুঁচ, বরাহক্রান্ত, সজিনা প্রভৃতি বিবিধ ভেষজ পদার্থ এই জেলায় উৎপন্ন হয়। সাভার অঞ্চল ভেষজ উদ্ভিদাদির চিরপ্রসিদ্ধ নিকেতন ; এখানে ইহা প্রকৃতির অযাচিত দানস্বরূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

উদ্ভিদ :

(ক) গাছ-গাছরা—গজারি, চাম্বল, করই, হিজল, বাবলা, বাঁশ, শিমুল, পাকুরকানী, মান্দার, তিন্তিরী, জারৈল, গোয়ারা, আম্র, কাঠাল, উড়িয়া আম, ছাইতান, দেবদারু, ঝাউ, বট, জারল, বউনা প্রভৃতি বৃক্ষাদি এবং বাঁশ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাপ্তান গ্রেহাম অথবা কর্নেল স্টেকি সাহেব পুরানা পল্টনের সন্নিকটবর্তী কোম্পানির বাগিচায় সেগুন বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। দেশীয় সৈন্য লালবাগে স্থানান্তরিত হইলে গভর্নমেন্ট ঐ বাগানটি মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে প্রদান করেন। ইহার পরে ঐ সেগুন বৃক্ষগুলি কর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ এ. এল. ক্লেসাহেব লিখিয়াছেন "The trees have been cutdown by whose order does not appear"।

এতদ্ব্যতীত ফনিক্স পার্কের পশ্চাদ্ভাগেও কতিপয় সেগুন বৃক্ষ ছিল। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ডেভিডসনের আদেশে উহা বিক্রয় করা হয়।

পূর্বে এই জেলায় মেহগনি বৃক্ষ ছিল না। ক্লেসাহেবের রিপোর্টের ফলে গভর্নমেন্ট কয়েকটি মেহগনি বৃক্ষ ঢাকাতে রোপণ করেন। মিঃ ক্লে বলেন "নিম্নবঙ্গের ভূমি মেহগনি চাষের উপযোগী"।

বেত, উলু, কাসিয়া, কালয়া, লটা, নল, হোগলা প্রভৃতি গৃহ নির্মাণোপযোগী সরঞ্জামী প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধুনা বেত ও উলু কম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(খ) **শাক-সবজি**—সাপলা, পদ্ম, ঘেচু, কলমি, হেলেঞ্চা, বনপুই, গিমা, বেতুয়া, ঢেকি, কচু, বনভারালী, ওল, কাটানটে, বনসিম, বাঘনখ, গন্ধ ভাদালিয়া প্রভৃতি শাক-সবজি ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

(গ) **ফল-মূল, পুষ্পাদি**—আম, কাঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, নোনা, জাম, গোলাম জাম, কাঠবউল, গাব, জামরুল, লিচু, লট্‌কা, কামরাঙ্গা, জলপাই, শসা, ঝিঙ্গা চালতা, তেঁতুল,

কত্‌বেল, পেপে, আমড়া, বিলাতি আমড়া, বাতাবিলেবু, জামির, কাগজি, নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি, কচুই, সিঙ্গারা, ময়না, ডেফল, আনারস প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে।

মাখনা ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

ঢাকা হইতে আরাকান প্রদেশে পলায়ন সময়ে শাহ্ সুজা, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি "সুজা পছন্দ" বলিয়া লোকে ঐ জাতীয় আম্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। শহরতলী শহর সোনারগাঁ এবং পরগনায় সোনার গাঁয়ের নানা স্থানেই অতি উৎকৃষ্ট আম্র পাওয়া যায় ; উহা "খাস আম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থানে স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট কাচামিঠা আম জন্মে যে তদ্রূপ আম্র প্রায় দুর্ঘট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তেজগাও এবং ভাওয়াল অঞ্চলের আনারস অত্যুৎকৃষ্ট। উহা "ঢাকাই আনারস" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। টেইলার সাহেব বলেন তেজগাও অঞ্চলে পর্তুগিজদিগের বাগান ছিল ; উহারা উৎকৃষ্ট আনারস উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিত।[১]

মধুপুর অঞ্চলের মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট লিচু উৎপাদনোপযোগী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।[২] আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদারবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভাওয়াল, কাশিমপুর ও মহেশ্বরদি অঞ্চলের কাঁঠাল, ঢাকার আতা ও কতবেল, কাইকার টেক ও লাঙ্গলবন্দের বেল অত্যুৎকৃষ্ট। যোলঘরের ও তৎপার্শ্ববর্তী কতিপয় স্থানের আম্র এই জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত।

পুষ্প :

গেন্দা, যুঁই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, জবা (শ্বেত ও লাল) বকুল, চাঁপা, ভুঁইচাঁপা, কনকচাঁপা, আকন্দ, করবী (রক্ত ও শ্বেত) ঝুমকা, পদ্ম, দ্রোণ, ঝিকটি, ডাইট, ?ি, হাজরা, নন্দদুলাল, টগর প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প এই জেলার সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যা?

১ Taylor's Topography of Dacca Page 141.

২ "No better land perhaps exists in the whole of lower Bengal than the Madupur jungle for growing lichee"—Mr A C. Sen's Report Page 82.

একাদশ অধ্যায়

মৎস, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি

মৎস্য :

ঢাকা জেলায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী, ঝিল, খাল, পুকুর, জলাশয় প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্যে পরিপূর্ণ। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকার ঝিলগুলি ক্রমশ ভরাট হইয়া যাওয়ায় মৎস্যের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কলিকাতা অঞ্চলে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য রপ্তানি হওয়ার দরুনও এতদঞ্চলবাসী জনগণ ইহার অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের ঝিলসমূহ হইতে অর্থ উপচিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমুদয় স্রোতোবেগে নীত হইয়া মেঘনাদ নদে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, এজন্যই ইহার জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও ময়লা সংযুক্ত। মেঘনাদে মৎস্যাধিক্যের ইহাই নাকি কারণ।[১]

রঘুনাথপুরের ঝিলটি মৎস্যের একটি নিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোহিত, কাতল, মিরগেল, কালিবাউস, ভাঙ্গনা, এলাঙ্গি, ধুরা, চেলা, মৌরলা, পুঠী, তিতপুঠী, সরপুঠী, ভোলা, ফেসা, ইলিশ, চাপলা ও খয়রা, বিলসা, ফলি, চিতল, মাগুর, সিলঙ্গ, ঢাইন, পাঙ্গাস, বাগাইর, আইর, বাচা, টেঙ্গরা, গলসা, রিঠা, ঘাগট, বাতাসী, সিংঙ্গি, বোয়াল, ঘাউরা, পায়রা, খল্লা, চান্দা, রঙ্গচান্দা, গজার, শৌল. লাঠা, চেঙ্গ, কৈ, ভেদা, ভেটকী বা কোরাল, বাইন, খলিসা, বাইলা, তপস্বী, টাটকিনী, ঢেপা, কাজুলী, সুবর্ণখরিকা, কুচিলা প্রভৃতি মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

মৎস্য ধরিবার জন্য জেলেদিগের জলকর দিতে হয়। তক্‌সীম জমাধার্যকালে পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের উপর জলকর ধার্য করা হইয়াছিল। সুতরাং তদবধি উহা তালুকের সামিল হইয়া পড়িতেছে। মেঘনাদ প্রভৃতি নদ-নদীর কোনও কোনও স্থানে গভর্নমেন্টের জলকর ব্যতীত বেসরকারী জলকরও ধার্য আছে।

নিম্নে ঢাকা জেলার জলকর মহালগুলির নাম ও রাজস্ব উল্লেখ করা গেল।

মহালের নম্বর		মহালের নাম	সদর জমা		
			টাকা	আনা	পাই
৯১৪৭	জলকর	চারিগাঁও নারায়ণী গঙ্গা	৩৭১	০	০
১০০৩৭	জলকর	পরগনা রাজনগর	১০০	১২	৪৩/৪
৮৬৭৮	জলকর	নয়ানদী রথখলা	৫৬১	০	০
৯৫২৮	জলকর	লাক্ষ্যা	১৮২	০	০
৯৫২৯	জলকর	বানার	১২	০	০
৯৪২৯	জলকর	হাড়িধোয়া	৩১	০	০
৮৩৭৭	জলকর	খোদাদাদপুর	২০০	০	০
৮৬৭১	জলকর	গঙ্গামালঙ্গ	৩৯	১	৭১/৪
৮৮৭৩	জলকর	গঙ্গামালঙ্গ	৮৯	১	৬
৪৩৭৮	জলকর	শাহা গোলাম মেন্দি	১৯২	৭	৫১/২
			১৭৭৮	৬	১১১/২

নিম্নলিখিত মহালগুলির অধিকাংশই জলকর।

মহালের নম্বর	মহালের নাম	সদর জমা		
		টাকা	আনা	পাই
৮২৪৪ তালুক	হরু দর্পনারায়ণ, জলকর নদী বুড়িগঙ্গা	৩৮১	০	০
৯১১২ তালুক	দেবু শ্যামদয়াল মাঝি জলকর গঙ্গামালঙ্গ	৪০	০	০
৯১২১ তালুক	দেবু শ্যামদয়াল মাঝি, তালুক জলকর			
	তিলক ভদ্র, জলকর নারায়ণ গঙ্গা—	১৫	০	০
২৭৩৪ তালুক	আনন্দীরাম দাস—	৯	৯	৭
৭৩৩৬ তালুক	তালুক বিহারী দাস—	১৯	০	০
৫৮৯৭ তালুক				
	বাঘ মারা কাশিমপুর—	২৫	৭	১১
৮০৫৪ তালুক	ডিহিভাগলপুর জলকর বাঙ্গসা—	১১৪	০	০
		৬০৪	১	৬

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার পনেরটি বৃহৎ নদনদীর জলকর ৭২৫ পাউন্ড ১৮ শিলিং ৮ পেন্স আদায় হইত। তাহার তালিকা দেওয়া গেল[২]।

	পাউন্ড	শিলিং	পেন্স
মরাগঙ্গা	২	১১	০
লাক্ষ্যা	৩৫	০	০
ব্রহ্মপুত্র	১০	১০	০
ধলেশ্বরী	১৩১	৮	০
ইছামতী বা ইলিসামারী	৬১	৪	০
গাজখালি	৩১	৫	৯
পদ্মা	১২৪	৬	
তুরাগ	১৫২	০	০
কালীগঙ্গা	২৬	২	০
হাড়িধোয়া	৫	১৬	০
নারায়ণীগঙ্গা	৩৮	১৫	২
বুড়িগঙ্গা	৩৮	২	০
খোদাদাদপুর	৩৬	৪	০
রামগঙ্গা	৩১	১৫	৯
তালুকআনন্দীরাম দাস	০	১৯	০
	৭২৫	১৮	৮

ঢাকা জেলার মৎস্য আমদানির তুলনায় ইহা তৎকালে প্রচুর আয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল না। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মৎস্য মাশুল ৮০০০ পাউন্ড হইতে ১০০০০ পাউন্ড হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।[৩]

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ১০ ফুট লম্বা একটি হাঙ্গর মেঘনাদ নদে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়, কিন্তু হাঙ্গর এই জেলার কোথাও দৃষ্ট হয় না।

বড় বড় নদীতে শিশুক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুকের তৈল বাতরোগের অমোঘ ঔষধি। এক একটি শিশুকে অর্ধমণ হইতে দেড় মণ পর্যন্ত তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পদ্মার চাইন ও ইলিশ মৎস্য এবং ধলেশ্বরীর ইলিশ মৎস্য সুস্বাদু। মানিকগঞ্জের এবং বিক্রমপুরের কৈ ও চিংড়ি খুব প্রসিদ্ধ।

লাক্ষ্যার বাচার খ্যাতি খুব আছে। বঙ্গের অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ সুস্বাদু মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মেঘনাদের টেকচাদা মৎস্য উল্লেখযোগ্য।

পশু :

অশ্ব, গর্দ্দভ, বন্যশূকর, গরু, ভেড়া, ছাগল মহিষ, হরিণ, ব্যাঘ্র, চিতা, কুকুর, বিড়াল, ভল্লুক, খেঁকশিয়াল, উদ, সজারু, শশক, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ছুচো, বানর, উল্লুক, খাটাশ প্রভৃতি নানাবিধ পশু এই জেলায় পাওয়া যায়।

গঞ্জ, সম্ভর, সুকী, সগ্রা এই চতুর্বিধ প্রকারের হরিণ এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খাচর ও বাঙ্গর ভেদে মহিষ দ্বিবিধ। বাঙ্গর অপেক্ষা খাচর ভীষণতর। মেঘনাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে পালিত মহিষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

গরু ও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য চালাকচর ও ঝিটকার হাট সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকাই গরু বঙ্গ প্রসিদ্ধ। বস্তুত এরূপ উৎকৃষ্ট গরু বঙ্গদেশের আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার প্রদর্শনীতে ঢাকার জে, পি. ওয়াইজ সাহেবের ষণ্ডটী বঙ্গের গোকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ঢাকার খেদা আফিসের বড় সাহেব ডেল্‌রিম্পল ক্লার্ক সাহেবের একটি প্রকাণ্ডকায় গাভি আমরা সন্দর্শন করিয়াছি। উক্ত পয়স্বিনীটি ত্রিশ সের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। এতদ্ব্যতীত ঢাকার মিউনিসিপ্যালিটির ষণ্ডটিও আকারে কম বৃহৎ ছিল না।

নবাব সায়েস্তা খাঁ দিল্লি হইতে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট বৃষ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাদের সন্তান সন্ততি "দেওশালী গরু" নাম পরিচিত। ঢাকাতে যে আহির গোয়ালার সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে উহাদিগের পূর্বপুরুষগণকে সায়েস্তা খাঁ দেওশাল গাভি প্রতিপালন করিবার জন্য ঢাকায় আনয়ন করিয়া ছিলেন।

ভাওয়াল অঞ্চলের ডোম, ঋষি ও চামারগণ বরাহ প্রতিপালন করিয়া থাকে। ঢাকাতে শ্বেত বরাহও দৃষ্ট হয়।

গভর্নমেন্টের খেদায় ধৃত হস্তী সমূহ পিলখানায় রক্ষিত হইত। মধুপুরের জঙ্গলে পূর্বে হস্তী পাওয়া যাইত। ময়মনসিংহের ভোলানাথ চাকলাদার কাপাসীয়ার নিকটে একটি খেদা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই খেদার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

গৃহপালিত পশুপক্ষীর উন্নতি সংসাধন জন্য কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে পূর্বে ঢাকায় একটি আদর্শ ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ভাওয়াল অঞ্চলে সাধারণ পাঠার মূল্য ছিল চারি আনা। খাসি একটি এক টাকা মূল্যেই পাওয়া যাইত। এক্ষণে ৩ টাকার কমে একটি অজশিশু এবং ৫ টাকার কমে একটি খাসি পাওয়া দুর্লভ।

পক্ষী ও পঙ্গপাল :

গৃধিণী, শকুনি, চিল, কোড়া, বাজ, কোরাল, টিয়া, চন্দনা, ময়না, চরুই, বাবুই, বন্যকুক্কুট, পায়রা, হরিকল, ঘুঘু, টুনি, দুর্গাটুনি, ডাহুক, শালিক, দোয়েল, শ্যামা, হরবোলা, ময়ূর, পেচক, কুড়াইলা, বক, মাছরাঙ্গা, হারগীলা, শামুকভাঙ্গা, কাক, বুলবুল, পিপি, তিতর, খঞ্জন, দাড়কাক, পাণিকাউর, বউ কথা কও, বাউর, কুক্কুট, সারস, রামশালিক, ঢুপি, বাদুর, মদনা, তোঁতা, হংস, রাজহংস, মোরগ প্রভৃতি পাখি এই জেলায় দৃষ্ট হয়।

মাণিকজোড়, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, শ্যামা প্রভৃতি পাহাড়িয়া পাখি হেমন্তকালে এই জেলায় আগমন করে এবং বর্ষার প্রারম্ভেই এখান হইতে অদৃশ্য হয়।

সোনাগঙ্গা এখন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট

একটি সোনাগঙ্গা দেখিয়া ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। উহা লম্বায় ৪২ ইঞ্চি ছিল।

এক সময়ে মৎস্যরাজ পক্ষীর পালক এই জেলা হইতে চিন ও ব্রহ্মদেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইত। মগেরা ইহার পালকদ্বারা তাহাদিগের পোশাক প্রস্তুত করিত।

বুলবুল ও কোঁড়া দ্বারা শিকারিগণ শিকার করিয়া থাকে। বুলবুলের লড়াই একটি চমৎকার দৃশ্য। এক্ষণেও শহরের তাঁতিবাজার, নবাবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে "লড়াই করিবার জন্য" বহু যত্ন সহকারে বুলবুল প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পানীভেলা পক্ষী দ্বারা শিকারিগণ পদ্মা নদীতে শিকার কবে।

পঙ্গপালের উপদ্রব এই জেলায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সরীসৃপ প্রভৃতি :

কচ্ছপ, কমঠ, কুম্ভীর, কৃকলাস, টিকটিকি এবং কোব্রা, গোমা, দারাইস, দুবরাজ, উলবোরা, জিঙ্গলাপোড়া, লাউটেপা, ঘনিয়া, মেটেসাপ, ধোরা, আইরলবেকা, শালিকবোরা, শঙ্খিনী, ধ্যামুয়া, দুমুখো, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি সরীসৃপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পদ্মা, মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও যবুনার বর্ষাকালে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়।

সুত্রাপুরের বাজার এবং ধনকুনিয়ার হাট কচ্ছপ ও কমঠ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

দ্বাদশ অধ্যায়
শিল্প

শিল্প :

শিল্পগৌরবে ঢাকা জেলা বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত-সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পীকুলকে রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ শাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের জন্য সমগ্র জগৎ যে এক সময়ে সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে শিল্প এত উন্নত হইয়াছিল এবং যাহার সম্মুখে আরও কত উন্নতির আশা ছিল, অদৃষ্টনেমীর আশ্চর্য পরিবর্তনে তাহা আজ ভস্মীভূত হইয়াছে, ইতিহাসের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য এই যে, ঢাকার শিল্পসম্ভার প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে প্রাণ হারায় নাই। 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থ প্রণেতা মহাপ্রাণ ডঃ টেইলার অতি দুঃখেই বলিয়াছেন,

"From this recapitulation of the more prominent facts connected with the sources of industry in this part of the country it will be seen that Commercial history of Dacca presents but a melancholy retrospect."[১]।

আমরা এই অধ্যায়ে, অতীতের সুমধুর স্মৃতিটুকু লইয়া ঢাকার শিল্পোন্নতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব।

(ক) বস্ত্রশিল্প :

প্রাচীনত্ব—ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চীনের মৃণ্ময় বাসন এবং দামাস্কাসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতের অন্য কোনও শিল্পই ঢাকার বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে বাবেলোনিয়া এবং এসেরিয়া প্রদেশে যে সময়ে সভ্যতার চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল, সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকটে সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিল ; একথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনস্বীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বাইবেলের যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা টীকা-টিপ্পনী সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে বাইবেলের কোনও কোনও স্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের ন্যায় একপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহা যে ভারতীয় মসলিন হইতে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই[২]।

তৎকালে শত শত বাণিজ্যতরণি বঙ্গদেশ হইতে পেলেস্টাইন বন্দরে উপনীত হইয়া পণ্যসম্ভারের আড়ম্বরে বৈদেশিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন "রোমক বণিকগণের ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। রোমক মহিলাকূল সেই সমস্ত সুচিক্কণ মসলিনের অন্তরাল হইতে আপনাদিগের অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতেন"[৩]।

প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন "তিন সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল[৪]। মিঃ ইয়েট্স বলেন "খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিশতাব্দীতে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র গ্রিস দেশে বিক্রীত হইত[৫]।

গ্রিস দার্শনিক এবং ব্যঙ্গকাব্য লেখকগণ নানাবর্ণ রঞ্জিত চারুচিকন বসন সজ্জিত বিলাস ব্যসনামোদী গ্রিক যুবকগণের প্রতি সমালোচনার তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন ; ঢাকার অতি সূক্ষ্ম ঝুনা মলমলই যে তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার বিষয় তাহা তাঁহাদিগের লেখা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। Juvenal এই সূক্ষ্ম বস্ত্রকে multitia নামে অভিহিত করিয়াছেন[৬]।

প্রাচীনকালে ঢাকায় এরূপ সূক্ষ্ম মলমল প্রস্তুত হইত যে, বিংশতি হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানা বস্ত্রখণ্ড পক্ষীপালকের ন্যায় ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলিত[৭]।

এরিয়েন তদীয় Periplus of the Erythrean sea নামক নৌসম্বন্ধীয় পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ; এরিয়েন খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

কার্পাস :

সংস্কৃত কার্পাস শব্দে তুলা বুঝায়। হিব্রু—কার্পাস, পারসি কারবস্ এবং হিন্দি কাপাস একই অর্থব্যঞ্জক। কার্পাস শব্দ Esther গ্রন্থে উল্লিখিত আছে[৮]। কার্পাস হইতে প্লিনির সময়ে carpassium or carpassian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শব্দ দ্বারা তৎকালে সমুদয় বস্ত্রই সূচিত হইত। ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়া নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে কার্পাস শব্দ এই কাপাসিয়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে[৯]।

নবম শতাব্দীতে লিখিত মোসলমান ভ্রমণকারীদ্বয়ের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতীয় মসলিন বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল[১০]।

১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে Barbosa ডুরিয়া ও সাদা মসলিনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে "মোহিত"[১১] নামক গ্রন্থে মসলিন-নির্মিত শিরস্ত্রাণ, ওড়না এবং বহুমূল্য মলমলশাহীর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মলমলশাহী ও মলমলখাস অভিন্ন। ১৫৮৪ খ্রিঃ সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাপ্ফ্ফিচ্ লিখিয়াছেন "সোনারগাঁ পরগনাতেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়।"

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ঢাকার মসলিনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তম মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ ঢাকাই মসলিনের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লির বেগমমহলে ঢাকাই মসলিন একাধিপত্যলাভ করিয়াছিল ; যাহাতে এই মসলিন ভারতের বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য ইহারা রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন "পারস্যের রাজদূত মহম্মদ আলি বেগ ভারত হইতে, প্রত্যাগমনকালে পারস্যের শাহকে উপহার দেওয়ার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন অতি ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের মালার মধ্যে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং অর্ধ গজ প্রস্থ একখণ্ড মসলিন অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র মধ্য দিয়া একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যাইতে[১২]।

১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্যন্ত লম্বা একখানা মলমলের ওজন ৪ তোলা মাত্র হইত। এই প্রকার মলমল দিল্লির বাদশাহদিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে এই মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসরে সোনারগাঁয়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মলমল প্রস্তুত হয় ; উহার ওজন হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা। পূর্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

মসলিনের সূতা :

"ঢাকার বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস" প্রণেতা, অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এক পাউন্ড ওজনের একফেটি সূতা তাহার সমক্ষে পরিমাপ করা হইলে উহা ২৫০ মাইল লম্বা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কলের সূতা অপেক্ষা এই সূতা নরম ; কিন্তু কলের প্রস্তুত মসলিন অপেক্ষা হস্ত নির্মিত মসলিন শক্ত। একজন তন্তুবায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে চরকায় সূতা কাটিয়া একমাসের মধ্যে মাত্র অর্ধতোলা পরিমিত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। এই প্রকার এক তোলা সূতার মূল্য ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮ টাকা মাত্র ছিল।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত Trigonometrical Survey গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনাদ এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপি প্রায় সমুদয় স্থানেই উৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত[১৩]।

ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত। মুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া এবং লাক্ষ্যা নদীতীরস্থ অন্যান্য গ্রামে নানাবিধ মসলিন সর্বদাই প্রস্তুত হইত। আবদুল্লাপুরের রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। কলাকোপা প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। হলদিয়ার ছিট ও লুঙ্গি, ঢাকা জেলায় সুপরিচিত ছিল। অধুনা নানা কারুকার্যসমন্বিত সুচিক্কণ জামদানি ও মলমল, নপাড়া, মৈকুলি, বৈহাকের, চরপাড়াবাশটেকী, নবিগঞ্জ, উত্তর শাহাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হয়।

বয়ন :

আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসই মসলিন প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। একখানা ডুরিয়া বা চারখানা মসলিন প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইত। সর্বোৎকৃষ্ট মলমল খাস অথবা সরকারআলি অর্ধ থান বয়ন করিতে ৫/৬ মাস কাল লাগিত। উহার মূল্য ৭০/৮০ টাকা অবধারিত ছিল।

মসলিন[১৪] :

জগত প্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ কার্পাস বস্ত্র। ইংরেজ বণিকগণ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মছলীপত্তন বন্দর হইতে পূর্বে মসলিন লইয়া যাইত। তাহাদের বিশ্বাস, মছলী বা মসলী অথবা অপভ্রংশ মসলিয়া শব্দ হইতে স্থান মহাত্ম্য-জ্ঞাপনার্থ এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তুর্কের সুলতান বা প্রাচীন খালিফাগণ স্ব স্ব ভোগ সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য বহুপূর্ব কাল হইতে এই সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ বস্ত্র শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদরূপে ব্যবহার করিতেন। মোসলমান বণিকগণ ঢাকা জেলার প্রস্তুত প্রসিদ্ধ মলমল বস্ত্র তুর্কের রাজধানী মোসল নগরে লইয়া যাইত। পরে ঢাকার তন্তুবায়সমিতির অবনতি বা হ্রাস নিবন্ধন হউক, আর পর্তুগিজাদি জলদস্যুর প্রভাবেই হউক ঢাকাই মলমল বস্ত্রের প্রসার কমিয়া যায়। সেই সময়ে শৌখিন তুর্কগণ মোসল নগরে সূক্ষ্ম মলমল বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করে। মোসলের সূক্ষ্মতম কার্পাস বস্ত্রগুলি মোসলী বা মসলিন আখ্যায় অভিহিত হয়।

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। ঝুনা :

হিন্দি ঝিনা—সূক্ষ্ম হইতে ঝুনা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক মাকড়সার জালের ন্যায়। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারকগণ ইহাকে অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্না দেবযোনীগণের কোমল কর-সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৫]। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ ; ওজন ৮½ আউন্স।

বিলাসী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্তকী ও গায়িকাবর্গই সাধারণত ইহা ব্যবহার করিত। "কৃলভা" নামক একখানা প্রাচীন তিব্বতীয় গ্রন্থে ঝুনা মসলিনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণও এই সূচিক্কণ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাহাতে লিখিত আছে। একদা কলিঙ্গরাজ একখানা ঝুনা মসলিন কোশলরাজকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'Gt sing Dgah-mo' নাম্নী স্খলিতচরিত্রা জনৈক ধর্মযাজিকা কোনও প্রকারে উহা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। তিনি একদা এই বস্ত্রখানা পরিধান করিয়া সর্বসমক্ষে বহির্গত হইলে, "নগ্নদেহে" লোকলোচনের গোচরীভূত হইবার জন্য তাহাকে অবমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছিল। অতঃপর, ধর্ম যাজিকাগণকে কেহই এবম্বিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে পারিবে না এবং তাহারাও উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল[১৬]।

২। রং :

ইহা প্রায় ঝুনা মসলিনের ন্যায়ই সূক্ষ্ম। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন প্রায় ৮ আউন্স ৪ ড্রাম। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১২০০।

৩। সরকার আলি :

ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সন্নিবিষ্ট হইলেও ইহা অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। বঙ্গের নবাবগণের জন্যই ইহা প্রস্তুত হইত। সরকার আলি নামে এক প্রকার বাদশাহী জায়গিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দিল্লিশ্বরের জন্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মলমল ঢাকা জেলায় প্রস্তুত হইত তাহার ব্যয় সঙ্কুলান জন্যই এই জায়গিরের সৃষ্টি হইয়াছিল। নবাব ও সুবাদারগণ প্রতি বৎসর সম্রাটকে যে সমুদয় দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন তন্মধ্যে সরকার আলি অন্যতম। সরকার আলি জায়গিরলব্ধ রাজস্ব ইহার প্রস্তুত জন্য ব্যয়িত হইত বলিয়া ইহা "সরকার আলি" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ ; ওজনে ৪ আউন্স কি ৪½ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

৪। খাসা :

পারসি "খাসা" (উৎকৃষ্ট, সুদৃশ্য) শব্দ হইতেই খাসা মলমলের নামকরণ হইয়াছে। ইহার সূত্রগুলিও ঘন সন্নিবিষ্ট। আবুল ফজল তদীয় আইন-ই আকবরি নামক গ্রন্থে এই মলমলকে "কসাক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাঁও অঞ্চল উৎকৃষ্ট "খাসা মলমল" প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল[১৭]। সর্বোৎকৃষ্ট খাসা মলমল "জঙ্গলখাসা" নামে অভিহিত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ হইতে ১½ গজ ; ওজন ১০½ হইতে ২১ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০ হইতে ২৮০০।

৫। সবনম্ :

এই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রূপকচ্ছলে পারসি ভাষায় "সান্ধ্য শিশির (evening dew) বলিয়া অভিহিত হইত। শ্যামল তৃণ শষ্পোপরি ইহা আস্তীর্ণ করা গেলে শিশির নিষিক্ত দূর্বাদল বলিয়া ভ্রম জন্মিত। একদা পরীক্ষাচ্ছলে নবাব আলিবর্দী খাঁ একখানা সবনম্ মল মল ঘাসের উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে একটি গরু ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়া ছিল[১৮]। জনৈক ইয়োরোপীয় কবি এই বস্ত্রকে "বায়ুর জাল" বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন[১৯]। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১০ হইতে ১৩ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ হইতে ১৩০০।

৬। আবরোয়ান :

আব্—জল, রোয়ান—প্রবাহিত হওয়া। নির্মল সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ইহা অতিশয় স্বচ্ছ,

এজন্যই ইহার নাম আব্‌রোয়ান। জলের সহিত এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া বুঝা যায় না। কথিত আছে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এক কন্যা এই বস্ত্র পরিধান করিয়া পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইলে পিতা তাহাকে আব্রুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলিলেন, "তবু আমি সাত পুরু কাপড় পরিয়াছি"[২০]। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৯ হইতে ১১½ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ হইতে ১৪০০।

৭। আলাবাল্লে :

তন্তুবায়কুল আল্লাবাল্লে শব্দের অর্থ করেন অতি উৎকৃষ্ট। ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সমাচ্ছন্ন। "Sequel to the Periplus of the Erythrean Sea" নামক পুস্তিকায় ডাক্তার ভিন্‌সেন্ট এই বস্ত্রকে "abolla" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন "abollai" এই গ্রিক শব্দটি, লাটিন abollai শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লাটিন abolla শব্দে সৈনিকের কুর্তা বুঝায়। এরিয়েন ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কেই সম্ভবত এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় "আল্লাবাল্লে" সংজ্ঞক মলমলকেই তিনি abollai বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৯ হইতে ১৭ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১১০০ হইতে ১৯০০।

৮। তাঞ্জেব :

পারসি "তনু"—শরীর, এবং জেব—অলঙ্কার। ইংলন্ড ইহা তাঞ্জেব নামে সুপরিচিত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

৯। তরন্দাম :

তন্তুবায়গণ এই শব্দের অর্থ 'আঙ্গরাখা' বলিয়া থাকেন। আরবি "তুরা"—রকম, এবং পারসি "উন্দাম" শরীর, এই দুইটি শব্দের একত্র সংযোগে তরন্দাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে "তেরেন্দাম" নামে ইহা ঢাকা হইতে ইংলন্ড রপ্তানি হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ। ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১০০০ হইতে ২৭০০।

১০। নয়নসুক :

ইহা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের। আইন-ই আকবরি গ্রন্থে ইহা "তুনসুক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল ইহার মূল্য ৪ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্যন্ত নির্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১½ গজ ; প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০ হইতে ২৭০০।

১১। বদনখাস :

নয়ন সুকের ন্যায় ইহার সূত্রগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। দৈর্ঘ্য ১০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১½ গজ, ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০।

১২। সরবন্দ :

সুর (মস্তক) ; বন্ধনা (বন্ধন করা) এই দুইটি শব্দের সমবায়ে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা শিরস্ত্রাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্ধ গজ হইতে এক গজ, ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২১০০।

১৩। সরবতি :

সরবতি শব্দের অর্থ মোচড়ান অথবা কুণ্ডলীকৃতভাবে জড়াইয়া রাখা। ইহাও শিরস্ত্রাণ রূপে ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সরবন্দের অনুরূপ।

১৪। কুমীস :

আরবি কুমীস্ (সার্ট) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বস্ত্র দ্বারা মোসলমানগণ কুর্তা প্রস্তুত করিতেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১০ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০।

১৫। ডুরিয়া :

ড়রিয়া প্রস্তুত প্রণালি একটু স্বতন্ত্র রকমের। দুইটি সূত্র একত্র পাকাইয়া ইহার তানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং বয়ন করিলে উহা ডুরিয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বেঙ্গা ও সেরোঞ্জ জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের তুলা হইতে সুতা কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য নিষ্পন্ন হইত। ডুরিয়া মসলিন নানাবিধ। যথা, ডোরাকাটা, রাজকোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, কাগজাহি, কলাপাত প্রভৃতি। দৈর্ঘ্য ১০ গজ হইতে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ ১½ গজ পর্যন্ত।

১৬। চারখানা :

এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের সূত্রদ্বারা নির্মিত। ইহা ডুরিয়ারই অনুরূপ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ডুরিয়ার ন্যায়। ড়রিয়া ও চারখানার "ডোরা"গুলির আয়তন সমান নহে। "Periplus of the Erythrean sea" গ্রন্থে ইহা Dia krossia নামে ভারতীয় বস্ত্রসমূহ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। Apollonias. Dia krossia শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ডুরিদার। চারখানা ছয় প্রকার যথা—নন্দন শাহবী, আনার দানা, কবুতরখোপা, সাকুতা, বাছাদার, কুণ্ডিদার।

১৭। জামদানি :

ঢাকার জামদানি বস্ত্র বিখ্যাত। উহার ফুল ও অন্যান্য কারুকার্য তাঁতেই তোলা হয়। সুনিপুণ তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়ন করিতে করিতে যথাস্থানে বংশ নির্মিত সূচি শাহায্যে প্রতান সূত্রের সহিত ফুলের সূত্র বসাইয়া দেয়। সোজা, বাঁকা, সকল দিকেই ইহারা ফুলের সারি রাখিয়া দেয়। বাঁকা সারি হইলে তাহাকে তেড়ছা বলে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক ফুল কাঁটা হইলে তাহাকে বুটিদার কহে।

পূর্বে ইহার বয়ন কার্যে ২০০ শত হইতে ২৫০ নম্বরের সূত্র ব্যবহৃত হইত। জামদানি বস্ত্র প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশি। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তিনি ইহার এক একখানা ২৫০ টাকা মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ প্রত্যেকখানা জামদানি বস্ত্র প্রস্তুত করিবার খরচ স্বরূপ ৪৫০ টাকা প্রদান করিতেন। Periplus of the Erythrean sea গ্রন্থে ইহা Skotulats বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৭০০।

জামদানি বস্ত্র নানাবিধ, যথা—তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলিজাল, চাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।

জামদানি বস্ত্রের নির্মাণকার্য মোগল গভর্নমেন্টের হস্তে একচেটিয়া ছিল। সর্বোৎকৃষ্ট জামদানি বস্ত্র মুর্শিদাবাদের নবাবগণের জন্যই প্রস্তুত হইত। ঢাকা আড়ং-এর তন্তুবায়গণই সাধারণত ইহা প্রস্তুত করিত। এজন্য ঢাকার সদর মলমল খাস কুঠির দারোগা তন্তুবায়দিগকে দাদন দিয়া রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল খাস কুঠিতে দারোগার কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানি বস্ত্রই প্রস্তুত হইত। অধিকাংশ বস্ত্রই তন্তুবায়গণ স্বীয় গৃহে বয়ন করিতেন। কিন্তু তাহারা ৩ গিনির অধিক মূল্যের মসলিন অপরের নিকটে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। এজন্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় এই উভয়বিধ বণিকসম্প্রদায়ই মসলিনের ব্যবসায়ের জন্য দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত[২১]।

তন্তুবায়গণকে "ছাপ্পা জামদানি" নামে একপ্রকার কর প্রদান করিতে হইবে। গভর্নমেন্টের অজ্ঞাতসারে জামদানি বস্ত্র বিক্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্তির জন্যই তন্তুবায়কুল এই কর প্রদান করিত। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে এই কর রহিত হয়[২২]।

এখনও ২০০ টাকা মূল্যের অত্যল্প সংখ্যক কয়েকখানা জামদানি মসলিন ত্রিপুরার মহারাজা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের জন্য ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪০০ টাকা মূল্যের জামদানি মসলিনও মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত করিতে দেখা যায়[২৩]।

ঢাকা শহর ব্যতীত নাস্তি, জেমরা, ধামরাই, কাচপুর, সিদ্ধিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও জামদানি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮। মলমলখাস :

দিল্লির সম্রাটগণের ব্যবহারার্থ ইহা প্রস্তুত হইত। এই মসলিন এরূপ সূক্ষ্ম যে একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দিয়া সমুদয় বস্ত্রখণ্ড একদিক হইতে অপরদিকে টানিয়া নেওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন আট তোলা ছয় আনা। মূল্য সাধারণত ১০০ টাকা। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৮০০ হইতে ১৯০০।

মলমলখাস মসলিন প্রস্তুত করিবার জন্য সুবাদারগণের নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক ঢাকা ও সোনারগাঁয়ের কুঠিতে অবস্থান করিত। উহা মলমলখাসকুঠি নামে অভিহিত হইত। তন্তুবায়গণের কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন দারোগা মলমলখাসকুঠির অধ্যক্ষস্বরূপ তথায় সর্বদা অবস্থান করিতেন। তাঁতের কার্যে যাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, এরূপ লোকদিগকেই মলখাস কুঠির কার্যে নিযুক্ত করা হইত। এই সমুদয় তন্তুবায়গণের নামের একখানা রেজেস্ট্রির বহি কুঠিতে রাখা হইত। প্রত্যেক কার্যকারক প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে কুঠিতে উপস্থিত হইয়া কার্য করিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দারোগার কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল[২৪]।

প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য সুসম্পন্ন হইল কিনা তাহার পরীক্ষা দারোগা স্বয়ং করিতেন। কার্যারম্ভের পূর্বে দারোগার অধীনস্থ কর্মচারী সূতাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিত। আদর্শ মলমলখাসের সূতার সহিত তুলায় উহা সমশ্রেণির বলিয়া বিবেচিত হইলে কার্যারম্ভ করিতে দেওয়া হইত। এরূপ কঠিন ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়াই মলমলখাস প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিত[২৫]।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের মসলিন মধ্যে মলমলখাসই অত্যন্ত মনোরম। সূক্ষ্মতায় ও ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবরোয়া, সব্‌নম্, সরকার আলি, তুঞ্জেব যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানীয়।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিনের সহিত য়ুরোপজাত মসলিনের তুলনা করা হয়। ফলে ঢাকাই মসলিনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই বিষয়ে ওয়াটসন সাহেবের উক্তি বড়ই মর্মস্পর্শী। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"However viewed therefore, our manufacturers have something still to do. With all our machinery and wondrous appliances, we have hither to been unable to produce a fabric which for fineness and ultility can equal the 'woven air' of Dacca—The product of an arrangements which appear rude and primitive but which in reality admirably adapted for their purpose"[২৬]।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতেব শিল্প প্রদর্শনীতে প্রেরিত মলমলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল[২৭]।

নাম	রকম	দৈর্ঘ্য প্রস্থ,	ওজন	মূল্য
১। আব্‌রোয়া	সাদা মসলিন	২০ × ১ গজ	৭ ১/২ আউন্স	৬ পা—৪শি
২। সরকার আলি	"	"	৬ ৩/৪ আউন্স	"
৩। সবনম্	"	১৯গ ১৪ই × ৩৪ই	৬ ১/২ আউন্স	৩—৪—"
৪। তুঞ্জেব	"	২১গ ৫ই × ১গ	১২ ১/৪ আউন্স	৫—০—"
৫। নয়নসুখ	"	১৯গ ১৮ই × ১গ	৭ই ১পা ২ ১/৪	৪—০—"
৬। জঙ্গল খাস	"	২১গ ৬ই × ১গ	৫ই ১পা ৯ ১/২	৫—২—"

কর্মচারীগণের উৎপীড়ন :

নবাবি কর্মচারীগণ তন্তুবায়গণের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে মলমলখাসকুঠির কর্মচারীগণ তন্তুবায়গণের শ্রমলব্ধ অর্থের অংশ হইতে শতকরা ২৫ টাকা হারে কর্তন করিয়া রাখিত বলিয়া ঢাকার রেসিডেন্ট লিখিয়া গিয়াছেন।

Abbe Raynel ঢাকার তন্তুবায় কুলের অবস্থা বর্ণনায় এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ইহারা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্টকার্য পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের কর্মচারীগণ উহাদিগের দ্বারা বেশি কাজ করাইয়া লইয়া তদ্ধাবদে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে সর্বদাই কার্পণ্য করিত ; এবং কার্য করিবার সময়ে উহারা একপ্রকার বন্দী অবস্থায়ই কালযাপন করিত[১৮]।

বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্তুতের জন্য প্রতি বৎসর যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা দিল্লিশ্বরের প্রাপ্য বার্ষিক নজরানা স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বাংলার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত হইত এবং সরকার আলি জায়গিরের হিসাবে খরচ লেখা হইত।

বিভিন্ন সময়ে মলমলখাস বস্ত্রের মূল্য কত ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে[১৯]।

প্রস্তুতের সময়—দৈর্ঘ্য প্রস্থ—তানার সূতার পরিমাণ—ওজন—মূল্য।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের

শাসন সময়ে—১০ গজ ৩৫" × ১ গজ ৩½"। ১৮০০। ১০ তো। ১০০ আর্কটমুদ্রা

১৭৯০। ১৮০০—১০ গজ ৩৫" × ১ গজ ৩½"। ১৮০০। ১২½—৮০ আর্কটমুদ্রা

১৮৫০—১০ গজ × ১ গজ। ১৮০০ ৪½—১০০ আর্কটমুদ্রা

নবাব জাফর আলিখাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেব সন্নিধানে প্রতিবৎসর ৫০০ খানা মলমলখাস বস্ত্র নজরানাস্বরূপ প্রেরণ করিতেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম নসরতজঙ্গ বাহাদুর প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে নবাব জাফর আলির প্রদত্ত উপঢৌকনাদির যে একটি তালিকা কমার্সিয়েল রেসিডেন্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। মলমলখাস ব্যতীত সুবর্ণ ও রৌপ্যের বাদলা, পাখা, শ্রীহট্টের ঢাল, নগকেশরের আতর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ঢাকা হইতে প্রেরিত হইত বলিয়া জানা যায়। সমুদয়ে মোট ১২৭৮৭১¾ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ঢাকা আড়ত

১০০ খানা জামদানি ধুতি ২৫০ টাকা হিসাবে	২৫০০০ টাকা
৫০ খানা জামদানি রেশমী বুটাদার ২০০ টাকা হিসাবে	২০০০০ টাকা
৬০ খানা রেজা অর্থাৎ রৌপ্য সূত্রের কারুকার্য খচিত মসলিন ১০০০ টাকা হিসাবে	৬০০০ টাকা
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ	১৪৮০ টাকা
	৪২৪৮০ টাকা

সোনারগাঁও আড়ত

১০০ খানা সাদা মসলিন ২০০ টাকা হিসাবে	২০০০০ টাকা
২০ খানা সাদা সরবন্দ ৮০ টাকা হিসাবে	১৬০০ টাকা
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ	২৯৫৯¼ টাকা
	২৪৫৫০¼ টাকা

নাগকেশরের আতর	২৬০ টাকা	
৫০ খানা শ্রীহট্টের ঢাল ১৬ টাকা হিসাবে	৮০০ টাকা	
ঢালের কারুকার্য বাবদ	২৬৮০ টাকা	
	৩৪৮০ টাকা	
১০০ খানা সুবর্ণ সূত্রের জরাও করা লাঠি এবং		
২০০ খানা তালপত্রের পাখা		২০০ টাকা
উহার কারুকার্য খরচ		৪০০০ টাকা
		৪২০০ টাকা
সোনার বাদলা		৫০০০ টাকা
রৌপ্য বাদলা		১১০০০ টাকা
		১৬০০০ টাকা

বিভিন্ন বস্ত্রাদি :

মসলিন ব্যতীত নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদিও ঢাকা জেলায় নানা স্থানে প্রস্তুত হইত।

বাফ্তা :

বাফ্তা কলাকোপা নামক স্থানে বিস্তর প্রস্তুত হইত। ইহা খুব মোটা ; সাধারণত গাত্র বস্ত্র স্বরূপেই ব্যবহৃত হইত। বাফ্তা নানাবিধ। যথা, হাম্মাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। দৈর্ঘ্য ১২ গজ, প্রস্থ ১ গজ।

বুন্নি :

হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সর্বজাতীয় লোকের নিকটেই বুন্নির আদর ছিল। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ।

একপাট্টা ও জোর :

সাধারণত হিন্দুগণই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। দৈর্ঘ্য ২ গজ হইতে ৩ গজ, প্রস্থ ১$\frac{১}{২}$ গজ।

হাম্মাম :

গামছার ন্যায়। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১$\frac{১}{২}$ গজ।

লুঙ্গি :

মোসলমানগণ ইহা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কসিদা :

বূটাতোলা মসলিন "কসিদা" নামে পরিচিত। কসিদা নানাবিধ। তন্মধ্যে কাটাউরমী [৩০] নৌবত্তি, আজিজুল্লা এবং দোছাক প্রধান। কার্পাস সূত্র ও রেশমের সংমিশ্রণে কসিদা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কার্পাস সূতা দ্বারা কসিদা বস্ত্রের যে অংশ বুনন হয় তাহাতে সিবন শিল্প সন্নিবেশিত করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ১$\frac{১}{৪}$ গজ হইতে ৬ গজ, প্রস্থ ১ হইতে ১$\frac{১}{৪}$ গজ পর্যন্ত হয়। সাধারণত আরবদেশেই ইহার সমাদর অধিক। কখনও কখনও রেঙ্গুন, পিনাং প্রভৃতি সুদূর পূর্বাঞ্চলেও ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু জিদ্দা নগরেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়।

মক্কার সন্নিকটবর্তী মিনার নামক স্থানে যে একটি সাম্বৎসরিক মেলার অধিবেশন হয় তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কসিদা বস্ত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। আরব, পারস্য ও তুরস্ক দেশীয়

সৈনিকগণের শিরস্ত্রাণ ও ফতুয়া এবং মহিলাকুলের ঘাঘরা এই কসিদা বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়।

পূর্বে ৫০/৬০ রকমের কসিদা বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহার এক এক খানা ৫০০ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইত।

রেশমবিহীন কার্পাস সূত্রের কসিদা বস্ত্র "চিকন" নামে সুপরিচিত। চিকন বস্ত্রে নানা বর্ণের সূত্রাদিযোগে পুষ্প প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করা হয়। হিন্দি ভাষায় এই কার্যকে চিকনকারি ও চিকন দাজি বলে। সাধারণত স্ত্রীলোকগণই কসিদার বুটা ও উহার অন্যান্য সূচিশিল্প প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখনও ঢাকার প্রতি তন্তুবায় পল্লিতেই গৃহকার্য সমাপন করিয়া পুরাঙ্গনাগণ অবসরমত এই কার্য করিয়া থাকেন। ধোপানিগণও তাহাদিগের যাবতীয় কাজকর্ম পরিসমাপ্ত করিয়া অবসর মতে কসিদার কার্য করিত। মোসলমান রমণীকুল মধ্যেই ইহার প্রচলন অত্যন্ত বেশি ছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয়া পুরমহিলাগণও এই কার্য করা হেয় মনে করিতেন না ; বরং ইহাতে বিশেষ দক্ষতা ও কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সকলের নিকটে উপহাসনীয় হইতেন।

এইরূপে এক্ষণেরও ঢাকার প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোকই মাসিক ৪ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিয়া থাকে।

কসিদার নক্‌সাগুলি পারস্যদেশীয় জনগণের অভিরুচি অনুসারেই অঙ্কিত হয়। তুরস্ক রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার কসিদা বস্ত্রেরও আদর কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে প্রধান সৈনিক পুরুষগণই কেবলমাত্র কসিদার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিবার অধিকারী। কিন্তু পূর্বে সমুদয় সৈনিকগণকেই ইহা ব্যবহার করিতে হইত।

কসিদা বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য পূর্বে "ওস্তাগর" ও "ওস্তানী"গণ মহাজনদিগের সহিত চুক্তি করিত। যে নমুনার "বুটা" বা কারুকার্য করিতে হইবে পূর্বেই তাহার একটি আদর্শ "চিপিগর" গণ সন্নিধানে প্রেরণ করিবার রীতি ছিল।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে মহম্মদ আলি পাশা ইজিপ্ট দেশে কসিদার কার্য প্রবর্তন করিবার জন্য ঢাকা হইতে অনেক তসর তথায় পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ঐ সমুদয় বস্ত্রখণ্ড ঢাকাতে পুনঃ প্রেরণ করেন।

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ১২০০০০ খণ্ড কসিদা বস্ত্র এখান হইতে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৯৫ সনে ৯০০০০ টাকার কসিদা বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৯৬ সনে কেবল মাত্র আরবদেশেই ২৫০০০০ টাকার বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল।

ঢাকা শহর ব্যতীত, সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাগর প্রভৃতি স্থানের মোসলমান স্ত্রীলোকগণও ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ঢাকা নগরী এবং মাতাইল গ্রামই এই কার্যের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

মিঃ ইউর তদীয় "Cotton manufacture of Hindusthan" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মসলিনের বয়নকার্য জলের নিচে সম্পন্ন হইয়া থাকে।" বলাবাহুল্য যে এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমাত্মক। গ্রীষ্মকালে মসলিন বয়নকালে তন্তুবায়গণ তাঁতের নিচে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিত। কারণ জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া উহা সূতার সংস্পর্শে আসিলে তানার সূতাগুলি একটু নরম হইত বলিয়াই বিদেশীয় লেখকগণের উক্ত রূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মসলিনের ছিট :

নন্দনশাহী, আনারদানা, কবুতরখুপি, সাকুতা, পাছাদার, কুন্তিদার প্রভৃতি মসলিনের নানাবিধ ছিট পূর্বে এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

তাঁত :

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ১৫০০, সোনারগাঁয় ৭০০, ডেমরাতে ৯০০, তিতবদ্দিতে ৩৬০

এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর ও অন্যান্য স্থানে ৭০০, সবশুদ্ধ ৪১৬০ খানা তাঁত ঢাকা জেলাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বস্ত্র ব্যবসা :

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ৪৫০০০০ টাকা সোনারগাঁয়ে ৩৫০০০০ টাকা ডেমরাতে ২৫০০০০ টাকা তিতবদ্দিতে ১৫০০০০ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্বে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় সাধারণত হিন্দু, মোগল, পাঠান, তুরানি, আরমানি, গ্রিক, পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণের হস্তে ছিল, কিন্তু এক্ষণে হিন্দুদিগের হস্তেই ইহা ন্যস্ত রহিয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ কোম্পানি ঢাকাই মসলিন যে মূল্যে খরিদ করিত তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করা গেল[৩১]

মসলিনের রকম	তানা	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গজ	দেশী সূতার প্রস্তুত (১৭৬০-৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)	দেশী সূতার প্রস্তুত (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)	বিলাতি সূতার প্রস্তুত (১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)
ডুরিয়া	১৫০০	৪০ × ২	১২ আর্কট	১৫ সিক্কা	১১ কোম্পানি
ঐ মধ্যম	১৯০০	"	১৮	২০টাঃ ১৫আঃ	১৪
ঐ বড়	"	৪০ × ২।০	২০টাঃ ৪আঃ	২২টাঃ ১০আঃ	১৬
ঐ সূক্ষ্ম	২০০০	৪০ × ২	২৫	২৯	২০
উৎকৃষ্ট চারখানা	২১০০	৪০ × ২	৩০	২৮	১৮
ঐ বড়	"	৪০ × ২	৩৩$\frac{৩}{৪}$	৩৭টাঃ ১১আঃ	২৮
ঐ সর্বোৎকৃষ্ট	"	৪০ × ২	৫০	৪৪	৩০
আব্‌রোয়া	১৪০০	"	৩৬	৩৯টাঃ ২আঃ	২৭
জামদানি	"	২০ × ২	৫০	৩৬টাঃ ৪আঃ	২৪
সরবতি (সাধারণ)	"	৪০ × ২	৫	৭টাঃ ৮আঃ	৬
মলমল	১২০০	"	৭টাঃ ৪আঃ	১০টাঃ ৪আঃ	৭
সূক্ষ্মমলমল	১৩০০	৪০ × ২	৯	১২	৮
ঐ লম্বা	"	৪৮ × ২	১১	১৪	১০
ঐ উৎকৃষ্ট	১৪০০	৪৮ × ২	৩০	৩৩টাঃ ৮আঃ	২২
"	১৬০০	৪০ × ২	২০	২	১৫
ঐ লম্বা	১৮০০	৪৫ × ২	৪৭	৫০টাঃ ৪আঃ	৩৫
আলাবল্লা	১৫০০	৪০ × ২	১০	১৩টাঃ ৮আঃ	৯
ঐ উৎকৃষ্ট	১৭০০	"	১৫	১৭টাঃ ৮আঃ	১৩
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	১৮০০	"	২৫	২৯টাঃ ১৩আঃ	২০
তাঞ্জেব (উৎকৃষ্ট)	"	"	৮	১১টাঃ ১৫আঃ	৯
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	"	"	১৪	১৮	১৪
ঐ চওড়া	১৬০০	৪০ × ২।০	৮	১২টাঃ ১৫আঃ	১০
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	"	৪০ × ২	৩৬	৩৭৬টাঃ ৫আঃ	২৪
ঐ উৎকৃষ্ট	"	"	১৪	১৫টাঃ ১০আঃ	১১
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	"	"	১৯।।০	২২টাঃ ২আঃ	১৬
নয়নসুক উৎকৃষ্ট	২২০০	"	৩৩।।০	৩৩	২২
ঐ	২৫০০	"	৩৩	৩৩	২৪
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	২৭০০	৪০ × ২।০	৫০	৫০	৩৫
তরন্দাম উৎকৃষ্ট	"	"	২০	২২	১৮
ঐ	"	"	৩৫	৩৩	২৫

ঢাকায় ইংরেজ বণিকগণের কুঠি স্থাপন :

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকগণ ঢাকাতে বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপন করেন[৩২]। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে কুঠি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কারণ ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে টেভারনিয়ার ঢাকায় ইংরেজকুঠি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কি তৎপূর্বে কুঠি স্থাপিত হইলেও ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে উহা কোম্পানির কর্তৃপক্ষীয়গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় নাই[৩৩]।

ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে, যে স্থানে ঢাকা কলেজের সুরম্য অট্টালিকা বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় ইংরেজ কোম্পানির কুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ প্রাট ঢাকা কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন।

একখানা ক্ষুদ্র একতলা অট্টালিকা, তন্মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ, এবং কর্মচারীবর্গের বাসোপযোগী কয়েকখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এবং একটি কক্ষ লইয়াই উহা গঠিত হইয়াছিল[৩৪]। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এই স্থানেই মেঃ আয়ার এবং ব্রাডিল নামক কোম্পানির এজেন্ট যুগল, সায়েস্তা খাঁর পরবর্তী অস্থায়ী নবাব বাহাদুর খাঁ কর্তৃক বন্দী অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ হইতেই ঢাকায় ইংরেজদিগের ব্যবসায় ক্রমশ উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে ; এবং কতিপয় বৎসর মধ্যেই উহা যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। তৎকালে কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জন স্মিথ। তৎপরে মিঃ রবার্ট এলওয়াজ অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ এলওয়াজ ঢাকা নগরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সেমুয়েল হার্বি ও ফিচ্ নিড্হাম নামক সাহেবদ্বয় সহকারী রূপে ঢাকার কুঠির কার্য পরিচালনা করেন। ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ হার্বি কাউন্সিলে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কুঠির অট্টালিকাটি ব্যবসায়ের পক্ষে অনতিপরিসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত কুঠিটির চারিদিকে এবং প্রাঙ্গণ মধ্যে কতিপয় পর্ণকুটির থাকায় অগ্নিদেবের অনুগ্রহ নিতান্ত সুলভ বলিয়া তদীয় আশঙ্কার বিষয়ও জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে কৌন্সিলের কর্তৃপক্ষ ঢাকাতে সহস্র টাকার পণ্য সম্ভার রক্ষণোপযোগী ইষ্টক নির্মিত একটি নাতিক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন[৩৫]।

সম্রাট ফেরোখাসিয়ার ইংরাজ কোম্পানির বাণিজ্য শুল্ক রহিত করিয়া দিলে, ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে ঢাকায় একটি সুপ্রশস্ত নতুন বাণিজ্যকুঠি নির্মিত হইয়াছিল[৩৬]। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে সমচতুষ্কোণাকার একটি অট্টালিকা এবং শ্রেণিবদ্ধভাবে অনেকগুলি পণ্যাগার এই সময়ে নির্মিত হয়। প্রাঙ্গণমধ্যেই কুঠিয়াল সাহেবগণের বাসোপযোগী একটি অট্টালিকা, শ্রমজীবিগণের কার্য করিবার গৃহ, গাঁট বাধিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ, একটি অফিস কক্ষ, ভৃত্য ও সিপাহীশাস্ত্রীগণের নিমিত্ত কয়েকখানা গৃহ অবস্থিত ছিল।

কর্মচারীগণের বেতন :

কুঠির অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারীবর্গ অতি সামান্য বেতন মাত্র প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু স্বীয় নামে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল। খোরাকি খরচ কোম্পানিই বহন করিতেন[৩৭]।

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে যে সমুদয় ব্যক্তিবর্গের হস্তে ঢাকার কুঠির ভার ন্যস্ত ছিল তাহাদিগের নাম, বয়স এবং বেতনাদির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল[৩৮]।

নাম	আগমনের তারিখ	বয়স	বেতন	পদ
রিচার্ড বিচার	২/৮/১৭৪৩	৩৫	৪০	কুঠির অধ্যক্ষ
উইলিয়াম সামার	২৫/১/১৭৪৫	২৬	৪০	Second at Dacca
লুক স্ক্রেফটন	২৫/৭/১৭৪৬	২৬	৩০	third at Dacca
টমাস হাউন্ডম্যান	১৬/৭/১৭৪৯	২৪	১৫	4th at Dacca
সেমুয়েল ওয়ালার	১৬/৭/১৭৪৯	২৬	১৫	5th at Dacca
জন কার্টিয়ার	২৫/৯/১৭৫০	২৪	১৫	সহকারী
জন জনস্টান	৯/৭/১৭৫১	২৫	৫	সহকারী

১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কুঠির খরচ ৫৭৬৬৬ টাকা ১১ আনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাটা ও ভাড়া এবং কর্মচারীবর্গের খোরাকি বাবদে অর্ধেকেরও বেশি খরচ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সৈনিক বিভাগের খরচ, দরবার খরচ, নৌকাভাড়া, ভূমির রাজস্ব, কুঠি মেরামত প্রভৃতি বাবদে অবশিষ্ট টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল[৩৯]।

ঢাকায় ফরাসী কুঠি :

ফরাসীগণ বাণিজ্যব্যপদেশে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করিলেও ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ইহারা ঢাকার বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন নাই। প্রথমত ইহারা দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪০/৪১ খ্রিষ্টাব্দে যখন নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দুইজন ফরাসী দেশীয় এজেন্ট ঢাকায় আগমনপূর্বক এখানে বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহারা ঢাকাতে একটি "গঞ্জ" বা বাজার খরিদ করিয়া "ফরাসগঞ্জ" নামে অভিহিত করেন, এবং তেজগাঁও নামক স্থানে কতিপয় অট্টালিকা নির্মাণপূর্বক বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ঢাকার নবাব বাহাদুরের আসানমঞ্জিল প্রাসাদের প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর পারে ফরাসীদিগের বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতাস্থিত ইংরেজ কোম্পানির কুঠি অধিকৃত হইলে ঢাকার কুঠিও নবাবের হস্তে পতিত হয়। এই সময়ে মেঃ বিচার, স্ক্রেফটন, হাইন্ডম্যান, কার্টিয়ার, ওয়ালার, জনস্টন, কাডমোর প্রভৃতি ইংরেজকর্মচারীবর্গ এবং কতিপয় ইংরেজমহিলা ঢাকার ফরাসী কুঠিতে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিল[৪০]।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজগণ পন্ডিচেরী অধিকার করিলে, ঢাকার ফরাসী কোম্পানির কুঠিও ইংরেজদিগের হস্তগত হইয়াছিল[৪১]। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের সন্ধির শর্তানুসারে উহা প্রত্যর্পিত হয়। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজগণ উহা পুনরায় অধিকার করেন। কিন্তু আমিনের সন্ধি শর্তে পুনরায় উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজগণ তৃতীয়বার ফরাসীকুঠি হস্তগত করিয়া ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসীদিগকে উহা পুনরায় ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ফরাসীগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাহাদিগের কুঠিটি, তেজগাঁয়ের বাড়িগুলি এবং ২৬ খানা পর্ণকুটির সমন্বিত ফরাসগঞ্জ বাজার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও ফরাসী গভর্নমেন্ট অদ্যাপি ঢাকাতে তাহাদিগের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার পরিত্যাগ করেন নাই[৪২]।

ওলন্দাজ কুঠি : ওলন্দাজগণ ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ঢাকাতে বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপন পূর্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবুর বাজারস্থ বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিমোত্তর কৌণিক প্রান্তে ইহারা কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ইহাদিগের বাণিজ্যকুঠি সন্দর্শন করিয়াছিলেন[৪৩]। ঐ সময়ে বিদেশীয় বণিকগণ মধ্যে ইহাদিগের প্রতিই বাণিজ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকবশত ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে

সুবাদারের আদেশক্রমে ইহাদিগের অবাধ বাণিজ্যপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে প্রকাশ্যভাবে ইহারা বাণিজ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু সুবাদারের আদেশের প্রতিকূলাচরণ করিয়া দেশীয় গোমস্তাগণের শাহায্যে গোপনভাবে ব্যবসায় চালাইতেও ক্ষান্ত হন নাই। ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের বহু পূর্ব হইতেই ওলন্দাজগণ ঢাকার কুঠি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইহারা পুনরায় ঢাকাতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজগণের বাণিজ্যকুঠি ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। ঐ সময়ে উহাদিগের বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ ঢাকাতে ইংরেজ হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন[৪৪]।

বস্ত্র ব্যবসায়ে দালাল :

কোম্পানির সমুদয় মালপত্রই দালালের মধ্যস্থতায় খরিদ হইত। নির্দিষ্ট সময়ে মাল যোগাইবার জন্য কুঠিয়ালগণ ইহাদিগকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিতেন। তন্তুবায়গণকে অগ্রিম দাদন দেওয়ার জন্য দালালেরা কোম্পানির অধ্যক্ষগণ হইতে দ্রব্যাদির আনুমানিক মূল্যের অর্ধাংশ কি ততোধিক গ্রহণ করিত। চুক্তিরক্ষার জন্য দালালগণ যথেষ্ট পরিমাণে জামিন দিতে বাধ্য হইত[৪৫]।

মহামতি বার্ক লিখিয়াছেন "১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বাণিজ্য দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইত। এই সময়ে তন্তুবায়দিগের নিকটে দাদন বাবদে কোম্পানির কিছুই প্রাপ্য ছিল না ; কিন্তু ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এই দাদনের টাকা অনেক পরিমাণে বাকি পড়িয়া যায়। তন্তুবায়গণ এক বৎসরে যে পরিমাণ টাকার মাল যোগাইতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকারে উহাদিগকে কোম্পানির নিকটে দায়বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ; ফলে, বিদেশী অন্যান্য কুঠিয়ালগণের এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অন্তরায় ঘটিয়াছিল"।[৪৬] এই প্রকারে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া হইয়া উঠিল।

যাচনদার :

কুঠিতে সমুদয় মাল একত্রিত করা হইলে যাচনদারগণ চুক্তিপত্রে উল্লিখিত আদর্শ বস্ত্রের সহিত উহা তুলনা করিয়া নির্বাচন করিয়া দিত। উৎকর্ষাপকর্ষতা অনুসারে বস্ত্রগুলিকে চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া সজ্জিত করিবার রীতি প্রচলন ছিল। দাদনে যে সমুদয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হইত তাহার উপরে অন্যান্য যাবতীয় খরচ-খরচা বাদে শতকরা ৮ টাকা হিসাবে, এবং নগদ খরিদা মালের উপরে শতকরা ৪টা. ৮ আনা হিসাবে, লভ্য ধরিয়া মূল্য নির্ধারণ করা হইত। অন্যান্য খরচ শতকরা ৭ টা. ৭ আনার কম পড়িত না।[৪৭]

প্রাদেশিক সমিতি, ওয়েয়ার হাউসকিপার ও গোমস্তা :

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে একজন অধ্যক্ষ ও চারিজন সভ্য লইয়া ঢাকার একটি প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপিত হইলে এতৎ প্রদেশের বাণিজ্য ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার ভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কলিকাতায় যে সমুদয় মাল রপ্তানি করা হইত তদ্বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নিযুক্ত হইলেন। তাহার পদের নাম হইল "সব এক্সপোর্ট ওয়েয়ার হাউসকিপার"।

ঢাকার রাজস্বাদি কলিকাতায় প্রেরণ করিবার রীতি তখন পর্যন্তও প্রবর্তিত হইয়াছিল না। উহা ঢাকা, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রামের কুঠিসমূহের বস্ত্র ব্যবসায়ে খাটান হইত। এই সময়েই দালালের মধ্যস্থতায় ব্যবসায় করিবার প্রথা রহিত করিয়া উহাদিগের স্থলে প্রত্যেক আড়ং-এ "গোমস্তা" নিযুক্ত করা হয়। আড়ং-এ খাতা (Warehouse) নির্মাণের অনুষ্ঠানও এই সময়েই আরম্ভ হয়।

ঢাকার কুঠিতে মাল চালান দিবার পূর্বে প্রত্যেক আড়ং-এ গোমস্তাগণ উহা "যাচাই" ও "বাছাই" করিয়া "খাতার" মধ্যে বোঝাই করিয়া রাখিত।

এই সময়ে জেসারাৎ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ভারই ইহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন ; তাহাতে তন্তুবায়দিগের উপরে আড়ং-এর গোমস্তার সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল।

নায়েব :

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন আড়ং-এ "নায়েব নিযুক্ত করিয়া তন্তুবায়দিগের যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার ভার ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমাদি ব্যতীত একশত টাকার অনধিক দাবির মোকদ্দমার বিচারও ইহারা করিতে পারিতেন। দশ টাকা দাবির মোকদ্দমায় ইহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

রেসিডেন্ট :

কুঠির বাণিজ্যব্যবসায় সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে একজন রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ফলে দেশীয় গোমস্তাগণের অব্যাহত ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল।

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার রেসিডেন্ট লিখিয়াছেন "আড়ং-এর গোমস্তাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, নতুন চুক্তিপত্র লিখিত হইবার পূর্বে তন্তুবায়গণ-সম্পর্কিত সমুদয় বব্যস্থা তাহাদিগের সমক্ষে পঠিত হইবে ; উহারা যে পরিমাণ বস্ত্র প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে যোগাইতে সক্ষম হইবে, তজ্জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিনামা লিখিয়া দিবে"। বৎসরান্তে একবার করিয়া তন্তুবায়গণের হিসাব-নিকাশ করা হইত। চলিত হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য উহাদিগের প্রত্যেকের নিকটেই একখানা করিয়া হাতচিঠা থাকিত। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তই এই ব্যবস্থানুযায়ী সমুদয় কার্য চলিয়াছিল ; ঐ সনেই ঢাকাস্থ কোম্পানির কুঠির বিলোপ সাধন হয়।

নবাবি আমলে বস্ত্রব্যবসায়ের প্রসারতা :

১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৮৫০০০০ টাকার বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার কমার্সিয়েল রেসিডেন্ট ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে যে ইহার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

দিল্লির বাদশাহের জন্য	
সাদা ও বুটিদার মসলিন এবং রৌপ্য খচিত বস্ত্র	১০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য	
নবাব এবং তদীয় দরবারস্থ আমীর ওমরাহবর্গের জন্য নানাবিধ বস্ত্র	৩০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
জগৎশেঠের জন্য	
সূক্ষ্ম ও মোটা নানাবিধ বস্ত্র (ব্যবসায়ের জন্য)	১৫০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
তুরানিদিগের জন্য	
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বন্দরে রপ্তানি হইত	১০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
পাঠান ব্যবসায়ীর জন্য	
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বন্দরে রপ্তানি হইত	১৫০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
আরমানি ব্যবসায়ী	
বসোরা, মোচা এবং জিদ্দা বন্দরে বিক্রয় করিবার জন্য	৫০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
মোগল ব্যবসায়ী	
(ইহার কতকাংশ বঙ্গদেশে বিক্রীত হইত, অবশিষ্টাংশ বসোরা, জিদ্দা ও মোচা বন্দরে বিক্রীত হইত)	৪০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)

ইংরেজ কোম্পানি	
ইউরোপে রপ্তানি হইত	৩৫০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
হিন্দু ব্যবসায়ী	
দেশে বিক্রীত হইত	২০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
ফরাসী কোম্পানি	
ইউরোপে রপ্তানি হইত	২৫০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
ফরাসী ব্যবসায়ীগণ	
বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করিবার জন্য	৫০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)
ওলন্দাজ কোম্পানি	
ইউরোপে বিক্রয় করিবার জন্য	১০০০০০ টাকা (আর্কট মুদ্রা)

ইংরাজ শাসন সময়ে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় :

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংলন্ড হইতে আনীত অর্থ দ্বারাই ইংরেজ কোম্পানি ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনন্দ লাভ করিবার পরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তখন উহারা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতেই ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানির বাৎসরিক মজুত মাল দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়েই বেসরকারি ব্যবসায়ীগণ এতদ্দেশীয় মুচ্ছুদীগণের নিকট হইতে মূলধন গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৭০২৮৯ পাউন্ড (১৩৬২১৫৪ টা.) মূল্যের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৭৭৬৪০ পাউন্ড, বেসরকারি ইংরেজ বণিকগণ ৫৮৫৩৫ পাউন্ড এবং হিন্দু ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ ৩৪০৯৪ পাউন্ড মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি করেন। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ অব্দের মধ্যে ঢাকা কুঠির অধীনস্থ অন্যান্য আড়ং হইতে ১৩৬২৬০১৮টা ১১ আনা ৬ পাই-এর বস্ত্র খরিদ হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লাঙ্কাসায়ারে ৪১টি মাত্র সূতার কল প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসর ঢাকার শুল্কাগার হইতে ৫০০০০০০ টাকার (খরিদ দর) বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। এই সময়েই ঢাকার বস্ত্রশিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়।

ঢাকার মসলিনের ন্যায় নয়নানন্দকর সুচিক্কণ মলমল বিলাতি কলে অদ্যাবধিও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় হইবেও না। ডাক্তার ফরবেস ওয়াটসন বলেন—

"However viewed, therefore, our manufacturers have something still to do. With all our machinery and wondrous appliances, we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca, the products of arrangemets which apear rude and primitive, but which in reality are admirably adapted for their purpose"[৪৬]

বস্ত্রশিল্পের অবনতি :

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি গৌরব, প্রসারতা ও প্রতিপত্তি, ইউরোপীয় বণিককুলের ঈর্ষানল প্রদীপ্ত করিয়াছিল। মসলিনের অনুকরণে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইলেও ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ইংলন্ডে উহা সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলন্ডে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তথায় বস্ত্রশিল্প প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। ১৭৮১ হইতে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংলন্ডের ব্যবসায় ২০০০০০০ পাউন্ড হইতে ৭৫০০০০০ পাউন্ড পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

শিল্পোন্নতির অন্তরায় :

বস্ত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে ইংরেজগণ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্র ইংলন্ড হইতে দূরীভূত করিবার জন্য আইন করিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। যে সমুদয় বস্ত্রাদির রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে ঢাকাই মসলিন সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পড়িয়াছিল। মলমল, আব্‌রোয়া, ঝুনা, রং, তারেন্দাম, তাঞ্জেব জামদানি, ডুরিয়া এবং খাসা।[৪৯]

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ইংলন্ডে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক ধার্য হইয়াছিল ; ইহাতে বঙ্গদেশে কোম্পানির আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও উহারা নিষিদ্ধ বস্ত্র সমূহ ইংলন্ডে প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না।[৫০]

টেইলার সাহেব তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ইংরেজগণের বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্তির কতিপয় বৎসর পূর্ব হইতেই ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল বটে।[৫১] কিন্তু ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলন্ডে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই ঢাকার বস্ত্রশিল্পে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। ঐ বৎসর ইংলন্ডে প্রায় ৫ লক্ষ খণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলন্ডীয় বস্ত্রশিল্পের সুবর্ণযুগ বলিয়া নির্দেশিত হয়। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে বস্ত্র শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। শিশুশিল্প রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজগণ বিদেশীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৭৫ টাকা পর্যন্ত কর নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এত অধিক পরিমাণে শুল্ক দিতে হওয়ায় ঢাকার বস্ত্র ইংলন্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং ঢাকার বস্ত্রশিল্প উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন ইংলন্ডে রপ্তানি হইত কিন্তু ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার মসলিন বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল।[৫২]

স্যার জর্জ বার্ডউড্ লিখিয়াছেন "১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নটিংহাম নগরে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাই মসলিনের অনুকরণে ইংলন্ডে ৫০০০০ খণ্ড মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু লাঙ্কাসায়ার ও মাঞ্চেস্টারের তন্তুবায়কুল তখন পর্যন্তও ঢাকার তন্তুবায়গণের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সমকক্ষভাবে দণ্ডায়মান হইবার সামর্থ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংলন্ডের এই শিশু শিল্পের উন্নতিকল্পে এবং শিল্পচাতুর্যে ঢাকার তন্তুবায়গণের সমকক্ষতালাভ করিবার জন্য, মসলিনের উপর শতকরা ৭৫ টাকা কর সংস্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ইংলন্ডে ঢাকাই মসলিনের কাটতি হ্রাস পাইতে লাগিল।[৫৩]

ঢাকার এই প্রাচীন শিল্পের এবম্বিধ শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রাণ মিল এবং বার্ডউড যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের অমর লেখনীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :

"Melancholy indeed, and a bitter rebuke of Dacca under the East India Company in the last Century, and the improverished state to which it was reduced when, at the beginning of the present century, the Imperial Parliament began to seriously interfere with the Company's administration in India... Still more and sad and humiliating is it to reflect that the desolation which then sweft over Dacca also more or less overtook every one of the ancient Polytechnical cities of India, and everywhere as the result of the disadvantages we so unrighteously enforced against them in their already unequal Competition with the rising manufacturing towns of Nottingham, Warrington, and Glasgow. But in the fateful year 1857 a steam loom mill was opened at Bombay, and now

(in 1887-88) India again exports Cotton manufacture to the annual value of Rs. 27988540/-. Thus whirling of time brings in his revenge.[৫৪]

"The Cotton and silk goods of India up to the period (1813 A.D.) could be sold for profit in the British market at a price from 50 to 60 p.c. lower than fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 to 80 p.c. in their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had no such prohibitory duties and decrees existed the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset and could scarcely have been again set in motion even by power of steam. Had India been independent she would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry form annihilation. This act of self defence was not permitted her. She was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturers employed the arms of political injustice to keep down and ultimately strangle a competition with whom she could not have contended on equal terms.[৫৫]

প্রকৃতপক্ষে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ হইতেই ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। তৎপূর্বে ইংরেজ কোম্পানি বস্ত্রব্যবসায়ের জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খাটাইতেন। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির মূলধন ৫৯৫৯০০ টাকায় পরিণত হয়। ঐ সময়ে বেসরকারী বণিকগণের মূলধন ৫৬০২০০ টাকার অধিক ছিল না। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত বাণিজ্য ২০৫৯০০ টাকার হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসরে ইংরেজ কোম্পানি এতদতিরিক্ত টাকা ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ে ব্যয় করেন নাই।

ইংলন্ড ভারতীয় বস্ত্রের শুল্ক হ্রাস :

১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ হাস্‌কিসন ভারতীয় বস্ত্র শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা ১০ টাকায় পরিণত করিলে ইংলন্ডে ঢাকাই মসলিন অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ঢাকার বস্ত্রশিল্পের আর উন্নতি সংসাধিত হইল না। এই অসাময়িক অনুগ্রহে ঢাকার মসলিন শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারিল না।[৫৬] কারণ ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব হইতেই বিলাতি সূক্ষ্ম সূত্র ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতেছিল। টেইলার সাহেব অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন "অতীত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করিলে ঢাকার বাণিজ্যের ইতিহাস নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে।[৫৭] ত্রিংশৎ বৎসরকাল মধ্যেই ঢাকার বাণিজ্য একেবারে ধ্বংসমুখে ত হইয়াছিল; ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

দনে অত্যাচার :

দন দিয়া কাজ করাইবার প্রথা বহুপূর্ব হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। নবাবি আমলেই এই থার সূচনা হয়। কোম্পানির কুঠিয়ালগণের হস্তে ইহার পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছিল। অনেক ময়ে এই দাদনের ফলে তন্তুবায়কুল ঘোরতর অন্যায়রূপে নিপীড়িত হইত। অনেক স্ত্রব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারী ৫০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র ১০০ টাকা প্রদান করিয়াই গ্রহণ করিত। দন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে তন্তুবায়দিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত; এবং অত্যাচার ৎপীড়ন করিয়া দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। ধর্মাধিকরণে সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় ন্তুবায়কুল উপস্থিত হইলে সুফললাভ সুদূরপরাহত ছিল। বস্তুত এই দাদন ব্যাপারে ন্তুবায়কুলের প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা মনে হইলেও শরীর শহরিয়া উঠে।

উইলিয়াম বেল্টস্ তদীয় considerations on Indian affairs (1772 A.D.) নামক গ্রন্থে দাদনে অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টতই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে শিল্পীগণ কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রাপীড়িত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের যাবতীয় শিল্প দ্রব্যই ইংরেজ কোম্পানির হস্তে একচেটিয়া। কোন্ শিল্পীকে কতমাল, কিরূপ মূল্যে যোগাইতে হইবে তাহা কোম্পানির স্বাচ্ছামতই স্থিরীকৃত এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর হাজির করিয়া মালের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দিবার নির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি একখানা দলিলে আপনাদিগের সুবিধামত সর্ত উল্লেখে তাহাতে শিল্পীগণের স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হইত। এজন্য শিল্পীগণের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা করা হইত না। এই সময়ে তন্তুবায় প্রভৃতির হস্তে অগ্রিম কিছু টাকা বায়না স্বরূপ প্রদত্ত হইত। শিল্পী ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার বস্ত্রাঞ্চলে উহা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তৎপরে কাছারির সিপাহীগণ চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। অন্য কাহারও কাজ করিতে পারিবে না, এই সর্তে অনেক শিল্পীকে বাধ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত স্বপ্নাতীত চাতুরি করা হইত। যে দরে তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করা হইত তাহা বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম। ইহার উপর আবার যাচনদানদিগের সহিত যোগাযোগে উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হইত। ফলে ইহার জন্য হতভাগ্য তন্তুবায়দিগকে শতকরা ৪০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। যে সমুদয় তন্তুবায় চুক্তিপত্রানুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণ লওয়া হইত। অনন্যোপায় হইয়া এই সময়ে বহুশিল্পী স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া কার্যে অক্ষমতাজ্ঞাপন পূর্বক আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইত। এইরূপে অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া চিরকালের জন্য মসলিনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৫৮]

ঢাকায় বিলাতি সূতা আমদানি :

১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে কলের সূতা সর্বপ্রথমে এখানে আমদানি হয়। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩০৬৩৫৫৬ পাউন্ড বিলাতি সূত্র ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে আমদানির মাত্রা দ্বিগুণ হারে বর্ধিত হইয়া ৬৬২৪৮২৩ পাউন্ডে পরিণত হইয়াছিল। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ হইতেই কলের সূতা ঢাকার বাজারে একরূপ একচেটিয়া হইয়া যায়। বিলাতি সূতার আমদানির ফলে চরকা ও টাকুর প্রস্তুত দেশী সূত্রের দর দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। সুতরাং ইংলন্ডে ঢাকাই মসলিনের শুল্ক হ্রাস পাইলেও কলের সূতা প্রচুর আমদানি হওয়ায় মসলিন শিল্প আর উন্নতিলাভ করিতে পারিল না।

এক সময়ে ঢাকা জেলা ইংলন্ডের—ইয়োরোপের নগ্নতা দূর করিয়াছিল—আর আজ সমগ্র ভারতবাসীকে ইংলন্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

বিলাতি ও দেশী বস্ত্রের তুলনা জ্ঞাপক ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের মূল্য তালিকা প্রদত্ত হইল।[৫৯]

	ঢাকায় প্রস্তুত	কলে প্রস্তুত
১নং ছোট বুটাদার জামদানি	২৫্	৮্
২নং ছোট বুটাদার জামদানি	১৬্	৫্
জামদানি মেহি পস	২৭্—২৮্	৬্
(তেরছা বুনন) জামদানি		
(Jaconet Muslim ৪০টা. ৮ আঃ)	১২্—১৩্	৪—৪ টা. ৮ আঃ
১নং ও ২নং জঙ্গল খাস	৩৮্—৪০্। ২৪্—২৫্	২০্—২২্।৯্—১০্
নয়ন সুখ ৪০ × ২$\frac{1}{4}$	৮্—৯্	৫্—৬্
Cambric (কামিজখাসা)		
লাল অথবা আসমানি	১৩—১৪	৬—৯টা. ৮ আঃ

রঙ্গের জামদানি	১৫—১৬	৪—৫
জামদানি সারি	১২—১৩	৫—৫টা. ৮ আঃ
মলমল	১০—১১	৭—৮
সলিম ৪৮ × ৩	২৮—৩০	১০—১৫

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ের অবস্থা :

মসলিন শিল্পের এবম্বিধ শোচনীয় অধঃপতনের পরেও ঢাকার প্রতি বৎসর প্রায় বিংশতি সহস্র মসলিন প্রস্তুত হইত। টেইলার সাহেবের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ৮ তোলা ওজনের একখানা মসলিন তৎকালে ১০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী সাড়ে দশ তোলা ওজনের ১০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থবিশিষ্ট দ্বিখণ্ড মসলিন চিনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার প্রত্যেক থানের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ১০০ টাকা। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে চিনদেশে হইতে পুনরায় উক্ত বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট দুই খানা তদনুরূপ মসলিনের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ মসলিন নির্মাতার মৃত্যু হওয়ায় উহা আর প্রেরিত হয় না।[৬০]

১৮২৩/২৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শুল্কাগার হইতে ১৪৪২১০১ টাকা মূল্যের বস্ত্র বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২৯/৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৯৬৯৯৫২ টাকার বস্ত্র বিক্রীত হয়।[৬১]

১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে যে পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।[৬২]

১। দেশী ২৫০নং ও তদূর্ধ্ব নম্বরের সুতায় নির্মিত সূক্ষ্ম মসলিন দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, লাহোর এবং নেপালের দরবারে ও দেশীয় জমিদারগণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।	৫০০০০
২। বিলাতি ৩০ হইতে ১০০ নম্বরের সুতায় প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট মসলিন	৫০০০০০
৩। নিম্নশ্রেণিস্থ জনগণের ব্যবহারোপযোগী ৩০ ও তন্নিম্ন নম্বরের দেশী সুতায় প্রস্তুত	১৫০০০০
৪। কার্পাস ও রেশম মিশ্রিত জরির কাজ করা বস্ত্র (জিদ্দা বন্দরে প্রেরিত হইত)	২০০০০০
৫। মসলিন, নেটের কাপড়, পশমি বস্ত্র, রুমাল জরীর ও রেশমি কাজ করা শাল প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র	৪৫০০০
৬। সুতার বুটাদার বস্ত্র	১০০০০
	৯৫৫০০০

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন "যাহারা বিলাতি সূত্র দ্বারা সাধারণ রকমের মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে এরূপ তন্তুবায় এখনও ঢাকাতে ৫০০ ঘর বিদ্যমান আছে এবং ২/১টি পরিবারে এখনও ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে। কমিশনার পিকক সাহেবের বার্ষিক বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে "১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাব স্যার আব্দুল গনি বাহাদুর প্রিন্স অব ওয়েলেসকে উপহার প্রদান করিবার জন্য যে তিনখণ্ড মসলিন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ববিষয়ে প্রাচীন সূক্ষ্ম মসলিনের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক খানার ওজন হইয়াছিল ৯¼ তোলা মাত্র। উহার এক এক খানা ২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থবিশিষ্ট ছিল।"

১৮৭৯/৮০ অব্দে ৮০ হাজার টাকা মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ২০০০০ টাকার মসলিন প্রস্তুত হয় কিন্তু প্রায় ১০৮০০ টাকার বস্ত্রই অবিক্রীত থাকে। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে

মসলিন বিক্রয় লব্ধ ২৫,০০০ টাকা ঢাকার তন্তুবায়গণের হস্তগত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এক সহস্র মুদ্রার এবং ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চ সহস্র মুদ্রার মসলিন প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৫২৮০ টাকার মসলিন নেপাল দেশে নীত হয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ২৭০০০ টাকার মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

এখনও ৩৫০ নং ও ৪০০ নং সূতাদ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সংসাধিত হইলেও সূক্ষ্ম মসলিন শিল্পের উন্নতি হয় নাই।

উৎকৃষ্ট গোলাবতন শাড়ি বর্তমান সময়েও প্রস্তুত হইতেছে। বালিয়াটি, ধামরাই, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায়গণই সাধারণত উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঢাকাই "ভিটির ধুতির" আদর এখনও রহিয়াছে।

শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার লোকসংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ২ লক্ষ ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উহা ৬৮০৩৮ সংখ্যায় পরিণত হয়।

শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা :

ভারতের বর্তমান অবস্থায় ও দেশের শিল্প এখানকার ও অন্য দেশের বাজারে বিক্রয় করিবার পক্ষে ব্যাঘাত অনেক। অবাধ বাণিজ্য ভারতের শিল্পোন্নতি ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রধান অন্তরায়। বৈদেশিক পণ্যের নিমিত্ত আমাদিগের দেশের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে কিন্তু আমাদিগের স্বদেশজাত পণ্য অপর দেশে ঐরূপ অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ইহাতে আমাদিগের দুই দিকেই ক্ষতি হইয়াছে। বৈদেশিক আমদানি দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষার জন্য উহা যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাতে লাভ অতি সামান্যই থাকে।

এতদ্দেশে স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্য ঘটাইতে হইলে অবাধ বাণিজ্যের পথ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা অত্যাবশ্যক। যে সমুদয় স্থান শিল্প বাণিজ্যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তৎসমুদয় দেশেই প্রথমে স্বীয় শিল্পোন্নতির কামনায় বৈদেশিক পণ্যের উপর অত্যধিক মাশুল ধার্য করিয়া এবং আইন বিধিবদ্ধ করিয়া উহার আমদানি বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংলন্ডও যে এককালে এইরূপে বিলাতে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের আমদানি রহিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ফলে বিলাতি বস্ত্রশিল্প অচিরে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, "বৈদেশিকেরা জার্মানির বাজার লুণ্ঠন করিতেছে। সুতরাং জার্মান শিল্পীকুলের মঙ্গলবিধান জন্য অন্তত কিছুদিন অবধি বাণিজ্যের দ্বার রুদ্ধ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমাদিগের হৃদয় বিচলিত হয় না, অভিজ্ঞতার উপরে আমার মত সংস্থাপিত। আমি দেখিতেছি, যে সকল দেশে অবাধ বাণিজ্য নাই, সে সকল দেশ সমৃদ্ধশালী হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ বাণিজ্যের উপাসক, তাহারা ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। অধিক কি, শক্তিশালী ইংলন্ডও ক্রমশ অবাধ বাণিজ্যের মায়া কাটাইতেছেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিলাতি দ্রব্যের বিক্রয়ার্থ অন্তত বিলাতের বাজার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণী-নীতির অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা বৈদেশিক দ্রব্যের মাশুল কম করিয়া ক্ষয়গ্রস্ত রোগীর ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি।"

এই বলিয়া প্রিন্স বিসমার্ক জার্মানি দেশে অবাধ বাণিজ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। আজি জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ইংলন্ডের সম্বন্ধেও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হইয়াছে। কারণ, এক্ষণে বিলাতের একটি প্রধান রাজনীতিক দল অবাধ বাণিজ্যের বিলোপ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের বর্তমান অবস্থাতেও যে অবাধ বাণিজ্যের সঙ্কোচ নিতান্ত আবশ্যক, একথা অভিজ্ঞ

ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড মিন্টো বলিয়াছেন, "বৈদেশিক পণ্যের আমদানির গতি প্রতিহত করিতে না পারিলে ভারতের শিল্পোন্নতি হইবে না।"

বিলাতের শিল্প ও শিল্পীর স্বার্থের দায়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। পূর্বে মাঞ্চেষ্টরের কার্পাসজাত দ্রব্যের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক আদায় করা হইত; কিন্তু কলওয়ালাদিগের আপত্তিতে ঐ শুল্ক কমাইয়া ৩ টাকা ৮ আনা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতজাত কার্পাস দ্রব্যের উপরে ঐ পরিমাণে চুঙ্গিকর বসিল।

শুল্কনীতির সংস্কার ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই বিষয়ে ভারত গভর্নমেন্টের হস্তপদ আবদ্ধ। পার্লামেন্টের কোনও দলই বিলাতি শিল্পীদিগের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও ব্যবস্থার অনুমোদন সহজে করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিল্পের প্রতি ভারত গভর্নমেন্টের অনুরাগ কার্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দেশীয়গণের উৎশাহ শত গুণে বর্ধিত হয়, এবং গভর্নমেন্ট দেশীয় দ্রব্যের সমাদর করিতেছেন সন্দর্শন করিলে সাধারণ লোকেও স্বভাবতই উহা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

রেলগাড়ী ও স্টিমারের মাশুলের হার হ্রাস করিলে দেশীয় দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রচলন করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে।

এ দেশের খালগুলির সংস্কার হইলে নৌকাযোগে অল্প ব্যয়ে মালপত্র করিবার সুবিধা হইবে।

বস্ত্রধৌত প্রণালি ·

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্মবস্ত্র ধৌতকার্যে ঢাকা বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত কাটার সুন্দর (কোঙরসুন্দর) গ্রামে একটি বৃহদায়তন দীর্ঘিকা আছে। উহার জলরাশি এরূপ স্বচ্ছ ও শুভ্র যে ইহাতে মলমলখাস বস্ত্র ধৌত হইয়া অপূর্ব শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।[৬৩] পূর্বে এই দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বে বহু সংখ্যক তন্তুবায় বাস করিত।

ঢাকা শহরের নারান্দিয়া নামক মহল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি মাইল দূরবর্তী তেজগাঁও গ্রাম পর্যন্ত স্থান মধ্যে নানা স্থানে ধোপাখানা আছে। এই স্থানের কূপজলও কোঙরসুন্দরের স্বনামপ্রসিদ্ধ দীর্ঘিকার জলের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট।[৬৪] তেজগায়ে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদিগের বিস্তৃত ধোপাখানা ছিল।[৬৫] অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার এই স্থানের কূপজলের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থানের কূপজল হইতে ঐ স্থানের কূপজলের স্বাদের বৈলক্ষণ্য আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সূক্ষ্ম মসলিন ধৌত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ বস্ত্রের ন্যায় ইহা 'পাটে' আছাড়াইতে হয় না। প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া, পরে সাজিমাটি ও সাবান মিশ্রিত ক্ষারজলে নিমজ্জিত করিতে হয়। অতঃপর উহা শ্যামল দুর্বাদল সমাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে আস্তীর্ণ করিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করা হয়। অর্ধ শুষ্কাবস্থায় বস্ত্রগুলি একত্রিত করিয়া ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করতঃ "সিদ্ধ" করিয়া লইতে হয়। পরে উহা লেবু-রস-সিঞ্চিত স্ফটিক-স্বচ্ছ জল মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল রক্ষিত হইয়া থাকে।

কাঁটা করা :

ধৌত করিবার সময়ে বস্ত্রের সূত্রগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খল হইলে পুনরায় যথানির্দিষ্ট স্থানে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়া দেওয়ার নাম "কাঁটা করা।" মসলিন ও অন্যান্য ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র যে ঢাকা শহর ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও স্থানে উত্তমরূপে ধৌত হইতে পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যত্র কোথাও কাঁটা করিবার প্রণালি প্রবর্তিত নাই বলিয়াই তাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র ধৌত কার্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এই বিষয়টি ঢাকা জেলার বিশেষত্ব। এই ব্যবসায়ীদিগের সাধারণ নাম "নর্দিয়া"।

রিফুগর :

ধৌত করিবার সময়ে অথবা অন্য কোনও প্রকারে বস্ত্রের কোনও স্থানে ছিদ্র হইলে রিফুগরগণ ঐ ছিদ্রটির মধ্যে সূত্র চালনা করিয়া এরূপভাবে মিলাইয়া দেয় যে তখন আর উহার অস্তিত্ব নিরূপণ করিবার উপায় থাকে না। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন "an expert ruffoger can remove a thread the whole length of a web of muslin, and replace it with one of a similar quality".[৬৬] তিনি ঢাকার রিফুগরদিগকে অহিফেন সেবী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অহিফেনের নেশায় বিভোর হইলেই নাকি ইহারা খুব ভাল কাজ করিতে পারে। বর্তমান সময়েও ঢাকায় রিফুগরদিগের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা টেইলার সাহেবের উক্ত মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

দাগধোপী :

মসলিন অথবা অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্রে কোনও প্রকার দাগ পড়িলে ইহারা তাহার বিলোপ সাধন করিতে সমর্থন হয়। লৌহ অথবা তদ্‌গুণ বিশিষ্ট কোনও পদার্থের সংযোগে উহাতে দাগ পড়িলে "আম্বলিপাতার" রস, ঘৃত, লেবুর রস ও সাজিমাটির জল দ্বারা ধৌত করিয়া দাগধোপীগণ ঐ চিহ্নের অপনোদন করিয়া থাকে।

কুমদীগর :

যে সমুদয় শ্রমজীবী শঙ্খ দ্বারা বারংবার বস্ত্র মার্জনা করিয়া উহার উজ্জ্বলতা সম্পাদনা করিয়া থাকে তাহারা "কুমদীগর" নামে পরিচিত। একখানা শক্ত তিন্তিরি বৃক্ষের কাষ্ঠোপরি বস্ত্রখণ্ড স্থাপনপূর্বক শঙ্খ সহযোগে উহা মার্জিত হয়। এই সময়ে ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপরে ভাতের মাড় দেওয়া হইয়া থাকে।

কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের কমলার প্রিয়পুত্রগণ ঢাকাই শঙ্খকরা বস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন।

ইস্ত্রিকার্য : ইহা বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে, সুতরাং পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক।

(খ) সিবন :

সূচিকর্মের জন্য বোগদাদ নগরী চিরপ্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন বোগদাদ নগরী হইতেই সূচিকর্ম প্রথমত ঢাকা শহরে প্রচলিত হইয়া ক্রমে ভারতের অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মোসলমানগণই এই শিল্পোন্নতির মূল। তাহারাই ইহার শিক্ষাদাতা। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সূচ প্রস্তুত প্রণালি সর্বপ্রথমে ইংলন্ড দেশে প্রচারিত হয়।[৬৭] ভারতে যে কোনও কালে সূচ প্রস্তুত হইত তাহা আজ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় না কি?

অতি পূর্বে বসোরা নগর হইতে ঢাকাতে সূচের আমদানি হইত। মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্রোপরি সূচিকর্ম করিবার জন্য যে সূচ ব্যবহৃত হইত তৎকালে তাহা বসোরা ব্যতীত অন্যত্র সুলভ ছিল না।

"রিফুগরী", "জরদজী", "চিকণকরি", বা "চিকন্দজাল", "কসিদা" প্রভৃতি নানাবিধ সূচিকর্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

জরদজী : এই শিল্প ঢাকা নগরীতে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে abbe de Guyon বলিয়াছেন, সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত জরাই এবং রেশমী কারুকার্য সমন্বিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি, জরাই গলাবন্ধ এবং মসলিন ঢাকা হইতেই ফরাসী দেশে নীত হইয়া থাকে।[৬৭]

মসলিন, পশমীশাল, রুমাল প্রভৃতি বস্ত্রের উপরে রেশম এবং স্বর্ণ অথবা রৌপ্যসূত্র দ্বারা নানাপ্রকার নয়নলোভন সুন্দর কারুকার্য খণ্ডোপরি স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্র অথবা বাদলা দ্বারা কারুকার্য সম্পাদিত হইলে উহা "গোলাবতন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। টুপির উপরে

এবম্বিধ কারুকার্য করা হইলে উহা "গসু" নামে পরিচিত হয়। শিরস্ত্রাণ, চর্মপাদুকা, ফরসীর নল প্রভৃতির উপরে ঐ প্রকার কারুকার্য থাকিলে তাহা "সলমা" নামে অভিহিত হয়। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণসূত্র জড়িত লেস এবং brockade প্রভৃতিতেও এবম্বিধ কারুকার্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার সাধারণ নাম "বুনন"।

যে আদর্শে কারুকার্য করা হইবে তাহা প্রথমত একখানা মসীবিমণ্ডিত কাষ্ঠফলকে পেন্সিল দ্বারা অঙ্কিত করা হয়; উহাকে "নকাসী" করা বলে।

Penant সাহেব জরদজী কার্যের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। সাধারণ কার্পাস নির্মিত বস্ত্রখণ্ডের উপরে এরূপ আশ্চর্য কারুকার্য করা হয় যে উহা রেশম নির্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে।[৬৯]

ঢাকার কারুকার্যসমন্বিত বস্ত্র ইউরোপখণ্ডেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় এক সহস্র খণ্ড জরাই কাজ করা বস্ত্র ঢাকাতে প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্যও কয়েকখানা নীত হইয়াছিল।

চিকণকরি বা চিকন্দজান : মসলিন বস্ত্রের উপরে কার্পাস সূত্রের কারুকার্য এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারণত মোসলমানগণের পোষাক-পরিচ্ছদেই এবম্বিধ কারুকার্য সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর ফুলতোলা ও বুটাতোলার নামও চিকণ। সহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্মকার্যে নৈপুণ্য থাকায় এ দেশীয় লোকে অতি অল্পায়াসেই চিকণ শিক্ষা করিতে ও উহাতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও আজ পর্যন্ত ঢাকার কসিদা, জামদানি, কারচব প্রভৃতি বস্ত্র স্বীয় পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সচরাচর কার্পাস সূত্র, রেশম, ঊর্ণা, অথবা স্বর্ণ, রৌপাদির তার প্রভৃতিই এই কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূত্রাদিও যথাসাধ্য সুরঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন সূত্রাদি দ্বারা কাজ করাতে উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাক। যথা, কারচব, জামদানি, ঝাপন, চারখানা, মুগা, কসিদা ইত্যাদি।

রেশমী ও পশমী বস্ত্রে কার্পাস সূত্র ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য দিয়াও সূচিকার্য সম্পন্ন হয়। স্বর্ণ রৌপ্যাদির তার ও রেশম সূত্র জড়াইয়া একরূপ সূত্র হয়। উহাকে চলিত ভাষায় "গোলাবতন" বলে। সূচিকার্যে ইহারই বেশি ব্যাপার।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্যের কাজ থাকিলে তাহাকে "কারচিকা" বলে। সূতার কাপড়ের উপর সোনা-রূপার কাজের নাম কামদানি।

কসিদা : ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

(গ) রঞ্জনশিল্প :

কুসুম ফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন শিল্প এতদ্দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লাল, নীল, বাসন্তি, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল প্রভৃতি রং দ্বারাই বস্ত্রাদি সাধারণত রঞ্জিত হইয়া থাকে। কসিদা ও অন্যান্য বস্ত্রের উপরে ছাপ মারিয়া রং করা হইত। যে শ্রেণির লোক এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদিগকে "চিপিগর" বলে। ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকে নানাবিধ কারুকার্য করিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্রাদিতে ছাপা দেওয়া হইত। ধার্মিক হিন্দু ও মোসলমানগণের ব্যবহারের নিমিত্ত "নামাবলি" এবং "কুফন" প্রভৃতি অদ্যাপি প্রস্তুত হইয়া থাকে।[৭০]

(ঘ) কার্পাস সূত্রশিল্প :

ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে তুলাই পরিচ্ছদের একমাত্র প্রধান উপাদান। এজন্য হিন্দুরাই সর্বাগ্রে তুলা হইতে সূত্র নির্মাণ ও বস্ত্রবয়ন করিতে শিখিয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিকাংশ দেশের লোকেই এক সময়ে ভারতবাসীর নিকট এই শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্প বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিল্লির সম্রাটগণের পুরমহিলাগণের ব্যবহারের জন্য যে সূক্ষ্ম মসলিন ঢাকাতে প্রস্তুত হইত তাহার আদর্শ সূত্র এত সূক্ষ্ম হইত যে ঐরূপ দেড়শত হস্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একগাছা সূত্রের ওজন একরতির অধিক হইত না।[৭১] সোনারগাঁও অঞ্চলে ঐরূপ ১৭৫ হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একগাছি সূত্রের ওজন একরতি মাত্র হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[৭২] ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে একপোয়া পরিমিত কার্পাস হইতে উৎপন্ন একমোড়া সূত্রের দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইল হইয়াছিল বলিয়া অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।[৭৩] কিন্তু ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে একরতি ওজনের ১৪০ হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সূত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সূত্র তৎকালে প্রস্তুত হইত না।[৭৪]

কলে নির্মিত সূত্র অপেক্ষা ঢাকার কার্পাস সূত্র কোমলতর হইলেও বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকাই ধুতি ও মসলিন অধিকতর মজবুদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন নির্মাণোপযোগী একতোলা পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত করিতে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইত। উহার মূল্য প্রতি তোলা ৮ টাকা পর্যন্ত হইত। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্পপ্রধান স্থানে সূতা কাটিলে আঁশ নরম হওয়ায় শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকা অঞ্চলের তন্তুবায়গণ অতি প্রত্যুষে অরুণোদয়ের পূর্বে এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইলে, চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য করে: তাহাতে বায়ু জলসিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে প্রাতে ৯টা কি ১০টা পর্যন্ত উহারা মধ্যম রকমের সূতা কাটে ; অপরাহ্নে ৩টা কি ৪টার সময় হইতে সূর্যাস্তের অর্ধ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত সূতা কাটা হইয়া থাকে।

ডাঃ ওয়াটসন ঢাকাই, ফরাসী ও ইংলন্ডীয় মসলিন সূতা অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইউরোপে যত প্রকার সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সমুদয়গুলি অপেক্ষাই ঢাকাই মসলিনসূতার ব্যাস অনেক কম; এবং ইউরোপীয় সূতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই সূতার আঁশও (Filaments) অনেক পরিমাণে কম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকাই সূতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments of fibres) ইউরোপে প্রস্তুত সূতার তুলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই দুইটি কারণে সূক্ষ্মতায় ও দৃঢ়তায় ঢাকাই সূতা অন্যান্য দেশের সূতাকে পরাস্ত করিয়াছে।[৭৫] আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, তুলার আঁশ মোটা হওয়ায় এবং সূতা চরকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চি সূতার পাক বেশি হয়।[৭৬]

ওয়াটসন লিখিয়াছেন, "পূর্বে যে মসলিন প্রস্তুত হইত, তাহার সূতা বিলাতি মসলিন অপেক্ষা দৃঢ় হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। কারণ, তৎকালে এখানে টাট্‌কা কার্পাস আনিয়া যে সূতা প্রস্তুত হইত তাহা ইংলন্ডের যন্ত্রনিষ্পিষ্ট কার্পাসসূত্র হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ভারতীয় বস্ত্রের উৎকৃষ্ট খ্যাতি কেবলমাত্র এখানকার তন্তুবায়গণের যত্নে ও কার্যকুশলতায় ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। ঢাকার তন্তুবায়গণ সূতা পাট করিতে জানে। এই কারণেই তাহাদের বস্ত্রবয়ন খ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।[৭৭] বস্তুত ঢাকার তন্তুবায়গণ এরূপ অধ্যবসায় ও ধীরতা সহকারে প্রত্যেকটি সূতা স্বতন্ত্রভাবে খৈ-এর মণ্ড সহযোগে পাট করে যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। অতি সূক্ষ্ম ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি পরিষ্কার লৌহ শলাকার (সূচের ন্যায়) নিম্নতম অংশে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান রাখিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র মৃৎগোলক সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটির নামই "ডলনকাঠী"।

চরকা ও ডলনকাঠীর শাহয্যেই ঢাকার সূতা কাটা হইত। চরকা দ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা দ্বিতীয় শ্রেণির সূতা ও ডলনকাঠী দ্বারা অতি সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা প্রস্তুত হয়। ভোগা জাতীয় তুলায় উৎপন্ন ৩০ নম্বর ও তন্নিম্নশ্রেণির সূতাই চরকায় কাটা হইয়া থাকে। উপরের শ্রেণির সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে "টাকুয়া" ও "ডলনকাঠী"-র শাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

কর্দমসংযুক্ত নরম মৃত্তিকার ঢিপির উপরে একটি ভগ্ন কড়ি অথবা কবুতর কি কচ্ছপডিম্বের খোসা সংস্থাপনপূর্বক টাকুয়ার নিম্নাগ্র ভাগ উহাতে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্তের

অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শাহায্যে উহা ঘুরাইতে হয়; এবং বাম হস্তে তুলার পাঁজদ্বারা টাকুয়ার অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশ পাঁজটি উপরের দিকে উঠাইতে হয়। এরূপ করিলেই তুলার আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত হইতে থাকে।

প্রথমত তুলা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। অতঃপর চরকা ও ডলনকাঠীর শাহায্যে ভোগা জাতীয় অপকৃষ্ট তুলা এবং ডলনকাঠীর শাহায্যে উৎকৃষ্ট মসলিন নির্মাণোপযোগী সূতার তুলা পরিষ্কৃত করিতে হয়। তুলা পরিষ্কৃত করা হইলে পরে উহা "পিজিতে" হয়।

ক্ষুদ্র বংশদণ্ড নির্মিত ধনুকে পশ্বাদির নাড়ির সূক্ষ্ম তার অথবা মুগার সূক্ষ্ম সূত্র সংযোগ করিয়া উহার ছিলা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই যন্ত্র শাহায্যে তুলা ধুনিতে হয়। তুলা ধুনিবার পূর্বে উহা আঁচড়াইয়া লওয়া হয়। বোয়াল মৎস্যের জোয়ালের হাড় দ্বারা আঁচড়াইবার যন্ত্রটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। জোয়ালের হাড়ে বোয়াল মৎস্যের যে ক্ষুদ্র দন্তপাটিকা আছে তাহা তুলা আঁচড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া তন্তুবায়গণ বলিয়া থাকে।

"ধুনা" হইয়া গেলে তুলার "পাঁজ" চিতল অথবা কুচিলা মৎস্যের শুষ্ক খোসার মধ্যে জড়াইয়া রাখিতে হয়। সুতরাং তুলার ধূলা অথবা শৈত্য লাগিতে পারে না।

সাধারণত অষ্টাদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্কা হিন্দু রমণীগণই সূক্ষ্ম সূত্র নির্মাণ করিতেন। ত্রিংশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রভাত সময় এবং অপরাহ্নকালই সূক্ষ্ম সূত্র নির্মাণের উপযুক্ত সময়। বায়ুর শৈত্য হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিলেই সূত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কা। ধীর, স্থির প্রফুল্ল ও একনিষ্ঠ চিত্ত না হইলে সূক্ষ্ম সূত্র নির্মিত হইত না।[৭৮]

সূতা পাটকরণ :

যে সূতায় তানা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা দিবসত্রয় পর্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। এইসময়ে প্রত্যহই ঐ জল পরিবর্তন করা আবশ্যক। চতুর্থ দিবসে সুতার মোড়াগুলি জল হইতে উত্তোলনপূর্বক উহার মধ্যে দুইখানা ক্ষুদ্র যষ্টিখণ্ড রাখিয়া ঐ যষ্টিদ্বয়ের শাহায্যে মোড়াগুলি ভালরূপে নিংড়াইয়া লইয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। কয়লার গুঁড়া, গৃহধূম, অথবা ভাতের হাড়ির কালী, জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে পূর্বোক্ত শুষ্ক সূত্রগুলি পুনরায় দুইদিন পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর পরিষ্কার জল দ্বারা উহা ভালরূপে ধৌত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। সূতাগুলি নাটাইয়া আবার একদিন পর্যন্ত উহা জলে রাখিতে হয়। পরে ঐ সূতা ভালরূপে নিংড়াইয়া একখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাইয়া রাখে। খুব পরিষ্কার চুণজলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে খৈ ভিজাইয়া মণ্ডের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। সূতাগুলি ঐ মণ্ডে উত্তমরূপে মাখাইয়া লওয়া আবশ্যক। পরে এক একটি করিয়া সূতা নাটাইতে হয়। নাটাইবার সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন, একগাছা সূতা অপর একগাছার গায়ে না লাগে। নাটাইয়ের সূতাগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। পরেনের সূতাগুলি বয়নের দুই দিবস পূর্বে ঠিক করিয়া লইতে হয়। একদিনে যে পরিমাণ সূতার কাজ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। পরে ভালরূপে নিংড়াইয়া লইতে হয় এবং পূর্বোক্ত প্রণালিতে সামান্যরূপে পাট করিয়া লইলেই হইল।

সবনম মসলিনের সূতা পাট করিবার সময়ে খৈয়ের মণ্ডের সহিত অতি অল্প পরিমাণে গৃহধূম মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং সূত্রগুলি ঈষৎ কালবর্ণে পরিণত হয়। এ জন্যই তন্তুবায়গণ সবনম শব্দে অর্ধ কৃষ্ণবর্ণ অথবা "গোধুলি" বুঝিয়া থাকে।[৭৯]

তানা অপেক্ষা পরেনের সূতা সূক্ষতর। মসলিনের মুখপাত সূক্ষ্মতম সূতায় প্রস্তুত হয়। শেষভাগের সূতা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের, মধ্যের দিকে আরও একটা মোটা সূতা ব্যবহৃত হয়।

সূতার নম্বর	দেশী সূতার ওজন	বিলাতি সিকিমোড়া সূতার মূল্য	দেশী সিকিমোড়া সূতার মূল্য
২০০নং	১ তোলা	৶০	৮॥
১৯০নং	১ ৲১৮	৵১৫	৷৵০
১৮০নং	১ ৵১৫	৵১৫	৷৵০
১৭০নং	১৵১৬	৵১০	৷/০
১৬০নং	১৷০	৵১০	৷০
১৫০নং	১৷/৭	৵১০	৶১০
১৪০নং	১৷৵১৭	৵৫	৶০
১৩০নং	১॥ ১২	৵৫	৶০
:২০ন°	১॥৵১৩	/১৫	৵১৫
১১০নং	১৸/৫	/১৫	৵০
১০০নং	২	/৫	৵০
৯০নং	২ ৶১১	/৫	/১৫
৮০নং	২॥০	/৫	/১৫
৭০নং	২৸০	/১৷০	/১৫
৬০নং	৩৷/৫	/২॥	৵০
৫০নং	৪	/৫	৵০
৪০নং	৫	/৭॥	৵০
৩ নং	[illegible]৵০	/২৮	৵০

বিলাতিসূতা : ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় বিলাতি সূতার আমদানি আরম্ভ হইলে এখানকার সূত্রশিল্পের অবনতি ঘটে। বিলাতি সূতার সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী সূত্র অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিল না। সুতরাং দিন দিন উহা ক্ষয়প্রাপ্ত রোগীর ন্যায় দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। টেইলার সাহেব তদীয় 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' নামক গ্রন্থে দেশী ও বিলাতি সূত্রে মূল্যের তারতম্য প্রদর্শনপূর্বক যে একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।[৮০]

বিক্রমপুর, সোনারগাঁও ও ধামরাই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ রমণীগণ অতি উৎকৃষ্ট পৈতার সূতা কাটিতে পারিতেন। উহার এক একটি পৈতা এলাচীর খোসার মধ্যেও ভরিয়া রাখা চলিত। এই শিল্পটিরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। তৎকালে ঘরে ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। প্রবাদ এই যে, এই দেশে বিলাতি সূতা চালাইবার জন্য কোম্পানির লোকে সেই সময়ে অনেকের চরকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, কোথায়ও চরকার উপর গুরুতর কর ধার্য করা হইয়াছিল। এই প্রবাদ সত্যমূলক কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ নহে।[৮১]

(ঙ) তাঁত :

ঢাকাতে তাঁতকলের উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে প্রণালিতে বস্ত্রবয়ন কার্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে সেই প্রথার উন্নতি ও পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই।

ঢাকার স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রখ্যাতনামা মনীষী স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহোদয় উন্নত প্রণালির একটি তাঁত প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

অতঃপর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দত্ত এম এ বি মহোদয় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই একটি অভিনব ও উন্নত প্রণালির তাঁত প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা করিয়া

অধুনা প্রায় সফলকাম হইয়াছেন। এই তাঁতে সূত্রগুলির তানাকার্য পরিসমাপ্ত হইয়া বয়নকার্যও এক সঙ্গে সম্পন্ন হইতে পারিবে। এই কলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে বিজ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত প্রতীচ্য জগৎও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুর অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল হইতেই উৎকৃষ্ট মাকু প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[৮২]

নৌ শিল্প :

ঢাকা জেলা নদীজালে সমাচ্ছন্ন, এজন্যই এতদঞ্চলে নৌকার প্রয়োজন বেশি। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এতদ্দেশবাসীগণ নৌশিল্পে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুত বস্ত্রশিল্পের ন্যায় বঙ্গীয় নৌশিল্পেও প্রতীচ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

"যুক্তি কল্পতরু" নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থে জলযান নির্মাণ কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে পূর্বকালে যানের কক্ষগুলি কণক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়ের বা উহাদের মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত।[৮৩] চতুঃশৃঙ্গ যান সিতবর্ণে, ত্রিশৃঙ্গ যান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গ যান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গযান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার রীতি ছিল। যানের মুখগুলি কেশরী, মহিষ, নাগ, হস্তী ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মনুষ্যের মুখের অনুকরণে নির্মিত হইত। নির্গৃহ ও সগৃহ ভেদে নৌকা দ্বিবিধ। সগৃহ নৌকা আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে 'সর্বমন্দিরা' বলা হইত। ইহা রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্রেণির যানের নাম ছিল "মধ্যমন্দিরা।" ইহার মন্দির মধ্যভাগে থাকিত বলিয়া ইহা মধ্যমন্দিরা নামে খ্যাত ছিল। ইহা বর্ষাকালে রাজাদিগের বিলাস যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে যানের মন্দির অগ্রভাগের দিকে থাকিত তাহা "অগ্রমন্দিরা" নামে পরিচিত ছিল। ইহা চিরপ্রয়াস যাত্রায় এবং রণে ব্যবহৃত হইত। মন্দিরগুলি কাষ্ঠ অথবা ধাতু দ্বারা নির্মিত হইত।[৮৪]

নৌকা দ্বিবিধ। সামান্য এবং দীর্ঘ।

সামান্য নৌকা দশবিধ : ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘ্যা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। সার্ধ এক হস্ত বৃদ্ধি হইলে ভীমা প্রভৃতি নৌকা হইবে। ইহার মধ্যে ভীমা, অভয়া ও গর্ভরা নৌকা শুভজনক নহে।

দীর্ঘ নৌকাও দশবিধ : দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গড়য়া, গামিনী, তরি, জঙঘালা, প্লাবিনী, ধরণী ও বেগিনী। ইহার মধ্যে লোলা, প্লাবিনী ও গামিনী দুঃখপ্রদা"[৮৫]

মহাভারতে যন্ত্রচালনীয় নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ততঃ স প্রোষিত বিদ্বান্ বিদুরেন নরস্তদা।
পার্থানাৎ দর্শয়া মাস মনো মারুত গামিণীম্।।
সর্ববাত মহাৎ নাবৎ যন্ত্রযুক্তাং পতাকিণীম্।
শিবে ভাগিরথীতীরে নরৈর্বি শ্রান্তিভিঃ কৃতাম্"।।

ভা ১।১৫০।৪৫

"এই যন্ত্রচালনীয় নৌকা শব্দে কলের জাহাজই বোধ হয়। বর্তমান সময়ে জাহাজের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্ত যন্ত্রচালনীয় নৌকার সহিত তুল্য। এই নৌকা মনোমারুতগামিণী, যন্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার পতাকা শোভিত হয়"।

নৌকা প্রস্তুতের জন্য কিরূপ কাষ্ঠের প্রয়োজন তাহাও হিন্দুদিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিল না। বৃক্ষায়ুর্বেদে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ কি প্রকার গুণবিশিষ্ট তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করিলে উহা সুখপদ হয় না বলিয়া কীর্তিত আছে।

লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্ম জাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্র জাতি তৎ।।
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্র জাতি তদুচ্যতে।।

* * * * *

ক্ষত্রিয় কাষ্ঠে-র্ঘটিতা ভেজে মতে সুখ সম্পদং নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈ বির্দধতি জল দুস্পদে নৌকাং।।
বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠ জাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় লোকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে বারিণী মজ্জতেচ।।
ন সিন্দু গাদ্যার্হতি লৌহ বন্ধং তল্লোহ কান্তৈর্হ্রিয়তে হি লৌহম্।।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ"।।

কথিত আছে মহারাজ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পূর্বাঞ্চলের নিমিত্ত নৌসেনা বিভাগের সৃষ্টি হয়। নদীবহুল দেশ বলিয়া এতদ্দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাল রাজগণও নৌবিভাগের বিশেষ আদর করিতেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নৌবিভাগের অধ্যক্ষ "তারিক" নামে অভিহিত হইতেন।

প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালিরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য পূর্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কন কেতক দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ বাঙ্গাল মাঝিদিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্যব্যপদেশে দক্ষিণ পাটণে গমনোদ্যত চাঁদসদাগর বর্ধকী আনিয়া বিবিধ ডিঙ্গা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ ডিঙ্গাগুলি বিবিধ পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণপাটনে যাত্রা করিয়াছিলেন, কোন কোনও নৌকা বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ, কোনওটিতে বা হাট বাজার বসিত। তৎকালে "চন্দন কাষ্ঠে গুড়া আর ডালি" প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

বঙ্গে বার ভূঞার আধিপত্য কালে খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর ও ধাপা প্রধান নাবিস্থান ছিল। কার্ভালোর সহিত আরাকান রাজ সেলিম সার যে ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কার্ভালোর রণতরীসমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া গেলে, তিনি আপনার নৌ শ্রেণি গঠনের জন্য শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মগ ও পর্তুগিজ প্রভৃতি জলদস্যুর উৎপাত নিবারণের জন্য মোগল সুবাদারগণ নৌবলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাব মীরজুম্লার আসাম অভিযান সময়ে এবং সায়েস্তাখাঁর চট্টগ্রাম অধিকার কালে ঢাকার নৌবলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

টেভারনিয়ার যে সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে এখানে বহু সংখ্যক সূত্রধর নবাব সায়েস্তাখাঁর আদেশ মতে নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি এখানে সূত্রধরের সংখ্যাধিক্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[৮৬]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত যে এই শিল্প ঢাকা হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল না, তাহা আমরা বিশপ হিবাবের গ্রন্থ হইতেও অবগত হইতে পারি।[৮৭]

ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিশ মীরজুম্লা ও সায়েস্তা খাঁ সময়ের নৌবলের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে কোষা, জলবা, ঘ্রাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পালেল, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গি খালু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নৌকার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বর্তমান সময়েও ঢাকা জেলায় কোষা, বজরা, ভওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, ডিঙ্গি, পলয়ার, পান্সী, কুমারিয়া নৌকা, ঘাসি নৌকা, জেলেডিঙ্গি, গহেনারনৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত পানুয়া নৌকা, ডাকের নৌকার বিষয়ও অবগত হওয়া যায়, নাওধুরী, সারেঙ্গা, ডোঙ্গা নৌকার ব্যবহারও কোনও কোনও স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মীরের বাগের মাঝিগণ পলওয়ার ও লাল ডিঙ্গির পরিচালনার জন্য বিখ্যাত। নৌকা পরিচালনায় জেলে মাঝিগণ সিদ্ধহস্ত। ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও ইহারা সুকৌশলে অবলীলাক্রমে নৌকা চালাইয়া থাকে।

শিকারিগণ পূর্বে ছিপ নৌকার মাঝিগিরি করিত।

১. Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 365.
২. Ezekiel Ch. xvi. io. 13 and Isiah Ch. iii. 23.
See Harris's Natural History of Bible and also interpretation given by Bishop Louth, Dr Stock and Mr. Dedson
৩. "Pliny when speaking of Muslin, terms it a dress, under whose slight veil our women continue to shew their shapes to the public"
"Muslimn of Dacca Constituted the *Seriae vestes* which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its laxury and refinement"—Cotton manufacture of Great-Britain by Dr. Ure
৪. See Introduction to the Rigveda Sanghita.
৫. Tesitriuum Antiquorum. L C page 341
৬. Juvenal Sat ii 65
৭. History of the Cotton manufacture.
৮. Book of Esther Ch i .v 6.
৯. Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 163.
১০. Account of India and China by two Mohammedan travelers.
১১. A Turkish Nautical journal by Sidi Chapridan Translated by J. Van. Hammer Barron Purqstall. See J A S of Calcutta vol V p 467.
১২. Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 163.
১৩. Vide Trigonometrical survey of India printed by order of the House of Commons, 15th April. 1851.
১৪. Eng. Cyclo. Art and Science vol III p. 851 বিশ্বকোষ।
১৫. "... When the City was in its most flourishing condition that those gossamer like Muslins were made, which have been compared "to the work of fairies rather than of men", and which constituted "the richest gift that Bengal could offer to her native Princes."—Taylor's Topography of Dacca Page 363.
১৬. Analysis of the Dulva by A Csoma Korosi in Res. Asiatic Society of Calcutta vol xx pt I page 85
১৭. 'Sircar Sunargong. In this Sircar is fabricated cloth, called Cassah'— Gladwin's translation of Ain-i-Akbari Page 305.
১৮. Bolt's Considerations in the affairs of India page 206.
১৯. Some of the muslins of India and especially those of Dacca, are of the most astonishing degree of fineness so as to justify the poetical designation "a web of woven wind"—Eng. cyclo. Art and Science Vol III. page 851.
২০. See Bolt's Considerations on the affairs of India page 206.
২১. History of the Cotton manufacture of Dacca District.
২২. Ibid.
২৩. A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908 by. Mr. G. N. Gupta M.A.I.C.S.

২৪. History of the Cotton manufacture of Dacca District.
২৫. Ibid.
২৬. The Textile manufacture and Costumes of the people of India by F Watson. 1866.
২৭. Ibid.
২৮. Raynel's History of the Settlement & Trade of the Europeans in the East and West India vol II page 157.
২৯. History of the Cotton manufacture of Dacca District.
৩০. হিন্দি "কুটাও" (বস্ত্রে বুটাতোলা) এবং আরবি "রুমী" (রোমীয় বা গ্রিস দেশীয়) এই উভয় শব্দের সংমিশ্রণে উদ্ভুত হইয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের জনগণের ব্যবহারার্থ প্রেরিত হইত বলিয়াই উক্ত কসিদাবস্ত্র এবম্বিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। "রুমী" এই শব্দ অদ্যাপি ভারতে প্রচলিত আছে। তুরস্কের সুলতান রুমের বাদশাহ বলিয়া অদ্যাপি এতদঞ্চলে পরিচিত। তুরস্ক অথবা তুরস্ক সম্রাটের শাসনাধীনস্থ জনগণকে রুমী বলিয়া অভিহিত এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। তুর্কি এবং গ্রিকগণ ভারতে মোসলমান অধিকারের বহু পূর্ব হইতেই পূর্বদেশে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করিতেন। তাহাদিগকেও রুমী বলিত, ইহা জানা যায়। Cosmos Indicoplenstes উল্লেখ করিয়াছেন যে তদীয় বন্ধু Sopatrus ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহলদ্বীপে উপনীত হইলে সিংহলরাজ তাহাকে রুমী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। (Vincent's Periplus of the Erythrean sea).
৩১. Descriptive and Historical account of the cotton manufacture of Dacca District.
৩২. "The English factory was started about the year—1666" Bowrey.
৩৩. In a letter to Hughly dated 24th Jany. 1668, the Court Comment on information received in the previous year that "Dacca is place that will vend much Europe Goods, and that the best Cossacs, mullmulls may then be procured" If the factory at Hughly were of opinion that the settling a factory at Dacca would result in a large sale of broad cloth they had liberty given them to send 2 or 3 fit persons thither to reside Letter Book No. 4.
৩৪. Diary of Streynsham master under date 23rd Nov. 1676 p. 269 I
৩৫. "The council did therefore order that brick buildings be forthwith erected to secure the Company's goods not exceeding one thousand Rupees for the year"—Bowrey
৩৬. History of Cotton Manufacture of Dacca District.
৩৭. "A common table was maintained at the factory, at the expense of the company".
৩৮. See appendix v. Pages 411 and 412 : Hill's Bengal Records vol. III.
৩৯.

বাটা ও ভাড়া	...	২৫৫৯৩ টা.	৮ আনা
খোরাকি খরচ	...	৪৩৬৯ টা.	৪ আনা
বাড়ি ভাড়া ও ভূমির রাজস্ব	...	২৮১০ টা.	৩ আনা
চাকরান মাহিয়ানা খরচ	...	৮৫৮ টা.	
সৈনিকবিভাগের খরচ	...	৮৬০ টা.	১১ আনা
কুঠির প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত বাঙ্গালার খরচ	...	১৭৫২ টা.	৭ আনা
মেরামতি খরচ	...	১২৪১০ টা.	১১ আনা
তেজগায়ের বাঙ্গালার খরচ	...	১০১৯ টা.	১৩ আনা
ঐ মেরামতি খরচ	...	১১৬১ টা.	১৩ আনা
ঝাজরা ও নৌকা ভাড়া	...	৯২৫ টা.	১৩ আনা
সাধারণ খুরচা খরচ	...	৪৯৪৩ টা.	১২ আনা
		৫৭৬৬৬ টা.	৭ আনা

৪০. উইলিয়াম সামার এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। সুতরাং স্ক্রেফটন, হুইস্ডম্যান, ওয়ালার কার্টিয়ার, জনস্টন, লেপ্টেনেন্ট কাডমোর (ইনি ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন) ইউলসন (কোম্পানির ডাক্তার) শিশুপুত্রসহ মিসেস বিচার, মিসেস ওয়ারউইক মিস হার্ডিং প্রভৃতিকে ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মনিয়ার কার্টিনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।
৪১. এই সময়ে লেপ্টেনেন্ট কাউই ঢাকায় ইংরেজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়েই প্রভিন্সিয়াল কৌন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ লজের আদেশানুসারে ফরাসীদের জগদীয়ার কুঠিও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। জগদীয়ার কুঠি ঢাকা-কুঠির অধীনস্থ একটি শাখামাত্র ছিল।

৪২. Vide History of Cotton Manufacture of Dacca District
৪৩. "The Hollanders finding that their goods were not safe in the ordinary houses of Dacca, have built there a very fair house"—Tavernier's Travels Book I. Page 103.
৪৪. See History of Cotton Manufacture of Dacca District.
৪৫. See Grant's History of East India Coy. Page 67.
৪৬. See Burkes works Vol. XI. Page 138.
৪৭. History of Cotton Manufacture of Dacca District.
৪৮. See A Hand-book of Indian products by T. N. Mukherjee published by J Patterson.
৪৯. See History of Cotton Manufacture of Dacca District.
৫০. Grant's History of the East India Company
৫১. কিন্তু অজ্ঞাত নানা গ্রন্থকার এই সময়কেই ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের "সুবর্ণযুগ" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুত : ঢাকাই বস্ত্রশিল্পের অবনতি ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দের পরই আরম্ভ হইয়াছিল।
৫২. Taylor's Topography of Dacca
৫৩. Ibid.
মনস্বী বার্ডউড পার্লেমেন্টের এই আইনকে "১৭০০ সনের কলঙ্ককর আইন" (The scandalous law of 1700) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।
৫৪. Report on the old Records of the India Office—by Sir George Birdwood. Page 59.
৫৫ Mill's History of British India (Wilson)
৫৬. "This boon came too late'—Clay.
৫৭. Taylor's Topography of Dacca.
৫৮. They have been treated also with such injuries that instances have been known of cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk—W Bolts. 1772
৫৯. Asiatic Researches Vol XVII.
৬০. "In 1870 a Resident of Dacca. on a special order received from China, procured the manufacture of two pieces of Muslin, each ten yds. long by one wide and weighing 10½ sicca rupees—The price of each piece was similar pieces, from the same quarter, but the parties who had supplied him on the former occassion had died in the mean time, and he was unable to execute the Commission". Asiatic Researches Vol. XVII.
৬১. Asiatic Researches Vol XVII.
৬২. Ibid.
৬৩. "In the town of Catare soonder is a large reservoir of water which gives a peculiar whiteness to the cloths that are washed in it". —Glad win's Translation of Aini Akbari P. 305
৬৪. History of the Cotton manufacture of Dacca District.
৬৫. Ibid and Taylor's Topography of Dacca.
৬৬. Dr. Taylor's Tropography of Dacca, Page 176.
৬৭. "The manufacture of needles introduced into England from India in 1540 during Elizabeth's time"—Act of Needle Work page, 354.
৬৮. See Histore des Indes Orientals Par M. L Abbes Guyan Vol. II page 30.
৬৯. See Penant's View of Hindusthan Vol II. page 340
৭০. ভগবানের নাম এবং দশ মহাবিদ্যার স্তোত্রাদি সম্বলিত বস্ত্র "নামাবলি" নামে সুপরিচিত। কোরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলি যে বস্ত্রে ছাপা হয় তাহার নাম "কুফন।"
৭১. History of the Cotton manufacture of Dacca District.
৭২. Ibid.
৭৩. Ibid.
৭৪. Ibid Sir Charles Wilkins সাহেব বিলাতের মিউজিয়ামে ঢাকার মসলিন নির্মাণোপযোগী সূত্রের নমুনা প্রেরণ করিয়াছিলেন; Sir Joseph Baubs কর্তৃক উহার ওজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হইলে প্রতি পাউন্ডে উহা ১১৫ মাইল ২ ফার্লং ৬০ গজ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল।
See Baine's History of Cotton manufacture.

৭৫. The Textile manufacture and Costumes of the people of India by F. Watson, 1866.

৭৬. "These causes—Combined with the ascertained result that the number of twist in each of length in the Dacca yarn amounts to 110 and 807, while in the British it was only 68.8 and 56.6, not only account for the durability of the Dacca over the European fibre"—Balfour's Cyclo, India..

৭৭. The Textile manufacturers and Costumes of the people of India 1866.

৭৮. "The cause of the perfection of Muslin manufacture of India must be sought for the exquisitely fine organisation of the natives of the East. Their temperament realizes every feature of that described under the title nervous by physiologists"—Dr. Ure.

৭৯. The starch used for shenen Muslins is mixed with a small quantity of lamp black, and hence the name shibnem signifying "halfdark" or twilight according to the weaver's interpretation"—Taylor's Topography of Dacca Page. 175.

৮০. সে আমলে প্রচলিত ওজন ও মূল্যের ব্যবহারের নমুনা স্বরূপ মুদ্রিত কপির প্রতিলিপি।

৮১. "Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the Cotton industry in India. He produced an Indian Charka or spinning wheel before the select Committee and explained that there was an oppressive Moturfa tax which was levied on every charka, on every house, and upon every implement used by artisans. The tax prevanted the introduction of sawgins in India"—Indian in the Victorian Age. P. 135.

৮২. See History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

৮৩. "কণকং রজতং তাম্রং ত্রিতরম্বা যথাক্রমন্।"

৮৪.
"চতুঃ শৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গাভা দ্বিশৃঙ্গা চৈক শৃঙ্গিণী।।
সিত রক্তা পীত নীল বর্ণান্দিদ্যাদ্যথা ক্রমম্।
কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্র এবচ।।
পক্ষী ভেকো মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্"।
"সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব মধ্যাগ্রমন্দিরা।
সর্বতো মন্দিরাং যত্র সাজ্ঞেয়া সর্বমন্দিরা।।
"রাজ্ঞাং বিলাস যাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যাতে।
অগ্রতো মন্দিরাং যত্র সাজ্ঞেয়া ত্বগ্রমন্দিরা।।
চিরপ্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে।।

* * * * * * * * * * * * *

কাষ্ঠজং ধাতুজঞ্চেতি মন্দিরং দ্বিবিধং ভবেৎ
কাষ্টজং সুখ সম্পত্ত্যৈ বিলাসে ধাতুজং মতম"।।

শব্দ কল্পদ্রুম বসুমতি সংস্করণ ৮৯৪ পৃঃ।

৮৫. বিশ্বকোষ নৌকা শব্দ।

৮৬. "There is but one continued row of houses separated one from the other, inhabited for the most part by carpenters, that build galleys and other small boats". Traverniers Tavels Book 1. page 103 Bangabhasi edition.

৮৭. Boating is popular, and they make boats very well here" Bishop Hebers Narrative of a Journey Vol 1 Page 186.

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ শিল্প
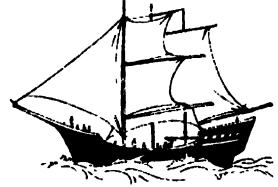
জন্মাষ্টমীর চৌকি :
ঢাকা শিল্পপ্রধান স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিবিধ শিল্পকলার বিকাশ এখানে যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বঙ্গের অন্যান্য স্থানে সুলভ নহে। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকির শিল্পচাতুর্য জগৎ প্রসিদ্ধ। এক একখানা চৌকি উচ্চতায় ত্রিতল অট্টালিকাকেও পরাজয় করিয়া থাকে। এই সুবিশাল চৌকিগুলি বংশদণ্ড এবং কাগজ দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার বিভিন্ন অংশগুলি খণ্ডিতাকারে শহরের নানা স্থানে বিভিন্ন কারিগরগণ দ্বারা নির্মিত হইলেও মিছিলের প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা পূর্বে একত্র করা হয়; এবং সংযোজিত করা হইলে, উহা যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। কোনও কোনও শিল্পী চৌকিগুলি শুধু সুনিপুণভাবে নির্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহাতে বিবিধ প্রকারের কল সংযোজনা করিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং মুহূর্তে মুহূর্তে চৌকিগুলির দৃশ্য আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তবিমোহন করিতে সমর্থ হয়। এই অভিনব প্রণালি গত কয়েক বৎসর যাবত সূচিত হইয়াছে; এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আনন্দহরিকেই ইহার প্রকৃত প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণির চৌকিগুলির মধ্যে "বেলুন" "ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন", "উর্বশীর শাপ বিমোচন" প্রভৃতি চৌকি শিল্পচাতুর্যে শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নভোমণ্ডলস্থ গ্রহগণের ভ্রমণ ও গ্রহাদি এবং পৌরাণিক ও সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহাদি, দুর্গ, কেল্লা, সার্কাস, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়াকৌশলও বড়চৌকিতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শঙ্খশিল্প :
এই জেলা মধ্যে শহর ঢাকা ও মাণিকগঞ্জস্থিত শঙ্খকারগণ উৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঢাকায় শাঁখারি বাজারে এই শিল্পীগণ সাধারণত বাস করিয়া থাকে। এখানে প্রায় ১০০ শত ঘর শাঁখারি বাস করে। এতদ্ব্যতীত ফরিদাবাদেও ৫।৬ ঘর শাঁখারি আছে। বর্তমান সময়ে ঢাকা শহরে প্রায় ৫০০ শত জন লোক এই শিল্পদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাদের ব্যবসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণ শাঁখার জোড়া ৬ আনা হইতে ২ টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। শঙ্খশিল্পীগণ সাধারণত ১০০ শত টাকা মূলধন লইয়াই স্বীয় ব্যবসায় আরম্ভ করে।

শঙ্খের সমুদয় কার্যই হস্তদ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। করাত দ্বারা শঙ্খচ্ছেদন করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য, ইহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা অধিকতররূপে করিতে হয়। শঙ্খ কর্তিত হইলে পর উহা একখণ্ড প্রস্তরোপরি বিশেষ ধৈর্যসহকারে ঘর্ষণ করাও কম আয়াসসাধ্য নহে।

শাঁখা, অঙ্গুরি, বালা; চুড়ি, ঘড়ির চেন, বোতাম ও কানের ফুল, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য শঙ্খ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শঙ্খকারগণ এই সমুদয় দ্রব্যের উপর নানা প্রকার কারুকার্য খচিত করে। বিবিধ কারুকার্য সমন্বিত লতাবালা, শঙ্খবালা, উপরবেণী, উপরশঙ্খ, লতাসাপ, দোসাপা,

মকরমুখো, চেনবালা, বক্‌লস্‌, চুড়ি প্রভৃতি শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি বঙ্গ প্রসিদ্ধ। এই সমুদয় শঙ্খ লঙ্কাদ্বীপ, মাদ্রাজ উপকূল ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে ঢাকাতে আমদানি হয়। সাধারণত লঙ্কাদ্বীপ হইতে তিতকৌড়ি শঙ্খ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে জাহাজি, ধলা, ও পটি শঙ্খ এবং মাদ্রাজ উপকূল হইতে গড়বাকি শঙ্খ কলিকাতা হইয়া ঢাকাতে আমদানি হইয়া থাকে। সুরতি, দুয়ানপটী ও আলানিলা শঙ্খই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর সমুদ্র উপকূল হইতে প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ ঢাকাতে আমদানি হয়; এবং ঢাকা হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার নানাবিধ শাঁখার দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

এই শিল্প সম্বন্ধে গর্ভনমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্তব্য। টিউটিকরিন প্রভৃতি স্থানের শঙ্খ ভারত গভর্নমেন্টের হস্তে একচেটিয়া; সুতরাং ইচ্ছা করিলে গভর্নমেন্ট শঙ্খ ব্যবসায়ীদিগকে উহা সুবিধায় বিক্রয় করিতে পারেন। তাহা হইলেই ইহাদিগের যথেষ্ট শাহায্য করা হইল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ঢাকার প্রেমচাঁদ সুর, দ্বারিকানাথ নাগ প্রভৃতি কারিগরের তৈয়ারি শাঁখার দ্রব্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ।

সাবান :

ঢাকা শহরে সাবানের একটি কারখানা আছে, তাহা "বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি" নামে পরিচিত। প্রায় ৩০০০০ টাকা মূলধন লইয়া এই ফ্যাক্টরিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকার বুলবুল সাবানই দেশীয় সাবানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

দেশী সাবান :

সাবান প্রস্তুত প্রণালি সম্ভবত মোসলমানগণই সর্বপ্রথমে এতদ্দেশে প্রচলিত করিয়া ছিলেন। "সাবুন" এই আরবি শব্দ হইতেই সাবান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঢাকার বাঙ্গালা সাবান এক সময়ে সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঢাকাই তৎকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাবানের অভাব মোচন করিত। সুদূর বসোরা এবং জিদ্দার বন্দরেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ঢাকায় সাবান বিক্রীত হইত।[১]

বাঙ্গলা সাবান নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত হইত।[২]

শামুকের চুর্ন	১০ মন
সাজিমাটি	১৬ মন
লবণ	১৫ মন
তিলতৈল	১২ মন
ছাগচর্বি	৫ মন ১ সের
	৫৩ মন ১৫ সের

স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য :

ঢাকার কর্মকারগণের শিল্পচাতুর্য বঙ্গপ্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারের উপর ইহারা এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য ফলাইতে পারে যে তদৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঢাকাই কর্মকারগণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহারা অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের কর্মকারগণ এই বিষয়ে ঢাকার কর্মকারগণের সমকক্ষ নহেন।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল ইরানের বাদশাহ ঢাকার অবদান কল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব স্যার আসানউল্লা বাহাদুর কে, সি, আই, ই মহোদয়ের নিকটে ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন হুসনী দালানের একখানা আলোকচিত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। শুধু সামান্য একখানা আলোকচিত্র সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করা স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের মনে ভাল লাগিল না। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিগর আনন্দহরির হস্তে ইমামবাড়ার একখানা স্বর্ণ ও রৌপ্য তার নির্মিত

প্রতিকৃতি নির্মাণ করিবার ভার অর্পণ করেন। আনন্দহরিও স্বীয় গুণপনা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত হইয়া অতি সুচারুরূপে কার্যটি সম্পন্ন করেন। আমরা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নবাব বাহাদুরের "আসান মঞ্জিল" প্রাসাদের উক্ত প্রকার একখানা প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করিয়া আনন্দহরি বিস্তর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা ঢাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বোধ হয় এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে মিছিলের অগ্রগামী কুঞ্জবযুথের মস্তকোপরি পরিশোভিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুকুটগুলি এবং নানা কারুকার্য খচিত রৌপ্য ও হিরন্ময় ছোট চৌকিসমূহ শিল্পচাতুর্যে ও কলানৈপুণ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত বিষয়ে গোপী কর্মকার বর্তমান সময়ে ঢাকার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার রৌপ্য নির্মিত আতরদান, গোলাববাস প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট।

ডাকের সাজ :

রাং-এর নানাবিধ কারুকার্য জন্য গোয়ালনগর, পানিটোলা প্রভৃতি মহলা সুপ্রসিদ্ধ। কাষ্ঠ ফলকোপরি বিচিত্র কারুকার্য খচিত নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাং-এর সূক্ষ্ম পাত উপর্যুপরি সন্নিবেশিতকরত হস্তের চাপ দিয়া ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই শিল্পটি বিনষ্ট হইয়া আর একটি অভিনব শিল্প ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে অনেকেই জার্মান প্রভৃতি দেশ হইতে আগত রাং-এর পাতদ্বারা নির্মিত ডাকের সাজ দেবীর অঙ্গ ভূষিত করিতে অনিচ্ছুক; সুতরাং ঢাকার এই শিল্পীগণ তৎস্থলে সোলার কাজ প্রস্তুত করিয়া ইহার অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত বদলা চুমকি ও সলমার কারুকার্যও প্রশংসার্হ।

লৌহের কারখানা :

অতি প্রাচীনকালে ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত লোহাইদ্ ও কীর্তনিয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ঐ সমস্ত স্থান খনন করিলে এক্ষণেও নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল লক্ষ্মীবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল শর্মা মহোদয় ঢাকা নগরীতে একটি লৌহের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিগর শ্রীযুক্ত কানাইলাল কর্মকারের তত্ত্বাবধানে ইহা প্রথমে পরিচালিত হয়। লৌহের নানাবিধ ঢালাই কাজ এই কারখানায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

পিতল, তাম্র ও কাংস্য পাত্র :

ঢাকা শহরের ঠাটারি বাজার মহল্লা, ধামরাই গ্রামে পিতল, তাম্র ও কাংস্য নির্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহজঙ্গ ও নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত কোনও কোনও স্থানেও এই সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ধামরাই-এর কাঁসার বাসন উৎকৃষ্ট। ভরণের কাজই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়। পূর্বে লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্তী দুয়ালী গ্রামে ভরণের কাজ হইত। ঢাকার স্বনামখ্যাত স্কুল ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় মহাত্মা দীননাথ সেন মহোদয় পিতল নির্মিত এক অভিনব প্রণালির দীপাধার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

টিনের বাক্স :

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই শহরে টিনের বাক্স প্রস্তুত হইত; কিন্তু বিলাতি বাক্সের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে উহা সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। সুতরাং তখন উহার বড় একটা সমাদর পরিলক্ষিত হয় নাই। পরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে উৎসাহিত হইয়া শিল্পীগণ উৎকৃষ্ট ও অভিনব প্রকারের দ্রব্যাদি নির্মাণ করায় উহার কাট্‌তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ

জে, এন, গুপ্ত ঢাকাই টিনের বাক্সের বিষয় গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্যাদি :

বহুকাল হইতেই ঢাকাতে হস্তীদন্ত নির্মিত শাঁখা ও চুড়ি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। এখানে খেদা অফিস থাকায় হস্তীদন্ত সংগ্রহ করা অনায়াসসাধ্য ছিল। সুতরাং শিল্পীগণ উহা সংগ্রহপূর্বক শাঁখা, চুড়ি, পাশারছক ও ঘুঁটি বোতাম প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জন করিতে সমর্থ হইত। এই শিল্পটি এক্ষণেও লুপ্ত হয় নাই।

শৃঙ্গের কারখানা :

মহিষের শৃঙ্গ নির্মিত শাঁখা, হরিণের শৃঙ্গের পাশার ছক ও গুটি প্রভৃতি অদ্যাপি বহুল পরিমাণে এখানে নির্মিত হইয়া থাকে।

কাচের চুড়ি :

মোসলমান শাসনকাল হইতেই এই জেলায় কাচের চুড়ি প্রস্তুত হইত। ঢাকার কাচের চুড়ি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফিরোজাবাদের কাচের চুরির অধিক সমাদর হওয়ায় ঢাকাই চুড়ির ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। ঢাকার চুড়িহাট্টা মহল্লাটির নাম দ্বারাই ঢাকাই চুড়ির ব্যবসায়ের গৌরব সূচিত হয়।

দেশী কাগজ :

প্রাচীনকাল হইতেই আড়িয়ল গ্রামে হরিদ্রবর্ণের এক প্রকার পুরু কাগজ প্রস্তুত হইত। উক্ত কাগজ প্রস্তুতকারকগণ "কাগজি" নামে পরিচিত ছিল। এই কাগজগুলি দৈর্ঘ্যে দেড় হস্ত ও প্রস্থে অর্ধ হস্ত পরিমিত হইত। পূর্বে আড়িয়ল গ্রামে প্রায় ৫০০ ঘর কাগজি বাস করিত। উহারা কাগজ প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। এক্ষণে দেশী কাগজের সমাদর নাই; সুতরাং উহারাও অন্যবিধ উপায় অবলম্বনে জীবিকা অর্জন করিতেছে।

মোজা ও গেঞ্জির কারখানা :

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শহরের নানা স্থানে এবং কোনও কোনও পল্লিতেও মোজার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই ঢাকা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল মহোদয় আমেরিকা হইতে Semi Automatic machine আনাইবার চেষ্টা করেন। পরে তাঁহারই যত্নে ঢাকাতে Branson এর কয়েকটি মোজার কল আনীত হয়। ঢাকায় মোজার কল প্রতিষ্ঠাও প্রচলন সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুই প্রথম উদ্যোক্তা।

বর্তমান সময়ে গুপ্ত এন্ড কোম্পানি এবং দাসব্রাদার্স কর্তৃক পরিচালিত কারখানা দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত এন্ড কোম্পানির কারখানায় সূত্র রঞ্জিত করা হয়। এই উভয় কারখানাতেই উৎকৃষ্ট মোজা ও গেঞ্জি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিঃ জি এন গুপ্ত তদীয় রিপোর্টে এই কারখানাদ্বয়ের কার্যপ্রণালির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।[৫]

ইট ও সুরকির কল :

ঢাকা শহরের নানা স্থানে প্রায় দশটি কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ৩০ হইতে ৭০ লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইটের কারখানাতেই ২/১টি করিয়া সুরকীর কল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্যবসায় মন্দ লাভজনক নহে।

ঝিনুকের দ্রব্যাদি :

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পূত মন্দাকিনী প্রবাহে যে সমুদয় শিল্প উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে ঢাকার ঝিনুকের নির্মিত দ্রব্যাদি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুত ঢাকার ঝিনুকের নির্মিত বোতাম, ঘড়ির চেইন, মাথার ফুল প্রভৃতি সৌন্দর্যে বিলাতি দ্রব্যাদির সহিত সগৌরবে স্পর্ধা করিতে সমর্থ। ঢাকার নারেন্দা প্রভৃতি স্থানেই ইহা বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া

থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রেরিত হইয়া থাকে।

পেন হোল্ডার :

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই নগরীতে যে সমুদয় স্বদেশী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে "গোল বদন কারখানায়" প্রস্তুত পেন হোল্ডার অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই কারখানায় প্রায় ত্রয়োবিংশতি প্রকারের অতি উৎকৃষ্ট হোল্ডার প্রস্তুত হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশগুলিই বিদেশজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা মনোরম ও সস্তা হইয়াছে। ইহাদিগের প্রস্তুত চন্দনকাষ্ঠের হোল্ডারগুলি খুব ভাল।

এতদ্ব্যতীত কালী, ব্লক্লো প্রভৃতিও নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে।

মৃৎশিল্প :

বিক্রমপুর ও চন্দ্রপ্রতাপের কুম্ভকারগণ প্রতিমা নির্মাণে সুদক্ষ। কাঁচাদিয়ার স্বর্গীয় গৌরীকান্ত সেন অতি সুন্দর মৃণ্ময় মূর্তি প্রস্তুত করিতে পারিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কলাকোপা ও তৎসন্নিহিত কতিপয় স্থানে সুবৃহৎ মৃণ্ময় তৈলাধার নির্মিত হইয়া থাকে ; উহা সাধারণত "মট্‌কি" নামে পরিচিত। এক একটি মট্‌কি এরূপ প্রকাণ্ড যে তাহাতে চল্লিশমণ পর্যন্ত তৈল রাখিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রায়তনেরও নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃণ্ময় "মোড়া" "ভাষি" ও "চার" প্রভৃতি নির্মাণ জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঢাকার মৃত্তিকা মৃৎশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাটির গাঁথুনিতে প্রকাণ্ড অট্টালিকাদিও সচরাচর নির্মিত হইয়া থাকে, উহা "কাঁচাগাথানী" বলিয়া পরিচিত।

উৎকৃষ্ট চুনকাম করিবার জন্য ঢাকার রাজমিস্ত্রিগণ প্রসিদ্ধ। এই চুনকাম (Stucco panelling) নবাব সায়েস্তা খাঁ এই স্থানে প্রবর্তিত করেন বলিয়া উহা সায়েস্তাখানি চুনকাম বলিয়া পরিচিত। নর্থ ব্রুকহলে এই চুনকামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেত্র ও বংশ নির্মিত দ্রব্যাদি :

ঢাকা জেলার নানা স্থানে বিশেষত নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত স্থান সমূহে বাঁশ ও বেত্র নির্মিত কুলা, ডালা, বীচন, মোড়া, ছেচো, পল, ডুলা, ঝাকা, ধামা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণত বেদিয়াগণই এই সমুদয় জিনিষপত্র নির্মাণে সুদক্ষ।

এতদ্ব্যতীত এই জেলায় নল ও মোতরা নির্মিত চাচ ও শীতল পাটিও বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

মালীটোলা, লক্ষ্মীবাজার ও কুমারটুলির চর্মকারগণ উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকায় বিস্তৃত চর্মের ব্যবসা আছে। প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকার চর্ম এখান হইতে কলিকাতা হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সঙ্গীত কলায়, বিবিধ যন্ত্রের বাদনে, ঢাকা এক সময়ে বঙ্গদেশের আদর্শ স্থানীয় ছিল। কলকণ্ঠ গায়কের সুমধুর কাকলী; সেতার, এস্রাজ ও তানপুরার মূর্চ্ছনা; পাখোয়াজের রোল, কাওলাতের গম্ভীর নিনাদ, তবলার বোল ও টপ্পার মিহি সুর, গম্ভীর নিশীথে প্রায়, প্রতি মহল্লাতেই শ্রুত হইত। সঙ্গীতচর্চায় ঢাকা এখন পশ্চাৎপদ নহে।

বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদিও বহুকাল হইতেই ঢাকায় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সেতার ও এস্রাজ প্রভৃতি নির্মাণ জন্য চুনীলাল ও সুখলাল মিস্ত্রী সুদক্ষ ছিল। বর্তমান সময়ে মুন্নালাল মিস্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে।

১. Vide History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

২. Ibid. ৩. আইন-ই-আকবরি।

৪. Vide G. N. Gupta's report Page.

৫. Vide A survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam by G. N. Gupta. I. C. S. publishing by Govt.

চতুর্দশ অধ্যায়

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সৌন্দর্যের অনুরাগ অল্প বলিয়া অথবা বিদেশীয় শাসনে শিক্ষার সুযোগের অভাবে বঙ্গীয় স্থপতিগণ নির্মাণ কার্যে সবিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই; অন্যের উদ্ভাসিত শিল্পবিদ্যার অনুকরণ মাত্র করিয়া আসিয়াছে"।[১] এটি যে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পচর্চায় ঢাকা জেলার স্থান অনেক উচ্চে। বস্তুত নানাবিধ শিল্পীর একত্র সমাবেশ এক ঢাকা ব্যতীত বঙ্গের অন্যত্র কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ঢাকা শহরের বিবিধ মহল্লার নামকরণও বিভিন্ন শিল্পীগণের অবস্থান অনুযায়ীই হইয়াছিল। তৎকালে এক জাতীয় শিল্পীগণ এক মহল্লাতেই বাস করিতেন। ঢাকার কামারনগর, তাঁতিবাজার, পাণীটোলা বা জামদানি নগর, শাঁখারি বাজার, সূতার নগর, মালীটোলা, গোয়াল নগর, কুমারটুলি, চুড়িহাট্টা, সূত্রাপুর, জড়িয়াটুলি, কাঁসারি বাজার প্রভৃতি মহল্লার নাম শিল্পীগণের বিভিন্ন কার্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মোসলমান শাসন সময়ে ঢাকার বিবিধ শিল্প উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিলেও ইহা স্বীকার্য যে প্রাচীন হিন্দুদিগের সময়েও এই জেলায় বিভিন্ন শিল্পাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ জপসা গ্রাম পূর্বে ঢাকা জেলারই অন্তর্গত ছিল। এখন উহা ফরিদপুর জেলার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। এই জপসা গ্রামের অন্তর্গত একটি পাড়ার নাম ছিল রাজকান্দি। তথায় শূদ্রজাতীয় এক শ্রেণির বহু লোক বাস করিত; উহারা রাজমিস্ত্রির কার্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। নবাবগঞ্জ থানায় যন্ত্রাইল নামে একটি গ্রাম আছে। পালরাজগণের সময়ে এই স্থানে যন্ত্রশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধামরাইর হিন্দু শিল্পীগণ বস্ত্রবয়ন কার্যে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছিল, মৃৎ-শিল্পেও তাহা হইতে তাহারা কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। শিল্প নৈপুণ্যে ধামরাইর অধিবাসীগণ সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আধুনিক যুগে কাঁচাদিয়া নিবাসী ৺গৌরীকান্ত সেন ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শুধু ঢাকা জেলাবাসীর কেন সমগ্র বাঙ্গালি জাতিরই গৌরবের বিষয়। শাহাবাজ নগরের ৺কাশী মুখোপাধ্যায়, ও ৺মদন গণক, তারপাশার (ইদানীং কনকসার) চন্দ্রমণি পাল, নাগের হাটের তিলক পাল, ঢাকার চুনীলাল, আনন্দহরি ও গোপী কর্মকার প্রভৃতির শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি এই জেলার বহুলোকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। বস্তুত শিল্পচাতুর্যে ঢাকা জেলা যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অনিন্দ্য সুন্দর ধাতব ও প্রস্তর মূর্তিগুলি প্রাচীনকালের উন্নত ভাস্কর্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। এই মূর্তিগুলির নির্মাণ কৌশল দক্ষিণাপথের শিল্পীগণের অনুরূপ বলিয়া, উহা যে বঙ্গীয় শিল্পীগণের সুনিপুণ হস্তপ্রসূত, তাহা স্বীকার করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হন। কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই যে, বাঙ্গালি চিরকালই অনুকরণে সিদ্ধহস্ত। বঙ্গের প্রাচীন ভাস্করগণ যে অন্যের উদ্ভাবিত অভিনব ও উন্নত শিল্পবিদ্যার অনুকরণ করিয়াও এতদ্দেশে উহার বহুল প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল না, তাহা মনে হয় না। বিশেষত তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে তৎকালে বঙ্গীয়

জনসাধারণ প্রত্যেকেই তাহাদিগের নিত্য আরাধ্য দেবতার মূর্তির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লিতে পল্লিতে এরূপ কত অসংখ্য মূর্তি লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

বিবিধ কারুকার্যখচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড সাভার অঞ্চলের অরণ্য মধ্যে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা যে নবম কি দশম শতাব্দীর ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তালতলা ও মীরকাদিমের খালের উপরে যে দুইটি পুল দৃষ্ট হইয়া থাকে উহা বল্লালী পুল বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত। সেনরাজগণের সময়ে হিন্দু স্থাপত্য যে কতদূর উন্নত ছিল তাহা এই পুল দুইটির নির্মাণ কৌশল সন্দর্শন করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

রোমীয় স্থাপত্য ও গ্রিক হর্ম নির্মাণ প্রণালির তুলনায় মোসলমানের কীর্তি লঘুতর হইলেও নানা স্থানের মকবেরা মসজিদ, কাটরা, লঙ্গরখানা, দুর্গ প্রভৃতি তাৎকলিক স্থপতির অসাধারণ নির্মাণকৌশল প্রদর্শন করিতেছে।

পরিবিবির সমাধি-মন্দির, সাতগুম্বজ মসজিদ, বড়কাটরা, ছোটকাটরা, ইমামবাড়া প্রভৃতি মোগলের উন্নতি স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। মহারাজ রাজবল্লভের কীর্তিনিকেতন রাজনগরের নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তদশ রত্ন, একবিংশ রত্ন প্রভৃতি গগনচুম্বি সৌধাবলি সৌন্দর্যে ও স্থপতি কৌশলে তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। লালা কীর্তিনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বুরুজ, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন কৃষ্ণদেব সেনের নির্মিত যাত্রাবাড়ির দুর্গ, দেওয়ান দর্পনারায়ণের পঞ্চরত্ন প্রভৃতি মনোরম অট্টালিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ডাক্তার ওয়াইজ এশিয়াটিক জার্নেলে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ বর্ণনায় লিখিয়াছেন, একটি পিত্তল নির্মিত কামানই চন্দ্রদ্বীপের ভূঞা রাজগণের স্মারকরূপে বিদ্যমান আছে। ঐ কামানটির গাত্রে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ একটি চিহ্ন এবং নির্মাতা "রূপিয়া খা সাং শ্রীপুর" এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে, উহার দৈর্ঘ্য ৭$\frac{৩}{৪}$ ফুট, বেড় সোয়া ২ ফুট, অগ্রভাগের ব্যাস সাড়ে ৯ ইঞ্চি।[২] ঐ সময়ে শ্রীপুর সমৃদ্ধি গৌরবে বঙ্গদেশ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চাঁদ কেদারের রাজধানী বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুরে তৎসময়ে বহু শিল্পীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের "জাহানকোষা" তোপ ও জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা শের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রধান কর্মকার জনার্দন দ্বারা ১০৪৭ হিঃ জমাদিয়াসসানি মাসে (অক্টোবর ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) নির্মিত হইয়াছিল।[৩] ঐ সময়ে মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ মুসেদী রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করিয়া বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং অগ্নিসংযোগ করিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন।

রেনেল সাহেবের মেমরের পাঠে ঢাকার বর্তমান সুবৃহৎ কামান ব্যতীত আর একটি তোপের বিষয় অবগত হওয়া যায়।[৪] "তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গি" গ্রন্থে এই তোপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে খানখানান মোয়াজুম খাঁর (মীরজুম্লা) সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং বিপন্নমুক্ত হইবার জন্যই ইহা নির্মিত হইয়াছিল। কাটরার দ্বারদেশে এই কামানটি এবং বর্তমান তোপটি স্থাপিত ছিল। পরে বৃহত্তরটি বুড়িগঙ্গাগর্ভস্থিত মোগলানি চরে স্থানান্তরিত করা হয়। নদীর স্রোতোপ্রাবল্যে মোগলানি চর বিধৌত হইলে দুইটি সুবৃহৎ গোলাসহ উহা সলিলশায়ী হইয়া যায়।[৫]

চতুর্দশটি লৌহপিণ্ড পিটাইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছিল। রেণেল সাহেবের গ্রন্থ হইতে ইহার পরিমাপ প্রভৃতি উদ্ধৃত করা হইল।

	ফুট	ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য	২২—১০½	সাড়ে দশ ইঞ্চি
বেড়	৩—৩	
মুখের ব্যাস	২—২½	আড়াই ইঞ্চি
মুখ হইতে চারি ফুট দূরবর্তী		
স্থানের ব্যাস	২—১০	
ছিদ্রের ব্যাস	১—৩⅛	

ওজন ৮০০ মণেরও অধিক এবং ৬ মণ গোলা চালাইতে সক্ষম।

ঢাকার বর্তমান কামানটিও ঐ সময়েই নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৩০—৩১খ্রিষ্টাব্দে (হিঃ ১২৪৬) ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার সাহেব সোয়ারিঘাট হইতে উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চকবাজারের মধ্যস্থলে স্থাপিত করেন। শেষোক্ত তোপটির পরিমাপ প্রভৃতি ঢাকার স্কুল ইন্সপেক্টর ষ্টেপলটন সাহেবের লিখিত নোট হইতে প্রদত্ত হইল।

	ফুট	ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য	১১	০
মুখের ব্যাস	১	সাড়ে সাত ইঞ্চি
বেড়	২	৩
ছিদ্রের ব্যাস	০	৬

উক্ত দুইটি কামান কালেখাঁ ও ঝমঝমা নামে অভিহিত হইত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। মেনুসীর গ্রন্থে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কামানগুলির যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঝমঝমা নামটি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেনুসীর উল্লিখিত "ঝমঝমা"র সহিত ঢাকার তোপটির কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, ঢাকার তোপটিরও এবম্বিধ নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

গত ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানবাগ (মনোহর খানের বাগ) নিবাসী মৌলবী মুজাফরহোসেন তাঁহার বাটিস্থ একটা নিম্নস্থান (গাড়া) ভরাট করিবার জন্য কোনও উচ্চস্থান হইতে মাটি কাটিয়া আনায়, তথায় ৭টি পিত্তল নির্মিত কামান আবিষ্কৃত হয়। তৎপর দিবস, সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় এই বিষয় গভর্নমেন্টের গোচরীভূত করিলে উহা ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে ৪টি কামান হুমায়ুনবিজয়ী শেরশাহ কর্তৃক ও ২টি ঈশাখাঁ মসনদআলি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপরটি কোন্ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ, ই, ষ্টেপলটন সাহেবের প্রতি উহার সময় নিরূপণ প্রভৃতির ভার অর্পিত হয়। তিনি ১৯০৯ সনের অক্টোবর মাসের এশিয়াটিক জার্নেলে ঐ কামানগুলির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

উহার মধ্যে ৪টি কামানের অগ্রভাগ ব্যাঘ্রমুখের অনুরূপ করিয়া নির্মিত হইয়াছে এবং একটিতে শেরসাহেব নাম খোদিত আছে।

অপর তিনটির মধ্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ঈশাখাঁর নাম ও হিঃ ১০০২ সন অঙ্কিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট দুইটি ঈশাখাঁর নির্মিত কামানের প্রায় অনুরূপ; সুতরাং ঐ দুইটিও তৎসময়ে নির্মিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই কামানগুলির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। ওজন এক মণ হইতে ২ দুই মণ।

১ নং কামান :

এই কামানটির খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, উহা হিঃ ৯৪৯ সনে (১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে) সৈয়দ আহম্মদ রুমি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্তা খিজিরখাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরবর্তী বৎসরই উহা নির্মিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গের কোন শাসনকর্তা না থাকায় দিল্লিশ্বর শেরশাহের নামই উহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে।

উহার পশ্চাদ্ভাগে, চুঙ্গির শেষাংশে, নিম্ন অঙ্কিত চিহ্নটি পরিলক্ষিত হয়। কামানটির নিম্নাংশে তিনটি খোদিত লিপি আছে; অগ্রভাগের নিম্নদেশে, খোদিত লিপিটিতে পারসি সিকস্ত অক্ষরে "রিফাৎগাজি" এই নামটি লিখিত আছে। ইহা হইতে মিঃ ষ্টেপলটন অনুমান করেন যে রিফাৎগাজি এই কামানটির পরিচালক (গোলন্দাজ) অথবা পরবর্তী স্বত্বাধিকারী কোনও এক ব্যক্তি হইবেন।

অপর দিকের কটিদেশের নিম্নে বঙ্গাক্ষরে "তরপ রাজা" নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা কামানটির নাম হওয়া অসম্ভব নহে। এই অক্ষর কয়টির পরে নিচের দিকে "২।৬" সংখ্যা লিখিত আছে।

আবার অপর দিকে "৩।৪" সংখ্যাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দুইটি সংখ্যা উহার ওজন পরিজ্ঞাপক বলিয়া ষ্টেপলটন সাহেব অনুমান করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত ওজন ১ মণ ২৭ সের মাত্র। উক্ত সংখ্যা দুইটি ওজন পরিজ্ঞাপক হইলে দুই স্থানে দুই প্রকার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি, এবং বর্তমান ওজনের সহিত উহার বৈষম্য কেন হয়, তাহার সদুত্তর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। টমাস সাহেব বলেন শেরশাহের সময়ে ৫১৮ পাউন্ডে এক মণ নির্দিষ্ট ছিল; অর্থাৎ শেরশাহের সময়ের মণ আকবরের সময়ের মণের $^{২৮}/_{৩০}$ অংশ। ইহা হইতে ওজন বৈষম্যের কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য।

কামানের নম্বর	খোদিত সংখ্যা	বর্তমান ওজন	গণনায় মীমাংসিত সংখ্যা
১নং	(৩.১৪)	...	...
২নং	(২.১৬)	১.২৭	১.২২
৩নং	(২.১৬)	১.৩৬$\frac{১}{২}$	১.২২
৪নং	(২.২৮$\frac{১}{২}$)	১.২০$\frac{৩}{৪}$	১.৩০

১নং কামানটির দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি; ছিদ্রের ব্যাস ১$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত স্থানের নিম্নাংশের বেড় ৯$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

২ নং ও ৩ নং কামান :

এই দুইটির অগ্রভাগও ব্যাঘ্রমুখের অনুরূপ; কিন্তু ব্যাঘ্রের মস্তকটি বিভিন্ন প্রকারের। ২ নম্বরেরটির ওজন ১ মণ সোয়া ত্রিশ সের; ছিদ্রের ব্যাস ১৩/৪ ইঞ্চি। ইহাতে খোদিত লিপি নাই; কিন্তু নিম্নের অঙ্কিত চিহ্নটি বিদ্যমান আছে।

৩ নম্বরেরটির ওজন ১ একমণ সাড়ে ছত্রিশ সের। ছিদ্রের ব্যাস ২ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। পারসি সিকস্ত অক্ষরে শাসনকর্তা সরকার মাবুদখাঁন এর নাম অঙ্কিত আছে। এই ব্যক্তির নাম কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইহার গাত্রে বঙ্গাক্ষরে ১০ ও ২।৬ সংখ্যাদ্বয় অঙ্কিত আছে। প্রথমোক্ত সংখ্যাটি কামানের নম্বর জ্ঞাপক এবং শেষোক্তটি ওজন বিষয়ক বলিয়া মনে হয়।

৪ নং :

ইহার অগ্রভাগও ব্যাঘ্রমুখাকৃতি। কিন্তু পূর্বোক্ত তিনটি হইতে এইটি একটু স্বতন্ত্র রকমের।

পূর্বোক্ত তিনটির ন্যায় ইহার দুই দিকে কড়া নাই। কটিদেশের চুঙ্গীটিও স্থূলতর। দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, ছিদ্রের ব্যাস ১$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। বঙ্গাক্ষরে 'নি' ৩৯১ ২।। ৮।। অঙ্কিত আছে। 'নি' এই অক্ষটির অর্থ বুঝা যায় না। ৩৯১ সংখ্যাদ্বারা কামানের নম্বর সূচিত হইতেছে এইরূপ অনুমান করা যায়। ২।।৮।। ওজন পরিজ্ঞাপক। কিন্তু প্রকৃত ওজন ১ এক মন পৌণে একুশ সের।

৫ নং :

এই কামানটিতে বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিত আছে।

সরকার শ্রীযুত ইছা খাঁ? (বমসনদী ফি) সন হীজাব ১০০২ : ছিদ্রের ব্যাস ১$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি; দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। ওজন এক মণ আড়াই সের। খোদিত হিজরি সন হইতে অনুমিত হয়, রাজপুত কুলধুরন্ধর রাজা মানসিংহ দিল্লিশ্বর আকবরের নিয়োগ অনুসারে ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে যে সময়ে এতদঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন সেই বৎসরই এই কামানটি প্রস্তুত হইয়াছিল।

৬ নং :

৫ নম্বরের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু দৃঢ়তর। দৈর্ঘ্যও সমান। ছিদ্রের ব্যাস পৌনে দুই ইঞ্চি; ওজন ১ মণ ৭ সের। বঙ্গাক্ষরে ৪ + ১২৬ ও ১।।৩ লিখিত আছে। পারসি অক্ষরে লিখিত কথা কয়টির অর্থ বোধগম্য হয় না। নিম্নদেশে ইংরাজি অক্ষরের ন্যায় 319—। এই সংখ্যা সন্নিবিষ্ট আছে।

৭ নং :

ইহাতে কোনও খোদিত লিপি অথবা কারুকার্য নাই। দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। ছিদ্রের ব্যাস পৌণে দুই ইঞ্চি; ওজন ১ মণ ৩০ সের।

১. বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
২. Dr. Wise on Barbhuyas.
৩. বাঙ্গালার ইতিহাস শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
৪. Rennel's memoris
৫. Tarikhi Nassaratjangi.

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাণিজ্য[১] বন্দর ও ওজন
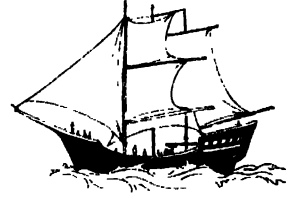
ঢাকা জেলা নদীমাতৃক দেশ বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মেঘনাদের সুনীল সলিলরাশি ভেদ করিয়া অসংখ্য বাণিজ্যতরণী সর্বদা নানাস্থানে যাতায়াত করিতেছে। নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্যসম্ভার পরিপূর্ণ পোতসমূহ পদ্মানদীর দক্ষিণাদিকস্থ শাখানদী বাহিয়া ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মাতে পতিত হয়, এবং তথা হইতে বলাসিয়া ও মেঘনাদ অতিক্রম করিয়া, অথবা ধলেশ্বরীর শাখানদী দিয়া ঢাকায় এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দরে উপনীত হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে চিনি বোঝাই করা নৌকা গঙ্গানদী দিয়া গোয়ালন্দ পর্যন্ত আগমন করে, এবং তথা হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হয়। এই সমুদয় চিনি মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে সর্বপ্রথমে আমদানি হইয়া থাকে। আসাম, কুচবিহার, রঙ্গপুর এবং পাবনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যমুনা বাহিয়া বাণিজ্য তরণীসমূহ এতদঞ্চলে সর্বদা যাতায়াত করিতেছে।

মধুপুর জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। মধুপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হইতে বিস্তরপণ্যবাহী তরণী বংশী ও তুরাগ নদী অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হয়; অথবা বানচেরা, টঙ্গী ও বালু নদী বাহিয়া লাক্ষ্যা নদীতে উপনীত হয়; তথা হইতে জেলার সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভাওয়াল অঞ্চল হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি বেলাই বিল অতিক্রম করিয়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আসাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ হইতে পাটি; যশোহর, তারপুর এবং গাজিপুর হইতে চিনি; শ্রীহট্ট হইতে চুন, কমলালেবু, কমলামধু, আসাম ও রঙ্গপুর হইতে কাঠ; রঙ্গপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও আরাকান হইতে কার্পাস; ত্রিপুরা হইতে সুপারি ও মরিচ; বাখরগঞ্জ হইতে চাউল, নারিকেল, সুপারি, ময়মনসিংহ হইতে চামড়া, আবির ও পনির; ব্রহ্মদেশ হইতে সেগুনকাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, গোলমরিচ, মোম, কেরোসিন তৈল; রেঙ্গুন হইতে আতপ তণ্ডুল; আসাম হইতে এণ্ডি, তসর, মুগারথান; পাটনা হইতে কলাই; কলিকাতা হইতে নানাবিধ মনোহরি জিনিষপত্র, সূতা, মদ, কেরোসিন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, চাউল, চিনি, ছাতা, জুতা, কাপড় ইত্যাদি। লক্ষাদ্বীপ ও মালাবার হইতে শঙ্খ প্রভৃতি এই জেলার প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানি হইয়া থাকে।

পাট, চামড়া, বাংলা সাবান, শাঁখা, রৌপ্যালঙ্কার, পনির, বাসনপত্র, কসিদা ও অন্যান্য ঢাকাই বস্ত্রাদি এই জেলা হইতে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মীরকাদিমের তৈল উৎকৃষ্ট। মীরকাদিমের পান পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নদী অথবা বড় খালের পারেই এই জেলার প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি অবস্থিত। কোনও কোনও স্থানে সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসে, এবং কোনও কোনও স্থানে দৈনিক বাজার হয়।

মেঘনাদতীরে ভৈরববাজার, রায়পুরা, বৈদ্যেরবাজার; ধলেশ্বরী তীরে অথবা তন্নিকটবর্তী স্থানে ঘিয়র, কেদারপুর, সাতুরিয়া, মাণিকগঞ্জ, বায়রা, তালতলা, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাববাজার, বারুণীঘাট, মুন্সিগঞ্জ, বুড়িগঙ্গাতীরে ঢাকা ও ফতুল্লা; লাক্ষ্যা তীরে বর্মি, লাখপুর, কালীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, সোনাকান্দা, যমুনা তীরে জাফরগঞ্জ, তেওতা এবং পদ্মাতীরে আরিচা, ভাগ্যকুল ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। লৌহজঙ্গের অনতিদুরে তরতিয়ারবাজার অবস্থিত; এতদ্ব্যতীত বংশীনদী তীরে কালিয়াকৈর, ধামরাই এবং সাভার, তুরাগতীরে মীরপুর, বানচেরাতীরে কাওরাইদ, এবং আইরলখাঁ ও মেঘনাদের শাখানদীর সঙ্গমস্থলে নরসিংহদি বন্দর অবস্থিত।

মীরপুর—তুরাগ নদীর তটে; চাউল, ধান্য, গুড়, লবণ, তৈল, চিড়া, বস্ত্র, কেরোসিন, তামাক, রাবগুড়, কাঠ প্রভৃতির বাণিজ্যস্থান। ঢাকা হইতে ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

নারিসা—পদ্মা (ইলিসামারী) তটে; ধান্য, বস্ত্র, সুপারি, তামাক, তৈল, গুড় প্রভৃতি।

ধামরাই—বংশীনদীর শাখা কাকলাজানী নদীর তীরে ; ধান্য, চিনি, গুড়, বস্ত্র, পিতলের বাসন, শাঁখা, দেশী কাপড়, মনোহারি জিনিস, সুপারি, হলুদ, তামাক, পান, বানিয়াতি জিনিস ও মসলা। ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

মদনগঞ্জ—লাক্ষ্যাতটে; ধান্য, পাট, তিসি, মরিচ, চিনি, সুপারি, সরিষা, চাউল, নারিকেল, হরিদ্রা। নারায়ণগঞ্জের অপর পারে লাক্ষ্যা এবং ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জের বণিকগণ দ্বারাই এই বন্দরটি প্রথমে সংস্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জের ন্যায় এখানেও লবণ এবং পাটের বিস্তৃত কারবার আছে।

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, লৌহজঙ্গ ও পদ্মাতীরবর্তী বন্দরগুলি এই জেলা মধ্যে প্রধান আমদানি ও রপ্তানির স্থান। নারায়ণগঞ্জের ন্যায় কারবারের স্থান পূর্ববঙ্গে আর নাই। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৬ সনের ১২ই মে তারিখের গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে নারায়ণগঞ্জ পোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

নরসিংদি—আইরলখাঁ ও মেঘনাদের এক শাখানদীর সঙ্গমস্থলে ঢাকা হইতে প্রায় ২৪ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। লবণ, ডাল, সরিষা, চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির বাণিজ্যস্থান।

লাখপুর—লাক্ষ্যাতীরে; ডাল, পাট, পিতলের বাসন, কেরোসিন প্রভৃতি।

মাণিকগঞ্জ বা ললিতগঞ্জ—ধলেশ্বরীতটে ; সূত্র, বস্ত্রাদি ও শাঁখা।

জাগির—ধলেশ্বরীতটে, মাণিকগঞ্জের সন্নিকটে ; চিনি, লবণ, তৈল, তামাক, মরিচ, গুড়, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি।

সাতুরিয়া—গাজিখালি ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। লবণ, পাট, কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি।

বায়রা—ধলেশ্বরী তটে; পাট।

তেওতা—যমুনাতীরে; লবণ, সূত্র ও বস্ত্রাদি।

জাফরগঞ্জ—যমুনাতীরে; পাট ও লবণ।

কাঞ্চনপুর—পদ্মার সন্নিকটে; পাট ও তুলা।

ঘিয়র—ধলেশ্বরীতীরে; পাট ও বস্ত্র।

আরিচা—পদ্মাতীরে; সূতা ও বস্ত্র।

গড়পাড়া—ধলেশ্বরীর সন্নিকটে; পাট।

মীরকাদিম—ধলেশ্বরীর তটে, স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের পারে অবস্থিত। গুড়, লবণ, তামাক, হরিদ্রা, কেরোসিন, সুপারি, ধান্য, চাউল, পান, বস্ত্র, পিতলের বাসন, টিন, সরিষার তৈল, হোগলা, শীতলপাটি, আদা, কলা, খৈল, খল্পা, কাইতা প্রভৃতি।

লৌহজঙ্গ—পদ্মাতীরে; লবণ, গুড়, তামাক, ডাল, চিনি, কেরোসিন, চাউল, বস্ত্র, পিতলের বাসন, পাট, টিন, সরিষার-তৈল, তিল-তৈল, নারিকেল-তৈল, কাঠ প্রভৃতি।

মুন্সির হাট—চিনি, লবণ, তামাক, ধান্য, চাউল, বস্ত্র, সরিষার-তৈল, বাতাসা প্রভৃতি।

তালতলা—ধলেশ্বরী নদী ও স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের তীরে, চিনি, লবণ, তামাক, চাউল, বস্ত্র ও সরিষার-তৈল।

শেখর নগর—তৈল, লবণ, তামাক, চিনি, ডাল, ধান্য, বস্ত্র, হরিদ্রা, সুপারি, কলা, পান, তুলা, রাবগুড় ও চিড়া।

বারুইখালি—তৈল, লবণ, তামাক, কেরোসিন, চিনি, বস্ত্র, হরিদ্রা, মরিচ, কলা, গুড়, রাবগুড়, চাউল, চিড়া ও পান।

ধানকুনিয়া—খালের ধারে; তামাক, চিনি, কেরোসিন, রাবগুড়, লবণ, তৈল, পাট, গুড়, চাউল, ধান্য, নারিকেল-তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি।

বান্দুরা—ইলিসামারী, তুলসীখালি ও ইছামতী এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। চিনি, তৈল, তামাক, গুড়, কেরোসিন, হরিদ্রা, চিটা, চিড়া, পান, মরিচ, বস্ত্র, চাউল, কলা, লবণ, ধান্য। এখানে প্রচুর ধান্য আমদানি হয়। প্রতিদিন ২০-২৫ খানা ধান্য বোঝাই করা বড় নৌকা এখান হইতে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে।

কোলাকোপা—ইছামতীতটে; তৈল, চিনি, তামাক, গুড়, হরিদ্রা, কেরোসিন, চিটা, চিঁড়া, সুপারি, মরিচ, চাউল, বেনেতি জিনিসপত্র, চুন, পেঁয়াজ, আদা, কলাই, খেসারি, মুগ, ছোলা ইক্ষু, জোলার কাপড়, পাট, গাব, লৌহ, চুড়ি, কাগজ, ছালা, পুস্তক, খাতা, চাটাই, বেত, পাটি, মনোহারী জিনিস, ধান্য, পান, লবণ, কাঠ, বস্ত্র, কুসুমফুল, তুলা, মটর ও গম।

করিমগঞ্জ—লবণ, তৈল, তামাক, রাবগুড়, গুড়, চিনি, মরিচ, কেরোসিন, বস্ত্র, জোলার কাপড়, লৌহ, ধান্য, চাউল, পান, সুপারি, কলা, লটাঘাস ও চাটাই।

পালোনগঞ্জ—ইলিসামারী তীরে; লবণ, তৈল, তামাক, গুড়, চিনি, মরিচ, কেরোসিন, বস্ত্র, জোলার কাপড়, ধান্য, পান, সুপারি, কলা ও রাবগুড়।

কালিয়াকৈর—বংশীতটে ; লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, ডাল, লৌহ, কেরোসিন, গজারিকাঠ, জ্বালানিকাঠ, ছন্, সরিষা, বাঁশ, ধান্য, চাউল, তিল।

কেরানীগঞ্জ—বুড়িগঙ্গাতটে; তৈল, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, রাবগুড়, হরিদ্রা, মরিচ, চিড়া, বস্ত্র ও লৌহ।

পুটিয়া—হাড়িধোয়াতীরে। গরু ও ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

কালীগঞ্জ—লাক্ষ্যাতীরে; বস্ত্র, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, কেরোসিন, পাট, কাঁঠাল ও সরিষা।

টঙ্গী—নদীতটে; কাঠ।

মির্জাপুর—তুরাগতটে; ধান্য, পাট, সরিষা, তিল, গজারি কাঠ।

তেওতা—যমুনাতীরে; বস্ত্র, লবণ, লৌহ, তৈল, তামাক, চাউল, ধান্য, মটর, চিড়া, চিনি, ঘি, ময়দা, সূতা, কাঠ ও কেরোসিন।

নায়ারণগঞ্জ—লাক্ষ্যাতীরে; পাট, তামাক, সুপারি, তুলা, কাঠ, তৈল, কেরোসিন, ঘি, চিনি, লবণ, চাউল, ধান্য, চামড়া, কয়লা, ডাল, ধাতু, সরিষা, পিতল ও টিন।

ভরাকর—খালের ধারে; এই হাটটি ডিঙ্গি নৌকা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে বর্ষাকালে এই স্থানে বহুলোক নৌকা ক্রয় করিবার জন্য আগমন করে।

সুবচনী—স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের ধারে, বিক্রমপুর মধ্যে প্রসিদ্ধ।

মাকোহাটি—স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের ধারে।

আটি—বুড়িগঙ্গার শাখাতীরে; আটির কুঠির হাট গরু, পাঁঠা ও ভেড়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

দিঘীরপাড়—পদ্মার একটি শাখা নদী তীরে; বাঁশ ও কাঠ বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থান।

কনকসার—খালের ধারে এই হাটটিও কাঠ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর—স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের ধারে; প্রতি হাটে প্রায় ৪০০০ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এই হাটে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হয়, এবং প্রায় ৮০-৯০ খানা ধান্য ও চাউল পরিপূর্ণ বড় বড় পলোয়ার নৌকা সর্বদাই এই বন্দরে উপস্থিত থাকে।

হলদিয়ার হাটে দূরদেশ হইতে আনীত মরঙ্গী ও সুন্দরী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়। এখানকার জোলাদিগের প্রস্তুত ছিট ও লুঙ্গি ঢাকা জেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভাওয়ালের অন্তর্গত বর্মির হাটে বহুল পরিমাণে গজারি কাষ্ঠ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সমুদয় গজারি কাষ্ঠ ভাওয়ালের গড় হইতেই প্রতি বৎসর আমদানি হয়।

মহেশ্বরদির অন্তর্গত পুটিয়া ও চালাকচর এবং হরিরামপুর থানার অধীন ঝিটকারহাট, গরু ও ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। দূরদেশান্তর হইতে বহুলোক এই হাটে আসিয়া গরু ও ঘোড়া ক্রয় করে।

এতদ্ভিন্ন আগরা, কোমরগঞ্জ, গোবিন্দপুর, বাগমারা, শিকারপুর, দাউদপুর, মামুদপুর, জয়পাড়া লেছরাগঞ্জ, খাবাশপুর, বুতুনি, তিল্লি, কেদারপুর, দৌলতপুর, শ্রীবাড়ি, মহাদেবপুর, বনিয়াজুরি, মাচান, নয়াবাড়ি, হোসনাবাদ, রঘুনাথপুর, সাভার, কাশিমপুর, মির্জাপুর, কলাতিয়া, নাজিরপুর, বহর, ব্রজযোগিনী, টঙ্গিবাড়ি, সোনারং, কলমা, আউটশাহী, হাসারা, বেজগাঁও, বালিগাঁও, চাচুরতলা, সিদ্ধিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, বেলাব, মাধবদী, বালিয়াপাড়া, চেঙ্গাকান্দী, রামচন্দ্রদী, ধর্মগঞ্জ, উদ্ধবগঞ্জ, বাচপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, সোনাকান্দা, মুন্সিরাইল, শ্রীনগর, ষোলঘর, গালিমপুর, পলাশ, টোকচাঁদপুর, ভাগুরিয়া, ফতুল্লা, জিঞ্জিরা, আবদুল্লাপুর, ভাগ্যকুল, রোয়াইল, ডেমরা, নবাবগঞ্জ, মাইজপাড়া, বারদি, রিকাববাজার, বিদগাঁও, গারুরগাঁও, দিঘীরপাড়, ইমামগঞ্জ, পুবাইল, নেরেজদিঘা, কামারখাড়া প্রভৃতি স্থানে হাট-বাজার আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চিন, তুরস্ক, সাইবেরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া, পারস্য, ইতালি, লেঙ্গুইডক, স্পেন, সুরাট, পেগু প্রভৃতি স্থানের সহিত ঢাকার অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

ঢাকার নারানখাদা ও বাকরখানি রুটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বাকেরখাঁ কেলান, (বড় বাকেরখাঁ) এর নামানুসারে এই রুটির নাম বাকরখানি হইয়াছে। ঢাকা শহরের পনির, মলাই ও অমৃতি; ফতুল্লা ও টাইটকার চিড়া, আবদুল্লাপুরের ক্ষীর, সোনারগাঁয়ের "হরিদাসখানি" দধি ও সরভাজা, রামপালের কলা; বিক্রমপুরের পাতক্ষীর এবং নারিকেলের নির্মিত জিরাচিড়া ও সন্দেশাদি বঙ্গ-প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের দধি ও ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট। রোহিতপুর অঞ্চল হইতে বিস্তর ক্ষীর ঢাকাতে আমদানি হয়। হরিরামপুর থানার অধীন ঝিট্‌কা গ্রামস্থ হাজারিগাজির নামানুসারে তথাকার খেজুরগুড় "হাজারিগুড়" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন হাজারীর পৌত্রগণ এই গুড় প্রস্তুত করে। ইহা অতি সুগন্ধবিশিষ্ট ও সুস্বাদু।

ভাওয়াল অঞ্চলের মধু ও মোম উৎকৃষ্ট।

বর্তমানে ঢাকার কাঁসারি ও কুম্ভকারগণ পাইকারি ব্যবসায় করিয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহারা মাল বোঝাই করিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও ময়মনসিংহ জেলার নানাস্থানে পর্যটন করিয়া কাঁসা ও পিতলের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। "গাওয়ালে" বহির্গত হইয়া মৃন্ময় হাড়িপাতিলের বিনিময়ে ধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে। জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও কেহ কেহ অর্থশালী হইয়াছে।

তিলি, কুণ্ড, শাহা, বসাক ও সুবর্ণ বণিকগণই জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী। ইহাদের তেজারতি বহু দূরদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন। কেহ কেহ রাজা ও রায়বাহাদুর উপাধি পর্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঢাকার গন্ধবণিকগণ মধ্যেও ব্যবসায়ে অনেক বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবিক "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এই কথার তাৎপর্য ইহাদিগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব। অধিকাংশেরই চাকুরির উপর জীবিকা নির্ভর করিতেছে। দুর্ভিক্ষের সয়ে এই তিন শ্রেণি মধ্যে অনেককেই যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এমত আর কোনও শ্রেণিতে নয়, কারণ অভিজাত্যগৌরবহেতু ইহারা প্রাণান্তেও অন্যের নিকট প্রার্থী হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে আশানুরূপ ফললাভে কেহই সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় চাকুরির মোহময় মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রতীচ্য দেশানুযায়ী ব্যবসায় প্রচলন করিতে পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল, নতুবা এই হতভাগ্য দেশের আর কল্যাণ নাই।

ওজন :

ঢাকা জেলার সর্বত্র জিনিসের ওজন সমান নহে। স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। কাঁচি ও পাকি ভেদে ওজন দ্বিবিধ। কাঁচি ওজন ৬০ তোলায় এক সের, ও পাকি ওজন ৮০ তোলায় এক সের হয়। টেইলার সাহেব যে সময়ে তদীয় "টপোগ্রাফি" প্রণয়ন করেন, তৎকালে ৮০ তোলায় সের প্রচলিত ছিল এবং কোনও জিনিস ৭৮ তোলাতেও সের ধরা হইত।

পিতল-কাঁসার জিনিসাদি কাঁচি হিসাব এবং চাউল, তৈল প্রভৃতি পাকি হিসাবে পরিমাণ করা হয়।

পাকি ওজনও সর্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে ৮০ তোলা, কোথায় ৮২ তোলা, কোনও স্থানে ৮২ তোলা দশ আনা কোথাও ৮ তোলা দশ আনা এবং ৯০ তোলায় পাকি ওজন ধরা হয়। মীরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয় সময়ে ৯০ তোলায় সের ধরা হয়।

প্রচলিত ওজনের প্রণালি :

৪	ধানে	১ রতি,	১৬	ছটাকে	এক সের
৪	রতিতে	এক মাসা,	৫	সেরে	এক পসারি,
১২	মাসায়	এক তোলা,	৮	পসারিতে	এক মণ।
৫	তোলায়	এক ছটাক,			

সোনা-রূপা প্রভৃতি ১০ মাসায় এক তোলা ধরা হয়। ঔষধ ও মসলা ১২ মাসায় এক তোলা, মণি রত্ন, প্রবাল প্রভৃতি সাড়ে ১২ মাসায় এক তোলা।

মসলিন ওজন দরে বিক্রীত হইত। উহার নাম ছিল 'খুদি'। উৎকৃষ্ট মকমল ওজনে যত পাতলা হইত, ততই উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

---

১. প্রাচীন বাণিজ্যের বিবরণ ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ অধ্যায়

মেলা

এই জেলার বহু স্থানে সাময়িক মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তার্কিক বারুণীর মেলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মেলাটি ধলেশ্বরীর দক্ষিণতীরে কমলাঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে মুন্সিগঞ্জের উত্তর এবং রিকাব-বাজারের পূর্বদিকে জমিয়া থাকে। পূর্বে এই মেলা কার্তিক মাসের পৌর্ণমাসিতে আরম্ভ হইয়া কেবলমাত্র তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হইত। বর্তমান সময়ে অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুনমাস পর্যন্ত থাকে। মেলার সময়ে প্রায় সহস্রাধিক পণ্যবীথিকা এই স্থানে সমাগত হয়। চতুঃপার্শ্ববর্তী নানাস্থান হইতে বিপুল জনসংঘ ক্রয়-বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইয়া এই স্থানটিকে আনন্দমুখরিত করিয়া তোলে। প্রতি বৎসরই আমোদ প্রমোদান্বেষি দর্শক ও ব্যবসায়ীগণের প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র তরুণী এখানে সমাগত হইয়া থাকে। এই মেলায় ন্যূনধিক এক কোটি টাকার মাল বিক্রীত হয়। অনেক ব্যবসায়ী দূরদেশান্তর হইতে সমাগত হইয়া সম্বৎসরের মাল এখান হইতে খরিদ করিয়া নেয়। এতৎপ্রদেশে এরূপ বিরাট মেলা আর নাই। অমৃতসর, দিল্লি প্রভৃতি নানা দূরবর্তী স্থান হইতেও বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আগমন করে। মগ জাতিরা কাচ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে এই মেলায় আনয়ন করে। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেক পাইকার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিয়া থাকে।

কাবুলী মেওয়া, শাল, বনাত প্রভৃতি নানাবিধ শীতবস্ত্র; শ্রীহট্টও কাছার প্রদেশ হইতে কমলালেবু ; ব্রহ্মদেশ ও আসামজাত নানাবিধ কাষ্ঠ, মোম; কলিকাতা হইতে বিবিধ মনোহারি জিনিস, ছাতা, জুতা, কাপড় প্রভৃতি; রংপুর ও পূর্ণিয়ার তামাক; এবং ঢাকা জেলার নানা স্থান হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পসম্ভারের একত্র সমাবেশ এখানে পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে রেশমী বস্ত্র, লৌহ, চর্ম, কার্পাস, চিনি, নীল মৃগনাভি প্রভৃতি দ্রব্যাদি নানাস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঐ মেলায় বিক্রয়ার্থ সমাগত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। জুয়াখেলা, রং তামাশা এবং অন্যান্য প্রকারের আমোদ-প্রমোদেরও ত্রুটি হয় না। মেলার নিত্য সহচর চোর, জুয়াচোর, গাইটকাটারও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাদিগের দমনোদ্দেশ্যে গভর্নমেন্টের সান্ত্রী, প্রহরী নিয়োজিত থাকিলেও উহাদিগের কবল হইতে সরল বিশ্বাসী দর্শকবৃন্দকে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতে দৃষ্ট হয়।

প্রথমত বারুণীস্নান উপলক্ষেই এই মেলাটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও মেলার সময়ে পূর্ণিমাতিথিতে হিন্দুগণ এখানে তীর্থস্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে।

"হিস্টরি অব কটন মেনুফেক্চার" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক এই' স্থানটিকে ঐতিহাসিক Gange Regia নামক স্থানের সহিত অভিন্ন মনে করেন। এই Gange Regia সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। মেজর রেনেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, D'Anville রাজমহলকে, বিলফোর্ড হুগলী নগরীকে, হীরেন (Heren) দুলিয়াপুর নামক স্থানকে Gange Regia আখ্যা প্রদান করিতে সমুৎসুক।

কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলেন "হিন্দু রাজত্ব সময় হইতে এই বারুণী মেলার অনুষ্ঠান

চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল লক্ষ্মীবাজার (লক্ষবাজার)। কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষমুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপের আদেশ ছিল।" দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা বিষয়ে হিন্দুরাজগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল; তাঁহারা কোনও দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়াও দিতে পারিতেন। ক্রয়-বিক্রয়াদি রাজানুজ্ঞা অনুসারেই সম্পন্ন হইত। লভ্যাংশের শতকরা ৫ টাকা রাজার প্রাপ্য ছিল।[২]

অশোকাষ্টমীর মেলা : প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিন নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের পূতসলিলে অবগাহন করিবার জন্য লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে নানা দূরদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু নর-নারী সমাগত হয়। এই উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রতীরে মেলা জমিয়া থাকে। ২-৩ দিবসব্যাপী এই মেলাটি স্থায়ী হয়। এই মেলাটি চৈত্রবারুণী নামে সাধারণ্যে সুপরিচিত।

ধামরাইর রথমেলা : রথদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে ধামরাই গ্রামে একটি মেলার সূচনা হইয়া প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। ধামরাই বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত; এই সময়ে বহু টাকার সূক্ষ্মবস্ত্রাদি এখানে বিক্রীত হয়।

উত্থান একাদশী এবং মাঘী-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যেও এখানে মেলা বসিয়া থাকে।

কলাতিয়ার মেলা : কলাতিয়া গ্রামের ধীবরগণ সম্রাট পঞ্চম জর্জের মেলা নামে একটি নতুন মৎস্যমেলা স্থাপন করিয়াছে। প্রতি বৎসর ১২ই ডিসেম্বর এই মেলার অধিবেশন হয়। প্রচুর পরিমাণে মৎস্যের আমদানি করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করাই এই মেলার উদ্দেশ্য। কোন এক বৎসর ১২ই মাঘ মেলা বসিয়াছিল।

মাণিকগঞ্জের মেলা : দোলপূর্ণিমা ও শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এখানে মেলা জমিয়া থাকে। দোলমেলা প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। মেলা উপলক্ষ্যে নানাবিধ আমোদ প্রমোদেরই রীতিমত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কলাকোপার মেলা : কলাকোপা রাজারামপুর নামক স্থানে একমাসব্যাপী একটি মেলার অধিবেশন হয়। প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় আরম্ভ হইয়া দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত এই মেলাটি স্থায়ী হইয়া থাকে। কলাকোপার হরেকৃষ্ণ পোদ্দার এই মেলার সংস্থাপক। খেজুরের চিনী ও খেজুরের গুড় প্রচুর পরিমাণে এই মেলায় বিক্রীত হয়।

বুতুনীর মেলা : প্রতি বৎসর বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলা জমিয়া থাকে। পূর্বে নানা দূরদেশান্তর হইতে অনেকানেক লোক এই মেলায় সমাগত হইত। কিন্তু এক্ষণে মেলাটির আর পূর্বের ন্যায় সম্পদ নাই। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের ঔদাস্যে ইহা শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীনগরের রথমেলা : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এখানে অষ্টাহব্যাপী একটি বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। এই মেলায় শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ কুম্ভকারগণের প্রস্তুত নানাবিধ সুদৃশ্য মূর্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে এই সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। দূরদেশান্তর হইতে আগত দোকানদারগণ বিবিধ পণ্যসম্ভার দ্বারা তাহাদের ক্ষুদ্র পণ্যবিথীকা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সময়ে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদেরও ত্রুটি হয় না।

লৌহজঙ্গের ঝুলন মেলা : শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে লৌহজঙ্গ গ্রামে একটি বৃহৎ মেলা জমিয়া থাকে। এতদুপলক্ষ্যে লৌহজঙ্গের প্রসিদ্ধ ধনী পালচৌধুরিগণ যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদেরও সুব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

উয়ারির মেলা : প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই গ্রামে মাঘমাসে একটি মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। মেলা উপলক্ষে এই স্থানে নানা দূরদেশান্তর হইতে বহু সাধু, ফকির, বৈরাগী ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সমাগম হয়। মেলার কয়দিন সাধু-সন্ন্যাসীগণ খোল-করতাল সংযোগে নামকীর্তন ও নানাবিধ উৎসবাদি করিয়া থাকেন। দিবা-রাত্রি সমভাবেই কীর্তন চলিয়া থাকে। এই মেলার একটি বিশেষত্ব এই যে, পূর্বে কাহাকেও মেলার

বিষয়ে সংবাদ না দিলেও সাধু-সন্ন্যাসীগণ নির্দিষ্ট দিবসে এই স্থানে সমবেত হইতে আরম্ভ করে।

রাড়িখালের মেলা : এই গ্রামেও প্রতিবৎসর মাঘমাসে ফকিরদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা দুইদিন মাত্র স্থায়ী হয়। নানা স্থান হইতে সশিষ্য বহু ফকির এই সময়ে এই মেলায় আসিয়া যোগদান করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত চৈত্র সংক্রান্তি এবং ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা জেলার প্রায় সমুদয় বন্দরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। উহা "গলইয়া" নামে সুপরিচিত। এই সমুদয় গ্রাম্য মেলায় হাঁড়ি, পাতিল প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্র, নানাবিধ মসল্লা বালক চিত্তবিনোদনকারী নানাবিধ খেলনা ও মনোহারি জিনিস, বিন্নি, জিলিপি, ফাঁপা বাতাসা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল।

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি তারিখে নবাব বাহাদুরের বিস্তীর্ণ শাহবাগ উদ্যানে শিল্প প্রদর্শনী হইত। এই প্রদর্শনীর সমুদয় ব্যয়ভার স্বর্গীয় নবাব আসানউল্লা বাহাদুর বহন করিতেন।

১. ডাঃ টেইটলারকেই অনেকে গ্রন্থকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

২. Heren's Asiatic Nations Vol III Page 349

সপ্তদশ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুর, বিশেষত বর্ষার প্রকোপ অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শীত :

শীতের প্রকোপ জেলার দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশেই অধিকতররূপে অনুভূত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের এবম্বিধ তারতম্য অক্ষাংশের পার্থক্যহেতুই যে সংঘটিত হয়, তাহা নহে। জেলার দক্ষিণভাগ নদীসঙ্কুল; পক্ষান্তরে উত্তরভাগ বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। জেলার উত্তরাংশের শীতাতিশয্যের ইহাই নাকি প্রধান কারণ। শীতকালে তাপমান যন্ত্রদ্বারা ৮৭.৮° ডিগ্রির অধিক এবং ৫০.৪° ডিগ্রির ন্যূনতাপ এই জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। শীতকালে এই জেলায় কোনও কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আশ্বিন, কার্তিক ও চৈত্রমাসে কলেরা আরম্ভ হইয়া থাকে। মাঘ মাসে বৃষ্টিপাত হইলে রবিশস্য ভাল জন্মে।

শীতকালে পশ্চিম, উত্তর এবং পশ্চিমোত্তর কোণ হইতে বাতাস বহিতে থাকে। শীতের প্রারম্ভে প্রথমত পশ্চিমদিক হইতে বাতাস বহে। শীতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতির পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরদিক হইতে বহিতে থাকে। শীতের প্রাচুর্যবশত তুষারপতন দ্বারা শস্যহানির বিষয় অবগত হওয়া যায় না।

অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত শীত স্থায়ী হয়। ১৩১১ সনের ২১শে মাঘ শুক্রবার হইতে এই জেলাতে প্রবল শীত এবং তদানুষঙ্গিক তুষারপতন হইয়াছিল।

গ্রীষ্ম :

বঙ্গের অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা এই জেলায় গ্রীষ্মাতিশয্য কম। এই জেলার উত্তরাংশস্থিত নিবিড় বনরাজি এবং দক্ষিণভাগস্থিত নদ-নদীকূল ও ঝিলসমূহের অবস্থানই নাকি ইহার অন্যতম কারণ। বৈশাখের অন্তে এবং জৈষ্ঠ্যের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মের প্রকোপ কিছু বেশি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমানযন্ত্র দ্বারা ৯৯.৩° ডিগ্রির অধিক এবং ৬৫° ডিগ্রির ন্যূনতম এই জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। গ্রীষ্মের শেষভাগে মধ্যে মধ্যে বারিপাতনিবন্ধন তাপ হ্রাস পাইতে থাকে।

সাধারণত বৈশাখ অন্তেই ষান্মাসিক বায়ুপ্রবাহ আরম্ভ হইতে থাকে। এইসময়ে প্রায় প্রত্যহই সায়ংকালে আকাশমণ্ডল ঘনসমাবৃত হইয়া ঝড় উঠিয়া থাকে। ফলে কোথাও বৃহৎ মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে; কোথাও বা গৃহসমূহ চূর্ন-বিচূর্ন হইয়া যায়। প্রকৃতির এই তাণ্ডবনৃত্যকালে নদ-নদীর জলস্রোতেও ভীষণ তরঙ্গায়িত হইয়া আরোহীসহ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণীসমূহ স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ফেলে।

ষান্মাসিক বায়ুপ্রবাহ প্রথমে দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে উহার গতি পরিবর্তিত হইয়া পূর্বদিকে এবং অবশেষে উত্তর-পূর্বদিকে সরিয়া যায়।

সাধারণত চৈত্রমাসেই শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। শিলাবৃষ্টিতে বোরধান্য, তিল, ক্ষিরাই, পাট এবং আম্রের ক্ষতি সংসাধিত হয়।

চৈত্রমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্তই গ্রীষ্মের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়।

বর্ষা :

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঢাকা জেলা নদীবহুল দেশ। অসংখ্য নদ-নদী ইহার বক্ষদেশে উপবীতবৎ শোভা পাইতেছে। এই জেলার পূর্বে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে তিনটি প্রধান নদ-নদী প্রবাহিত। বৈশাখ মাস হইতেই নদীজল ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে এবং আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথমেই উহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বর্ষার জলপ্লাবনে একদিকে যেমন লোকের বাড়ি-ঘরে জল উঠিয়া অশান্তির উৎপাদন করে, পক্ষান্তরে আবার সম্বৎসরের আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া ম্যালেরিয়া বীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হয়। ভাওয়াল ও ঢাকা শহরের উত্তরাংশ এবং কাশিমপুর অঞ্চল ব্যতীত জেলার প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া যায়। সেই প্লাবন মধ্যে, গ্রামগুলি যেন প্রবল-পবন-তাড়িত উর্মিসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যে বৃক্ষরাজিপরিশোভিত অসংখ্য দ্বীপমালার শোভা ধারণ করে। আর, গ্রামগুলির অভ্যন্তর দেখিলে মনে হয়, যেন সমুদয় জেলাটিই ভেনিস নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। নৌকার শাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সময়ে কুমুদ, কহলার প্রভৃতি জলজ পুষ্প ঝিলের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, এবং নদীর ধার শুভ্র কাশপুষ্প দ্বারা ভূষিত হইয়া উহা ভাসমান উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হয়।

সাধারণত আশ্বিন মাস হইতেই বর্ষার জল কমিতে আরম্ভ করে; কিন্তু কার্তিক মাসে প্রকৃতি পুনরায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। এই সময়ে পুনঃ পুনঃ শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হইয়া সমুদয় জেলাটিকে আলোড়িত করিয়া তোলে।

কার্তিক মাসেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়।

বর্ষার জল প্লাবনে পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং বর্ষার কষ্ট নিতান্ত বিপজ্জনক হইলেও উহা একাধিক প্রকারে উপকারসাধন করিতে সমর্থ হয়।

এই জেলার দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইলেও বর্ষা অন্তে এই স্থানে জল আবদ্ধ থাকে না; সুতরাং এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একেবারেই নাই। মাণিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে এবং ভাওয়াল অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়।

লাক্ষ্যাতীরবর্তী স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। পদ্মার সলিলরাশি অতিশয় ঘোলা হইলেও উহা পান করিলে কোনও অসুখ হয় না।

এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, উদরাময়, কোরণ্ড, গোদ এবং চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। ঢাকা শহরে গোদ ও কোরণ্ড রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। কূপোদক পানই নাকি এই সমুদয় রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ।

১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে যশোহর অঞ্চল হইতে এই জেলায় কলেরা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। জলের কল স্থাপনের পূর্বে ঢাকা শহরে কলেরার প্রকোপ খুব বেশি ছিল।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলার উত্তরাংশে গোমড়ক আরম্ভ হয়। তাহাতে বহু সংখ্যক গো কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে উহা পুনরায় আরম্ভ হয়।

পূর্বে বসন্ত রোগের প্রকোপও যথেষ্ট উপলব্ধি হইত। এক্ষণে কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিপ্লব

ভূমিকম্প :

কোনও প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষীয় অতীত ভূমিকম্পসমূহের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিকম্প হিসাবে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষকে দ্বাদশটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দ্বাদশ বিভাগ মধ্য অষ্টম বিভাগে নিম্নবঙ্গ অবস্থিত। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে এই দ্বাদশ প্রদেশের মধ্যে অষ্টম প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং পৃথিবীস্থ ভূকম্পোপযোগী যাবতীয় স্থানের অন্যতম একটি।

অনেকের বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয়ই ভূকম্প উৎপত্তির সর্বপ্রধান কারণ, কিন্তু পর্যবেক্ষণদ্বারা এই সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সমুদয় নৈসর্গিক উপায়ে ভূকম্প সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে গঠনসম্বন্ধীয় ও ক্ষয়সম্বন্ধীয় কারণই অত্যন্ত বলবান্।

একটি বৃহৎ ভূমিকম্প হইলে ছোট ছোট অনেক কম্প তৎপশ্চাতে হইয়া থাকে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পরে অনুকম্পের (after shock) বিবরণ সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, মধ্যে মধ্যে আসামও পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমুদয় ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখের জগৎপ্রসিদ্ধ ভূকম্পজাত অনুকম্পের জের মাত্র।

এই ভূমিকম্পে জেলার উত্তরাংশের অনেকানেক খালবিলের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বহুসংখ্যক সুরম্যহর্ম্যরাজি ও প্রাচীন কীর্তিকলাপ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া লোকলোচনের অন্তরাল হইয়াছে। ঐ ভূকম্পের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ্ রেললাইন ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় দুই সপ্তাহকাল রেলের চলাচল বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুত এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কোনটিরই ধ্বংসকার্য ও বিস্তৃতি এই ভূমিকম্প অপেক্ষা অধিক ছিল না।[১]

"১০৭১—১০৭২ সনে ঢাকা হইতে ৭দিন ব্যবধান, এমন একটি স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই কম্প ৩২ দিন সংঘটিত হইয়াছিল, এই ভূমিকম্পের স্থান ও তারিখসমূহের স্থিরনির্দেশ নাই।"

১১৬৮ সনের ১৮ই চৈত্র সোমবার বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে যে একটি ভূকম্প অনুভূত হয়, তাহা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মনিষীগণ এই কম্পের কেন্দ্রস্থল বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশিমধ্যেই স্থির করিয়াছেন। এই ভূকম্পের ফলে ঢাকাতে হঠাৎ এরূপ বেগে জল বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতে বহু সংখ্যক তরণী ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত ও অসংখ্য নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।[১]

১২৫৩ সনের ২রা কার্তিক শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা কার্তিক সোমবার পর্যন্ত ময়মনসিংহে অন্যূন বিংশতিবার ভূকম্প হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ৩রা কার্তিক রবিবার দিবা ২/১৫ মিনিটের সময় একটি অতি ভীষণ কম্প হয়। এই কম্পের ফলে ঢাকাস্থ বহুসংখ্যক অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

১২৫৭ সনের ২৫শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রামে ২০ সেকেন্ড কাল স্থায়ী একটি কম্প হইয়াছিল, এই কম্পও ঢাকাতে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

১২৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রাতে ৪/৩৭ মিনিটের সময় ঢাকাতে ১৫ সেকেন্ডকালস্থায়ী একটি কম্প হইয়াছিল।

১২৭০ সনের ২২শে পৌষ মঙ্গলবার ঢাকাতে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে একটি কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ১১৩৮, ১১৮১, ১২১৮, ১২৭৮, ১২৯৭ সনেও এতদঞ্চলে ভূকম্প হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, এতন্মধ্যে ১১৮১ ও ১২১৮ সনের ভূমিকম্পই একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল।

জলকম্প :

ভূমিকম্প সঙ্গে সঙ্গে অথবা কোন কোন সময়ে স্বতন্ত্র ভাবেও জলকম্প হইয়া থাকে। ১৩৯০ সনের ৬ই ভাদ্র হইতে প্রায় সপ্তাহকাল পর্যন্ত এতদঞ্চলে যে জলকম্প হইয়াছিল, তাহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

জলপ্লাবন :

সাময়িক জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে এই জেলার ভীষণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ১৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে যে ভীষণ বন্যাস্রোতে এই জেলার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ মিঃ টেইলার তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেঘনাদের মোহানার সান্নিধ্যবশতই জলপ্লাবনে এই জেলার বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। এই জলপ্লাবন দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভেই মেঘনাদের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। ফলে, বহু লোকের বাড়ি ঘর এবং শস্যাদি ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই প্লাবনের ফলে ১২০ খানা পরগনা ও তালুক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।[৩] ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ডে সাহেব এই জলপ্লাবন এবং উহার সহচর দুর্ভিক্ষের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জলপ্লাবনে শুধু শস্যাদির অনিষ্ট ঘটিলে তাহার ক্ষতিপূরণ অনতিবিলম্বে করা সাধ্যায়ত্ত ছিল, কিন্তু জনসাধারণের যাবতীয় দ্রব্যাদি ও পশ্বাদি ধ্বংস মুখে পতিত হওয়ায় তাহারা বাড়িঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ফলে সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িল, ভূমিকর্ষণ করিবার লোকের অভাবে প্রায় সমুদয় জমিই পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল।"

১৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ন্যায় বিষয় ডাক্তার টেইলার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবারকার বন্যাস্রোতঃ ভীষণতর মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন "মার্চ মাসের প্রারম্ভেই বারিপতন আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত বরুণদেব মুষলধারে বর্ষণকার্য করিয়া স্বীয় কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেন। ফলে, নদীজল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উচ্ছ্বসিত প্রবাহে তটভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। ঐরূপ ভীষণ জলপ্লাবন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করে নাই। অন্যান্য জলপ্লাবনে ঢাকা শহর ভেনিসের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই বন্যাস্রোত শহরের বক্ষোদেশের উপর দিয়াই চলিয়াছিল। ফলে, শহরের রাস্তার উপর দিয়াই তরণীসমূহ চলাচল করিতে থাকে। অধিবাসীগণ বাড়িঘর সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বংশনির্মিত মঞ্চ প্রস্তুতপূর্বক বাস করিত।"

"এই প্লাবনে দক্ষিণ ঢাকাস্থিত গ্রামসমূহেরই অনিষ্ট অধিকতর রূপে সংসাধিত হইয়াছিল। রাজনগর, কার্তিকপুর ও রসুলপুর এই তিনটি পরগনাতেই ক্ষতির মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। মিঃ ডে ঐ সমুদয় স্থানে তৎকালে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। এই জলপ্লাবনের ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা

দিয়াছিল। প্রায় ৬০০০০ ষষ্ঠি সহস্র নরনারী প্রবল বন্যাস্রোতে এবং দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।[৪]

১৭৬৯-৭০, ১৭৮৪, ১৮৩৩-৩৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দেও ভীষণ বন্যাস্রোতের দ্বারা এতদঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। শেষোক্ত জলপ্লাবন ১২৮৩ সনের ১৬ই কার্তিক সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উহা "তিরাসীসনের বন্যা" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। ২৯শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গোপসাগরের বক্ষোস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ভীষণ ঝটিকাবর্ত আরম্ভ হয়। এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্কিমপথে প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদের মোহনায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবনের ফলে প্রায় একলক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।[৫]

বর্ষার প্লাবনসময়ে কখনও কখনও প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও উচ্ছ্বসিত বারিরাশি এতুদুভয়ের সম্মিলিত শক্তিপ্রভাবে নদীস্রোতের গতি সংহত হইয়া থাকে। ফলে, ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হয়।[৬]

নদীবহুল প্রদেশে জলপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। এই জেলার তিন দিক তিনটি বৃহৎ নদীদ্বারা পরিবেষ্ঠিত। দুইটি অনল্পপরিসর স্রোতস্বতী এবং আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালি এই জেলার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহপরিবর্তন সংসাধিত হওয়ায় দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভূভাগের ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। জেলার নিম্নভাগ প্রতি বৎসর বর্ষার জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া যায়, ফলে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া ঐ সকল স্থান ক্রমশ উচ্চতালাভ করিতেছে। আলমনদী এই প্রকারে জলপ্লাবিত নিম্নভূমির উচ্চতাসাধনে সহায়তা করিতেছে।

তুর্নড ও ঝটিকাবর্ত :

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে শনিবার সন্ধ্যা ৭।। টার সময় ঢাকায় যে ভীষণ তুর্নড হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আজিও অনেকের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহা "ঢাকার তুর্নড" বলিয়া যেরূপ পরিচিত, বিক্রমপুরে তদ্রূপ ইহা "হাসাইলের ঝড়" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই বাত্যা প্রথমে মুন্সিগঞ্জ মহকুমার দিক হইতে ঢাকা শহরের দিকে আসিয়াছিল। প্রথমে ঈশানকোণে লোহিতবর্ণের মেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশ ঐ মেঘখানা সমুদয় আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং মুহূর্তমধ্যে উষ্ণ ঝটিকাবর্ত আরম্ভ হইয়া প্রলয়ের ধ্বংসের ন্যায় অট্টালিকা এবং গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। বিক্রমপুরান্তর্গত হাসাইল, ভরাকর, শৈলকোপা, বিদ্দৈল প্রভৃতি কতিপয় গ্রামেও এই ভীষণ ঝটিকাবর্তের প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঢাকা শহরের ৩৫২৭ খানা গৃহ এই তুর্নডের ফলে ধরাশায়ী হয়। ঢাকার নয়নমনোরম "আসান-মঞ্জিল" প্রাসাদ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ হুসনীদালাল এবং রম্নার কালীর মঠ প্রভৃতি ১৪৮ খানা ইষ্টকালয় ভগ্ন হইয়া যায়। বস্তুত এই তুর্নডে ঢাকার প্রায় সমুদয় অট্টালিকারই অল্পাধিক পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৩ জন লোক হত এবং ১৫০০ লোক আহত হইয়াছিল। প্রায় ১২১খানা নৌকা ও পুলিস ষ্টিমার জলমগ্ন হইয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলেও প্রায় ৭০ জন লোক এই ঝটিকাবর্তের প্রবল তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শীতের প্রাখর্য অধিক অনুভূত হইয়াছিল না। গিরিমালার শিখরদেশ এবং পার্বত্যস্থানসমূহেও তুষারপতনের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফলে, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নীতির ব্যতিক্রম হইয়া মার্চ মাসের প্রারম্ভেই বায়ুরতাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এপ্রিল ও মে মাসে দারুণ গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। এই গ্রীষ্মাতিশয্য এবং বায়ুর বাষ্পাভাব প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশেই অনুভূত হইয়াছিল।[৭]

এপ্রিল ও মে মাসের দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যহেতু বঙ্গদেশে, বিশেষত গাঙ্গেয় সমতলপ্রদেশে ঘন ঘন উষ্ণ ঝটিকাপ্রবাহ, ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবৃষ্টি, বালুকাবৃষ্টিও তুর্নড আরম্ভ হইল।[৮] ঢাকাতে

প্রথমত এই ঝটিকাবর্ত সাধারণ উত্তর-পশ্চিমদিকস্থ বায়ুপ্রবাহরূপে আরম্ভ হইয়া ভীষণ তুর্নডের আকার ধারণ করিয়াছিল। ৪ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ১০০ হইতে ১৫০ গজ পর্যন্ত প্রশস্ত স্থানসমূহে এই তুর্নডের ধ্বংসকার্য সীমাবদ্ধ ছিল।[৯]

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৩০৯ সন, ১৯ শে বৈশাখ) শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ঢাকায় দ্বিতীয়বার তুর্নড হয়। এইবার পারজোয়ারের দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিয়া ঢাকা শহর অতিক্রমকরত বক্রগতিতে পূর্বাভিমুখে ১৬ মাইল পর্যন্ত ধাবিত হয়। এই ১৬ মাইল পথের কোন কোন স্থানে ২০০ হাত কোথাও বা অর্ধমাইল ব্যাপিয়া বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং বহুসংখ্যক গৃহাদি ভগ্ন এবং বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছিল। ফলে ৩৮ জন আহত হইয়াছিল।

১৩১০ সনের ৫ই কার্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭।। টার সময়ে এতদঞ্চলে বিদ্যুৎপিণ্ড পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

অনাবৃষ্টি :

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় অনাবৃষ্টি হয়। সমুদয় বৎসরে গড়ে ২৯.০২ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপতন হইয়াছিল। ফলে তৎপরবর্তী বৎসরে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাবৃষ্টির ফলে এই জেলার শস্যহানির বিষয় খুব কমই অবগত হওয়া যায়। বর্ষার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত ভূমির শৈত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি হইয়া অতি শীঘ্র নদীজল স্ফীত হইলে শস্যহানির সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

পঙ্গপাল :

১২৭৬ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বেলা ২টার সময়ে এই জেলায় পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দক্ষিণদিক হইতেই সময়ে সময়ে পঙ্গপালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের উৎপাত সমুদয় জেলামধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় না। উৎপাতের মাত্রাও যৎসামান্য মাত্র।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, সুয়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পঙ্গপাল কর্তৃক শস্যহানির বিষয় অবগত হওয়া যায়।[১০]

দুর্ভিক্ষ :

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকায় চাউল এক টাকায় আট মন বিক্রীত হইত। ইহার অব্যবহিত পূর্বে ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাত্ইয়া ইব্রাইয়া" নামক গ্রন্থে এই দুর্ভিক্ষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, যে ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল। নবাব মীরজুম্লার মৃত্যু হইলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিহারের সুবাদার দায়ুদখাঁকে, স্থায়ী সুবাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঢাকার কার্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। দায়ুদখাঁর ঢাকায় আসিতে কিয়ৎকাল বিলম্ব ঘটিলে, সেনাপতি দিলিরখাঁ দায়ুদের স্থানে অস্থায়ীভাবে কার্য করিতে থাকেন। ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর দায়ুদখাঁ ঢাকার সন্নিকটে আগমন করিয়া খিজিরপুরে তদীয় বাসস্থান মনোনীত করেন। এই সময়েই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। দায়ুদখাঁ সম্রাটের অনুমতিগ্রহণের অপেক্ষা না করিয়াই দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য শস্যের জাকত আদায় পরিত্যাগ করেন।[১১]

১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশব্যাপী যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহার কবল হইতে ঢাকা জেলাও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে ঢাকায় ১২ সের করিয়া চাউল বিক্রীত হইয়াছিল; তাহাতেই ও জেলার বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রী-পুত্র ও আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপালনের চেষ্টা করিয়াছিল। মিঃ এ, সি, সেন লিখিয়াছেন, "ঐ দারুণ দুর্ভিক্ষের পূর্বে হঠাৎ ভীষণ প্লাবন উপস্থিত হইয়া জেলার সমুদয় শস্যের হানি জন্মাইয়াছিল। এই জলপ্লাবন দীর্ঘকাল পর্যন্ত

স্থায়ী হয়। এই জলপ্লাবনের পরেই আবার মার্তণ্ড ও পবনদেবের কৃপা কিছু অধিকমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। ফলে এক বিন্দুও বারি পতন হইয়াছিল না।"।

পুষ্করিণী ও কূপ জলশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল; ফলে, গ্রামে গ্রামে বৃক্ষাদির শাখাপ্রশাখা এবং বংশদণ্ডের ঘর্ষণে অগ্ন্যাদগম হইতে লাগিল। দুঃস্থ জনসাধারণ সাফ্‌লা, জলপদ্মের মৃণাল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ফলে বহুলোক কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থিত স্থানসমূহ হইতে যে ঢাকা জেলায় এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হইয়াছিল, শ্রীহট্ট জেলার সান্নিধ্যই তাহার একমাত্র কারণ। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মেঘনাদের জলরাশি হঠাৎ স্ফীত হইয়া উঠে ফলে, ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়া আউস ও হৈমন্তিক এই উভয়বিধ ধান্যই নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে পূর্ববর্তী বৎসরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে এতদঞ্চলের শস্য তথায় প্রেরিত হয়; সুতরাং পরবর্তী বৎসরে এই জেলার ফসল নষ্ট হওয়ায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। অক্টোবর মাসেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

১৭৮৭/৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জলপ্লাবনের ফলে এতদঞ্চলে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে টাকায় ৪ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৬০,০০০ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রাজনগর ও কার্তিকপুর পরগনাতেই এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোনও কোনও পরগনায় প্রায় বার আনা রকম শ্রমজীবি লোকের অভাব হইয়া পড়িল। ফলে আবাদের অভাবে স্থানসমূহ গভীর অরণ্যসঙ্কুল হইয়া শ্বাপদ জন্তুর ক্রীড়ানিকেতনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। শস্যের মূল্য প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে এই জেলায় শস্য আমদানি করিবার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এপ্রিল মাস পর্যন্তও আমদানি হইয়াছিল না। পরে, ৭২৫০ মণ শস্য মাত্র শহরে আসিয়া উপনীত হয়।

এই সময়ে আবার শহরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৭০০০ খানা গৃহ এবং খুচরা ব্যাপারীদিগের সঞ্চিত শস্যাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ফলে প্রায় শতাধিক লোক এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণত্যাগ করে।

১৮৩৩/৩৪ খ্রিষ্টাব্দের জলপ্লাবনের ফলেও শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে উড়িয়্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় এই জেলায়ও অন্নকষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইয়াছিল তাহাও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রদেশেই প্রেরিত হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ স্থানে, লাক্ষ্যাতীরবর্তী পলাসের সন্নিকটে এবং বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে শস্য কম জন্মিয়াছিল। জুন মাসে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এক বিন্দুও বারিপতন হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। আবার, নারায়ণগঞ্জ, ফুলবেড়িয়া এবং সূয়াপুর প্রভৃতি স্থানে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ পঙ্গপালের উপদ্রবে শস্য নষ্ট হইয়া যায়। ফলে শস্যের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে বহুলোক অর্ধাশনে বা অনশনে কালযাপন করিয়াছিল। কৃষকগণ সামান্য পরিমাণ চাউলের সহিত চিনা ও কাঐন মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিত। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে জেলার জমিদারগণ অকাতরে অন্নদান করিয়া বহুলোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১২]

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষার জলপ্লাবন কিছু বেশি হইয়াছিল। সুতরাং জেলার নিম্নভূমিগুলি জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে জেলায় শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল না।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহার প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে এই জেলার কোনও কোনও স্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে ধামরাই, সুয়াপুর এবং মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমার কোনও কোনও স্থানে শাহায্য প্রদান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাকালে অত্যধিক পরিমাণে জলবৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বৎসরও দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। এই সময়ে ১০।১২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা বেশি দিন স্থায়ী হইয়াছিল না।

দুর্ভিক্ষের কারণ :

পূর্বোল্লিখিত বিষয় পর্যালোচনা করিলে সাধারণত জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও পঙ্গপালের উপদ্রব এই তিনটি কারণ প্রধান বলিয়া মনে হয়। এই তিনটি বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

জেলার কোন্ কোন্ স্থানে শস্যহানির সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমরা এই জেলাকে নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

১। কাশিমপুর ও ভাওয়াল পরগনা।

২। লাক্ষ্যা ও আরিয়লেখা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ।

৩। মেঘনাদ, পদ্মা, যবুনা এবং ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদনদীর দিয়ারা।

৪। মুন্সিগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার স্থানসমূহ।

৫। একদিকে বংশী নদী এবং অপরদিকে গাজিখালি নদী এবং রামরাবণের খাল এই সীমাবিচ্ছিন্ন ভূভাগ।

১। এই বিভাগে সমুদয় বিভিন্ন প্রকারের ধান্যই উৎপন্ন হয়। পাট ও আউস ধান্য উচ্চভূমিতে, রোয়া আমন ধান্য ক্রমনিম্ন ভূমিতে এবং বোরো ধান্য ঝিলের কিনারায় জন্মিয়া থাকে। লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্য ঝিলসমূহের পার্শ্ববর্তী স্থানে এবং তুরাগ, সালদহ, লবণদহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরবর্তী স্থানেও উৎপন্ন হয়। পূর্বে এই অঞ্চল হইতে জেলার অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল প্রেরিত হইত। কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, উৎপন্ন শস্য এই অঞ্চলের অভাব বিমোচন করিয়া উদ্বৃত্ত হইতে পারে না; সুতরাং জেলার অন্যান্য স্থানে পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। উচ্চভূমিতে জাত পাট এবং আউস ও রোয়া ফসলের অবস্থা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। মে অথবা তাঁহার কিছুকাল পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাস পর্যন্ত সর্বত্র প্রচুর পরিমাণ বারিপতন হইলেই এই সমুদয় শস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। জুন মাস পর্যন্ত বৃষ্টি না হইলে আউস ধান্য ও পাট বপন করা যায় না; এবং জুলাই মাসেও যদি পর্জন্যদেবের কৃপা না হয়, তবে আমন শস্য রোপণেরও আশা থাকে না।

২। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। এখানকার জমিও অপেক্ষাকৃত উন্নত, সুতরাং জলপ্লাবনদ্বারা শস্যহানির আশঙ্কা খুব কম। বৎসরের প্রথমে বৃষ্টি না হইলেও তেমন অনিষ্টদায়ক হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে বারিপতন হইলে সুশস্য জন্মিয়া থাকে। জেলার মধ্যে এখানকার চাষীগণের অবস্থাই খুব ভাল।

৩। পাট ও আউস ধান্যই এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। এই অঞ্চলের জমি অল্পাধিক পরিমাণে জলপ্লাবনের অধীন। যথাসময়ের পূর্বে নদীজলের স্ফীতি হইলে শস্যহানির সম্ভাবনা, বপনকার্যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলে উহা আরও বেশি অনিষ্টদায়ক হয়। সুতরাং এই অঞ্চলে সুশস্য উৎপাদন পক্ষে বৎসরের প্রথম ভাগেই বারিপতন হওয়া

আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে বপনকার্য যথাসম্ভব শীঘ্রই আরম্ভ হইতে পারে এবং জলপ্লাবন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসেই শস্য কর্তিত হইতে পারে। এই অঞ্চলে ডাল, সরিষা ও তিলের চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং আউস ধান্য ও পাট ফসলের অনিষ্ট হইলেও উক্ত ফসল দ্বারাই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। রায়পুরা থানার অন্তর্গত কতিপয় স্থানে রোয়া ধান্যের চাষই অধিক পরিমাণে হয়; অনাবৃষ্টির ফলে এই ফসলের অনিষ্ট খুব কমই সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। এই অঞ্চলে লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্যই মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে এই ফসল ভাল জন্মে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পরেই এই ফসল জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং সুশস্য উৎপাদনপক্ষে বৃষ্টির আবশ্যক হয় না। জলপ্লাবনহেতু হঠাৎ জলবৃদ্ধি হইলে চারা নিমগ্ন হইয়া যায় ; সুতরাং তাহাতে শস্যহানি হইতে পারে। রবিশস্য খুব কমই জন্মে; সুতরাং শস্যহানি জন্মিলে রবিশস্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ হইবার আশা নাই।

৫। এই অঞ্চলে লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্য এবং প্রচুর মটর উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলেই জলপ্লাবনদ্বারা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে জলপ্লাবনের ফলে ধান্যাদি শস্য একেবারে ভাসাইয়া নেয়। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম, কৃষকগণ মটর বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়া থাকে। আলম নদী দ্বারা এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুতরাং দেখা যায় যে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের বারিপতনের উপরই ঢাকা জেলার শস্যাদি নির্ভর করিয়া থাকে। এই দুই মাসে বৃষ্টি না হইলেই গভর্নমেন্টের চিন্তার কারণ জন্মে। এই জেলা মধ্যে মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমাদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ স্থানগুলি এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার গ্রামসমূহেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালের শেষভাগে এই অঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা নাই; এই সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে জনগণের কষ্ট বর্ণনাতীত হয়।

১ Rec G.S.I Vol XXX. Mem G.S.I Vol. XXIX, Vol XXX Pt I. and Vol XXXV Pt II
২. Taylor's Topography of Dacca.
৩. See Dr. Taylor's Topography of Dacca, page No. 301
৪. Dr. Taylor's Topography of Dacca.
৫ Handbook of Cyclone & C. by Elliot
৬. Lyell's principles of Geology. Chap. XIX. Page 266
৭. See Bay of Bengal and Arabian Sea Cyclone Memoris by J Eliot. Page 13.
৮. Ibid.
৯. See Bay of Bengal and Arabian Sea Cyclone Memoris by J Eliot. Page 13.
১০. Mr. A. C. Sen's Report.
১১. Shihabuddin Tallsh's Fathyia Ibrayia. page 11ob. (manuscript translation by Prof. Jadunath Sarkar)
১২. ঢাকার অবদান কল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব খাজে আবদুলগণি দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়া ভিখারীদিগকে অন্নদান করিবার জন্য "পুরব দরজা" মহল্লায় একটি "লঙ্গরখানা" স্থাপন করেন। এই লঙ্গরখানায় বহু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক প্রতিপালিত হইয়াছিল।

উনবিংশ অধ্যায়

বিবিধ

মিউনিসিপালিটি; জলের কল; আলো; ঠিকাগাড়ি জেলাবোর্ড; লোকেল বোর্ড; পাউণ্ড; গুদারা; রেল ও স্টিমার পথ; ডাক ও টেলিগ্রাফ; চিকিৎসালয়; পাগলাগারদ; হাসপাতাল; জেল প্রভৃতি।

মিউনিসিপালিটি :

"১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে ঢাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১১ই আগষ্ট তারিখে কমিশনারগণের প্রথম সভা আহুত হইয়াছিল। ঐ সভায় নগরের গৃহাদির উপর এবং ভূমির উপর আয় ধরিয়া ঐ আয়ের উপর শতকরা ৭ টাকা ৫০ পয়সা হারে টেক্স ধার্য হয়। ঐ সময়ে সমগ্র ঢাকা সহরে করদাতার সংখ্যা হইয়াছিল ১৬০৬০ জন। কার্যের সুশৃঙ্খলা বিধান জন্য শহরটিকে ১৬৬ মহল্লায় বিভক্ত করিয়া, কর আদায় জন্য ১৪ জন তহসিলদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে তহসিলদারের সংখ্যা কমাইয়া ১০ জন করা হয়।

"১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর মদনগঞ্জ বন্দরকে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জই এই প্রদেশমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপালিটি।"

জলের কল :

"১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯৫০০০ টাকা ব্যায়ে জলের কলের কার্য শেষ হয় জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য অবদানকল্পতরু স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুলগণি লক্ষ টাকা প্রদান করেন ; বক্রী ৯৫০০০ টাকা গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। নগরবাসীদিগকে করভারে প্রপীড়িত না করা হয়, এই শর্তেই নবাব বাহাদুর টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শহরে জলের কল খোলা হয় এবং ফিলটার না করিয়াই শহরবাসীদিগকে কলের জল প্রদান করা হয় এবং তৎপরবর্তী বৎসর হইতে "লোহারপুর" পর্যন্ত বড় বড় রাস্তাগুলিতে পরিষ্কার জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন পর্যন্তও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মিউনিসিপাল কমিটি ৫০০০০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া কলবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ সময়ে "ডিউক অব কনট" কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তদীয় শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঢাকার স্বনামধন্য স্বর্গগত নবাব স্যার আসানুল্লা বাহাদুর ১১০০০ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ অর্থে শহরের উত্তর অংশে—নবাবপুর হইতে ঠাটারীবাজার এবং দেলখোসবাগ পর্যন্ত জলপ্রদানের বন্দোবস্ত হয়। ঐ লাইন "Cannaught-Extension" নামে অভিহিত হইবে, নির্ধারিত হয়।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট হইতে ১২৫০০০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া ঢাকার মিউনিসিপালিটি শহরের সর্বত্র জলপ্রদানের সুবিধা করেন।

বঙ্গ বিভাগের পরে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতি বাড়িতে জলের কল প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়।

জলের কলে শহরের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছে। পূর্বে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু জলের কল প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯০৪/০৫ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জে জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব হয় ও ১৭৯০০০ টাকা ব্যয়ে শহরের দুইটি মহল্লায় unfiltered জলপ্রদানের ব্যবস্থা হয়। এখন নারায়ণগঞ্জে জলের কলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলো :

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সার আবদুলগণি বাহাদুর K.C.S.I উপাধি পাইলে, নবাব স্যার আসানউল্লা বাহদুর তাঁহার স্মরণার্থে ঢাকা নগরে আলোকপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে শহরটিকে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় বিভূষিত করিবার জন্য তিনি ২ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন। ঐ টাকায় তাড়িতালোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আলোকপ্রদানের ব্যয়নির্বাহার্থ নবাব বাহাদুর আরও দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই আলোক উপভোগের জন্য শহরবাসীকে কোনও টেক্স প্রদান করিতে হয় না।

ঠিকাগাড়ি :

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ সিরকোর নামক কোন আমেরিকান বণিক এই জেলায় সর্বপ্রথম ঠিকাগাড়ি আমদানি করেন। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসরের মধ্যে বহু ঠিকাগাড়ি আমদানি হয়। দশ বৎসরের মধ্যে ঠিকাগাড়ির সংখ্যা ৬০ খানা হয়। এখন ঢাকার অসংখ্য ঠিকাগাড়ি হইয়াছে।

জেলাবোর্ড :

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ঢাকা জেলায় "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন" প্রবর্তিত হয়। তদনুসারে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর জেলাবোর্ডের সভাপতি। সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারি সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঢাকা জেলাবোর্ড সভাপতি সহ মোট সদস্যের সংখ্যা ২৯ জন। সদস্যদিগের মধ্যে ১৪ জন লোকেলবোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ১৫ জন গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন। গর্ভনমেন্টের মনোনীত ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন রাজকর্মচারী (Ex-offico)।

জেলাবোর্ড সাধারণত শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতি, পশুচিকিৎসা, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি সাধারণের উপকারজনক কার্যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ঢাকা জেলাবোর্ডের পরিমাণফল ২৭৭১ বর্গ মাইল।

লোকালবোড :

"জেলাবোর্ডের কার্যসৌকর্যার্থে সদর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ এই চারিটি লোকালবোর্ড আছে। জনসাধারণের মতে লোকালবোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। লোকালবোর্ডগুলির সভ্যসংখ্যা ও বোর্ডের পরিমাণফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মেম্বারের সংখ্যা	পরিমাণ ফল
সদল লোকেল বোর্ড	১২	১২৫৯.৫
নারায়ণগঞ্জ বোর্ড	১০	৬৩৬.৫
মুন্সিগঞ্জ বোর্ড	১৬	৩৮৬.০
মাণিকগঞ্জ বোর্ড	৯	৪৮৯.০

গুদারা :

"গুদারা ঘাটে পূর্বে ভূম্যধিকারীর স্বত্ত্ব ছিল। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট গুদারা স্বত্ত্ব নিজে গ্রহণ করেন। জেলাবোর্ড স্থাপিত হইলে গুদারার বন্দোবস্ত জেলাবোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের মধ্যে একটি স্টিমার দ্বারা পারাপারের কার্য পরিচালিত হয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০০০ টাকা ব্যয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড একটি স্টিমার ক্রয় করেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে "ট্রাফিক বিভাগ" ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্ত হইতে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৯-৯০ খ্রিষ্টাব্দে বোর্ড পুনরায় তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে এই স্টিমার গুদারা ইজারা বিলির বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও লাখপুরের দুইখানা স্টিমার গুদারা চলিতেছে।

পাউন্ড :

"ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন এই জেলায় ১৯৬টি পাউন্ড আছে। গুদারাঘাটের ন্যায় পাউন্ডগুলিও প্রতি বৎসর প্রকাশ্য ডামে নিলাম হইয়া সর্বোচ্চ ডাককারির সহিত মেয়াদি বন্দোবস্ত করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউন্ড ব্যতীত মিউনিসিপালিটির অধীনেও পাউন্ড আছে। গুদারা ও পাউন্ডের আয় শিক্ষাকার্যে ব্যয়িত হয়। মাণিকগঞ্জ ব্যতীত জেলার অন্যান্য স্থানের যাবতীয় পাউন্ডগুলি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে নীলামে বিলি হইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে মাণিকগঞ্জের পাউন্ডগুলির ডাকে বিলি হইতেছে।

পাগলাগারদ :

শহরের পশ্চিমাংশে চক্‌বাজারের সন্নিকটে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে পাগলা গারদ প্রস্তুত হয়। ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদার ইসলামখাঁর নির্মিত দুর্গের নিকটেই ইহা অবস্থিত।[১] ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এই গারদে ৫টি সপ্রশস্ত আঙ্গিনা, চারিজনের অবস্থানোপযোগী ৭টি কক্ষ এবং নির্জন বাসোপযোগী ৩২টি কক্ষ ছিল।[২] এক্ষণ এখানে ২১৭ জন পুরুষ ও ৪৫ জন স্ত্রীলোকের বাস করিবার উপযোগী স্থান আছে। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছার, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বগুরা, কুচবিহার এবং আসাম প্রদেশের রোগীও এখানে প্রেরিত হইত।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসরে গড়ে ৯৫ জন করিয়া রোগী গৃহীত হইত। ইহার মধ্যে গঞ্জিকাসেবন জন্য বিকৃতমস্তিষ্কের সংখ্যাই অধিক।[৩] গারদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ২৬০০০ টাকা। এই সমুদয় ব্যয় গভর্নমেন্টই বহন করেন। ঢাকার সিভিলসার্জন গারদের সুপারিন্টেন্ডন্ট এবং উচ্চপদস্থ কতিপয় রাজকর্মচারী ও কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্তলোক ইহার সম্মানিত পরিদর্শক (Honarory visitors)।

টাকশাল :

পাঠান শাসন সময়ে "হজরৎজালাল" সোনারগাঁও, হজরৎ মোয়াজ্জমাবাদ, মামুদাবাদ প্রভৃতিস্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মোগলশাসন সময়ে নবাবি টাকশাল চক্‌বাজারের সন্নিকটবর্তী ইস্‌লামখাঁর দুর্গমধ্যে স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়ে ঐ স্থানে জেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোগল রাজত্বের অবসানের পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার টাকশাল কোম্পানির মুদ্রাদি প্রস্তুত হইত। ঐ সনেই ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের টাকশাল উঠিয়া যায়। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখ হইতে ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত টাকশাল হইতে পুনরায় কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।[৪] কিন্তু ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারির পরে ঢাকার টাকশালে আর কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হয় নাই।[৫] ঐ সময়েই টাকশালের কার্য বন্ধ হইয়া যায়।

হাসপাতাল :

পাগলা গারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, দৈনিক চিকিৎসালয়, লেডি ডাফরিন জেনানা হাসপাতাল প্রভৃতি ঢাকার প্রধান চিকিৎসালয়।

মিটফোর্ড হাসপাতাল :

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে রবার্ট মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মিঃ মিটফোর্ড ঢাকার প্রথম কালেক্টর ও শেষ প্রাদেশিক আপিল আদালতের (Provincial court of Appeal) জজ ছিলেন।

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ মিটফোর্ড প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তদীয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ঢাকার জনসাধারণের উপকার ও উন্নতিকল্পে গভর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করিয়া যান। কিন্তু এই মহাত্মার মৃত্যুর পরে উক্ত দানপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত হইলে বিলাতে সেই আপত্তির বিচার হইয়া ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাহার মীমাংসা হয়। ফলে বিলাতের চেন্সেরি কোর্ট বঙ্গীয় গভর্নমেন্টকে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। ডিক্রির বলে দাতার এই সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য গভর্নমেন্ট প্রায় ১৬৬০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে হাসপাতালের দালানের কার্য আরম্ভ হয়। কাটরা পাকুরতলীর[৬] (বাবুর বাজার) যে স্থানে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য কুঠি বিদ্যমান ছিল, তথায় এই হাসপাতালের দালান প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে গভর্নমেন্টের দেশীয় হাসপাতাল[৭] ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং দেশী হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহার্থ গভর্নমেন্ট যে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। বর্তমান সময়ে গভর্নমেন্টের উক্ত শাহায্যে এবং মহাত্মা মিটফোর্ডের দানের টাকার সুদ হইতে এই হাসপাতালের খরচ পরিচালিত হইতেছে।[৮]

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এই হাসপাতালে ৯২ জন রোগীর স্থান হইত। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এখানে ১০৭৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৮৬৫ জন আরোগ্য লাভ করে ; ১৭৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৩৩ জন বৎসরের শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এই হাসপাতালে একটি ইউরোপীযান ওয়ার্ড খুলিবার প্রস্তাব গভর্নমেন্ট মঞ্জুর করেন।

১৮৮৯-৯০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙ্গলার ধনকুবের ভাগ্যকুলনিবাসী রাজা শ্রীনাথ রায় মহোদয় তদীয় স্বর্গগতা জননীর স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে এই হাসপাতালের সংশ্রবে একটি চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে একটি Eye ward স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ফিমেল ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় নবাব স্যার আসানউল্লা বাহাদুর এবং ভাওয়ালের মহানুভব রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ওয়ার্ডের স্থান ক্রয় করিবার জন্য যথাক্রমে ২৭০০০ টাকা এবং ২০০০০ টাকা প্রদান করেন।

লেডি ডাফরিন জেনানা হাসপাতাল :

১৮৮৮-৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফরিনের ঢাকায় আগমন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৫০০০০ টাকা ব্যয়ে লেডি ডাফরিনের নামানুসারে লেডি ডাফরিন জেনানা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন।

জেল হাসপাতাল :

এই হাসপাতালে জেলের কয়েদিদিগের চিকিৎসা হয়। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন নবাবি টাকশালে এই জেল স্থাপিত হইয়াছে।

মফঃস্বলের ঔষধালয় :

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মাণিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, জৈনসার, ভাগ্যকুল ও কালীপাড়া এই পাঁচটি গ্রামে পাঁচটি ঔষধালয় ছিল। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট মাণিকগঞ্জ ডিসপেন্সারি স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে জয়দেবপুরের জমিদার ৺কালীনারায়ণ রায় জয়দেবপুরে ডিসপেন্সারি স্থাপন করেন। ঐ সনের ১৬ই নভেম্বর জৈনসার নিবাসী ছোট আদালতের জজ স্বনামধন্য ৺অভয়কুমার দত্ত নিজ গ্রামে ডিসপেন্সারি স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাগ্যকুল ও ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে কালীপাড়ায় ডিসপেন্সারি স্থাপিত হয়। এই পাঁচটি ডিসপেন্সারি ডাক্তারের বেতন গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হইত। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ ও মালুচি ডিসপেন্সারি স্থাপিত হয়। ৺বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মৃত্যুকালে তাঁহার রঙ্গপুরের এক সম্পত্তি মালুচি ডিসপেন্সারি ব্যয় নির্বাহের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ডিসপেন্সারির ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ ও বালীয়াটি ডিসপেন্সারি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কালীপাড়া ডিসপেন্সারি সিমুলিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিমুলিয়ার ডিসপেন্সারি উঠাইয়া দেওয়া হয়। জুবিলি উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও ১৮৯০-৯১ সনে মিশন ডিসপেন্সারি স্থাপিত হয়।

বর্তমান সময়ে এই জেলায় ২৩টি ডিসপেন্সারি ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ২৩টির ৮টি ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ও লোকেল বোর্ডের ২টি মিউনিসিপালিটির, ১টি মিসনারীদিগের ও ১২টি স্থানীয় ভূমধ্যধিকারীদিগের ব্যয়ে পরিচালিত। এই ২৩টি ডিসপেন্সারির মধ্যে যে ১৫টিতে গভর্নমেন্টের শাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার নাম প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল (২) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, (৩) বলধরা, (৪) বনখুরা (৫) মূলচর (৬) মহাদেবপুর (৭) তেঘরিয়া (৮) চুরাইন (৯) রায়পুরা (১০) মনোহরদি (১১) জৈনসার (১২) মাণিকগঞ্জ (১৩) মুন্সিগঞ্জ (১৪) নাগরী (১৫) ঢাকা লেডি ডাফরিন হাসপাতাল।

জয়দেবপুর, ভাগ্যকুল, বালিয়াটি, যোলঘর প্রভৃতি স্থানের ডিসপেন্সারিগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের অর্থে পরিচালিত হয়।

রেল :

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রেল চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়। এই জেলায় মোট ৫২ মাইল রেললাইন।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহের মধ্যে এই জেলার অধীন ১১টি স্টেশন। (১) নারায়ণগঞ্জ (২) চাসারা, (৩) দোলাইগঞ্জ, (৪) ঢাকা, (৫) কুর্মিটোলা, (৬) টঙ্গী, (৭) জয়দেবপুর (৮) রাজেন্দ্রপুর, (৯) শ্রীপুর, (১০) সাতখামাইর, (১১) কাওরাইদ।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইনের পথ-নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের ত্রুটি হইয়াছে। লাক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরভূমি দিয়া এই লাইন চলিলে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই উভয় জেলারই পাট উৎপাদনপযোগী স্থানসমূহ রেলপথের অনতিদূরে থাকিত। পক্ষান্তরে, লাক্ষ্যা-তীববর্তী স্থানসমূহের জলবায়ু অতি উত্তম; নৈসর্গিক সৌন্দর্যগৌরবে এই স্থান নিম্নবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বহুসংখ্যক নদী-নালা এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জলপথে যাতায়াতেরও খুব সুবিধা। এই স্থানের সন্নিকটেই স্বাধীন পাঠানরাজগণ বহুকাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া গিয়াছেন; ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকার মসলিন এই স্থানেই প্রস্তুত হইত। যৎসামান্য চেষ্টাতেই লাক্ষ্যানদীর উভয় তীরবর্তী স্থানসমূহকে উন্নত বন্দরে এবং নিকটবর্তী বনভূমিকে

তুলা ও ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ প্রকৃতির এই অযাচিত দান উপেক্ষা করিয়া মধুপুর অরণ্যানীর অন্তর্গত কর্ষণের অনুপযোগী পরিত্যক্ত ভূমি নির্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং এই রেল-লাইনের আয় আশানুরূপ হইতেছে না।

জাফরগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘিয়র, বেউথা, কায়রা, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শেখরনগর, তালতলা, মীরকাদিম হইয়া মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত একটি রেললাইন হইলে সর্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে এবং আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহুল দেশে রেলপথের আবশ্যকতা অতি সামান্যমাত্র। খালগুলির সংস্কারসাধন এবং ক্ষীণতোয়া নদ-নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলেই বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতিসাধন হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে তালতলার খাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

ষ্টিমার :

সিপাহি-বিদ্রোহের পর হইতে গভর্নমেন্ট ঢাকা, কলিকাতা, ও আসামের সহিত ষ্টিমার-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তৎকালে নিয়মমত ষ্টিমার চলিত না।

১৮৬২ সনের ১৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত রেল-লাইন বিস্তৃত হইলে, ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ বাক্‌লেন্ডের যত্নে ঢাকা হইতে কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত ষ্টিমার চালিত হয়। পরে ঐ রেলপথ গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রসারিত হইলে ষ্টিমার নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকে।

বর্তমান সময়ে জেলার দুই পার্শ্বে ২টি প্রধান ষ্টিমার লাইন আছে। একটি পদ্মা ও মেঘনাদে, অপরটি যমুনায়। এই উভয় লাইনের "রিভার ষ্টিম্ নেভিগেশন কোম্পানির' ও "ইন্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানির" ষ্টিমার চলিয়া থাকে। নিম্নে ষ্টিমার লাইনগুলির পরিচয় ও যাতায়াতের পথ প্রদত্ত হইল।

"গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ ডেইলি এক্সপ্রেস" ও "কাছার-নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ ডেইলি ইন্টারমিডিয়েট ডেস্‌প্যাচ সার্ভিস"—গোয়ালন্দ হইতে প্রথম দিন :—কাঞ্চনপুর, জেলানদী, হরিরামপুর চর, মৈনট, নারিশা, কাদিরপুর, মাওয়া, তারপাশা, পদ্মা জংশন, সুরেশ্বর জংশন, বহর, সাতনল, কমলাঘাট, নারায়ণগঞ্জ। দ্বিতীয় দিন—মীরকাদিম, বৈদ্যের বাজার, বারদি, শ্রীমদ্দি, বিষনন্দী, ভাঙ্গার চর, নরসিংহদী, মণিপুরা, মাণিকনগর হইয়া ভৈরববাজার।

"কাছার-সুন্দরবন" ডেইলি ডেস্‌প্যাচ (৫ম দিন)—মীরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ষ্টিমারঘাট। (৬ষ্ঠ দিন) মীরকাদিম, বৈদ্যের বাজার, বারদি, শ্রীমদ্দি।

"আসাম ডেইলি মেল সার্ভিস"—কলিকাতা জগন্নাথঘাট হইতে ষ্টিমার ছাড়ে। এই ষ্টিমার বরিশাল ও মাদারীপুর হইয়া পদ্মায় পড়ে ; পরে "আসাম মেল সার্ভিসের" সঙ্গে যোগ হয়।

"নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব ডেইলি ডেস্‌প্যাচ"—ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ট্রেন আসিলেই ষ্টিমার ছাড়ে। নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, বৈদ্যের বাজার, বারদি, শ্রীমদ্দি প্রভৃতি।

"চাঁদপুর ডেইলি এক্সপ্রেস মেল সার্ভিস"—কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টিমার কাদিরপুর, তারপাশা, বহর, সুরেশ্বর হইয়া চাঁদপুর পৌঁছে।

"কো-অপারেটিভ নেভিগেশন কোম্পানি" (১)—কলিকাতা হইতে ছাতক, ভায়া বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ। (২) বরিশাল হইতে সিরাজগঞ্জ, ভায়া মাদারীপুর ও গোয়ালন্দ।

"দি বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন্ কোম্পানি লিমিটেড"—কলিকাতা হইতে মাদারীপুর লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব ও মধ্যবর্তীস্থানে যাতায়াত করে।

"ধলেশ্বরী সার্ভিস"—রবিবার ব্যতীত প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার ঢাকা হইতে বেলা ৭টার সময় ছাড়িয়া রামচন্দ্রপুর, সাভার, সিঙ্গেরহাট, আলডোনগঞ্জ, বেতিলাঘাট ও হেমগঞ্জ হইয়া সন্ধ্যা ৬টায় ললিতগঞ্জ পৌঁছে।

যবুনা লাইন সাধারণত "আসাম লাইন" বলিয়া পরিচিত। এই লাইনের ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে জেলার পশ্চিমসীমা দিয়া যবুনা নদী বহিয়া আসাম যাতায়াত করে।

গহেনা :

জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্বদা যাতায়াত করিবার জন্য গহেনার নৌকাই প্রশস্ত। গহেনার নৌকা প্রত্যহ নিয়মিত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে।

কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থান পর্যন্ত প্রসিদ্ধ গহেনাগুলি যাতায়াত করিয়া থাকে, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক)	ঢাকা	হইতে	মাণিকগঞ্জ	পর্যন্ত
(খ)	ঢাকা	হইতে	ধামরাই	পর্যন্ত
(গ)	ঢাকা	হইতে	তালতলা	পর্যন্ত
(ঘ)	ঢাকা	হইতে	বহর	পর্যন্ত
(ঙ)	ঢাকা	হইতে	লৌহজঙ্গ	পর্যন্ত
(চ)	ঢাকা	হইতে	শ্রীনগর	পর্যন্ত
(ছ)	ঢাকা	হইতে	কলাকোপা	পর্যন্ত
(জ)	ঢাকা	হইতে	নবাবগঞ্জ	পর্যন্ত
(ঝ)	ঢাকা	হইতে	হোসনাবাদ	পর্যন্ত
(ঞ)	ঢাকা	হইতে	কালীগঞ্জ	পর্যন্ত

ঢাকা লালকুঠির ঘাট হইতে প্রাতে ৭টা ও রাত্রি ৮টার সময় কয়েকখানা গহেনা ছাড়িয়া থাকে। বর্ষাকালে সেরাজদিঘা পর্যন্ত যাতায়াতকারী গহেনার ভাড়া ১ আনা ১০ গন্ডা; এবং অন্যান্য সময়ে প্রাতে প্রথম গহেনা ১ আনা ১৫ গন্ডা। দ্বিতীয় গহেনা ১ আনা ৫ গন্ডা। রাত্রিকালে প্রথম ও দ্বিতীয় গহেনার ভাড়ার তারতম্য নাই। উভয়ের ভাড়াই ২ আঃ। তালতলা ১আনা, ১০ গন্ডা, শ্রীনগর ৩ আনা, ষোলঘর ২ আনা ১০ গন্ডা, হাসারা ২ আনা, লৌহজঙ্গ ৪ আনা, মীরকাদিম ২ আনা, বহর ৩ আনা, টঙ্গিবাড়ি ২ আনা, কলমা ৩ আনা, তন্তর, সিঙ্গপাড়া ২ আনা, ইছাপুর ২ আনা।

পুনরায় ঢাকা লালকুঠির ঘাট হইতে বেলা ২ ঘটিকার সময় তালতলা ও সেরাজদিঘা যাতায়াত করে।

ঢাকা ফরাসগঞ্জ হইতে প্রাতে ফতুল্লা ১০ গন্ডা, তালতলা ১ আনা, মীরকাদিম ১ আনা। ঢাকা চাম্নিঘাট হইতে প্রাতে ৭টা ও রাত্রে ৮টার সময় ছাড়ে। ফুলবাড়িয়া, সাভার ২ আনা, সিঙ্গার ২ আনা ১০ গন্ডা, মাণিকগঞ্জ ৪ আনা, গোয়ালন্দ ৮ আনা, ধামরাই ২ আনা, নবাবগঞ্জ ১ আনা ৫ গন্ডা, চর নবাবগঞ্জ ১ আনা।

বাবুরবাজার ঘাট হইতে রাত্রি ৭টার সময় ছাড়ে। কলাকোপা ২ আনা, যন্ত্রাইল ২ আনা ১০ গন্ডা, বান্দুরা ২ আনা।

ঢাকা-দয়াগঞ্জ হইতে বর্ষাকালে ছাড়ে। ডেমরা ২ আনা, মুড়াপাড়া ২ আনা, ডাঙ্গা ৩ আনা, কালীগঞ্জ ৪ আনা।

কাওরাইদ হইতে নাইনন্দ ৫ আনা, চোরেরহাট ১ আনা, উলুসারা ২ আনা, টোকেরঘাট ৩ আনা, মঠালা ৪ আনা, রামপুর ১ আনা, কাঠিয়াদি ১ আনা।

নারায়ণগঞ্জ হইতে দিবা ১০টার সময় ছাড়ে। দাউদকান্দি ৩ আনা, আইলারগঞ্জ ৪ আনা, কুমিল্লা ৮ আনা, বিবাগর ২ আনা, উচিৎপুরা ৩ আনা, গোপালদি ৪ আনা, ডাঙ্গা ৩ আনা, কালীগঞ্জ ৪ আনা, চরসিন্দুর ১ আনা, লাখপুর ১ আনা, হাতিরদি ২ আনা, কমলাঘাট ১ আনা ১০ গন্ডা, মুন্সিগঞ্জ ৪ আনা ১০ গন্ডা, চাঁদপুর ৪ আনা, লৌহজঙ্গ ৪ আনা, মীরকাদিম ২ আনা, টঙ্গিবাড়ি ২ আনা।

মুন্সিগঞ্জ হইতে লৌহজঙ্গ ধানকুনিয়া, হলদীয়া কনকসার ৪ আনা।

ডাক :

জেলা সংস্থাপনের পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলে ডাকে বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা হইতে ৫ দিনে ঢাকায় চিঠিপত্র আসিত। গর্ভনমেন্টের নিযুক্ত বরকন্দাজগণ চিঠি বিলি করিত। তৎকালে চিঠির মাশুল স্থানীয় দূরত্ব হিসাবে ধার্য করা হইত। কলিকাতা হইতে ঢাকার ডাক আসিয়া পৌঁছিলে এখান হইতে লোকদ্বারা প্রত্যেক থানায় উহা প্রেরিত হইত। মফঃস্বলবাসী ইউরোপীয়গণ ডাকের প্রতীক্ষায় ঢাকায় লোক রাখিতেন।

১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের ডাক বিলি করিবার জন্য টঙ্গী ও বরদিপুর নামক স্থানদ্বয়ে ডাকঘর সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ডাকের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় ডাকঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, শ্রীনগর বহর, ধামরাই, সোনারং, রূপগঞ্জ ও পশ্চিমদি এই এগারটি স্থানে গভর্নমেন্টের ডাকঘর ছিল। জৈনসার ও কাঠাদিয়া Experimental ডাকঘর ছিল।

বর্তমান সময়ে এখানে ২টি "প্রধান" ডাকঘর, ৬২টি সাব পোষ্ট-অফিস ও ১৬৮টি ব্রাঞ্চ পোষ্ট-অফিস সংস্থাপিত আছে। নিম্ন ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

সাব অফিস	ব্রাঞ্চ-অফিস
ঢাকা—	আমদিয়া, আটি, বংশাল, বংশীবাজার, বিরাব, ব্রাহ্মণকীর্তি, চৌধুরিবাজার, ডাঙ্গাবাজার, ডেমরা ইস্‌লামপুর, কলাতিয়া, কাওরাইদ, কোণ্ডা, লক্ষ্মীবাজার, নবাবপুর, নিমতলী, পশ্চিমদী, পীলখানা, পোস্তা, পুবাইল, রাজফুলবাড়িয়া, রোহিতপুর, শাক্তা, শুভাড্যা, সংগ্রামপুর, তেঘরিয়া, তেতুলঝোড়া, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি।

আগলা—মাসাইল।
বৈদ্যেরবাজার[৯]—আমিন্‌পুর, বারদি, লক্ষ্মীবারদি।
বায়রা[১০]—আটিগ্রাম, বলধর, বস্থুরা, হাটিপাড়া, কাবাস্‌পুর, ভগবানগঞ্জ।
ভাগ্যকুল[১১]—বাঘরা, কাটিয়াপাড়া, নারিশা।
চকবাজার[১২]।
ঢাকা রেলওয়েষ্টেশন।
ধামরাই—।
ধানকোড়া—কুশরা, কাটিগ্রাম, সানোরা, শাহাবেলিশ্বর।
ফরিদাবাদ।
ঘিয়র—চক-মীরপুর।
হাসারা—কেওটখালি।
জাগীর[১৩]
জয়দেবপুর[১৪]—আশুলিয়া, বলধরা, বোয়ালী, গাছা, কাশিমপুর।
জয়মন্টপ[১৫]—বানিয়ারা, চান্দর, নান্নার, রোয়াইল।
জাফরগঞ্জ—খলসী, নয়াবাড়ি।
কালীগঞ্জ—ব্রাহ্মণগাঁ (ভাওয়াল) ঘোড়াশাল।
কাঞ্চনপুর—ঝিটকা, মালুচি, নবগ্রাম, বামাদিয়া নালি।

কেরাণীগঞ্জ।
কুমারভোগ—গ্রামওয়ারী।
লাখপুর—চক্রধা, একদুয়ারিয়া।
লেছরাগঞ্জ—লক্ষ্মীকূল, নটাখোলা।
মদনগঞ্জ[১৬]
মহাদেবপুর[১৭]—বুতুনী।
মহম্মদপুর—দেবীনগর, দোহার।
মাণিকগঞ্জ[১৮]—বানিয়াজুরি, বেতিলা, গরপাড়া, মত্ত, ছনকা, তরা, তিল্লি।
মেদিনীমণ্ডল।
মীরপুর[১৯]—বিরুলিয়া।
নবাবগঞ্জ—দাউদপুর, গোবিন্দপুর, হোসনাবাদ, জয়কৃষ্ণপুর।
নারায়ণগঞ্জ—বারপাড়া, হরিহরপাড়া, নবীগঞ্জ, শীতললাক্ষ্যা, টানবাজার।
নরসিংদি—আমিরাবাদ, রামনগর, রায়পুরা।
পাঁচদোনা—গয়েশপুর, নওপাড়া, পারুলিয়া, সিলমদ্দি।
রাজখাড়া।
রূপগঞ্জ—আড়াইহাজার, দুপতারা, গোপালদি, মুড়াপাড়া, পনিবাজার, শম্ভুপুর।
সাভার[২০]
সাতরিয়া[২১]—বালিয়াটি, চৌহাট, দড়গ্রাম, দিঘলিয়া, গ্রাম আমতা।
শেখরনগর—বারৈখালি, চুরাইন, বাজানগর।
শিবালয়[২২]—নালি, তেওতা।
সিমুলিয়া—বালিয়াদি, কালিয়াকৈর।
সিঙ্গৈর[২৩]।
ষোলঘর।
শ্রীনগর[২৪]—বেলতলি, আটপাড়া, দোগাছি, কুকুটিয়া, মাইজপাড়া, শ্যামসিদ্ধি।
শ্রীপুর—বরিশাব, বেলাব, গোতাদিয়া, কাপাসিয়া, মনোহরদি, নরেন্দ্রপুর, উলুসারা।
সুয়াপুর।
টঙ্গী।
উথুলী—বারাঙ্গাইল, বরাটিয়া।
উয়ারী[২৫]।
মুন্সিগঞ্জ[২৬] (দ্বিতীয় শ্রেণি)—ফিরিঙ্গিবাজার, গজারিয়া, ঘাসিরপুকুরপাড়, কেওয়ার, মুলচর, পঞ্চসার।
বহর—ভরাকৈর, কলমা।
বজ্রযোগিনী[২৭]।
বারুণী।
বিদগাঁও।
হাসাইল—বানরী।
ইছাপুরা[২৮]—চন্দনধূল, খিদিরপাড়, কুচিয়ামোড়া, রসুনিয়া, সিরাজদিঘা, সিয়ালদি, তেজপুর, টোলবাসাইল, মধ্যপাড়া।
জৈনসার[২৯]—পশ্চিমপাড়া।
কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া—রাউৎভোগ, যশোলঙ্গ।
কোলা[৩০]—বেলতলি, রোবদী।

লৌহজঙ্গ[৩১]—বেজগাঁ, ব্রাহ্মণগাঁও, গাউদিয়া, গাউপাড়া, হলদিয়া, কনকসার, কোরহাটি।
মালখানগর[৩২]—কৈচাল, মালপদিয়া, পালৈদিয়া, সিলিমপুর।
মীরকাদিম[৩৩]—পাইকপাড়া।
রাজাবাড়ি।
সোনারং[৩৪]—আড়িয়ল, বালিগাঁ, বেতকা, আউটসাহি, পুরাপাড়া, টঙ্গীবাড়ি।
স্বর্ণগ্রাম—বাঘিয়া, নয়না।

১. Khan Bahadur Syed Aulad Hussain's Antipuities of Dacca and Tarikh-i-Dacca.
২. Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. V.
৩. Ibid.
৪. "The earliest weekly account of the new Dacca mint which I have been able to find is dated 11th August, 1792."—E. Thurston on History of the East India Company Coinage.
৫. J. A. S. B. Vol., LXII, Pt., I, Page 62.
৬. বাবুর বাজারের নাম পূর্বে কাটেরা পাকুরতলী ছিল; পরে ভূকৈলাসের বাবুদিগের বসবাসহেতু ঐ স্থান বাবুর বাজার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।
৭. ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার দেশী হাসপাতালের শাখা স্বরূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক ১৫০ টাকা এবং ঔষধাদি প্রদান করিতেন। জনসাধারণও কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট হইতে চাদা তুলিয়া ২২০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ টাকার সুদ হইতে ইহার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ হইত।
৮. "১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬৬০০০ টাকার সুদ ও গভর্নমেন্টের শাহায্য এরূপ ছিল—

মাসিক সুদ ৫৭৭৫ টাকা ১২ আনা ৫ পাই

৪৫৩ টাকা ১২ আনা

মাসিক গভর্নমেন্ট শাহায্য———(দেশী হাসপাতালের জন্য)

মোট ১০৩১ টাকা ৮ আনা ৫ পাই

তখন এই মাসিক ব্যয়ে হাসপাতাল চলিত। ঢাকার বিবরণ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

৯—১২ চিহ্নিত ডাকঘরে টেলিগ্রাফ অফিসও আছে।
১৩—২৩ চিহ্নিত ডাকঘরে টেলিগ্রাফ অফিসও আছে।
২৪—৩৪ চিহ্নিত ডাকঘরে টেলিগ্রাফ অফিসও আছে।
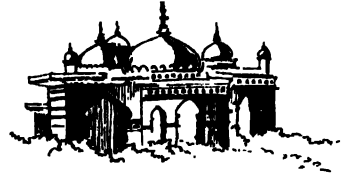
বিংশ অধ্যায়

জমি ও জমা

প্রাচীন হিন্দুদিগের জমি-জমা পদ্ধতির মূল ভিত্তিই গ্রাম। পুরাকালে কর্ষিত ভূমিতে কৃষকেরই স্বত্ব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে এরূপও নির্দেশ আছে যে ভূমির স্বত্ব রাজারই হওয়া উচিত। ফলতঃ ভূমিতে কাহার স্বত্ব ছিল, মনুতে স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না।

জমির উৎপন্ন শস্যের অংশ চাষী, গ্রাম-শাসনসংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও রাজা, সকলেই পাইতেন; সকলেরই জমিতে স্বত্ব ছিল। মনুর সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভূমির উর্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য, আবশ্যক হইলে তাহার চারি অংশের একাংশ লইবারও ব্যবস্থা ছিল।

শস্যবিশেষে উৎপন্নের অর্ধেক অথবা তিনভাগের দুইভাগ কৃষকেরা, তদবিশিষ্ট কর্মচারীরা পাইতেন। কৃষকদিগের মধ্যে তিন শ্রেণি ছিল :

(১) গ্রামের আদিম বাসিন্দা।

(২) স্থায়ী বা অস্থায়ী নতুন বাসিন্দা।

(৩) গ্রামান্তরের কৃষক।

এই তিন শ্রেণির লোক হইতেই খোদকস্ত ও পাইকস্ত কৃষকের উৎপত্তি হইয়াছে। অধিপতি (মাতব্বর), নিকাশনবীশ, চৌকিদার, পুরোহিত, শিক্ষক, গণক, কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার, গোরক্ষক, চিকিৎসক, গায়ক, গাথক, প্রভৃতি কর্তৃক গ্রামের শাসনসংরক্ষণ সম্পন্ন হইত।

যোগ্যতানুসারে পূর্বাধিপতির বংশধরদিগের মধ্যে কোনও না কোন ব্যক্তিকে এই পদে মনোনীত করা হইত। পুরাকালের গ্রামাধিপতিগণই জমিদারদিগের আদি।

মোসলমান শাসনসময়ে পূর্বোক্ত নিয়মগুলি পরিবর্তিত হইয়া পরগনাদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। পরগনাদারগণ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদান করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা পরগনাদারগণের নিজস্ব ছিল। কালক্রমে ঐ পরগনাদারগণই জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠেন।

জমিদারদিগের হস্তে দেওয়ানি, ফৌজদারি উভয়বিধ ক্ষমতাই ন্যস্ত ছিল।

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে রাজা তোডরমল্ল মোগল সাম্রাজ্যের যে একটি হিসাব প্রস্তুত করেন, উহা "ওয়াশীল তুমার জমা" নামে পরিচিত। ইহাতে বঙ্গদেশকে ১৮টি সরকার এবং ৬৮২ মহলে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথমে ভূমি পরিমাপ করিয়া দেশের রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "এলাকাগজ" নামক মানদন্ড প্রচলিত করেন এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে উহা পুলি, পরবতী, চেঞ্চর ও বঞ্জর এই চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তাঁহার এই বন্দোবস্ত প্রথমত এক বৎসর জন্য হয়, কিন্তু বৎসর বৎসর নতুন বন্দোবস্ত অসুবিধাজনক বোধে দশ বৎসরের মধ্যে উহার আর কোন পরিবর্তন করা হয় না।

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহসুজা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার নতুন হিসাব প্রস্তুত করেন, উহাতে

বঙ্গভূমি ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হইয়া পূর্বাপেক্ষা উহার রাজস্ব বর্ধিত হয়।

অতপর ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ কর্তৃক বঙ্গদেশের রাজস্ব আরও বর্ধিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩টি চাকলা, ৩৪টি সরকার এবং ১৬৬০ পরগনায় বিভক্ত করেন।

১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনখাঁ পুনরায় বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।

অতপর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কাশিমআলিখাঁ কর্তৃক বঙ্গদেশে পরগনাওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে জমিদারদিগের উপরই পরগনার রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পিত ছিল। তৎকালে জমির উপরে তাঁহাদিগের কোনও স্বত্ব ছিল না। রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ জমিদারগণ জমিদারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন। ভূমিতে জমিদার এবং প্রজাসাধারণের বিশেষ স্বত্ব না থাকায় ভূমির উৎকর্ষসাধনপক্ষে প্রজা বা জমিদার কেহই বিশেষ যত্ন লইতেন না।

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ দেশের শাসনভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া হেস্টিংস সাহেবকে বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য জেলায় প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত করেন এবং কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারদিগের সহিত ৫ বৎসর জন্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে প্রেরণ করেন।

উক্ত বন্দোবস্তে হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব ধার্য হওয়ায়, অনেক জমিদারের খাজনা বাকি পড়িয়া যায়। এইজন গভর্নমেন্টকে অনেক টাকা পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বৎসরের অবস্থা বুঝিয়া বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায়, রাজস্ববৃদ্ধি ভয়ে জমিদারগণ কৃষিকার্যের উন্নতি বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়েন। এই সমুদয় কারণে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দশ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে এইরূপ কথা থাকে যে, ডাইরেক্টরদিগের অনুমোদিত হইলে, উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ২২শে মার্চ ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষ দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে জমিদারেরা নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্বে ঢাকার জমিদারদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডে লিখিয়াছেন, "এখানে ধনশালী বা বিশ্বাসস্থাপনযোগ্য একটি লোকও নাই।"[১] দশশালা বন্দোবস্তের কার্য এই জেলায় ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।[২]

ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদারদিগের নানাপ্রকারের স্বত্ব ও জেলায় প্রচলিত আছে। নিম্নে ঢাকা জেলার মহাল ও জোতের একটি বিবরণ প্রদত্ত হইল।[৩]

১ম। প্রধান মহাল :

(ক) গর্ভনমেন্টের অবিক্রীত মহাল :

(১) বাজেয়াপ্তি লাখেরাজ
(২) খরিদা মহাল
(৩) পয়স্তী জমি
(৪) চর
(৫) অন্যান্য খাস মহাল

(খ) গভর্নমেন্টের করপ্রদ বন্দোবস্তী মহাল :

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল—জমিদারী, খারিজা, হুজুরি তালুক।
(২) অস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল—খাস ইজারা।

(গ) নিষ্কর মহাল :
(১) রাজস্ব-মুক্ত।
(২) দেবোদ্দেশ্যে সৃষ্ট—দেবোত্তর।
(৩) ব্রাহ্মণোদ্দেশ্যে সৃষ্ট—ব্রহ্মোত্তর।
(৪) স্বেচ্ছায় সৃষ্ট—লাখেরাজ।

২য়। অধীন মধ্য স্বত্ব :
(ক) প্রথম শ্রেণি :
(১) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের যোগ্য—
নির্দিষ্ট করপ্রদ : সামিলাত, পত্তনী, সিকিমি, মিরাস, মৃশকমী।
অনির্দিষ্ট করপ্রদ : হাওলা।
(২) বংশপরম্পরাগত হস্তান্তরের অযোগ্য :
নির্দিষ্ট করপ্রদ : বন্দোবস্তী, কায়েমী।
(৩) অস্থায়ী ও হস্তান্তরের যোগ্য—ইজারা।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণি :
(১) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের যোগ্য :
নির্দিষ্ট করপ্রদ : দরপত্তনী, দরমিরাস, নিমহাওলা।
(২) অস্থায়ী—দর ইজারা।

৩য়। করমুক্ত জোত :
(ক) ধর্মোদ্দেশ্যে সৃষ্ট —
হিন্দুগণ কর্তৃক—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর।
মোসলমানগণ কর্তৃক—চেরাগান।
(খ) সাধারণের উপকারার্থে সৃষ্ট,—
হিন্দুগণ কর্তৃক —ভোগোত্তর।
(গ) কর্মোদ্দেশ্যে সৃষ্ট,—
(১) জমিদারের অনুচরগণভোগ্য—পাইকান।
(২) ব্যক্তিগত অনুচরগণভোগ্য—নফরান, চাকরান, মহাত্রাণ।

উপরোক্ত জোত মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) খাসমহাল : গভর্নমেন্ট খাসমহালগুলির মালিক। এই মহালগুলির কতক গভর্নমেন্টের নিজ তত্ত্বাবধানে আছে এবং অবশিষ্টগুলি অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তগুলিকেই প্রকৃত খাসমহাল বলা যাইতে পারে। শেযোক্তগুলি প্রকৃতপক্ষে খাস ইজারা মাত্র।

(২) খারিজা হুজুরী তালুক এবং সামিলাত তালুক : চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়ে যে সমুদয় তালুক বিদ্যমান ছিল, তাহা খারিজা তালুক ও সামিলাত তালুক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছিল।

ঐ বন্দোবস্তের সময়ে কতকগুলি তালুক গভর্নমেন্ট কর্তৃক জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া স্বত্বাধিকারীগণের সহিত একা এক বন্দোবস্ত হয়। তাহারা নিজেই গভর্নমেন্টের কর দিতে থাকেন। তৌজিতেও ঐ সকল তালুকের পৃথক নম্বর ধার্য হয়। এই প্রকার তালুকই খারিজা বা হুজুরি তালুক নামে উক্ত।

দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সমুদয় তালুকদার, জমিদারের অধীনে থাকিয়া কর আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের তালুক এবং কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি ও ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, এই সময়ের মধ্যে প্রদত্ত একশত বিঘার অনধিক যে সমুদয়

নিষ্করভূমি গভর্নমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া জমিদারীর সামিল হইয়াছে, তাহাই সামিলাত তালুক নামে পরিচিত।

(৩) বাজেয়াপ্তি তালুক : দেওয়ানি প্রাপ্তির পরে এবং ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পূর্বে প্রদত্ত একশত বিঘার অধিক যে নিষ্কর ভূমি গভর্নমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া কালেক্টরী তৌজিভুক্ত ও নম্বরযুক্ত হইয়াছে এবং যাহার রাজস্ব গভর্নমেন্টকে দিতে হয়, তাহা বাজেয়াপ্তি তালুক বলিয়া অভিহিত।

(৪) রাজস্বমুক্ত মহাল দুই শ্রেণিতে বিভক্ত : (ক) যে সমুদয় মহাল আইনানুসারে রাজস্বমুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। (খ) বাদশাহী ও জমিদারী সনন্দক্রমে প্রাপ্ত যে সমুদয় নিষ্কর মহাল ১৭৯৩।১৯ রেগুলেশন দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত যে সমুদয় ভূমি চূড়ান্তরূপে নিষ্কর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা লাখেরাজ নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত প্রাপ্তির পরের এবং ১৭৯০। ১লা ডিসেম্বর পূর্বকার, যে সমস্ত নিষ্কর গভর্নমেন্টের (সহিত মোকদ্দমায়) সিদ্ধ, তাহাই সিদ্ধনিষ্কর বলিয়া পরিচিত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত নিষ্কর দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বে দখলে আইসে নাই,—আসিলেও ঐ সময়ে যাহার উপর গভর্নমেন্ট কর্তৃক কর ধার্য হইয়াছে, তৎসমুদয় "খেরাজ" বা "মালের জমি" বলিয়া গণ্য। অন্যান্য সর্বপ্রকার খুচরা নিষ্কর ভূমি জমিদারী ও তালুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ঐ সমুদয় খুচরা লাখেরাজও এক একটি মহাল বলিয়া গণ্য।

বাদশাহী সনন্দক্রমে প্রাপ্ত নিষ্কর (আলতামগা, জায়গির, আয়মা, মদৎমাস) প্রভৃতিও পূর্বোক্তরূপে সিদ্ধাসিদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিষ্কর ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। যথা—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ, নফরান, চাকরান, ভোগোত্তর (ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালনার্থে সৃষ্ট) পিরান, চেরাগান, (মস্‌জিদের আলো দিবার জন্য)।

(৫) পত্তনী, দরপত্তনী : জমিদার তাঁহার জমিদারী কি তাহার অংশ, এবং তালুক কি তাহার কোন অংশ, দানবিক্রয় ও পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের স্বত্ব অর্পণে লভ্য রাখিয়া নির্দিষ্ট বার্ষিক খাজনায় কাহারও সহিত চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিলে তাহাকে পত্তনীতালুক বলে। ১৮১৯।৮ ধারামতে ইহার বিধান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির পত্তনী দরপত্তনী বলিয়া পরিচিত। অর্থাৎ পত্তনীদার তাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্বোক্ত নিয়মে বন্দোবস্ত করিলে তাহাকে দরপত্তনী বলে।"

(৬) সিকিম তালুক : পঞ্চসনা বন্দোবস্তের সময়ে পরগনার তালুকদারগণ যে সমুদয় তালুকের জমাজমির হিসাব জেলা কালেক্টরের নিকটে দাখিল করেন নাই, তাহা গভর্নমেন্টের তৌজীভুক্ত হয় নাই; উহা জমিদারেরই অধীন থাকিয়া যায়। এতৎসমুদয়ই সিকিমি তালুক বলিয়া পরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে সমুদয় সিকিমির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী এবং উহা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া গণ্য। উহার রাজস্বও অপরিবর্তনীয়।

(৭) মিরাস : প্রায় সিকিমির ন্যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণির মিরাসের নাম দরমিরাস।

মৌরসী দুই প্রকার, যথা—(ক) কায়েমী, (খ) কায়েমী মকররী।

(ক) বংশানুক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ পরিবর্তনীয় হারে বা খাজনায় যে বেমেয়াদি বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম কায়েমী মৌরসী।

(খ) অপরিবর্তনীয় হারে বা খাজনায় চিরকালের জন্য পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ যে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম কায়েমী মকররী মৌরসী।

মৌরসীদার তাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্বোক্ত নিয়মে বন্দোবস্ত করিলে, তাহাকে দরমৌরসী বলে।

(৮) হাওলা : অধীন তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র তালুকের নাম হাওলা তালুক। হাওলার অধীন তালুক "নিমহাওলা"। হাওলার স্বত্ব ও ধার্য রাজস্ব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। নিমহাওলার স্বত্ব দলিল অনুযায়ী হইয়া থাকে।

জঙ্গল আবাদের জন্য যে হাওলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার খাজনার কম বেশি হইতে পারে।

(৯) বন্দোবস্তী : জমিদারের নিকট হইতে গৃহাদি নির্মাণজন্য কোনও জমি গ্রহণ করিলে, অথবা সাধারণ প্রজা পুষ্করিণী প্রভৃতি খননজন্য জমি লইলে, কিংবা জঙ্গল আবাদজন্য জমি প্রদত্ত হইলে, উহা বন্দোবস্তী জমি বলিয়া পরিচিত। ইহার স্বত্ব বংশানুক্রমিক স্থায়ী হইলেও, ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য। দলিলের লিখিত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে এই জমি ব্যবহৃত হইলে জমিদার ইহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন।

ভাওয়ালের জমিদারের অধীনে "জঙ্গলবুড়ি" তালুক আছে। জঙ্গল আবাদ করিবার শর্তে যে তালুক গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম জঙ্গল বুড়ি তালুক।[৫]

(১০) মুশকমী : জমিদারের অব্যবহিত অধীনে নির্দিষ্ট জমায় যে মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মুশকমী বলিয়া পরিচিত। বংশানুক্রমে স্থায়ী হইলেও ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য।

(১১) ভোগোত্তর : বংশানুক্রমিক হইলেও ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য।

জেলার দক্ষিণাংশে গোগ্রাসের জমি নাই। ভাওয়াল অঞ্চলে এখনও অনেক গোগ্রাসের জমি আছে।

বাঘমারা : এতদঞ্চলের কোনও স্থান ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাব থাকায় ব্যাঘ্রশিকার জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর হইয়াছিল। ঐ সমুদয় ভূমি "বাঘমারা" তালুক নামে অভিহিত হইত। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ঐ সমুদয় তালুক বাজেয়াপ্ত করেন।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণির প্রজা এই জেলায় বর্তমান আছে।

(ক) উঠবন্দী বা ইচ্ছাধীন প্রজা : পদ্মা, যমুনা ও ধলেশ্বরীর দিয়ারা অথবা নতুন উদ্ভুত চরাজমির চাষী প্রজা এই শ্রেণিভুক্ত।

(খ) মকররী রাইয়ত : যাহাদের খাজনা বা খাজনার হার নির্দিষ্ট থাকে, তাহাদিগকে মকররী রাইয়ত কহে। জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মুন্সিগঞ্জ মহকুমাতেই এই শ্রেণির প্রজা অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণির প্রজার সংখ্যানুসারে ইহাদিগের সংখ্যা অল্প।

(গ) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত : যে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমিতে দখলি স্বত্ব আছে তাহাকে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কহে।

কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের জমি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল রাইয়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তাহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মে। এক গ্রামের একখণ্ড জমি ২ বৎসর, একখণ্ড ৪ বৎসর, একখণ্ড ৬ বৎসর, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দখল দ্বারা দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলেও ঐ সমস্ত জমিতে দখলি স্বত্ব জন্মে। দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে স্থিতিবান রাইয়ত বলা যায়। পূর্বে যাহারা খোদকস্ত রাইয়ত বলিয়া অভিহিত হইত, বর্তমান খাজনার আইনে তাহাকে স্থিতিবান বলা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্থিতিবান প্রজাকে নিজ গ্রামের কোন একখণ্ড জমি দ্বাদশ বৎসর কাল ভোগ করা আবশ্যক। খোদকস্ত প্রজাসম্বন্ধে ঐ নিয়ম নাই। খোদকস্ত রাইয়ত হইলে দুইটি বিষয় আবশ্যক : (১) এক গ্রামে বাস করা ও (২) সেই গ্রামের অন্তর্গত জমি ভোগ করা। ইহা ভিন্ন দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে রাইয়তদিগকে পাইকস্ত নামে আরও এক শ্রেণিতে বিভাগ করা হইত।[৬]

পূর্বোক্তরূপে যাহার দখলি স্বত্ব বর্তে নাই, তাহাকে দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত বলে।

বর্গাহিসাবে জমি বন্দোবস্ত করিবার প্রথা এই জেলায় প্রবর্তিত আছে। এই প্রথানুযায়ী মালিকের খামার জমি চাষ করিয়া প্রজা যে ফসল অর্জন করে, তাহার অর্ধাংশ মালিককে

প্রদান করে। বীজের খরচ ক্ষেত্রস্বামী দিয়া থাকেন। এই প্রথা আধিবর্গা নামে পরিচিত। যে ফসলে আধিদারকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, সেই সকল ফসলে প্রজা দুই ভাগ রাখে এবং ভূম্যধিকারী এক ভাগ পান। এইরূপ বন্দোবস্ত তেভাগী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ভূম্যধিকারী ন্যায্য খরচ বহন করিলে প্রজা অর্ধাংশে পাইয়া থাকে।

খাজনার আইন অনুসারে জেলার শতকরা প্রায় ৯০ জন প্রজারই দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছে।

(ঘ) অধীন রাইয়ত বা কোর্ফাপ্রজা : রাইয়তের অব্যবহিত অধীন বা তদধীন রাইয়তকে কোর্ফাপ্রজা বলে। কোর্ফা প্রজার সংখ্যা এই জেলায় কম।

দখলিস্বত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা—

(১) জোত স্বত্ব হস্তান্তরিত করা : এই জেলার প্রজাগণের দানবিক্রয়দ্বারা জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিবার অধিকার নাই। প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে এবম্বিধ প্রথা এই জেলায় প্রচলিত ছিল না। আইন প্রণয়নের পরে ঐরূপে কোনও কোনও জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করা হইলেও উহা জমিদারগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

(২) ফলবান বৃক্ষের ছেদন : ফলবান ও মূল্যবান বৃক্ষের ছেদন করিবার ক্ষমতাও ঢাকাজেলার প্রজাগণের নাই। উহা করিতে হইলে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্য।

খাজনার হার :

জমির রকম অনুসারে জমা ধার্য হইয়া থাকে। জেলার বিভিন্ন অংশে একই প্রকার জমির খাজনার হারেরও তারতম্য আছে। ঢাকা শহরের সমীপবর্তী স্থানসমূহে এবং মুন্সিগঞ্জ মহকুমার এই হার সর্বাপেক্ষা কম। মধুপুর বনাঞ্চলে খাজনার হার কম নহে। জমির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কর ধার্য হইয়া থাকে। অবস্থান (শহর, বন্দর এবং নদীর নিকটবর্তিতা), মৃত্তিকার রকম (ফসল উৎপাদনের উপযোগিতা), ফলবান বৃক্ষাদির সংখ্যা, ভিটি জমির উচ্চতা প্রভৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

সাধারণত বঙ্গের অন্যান্য প্রায় সমুদয় জেলা অপেক্ষাই এই জেলায় খাজনার নিরেখ কম।

দশশালা বন্দোবস্তসময়ে এই জেলার অনেক স্থান জঙ্গলময় এবং ঝিলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঢাকা জালালপুরের অনেক স্থানেই বহুসংখ্যক ঝিল বা জলাভূমি ছিল। এক্ষণে ঐ সমুদয় স্থান মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ অঞ্চলস্থিত জমির খাজনার নিরেখ কম করিয়া ধরা হইয়াছিল।

জেলার বিভিন্ন অংশে খাজনার হার

স্থানের নাম	বিঘা প্রতি খাজনার হার
১। ঢাকার সন্নিকটে	৬ টাকা
২। মিরপুর (বোরো জমি)	২ হইতে ৪ টাকা ৮ আনা
৩। রামপাল	৩ টাকা
৪। কাশিমপুর পরগনা	২ হইতে ২ টাকা ৮ আনা
৫। ভাওয়াল পরগনা	
ক) ভিটি—	
(১) বাস্তু জমি—	
(২) পালান অর্থাৎ রাইয়তের কুটীরের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান, যেখানে কলা, কাঁটাল, আম্র প্রভৃতি জন্মে—	৮ আনা হইতে ১ টাকা ৪ আনা
(৩) ছোলা অর্থাৎ পালান জমির চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থান, যথায় সরিষা, পাট, করলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়—	১২ আনা হইতে ১ টাকা ৮ আনা

(৪) ছাট পালান অর্থাৎ, বাস্তুজমির নিকটবর্তী
পশ্বাদি চড়াইবার স্থান—৪ আনা হইতে ১২ আনা

(খ) নাল—

(১) বর্ষার অর্থাৎ জলপ্লাবনে নিমজ্জমান ভূমি—
পুরদার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি—১ টাকা ২ আনা হইতে ১ টাকা ৪ আনা
কামদার অর্থাৎ ২য় শ্রেণি—১টাকা হইতে ১টাকা ৪ আনা।
সেদার অর্থাৎ ৩য় শ্রেণি—১২ আনা হইতে ১ টাকা।

(২) খামা অর্থাৎ যে জমিতে বর্ষাকালে বর্ষার জমি অপেক্ষা কম জল উঠে।
পুরদার অর্থাৎ ১ম শ্রেণি— ১টাকা ৪ আনা।
কামদার অর্থাৎ ২য় শ্রেণি— ১ টাকা।
সেদার অর্থাৎ ৩য় শ্রেণি—১১ আনা হইতে ১৪ আনা।

(৩) ততি অর্থাৎ খামা অপেক্ষা উচ্চতর ভূমি—
পুরদার অর্থাৎ ১ম শ্রেণি—১ টাকা
কামদার অর্থাৎ ২য় শ্রেণি—১২ আনা হইতে ১৪ আনা।
সেদার অর্থাৎ ৩য় শ্রেণি—১০ আনা

(৪) রোয়চা অর্থাৎ উচ্চভূমি—
এই জমি বর্ষার প্লাবনে নিমগ্ন হয় না;
কিছু বৃষ্টি হইয়া জল জমিলে তথায়
ধান্য রোয়া হয়।
পুরদার অর্থাৎ ১ম শ্রেণি—১ টাঃ ৪ আঃ হইতে ২টাঃ ৮ আনা।
কামদার অর্থাৎ ২য় শ্রেণি—১৪ আঃ হইতে ১টাঃ ২ আনা।
সেদার ৩য় শ্রেণি—১২ আনা হইতে ১ টাকা।

(৫) আউস—১৪ আনা ১ টাকা ২ আনা

(৬) বোরো—১২ আনা হইতে ১ টাকা।

৬। কালীগঞ্জ — ১০ আনা হইতে ১ টাকা ৮ আনা
৭। বন্দখোলা — ১ টাকা ১২ আনা।
৮। বাগিয়া — ১২ আনা — ১ টাকা ৮ আনা।
৯। কাওরাইদ — ৮ আনা — ১ টাকা ৮ আনা।
১০। টোক — ১২ আনা — ২ টাকা।
১১। আরালিয়া — ১ টাঃ ২ আনা — ২ টাকা ৪ আনা।
১২। উজিলার — ১ টাকা — ১ টাকা ৮ আনা।
১৩। নরসিংদী — ৯ আনা — ১ টাকা।
১৪। দুনিগাও — ১ টাকা ৪ আনা।
১৫। তেওতা — ৮ আনা।
১৬। মাণিকগঞ্জ — ৭ আনা — ৮ আনা।
১৭। কালিয়াকৈর — ১ টাকা ২ আনা—১ টাঃ ১০ আনা।
১৮। বাঘের — ৮ আনা ১০ গণ্ডা — ১০ আনা ১০ গণ্ডা।
১৯। পটালি (মুন্সিগঞ্জ) — ১ টাকা ৮ আনা — ৪ টাকা।
২০। বারৈখালি — ১ টাকা ৮ আনা — ৩ টাকা

ভূমির স্থানীয় মাপ :

এই জেলায় ভূমির পরিমাপ সর্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে দ্রোণ, কোনও স্থানে খাদা, কোনও স্থানে বিঘার মাপে জমির পরিমাপ হইয়া থাকে। "কাশুরী" (কাঁচি) ও "শাহী" (পাকি) মাপভেদে জেলার কোন কোন স্থানে দুই প্রকার মাপ প্রচলিত আছে। কাঁচি বা কাশুরী মাপে জমির খাজনার হিসাব এবং শাহী বা পাকি মাপে জমির ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভূমির পরিমাপ সর্বত্রই নলদ্বারা হয়। এই নলের পরিমাণও সকল স্থানে একরূপ নহে। দ্রোণের মাপের নল ৭ হাত হইতে ৯ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ। এই নলের ২৪ নল দীর্ঘ × ২০ নল প্রস্থ = ১ কানি। খাদার মাপের নল ৬ হাত হইতে ৮ হাত দীর্ঘ। এই নলের ৬ নল দীর্ঘ × ৫ নল প্রস্থ = ১ পাখি।

দ্রোণের মাপের হিসাব :

৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া।
৪ কড়ায়	১ গন্ডা।
৫ গণ্ডায়	১ কুণি।
৪ কুণিতে বা ২০ গণ্ডায়	১ কানি।
১৬ কানিতে	১ দ্রোণ।

খাদার মাপ :

৪ কাগে	১ কড়া।
৪ কড়ায়	১ গণ্ডা।
৭১/২ গণ্ডায়	১ পাখী।
১৬ পাখীতে	১ খাদা

বিঘার মাপ :

৪ কড়ায়	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায়	১ ধারা
২০ ধারায়	১ কাঠা
২০ কাঠায়	১ বিঘা।

এই বিঘার সহিত গভর্নমেণ্টে প্রচলিত বিঘার কোনও সামঞ্জস্য নাই।

---

১. "There was not a man of wealth or credit among them at the time".

২. Mr. A C Sen's Report of Land Tenures & C.

৩. List of the estate and tenures existing in the district, arranged in the way proposed. by Mr. O'Donnel for the revised edition of Dr. Hunter's Statistical Account of Bengal. mentioned by Mr. A. C. Sen.

৪. পত্তনী বন্দোবস্ত সর্বপ্রথমে বর্ধমানের রাজার জমিদারীতে সৃষ্ট হয় ; পরে অন্যান্য জমিদারীতে প্রচলিত হইয়াছে।

৫. মোগল শাসন সময়ের প্রারম্ভে জেলার উত্তরাংশস্থিত অনেকানেক জমি জঙ্গল আবাদের জন্য নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে ডেপুটি গভর্নরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। Vide Taylor's Topography of Dacca. P. 122-23.

৬. কেহ এক গ্রামে বাস করিয়া অন্য গ্রামের জমি ভোগ করিলে তাহাকে পাইকস্ত রাইয়ত বলা হইত। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত প্রথা রহিত হইয়া যায়। রাইয়তি স্বত্ব, জোত স্বত্ব ও ম্যাদি স্বত্ব ভেদে বর্তমান সময়ে এই জেলায় চাষের স্বত্ব ত্রিবিধ।

একবিংশ অধ্যায়
তীর্থস্থান

লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট :
কথিত আছে, ভগবান জামদগ্ন্য মাতৃবধজনিত পাপবিমোচনার্থে পিতার উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে স্নান করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীতললাক্ষ্যার সহিত এই নদের সংযোগ সাধন করিয়া ইহাকে তীর্থরাজরূপে জগতে শ্রেষ্ঠ করিবেন, এরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতললাক্ষ্যার দর্শনাভিলাষে গমন করেন। এদিকে শীতললাক্ষ্যা আগন্তুকের আগমনশ্রবণে বৃদ্ধাবেশে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই সহসা বলিলেন, "মাতঃ! শীতললাক্ষ্যা কত দূরে"? বৃদ্ধ বলিলেন, "আমারই নাম শীতললাক্ষ্যা; আমি আপনার ভীষণ রবে ভীতা হইয়া বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম।" অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মপুত্র লাঙ্গলবন্ধে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে পরশুরাম এসমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মপুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তৎপর ব্রহ্মপুত্র অনেক অনুনয় বিনয় করায় জামদগ্ন্য প্রসন্ন হইয়া এই বলিলেন যে, প্রত্যহ তীর্থরাজ না হইয়া বৎসরের মধ্যে এক অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ হইবে। তদ্ব্যতীত গঙ্গায় অবগাহন করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয় হয়, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে স্নান করিলেও তাহাই হইবে।[২]।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে :

"চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রমতমানসঃ।।
স্নাতি লৌহিত্যতোয়ে তু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ"।।

কালিকাপুরাণম্ ত্র্যশীততমোহধ্যায়ঃ।

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, "পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে বৃষলগ্নে ব্রহ্মপুত্রনদের জলে স্নান করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী বা সাগর আছে তাহারা সকলেই ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে আসে।" স্নানের মন্ত্র যথা :

"পৃথিবীব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।।
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনো কুলনন্দনঃ।
অমোঘা গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।।"

তিথিতত্ত্ব

প্রতি বৎসর বহু দূরদেশান্তর হইতে অসখ্য হিন্দু নরনারী লাঙ্গলবন্ধে সমাগত হইয়া অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন। অনেকে আবার তৎপর দিবস এই স্থানে রামনবমীর স্নানও করেন।

ব্রহ্মপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্ধ এই সময়ে একমাসকাল পর্যন্ত অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থবাসও করিয়া থাকেন।

লাঙ্গলবন্ধের জয়কালী জাগ্রত দেবতা।

লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটেও বাসন্তী অষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করিবার জন্য অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। কথিত আছে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে লৌহিত্যতীর্থ সন্দর্শনার্থে এখানে আগমন করেন। তাঁহারা যে স্থানে স্নান ও তর্পণাদি করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চপাণ্ডবের এতদঞ্চলে আগমনের স্মৃতিস্বরূপ পঞ্চমীঘাট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আজও যাত্রীগণ আগমনপূর্বক তত্তৎস্নান দর্শন ও তথায় স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকে। বস্তুত লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটও পবিত্র তীর্থস্নান।

শিমুলিয়া তীর্থঘাট :

বংশী নদীর তীরবর্তী শিমুলিয়া গ্রামে একটি তীর্থঘাট আছে, তথায় অশোকাষ্টমী উপলক্ষে বহু নরনারী সমবেত হইয়া তীর্থস্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে। কথিত আছে, ভক্ত রামজীবন দ্বিজপঞ্চকের শাহায্যে ঁযশোমাধব বিগ্রহ আনয়ন করিবার সময়ে এই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঁযশোমাধবের স্নানকার্য ও অর্চনাদি সমাধা করিয়াছিলেন। ঁযশোমাধবের সংশ্রবহেতু এই স্নান তদবধি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই অতীত স্মৃতিটুকু একটি মেলার অধিবেশন দ্বারা অদ্যাপি জনসাধারণের নিকটে জাগরূক রহিয়াছে। আজ পর্যন্তও প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর স্নান উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা জমিয়া থাকে।

হীরা নদীতীর্থ :

কেইলা ও জয়পুরার মধ্যবর্তী হীরা নদীতে চৈত্রবারুণী উপলক্ষে বহু হিন্দু নরনারী তীর্থস্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে। ধামরাই অঞ্চলে এই তীর্থস্নান উপলক্ষে যে একটি সংস্কৃতবাঙ্গালামিশ্রিত বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।[৩] বৃদ্ধাদিগের উদ্দেশ্যে আজও ঐ অঞ্চলে উহা প্রয়োগ করা হয়।

"কেইলা জয়পুরা মধ্যে, হীরা নদী তীর্থং।
দে বুড়ী ডুব দে পাঁচ গণ্ডা কড়িদে।
* * * * * লড় দে"।।

কাউয়ামারা স্নান :

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে তীর্থ স্নান করিবার জন্য নানাস্থান হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। স্নান উপলক্ষে এখানে একটি মেলারও অধিবেশন হয়। ইহাও একটি তীর্থস্থান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কাউয়ামারা ও রাজনগর এই গ্রামদ্বয় ভেদ করিবার যে পয়ঃপ্রণালি প্রবাহিত হইয়াছে, তথায়ই এই স্নানানুষ্ঠানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুসাগাড়ার বারুণীস্নান :

বুড়িগঙ্গাতীরবর্তী বাছিলা নামক স্থানে মাঘী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ঢাকা অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দুনরনারী তীর্থস্নান করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকে। ইহা "কুশাগাড়ার বান্নি" (বারুণী) বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। প্রবাদ এই যে অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে মুনিপঞ্চক সমাগত হইয়া অতি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তপস্যান্তে উহারা এই স্থানে "কুশা" গাড়িয়া (পুতিয়া) রাখিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "কুশাগাড়ার বান্নি" নামে অভিহিত হইয়াছে।

বুতুনীর বারুণীস্নান :

বুতুনী গ্রামের নিকটবর্তী ক্ষীরাই নদীতে বারুণীগঙ্গাস্নান উপলক্ষে বিস্তর লোকসমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে ক্ষীরাই নদীতে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

গঙ্গাসাগর দীঘি :

বারভূঞার অন্যতম ভূঞা খিজিরপুরের ঈশাখাঁমসনদআলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লিশ্বর আকবর কর্তৃক মহারাজ মানসিংহ পূর্ববঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময়ে ঢাকাতে মোগলরাজের একটি থানা মাত্র সংস্থাপিত ছিল। মহারাজ মানসিংহ বিপুল বাহিনীসহ ঢাকাতে উপনীত হইয়া ডেমরা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং ঢাকার উত্তর-পূর্বদিকে কমলাপুর নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহাতে বারতীর্থের জলনিক্ষেপকরত উহাকে "গঙ্গাসাগর" নাম প্রদান করেন। মহারাজ মানের অবস্থানহেতু এই স্থান রাজারবাগ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তীর্থজ্ঞানে এখনও অসংখ্য হিন্দু নরনারী এই দীর্ঘিকায় মাঘীপূর্ণিমায়, মাঘীসপ্তমীতে ও অষ্টমী তিথিতে স্নান করিয়া থাকে। এই সময়ে এখানে মেলা জমিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে এই দীর্ঘিকাটির প্রায় তৃতীয়াংশ তাড়াদামে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বতীরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দক্ষিণতীরবর্তী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে বহু নরনারী মানস করিয়া চাঁচর প্রদান করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ইছামতী নদীরতীরবর্তী তীর্থঘাট, আগলা, সোলপুর, বারুণীঘাট এবং যোগিনীঘাট নামক পঞ্চ তীর্থঘাটেও কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে অসংখ্য হিন্দুনরনারী অবগাহন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে।

১. কেহ কেহ বলেন যাদববংশাবতংস মহানুভব বলরাম তীর্থ পর্যটনকালে পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্রনদে অবগাহন করিয়া, ইহাকে লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার জন্য স্বীয় লাঙ্গলদ্বারা এইস্থান পর্যন্ত আনয়ন করেন। এখানে তদীয় লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এই স্থান লাঙ্গলবন্ধ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২. "লৌহিত্যে পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহ্নবী"।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
প্রাচীন কীর্তি

লালবাগের কেল্লা, ও বিবি পরির সমাধি :

লালবাগের কেল্লাকে কেহ কেহ আরঙ্গাবাদের কেল্লা বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন।[১] যে স্থানে এই কেল্লাটি অবস্থিত তাহার নাম ঔরঙ্গাবাদ বা আরঙ্গাবাদ। দিল্লিশ্বর ঔরঙ্গজেবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ঔরঙ্গবাদ বা আরঙ্গাবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। কেল্লাটি নগরীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া বুড়িগঙ্গা বালুকাস্তুপমণ্ডিত বিশাল চর বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুমন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে বুড়িগঙ্গা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাওয়ায় নদীটি কেল্লা হইতে প্রায় সিকি মাইল ব্যবধানে পড়িয়াছে। দ্বিশতাব্দী পূর্বে কেল্লাটি এরূপভাবে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইত যেন উহার মূলভাগ নদীগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। বস্তুত দক্ষিণদিকের কতকাংশ কালক্রমে বুড়িগঙ্গার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে নদীপ্রবাহ এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে সরিয়া পড়ে।[২]

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন "দুর্গের বহির্ভাগ, কয়েকটি তোরণদ্বার, দরবার প্রকোষ্ঠ এবং স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অতীত গৌরবের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিল। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের পর হইতেই ধ্বংসের কার্য অধিক মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে।[৩]

এক্ষণে দুর্গের একেবারে ধ্বংসাবস্থা, কোনও প্রকারে কয়েকটি তোরণদ্বার ও কতিপয় স্তম্ভ অচিরে কালের কবলে পতিত হইবার জন্যই যেন ভগ্নচূড় হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোনও স্থানে অট্টালিকার নিম্নতল পাতালোদ্দেশে গমন করিয়া চর্মচটিকা ও অজগরের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বর্তমান সময়ে গভর্নমেন্ট তদুপরি একটি পোলিস সেকসন স্থাপিত করিয়াছেন।

দুর্গের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ২০০০ × ৮০০ ফুট ; দুর্গাভ্যন্তরে ২৩৫ ফুট সমচতুষ্কোণাকার একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর চারি ধার ইষ্টকনির্মিত পোস্তায় বাঁধান; ইহার প্রত্যেক কৌণেকদেশ হইতে দুই দুইটি ঘাট পুকুরে তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। এই পুকুরটির ২৭৫ ফুট পশ্চিমে যে সুন্দর একটি মকবেরা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, তাহাই নবাবনন্দিনী পরিবিবির সমাধি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আাছে।[৪] এই মকবেরাটি পঞ্চগুম্বজপরিশোভিত এবং নব কক্ষে বিভক্ত। মধ্যের গুম্বজটি তাম্রপাতবিমণ্ডিত বলিয়া সূর্যকিরণসংস্পর্শে ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। মসজিদের ঠিক মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠমধ্যে বিবি পরির সমাধি সুরক্ষিত। এই প্রকোষ্ঠটি ১৯ ১/৪ ফুট সমচতুষ্কোণাকার। এই প্রকোষ্ঠের চারি কোণে চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠ চতুষ্টয় (১০' - ৮" ১/২) সমচতুষ্কোণাকার। কেন্দ্রস্থ বৃহত্তম প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে (২৪' - ৮" ১/২) দৈর্ঘ্য ও (১০' - ৮" ১/২) প্রস্থবিশিষ্ট চারিটি বারান্দা আছে। এই শেষোক্ত কক্ষচতুষ্টয় এবং কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশেই পঞ্চ গুম্বজ শোভা পাইতেছে।

মকবেরাটির ছাদের নির্মাণকৌশলে একটু বিশেষত্ব আছে, ইহা অষ্টকোণসমন্বিত পিরামিডের ন্যায় গ্রথিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগুলি ১৯ ফুট ১১ ইঞ্চি

পর্যন্ত উচ্চতা লাভ করিয়াছে। পিরামিডের বহির্ভাগে ১০ ফুট ব্যাসসমন্বিত অষ্টকোণাকার ক্ষুদ্র গুম্বজ মকবেরার শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলির ছাদও এইরূপেই নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের প্রাচীরগুলি ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া সপ্তসংখ্যক সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড মস্তকে বহনপূর্বক ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চতা লাভ করিয়াছে।

ছাদের এবম্বিধ নির্মাণকৌশল প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের অনুরূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন।[৫]

ভিত্তিগাত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মর্মর প্রস্তরের নানাপ্রকার কারুকার্য পরিলক্ষিত হয়। দেওয়ালে শ্বেত প্রস্তরের নয়নলোভন আড়ম্বরহীন বাদশাহী আমলের স্থাপত্যকালের আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোণসংস্থিত প্রকোষ্ঠচতুষ্টয়ের দেওয়ালে পীতবর্ণ ভূমির উপর নীল, সবুজ, রক্তিম ও হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা হইয়াছে এবং প্রান্তভাগে লতাপুষ্পাদি অঙ্কিত বিবিধ কারুকার্য দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিতে সমর্থ হয়।

সমাধির প্রস্তরখণ্ডগুলির কোনও কোনও স্থান ভগ্ন হইয়াছে। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর এবং ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, লোকেল কমিটির সেক্রেটারি, ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি, এইচ, কুপার সাহেবের নিকট এই বিষয়ে যে দুইখানা লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ছোট-কাটরাণীবাসী আলোয়ার খাঁন কর্তৃক এই কার্য সমাধা হয়। মজহরআলি খাঁনের সহিত এই মকবেরার স্বত্ব লইয়া উহার যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই আলোয়ার খাঁন এই কার্য করিয়াছিলেন।

মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উহাকে একটি শান্তির আগার বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বস্থ দেওয়ালে যে তিনখানা শ্বেত প্রস্তরবিনির্মিত গবাক্ষ আছে তাহার কারুকার্য অতি চমৎকার। প্রত্যেকটি গবাক্ষ দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও প্রস্থে ৩ ফুট হইবে। ইহার নির্মাণজন্য চুনার হইতে বিভিন্ন প্রস্তরাদি, গয়া হইতে সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ও জয়পুর হইতে শ্বেতমর্মরপ্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে কোনও কোনও স্থানে শ্বেত মর্মরপ্রস্তরখণ্ডগুলি উৎপাটিত, স্থানে স্থানে বিকৃত, স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার কোথাও বা আসল প্রস্তরের স্থানে কৃত্রিম প্রস্তরও বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। এমন কি সমাধির শ্বেত প্রস্তরও কোনও কোনও স্থানে ভগ্ন করা হইয়াছে। চন্দনকাষ্ঠনির্মিত বিবিধ কারুকার্যসমন্বিত কবাটগুলিও কিন্তু শিল্পীগণের করপ্রসূত।[৬]

সমাধির সন্নিকটস্থ প্রস্তরফলকে তুগ্রা আরবি (Tugra Arabic) অক্ষরে একটি কবিতা লিখিত আছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রশংসাবাদেই শিলালিপিখানি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কবিতাটি পাঠ করিলেই উহা আংশিক বলিয়া বিবেচিত হয়। শিলাখণ্ডের অপরার্ধ যে কোথায় তাহা জানা যায় না। নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত আছে।

> "আহ্ ছেন্‌তো আয়ে সাহেন্ শাহে আফাখ্ রোখ্‌নে দিন্
> কো ওয়াবেহে মালেকে সিন্দ্‌ভো হেন্দো চিন্।।
> সাহেন্ সাহে ইয়ে মুল্‌ক্ বাতাইদে আস্‌মান।
> কোরা রসিদ আজ্ পেদেরো যদ্ দরি জেমিন্।।
> ওয়ানি সোদেস্তে রুই তামামি এমুলক্‌রা।
> আজ্ হোস্‌নে আ-হ্ দে খিস্ চোরখ্ ছার হুরেইন।।
> দার আহ্‌দে মুল্‌কো সলতানাতে ইর্চুনি সাহে।
> দানায়ে আর জামানা হামি গোয়েদ্ আফেরি * * *।"

"হে পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর এবং দীন ধর্মের রক্ষক, যিনি সিন্ধু প্রদেশ, হিন্দুস্থান ও

চিনদেশের বংশানুক্রমিক অধিপতি, ঈশ্বরানুগ্রহে পিতৃপিতামহ হইতে দেশের শাসনভার যাহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, যিনি অপ্সরাকূলের বদনানুরূপ শাসনদ্বারা নিখিল প্রাণীবৃন্দের অধিরাজ হইয়াছেন আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। এ হেন নৃপতির এবম্বিধ শাসনে সমুদয় প্রদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিই তোমার স্তুতিবাদ করিতেছে * * * *

যে সময়ে মোসলমানকুলধুরন্ধর অমিততেজা ঔরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বঙ্গের ভাগ্যবিধাতৃরূপে অল্পকালের জন্য ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিবার অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয় আজিম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে লালবাগের কেল্লা ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তদীয় শাসনসময়মধ্যে তিনি উহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্রাটতনয়ের পরে নবাব সায়েস্তা খাঁর হস্তে বঙ্গের শাসনভার দ্বিতীয়বার অর্পিত হয়। তিনি সম্রাটকুমার কর্তৃক আরব্ধ অসম্পূর্ণ দুর্গটিকে সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশত তদীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা দুহিতা বিবিপাইরী[১]। এই সময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়। আমির-উল-ওমরা সায়েস্তাখাঁর নিকটে তদীয় দুহিতার তীব্র শোকজ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বড় সাধ করিয়া অদম্য উৎসাহে দুর্গের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্নিবার কাল ওমরার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে দিল না। প্রবল শোকবন্যায় উৎশাহ উদ্যম একেবারে ভাসিয়া গেল। বিশেষত দুহিতার অকালমৃত্যুতে তাঁহার মনে এক সংস্কারের সৃষ্টি হইল যে লালবাগের কেল্লায় আর হস্তক্ষেপ অথবা সুসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইলে যেন তাহার পক্ষে শুভজনক হইবে না। যতদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তদীয় বীরহৃদয় হইতে এই সংস্কার আর দূরীভূত হইল না। বস্তুত একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতার শোকই দুর্গনির্মাণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। স্বীয় দুহিতার শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তদীয় মকবেরার একটি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করিয়া আমি-উল-উমরা তদীয় দুহিতার মৃত্যুজনিত শোকের যেন কিঞ্চিৎ লাঘবতা অনুভব করিয়াছিলেন। এক সময়ে এই মসজিদটি পূর্ববঙ্গের নয়নাভিরাম দর্শনীয় বস্তুমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বিবি পইরীকে সম্রাটতনয় সুলতান মহম্মদ আজিমের পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা ভুল। আমরা সায়েস্তাখাঁর বংশীয় ছোট-কাটরাণীবাসী রামজানআলি খাঁর নিকট এক সময়ে এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উহা অস্বীকার করেন।

লালবাগের কেল্লা ও তৎপার্শ্ববর্তী বিস্তৃর্ণ ভূমিখণ্ড সায়েস্তখাঁর জায়গির মধ্যে ছিল। ১৮৪৪ সনে ইংরেজ গভর্নমেন্টের সুবিধার জন্য তদানীন্তন লোকেল কমিটির মেম্বার, মিঃ কুক্, মিঃ ওয়াইজ, ডাঃ টেইলার, মিঃ আরাটুন, খাঁজে আলিমুল্লা সাহেব, মির্জা গোলাম পীরসাহেব, মিঃ এজিৎসিংহ, মুন্সি নন্দলাল দত্ত প্রভৃতি, বাবু হাকিমান, নবাব সায়েস্তা খাঁর ওয়ক্‌ফ্ সম্পত্তিভুক্ত লালবাগের ভূমিখণ্ড নবাবের বংশধর মির্জা মজহর আলিখাঁন ও বিবি সালেহা খানম হইতে বার্ষিক মবলক ষষ্ঠীতম রজতখণ্ড পুষ্পমূল্যে মোকরবি পাট্টা লইয়া এক দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। তাহতে লিখিত আছে, "মোতালক শহর ঢাকায় লালবাগ মহল্লা মধ্যগত চাকলায় অর্থাৎ বিবি পরির মকবেরায় ও মহজিদের চৌতবকি চৌদেওয়ার মধ্যস্থিত ভূমি যাহার চৌহদ্দি এই লালবাগ হাতার জমির ও বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরের কেল্লার পোস্তা দেত্তায়ের লাগ উত্তরময় দেত্তার ও বড় সরকের লাগ দক্ষিণ পূর্বময় দেত্তার ও আওরঙ্গাবাদের হাম্মাম যাহা পাদরি সাহেব নিলাম করিয়াছেন তাহার ও ঐ আওরঙ্গবাদের জমির ও মৃত্তিকার নিচে যে উত্তরদক্ষিণ দীর্ঘকার পোক্তা নেউ আছে তাহার লাগ পশ্চিমময় ঐ নেউ ঐ চতুঃসীমাবস্থিত দরোবস্ত ভূমি ও তন্মধ্যগত কেল্লা ও হোজরা ও পোক্তা মোকালত ইত্যাদি

যে তৌলিয়তের হকিয়াতে আপনাদিগের দখলে আছে তাহার মধ্যে বিবি পরির মকবেরা ও মসজিদ সেওয়ায় বাকি সমস্ত ভূমি ও তন্মধ্যগত কেল্লা ও হোজরা ইত্যাদি পোক্তা মোকলতে আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক মঃ ৬০ টাকা কোম্পানি বার্ষিক জমাতেই ১৮৪৪ সনের প্রথমাবধি হামেস গীর নিমিত্ত মোকরবি পাট্টা লইলাম" ইত্যাদি। এই স্থানে গভর্নমেন্ট প্রথমত ঢাকা কলেজ স্থাপন ও একটি পার্ক প্রস্তুতের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। সায়েস্তাখাঁর বংশধরগণ মধ্যে মির্জা রমজানআলি খাঁ সাহেব এই ভূমিখণ্ডের বাবদে ওয়ারিশি সূত্রে বার্ষিক ৬০ টাকা এখনও প্রাপ্ত হইতেছেন।

হাম্মাম ও দেওয়ানি আম :

ইহা লালবাগ কেল্লার মধ্যস্থিত একটি দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার স্তম্ভগুলি প্রস্তরনির্মিত হওয়াতে অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। নিম্নতলস্থ একটি প্রকোষ্ঠে নবাবের স্নানাগার (হাম্মাম) ছিল। বিভিন্ন পাত্রে কবোষ্ণ জল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ শীতলতর জলরাশি সঞ্চিত থাকিত। সম্রাটকুমার মহম্মদ আজিম কর্তৃক লালবাগদুর্গ নির্মাণ সময়ে এই স্থান দেওয়ান-ই-আম রূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে গভর্নমেন্ট ঐ প্রকোষ্ঠে মলমূত্রত্যাগের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নবাবি আমলের দেওয়ানি-ই-আমের যে এই অবস্থা ঘটিবে, তখন স্বপ্নেও কেহ কল্পনায় আনিতে পারে নাই।

লালবাগের কেল্লার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিবৃত করিতে করিতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, "যে সময়ে সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ঢাকায় আগমন করেন, সেই সময়ে তিঁনি সায়েস্তাখাঁকে লালবাগস্থ এক কাষ্ঠনির্মিত গৃহে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন।" লালবাগের প্রাসাদ তখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছিল বলিয়াই নবাব কাষ্ঠনির্মিত গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু হাণ্টার সাহেবের উক্তি সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় আগমন করেন।[৮] সেই সময়ে সায়েস্তাখাঁ দুই বৎসর যাবত ঢাকার সুবাদারি পদ গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন মাত্র। লালবাগের রাজপ্রাসাদ বা দুর্গনির্মাণের কল্পনাও তখন কাহারো মনে স্থান পায় নাই। ইতিহাস আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, লালবাগের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের নির্মাণকার্য ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে টেভারনিয়ার সায়েস্তাখাঁকে লালবাগে কেন দেখিবেন? টেভারনিয়ার নির্দিষ্ট করিয়া কোন স্থানের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "নবাব বুড়িগঙ্গানদীর তীরদেশে কাষ্ঠনির্মিত গৃহে অবস্থান করেন।" তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই গ্রন্থে লিখিত আছে "সায়েস্তাখাঁকে কাটরা পাকুরতলীতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে তৎকালে অবস্থান করিতেন। রেঙ্কিন সাহেবের মতে বর্তমান মেডিকেল স্কুলের নিকটেই সায়েস্তাখাঁ অবস্থান করিতেন। ঐ স্থানের একটি মসজিদে, পারস্য ভাষায়, নবাব সায়েস্তাখাঁর স্বহস্তলিখিত কতিপয় পংক্তি, একখানা শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্থানের নদীর ধারে একটি ইষ্টকনির্মিত পোস্তার ভগ্নাবশেষ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। অনেকে উহা নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্মিত গৃহের অংশ বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই সমুদয় কারণে আমরা হাণ্টার সাহেবের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় হাণ্টার সাহেব স্থাননির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

কেল্লা গুম্বজবহুল যে অংশ এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা কেল্লার নহবতখানা ছিল না।

ছোটকাটরা ও বিবি চম্পার সমাধি :

শাহসুজা নির্মিত বড়-কাটরা হইতে প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে বুড়িগঙ্গাতীরে নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্মিত ছোট-কাটরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সোয়াবীঘাটার উভয় পার্শ্বে এই দুইটি কাটরা নির্মিত হওয়ায় ঢাকার নবাগত লোকদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য শতগুণে বর্ধিত

হইয়াছিল। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের একটি তালিকা দৃষ্টে অবগত হইয়া যায় যে, উভয় কাটরার ব্যয়নির্বাহার্থে বার্ষিক ১২০৭ টাকা নির্দিষ্ট ছিল যথা—

মহালের নাম	অধিবাসীর নাম	আনুমানিক
পাকুরতলী	দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারি ও মৃত	
	জয়নারায়ণবাবুর ওয়ারিশ—	২৭৫
চম্পাতলি বা	হায়তন্নেছা খাতম...	
ছোট কাটরা	মিঃ ওয়াইজ এবং সালেহাখানম	
(ইমামগঞ্জসহিত)	আহম্‌দম হাজি ও মজফর	২৫০
পাথরকাটা এস্বার্স		
কাটরা—	হোসেন	৫০
চক নিকাশ—	গভর্নমেন্ট	১০০
রহমৎগঞ্জ	মজহর আলি খান, পুটি খানম,	
	সালেহা খানম	৩০০
খাষেৎ দেউন	ইমাম বক্‌স	৫০
তাইব্রাজ খান	মজহর আলি খান	২
বড় কাটরা	উদয়চাঁদ পসরি ও শঙ্কর পুসম	১৫০
		১২০৭

কাটরার সম্পত্তিগুলি ওয়াক্‌ফ্ বলিয়া মিঃ স্কিনার তদীয় রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হিঃ ১০৮৮ সনে (১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে) ছোট-কাটরার নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হয়।[৯] সায়েস্তা খাঁ ঢাকাতে আগমন করিয়াই এই কাটরাটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। প্রকাণ্ড প্রাচীর পরিবেষ্টিত এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি প্রায় ২৫০ বৎসর যাবত সর্ববিধ্বংসী কালের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আজিও যেন গর্বোন্নত মস্তকে নির্মাতার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।[১০] ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে এই কাটরাদ্বয়ে প্রস্তাবিত নতুন স্কুল ও ডিস্‌পেন্সেরি প্রভৃতি সংস্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। প্রাচীর পরিবেষ্টিত আঙ্গিনার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবি চম্পার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিবি চম্পার নামানুসারে এই স্থান চাঁপাতলি বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশের উপরিভাগে একখানা শিলালিপি বর্তমান ছিল। উহা ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় বলিয়া শিলালিপিতে লিখিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে শিলালিপি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিবি চম্পা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইনি সায়েস্তাখাঁর জনৈক দুহিতা; আবার কেহ কেহ ইহাকে সায়েস্তাখাঁর বাঁদি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।[১১] যিনিই হউন, এই রমণী যে বিশেষ সৌভাগ্যবতী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চক মসজিদ :

চকবাজারের পশ্চিমপ্রান্তে তিনটি গুম্বজসমন্বিত একটি প্রকাণ্ড মসজিদ সায়েস্তাখাঁ নির্মাণ করেন। এখানে তিনি স্বয়ং নামাজ পড়িতেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ঈদ উপলক্ষে এই মসজিদটি আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। এই মসজিদটি ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[১২]

ঢাকার প্রাচীন দুর্গ ও নবাবি প্রাসাদ :

ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদার কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন দুর্গের চিহ্নও বর্তমান নাই। বর্তমান সময়ে ঐ স্থানে জেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবাব ইব্রাহিমখাঁ ফতেজঙ্গ এবং ইসলামখাঁ মেসেদী

এই দুর্গের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামখাঁ এই স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই দুর্গের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে যে দুইটি প্রকাণ্ড তোরণদ্বার নির্মিত হইয়াছিল তাহা "পূরবদরজা" ও "পশ্চিমদরজা" নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন কেল্লার সন্নিকটবর্তী স্থান অদ্যাপি "গড়কেল্লা" বা "গির্দাকেল্লা" বলিয়া পরিচিত। এই দুর্গের নিকটে "পাদশাহীবাজার" প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা "খোনা নিকাশ", "চক নিকাশ", "উর্দুবাজার" বলিয়া কথিত হইত।[১৩]

সায়েস্তাখাঁর সুশাসনগুণে বঙ্গদেশে আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে মহোল্লাসে তিনি পূরবদরজার তোরণদ্বারে লিখিয়া যান যে, যে রাজার রাজত্বকালে পুনরায় এইরূপ সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাওয়া যাইবে, তিনি যেন ঐ দ্বার উদঘাটন না করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, সরফরাজখাঁর সময়ে, যশোবন্ত রায়ের সুশাসনগুণে ঢাকা প্রদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে তিনি মহা সমারোহে উল্লিখিত আবদ্ধ তোরণদ্বার মুক্ত করেন।

এই স্থানে নবাব জেসারৎখাঁ কর্তৃক খনিত একটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পলাশীর যুদ্ধাবসানে নবাব জেসারৎখাঁ এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বড়-কাটরাতে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; পরে নিমতলির প্রাসাদ নির্মিত হইলে সমুদয় অনুচরবর্গসহ তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন।[১৪]

বড়-কাটরা :

১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে (হিঃ ১০৫৫) শাহ সুজা বুড়িগঙ্গাতীরে একটি প্রকাণ্ড সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১৫] সুজার আদেশক্রমে মীর-ই-ইমারৎ আবদুল কাসেম কর্তৃক উহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। এই অট্টালিকা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ "বড়-কাটরা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি ইহার ভগ্নাবশেষ লোকলোচনের গোচরীভূত থাকিয়া কীর্তি কর্তার নাম জাগরুক রাখিয়াছে। কথিত আছে ইহার নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হইলে উহা সম্রাটতনয়ের মনোমত না হওয়ায় তিনি এই বৃহৎ কাটরাটি আবদুল কাশেমকে দান করিয়াছিলেন। মোগল শাসন সময়ে শত শত যাত্রী এখানে আশ্রয় লাভ করিত এবং আহার্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইত। এই অট্টালিকাটির নির্মাণকৌশল অতি সুন্দর ও সুদৃঢ়।[১৬]

List of Ancient monuments-এ এই অট্টালিকাটি কুমার আজিম উশ্বানের আদেশক্রমে নির্মিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু উহা ভুল। ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটতনয় সুলতান সুজা বঙ্গের সুবাদারি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আজিম উশ্বান সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র। এই সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাহার আদেশক্রমে এই অট্টালিকার নির্মাণ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়!

বুড়িগঙ্গার গর্ভ হইতে ইহার প্রশস্ত তোরণদ্বার এবং উন্নত ও সুদৃঢ় প্রাচীরের সুবিশাল দৃশ্য একখানা চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

সুবাদার মীরজুমলা-বড়-কাটরায় স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন; ইহার তোরণদ্বারে তিনি প্রকাণ্ড দুইটি কামান সজ্জিত রাখিতেন।

লাডুবিবির প্রকোষ্ঠ :

বর্তমান মেডিকেল স্কুল যথায় অবস্থিত, সেখানে সায়েস্তাখাঁ-নন্দিনী লাডুবিবির সমাধি বিদ্যমান ছিল। তৎকালে এই মসজিদটি একটি নয়ন-মনোরম অট্টালিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মেডিকেল স্কুলের ভিত্তি সংস্থাপন সময়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লাডুবিবির সমাধিস্থান খননপূর্বক নবাব-নন্দিনীর শেষ চিহ্ন, অস্থিপঞ্জরাদি নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন। কথিত আছে একটি রৌপ্য গোলাবকাশ ও Lurbander তথায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছিল। লাডুবিবির অপর নাম সাজাদা খানম বলিয়া জানা যায়।

বেগম-বাজারের মসজিদ :

বেগম-বাজারের মসজিদটি দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এত বড় মসজিদ ঢাকাতে আর নাই। ইহার নির্মাণ কৌশল অতি চমৎকার।

লালবাগ মসজিদ :

এই মসজিদটি কেল্লার সংলগ্ন দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। ঐ স্থানের নাম ছিল রাকবগঞ্জ বা মসজিদগঞ্জ। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ প্রায় ১৬৪' × ১৫০' হইবে। প্রায় ১৫০০ শত লোক একত্র বসিয়া এই মসজিদে নামাজ পড়িতে পারিত। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র কুমার আজিমউশ্বান ঢাকা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে তদীয় পুত্র ফেরোখ্সয়েরকে ঢাকার প্রতিনিধি-শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফোরোখ্সয়ের অচিরেই জনসাধারণের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্বসাধারণের উপকারার্থে অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করেন। লালবাগের এই মসজিদটি ফেরোখ্সয়ের কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ এই মসজিদের ব্যয় নির্বাহার্থ চতুঃপার্শ্ববর্তী কতকস্থান এবং নবলক মাসিক সাড়ে ২২ টাকা হিসেবে মাশোহারা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

সাতগুম্বজ মসজিদ :

ঢাকা সদরঘাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার বাঁশবাড়ি নামক স্থানে নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্মিত সপ্তগুম্বজ পরিশোভিত নয়ন-মনোরম একটি মসজিদ বিদ্যমান থাকিয়া নির্মাতার অতীত কীর্তি-কাহিনী অদ্যাপি বিঘোষিত করিতেছে। সৌন্দর্যে লালবাগের পরিবিবির সমাধির পরই এই মসজিদটির নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী এই মসজিদটির দক্ষিণ-প্রান্ত দিয়াই প্রবাহিত হইত। এক্ষণে নদীপ্রবাহ প্রায় একমাইল দক্ষিণ দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিকর। সন্নিকটে দুইটি অতি প্রাচীন দরগা আছে। উহা সায়েস্তাখাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গুলজারবিবির সমাধি বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

এই মসজিদটির অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪৮ ফুট × ১৬ ফুট। অভ্যন্তরে চারিটি অষ্টকোণসমন্বিত দ্বিতল প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান আছে। এই চারিটি প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশে চারিটি গুম্বজ পরিশোভিত। মসজিদের ঠিক মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠটির শীর্ষদেশে তিনটি সুবৃহৎ গুম্বজ আছে।

নবাব স্যার আবদুলগণি এই মসজিদটির সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন মোল্লার মাশোহারাও প্রদান করিতেন। প্রায় বারপাখী নিষ্কর জমির উপসত্ব এই মোল্লার উপভোগ্য।

নারিন্দা বিনটবিবির মসজিদ :

নারিন্দার এই মসজিদটি ঢাকা শহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় যে ইহা পাঠানরাজ নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের সময়ে ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র হইলেও এই মসজিদটির গঠন অতিশয় দৃঢ়, কিন্তু শিল্পচাতুর্য তেমন প্রশংসনীয় নহে।

এখানে এই মসজিদটির অবস্থানহেতু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ঢাকানগরে অন্তত ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই মোসলমানগণ বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যবতী মহিলার পরিচয় অতীতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন খান বাহাদুর বলেন, "ইনি যে উচ্চকুল সম্ভূতা ছিলেন না, তাহা উহার নামেই সূচিত হইতেছে।"

গির্দকেল্লার মসজিদ :

উপরোক্ত মসজিদটি নির্মাণের ঠিক দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০ শে শ্রাবণ নবাব ইসলামখাঁর নির্মিত প্রাচীন কেল্লার সন্নিকটে আর একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। উহা গির্দকেল্লার মসজিদ বলিয়া পরিচিত। এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র অতীতের

সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান আছে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই প্রাচীন মসজিদটি ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবলমাত্র প্রাচীরগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে।

গির্দকেল্লাস্থিত নাসওয়ালা গল্লির প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই মসজিদটি হিঃ ৮৬৩ সনের ২০ শে শ্রাবণ তারিখে, নাসিরউদ্দিন আবুল মোজফর মহম্মদশাহের রাজত্বকালে মোবারকবাদের প্রত্যন্ত প্রদেশে নির্মিত হইয়াছিল। ডাঃ ওয়াইজ বলেন, এই শিলালিপিখানা অন্য কোনও প্রাচীন নগরীস্থ মসজিদ হইতে ঢাকাতে নীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মসজিদটি যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে উক্ত মত আমাদের নিকটে সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। হিজরি ৭৩১ সনে বাহাদুরশাহের মৃত্যু হইলে দিল্লিশ্বর মহম্মদ তোগলক বাহাদুরখাঁকে সুবর্ণগ্রামে এবং কদরখাঁকে লক্ষ্মৌতীরে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লিতে প্রত্যাগমন করেন। হিঃ ৭৩৯ সনে বহরমখাঁর মৃত্যু হইলে ফখরউদ্দিন মোবারক সোনারগাঁয়ের সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ তোগলক এই সংবাদ অবগত হইয়া উহাকে দমন করিবার জন্য কদরখাঁকে আদেশ প্রদান করেন। ফখরউদ্দিন কদরখাঁর নিকটে পরাজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কদরখাঁর সেনাদিগকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া পরে তাহার বিনাশসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হিঃ ৭৪১ সনে সংঘটিত হয়। ফখরউদ্দিন ৭৫০ সন পর্যন্ত সোনারগাঁয়ে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রদৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ফখরউদ্দিন কদরখাঁর নিকটে পরাজিত হইয়া লাক্ষ্যানদী অতিক্রম করিয়া টঙ্গী ও তুরাগনদী অথবা দোলাইখাল বাহিয়া ঢাকার অরণ্য মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উদ্যম সফল হইলে তদীয় আশ্রয়স্থানকে স্বীয় নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। জেরেটের অনুদিত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে মোবারকউজিয়াল, সরকার বাজুহারের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে; বর্তমান সময়েও ঢাকা জেলায় মোবারক উজিয়াল পরগনার বর্তমান আছে।

পুস্তা প্রাসাদ :

এই প্রাসাদ লালবাগকেল্লার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রায় সমুদয় অংশই বুড়িগঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়।[১৭] ডাঃ টেইলার এই প্রাসাদের সামান্য চিহ্ন মাত্র অবলোকন করিয়াছিলেন। ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার তদানীন্তন সুবাদার, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্বানকর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল।[১৮] ফেরোখ্‌সয়ের ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিবার সময়ে এই প্রাসাদ মধ্যেই বাস করিতেন। বিশপ হিবার ইহার গঠন প্রণালির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ইহাকে মস্কোনগরস্থ Kremlin এর সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯]

নিমতলীর কুঠি, বারদুয়ারি ও নৌবৎখানা :

নিমতলীর প্রাসাদ এবং তন্নিকটবর্তী বারদুয়ারি ও নৌবৎখানা ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাব জেসারৎখাঁর সময়ে নির্মিত হয়। এই প্রাসাদই ঢাকার নায়েব-নাজিমদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নবাব জেসারৎখাঁ, আসমৎজঙ্গ, নসরৎজঙ্গ, সমসেদ্দৌলা, কমরেদ্দৌলা ও গাজিউদ্দিন হায়দর প্রভৃতি ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিমগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। যে প্রকাণ্ড জলাশয় এখন ঢাকা কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত, তাহা ঐ সময়ে বেগমদিগের জন্য খনিত হইয়াছিল।

নৌবৎখানার প্রকাণ্ড তোরণোপরি প্রত্যহ সান্ধ্যকালে সামরিক বাদ্য বাজিয়া উঠিত। বিশপ হিবার নবাব সমসেদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই নৌবৎখানা অতিক্রম করিয়াই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। প্রাসাদমধ্যস্থিত অষ্টকোণসমন্বিত একটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের গঠন প্রণালির তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। বারদুয়ারির দরবার প্রকোষ্ঠেই ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিমগণের নবাবিলীলা প্রকটিত হইত।

খান মৃধার মসজিদ :
মুর্শিদকুলির শাসন সময়ে ঢাকার তদানীন্তন প্রধান কাজির আদেশানুসারে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। ঢাকায় রাজধানী থাকার সময়ে, নবাবি আমলে, এই অট্টালিকার পরে আর কোনও অট্টালিকা নির্মিত হয় নাই; সুতরাং এইটিই ঢাকার মোগল স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

কাটরা পাকুরতলীর প্রাসাদ ও নৌবৎখানা :
বাবুরবাজার মসজিদের উত্তর-পূর্বদিকে, যেখানে বর্তমান মেডিকেল স্কুল ও জেনানা হাসপাতাল সংস্থাপিত, তথায় এই প্রাসাদ ও নৌবৎখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে এই প্রাসাদের নিকটবর্তী বাবুরবাজারের ঘাট, নৌবৎখানার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ এবং একটি ক্ষুদ্র মসজিদ মাত্র বিদ্যমান আছে। মসজিদগাত্রস্থিত শিলালিপিতে পারস্য ভাষায় লিখিত নবাব সায়েস্তাখাঁর রচিত কতিপয় পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মসজিদটি সায়েস্তাখাঁর প্রথমবারের শাসন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শিলালিপির অনেক স্থান অগ্নিদেবের কৃপায় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রাসাদ মধ্যেই নবাব সায়েস্তা খাঁকে অবস্থান করিতে সদর্শন করিয়াছিলেন।

হাজি খাজে শাহাবাজের মসজিদ :
রমনার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণইক-প্রান্তে দুইটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে। উহার একটি হাজি খাজে শাহাবাজের মসজিদ এবং অপরটি উক্ত মহাত্মার সমাধি স্থান। এই মসজিদটি ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইনি কাশ্মীরাঞ্চল হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে ঢাকা নগরীতে আগমন করেন এবং টঙ্গীতে স্বীয় আবাসস্থান মনোনীত করেন। টঙ্গী হইতে ইনি প্রতিদিন সান্ধ্যনমাজের জন্য এই স্থানে আগমন করিতেন।

এই সমচতুষ্কোণাকার মসজিদটির বাহ্যাকৃতি ৬৭' × ২৬' এবং ইহা তিনটি গুম্বজসমন্বিত। ছাদের চারিকোণ আটটি উচ্চ চূড়ায় পরিশোভিত। প্রাঙ্গণভূমি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত। দরজার কবাটগুলিও প্রস্তরময়। পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ এই তিনদিকে তিনটি দ্বার আছে।

বেচারামের-দেউরী নিবাসী জগ বা সাহেব ইহার তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই এই মসজিদে আলোক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শাহাবাজের সমাধিও ঐ সময়েই তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং পরে তাহার মৃত্যু হইলে শবদেহ এই মসজিদ মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। এই মসজিদটি সমচতুষ্কোণাকার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২৬'। একটি গুম্বজ এবং চারিটি উচ্চচূড়ায় পরিশোভিত।

চুড়িহাট্টার মসজিদ :
চুড়িহাট্টায় অতি প্রাচীন একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, একদা ঢাকার জনৈক নবাব একটি ধর্মমন্দির নির্মাণার্থে কতক অর্থ তদীয় হিন্দু কর্মচারীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দুকর্মচারীগণ নবাব প্রদত্ত অর্থে একটি দেবালয় নির্মাণ করিয়া মন্দির মধ্যে বাসুদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নবাব, কর্মচারীগণের এবম্বিধ আচরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ বিগ্রহের বিনাশসাধনকরত ঐ স্থানে এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল এই মসজিদের কোনও স্থান খনন করিবার সময়ে একটি ভগ্ন বাসুদেব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে, টি, রেঙ্কিন মহোদয় ঐ মূর্তিটি সংগ্রহ করিয়া কালেক্টরির সম্মুখে রাখিয়াছেন।

গিয়াসউদ্দিন আজমশাহের সমাধি :

পাঁচপীরের দরগার প্রায় ৫০০ শত গজ দক্ষিণ-পূর্বদিকে, তারাদামপূর্ণ নানাবিধ আবর্জনাসম্পূরিত মগ দীর্ঘিকার তীরে[২০] পারসি কবি হাফেজের সমসাময়িক[২১] ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যোৎশাহী পাঠানরাজ গিয়াসউদ্দিন আবুল মুজঃফর আজমশাহের (সুলতান গিয়াস্উদ্দিন) সমাধি বিদ্যমান আছে। সমাধিটির এক্ষণে ভগ্নাবস্থা। সুনীল মর্মরপ্রস্তরের লৌহের বন্ধনীগুলি (খিলান) অতিশয় মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রস্তর ভেদ করিয়া সুবৃহৎ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া উহার প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিতেছে। পূর্বে এই সমাধির কেন্দ্রস্থলে একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মর্মর প্রস্তর এবং উহার চতুর্দিকে পাঁচ ফুট উচ্চ অনেকগুলি স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। এই প্রস্তরগুলি আরব্যস্থপতিবিদ্যার অনুযায়ী নয়নমনোরম বিবিধ কারুকার্য-খচিত। অতি সুকৌশলে প্রস্তরগুলির বক্রতা সম্পাদন করা হইয়াছে। উহার প্রান্তদেশ এবং প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ কাল্পনিক বিবিধ লতাপুষ্পাদি অদ্যাপি নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্লঙঘ্যকালের ধ্বংসনীতির প্রবল তাড়নায়ও উহার প্রাচীন কারুকার্য বিনষ্ট হয় নাই। সুসংস্কৃত হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর পাঠান স্থাপত্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন লোকলোচনের অন্তরাল হইবার আশঙ্কা থাকে না। গিয়াসউদ্দিনের সমাধি পূর্ববঙ্গের মোসলমানগণের গৌরবের জিনিস।

মগড়াপাড়ার নহবৎখানা ও "তহবিল" :

মহম্মদ ইউসুফের সমাধির সন্নিকটে একটি প্রাচীন ফটকের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ্যে উহা "নৌবৎখানা" বলিয়া সুপরিচিত। পাঠান শাসনকালে, বিশ্রামস্থলের সান্নিধ্যপরিজ্ঞাপনার্থ প্রত্যহ প্রভাত সময়ে এবং সায়ংকালে এই নৌবৎখানা হইতে অনবরত তানলয়সংযোগে বংশীবাদন করা হইত। পথশ্রমে ক্লান্ত নবাগত পথিক এবং পীরপয়গম্বর ও ফকিরগণ দূর হইতে এই সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিলেই আশ্বস্ত হইয়া এই স্থানে আগমনপূর্বক বিশ্রম্ভালাপনে শ্রম অপনোদন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইত। মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে যে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা "তহবিল" Tahwil ধনাগার নামে পরিচিত। মসজিদের মতউল্লি অভ্যাগতগণকে এই স্থানে সাদরে আহ্বানপূর্বক পানাহার প্রদান করিয়া যে তাহাদিগের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন, তাহা ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের সময়েও অনেক প্রাচীন ব্যক্তির স্মৃতিপটে জাগরুক ছিল।[২২] বর্তমানে মতউল্লির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

গোয়াল নদীর প্রাচীন মসজিদ :

প্রাচীনত্বের হিসাবে এই মসজিদটি সোনারগাঁয়ের মধ্যে প্রাচীনতম। উৎকীর্ণ শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা আলাউদ্দিন হোসেনশাহের সময়ে হিঃ ৯২৫ সনে (১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে) মোল্লা আকবরখাঁ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

এই মসজিদের ইষ্টকগুলি অতিশয় রক্তবর্ণ। বহির্ভাগ বিবিধ কারুকার্যসমন্বিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে তৎসমুদয়ই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মসজিদটি ১৬½ ফুট চতুষ্কোণাকার। সমচতুষ্কোণাকার দেওয়ালগুলি কিয়দ্দূর পর্যন্ত উত্থিত হইয়া অষ্টভূজাকারে পরিণত হইয়াছে। অর্ধ-গোলাকার তোরণের ন্যায় চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোলঙ্গ ইহার চারি কৌণিক প্রান্তদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে। মধ্যদেশ গুম্বজত্রয়ে পরিশোভিত। কেন্দ্রস্থ গুম্বজটি আরব্যস্থাপত্যের অনুকরণে সুনীল মর্মর প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। অপর দুইটি ইষ্টক নির্মিত। দ্বারদেশের স্তম্ভগুলি কোন হিন্দু দেবমন্দির হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব অনুমান করেন। হিন্দু-মোসলমান নির্বিশেষে সোনারগাঁও অঞ্চলের সকলেই এই মসজিদটিকে সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। শেষ খাদিমের মৃত্যুর পরে ইহা নিতান্ত অযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

হোসেনশাহের নির্মিত এই প্রাচীন মসজিদটি এক্ষণে একরূপ পরিত্যক্ত, দীনধর্মানুমোদিত নমাজের উচ্চ ধ্বনি এক্ষণ আর এখানে শ্রুত হওয়া যায় না। হিঃ ১১১৬ (১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে) সনে নির্মিত আবদুল হামিদের মসজিদেই নমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাড়ি মখলস্ :

হবিবপুর গ্রামের অনতিদূরে কোম্পানিগঞ্জের পুলের সন্নিকটে একটি প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা সাধারণ্যে "বাড়ি মখলস্" নামে পরিচিত। সেখ ঘরিবুল্লা নামক ইংরেজ কোম্পানির জনৈক যাচনদার হিঃ ১১৮২ (১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) সনে এই সুবৃহৎ বাটি নির্মাণ করেন। সোনারগাঁয়ে মলমলখাসকুঠি নির্মিত হইলে দারোগার অধীনে যাচনদারগণ কার্য করিতেন। মসলিনের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উহার উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা যাচনদারের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বাড়ি মখলসের গঠনপ্রণালি সাধারণ মসজিদ হইতে ভিন্ন শ্রেণির। "বিদেশীয় গথিক (Gothic Style) প্রণালির অস্পষ্ট আভাস এই সুদৃশ্য ভবনের সহিত বিজড়িত" বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।[২] ইহার চূড়াগুলি মৃণ্ময় হইলেও অত্যন্ত মসৃণ এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট।

বল্লালের প্রস্তরময় রথ :

মোগড়াপাড়ার অনতিদূরে, পবিত্র ব্রহ্মপুত্রতটে, পোড়ারাজার (দ্বিতীয় বল্লাল সেন) প্রস্তরময় রথের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রস্তরগুলির উপরে উৎকীর্ণ বহুবিধ চিত্র অদ্যাপি হিন্দুভাস্কর্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। প্রবাদ এই যে, রথদ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ এই প্রকাণ্ড রথটি টানিয়া স্থানান্তরিত করিত, কিন্তু রথদ্বিতীয়া অতিক্রান্ত হইলে শত শত বলশালী পুরুষের সমবেত চেষ্টাতেও উহাকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হইত না। কালু নামক কোনও হিন্দু ফকির মোসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিয়া এই রথের চূড়া ও কারুকার্যময় প্রস্তরমূর্তিগুলির বিনাশ সাধন করেন।

লস্কর দীঘীর শিবমন্দির :

বাঘিয়া গ্রামে লস্করদিঘী নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের পূর্বতীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহা ১১১২ বঙ্গাব্দে রূপরামগুপ্ত (লস্কর) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। "মন্দিরের চতুর্দিকস্থ ইষ্টকগাত্রে লোলরসনা দিগম্বরী কালিকামূর্তি, মহিষাসুরমর্দিনী দশভূজামূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের লীলালেখ্য আভীরপল্লির সুন্দরচিত্র, প্রসাধননিরত সুন্দর রমণীমূর্তি প্রভৃতি অঙ্কিত থাকিয়া দ্বিশত বৎসর পূর্বে এতদঞ্চলের শিল্পকলার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কথিত আছে, এই মন্দিরের ভিত্তিতলে কতিপয় সহস্র মুদ্রা প্রোথিত আছে।

রাজাবাড়ির মঠ :

এই মঠটি প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ; নিম্নাংশের বেষ্টনও প্রায় ১২০ ফুট হইবে। রাজবাড়ি থানার দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মঠটি অবস্থিত। মঠের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে; নিম্নাংশে বহুপরিমাণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। উত্তালতরঙ্গময়ীপদ্মা ইহার অনতিদূরে প্রবাহিত। বহুদূরবর্তী পদ্মাপক্ষ হইতেও এই মঠটি দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। এতবড় মাঠ ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। প্রবাদ, কেদার রায় মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের ধনকুবের ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠটির সংস্কার এবং উপরের চূড়া নির্মিত হইয়াছে। পূর্বে এই মঠের চূড়া ছিল না।

এই মঠটির নির্মাণ সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন চাঁদমিঞা নামক জনৈক খ্যাতনামা মোসলমান হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় জননীর সমাধির উপরে ইহা নির্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ ইহা পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের একতম কীর্তি বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই মঠটি পূর্বদ্বারী বলিয়াই এসমুদয় অলীক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ অনেকের বিশ্বাস হিন্দুর নির্মিত মঠ-মন্দিরাদি পূর্বদ্বারী হইতে পারে না। পূর্বদ্বারী মঠ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হিন্দু শাস্ত্রবিরোধী নহে। মঠ বা মন্দির সর্বদ্বারীই হইতে পারে। মন্দির-দ্বার নির্ণয়ে শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে :

"হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—গ্রাম মধ্যে চ পূর্বে চ প্রত্যগ্‌দ্বারং প্রকল্পয়েৎ।
বিদিশাসু চ সর্বাসু তথা প্রত্যঙ্মুখং ভবেৎ"।।
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিবে প্রাঙ্মুমুখংভবেৎ।"
শব্দকল্পদ্রুম, ১৪০৮ পৃঃ (বসুমতী-সংস্করণ)।

আদমসাহিদ মসজিদ :

আদমসাহিদ মসজিদ বা বাবা আদমের[২৪] মসজিদের অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ, ডাঃ হোয়াইট ও মিঃ ব্লকম্যান প্রভৃতি মনীষীবর্গ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ ও ব্লকম্যানের মতে এই মসজিদটি বল্লাল বাড়ির দুই মাইল দুরে কাজি-কসবা গ্রামে অবস্থিত।[২৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বল্লাল বাড়ির প্রায় অর্ধ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। মিঃ ক্যানিংহামের Archaelogical Survey Report পাঠেও ইহা অবগত হওয়া যায়।[২৬]

কাজি-কসবা গ্রামে অথবা তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে চারিটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে এবং এই সমুদয় স্থানকেই লোকে সাধারণত কাজি-কসবা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই মসজিদচতুষ্টয় লইয়া অনেককেই অল্পাধিকরূপে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। এই ভ্রমনিরসনের জন্য আমরা উক্ত চারিটি মসজিদেরই বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমটি : রিকাবিবাজারের মসজিদ। এই মসজিদটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় পঞ্চদশ হস্তপরিমিত হইবে। ইহা একটি মাত্র গুম্বজবিশিষ্ট। ইষ্টকগুলি অত্যন্ত মসৃণ এবং ঈষৎ বক্র, প্রান্তভাগ এরূপ সুমার্জিত যে, দূর হইতে প্রস্তরখণ্ড বলিয়া প্রতীতি হয়। সাধারণ সুরকি ও চূনের প্রলেপদ্বারা উহা গ্রথিত করা হয় নাই। প্রলেপের শুভ্রত্ব দর্শনে অনুমিত হয় যে উহা চূর্ণীকৃত প্রস্তর এবং চুন অথবা তদ্বৎ অন্য কোনও পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে।

মসজিদের গাত্রে কোনও শিলালিপি বিদ্যমান নেই। কিন্তু অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই মসজিদসংলগ্ন প্রস্তরফলকটি নিকটবর্তী অপর একটি মসজিদের গাত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা হিঃ ৯৭৬ সনের জেলকদ্দ মাসে নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়টি : এই শেষোক্ত মসজিদটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত মসজিদের শিলালিপিখানা স্থানান্তরিত করিয়া দ্বিতীয় মসজিদের গাত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় অনেকেই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ইহা দ্বিগুম্বজসমন্বিত।

তৃতীয়টি : বাবা আদমের মসজিদের অনতিদূরে কাজি-কসবা গ্রামে তৃতীয় মসজিদটি অবস্থিত। ইহা কাজির মসজিদ বলিয়া পরিচিত। বাবা আদমের মসজিদের অনেক পরে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে। ইহার গাত্রে কোনও শিলালিপি নাই। কিন্তু বারান্দায় একটি হিন্দুদেবমূর্তির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হওয়ায় মনে হয়, দীনধর্মের জয়স্তম্ভ স্বরূপেই উহা মসজিদের দ্বারদেশে রক্ষিত হইয়াছে। মসজিদের বর্তমান কাজির নিকটে আলমগির বাদশাহের প্রদত্ত ফরমান আছে। তাহাতে এই মসজিদের ব্যয় সংকুলানের জন্য ভূমিদানের কথা লিখিত আছে। এই মসজিদটি দ্বিগুম্বজসমন্বিত।

চতুর্থটি : রামপালের অর্ধমাইল উত্তরে দুর্গাবাড়ি নামক স্থানে আদমসাহিদ মসজিদ অবস্থিত। এক্ষণে এই মসজিদটির ভগ্নাবস্থা। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ২৮ হাত হইবে। অভ্যন্তরস্থিত ফুকারের পরিমাপ ২৬ × ১৯ হস্ত। এই মসজিদের গাঁথুনি এবং ইষ্টকগুলির কারুকার্য রিকাবিবাজারের মসজিদেরই অনুরূপ। ইষ্টকগুলি মসৃণ এবং বক্রভাবাপন্ন।

এই মসজিদটি ষড়্গুম্বজসমন্বিত ছিল[১১] মসজিদে প্রবেশ করিবার দ্বারের দুইপার্শ্বে দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ অভ্যন্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৭ হাত হইবে; পরিধিও প্রায় সাড়ে ৩ হস্ত। এই স্তম্ভদ্বয় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ একটি অভগ্ন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত। এই স্তম্ভদ্বয়ের একটি হইতে অনবরত ঘর্মাকারে জল নিঃসৃত হইত বলিয়া উহা স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হইত, এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। ঘর্মশীল বারুণ প্রস্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সম্ভবত ঐরূপ একখানা প্রস্তর স্তম্ভগাত্রে অলক্ষ্যভাবে স্থাপিত ছিল। স্তম্ভদ্বয় হিন্দু ও মোসলমান রমণীগণ দ্বারা সিন্দুরানুলিপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মসজিদগাত্রস্থিত শিলালিপিতে জিরি রজব ৮৮৮ সন খোদিত আছে। ঢাকা জেলার মসজিদগুলির মধ্যে এইটিই প্রাচীনতম।

মসজিদের অভ্যন্তরস্থিত দেওয়ালগাত্রে দ্বাদশটি বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড সংলগ্ন ছিল ; মগগণ কর্তৃক এতদঞ্চল লুণ্ঠিত হইবার সময়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি অপহৃত হয় বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে ফৈজদ্দিন খন্দকার, মফিজদ্দিন দেওয়ান এবং আইনদ্দিন খন্দকার প্রভৃতি এই মসজিদটির স্বত্বাধিকারী।

[See page 132 to 135 of Vol. XV of the Archaeological Survey Report.]

পাথরঘাটার মসজিদ :

শ্রীনগর থানার অন্তর্গত পাথরঘাটা নামক স্থানে আনোয়ার নামধেয় ঔরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদ কর্তৃক হিঃ ১১০২ সনে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পরিমাপ ৩৪' × ২০'। এই মসজিদটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিনটি গুম্বজে পরিশোভিত। দুই খণ্ড পীরোত্তর লাখেরাজ জমির উপসত্ব এবং বার্ষিক মঃ ১২ টাকা ২ আনা খাজনা এই মসজিদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। জিকনখাঁ নামক জনৈক মোল্লা এই মসজিদেব তত্ত্বাবধায়ক। নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ইহার সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। স্থানীয় মোসলমানগণ এই স্থানে দৈনিক নামাজ পড়িয়া থাকে।

List of Ancient Monuments

শ্রীনগরের বুরুজ :

শ্রীনগরের জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ৺লালা কীর্তিনারায়ণের নির্মিত চারিটি বুরুজ অষ্টাদশ শতাব্দীর উন্নত স্থাপত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগর পত্তন করিয়া উহার চতুর্দিকে পরিখা খননপূর্বক সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিপদকালে আত্মরক্ষার্থে স্বীয় আবাসভূমির চতুর্দিকে যে চারিটি বুরুজ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি মাত্র ধ্বংস চিহ্ন হইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে বোধ হয় ইহাও কালগর্ভে বিলীন হইবে। এই বুরুজটি গোলাকার, উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাসও প্রায় ৭ ফুট। এই বুরুজে দিবা-রাত্রি সান্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত থাকিত।

দুরদুরিয়ার দুর্গ :

বানার নদীর তীরে দুরদুরিয়ার দুর্গ অবস্থিত। ডাঃ টেইলারের সময়ে এই স্থানে নদীর পরিসর প্রায় ৩০০ গজ এবং গভীরতা ৪০ ফুটেরও বেশি ছিল। তীরভূমি রক্তবর্ণ কঙ্করপরিপূর্ণ, এবং

নদীর ধার হইতে উহার উচ্চতাও প্রায় ৫০ ফুট। দুর্গটি নদীতীরে অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত হইয়াছিল। দুর্গের বহির্দিগস্থ প্রাচীর কর্দমাক্ত রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার সংমিশ্রণে নির্মিত। ডাঃ টেইলার এই প্রকারের উচ্চতা ১২ × ১৪ ফুট সন্দর্শন করিয়াছিলেন। দুর্গের পরিধি ২ মাইলেরও উপর। চতুর্দিকস্থ পরিখা প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত। এক্ষণে এই পরিখার অধিকাংশ স্থানই ভরাট হইয়া গিয়াছে। দুর্গের পাঁচটি দ্বার ছিল, ইষ্টকনির্মিত কোনও তোরণদ্বারের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। দুর্গাভ্যন্তরে এই বহির্দিকস্থ প্রাচীরের কিছু দূরে আর একটি পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই পরিখা অতিক্রম করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ নয়নগোচর হইয়া থাকে। দুর্গের বহির্ভাগের ন্যায় ইহাও অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুর্দিকস্থ পরিখা বানার নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল। অভ্যন্তরস্থিত এই বেষ্টনটির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটি দ্বার নির্দিষ্ট আছে। বেষ্টনমধ্যে দুইটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই অট্টালিকাদ্বয় উচ্চস্থানে নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। দক্ষিণদিকস্থ অট্টালিকাটি ইষ্টকনির্মিত উচ্চচূড়াসমন্বিত ছিল। প্রাচীরপরিবেষ্টিত চারিটি বুরুজের ভিত্তির অংশগুলি এক্ষণেও বিদ্যমান আছে।

উত্তরদিকস্থ অট্টালিকাটিতে দুইটি সমচতুষ্কোণাকার উচ্চস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণী দুর্গের বহির্দিকস্থ পরিখার সহিত একটি পয়ঃপ্রণালি দ্বারা সংযোজিত ছিল। দুর্গাভ্যন্তরে অনেকগুলি জলাশয় ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যপি বিলুপ্ত হয় নাই। অট্টালিকাগুলি অধিকাংশ স্থান বানার নদীর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে।

এই দুর্গটি রাণীবাড়ি বলিয়া অভিহিত হয়। রাজা যশোপালের বংশীয় রাণী ভবানী এতদঞ্চলে মোসলমান আগমনের প্রাক্কালে এই স্থানে বাস করিতেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই দুর্গটি রাজা যশোপালের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ নরপতিগণের সময়ে দুর্গাদি কি প্রকার সুরক্ষিতভাবে নির্মিত হইত তাহা এই দুর্গটি দৃষ্টে কতক হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

হাজিগঞ্জের দুর্গ :

এই দুর্গ সুবাদার মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। মগেরা সাধারণত ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া শীতললাক্ষ্যা অতিক্রমকরত ঢাকা নগরীর চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রামসমুহ লুণ্ঠন করিত। ঢাকা নগরীকে জলদস্যুগণের হস্ত হইতে সুরক্ষিত করিতে হইলে হাজিগঞ্জ এবং ইদ্রাকপুর স্থানদ্বয় হইতেই শত্রুপক্ষের গতির প্রতিরোধ করা আবশ্যক, এই বিষয় পর্যালোচনা করিয়াই দুরদর্শী সুবাদার এই স্থানদ্বয়ে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এই দুর্গটির পরিধি প্রায় দেড় মাইল হইবে। চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের উচ্চতাও প্রায় দশ হাত। গঠনপ্রণালি ইদ্রাকপুরের দুর্গের প্রায় অনুরূপ। ইদ্রাকপুরের দুর্গের ন্যায় এই দুর্গেও একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল।

এক্ষণে এস্থানে ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাগানবাড়ি নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান নবাব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত খাঁজে হাফেজুল্লার নামানুসারে এই বাগানবাড়ির নাম "হাফেজমঞ্জিল" রাখা হইয়াছে। বর্তমানে ইহার প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন হইয়া রাজপথ চলিয়াছে।

ইদ্রাকপুরের কেল্লা :

এই দুর্গটি পূর্বে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে ইছামতীর খরস্রোতে নদীতীরবর্তী প্রাচীরাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। পরে নদীতে চরা পড়িয়া কিয়দংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদীও এক্ষণে প্রায় অর্ধক্রোশ পূর্বে সরিয়া গিয়াছে।

দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার ছিল, ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ এবং পূর্বদিকের অংশ সমান্তরাল চতুষ্কোণের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। একটি

প্রাচীরদ্বয় এই উভয় অংশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। দুর্গের কতকাংশ যে পরিখাবেষ্ঠিত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পূর্বদিকস্থ পরিখা নাতিদীর্ঘ একটি জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিক সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ; প্রাচীর গাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র বর্তমান আছে। প্রাচীরগুলি মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। দুর্গের চারি কোণে বৃত্তাকার চারিটি উচ্চতর সছিদ্র প্রাচীর আছে। পূর্বাংশে চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফুট পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া অর্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটি পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

দুর্গাভ্যন্তরে একটি গোলাকার সুবৃহৎ স্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উচ্চতা অদ্যাপি প্রায় ৪৫ ফুট হইবে। এই স্তূপের উপরিভাগ খিলানের উপরে রক্ষিত। স্তূপের অভ্যন্তর পূর্বে ফাঁপা ছিল; উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার একাধিক দ্বার ছিল না। দুর্গের মধ্যে, পশ্চিমাংশে, একটি জলাশয় আছে এবং এই জলাশয় হইতে স্তূপটির উপরিভাগ পর্যন্ত সুপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে, এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে, নিম্নে একটি কুঠরী পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভবত উহার বারুদাগাররূপে ব্যবহৃত হইত।

এই দুর্গটি সুবাদার মীরজুম্লাকর্তৃক ১৬৬০ খ্রি আসাম অভিযানের প্রাক্কালে মগদস্যুগণের আক্রমণ হইতে ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে "মগের কেল্লা", কেহ বা "পর্তুগিজের কেল্লা" বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

আবদুলাপুরের পুল :

এই পুলটি মিরকাদিমের খালের উপরে সংস্থাপিত। প্রবাদ এই যে কৌলীন্যমর্যাদাসংস্থাপক মহারাজা বল্লাল সেন কর্তৃক এই পুলটি নির্মিত হইয়াছিল। তিনটি মাত্র খিলানের উপরে উহা রক্ষিত। মধ্যস্থিত খিলানের প্রসারতা প্রায় সাড়ে ৯ হাত; খালের গর্ভ হইতে এই খিলানটির উচ্চতা প্রায় ১৯ হাত। পারিপার্শ্বিক খিলানদ্বয়ের প্রত্যেকটি প্রায় ৫ হাত প্রশস্ত ও প্রায় সওয়া ১১ হাত উচ্চ। স্তম্ভগুলি প্রায় ৪ হাত পুরু। সমুদয় সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৬ হাত। নির্মাণকৌশলদৃষ্টে ইহা সেনরাজগণের কীর্তির অন্যতম নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। পুলটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ; কিন্তু একেবারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, খিলানের অবলম্বনের অংশগুলি ফাঁটিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কতকাংশও ভূমিস্মাৎ হইয়াছে; দুইদিকের অপ্রশস্ত প্রাচীরের উপর দিয়া এখনও লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। List of Ancient Monuments of Dacca Division নামক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় যে ঢাকার পূর্বতন জনৈক কালেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন, "অষ্ট সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত হইলে ইহা পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্মিত পুলের সমতুল্য হইবে।" কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল, স্থানীয় জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার ফলে এই পুলটির মেরামতকার্য একপ্রকার সম্পন্ন হইয়াছে।

তালতলার পুল :

এই পুলটিও মহারাজা বল্লাল সেনের অন্যতম কীর্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামপালনগরী হইতে যে সুপ্রশস্ত প্রাচীন বর্ত্ম কোদালদহের উত্তরতীর স্পর্শ করিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া পদ্মাতীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহার বক্ষদেশ ভেদ করিয়া যে পয়ঃপ্রণালিদ্বয় সমান্তরালভাবে অবস্থিত, তদুপরিই আবদুলাপুর ও তালতলার সেতুদ্বয় সংস্থাপিত।

তালতলার সেতুটির অবস্থা পূর্ববর্ণিত সেতুটির অপেক্ষাও শোচনীয়। তিনটি খিলানের উপরে তালতলার পুলটি অবস্থিত ছিল। দুই পার্শ্বের খিলান দুইটির পাশ ৬ হাত ও উচ্চতা

বর্তমান সময়ে খালের তলদেশ হইতে ১০।১২ হাত। মধ্যস্থিত খিলানের পাশ ৮।৯ হাত, উচ্চতা প্রায় ২০ হাত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকায় সংবাদ প্রেরণের সুবিধাকল্পে এবং পূর্বসীমান্ত প্রদেশ ও ব্রহ্মযুদ্ধে প্রেরণ করিবার জন্য সৈন্য ও রসদাদিসহ প্রকাণ্ড নৌকা এই সেতুর নিম্নদেশ দিয়া যেন অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে, এজন্য মধ্যের বৃহত্তর খিলানটি বারুদসংযোগে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

ইহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় যাতায়াতের বড়ই কষ্ট হইয়াছে; তবে এখনও অতিকষ্টে জনসাধারণ একখণ্ড কাষ্ঠের শাহায্যে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

পানাম দুলালপুরের পুল :

পানাম হইতে যে একটি গ্রাম্যপথ হাজিগঞ্জ বৈদ্যেরবাজারের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ রাস্তার একটি খালের উপরে পাঠান আমলের কীর্তিচিহ্নস্বরূপে এই পুলটি বিদ্যামান রহিয়াছে। তিনটি খিলানের উপরে এই পুলটি সংরক্ষিত। মধ্যস্থিত খিলানটি পারিপার্শ্বিক খিলানদ্বয় অপেক্ষা উচ্চ, সুতরাং ঐ স্থান দিয়াই পণ্যবাহী তরণীসমূহ গমনাগমন করিতে পারে। পুলের উপরিভাগের রাস্তা অত্যন্ত ঢালু। পাঁচ ফুট পরিধি ব্যাপিয়া চক্রাকারে ইষ্টকগুলি সজ্জিত করা হইয়াছে। এই সমুদয় ইষ্টকচক্র পুলের পাদদেশস্থ প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভের শাহায্যেই যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে।

পুলের রাস্তাটির প্রান্তদ্বয়ের অনেক স্থান বসিয়া গিয়াছে। পুলের কোনও কোনও স্থানে নোনা ধরিয়াছে, পানামের সুবিখ্যাত ধনী রামচন্দ্র পোদ্দার ও গুরুচরণ পোদ্দার মহাশয়েরা এক্ষণে ইহার স্বত্বাধিকারী। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে এই প্রাচীন কীর্তিটি রক্ষা পায়।

এই পুলের উপর দিয়াই কোম্পানির কুঠিতে যাইতে হয। এই পুলটির সন্নিকটে যে অপর একটি সেতু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনপ্রণালিও পূর্বের সেতুটির অনুরূপ।

টঙ্গীর পুল :

ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দূরে টঙ্গীর পুল অবস্থিত। খান খানান মেয়াজ্জখাঁ (মীরজুম্লা) কর্তৃক টঙ্গীর পুলটি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন সাটঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মীরজুম্লার প্রস্তুত পাগলার পুলটির গঠনপ্রণালি টঙ্গীর পুলেরই অনুরূপ বলিয়া শেষোক্তটি মুরজুম্লা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মনে করি।

সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কার্নাকের আদেশানুসারে এই পুলের কতকাংশ ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু Sir Charles D'Oyly's Ruins of Dacca গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই পুলটির একটি খিলান বহুপূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে যে একটি লৌহনির্মিত সেতু এই স্থানে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যাস্রোতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাগলার পুল :

ঢাকা হইতে ৫ মাইল দূরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তার উপরে পাগলার পুল অবস্থিত। এই পুলটি সৈন্যাদি গমনাগমনের সুবিধার জন্য সুবাদার মীরজুম্লা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। বিশপ হিবার এই পুলটি এতদ্দেশীয় শিল্পীগণের হস্তপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তিনি ইহাতে Tudor Gothic শিল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তদীয় নৌকার মাঝিগণ হইতে এই পুলের নির্মাণ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবাদবাক্য পরিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতে উহা জনৈক ফরাসি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[১৮] Charles D'Oyly's Ruins of Dacca গ্রন্থে ইহার একটি অতি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে।

চাঁপাতলীর পুল :

আকালের খালের উপরে সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত চাঁপাতলী গ্রামে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত এক প্রকাণ্ড সেতু বিদ্যমান আছে। খিজিরপুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপরদিয়া ঢাকা পর্যন্ত গিয়াছে। এই পুলের উত্তর দ্বারে যে প্রস্তরফলক রক্ষিত আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, হিজিরি ১১০২ সনে লালা রাজমলকর্তৃক এই পুল নির্মিত হইয়াছিল।[২১] এই কায়স্থকুলতিলক লালা রাজমল ঈশাখাঁর অনন্তরবংশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ মনোয়ারখাঁর রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। চাঁপাতলীর অন্তর্গত লালাখাঁর বাগান বলিয়া একটি আম্রোদ্যান এতদঞ্চলে সুপরিচিত।

১. Khan Bahadu Syed Aulad Hussein's Antiquities of Dacca.

২. "The South face of the enclosure was formery washed by the river; but the stream has now receded some distances"— Couningham's Report on the Archaelogical Survey of India. Vol XV.

৩. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol V.

৪. পরিবিবির মকবেরার পশ্চিমে ঔরঙ্গজেব তনয় মহম্মদ আজিমের নির্মিত একটি নাতিক্ষুদ্র মসজিদ অদ্যপি বর্তমান আছে।

৫. "But the most curious part of this tomb is its roof, which is built throughout in the old Hindu fashion of overlapping layers". Cunningham's Archaelogical Report of India, Vol XV.

৬. "The sandal wood door of the tomb are also of Hindu designs, as the panels from regular Swastikas or mystic crosses." Cunningham.

৭. ইহার অপর নাম "ইরাণ দুক্‌ৎ"।

৮. টেভারনিয়ারের বিবরণ পাঠে মনে হয় তিনি দুইবার ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। একবার ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং আর এক বার ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৯. খান বাহাদুর আওলাদ হোসেনের মতে উহা ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাতইয়া ইব্রাইয়া" গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সায়েস্তাখাঁ ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রাজমহল হইতে ঢাকায় প্রথম পদার্পণ করেন। দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গলার কার্যভার গ্রহণ করিয়া ঐ সনের ৮ই মার্চের পূর্বে তিনি রাজমহলে আসিয়াছিলেন না।

১০. আমির-উল-উমরার বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন।

১১. বলাবাহুল্য যে এই সমুদয় প্রবাদের মূলে কোনই সত্য নাই।

১২. D. Oyle's Antiquities of Dacca.

১৩. Vide Para 5 of the Report of Mr. R. M. Shinner, offg. Magte. to Mr. J. H. Young Dy. Secy. to the Govt. of Bengal.

১৪. Khan Bahadur S. A. Hussein's Antiquities of Dacca.

১৫. Report of R. M. Shinner Esqr. Offg. Magistrate to G. H. Young Esqr. Dy. Secretary to the Government of Bengal.
হান্টার প্রভৃতি সকলে ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬. বুড়িগঙ্গার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড তোরণদ্বার এবং তৎপার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত অল্পায়তনবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারগুলি অষ্টকোণসমন্বিত উচ্চ চূড়াদ্বয় আজিও অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ঢাকার প্রাচীন সমৃদ্ধিগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

১৭. "Of the Pooshta residence the greater part has been carried away by the river, within the last twenty years, another is now only a small portion of it standing",. Dr. Taylor's Topography of Dacca, Page 96.

১৮. Dr. Taylor's Topography of Dacca.

১৯. "The Castle which I noticed, and which used to be the palace, is of brick, yet showing some traces of the plaster which has covered it. The architecture is precisely that of the Kremlin of Moscow."— Bishop Heber's Journey. Part I, Page 190.
২০. মগদীঘিটি ইসলামধর্মানুমোদিত পূর্ব-পশ্চিমদীর্ঘে খনিত। মগদিকের খনিত দীঘি পূর্ব-পশ্চিমদীর্ঘ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত মগের দৌরাত্ম্য সময়ে উহারা শহর সোনারগাঁয় এই সকল দীর্ঘিকার পারে অবস্থান করিয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী সময়ে উহা মগদীঘি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।
২১. কথিত আছে গিয়াসউদ্দিন হাফেজকে স্বীয় রাজধানী সুবর্ণগ্রামে আনয়ন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি এত দূরদেশে আসিতে সম্মত হন নাই।
২২. At the back of the mosque are the ruins of a house called the "Tahwil" or treasury, where within the memory of many living, feasts were given by the Superintendent, or Mutawalli, of the mosque". Dr. J. Wise—Notes on Sunargaon. East Bengal.
২৩. ঐতিহাসিক চিত্র, অগ্রহায়ণ ১৩১৮।
২৪. বাবা আদম হজরৎ আদম নামেও পরিচিত।
২৫. Dr. Wise on Sunargaon and Mr. Blochman's History and Geography of Bengal.
২৬. Arch. Surv. Rep., Vol X P. 134.
২৭. ডাক্তার হোয়াইট-এর মতে তিনটি এবং মৌলবী আবুলখয়ের-এর মতে দুইটি গুম্বজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্যানিংহামসাহেবের বিবরণীতে গুম্বজ ধ্বংসের বিষয় অবগত হওয়া যায় না। মিঃ গুপ্ত এই মসজিদটিকে এক গুম্বজবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি রিকাবিবাজারের মসজিদকেই বাবা আদমের মসজিদ মনে করিয়া এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মসজিদের ছাদ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় একটি মাত্র গুম্বজ ব্যতীত অপর কয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।
২৮. "It is a very beautiful specimen of this richest Tudor Gothic, but I know not whether it is strictly to be called an Asiatic buildings, for the boatmen said the tradition is, that it was built by a Frenchman.—Bishop Heber's Journal". Vol. I Page 202.
২৯. 'মাদনুল্ আফ্‌জাল লালা রাজমল ছাখ্‌তারাহে খোদা,
বাহারে নাজাৎ ওয়ার ছেরো চস্‌ম্ গোফ্‌ৎ তরিখাস্।
গো পোল্‌ছেরাতে চস্‌মায়ে আবেহায়াৎ।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান, দেবাধিষ্ঠিতস্থান, ধর্মমন্দির

ঢাকেশ্বরী :

বর্তমান ঢাকানগরীর পশ্চিম প্রান্তে ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই ইনি ঢাকেশ্বরী নামে অভিহিত হইতেছেন, অথবা ঢাকেশ্বরী দেবীর নামানুসারেই ঢাকার নামকরণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ঢাকেশ্বরী কতকাল যাবত জনসাধারণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা জানা যায় না। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের উনবিংশ অধ্যায়ে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে—

"বৃদ্ধ গঙ্গা তটে বেদ বর্ষ শাহস্র ব্যত্যয়ে
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈ জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদাঃ
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কা সজ্ঞকং দেশবাসিনঃ"।।

প্রবাদ এই যে, সতীদাহ ছিন্ন হইয়া তদীয় কিরীটের "ডাক"[১] এই স্থানে পতিত হইলে, এইস্থান একটি উপপীঠ মধ্যে গণ্য হয়। "ডাক" পতিত হওয়াতেই এই স্থানের নাম ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী নামে সুপরিচিত হইয়াছে।

দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ বল্লালের জন্মসম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, ঢাকেশ্বরী বাড়ির নিকটস্থ কোনও উপবনে তদীয় জননীকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বনবাস দেওয়া হইলে, বল্লাল প্রসূতি ঢাকেশ্বরীর আরাধনা করেন। এই সময়েই বল্লালের জন্ম হয়। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া মাতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বনলাল বা বল্লাল। মহানুভব বল্লাল ভূপতি রাজসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বনাকীর্ণ আবর্জনাসম্পূরিত উক্ত স্থানটি জনসাধারণের বাসোপযোগী করিয়াছিলেন। দেবীর মন্দিরটিও বল্লালের আদেশেই নির্মিত হইয়াছিল। রাজাদেশে দেবীর সেবার জন্য পূজারি নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।[২]

আর একটি প্রবাদ এই যে, মহারাজ মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া গৃহদেবী শিলাময়ী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। এ সম্বন্ধে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তদীয় বারভূঞা গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, "পরে তত্রত্য কর্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্তির অনুরূপ হিরণ্ময়মূর্তি নির্মাণ জন্য নিয়োগ করিয়া তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যে অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্য সর্বদা রক্ষিগণকে তত্ত্ব-তালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্মাণ করে। যে দিবস কার্যশেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া থাকে, "মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্মিত দেবীমূর্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, নির্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্মিত মূর্তিটিকে দেবীর আসোনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্তিকে মাজিয়া ঘষিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্তি একত্র হইলে কোন টি বা পূর্ব নির্মিত এবং কোনটি বা নবনির্মিত কেহই তাহা নির্বাচন করিতে পারিলেন না। পরে কারিগরেরা এই রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে

মানসিংহ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া চাঁদরায়ের দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপর মূর্তিটি ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্তিই অষ্টধাতু নির্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

ঢাকেশ্বরীর মন্দির পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইলেও উহার গঠনপ্রণালি এবং ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন ইষ্টক খণ্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই মন্দিরটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্মিত হইয়াছিল।

রমনার কালী : ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে রমনার ময়দানে দশনামী সন্ন্যাসীদের একটি মঠ আছে, শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী উদাসীগণ কর্তৃক এই মঠ সংস্থাপিত হয়। এই মঠমধ্যে ব্যাঘ্রম্বরপরিধানা চতুর্ভুজা পাষাণময়ী কালীকাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্তমান কালীবাড়ি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্বতন কালীবাড়ির ভগ্নাবশেষ এই মঠের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত।

মহারাজ রাজবল্লভ এই মঠটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভীষণ ভূকম্পে মঠের শীর্ষদেশ ফাটিয়া গেলে গভর্নমেন্ট উহার সংস্কার করেন। নিকটবর্তী পুষ্করিণীটি ভাওয়ালের স্বর্গগতা রাণী বিলাসমণি দেবীর ব্যয়ে খনিত হইয়াছে, প্রতি অমাবস্যায় দেবীর তৃপ্তার্থে বলির ব্যবস্থা আছে।

প্রাঙ্গণ মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়; সাধক প্রবর ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলিয়া লোকে এখনও উহা পূজা করিয়া থাকে।

প্রান্তর মধ্যস্থিত এই জনসমাগমশূন্য বিরলবসতি স্থানই সাধনার পক্ষে অনুকূল বলিয়া ব্রহ্মানন্দ এখানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্রহ্মানন্দের ন্যায় সাধকশ্রেষ্ঠের পুণ্যস্মৃতি এইস্থানের ধূলিকণার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই ইহা পুণ্যস্থান বলিয়া সমাদৃত। এইস্থান তদীয় গুরুধাম বলিয়া জনশ্রুতি।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ব্রহ্মানন্দ গিরির জননী দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক তিলক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দ প্রসূত হন। নির্দয় দস্যুরা নবজাত শিশুকে তথায় রাখিয়া জননীকে লইয়া প্রস্থান করিল ; পরে, শিশুর পিতা এই সংবাদ পাইয়া পুত্রকে ক্ষেত্র হইতে আনয়ন পূর্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ গিরি নিতান্ত দুর্বিনীত, ভ্রষ্টাচারী ও চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। কুলত্যাগিনী মাতাও অনন্যোপায় হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। কুসঙ্গদোষে একদা ব্রহ্মানন্দগিরি তাঁহার মাতার ঘরেই প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ গিরির ললাট দেশে একটি জুড়ুল ছিল। সেই নিদর্শন দৃষ্টে জননী পুত্রকে চিনিতে পারিলেন। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দগিরি সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ প্রথমত রমনার কালীবাড়ি আসিয়া দশনামী সন্ন্যাসীদিগের দলভুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি নাম ধারণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এইপথ পরিত্যাগ পূর্বক তান্ত্রিক সিদ্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিয়াছিলেন, যে মহাশক্তির প্রেরণায় জগতের তাবৎকার্য যন্ত্রচালিতের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদীয় দুষ্কার্যও তাঁহারই প্রেরণাসম্ভূত। তিনি এই দুষ্কর্মের প্রতিশোধ-গ্রহণ-সঙ্কল্প লইলাই তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেন। সেইজন্যই ইষ্টদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়াও সাধক বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মানন্দগিরিগিরীন্দ্র তনয়া বক্রামৃত বাঞ্ছতি।" ব্রহ্মানন্দের কঠোর সাধনায় দেবী পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তের আসন মস্তকে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমা ও তারা এই দুই মূর্তিতে দেবী প্রস্তর বহন করত ভক্তের অনুগামী হইতেন। লোকে দেখিত, প্রস্তরখানা শূন্যের উপর দিয়া ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। কথা ছিল, প্রার্থনার অন্যথাচরণ করিলে দেবী অন্তর্ধান হইবেন। একদা তিনি রমনার মাঠে যাইয়া প্রস্তরসহ গুরুধামের প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করা সমীচিন বিবেচনা করিলেন না। তাই দেবীকে পাথর নামাইয়া দ্বারদেশে বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ

করিতে উদ্যত হইলে, দেবী কহিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল, যখন তুমি পূর্ব প্রার্থনার অন্যথা করিতে বলিবে, তখন আমি প্রস্থান করিব। তুমি আমাকে প্রস্তরবাহক করিয়া তোমার সহিত বিচরণ করিতে বলিয়াছিলে, উহা নামাইতে বলিলে কেন? অতএব আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তথায় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করত দেবী অন্তর্ধান হন। পাথরখানা ওজনে প্রায় দেড় মণ হইবে। প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক, এই প্রস্তরখানার উপরে উপবেশন করিয়াই যে ব্রহ্মানন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। প্রস্তরখানা এক্ষণেও রমনার কালীবাড়িতে বিদ্যমান আছে।

বর্তমান মন্দিরের কিছু উত্তরে পূর্বোক্ত কালীবাড়ির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এইখানেই দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মঠ ছিল List of ancient monuments গ্রন্থে রমনার মঠের উল্লেখ আছে।

সিদ্ধেশ্বরী ও মালীবাগের আখরা :

ঢাকা নগরীর উত্তরাংশে, বর্তমান নিউটাউনের সন্নিকটে, মালীবাগ নামক স্থানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই কালীমূর্তি বিক্রমপুরাধিপৃত চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। মন্দিরের প্রাঙ্গণমধ্যে একটি রক্তচন্দনবৃক্ষ মন্দিরের সমীপবর্তী অন্য কোথায়ও আর দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির প্রায় সংলগ্ন পশ্চিমোত্তর দিকে, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে, একটি বাঁধান পুকুর ও কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে, উহা মালীবাগের আখরা নামে পরিচিত। শ্যাম পুত্রপূর্ণ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপনাপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এরূপ ভাবে আলিঙ্গনসংবদ্ধ হইয়া এখানে শান্তকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছে যে, মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রদীপ্ত কিরণজালও ইহা ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং নিদাঘ মধ্যাহ্নের সুশীতল বায়ুস্পর্শে শরীর শীতল হইয়া যায়। পৌষমাসে ঢাকা নগরীর আমোদপ্রিয় অধিবাসীবৃন্দের আনন্দ কোলাহলে এই স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময় এখানে একটি মেলা জমিয়া প্রায় একমাসকাল স্থায়ী হয়। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদরায়ের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই সময়ের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে সিদ্ধেশ্বরী স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

প্রবাদ এই যে, সিদ্ধেশ্বরীর জনৈক সেবাইত সৌমারবন গোস্বামী একজন স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এইস্থানেই সিদ্ধি লাভ করেন। একদা এই মহাত্মা দেবীর প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত একটি ইন্দারা মধ্যে লৌহশৃঙ্খল সহযোগে অবতরণ করেন। তিনি পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি এই শৃঙ্খল কূপজলের স্ফীতিহেতু নিমগ্ন হইয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যতকাল পর্যন্ত ইহা জলমগ্ন হইয়া না যাইবে ততকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন। বর্ষাকালে স্থানীয় কূপসমূহে জল বৃদ্ধি হইলেও এই কূপের জলরাশির কিঞ্চিন্মাত্র স্ফীতি অনুভূত হয় না। এই শৃঙ্খলটি অদ্যাপি একই অবস্থায় কূপমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে।

কথিত আছে, আজিমপুরার সাধকশ্রেষ্ঠ সাআলিসাহেব একদা একটি ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিয়া সৌমারবন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ই তাহাদিগের নিজ জাতীয় সাধুপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য এইরূপ নানা অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছে।

শারদিয় উৎসবের সময়ে দেবীর সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা দিবার প্রথা বহুপূর্বকাল হইতেই এখানে প্রচলিত আছে। পূজা সমাপনান্তে বিজয়া দশমীতে পূজারিগণ এই ঘট প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে বিসর্জন করিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে এই ঘট পুনরায় জাগিয়া উঠে। পরে ঐ ঘট পুনরায় সংস্থাপনপূর্বক দশাহ পর্যন্ত পূজা হইয়া বিসর্জিত হয়। প্রতি বৎসরই এইরূপে পূজা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের "বন" উপাধিধারী উদাসীনগণই এই মঠের কার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নে দেবীর সেবাইতগণের যথানুক্রমিক নাম প্রদত্ত হইল :

সৌমার বনগোস্বামী
এৎবার বনগোস্বামী (চেলা)
রামেশ্বর গোস্বামী (চেলা)
সুমেরু বনগোস্বামী (পুত্র)
নরসিংহ গোস্বামী (জীবিত)

দেবীর বর্তমান সেবাইত নরসিংহ গোস্বামীর বয়স এক্ষণে প্রায় ৫৫ বৎসর।

১২৭২ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে সুমেরু বনগোস্বামী ঢাকা ফুলবাড়িয়ার গোপাললোচনমিত্র বরাবরে যে একখানা কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া দেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খিলগ্রাম মৌজার মধ্যে চারিশত চল্লিশ বিঘা উনিশ কাঠা দশ ধুর জমি "শ্রী শ্রী ৺সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রী ৺মহাদেব ঠাকুর বিগ্রহের" দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তি ভুক্ত।

List of ancient amnuments গ্রন্থে এই মঠ ও আখড়ার উল্লেখ নাই।

বুড়াশিব :

কালিকাপুরাণের অশীতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, বৃদ্ধগঙ্গার জলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত।

যথা "বৃদ্ধ গঙ্গা জলস্যান্ত স্তীরে ব্রহ্মপুত্রস্য বৈ।
বিশ্বনাথো হরয়ো দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ।।

কালিকা পুরাণোক্ত বিশ্বনাথ এবং এই বুড়াশিব অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। আবার অনেকে বলেন যে এই বুড়াশিব ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। যিনি যাহাই বলুন এই শিবলিঙ্গটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, একদিন আমি ও আমার কয়েকটি বন্ধু ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর নিকটে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বুড়াশিব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "পাঁচ বরষ মে চন্দরনাথ হো যায়গা"। মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম, মদনমোহন :

নবাবপুরের যে স্থানে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপিত আছে, উহা অমরাপুর বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। নবাবপুরের বসাকগণের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণদাস মুচ্ছদি মহোদয় কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসাক মহাশয় কীর্তিকুসুম নামক গ্রন্থে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্বে দ্বাদশভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদাররায়ের কুলদেবতা ছিল। ৯৮২ বঙ্গাব্দে ইহা কৃষ্ণদাসের হস্তগত হয়।[৩]

এই সময়ে কৃষ্ণদাস অশোকাষ্টমীর স্নান উপলক্ষে পঞ্চমীঘাট তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। চক্রবাহীব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের উদ্দেশ্যে প্রথমত ঢাকানগরীতে এবং পরে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ পঞ্চমীঘাট তীর্থে উপনীত হইয়া কৃষ্ণদাসের হস্তে এই শালগ্রাম শিলা অর্পণ করে। কৃষ্ণদাসও সানন্দে লক্ষ্মীনারায়ণের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে তদবধিই কৃষ্ণদাসের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল।

প্রবাদ এই যে, তিনি নিদ্রাবেশে শ্রীশ্রীবলরাম মূর্তি সন্দর্শন করিয়া স্বপ্নলব্ধ অপরিস্ফুট প্রত্যাদেশ বাক্য প্রতিপালনোদ্দেশ্যে ভগবান রেবতী রমণের দারুময় সুন্দর সুঠাম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। অচিরকাল মধ্যেই সর্বজন চিত্তহারী দারুময় মনোহর বলরাম মূর্তি নির্মিত হইল। তদনন্তর গয়াধাম হইতে পাষাণময় মদনমোহন বিগ্রহ আনাইয়া ও

অষ্টধাতুময়ী সমুজ্জল কিশোরী মূর্তি গঠিত করিয়া ১০২০ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীপাদ বীরভদ্র গোস্বামীর নামে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র ও বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিলেন।

কৃষ্ণ মুচ্ছদ্দির অনন্তর বংশ্য ৺কৃষ্ণগোবিন্দ বসাক কর্তৃক ১২৯৪ বঙ্গাব্দে একখানা রথ প্রস্তুত হয়। তৎপরবর্তী বৎসরে সমুদয় সেবাইতগণের অর্থে পঞ্চায়তি বলদেবের রথ প্রস্তুত হয়।

রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা ব্যতীত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র বাহিরে আনয়ন করা হয় না। পুষ্পযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মযাত্রা, গোবর্ধনযাত্রা, নিয়মপূর্ণা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মযাত্রার উৎসব কৃষ্ণদাসমুচ্ছদি কর্তৃক নিজ প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীশ্রী ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রীত্যর্থে সূচিত হয়।

কৃষ্ণদাস মুচ্ছদিই ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী ও মিছিলের প্রবর্তক। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই উৎসবের সূচনা করেন।

অনুমান ১০২০ বঙ্গাব্দের পর ব্রজলীলার সং লইয়া মিছিলের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয় সং ব্যতীত অন্য কিছু জন্মাষ্টমীর অঙ্গভুক্ত করিবার আবশ্যকতা তখনও উপলব্ধি হয় নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ যশোদাদি একটি কাষ্ঠ নির্মিত মঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়া বাহির করা হইত। তৎসঙ্গে দধি নবনী প্রভৃতি ভারবাহী ও অন্যান্য নর্তনপর গোপ ও ব্রজবাসীগণ কেহ কেহ অশ্বোপরি ও কেহ বা ভূপৃষ্টে থাকিয়া নৃত্য ও বাদ্যাদি করিয়া চলিত। ইহাই প্রথমাঙ্গ নন্দোৎসব বটে। সেই সঙ্গে ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব বস্যকবৃদ্ধগণ পীতবসনপরিহিত ও পুষ্পমাল্যাদি ভূষিত হইয়া খোল করতাল যোগে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে উহা প্রত্যুদগমন করিত। অনন্তর কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১০৪৫ বঙ্গাব্দের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিপাদসমন্বিত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মূর্তি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে ক্রমশ পতাকা নিশানাদি ও বন্দুক বর্ষা প্রভৃতি এবং আশাসটা-বল্লম ছড়িধারী পদাতিক ও অন্যান্য সাজসজ্জাসহ মিছিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই মিছিলের পরবর্তী উন্নতাবস্থা।

ক্রমে নবাবপুরের তদানীন্তন অন্যান্য ধনীবসুকগণও নিজ নিজ দেবালয় হইতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সং বাহির করিয়া মিছিল গৌরবান্বিত করিতেছিলেন। এইরূপে প্রায় শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইলে উর্দুবাজারস্থ গঙ্গারাম ঠাকুর নামক জনৈক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বসুকদিগের আদর্শানুকরণে একটি মিছিল বাহির করিয়া উর্দু হইতে নবাবপুর পর্যন্ত লইয়া আসিতেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে মিছিলগুলি নবাবপুর মধ্যেই পর্যটন করিত। পরে উহা নবাবপুর অতিক্রম করিয়া বাংলাবাজার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করত পুনরায় নবাবপুরে প্রত্যাবর্তন করিত।

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে পান্নিটোলা নিবাসী গদাধর ও বলাইচাঁদ বসুক কর্তৃক ইসলামপুরের মিছিলের আরম্ভ হয়। এই মিছিল উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের প্রীত্যর্থেই বাহির হইতে থাকে। এই সময়ে বলাইচাঁদ গদাধর শহরের মধ্যে সম্পদ গৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহারা মিছিলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া মহাসমারোহে নবাবপুর পর্যন্ত মিছিল আনয়ন করিতে থাকেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে মিছিল যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমশ উভয়পক্ষে নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মনোরঞ্জন চিত্র প্রভৃতি সং এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সময়েই বড়চৌকি, সোনারূপার চতুর্দোল, হস্ত্যশ্ব সমূহের জন্য সাচ্চার কাজকরা জরির সাজ মিছিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গভর্নমেন্টের পিলখানার হস্তীসমূহ শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইল। উভয়পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় সাধিত হইয়া বিবিধ পাদচারী ও মঞ্চ স্থাপিত সং মনোরম সাজসজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাঁকাল করিয়া তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার পূর্বতন শাসনকর্তা নবাবগণ যে

প্রকার মিছিল সমভিব্যহারে অতি সমারোহে নগরে বাহির হইতেন, তাহারও কতক অনুকরণ করিয়া ঐ নবাব-সোয়ারির অংশ মিছিলের কোনও কোনও স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সূচনা হইতে ও পর্যন্ত নবাবপুরের মিছিল পাঁচবার স্থগিত রহিয়াছে।

১। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যখন বঙ্গদেশ সন্ত্রস্ত, সেইবার মিছিল বাহির হয় নাই। ২। বৃন্দাবনীধুম—বৃন্দাবন দেওয়ান রাজদ্রোহী হইয়া যে বৎসর ঢাকা নগরী লুণ্ঠন করেন, সেবৎসর মিছিল বন্ধ ছিল। ৩। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধের সময় মিছিল হইতে পারে নাই। ৪। সামাজিক দলাদলির ফলে একবার মিছিল বন্ধ হয়। ৫। ১২৬০ সনে ইসলামপুরের প্রতিযোগিতায় বিবাদ বিসম্বাদের আশঙ্কায় মিছিল বন্ধ থাকে।

ইসলামপুরের মিছিল এ পর্যন্ত বন্ধ হয় নাই।

নবাবপুরের ধনাঢ্য বসাকগণ নিজ নিজ বাড়ি হইতে মিছিল করিয়া একত্রে নির্দিষ্ট পথে গমন করেন। ইসলামপুরের মিছিল কেবল গদুবলাইর বংশধরগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

রাজাবাবুর লক্ষ্মীনারায়ণ :

ঢাকা-লক্ষ্মীবাজার রাজাবাবুর বাড়িতে এই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভিখন লাল ঠাকুর এই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানির দেওয়ানিপদ পর্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক ইনি পাঁচটি নারায়ণচক্র লাভ করিয়া উহা বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ঢাকার নরসিংহজির আখরায়, লক্ষ্মীবাজার নামক স্থানে, নারায়ণগঞ্জ বন্দরে, ইদ্রাকপুরে এবং পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে উক্ত পাঁচটি শালগ্রাম মহাসমারোহে স্থাপিত করিয়া স্বীয় জমিদারিভুক্ত নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আয়, পূজা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহার্থে ধার্য করিয়াছিলেন। নারায়ণ বিগ্রহের সেবার জন্য এই স্থানের আয় নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহা নারায়ণগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

পরে গভর্নমেন্ট নারায়ণগঞ্জ বন্দর বাজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প করিলে ভিখন লাল ঠাকুর ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডগলাস এর নিকটে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে যে একখানা দরখাস্ত লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"I hold Narayangunge in virtue of a Sanad granted by the Company for the purpose of defraying the expenses of the Takoor, for feeding the poor, and for my support. To this day the gentleman have not resumed Debouter, Bermouter, Lackarage, Aymah, Piran and Fakiran lands of ancient establishment and the proprietors have been suffered to enjoy them unmolested. I have been an old and faithful servent of the Company and have hald Narayangunge these thirty years; and now that I am worn down with years and infirmities and have no other means of support, I learn that a darogah is appointed to Narayangunge to attach the same. This news have overwhelmed me with grief and as I am too ill and too week to wait on you. I have sent my son to you to represent my miserable situation. He will show you my Sanad. Let me beseech you to give a favourable ear to his representation; but if you do not, it were better that take away my life, or expel me from a district where I can no longer remain without incurring shame trouble and infinite distress. Hundreds of beggars who are daily fed

my me are clamourous for food and you have not only deprived me of the means of supplying their wants but shut the door against my performing my religious rites bu taking possession of the Gunge".

ঠাঠারী বাজারের জয়কালী :

ঠাঠারী বাজারের জয়কালীর মন্দির এবং নবরত্ন মঠ প্রায় ২০০।২৫০ বৎসরের প্রাচীন। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত কালীমূর্তি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ৭০ ও ৫০ ফুট উচ্চ দুইটি মঠ বিদ্যমান আছে। পশ্চিম পার্শ্বের মঠটি পঞ্চচূড় পঞ্চরত্ন নামে সুপরিচিত। মন্দিরের সন্নিকটে একটি নবরত্ন মঠের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রায় ২৮ বৎসর যাবত উহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। জয়কালীর মন্দির হইতে নবরত্ন মঠটি ৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। List of ancient monuments গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

মাধবচালার সিদ্ধিশক্তি :

তুরাগ নদীর পূর্বতীরবর্তী সাকোসার গ্রামে পশ্চিমদিকে সিদ্ধিশক্তি নামে এক পাষাণময়ী দশভূজামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্তি এবং মন্দিরটি অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ নরপতিগণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের জ্যোতি মলিন হইয়া শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়েই বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মহিষমর্দিনী, সিংহবাহিনী, চুণ্ডারোষিণী প্রভৃতি মূর্তি এই সময়েই নির্মিত হইয়া থাকিবে।

মিতারার দশভূজা :

ময়মনসিংহ জেলাস্থিত পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে প্রায় ১০০০ বঙ্গাব্দে অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে ভগবতী দশভূজার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উহা এই জেলার মিতারা গ্রামে আনীত হয়।

উক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের জয়দুর্গা নাম্নী কন্যার দেহলতা জন্মকাল হইতেই দ্বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছিল। এই বিচিত্র কন্যার জন্মগ্রহণ অধ্যাপক মহাশয়ের কতদূর প্রীতিপদ হইয়াছিল বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী-জনগণের নানাবিধ মর্মন্তুদ উক্তি যে বালিকার বিবাহ বিষয়ের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয়কে বিষমচিন্তায় পড়িতে হইল। এবং বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলেও বরের সন্ধান করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্তী মিতারা গ্রামবাসী রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যার্থী হইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সমীপে আগমন করেন। কার্যকলাপ দৃষ্টে অন্যান্য বিদ্যার্থীগণ রাঘবকে নিতান্ত নির্বোধ বলিয়া মনে করিত। চতুরের নিকটে নির্বোধের যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায় এক্ষেত্রেও তাহার বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল না। কাজেই অভাব অসুবিধার বিষম ভার রাঘবের ভাগ্যেই অধিক পড়িত। গভীর রাত্রিতে গৃহে অগ্নির অভাব হইলে, নিকটবর্তী বিভীষিকাময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসীর ধুনী হইতে অগ্নি আনয়ন, অপর কাহারো শাহসে কুলাইত না; সে সময় সকলে রাঘবকেই সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করিত।

সুচতুর পণ্ডিতমহাশয় রাঘবেন্দ্রের বুদ্ধির দৌড় সন্দর্শনে তাহাকেই জয়দুর্গার উপযুক্ত বর স্থির করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাঘব পাঠ সমাপন করিয়া অধ্যাপক সন্নিধানে বিদায়গ্রহণ করিবার জন্য চরণবন্দনা করিলে তিনি গুরুদক্ষিণার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"আমার কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করিয়া তুমি আমাকে দক্ষিণা প্রদান কর।" একেত রাঘব বুদ্ধিমান। তদুপরি আবার গুরুদক্ষিণার কথা। কাজেই এই বিবাহ হইতে আর কালবিলম্ব হইল না।

বিবাহান্তে শ্বশুরগৃহে গমন কালে জয়দুর্গা পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দশভূজা মূর্তি পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া, পিতা বলিলেন, দেবীর পূজার উপস্বত্বই আমার সংসারের প্রধান সম্বল; তুমি যদি দেবীকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাইবে, তবে আমার সংসার চলিবে কিরূপে? জয়দুর্গা উত্তর করিলেন, "আমার সন্তানগণ আপনার শিষ্য হইবে, এবং তদ্দ্বারাই আপনার সংসার চলিতে পারিবে।" উত্তর শুনিয়া পিতা জয়দুর্গার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং দশভূজা জয়দুর্গাকে প্রদান করা হইল।

রাঘব ভট্টাচার্য সস্ত্রীক মিতারাগ্রামে উপনীত হইলে তদীয় পিতা নববধূর পাকস্পর্শের আয়োজন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধবসহ অপরাপর ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে পরস্পর কানাকানি চলিতে লাগিল। একেত বিদেশী মেয়ে, তদুপরি বধুর শরীরের বর্ণ অত্যদ্ভুত, কাজেই বিশেষ প্রকারে অর্থব্যয় করিয়া মনস্তুষ্টি সাধন না করিতে পারিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নববধূর প্রদত্ত অন্ন আহার করিবেন না। সুতরাং রাঘবের পিতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতচ্ছ্রবনে নববধূ, শ্বশুরকে লোকদ্বারা জানাইলেন, "নিমন্ত্রিতগণকে ভোজনাসনে উপবেশন করিতে বলুন, টাকার ব্যবস্থা পরে করা যাইবে।" বধুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শ্বশুর সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসনে উপবেশন করিলে জয়দুর্গা অন্নপূর্ণপাত্রহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ বাতাস লাগিয়া নববধূর মাথার ঘোমটা পড়িয়া গেল। জয়দুর্গার দুই হাত বদ্ধ, কাজেই কি করেন! স্বয়ম্বর স্থলে রাজগণের চক্ষু যেমন ইন্দুমতীর প্রতি পতিত হইয়াছিল, তেমনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, আগ্রহ সহকারে নববধুর দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাহারা সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পাইলেন, জয়দুর্গা, স্বীয় দেহযষ্ঠি হইতে অন্য দুইখানি হাত বাহির করিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিতেছেন। ঘোমটা দেওয়া হইলেই হাত দুখানি আবার জয়দুর্গার দেহের সহিত মিশাইয়া গেল। সকলে বুঝিলেন, ও সামান্যা মেয়ে নয়, ভগবতী অংশত অবতার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। দর্শকগণ বিহ্বল; ভক্তিভরে তাহাদের শরীর কণ্টকিত; সুতরাং আর টাকা প্রাপ্তির আপত্তি রইল না। সকলেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি শরীরের কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণের সমাবেশ অনুসারে জয়দুর্গা "অর্ধকালী" নামে খ্যাতিলাভ করিলেন।

জয়দুর্গার আনীত দশভূজা এখনও মিতারা গ্রামে আছে। "অর্ধকালীর" সহিত দশভূজার নাম বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই এই দেবী মূর্তি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

নান্নারের বনদুর্গা :

শ্রীশ্রীবুড়াবুড়ি (বনদুর্গা), নান্নার গ্রামের এক নমঃশূদ্র বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন অনেকেই এই স্থানে মানসিক দিয়া থাকে। বুড়াবুড়ি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। হাঁস, কবুতর, বরাহ, অজশিশু, প্রভৃতি বলি দেবীর নিকট প্রদত্ত হয়।

বরাহ বলির রীতি এতদঞ্চলের অন্য কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও বিরল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইহা বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বিধান মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কালিকাপুরাণে সকল প্রকার পক্ষী, বরাহ, গোধিকা এবং সিংহ ও শার্দুল প্রভৃতি বলিরবিধানও পরিলক্ষিত হয়।

যথা :

"কৃষ্ণসারস্য রুধিরৈঃ শূকরস্য চ শোণিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি সততং দেবী তৃপ্তিং দ্বাদশ বার্ষিকীম্।।

ধামরাইর যশো-মাধব :

কথিত আছে, পুরীধামের জগন্নাথমূর্তির প্রথম কলেবর নির্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি গঠিত হইয়াছে। মাধবের মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"অর্ধ মূর্তি রাখি বিশ্বকর্মা মহামতি।
চ'লে গেল নিজ স্থানে হ'য়ে ক্ষুন্নমতি।।
তারপর শুনহ অদ্ভুত বিবরণ।
যেমন মাধব মূর্তি হইল গঠন।।
জগন্নাথ নিরমিয়া যে কাষ্ঠ আছিল।
গৃহে আনি যত্নে তরে মূরতি গঠিল।।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
কস্তুরি শোভিত কর মাধব মুরারি।।
পদতলে নিরমিল রক্ত শতদল।
রবি শসি যার তেজে করে ঝলমল।।
ক্ষীরোদসাগরশয্যা অনন্ত আসন।
কিরীট কুণ্ডল আর রত্ন আভরণ।।
লক্ষ্মী সরস্বতী দোহে করে পদ সেবা।
দশ অবতার দিল লীলা বোঝে কেবা।।
কপালে মাণিক দিল সূর্য কোন ছার
(করিয়াছে চুরি যাহা পাণ্ডা দুরাচার)।।
হিরণ্য গর্ভের যেবা বুদ্ধি দিয়াছিল।
সেই মূর্তি বিশ্বকর্মা অভেদ গড়িল।।
গড়িয়া বিরলে মূর্তি সহস্র বৎসর।
পূজা করে মর্ত লোকে, নাহি জানে নর।।"

এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্তিটির পদ্মাসন হইতে দুইটি সর্প ফণা উত্তোলন পূর্বক মাধবের নিম্নদিকস্থ দক্ষিণ ও বাম কর-প্রকোষ্ঠ চুম্বন করিয়াছে। ইহা দ্বারা অনন্ত আসন সূচিত হইতেছে; লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তির দুইদিকে, ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ও প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান। পদ্মাসনের নিচে গজকচ্ছপের দ্বন্দ্ব-মীমাংসাকারী গরুড় বাহন-স্বরূপে অবস্থিত। গরুড়ের দুইদিকে চারিটি রাজহংস উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

চালীর উর্ধ্বদেশে বৃষভ-বাহন শম্ভু এবং তাঁহার দুইদিকে ভগবানের দশাবতার মূর্তি ক্রমে নিম্নদিকে বিরাজমান।

এই মাধব পালবংশয় যশোপাল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, একদা রাজা যশোপাল একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে দামরাই গ্রামের অনতিদূরবর্তী শিমুলিয়ার নিকটস্থ গাজিবাড়ির এক উচ্চ ভিটার সম্মুখে উপনীত হইলে হস্তী আর অগ্রসর না হইযা পশ্চাৎ দিকে হটিয়ে যাইতে লাগিল। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নরপতি তৎক্ষণাৎ গজ হইতে অবতরণপূর্বক কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাদেশে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল।[৫] যশোমাধব সংবাদে লিখিত আছে :

"মাটি কাটি শ্রীমন্দির বাহির করিল।
কপাট ভিতরে আটা খুলিতে নারিল।।

অতঃপর মহারাজা ব্যাকুল হইয়া।
তিনদিন অনাহারে রৈল হত্যাদিয়া।।
ভক্তি দেখি ভগবান নারিল থাকিতে।
দৈববাণী আসি তারে কৈল অলক্ষিতে।।
তোর বংশ থাকিবে না তুলিলে আমারে।
তমোপূর্ণ পৃথিবী দেখিয়া আমি ডরে।
লুকাইয়া আছি হেথা মৃত্তিকা ভিতরে"।।

কিন্তু ভক্ত নরপতি "তুমি মোর ধনবংশ তুমি শিরোমণি।" বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃহে আনয়নপূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশোপাল নির্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু "বংশগেল যশোনাম মাধবে মিলিল।" মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়া রহিয়াছেন। যশোপালের পরলোক গমনের পরে উৎকল দেশীয় পাণ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চনার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

পালবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের পরে চাঁদপ্রতাপ ও ভাওয়ালে গাজি বংশের অভ্যুদয় হয়। মোসলমানদিগের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ধামরাই নিবাসী শ্রোত্রীয় রামজীবন মৌলিক কুমরাইল গ্রামে মাধব বিগ্রহকে কিয়ৎকাল পর্যন্ত রাখিয়া ছিলেন। কিছুদিন পরে এই বিগ্রহ "ঠাকুরবাড়ি পঞ্চাশে" স্থানান্তরিত করা হয়। কুমরাইল ও ঠাকুরবাড়ি পঞ্চাশই আদি ধামরাই ; পরে এই বর্তমান স্থানে (এই স্থান পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল) বিগ্রহ পুনরায় স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

যশোপাল রাজার জনৈক ওয়ারিশ এই বিগ্রহের জন্য রামজীবনের নামে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যশোপালের প্রকৃত ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হওয়ায় রামজীবন মৌলিকের হস্তেই বিগ্রহের ভার অর্পিত হয়।

মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদি বিনা সৈন্ধবে পাক হয়। বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি মাধবের জন্য একখানা রৌপ্য সিংহাসন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। জনৈক ভক্ত একখানা সুদৃশ্য হিরণ্ময় মুকুট প্রদান করিয়াছেন।

আলমগির বাদশাহের খানাজাত মহম্মদ মোজহরের দস্তখতি ও মোহরযুক্ত ১০৯২ সনের ১০ই মাসের তারিখযুক্ত একখানি সনদ দ্বারা রামজীবন ৩৭ বিঘা জমি জায়গির স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জমির উপসত্ত্ব হইতেই মাধবের সেবাকার্য সম্পন্ন হইত।

ধামরাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে, মাধব, কুমরাইল এবং ঠাকুরবাড়ি পঞ্চাশে স্থাপিত ছিল তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই স্থানে পুরাতনমাধববাড়ির ঘাট বলিয়া একটি স্থান আছে, ঐ ঘাট প্রায় ৮ কাঠা জমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নবাবি আমলের কাগজপত্রে "মাধববাড়ির ঘাট" বলিয়া এই স্থান চিহ্নিত হইয়াছে।

মোসলমান-উপদ্রবে মাধবের স্থানান্তরিত হইবার বিষয় একখানা প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে। ঐ কাগজখানা রামজীবনের অনন্তরবংশ্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্ররায় মহাশয়ের নিকটে আছে। এতৎসম্পর্কীয় যে কয়খানা দলিলের অনুলিপি উক্ত রায় মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১ নং দলিলের নকল :

রাজীব মিত্র, রমাকান্ত বসু, রামজগন্নাথ গুহ, রাধাবল্লভ দাস, জয়রাম সেন, রূপনারায়ণ দাস, হরিনাথ দাসস্য।

শ্রীযুত মহকুব শ্রীযুত যশোমাধব ঠাকুর কুমরাল গ্রামেতে দেবলয়ত আছিলা। রামশর্মা ও ভগীরথশর্মা ও রাধাবল্লভ শর্মা ও গয়রহ সেবাইতেরা আপনার আপনার ওয়াদামির সেবা করিতেছিল, রাত্রি দিবা চৌকি দিতেছিল। শ্রীরামজীবনমৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুযানুক্রমে

করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগনা পরগনাতে দেওতা মুরতি তোড়িবার আহাদেশ হুজুর থানার পরওয়ানা লইয়া আর আর পরগনাতেও দেওতা মুরতি তোড়িতে আসিল এ বার্তা শুনিয়া ঠাকুর ঠাকুর রামজীবনমৌলিকের বাহির বাড়িতে আসিয়া রহিলা। রামশর্মা ও ভগীরথশর্মা ও গয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকিপাহারা রাত্রি দিন নিযুক্ত আছিল তাহার পর ২৬ মহরম মাহে ২৮শে জৈষ্ঠ্য ঠাকুর দেখিবার পাতকালে সকললোক গেল। ঠাকুর সেখানে না দেখিল রামশর্মা ও ভগীরথ শর্মা সেবা করিতে ছিল। তারায় সেখানে নাই তদবধি রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে ঠাকুর ও রামশর্মা ও ভগীরথ শর্মা সেখানে নাই ইতি সন ১০৭৯। ২৭ মহরম মাহে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

২ নং দলিলের নকল :

শ্রীযুত যশোমাধব ঠাকুরের

শ্রীশ্যাম মালাকার তথা ভগিন্দ মালি ও গয়রহ মালিবর্গ ও তথা শ্রীকুলি এত—সুচরিতেষু—আগে তোমরা যে কারণ শ্রীরামজীবন মৌলিকের ফইরাদ করহ কারণ কি তোমরা তো তোমরা মালীনত পঞ্চবিত্তি আবদরুণ তোমরা দাও অকারণ ও রামজীবন মৌলিক পুরুষানুক্রমেই সেবার অধিকারী মনিব আমরা পূজাহারী ব্রাহ্মণ তোমরা কেন ফৈরাদ সরহ শ্যাম মালি তোমাকে দুইবৎসর ধরিয়া চাকর রাখিয়াছি *** তুমি ফৈরাদ করহ নাই। আমরা পুরুষানুক্রমেই সেবা করিতেছি। ইতি সন ১০৭৯।২১শে আষাঢ়।

রাধাবল্লভ শর্মন ভগীরথ শর্মন শ্রীরাম শর্মা

(মোকাবেলা সাক্ষী)। নরোত্তম মিত্র, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যামরায়।

ধামরাইর আদ্যাশক্তি : ধামরাইর আদ্যাশক্তি নিম্বকাষ্টনির্মিত অষ্টভুজা মূর্তি। কথিত আছে, ঠাকুরমাধব ধামরাইতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক এই মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আদ্যাশক্তি মূর্তিসহ এই গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, মাধবের মন্দিরে আদ্যাশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন্ন্যাসী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মা! যদি এই মন্দিরে প্রকৃত ধর্ম থাকে, তবে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিও, নচেৎ এখানেই মৃত্তিকাভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিও।" তদবধি এই মূর্তি যশোমাধবের বাড়িতেই আছে।

এতদঞ্চলে আদ্যাশক্তির প্রতিপত্তি খুব বেশি। যশোমাধব অপেক্ষা ইহাকে লোকে অধিক ভয় করে।[৮]

ধামরাইর বলদেব ও কানাই :

বলদেবের মূর্তি দারুময়। ইহাও জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যশোমাধবের প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই এই মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

স্থানীয় পণ্ডিত অমরসিংহভট্টাচার্য কর্তৃক কানাই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দোল ও রথযাত্রার সময়ে বলদেব ও কানাই ঠাকুরের নাচ এতদঞ্চলে এক রমণীয় দৃশ্য।

ধামরাইর রাধানাথ :

ধামরাই নিবাসী দেবীপ্রসাদ বসাক রাঢ় দেশ হইতে এই প্রস্তরময় মূর্তি আনয়ন পূর্বক এই স্থানে স্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে, এখানে মানস করিলে চক্ষুপীড়ার উপশম হয়।

ধামরাইর বনদুর্গা :

বংশাই ও কাকিলাজানি নদীর সঙ্গমস্থলে, ধামরাই গ্রামে, এতদঞ্চলবাসী প্রত্যেক হিন্দু তাঁহাদের প্রত্যেক শুভ কার্যারম্ভের পূর্বে ত্রিমোহনার পূজা করিয়া থাকেন। ত্রিমোহনা স্থলে বনদুর্গার পূজা হয়। এই পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ, বনাল অর্থাৎ শূকর বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। সর্বসাধারণের সংস্কার এই যে, প্রত্যেক শুভকার্যের পূর্বে এই পূজা না করিলে অমঙ্গল হয়।

সভার ও নবাবগঞ্জ থানার প্রত্যেক স্থানেই বনদুর্গা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। যেখানে পুরাতন বট, পাকুর, সেওড়া গাছ আছে, সেই সমুদয় গাছই দেবাধিষ্ঠিত বলিয়া উহারা ঐ পূজা দিয়া থাকে। ধামরাইর অধিবাসীগণ ত্রিমোহনারঘাটই বনদুর্গাপূজার পীঠস্থান বলিয়া মনে করে।

সাধারণত উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতেই এই পূজা হয়। কিন্তু ত্রিমোহনার ঘাটে যে বনদুর্গার পূজা হয় তাহা প্রত্যেক শুভকার্যের পূর্বেই সকলে করিয়া থাকে। বর্ষার সময়ে যখন ত্রিমোহনার ঘাট জলমগ্ন হইয়া যায় তখন ঐ ঘাটের অনতিদূরস্থিত দুইটি বটবৃক্ষতলেই এই পূজা হয়। হিন্দুমাত্রই বনদুর্গার নিকটে শূকর শাবক বলি দিয়া থাকে। নিম্নে বনদুর্গার ধ্যান উদ্ধৃত করা গেল।

দেবীং দানবমাতরং নিজ মদাঘুন্নং মহালোচনাং।
দংষ্ট্রা ভীমমুখাং জটা বিলসন্মৌলিং কপাল শ্রজাং।
বন্দে লোক ভয়ঙ্করী ঘনরুচিং নগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং।
চর্মাবদ্ধ নিতম্ব যুগ্ম বিপুলাং বালানধনুর্বিভ্রতিং।"

ধামরাইর মদনোৎসব :

ধামরাই গ্রামে তেরাস্তার মধ্যে "কামদেবস্থলীতে" কলদী বৃক্ষ রোপণ করিয়া কামদেবের অর্চনা করিবার প্রথা প্রবর্তিত আছে। কামদেবের স্থলী কোথাও পাকা বাঁধান আছে, কোথাও বা মাটি দিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী ও চতুর্দশীতে কামদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই চতুর্দশী "মদনচতুর্দশী" নামে খ্যাত।' কামদেব পূজার ধ্যান :

"চাপেষুদৃক্ কামদেবোরূপবান্ বিশ্বমোহন!"

কামদেবের পূজার সময়ে ঢোল বাজাইয়া বহুলোকে সমস্বরে তান লয় সংযোগে যে ছড়ায় আবৃত্তি করে তাহার অবিকল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :

"এই থলীতে আয়রে কামা এই থলীতে আয়।
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।।
লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।
ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।।
পূবে বন্দিয়া গামু উদয় হয় ভানু।
যাহার ঘরেরে জন্মেছে রাম কানু।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গামু ক্ষীর নদী সাগর।
যার জাল ভাইসা ফিরে সাহেব সদাগর।।
উত্তরে বন্দিয়া গামু কৈলাস পর্বত।
শিব আর পার্বতী যথা থাকেন সতত।।
আরে হাত মেলারে শিবা যোগী, হাত যায় আকাশ।
পা মেলারে শিবা যোগী, পা যায় পাতাল।।
সোনার খাটে বৈসেন শিব রূপার খাটে পাও।
চতুর্দিকে পরে শিবের শ্বেত চোয়ারের বাও।।
দক্ষিণে বন্দিয়া গামু ঠাকুর জগন্নাথ।
যাঁহার প্রতাপেরে বাজারে বিকায় ভাত।।
ডোঙ্গা ভরা ব্যঞ্জন গামছা ভরা ভাত।
যথা তথা নেয় প্রসাদ জাতি না যায় তাঁত।।
শূদ্রে রান্ধিয়া ভাত থোয় নিয়া বামন বাড়ি।
লুইটা পুইটা খায় প্রসাদ বলে হরি হরি।।

হুগলি বান্দিয়া গামু গলি গলি কোঠা।
বৈষ্ণবী বৈরাগী যথা করে তিলক ফোঁটা।।
ঢাকার শহর বন্দিয়া গামু পাচপীরের মোকাম।
সাহেব সুবায় যথা খেলায় চোকাম।।
বংশাই বন্দিয়া গামু যার খাইরে জল।
কায়েত কুঠি বন্দিয়া গামু যার কলমের তল।।
ধামরাই বন্দিয়া গামু মাধবের চরণ।
যথায় হইয়াছে রে ভাই পর্বের জনম।।
আগন মাসে ভাঙ্গের জন্ম সকসার ক্ষেতে।
হাতে বিঘতে ভাঙ্গল ফুল ধইরাছে মাথে।।
ভাঙ্গ বানাইয়ারে ভাই ভাঙ্গ দিল চিনি।
ভাঙ্গ আনিয়া দিল রসের বিনোদিনী।।
ভাঙ্গ বানাইয়ারে ভাগে দিল দই।
ভাঙ্গ আনিয়া দে লো গোয়ালিনী সই।।
হাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ পাকে পাকে মই।
জাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ ডুবিয়া ধরে কই।।
কুমার ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ করে তারিতুরি।
কামার ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ সোসাইয়া মারে বারি।।
কায়েত ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ আখর কৈল চুরি।
হিসাবের কালে খায় লাথি আর গুড়ি।।
তাতি ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ মাকু মারে ঝোকে।
মর্কা আন কর্মা আন বলে নিকারিরে ডাকে।।
পোলাপানে খাইয়া ভাঙ্গ চোক নিট্‌কাইয়া চায়।
মায় বলে আবাগীর পোরে যমে নিয়া যায়।।
আগে যদি জানিতাম রে ভাঙ্গের এমন গুণ।
ডোল ডালী ভরিয়া থুইতাম ঘরের চারি কোণ।।
সুধা ভাইজা খোলারে সুধা ভাইজা ,খোলা।
নিক্তিয়ে তৌলায়ে ভাঙ্গ বেজ্‌ব তোলা তোলা।।
ইতিকামদেব প্রীতে হরি হরি বল।।

ধামরাইর বাসুদেব :

সায়েস্তাখানি স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত কেবলমাত্র খিলানের উপর অবস্থিত একটি ইষ্টক বিনির্মিত সুন্দর মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপিত। এই বাসুদেব মূর্তি উলাইলের বিখ্যাত হয়; পরে ধামরাই গ্রামে আনীত হইয়াছে। বাসুদেব বাড়ি হইতে লাকুরিয়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় $\frac{১}{৪}$ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ২৭।২৮ হাত প্রশস্ত একটি রাস্তা আছে ; এই রাস্তা দিয়াই ধামরাইর রথ টানা হয়।

শিববাড়ির অচল শিবলিঙ্গ :

দাশোড়ার নিকটবর্তী শিববাড়ি গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোদ্ভব দত্ত মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠাপিত। যুগী জাতীয়গণ এই শিবের অর্চনা করিয়া থাকে। কথিত আছে, এই যুগীদিগের জনৈক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইহার সন্ধান পাইয়াছিল। অদ্যাপি প্রত্যেক যুগী পূজারিকেই দত্ত মহাশয়দিগের

অনন্তরপুরুষগণের প্রধানের নিকট হইতে কপালে টীকা গ্রহণ করিতে হয়। উহাই তাহার নিয়োগপত্র বিশেষ।

এই শিববাড়ি একটি প্রসিদ্ধ দেবস্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ডমধ্যে শায়িত সুবৃহৎ পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিণীবালা ভৈরবী মূর্তি। শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটি মেলার অধিবেশন হয়।

খাবাশপুরের নিমাইচাঁদ :

মানিকগঞ্জ থানার অধীন খাবাশপুর গ্রামে নিম্নকাষ্ঠবিনির্মিত মহাদেব মূর্তি স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহ শ্রীশ্রী ৺নিমাইচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। দৈনিক পূজা ও পার্বণাদির ব্যয় নির্বাহার্থে বসুরবরুণা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় কতক জমি ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে সেবাইতগণ বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ১লা বৈশাখ তারিখে এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে।

বুতুনীর গোবিন্দ রায় :

ঘিয়র থানান্তর্গত ক্ষীরাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বুতুনি গ্রামের ৺গোবিন্দ রায় বিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রামের চৌধুরি বংশোদ্ভব উমানন্দ, পরমানন্দ, দেবানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও গৌরীপ্রসাদ ভ্রাতৃপঞ্চক কর্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বারুণী স্নান উপলক্ষে এখানে একটি মেলা জমিয়া থাকে। ইষ্টকনির্মিত নাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে ৺গোবিন্দ রায় প্রতিষ্ঠিত।

বিরলিয়ার মা যশাই :

সাভার থানার অন্তর্গত তুরাগ নদীর পশ্চিমতীরবর্তী বিরলিয়া গ্রামের "মা যশাই" জাগ্রত দেবতা। যে বৃক্ষের অবলম্বনে দেবীর অধিষ্ঠান উহা সাধারণ্যে "যশাই গাছ" বলিয়া পরিচিত। এজন্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মা যশাই" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই প্রাচীন পাদপটির শাখা-প্রশাখা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া সমাগত পথশ্রান্ত পথিকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। কতকাল যাবৎ "মা যশাই" জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায় না।

নববৈশাখের প্রথম দিবসে প্রতিবর্ষে মেলা ও পূজা উপলক্ষে দূরদেশান্তর হইতে এখানে বহুজনসমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত দৈনিক পূজারও ব্যবস্থা আছে, প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মোসলমান, জাতিবর্ণনির্বিশেষে পূজোপচার লইয়া দেবীর নিকটে আগমন করে। মেলার দিন ঢাকার নবাব বাহাদুরের ও বালিয়াটির বাবুদিগের স্থানীয় কর্মচারীগণ এবং গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর পূজা যাহাতে সুচারুরূপে নির্বাহ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই "মানসিক" বলি চলিয়া আসিতেছে। মেলার দিন গ্রামবাসীগণ খোল করতাল সংযোগে উচ্চকণ্ঠে মায়ের যশোগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বিবাহান্তে নবদম্পতি "মা যশাইর" সন্নিকটে উপনীত হইয়া দেবীর প্রসাদ কামনা করিয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক নরনারী এইস্থানে "মানত" করিয়া থাকে এবং স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধি হইলে মায়ের পূজা দিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া পূজোপচার প্রদান করিয়া থাকে।

রঘুনাথপুরের বনদুর্গা :

এখানে প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে, প্রতিষ্ঠিত বটপর্কটি বৃক্ষের পাদদেশে, মৃণ্ময়ী বনদুর্গা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পূজিত হয়। চতুর্ভূজা, ব্যাঘ্রাসীনা, ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিতা, নীলজীমূতসঙ্কাশা, দেবীমূর্তি প্রতি বৎসরই নতুন করিয়া নির্মিত হইয়া থাকে। গভীর নিশীথে দেবীর পূজা

অনুষ্ঠিত হয়। ছাগ, মেষ, মহিষ, বরাহ, হংস ও কবুতর বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবাধিষ্ঠিত এই বটবৃক্ষটিও অতি জাগ্রত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অনেকে কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পৌষ সংক্রান্তির পূজা ব্যতীত বৈশাখের যে কোনও শনিবার অমূর্তি পূজা হইতে পারে।

রঘুনাথপুরের শ্মশানকালী :

রঘুনাথপুর গ্রামে শ্মশানকালী প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্মশানকালী প্রায়ই বাড়ির উপরে স্থাপিত হয় না। প্রবাদ এই যে, স্বর্গীয় কালীনাথ চক্রবর্তীর মাতা একদা স্বপ্নে দেখেন যে, শ্মশানকালী কন্যারূপে আসিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তিনি স্বপ্নাবস্থায় ইহা অবৈধ বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, দেবী এই প্রতিষ্ঠায় কোনও ক্ষতি হইবে না বলিয়া বলেন। তদনুসারেই এই কালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রত্যহ পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। শারদিয় পূজার সময়ে অনেকে এখানে ছাগশিশু ও মহিষাদি দিয়া পূজা দেন। কালী অতি জাগ্রত বলিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন।

কোণ্ডার মহাপ্রভুর আখরা ও কালীবাড়ি :

রাজা হরিশচন্দ্রের বংশের যে শাখা কোণ্ডাগ্রামে আসিয়া বাস করেন, সেই শাখায় সুরনারায়ণ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কোণ্ডার মহাপ্রভুর আখরা সুরনারায়ণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। দৈনিক কার্য ও নিত্যসেবা নির্বাহের জন্য আড়াইখাদা জমি দেবোত্তর ছিল। বর্তমান জমিদারগণ নাকি তাহার অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত সেবাইতের অভাবে আখরাটি অনাচারদুষ্ট হইয়া পড়িলে ঢাকার কালেক্টর বাহাদুর মহাপ্রভুর স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। পরে এই বংশের ভারতচন্দ্র রায় তাহাদের পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত সম্পত্তি ও সংস্থাপিত আখরার প্রমাণাদি দর্শাইয়া তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোণ্ডার কালীবাড়ি এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কালীও পূর্বোক্ত বংশীয়গণেরই অন্যতম কীর্তি। কোণ্ডা গ্রামে সন্নিকটবর্তী একটি স্থান বুরুজের টেক বলিয়া পরিচিত, এই স্থানে রায়মহাশয়দিগের সান্ত্রী প্রহরী সর্বদা নিযুক্ত থাকিত।

শিকারিপাড়ার কালী ও গোপাল-বিগ্রহ :

শিকারি পাড়ার ঘোষমহাশয়দিগের স্থাপিত কালী ও গোপাল বিগ্রহ জাগ্রত। প্রতিদিন দেবভোগের জন্য যাহা প্রদত্ত হয় তাহা দ্বারাই ইহারা অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন। দৈনিক অতিথির সংখ্যাও কম হয় না। ঘোষমহাশয়দিগের সুব্যবস্থায় দেবকার্য অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতেছে।

গোবিন্দপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ :

গোবিন্দপুরের চৌধুরি মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবগঞ্জ থানার মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুষ্পযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দ্বীপ, রাস, দোলযাত্রা ও বারুণীস্নান ইত্যাদি হইয়া থাকে। ঠাকুরসেবার জন্য দেবোত্তর জমি নির্দিষ্ট আছে। দৈনিক আতপতণ্ডুলের মিষ্ঠান্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্তী জনসাধারণ দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করিয়া এখানে ভোগ দিয়া থাকে। চৌধুরি মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষ জগৎজীবন রায় কর্তৃক এই বিগ্রহাদি স্থাপিত হয়। জগৎজীবন জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে জীবিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহআলম বাদশাহের হাতের পাঞ্জার আলতা বিমিশ্রিত ছাপযুক্ত সনদ ১২৫৫ সালের গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গোবিন্দপুরের রাজরাজেশ্বর ও রাধাবল্লভ :

দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে এই গ্রামের হরেকৃষ্ণ রায় কোম্পানির দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই এই বিগ্রহের স্থাপয়িতা। ঠাকুরের রাস, জন্মযাত্রা ও দোল উপলক্ষ্যে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক আতপচাউলের ভোগের ব্যবস্থা আছে। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতেই দেবসেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলাকোপার লক্ষ্মীনারায়ণ :

কলাকোপা গ্রামে দাতা খেলারামের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দানশৌণ্ডতার জন্য খেলারাম দাতা উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অনেক কীর্তিকলাপ কলাকোপা গ্রামে বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের মন্দির অন্যতম একটি। এই স্থানে দূরদেশান্তর হইতে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

বর্ধনপাড়ার রসরাজ বাউলের আখড়া :

বর্ধনপাড়ার রসরাজ বাউলের অনেক অলৌকিক কথা শ্রুত হওয়া যায়। তৎপ্রতিষ্ঠিত আখরা এতদঞ্চলে সুপরিচিত। এই আখরাতে, রসরাজের মৃত্যুদিনে, নানা স্থান হইতে বহু সাধুপুরুষ আগমন করিয়া থাকে।

কলাকোপার বলাই-বাউলের আখড়া :

কলাকোপার বলাই বাউল একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত আখরাতে যে সমুদয় দরবেশ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া থাকে তাঁহারা কেহই রন্ধন করে না। নানা স্থান হইতে উহাদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। বলাই বাউলের যশোগাথা লোকমুখে অনেক শ্রুত হওয়া যায়।

মাসতারার লক্ষ্মীনারায়ণ :

বিরাটগুহের অধঃস্তন ১২শ পর্যায়ের উগ্রকণ্ঠগুহ যশোহর হইতে তদীয় কুলদেবতা ˚লক্ষ্মীনারায়ণসহ মাসতারা গ্রামে আগমন করিয়া বাসস্থাপন করেন। উগ্রকণ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। মোগলযুদ্ধে উগ্রকণ্ঠের পুত্রদ্বয় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণাঙ্গনে জীবনাহুতি প্রদান করিলে, উগ্রকণ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে মোগলের সহিত সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তদীয় অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় অবমাননাবোধ করিয়া নিহত পুত্রদ্বয়ের দুইটি শিশুতনয় এবং উক্ত কুলদেবতাসহ রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এতদঞ্চলে আগমন করেন। উগ্রকণ্ঠ এইস্থানে আগমন করিয়া গাজিবংশীয়গণের আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উগ্রকণ্ঠের প্রপৌত্র সুবুদ্ধিখাঁ ১০৩১ সনে ˚লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরের ইষ্টকাদিতে বিচিত্র কারুকার্য খচিত ছিল।

নান্নারের রক্ষাকালী :

নান্নানের রায় উপাধিকারী জমিদার ˚রূপরাম রায় কর্তৃক প্রায় ২৫০ বৎসর পূবে রক্ষাকালীর মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের ছাদ কেবলমাত্র খিলানের উপরে অবস্থিত। এতদঞ্চলে এবম্বিধ মন্দির "ঝিকাট" নামে খ্যাত। রথযাত্রার সময়ে রায় মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এই মন্দির মধ্যে ৭ দিবস অতিবাহিত করেন বলিয়া ইহা "লক্ষ্মীনারায়ণের শ্বশুরবাড়ি" বলিয়া কথিত হয়। মন্দিরস্থ কালীকাদেবী ˚রামগোবিন্দ চক্রবর্তী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

পরশুরামতলা :

পাঁচদোনার উত্তরাংশে, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণভাগে অবস্থিত পরশুরামতলা একটি

দেবস্থান। কথিত আছে, রামায়ণোক্ত পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপ বিমোচনার্থে পিতৃআদেশক্রমে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ শরীর হইলে, যখন ব্রহ্মপুত্র নদকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে অর্থাৎ সাগরোদ্দেশ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন এই স্থানে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত বটবৃক্ষ দ্বারা আবৃত স্থান পরশুরামতলা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে পরশুরামের তৃপ্ত্যর্থে পূজাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত পূজাই বিষ্ণুপদে অর্পিত হয়। তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এখানকার ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র এই স্থান হইতে প্রায় দ্বিশতহস্ত দূরে পশ্চিমদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে যে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরশুরামতলার খুব সন্নিহিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কথুনাথের দেবালয় :

রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষ্যা-তীরবর্তী ডাঙ্গাবাজের সন্নিহিত তালতলা গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সাধনামন্দির অবস্থিত। তালতলা গ্রামের যে স্থানে তিনি সাধনা-মন্দির স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বে ভীষণ অরণ্যানীসঙ্কুল উচ্চভূমি ছিল। কথুনাথ ঐ স্থানে আগমনপূর্বক গুরু-দত্ত শিঙ্গা-ধ্বনি করিতে থাকেন। সাধকের শিঙ্গার রব শ্রবণ করিয়া অরণ্যের যাবতীয় হিংস্র জন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বীয় আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে ক্রমে ক্রমে তথা জনসমাগম হইয়া প্রসিদ্ধ দেবস্থানে পরিণত হয়।

দেবালয়ের চারিদিক ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পূর্বদিকে, প্রাচীরের বহির্দেশে একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীটির পূর্বতীরে কথুনাথের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দুইজনের দুইটি ক্ষুদ্র সমাধি মন্দির অবস্থিত। দেবালয়ের অভ্যন্তরে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের ভিটাতে একতল অট্টালিকা এবং উত্তরের ভিটাতে একখানা টিনের ঘর আছে। পূর্বের ভিটার দালানেই কথুনাথের উপাসনা মন্দির। এই উপাসনা মন্দিরের চত্বরের সহিত সংলগ্ন পূর্বদিকে যে ক্ষুদ্র দুইটি ইষ্টকনির্মিত মন্দির অবস্থিত তাহার একটিতে কথুনাথের ইষ্টদেবতা ঁরামকৃষ্ণ গোঁসাইর ও অপরটিতে কথুনাথের পাদুকা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রায় সার্ধদ্বিশতাব্দী পূর্বে পাঁচদোনার সন্নিহিত শিলমন্দি গ্রামে নাথকুলে কথুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গে অনুরক্তি তদীয় শৈশব অবস্থাতেই জন্মিয়াছিল। ফলে, তিনি অল্প বয়সেই বিবেকীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার গর্ভধারিনী সংসারের একমাত্র অবলম্বন নয়নের পুতলীকে সংসার-ধর্মে অনাসক্ত সন্দর্শন করিয়া ভীতা ও চিন্তিতা হইয়া পড়েন। পরে আত্মীয়-স্বজনের উপদেশমত পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর তাঁহার উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন করেন; কিন্তু দুঃখিনী মাতার মনের সাধ পূর্ণ হইল না। পুত্র সংসারী হইতে পারিল না। মাতা বহু চেষ্টা করিয়াও যখন পুত্রকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অনন্যোপায় হইয়া একদা তাহাকে বহু তিরস্কার করেন। তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে কথুনাথ গৃহত্যাগী হন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম ঘটনা।

কথুনাথ গৃহত্যাগী হইয়া নানাস্থান পর্যটন করেন, কিন্তু কোথায়ও সদ্‌গুরুর সন্ধান মিলিল না। অবশেষে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বিথলঙ্গের ঁরামকৃষ্ণ গোঁসাইর আখড়ায় উপনীত হইয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকটে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করেন। কথুনাথ উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারিবে কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ঠাকুরের মন্দির হইতে পাদোদক লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া ঁরামকৃষ্ণ গোঁসাই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নয়দিন পরে তিনি মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কথুনাথকে একইস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা তুমি আজও এখানে দাঁড়াইয়া আছে?" কথুনাথ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে অপেক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কি

প্রকারে স্থান ত্যাগ করিব?" তরুণ বয়স্ক যুবকের এবম্বিধ একনিষ্ঠতায় রামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হন, এবং অচিরে তাহাকে তদীয় শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন; কথিত আছে গুরুর কৃপায় এবং স্বীয় অসাধারণ যোগশক্তি প্রভাবে তিনি গুরুর সহিত নদীগর্ভে ধ্যানস্থ হইয়া যোগসাধনা করিয়াছিলেন এবং অচিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

অতঃপর গুরুর আদেশানুসারে তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতার মহিমা প্রচার করিবার জন্য গুরুদত্ত শিঙ্গা হস্তে তালতলা গ্রামে আগমন করেন এবং অসাধারণ যোগবলে নানাবিধ অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা জনসমাজে স্বীয় দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাধিস্থ হন।

কথুনাথ স্বীয় আসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশনপূর্বক যোগ-সাধনা করিতেন এবং ইষ্টদেবতার পাদুকা সন্দর্শন করিতেন। অন্য কোনও বিগ্রহ তিনি পূজা করেন নাই বা মন্দিরে কোনও বিগ্রহ স্থাপন করেন নাই। কথুনাথের ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পাদুকা পূজা করিয়া থাকে; কথুনাথকে ইহারা বিষ্ণুর অংশবিশেষ বলিয়া মনে করেন।

চিনিশপুরের কালী :

কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর যাবত চিনিশপুর গ্রামে দ্বিজরাম প্রসাদের সিদ্ধপীঠ বর্তমান আছে। দেবীর নাম চীনেশ্বরী। ইহা দক্ষিণাকালীর পীঠ। কিংবদন্তী, এই রামপ্রসাদ এতদঞ্চলবাসী ছিলেন না। আত্মগোপন করিতেন বলিয়া তাহার সুপরিচয় সকলে জানিত না। প্রবাদ এই যে, রামপ্রসাদ নাটোরের স্বনামখ্যাত রাজারামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দত্তক দেওয়ার সময়ে তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য সন্দর্শন করিয়া রামপ্রসাদের মনে চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়। ভাবিলেন উভয়েই সহোদর, একক্ষেত্রে উপস্থিত কনিষ্ঠের ভাগ্যে এই বিশাল বিভব প্রাপ্তি আর তিনি আজীবন তাঁহারই কৃপাভিখারী কেন? জগন্নিয়ন্তার এই বিচিত্র বিচারে তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তদবধিই তাঁহার সংসারে বীতরাগ এবং বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইল। এই বৈরাগ্যের পরিমাণ দেবীর অনুগ্রহ লাভ এবং আদেশপ্রাপ্তি—চিনিশপুরের বনাকীর্ণ স্থানে অবস্থান, টেঙ্গুরিপাড়া নিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যার পানিগ্রহণ, পঞ্চমুণ্ডীআসন প্রস্তুত এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে ইনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বীর-সাধক ছিলেন। বীর-সাধনাকে "চিনক্রম" বলে! এই চিন হইতে রামপ্রসাদের ইষ্টদেবীর নাম, "চীনেশ্বরী" এবং গ্রামের নাম "চীনেশপুর", কালক্রমে চিনিশপুর নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর অব্দ নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবত ১২০০ সনের পূর্বে ইনি মানব-লীলা-সম্বরণ করেন।

রামপ্রসাদ দেহরক্ষা করিলে তদীয় শ্যালক শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, ভাগিনেয় শম্ভুচন্দ্র এবং মধুসূদনকে বঞ্চনা করিয়া দেবোত্তর-ভূমি স্বীয় নামে লিখাইয়া লন। পরে শম্ভুচন্দ্র অশেষ চেষ্টা করিলে, জমিদার-সরকারতান্ত্রিক রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী বলিয়া শম্ভুচন্দ্রকে তন্ত্রধারস্বত্বের উল্লেখে ৮ আনা, ও পূজা-স্বত্বের উল্লেখে বক্রী ৮ আনা শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তীকে জায়গির প্রদান করিয়া ১২১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ় তারিখে "শ্রীমদ্রাজন মাহাবুদআলী মিরাশ তালুকদার এবং নীলমণি ঘোষ গোমস্তা জোয়ার নন্দীপাড়া" বরাবর এক হুকুমনামা প্রদান করেন, তদবধি রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারীগণ ৮ আনা এবং শ্রীনারায়ণের পরবর্তীগণ ৮ আনা অংশে রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার উপস্বত্ব ভোগ-দখল করিতেছেন।

কালক্রমে গভর্নমেন্ট ১৭৯০ সনের পূর্বে স্থাপিত দেবোত্তর বলিয়া এই সকল ভূমি খাস করিয়া ১৪টাঃ ২ আনা ৬ পাই সদর জমা ধার্যে জগন্নাথ চক্রবর্তীর সহিত বন্দোবস্ত করেন। পরে ঐ তালুক রাজস্বদায়ে নিলাম হইয়া গেলে অপর কতিপয় ব্যক্তি উহা খরিদ করেন।

ওয়াইজ সাহেবের নীলকুঠির দেওয়ান রামকৃষ্ণ রায় মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বাবা লোকনাথের আশ্রম :

মেঘনাদতীরে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বারদিগ্রামে স্বয়ংসিদ্ধ মহাযোগী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম বিদ্যমান আছে। ইনি "বারদির ব্রহ্মচারী" বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। এই মহাপুরুষের অন্তর্লীলা-স্থল বলিয়া বারদি গ্রাম পুণ্য-পীঠের একতম একটি স্থান বলিয়া সমাদৃত। বাবা লোকনাথের সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। যাঁহারা লোকনাথের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তদীয় অমৃত-নিস্যন্দিনী বাক্যাবলী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত আছেন; সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

বাংলা ১১৩৭ সনে, ইংরাজি ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গের কোন পল্লিগ্রামে লোকনাথের জন্ম হয়। তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার ছিল যে, বংশের মধ্যে একটি লোক যদি গৈরিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাহির হইতে পারেন তবে সেই কুলের উদ্ধার সাধন হয়। লোকনাথের পিতা এতাদৃশ্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়া একাদশ বৎসর বয়সে লোকনাথের যজ্ঞোপবীত সংস্কার সম্পাদনপূর্বক পুত্রকে আচার্য গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া জন্মের মত বিদায় দেন। তদবধি লোকনাথ গৈরিক ব্রহ্মচারী হইয়া আচার্যগুরু ভগবান গাঙ্গুলির সহিত বহির্গত হন।

১২৭০ বঙ্গাব্দে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ সময়ে তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে যে দুই জন মহাপুরুষ বাঙলার পূর্বসীমান্তবর্তী পাহাড়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী অন্যতম। দীর্ঘকাল তুষারাবৃত স্থানে অবস্থান করা নিবন্ধন তাঁহাদের সর্বশরীরে একরূপ শ্বেতবর্ণের পুরু চর্ম জন্মিয়াছিল। সেই চর্মের প্রভাবে তাঁহাদের উলঙ্গ শরীরে শীতজনিত কষ্ট বোধ হইত না। একদিকে শরীরের এই অদ্ভুত চর্মচ্ছদ, অন্যদিকে তাঁহাদের ভূতল-স্পর্শ বিশাল জটাকলাপ, তাঁহাদিগকে অভিনব জীবাকারে পরিণত করিয়াছিল। নিম্নভূমিতে আগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের শরীরের শ্বেতচর্মের আবরণটি অদৃশ্য হইতে থাকে; কালে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ব্রহ্মচারী বাবা জাতিস্মর ছিলেন। তিনি এজন্মের অব্যবহিত পূর্বজন্মে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। এমনকি, গত জন্মের মৃত্যু হইতে এ জন্মের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কাল পর্যন্ত যেভাবে ছিলেন তাহাও স্মরণ ছিল।

তিনি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত কার্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় দেহেতে আগত হইতেন, যখন দেহ ছাড়িয়া যাইতেন, তখনও আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, কিন্তু তখন দেহটা দেয়ালাদিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতবৎ পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বলিত, "গোসাঞি মরিয়াছে, কিন্তু পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন।"

ব্রহ্মচারী পৃথিবীর নানাস্থান পর্যটন করিয়াছিলেন। মক্কা, মদিনা এমনকি তিনি যে সুদূর ইউরোপের নানা স্থানে এবং সুমেরু পর্যন্তও গমন করিয়াছিলেন এরূপ পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লোকনাথের শারীরিক গঠন অন্যান্য মানুষের ন্যায় হইলেও চক্ষুর গঠন এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহা অতিশয় বিশাল। আমরা স্থির দৃষ্টিতে চাহিলে, আমাদের উভয় নেত্রের তারকা-যুগল চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থান করে, লোকনাথ চক্ষু স্থির করিলে তাঁহার উভয় নেত্রের তারকা আসিয়া নাসিকার নিকট সংলগ্ন হইত। তাঁহার চক্ষুর তেজ সাধারণ লোকে সহ্য করিতে পারিত না।

তিনি যে এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "আমি মৃত্যুর সময় অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছি। এ অবস্থায় মোহ (নিদ্রা) আসিলেই আমার পিণ্ডপাত ঘটিবে।" তাঁহার নিদ্রা ছিল না, অথচ রাত্রিতে বিছানায় যাইয়া পড়িয়া থাকিয়া, জাগ্রদ্বিশ্রাম করিতেন।

তনুত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সূর্যমণ্ডল ভেদ করিবার জন্য দুই-তিনবার উঠিলাম, প্রত্যেকবার অকৃতকার্য হইয়া নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।" এই সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেন—"আমি এ ঘর হইতে কোন্ ঘরে যাইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

১২৯৭ সনের ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ তদীয় লীলার অবসান হয়। তিনি যোগস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

চাচুরতলার কালীবাড়ি :

চাচুরতলার কালী সাধারণত সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে সুপরিচিত। এইস্থান ঠারইনবাড়ি বলিয়া অভিহিত হয়। রাজবাড়ি মঠের প্রায় অর্ধ মাইল দূরবর্তী চাচুরতলা গ্রাম স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের পারে এই কালীমন্দির স্থাপিত। আম্র, তিন্তিড়ি, বট প্রভৃতি প্রাচীন পাদপরাজির ঘর সন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখার শীতল ছায়ায় এই স্থানটিকে শান্তিনিকেতনে পরিণত করিয়াছে। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নর-নারী দেবীর দর্শন লালসায় এখানে সমাগত হইয়া থাকে। এখানে মানত করিয়া জনসাধারণ স্বীয় চাচর (কেশ) প্রদান করে বলিয়া ইহা চাচুরতলার কালী বলিয়া পরিচিত। পদ্মানদী ভীষণ সংহারক মূর্তি ধারণপূর্বক এই স্থান গ্রাস করিবার জন্য বহুবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেবীর মন্দিরের অনতিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

মনাইফকির নামে জনৈক মোসলমান সিদ্ধ পুরুষের প্রভাব ও খ্যাতির বিষয় এতদঞ্চলে অনেক শ্রুত হওয়া যায়। তিনি প্রায় ৬০-৭০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। কীর্তিনাশের ভীষণ সংহারক মূর্তি সন্দর্শনে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই কীর্তিনাশা নদীর বিস্তার কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। তদুত্তরে ফকির সাহেব বলেন, তোমরা আমার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া থলিয়ায় পুরিয়া এ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ কর, পরে সপ্তাহান্তে পুনরায় আগমন করিলেই তোমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবে। মহাপুরুষের বাক্যে কাহারও অনাস্থা ছিল না। সুতরাং তাঁহার কথানুযায়ী কার্য সমাধা হয় এবং উত্তর প্রার্থীরা পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে সমবেত হইয়া ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ফকির তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে আমি কতকটা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। "কীর্তিনাশার উত্তর তটে চাচুরতলার ঠারইনবাড়ি ও দক্ষিণ পারে মাঐসারের দিগম্বরীবাড়ি বলিয়া যে দুইটি দেবীস্থান বর্তমান দেখিতেছ, তাহাই এই নদীর উভয় তটে বর্তমান থাকিবে। এতৎমধ্যবর্তী যাবতীয় স্থান নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তবে শ্রীপুরের যে "টেক" বর্তমান আছে উহা কোনও কালেই বিলুপ্ত হইবে না। আজ পর্যন্ত ঐ সিদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী কতকটা সত্যি বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

পাটাভোগের হরিবাড়ি :

নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ মধ্যে অনেকে চিকিৎসক শাহায্যে রোগমুক্ত হইতে না পারিলে হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং হরিভক্ত নাম ধারণপূর্বক হরিনামের ছাপ দ্বারা সর্বাঙ্গ সুরঞ্জিত করিয়া থাকে। ঠাকুরের আদেশে অসুস্থাবস্থায় ও তিন বেলা স্নান করিতে ত্রুটি করে না। হরিভক্তিপরায়ণগণ সন্ধ্যার সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়া মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সুকণ্ঠ মিশাইয়া নামকীর্তন করে। পাটাভোগের হরিবাড়িতে অসংখ্য নর-নারীর সমাগম হয়।

হলদিয়ার কালী :

এই পাষাণময়ী কালী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দেবীর জন্য

তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দেন। দৈনিক পূজার জন্য তিনি এই গ্রামের কতক জমি জনৈক ব্রাহ্মণকে বৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবী খুব প্রত্যক্ষের বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

হাইরামন্সার কালী :

এই মূর্তিটি চতুর্বিধ ধাতুর সংমিশ্রণে নির্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক এক ফুট হইবে। পূর্বে ইহার পূজাকার্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হইত; কিন্তু স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অধুনা জনৈক বিধবা কায়স্থ রমণী ইহার পূজা করিয়া থাকে।

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে কমলা সেন নাম্নী জনৈক বিধবা স্ত্রীলোক কাশিমপুর গ্রামে তাঁহার ভগ্নীর বাড়ি বেড়াইতে যায়; একদা সেখানকার কালী বাড়িতে বসিয়া তিনি তদগত চিত্তে শিবপূজায় ব্যাপৃতা আছেন এমন সময়ে আদিষ্ট হন যে হাইরামুন্সা গ্রামে তাঁহার নিজের বাড়ির পুষ্করিণীতে যে দেবীমূর্তি সলিলগর্ভে নিহিত আছে তাহা তিনি যেন প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। দেবাদিষ্ট হইয়া কমলা অচিরকাল মধ্যে বাড়িতে প্রত্যাগত হন; এবং পুষ্করিণী হইতে এই দেবীমূর্তি উদ্ধার করিয়া নিজবাড়িতে স্থাপিত করেন।

কলমার জয়কালী :

এই প্রস্তরময় দক্ষিণাকালীমূর্তি কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্বে কমলানিবাসী দেওয়ান নন্দকিশোরের অনন্তরবংশ্য ৺বলরাম দাস মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত হয়। কথিত আছে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মূর্তি কাশীধাম হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বলরাম একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই মূর্তি মহাসমারোহে কলমাস্থিত স্বীয় প্রাচীন বাড়িতে প্রথমত সংস্থাপন করেন, পরে বর্তমান বাড়ি নির্মিত হইলে এই দেবীও তথায় নীত হয়। ভক্ত বলরামই কালীর মন্দিরাদি নির্মাণ করেন এবং দেবীর অর্চনার জন্য স্বীয় জমিদারিভুক্ত বরিশাল জেলান্তর্গত হবিবপুর পরগনা মধ্যে কতক তালুক উৎসর্গ করিয়া যান। এখনও ঐ তালুকের আয় হইতেই ইহার অর্চনাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি দেবীর জন্মতিথি বলিয়া ঐ তিথিতে মহাসমারোহে পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক পূজা এবং অমাবস্যাতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীনগরের ৺অনন্তদেব :

শ্রীনগরের স্বনামখ্যাত লালা কীর্তিনারায়ণ ১১৭৫ বঙ্গাব্দে ৺অনন্তদেবকে তদীয় কুলদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। লালাকীর্তিনারায়ণ অনন্তদেবের নামেই বিভিন্ন সময়ে নানা-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

৺অনন্তদেব জাগ্রত দেবতা। শ্রীনগরের-লালা বাবুগণ সমুদয় ক্রিয়া-কলাপেই অনন্তদেবের অর্চনা করিয়া তাঁহার নাম নিয়া অন্যত্র গমনাগমন করিয়া থাকেন।

দৈনিক পূজার নিয়ম : প্রাতে জাগরণ, পরে স্নানাদি করাইয়া ৭ সের তণ্ডুলের নানা উপকরণসহ ভোগ। সন্ধ্যায় কীর্তন ও আরতি, পরে বৈকালি। প্রতি পূর্ণিমা ও একাদশীতে ৫ সের দুগ্ধের মিষ্টান্ন ভোগ প্রদত্ত হয়।

বাৎসরিক নিয়ম : দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ পুষ্প দ্বারা বিশেষভাবে পূজা। বৈশাখে জলধারা ও শীতলভোগ; জ্যৈষ্ঠে আমক্ষীর ও ক্ষীরের ভোগ। ভাদ্রে পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ। আশ্বিন মাসে নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে ভোগ প্রদত্ত হয়। কার্তিক মাসে ঘৃতের প্রদীপ ও প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হয়। পৌষে পিষ্টকাদি এবং মাঘমাসে কুলের ভোগ হয়। চৈত্রে পুরি ও ক্ষীর দ্বারা প্রত্যহ বৈকালি হয়।

কোমরপুর বা ভাওয়ারের কালী ও দুর্গা :

এই অর্ধ-কালী ও অর্ধ-দুর্গা মূর্তি কোমরপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাওয়ারের দীনদয়াল চক্রবর্তী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দীনদয়াল একজন সাধক ছিলেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে এই দেবতা অত্যন্ত জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাইকপাড়ার বাসুদেব :

এই বাসুদেব সম্বন্ধে পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে হরিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (খাসনবীশ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুরাতন বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়াতে সেই বাড়ির উত্তরাংশে তিনি নতুন বাড়ি প্রস্তুত করেন এবং ঐ পুরাতন বাড়িতে জ্ঞাতিগণের শাহায্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হয়। এই পুষ্করিণী খননকালে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্ন দেখেন যে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-ধারী গরুড়বাহন লক্ষ্মী-সরস্বতীসমন্বিত বনমালী বিষ্ণু বলিতেছেন যে, তোমরা যে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইতেছ সেখানে মৃত্তিকার নিচে আমি প্রস্তর মূর্তিতে অবস্থান করিতেছি, কোদালির আঘাতে অঙ্গ-ভগ্ন না হইতে আমাকে নিয়া পূজা করিবে। তৎপর দিবস অতি সাবধানে পুষ্করিণীর নির্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া স্বপ্ন-বর্ণিত মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং ভক্তি বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া নতুন বাড়িতে স্থাপন করেন। দেখিলে দর্শকের মন শীতল হয় এবং পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিতে বিগলিত হয়। এরূপ প্রস্তর খোদাই করিবার ভাস্কর ইদানীং সুলভ বলিয়া মনে হয় না।"

সেরাজাবাদের সুধারামের আখড়া :

সুধারাম বাউলের নাম বিক্রমপুরের সর্বত্র সুপরিচিত। সুধারামকেই পূর্ববঙ্গের বর্তমান বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া মনে হয়। বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায় সুধারামেরই মতাবলম্বী। বাঘিয়া গ্রাম নিবাসী ৺কৃষ্ণনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠপুর পরগনার তদানীন্তন অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীনগর নিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয় এই মহাপুরুষকে সেরাজাবাদ নামক স্থানে নিষ্কর ভূমি দানপূর্বক মন্দির তুলিয়া একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দির ও বাসস্থান এখনও বর্তমান এবং "সুধারামের আখড়া" বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে একদা প্রভাত সময় উন্মাদের ন্যায় ভাবে বিভোর হইয়া হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে সুধারাম সেরাজাবাদে আসিয়া উপনীত হন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। সেরাজাবাদের যে স্থানে তদীয় আখড়া নির্মিত হইয়াছিল পূর্বে উহা মুচিখোলা নামে অভিহিত হইত। মুচিখোলা ঘোর অরণ্যানীসঙ্কুল ও নিকটবর্তী গ্রামবাসী কর্তৃক শ্মশানরূপে ব্যবহৃত হইত।

বিক্রমপুর মঠীভাঙ্গা গ্রামে নমঃশুদ্র বংশে সুধারামের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। লোকসমাজের সহিত মেশা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। নির্জন প্রান্তরে, বৃক্ষের ছায়া, কিংবা নদীর তীরে বসিয়া অনন্য মনে কি চিন্তা করিতেন তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

সুধারামের নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী বিক্রমপুরের সর্বত্র সুপ্রচলিত।[৮] সেরাজাবাদেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার রচিত বহু গান এতদঞ্চলে বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক গীত হইয়া থাকে। একটি গানে লিখিত আছে, 'ঢাকার শহর নিগম্য স্থান অতি যে গোপন। সে স্থানেতে বিরাজ করে মানুষ রতন।" ইহাতে বোধ হয় ঢাকা শহরের কোনও এক মহাপুরুষ তাঁহার গুরু ছিল। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তালতলার শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী :

তালতলার বন্দরের বিপরীত দিকে পঞ্চরত্ন-মন্দিরাভ্যন্তরে মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ ও "আনন্দময়ী" নামক এক পাষাণময়ী কালিকা মূর্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভ রাজনগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া এই স্থানে আসিলেই প্রভাত হইয়া যাইত এবং প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত। এই ক্ষুদ্র দেবমন্দিরটি মহারাজার সন্ধ্যা বন্দনাদির জন্য নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহাদের সেবার নিমিত্ত যে তিনশত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ পর্যন্তও সেই বৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতাদ্বয়ের সেবাকার্য নির্বাহিত হইতেছে। ফেগুনাসার গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকে দীপনগর নামে যে গ্রাম বিদ্যমান আছে ঐ স্থানে মহারাজ রাজবল্লভ উক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরে সায়ংকালে সন্ধ্যারতি প্রদান করিবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

হুসনী দালান (ইমামবাড়া) :

বর্তমান সময়ে ঢাকা নগরীতে নবাবি আমলের এমারতাদির মধ্যে "ইমামবাড়া" বা হুসনীদালান সুপ্রসিদ্ধ। মহরমের সময় এই স্থানে বহুলোকের সমাগম হয়। দশাহব্যাপী উপবাসী এবং কঠোর নিয়মাবলীতে আবদ্ধ থাকিয়া, পুত সংযতচিত্তে শোক চিহ্নধারণ করত শিয়া সম্প্রদায়ের মোসলমানগণ হাসেন হুসেনের বিষাদ-স্মৃতি বহুকালাবধি হৃদয়পটে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকায় এই সময়ে মসজিদের অভ্যন্তরস্থিত দেওয়াল এবং বেদিমূল প্রাণীপুঞ্জের মনোরম চিত্রাবলী ও নয়ন মন প্রীতিকর লতাপুষ্পাদিতে পরিশোভিত করা হয়। হাসেনায়েনের প্রতিমূর্তি মসজিদের যে অংশে স্থাপিত করা হইয়াছে সেই স্থানের দেওয়ালটি শোকচিহ্নের আধারস্বরূপ কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা হয়। মসজিদের ঠিক মধ্যভাগে একটি কৃত্রিম উৎস অম্বুকণারাশি উর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত গায়ক-সম্প্রদায় "হাসনায়েনের" সদ্‌গুণাবলী বিষাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কীর্তন করিয়া, উষ্ণ অশ্রুজলে বক্ষদেশ প্লাবিত করিয়া, অতীতের বিষাদস্মৃতি জাগাইয়া তুলে। গায়ক-সম্প্রদায় উপবাসের রাত্রিগুলি শ্মশান-সঙ্গীত কীর্তন করিয়াই কাটাইয়া দেয়। এই সময়ে সমগ্র ইমামবাড়া নীল সবুজ রক্তিম প্রভৃতি বিধিবর্ণের দীপ-মেখলায় সুসজ্জিত হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে থাকে।

ইমামবাড়া শহরের প্রান্তেক দেশে সংস্থাপিত; মসজিদের চতুর্দিকস্থ বিস্তীর্ণ কতকস্থান লইয়া ঐ স্থান হুসনী দালান নামে পরিচিত। ইমামবাড়ার গঠন কৌশল অতি সুন্দর। গত ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে হুসনীদালানের অনেক স্থান চুর্নবিচুর্ন হইয়া যাওয়ায় কীর্তিমান স্বর্গীয় নবাব আসান উল্লা খানবাহাদুর প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইমামবাড়ার সংস্কার সাধন করেন।

শাহাজাদা সুলতান সুজা যে-সময়ে বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে সৈয়দ মীর মোরাদ ঢাকাতে "মীর-ই-বহর" (Supdt. of the Fleet) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ইনি দিল্লিতে "মীর-ই-ইমারৎ" (Supdt. of Architecture) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।[১] কথিত আছে, একদা মীর মোরাদ গভীর নিশীথে স্বপ্নে দেখিলেন যেন, ইমাম হুসেন মহরমের মূর্তি স্মৃতি রক্ষার্থে "তাজিয়া কোণা" (a House of mourning) নির্মাণ করিতেছেন। স্বপ্নেদৃষ্টে হুসেনের সৌম্যমূর্তি এবং তাজিয়া কোণার সুখ-কল্পনা মোরাদের মন হইতে সহজে বিদূরিত হইল না। তিনি সর্বদাই এই বিষয়ের চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি স্বপ্নানুযায়ী কার্য করতে কৃতসংকল্প হইলেন। অবিলম্বে বহুলোক "তাজিয়া কোণা" নির্মাণের জন্য নিযুক্ত হইয়া গেল। মীর মোরাদ সর্বদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এমারতের গঠন-প্রণালি পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রতি বৎসর মহরমের সময়ে দীপমালায় আলোকিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মীরের মৃত্যুর পর ঢাকার সুবাদারগণ তদীয় সাধু সঙ্কল্পটি সুসম্পন্ন ও

সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য "তাজিয়া কোণা" আলোকমালায় বিভূষিত করিবার সমগ্র ব্যয় ভার বহন করিতেন।[১০] ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিমা জেসারৎখাঁ বাৎসরিক নির্দিষ্ট বৃত্তির টাকা কমাইয়া দিতে চাহিলে ঢাকার মোসলমান সম্প্রদায় মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকটে দরখাস্ত করেন। সিরাজ ঢাকার নিজামত হইতেই পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য জেসারৎ খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।[১১] ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ সোর ত্রৈবার্ষিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য ঢাকায় আগমন করিলে তিনি নিজামত মহালগুলি হুজুরির সহিত একত্র করিয়া ফেলিলেন।[১২] সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুসনী দালানের বাৎসরিক বৃত্তিরও উচ্ছেদ সাধন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই[১৩]। ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিম আসমৎজঙ্গ বাহাদুর মিঃ সোরের এই অন্যায় ও অবিচারের বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিলে গভর্নমেন্ট ২৫০০ সিক্কা টাকা বৃত্তি স্বরূপ নির্ধারিত করিয়া দেন।[১৪] আজ পর্যন্তও গভর্নমেন্ট দয়াপরবশ হইয়া নবাবি আমলের এই বৃত্তিটির উচ্ছেদ সাধন না করিয়া মহত্ত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট হুসনী দালানের জীর্ণ সংস্কারকল্পে তিন সহস্র এবং ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে চারি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।[১৫] অতঃপর কোর্ট অব ডিরেক্টরের আদেশ অনুসারে, জীর্ণ সংস্কার করে কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এইক্ষণে ঢাকার বর্তমান নবাব পরিবারের বদান্যতার উপরেই হুসনী দালানের অদৃষ্ট-চক্র স্থির রহিয়াছে।

পরগনা হোসনাবাদ, সৈদাবাদ, ময়নামতী এবং অন্যান্য কতিপয় সম্পত্তি হুসনী দালানের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে মীর মোরাদ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মীরের মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ প্রায় সমুদয় সম্পত্তি এবং হুসনী দালানের বহুমূল্যবান মণিমুক্তা জহরাদি হস্তান্তরিত করেন।

রোজাবসানে প্রতিদিন এই স্থানে শত শত লোক এফ্‌তার পাইয়া থাকে। সুশৃঙ্খলে কার্য নির্বাহ করিবার জন্য একজন দারোগা নিযুক্ত আছেন। হুসনী দালানের মতওল্লির আদেশানুসারে তিনি সমুদয় কার্য নির্বাহ করেন। মহরম উৎসবের সময়ে দারোগা "সিরিণী সিলামতের" অংশ পাইয়া থাকেন।

হুসনী দালানের গাত্রে যে কয়খানা শিলালিপি আছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে উহা হিজরি ১০৫২ সনে মীর মোরাদ কর্তৃক নির্মিত হয় এবং হিজরি ১১৩১ সনে মীরের মৃত্যু হয়।

পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য শিলালিপিগুলির পারসি কবিতা ও বঙ্গানুবাদ এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

"দার জামানে বাদশাহে বাওয়েকার
আঁ-আজম উশ্বান্ সাহে নামদার।
সাখ্‌তই মাতাম্ সারা সাই ইয়াদ্ মোরাদ্
দারসানে পান্‌জা ওয়াদো-ওয়াবর ইয়াক্ হাজার।
চুঁকে নামি হাস্ত্ জাতে পাকে পান্‌জেতান
গোপ্ত্ ইঁ তারিখে দালানে হোসায়নি য়াদগার"।।

"সুপ্রসিদ্ধ মহামান্য প্রতাপশালী বাদশাহের রাজত্ব সময়ে সৈয়দ মীর মোরাদ কর্তৃক এই শোক ভবন নির্মিত হয়। স্মরণার্থ হিজরি ১০৫২ সন হুসনী দালানেই দৃষ্ট হইবে। এই কবিতাটিতে হুসনী দালানের নির্মাণের তারিখ হিজরী ১০৫২ সন, স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও শেষ চরণের "দালানে হোসায়নি" পদ হইতেও ১০৫২ সন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"মীর-ই-ফৈয়াজ চুঁ যে দুনিয়া রাফ্‌ৎ
গ্যাষ্‌ত আজ্ রহমৎ-ই-ইলাহি সাদ

বুদ আজ্ দেল চুঁ খাদেম-ই-হাসনায়েন
হাক্ ন্যামাস যেজা-ই-এহ্সান দাদ্
গুপ্ত তারিখে-ই-ফাউৎ এউ হাতেফ্
বা হাসান ইয়াদ হাশ্রে মীর মোরাদ।"

"মীর ফৈয়াজ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া জগদীশ্বরের বিশ, কৃপালাভকরত সন্তুষ্ট হইলেন। কায়মনোবাক্যে হুসেনের দাস ছিলেন বলিয়াই জগদীশ্বরের কৃপাতে অনুগৃহীত হইলেন। স্বর্গ হইতে আদেশ হইল যে, মীরের স্মৃতি বিচারের দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তদীয় মৃত্যুর তারিখ হিজরি ১১৪১ সন বলিয়া দিল।"

এই কবিতাটির শেষ চরণস্থিত "ইয়াদ্ হাশ্রে" পদ হইতে মীর মোরাদের মৃত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম কবিতাটি হইতে হুসনী দালানের নির্মাণের তারিখ ১০৫২ হিজরি ধরিলে দৃষ্ট হইবে যে এই উভয় সনের পার্থক্য ৭৯ বৎসর। সুতরাং তাজিয়াকোণা নির্মাণ কার্য শেষ করিয়াও মীর মোরাদ ৭৯ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন দৃষ্ট হইতেছে।

ঢাকার সুবাদার ও নায়েব নাজিমগণই হুসনি দালানের মতউল্লী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন. ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজিউদ্দিন হায়দর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর গভর্নমেন্টের নিকট মতউল্লী নিযুক্তের জন্য রিপোর্ট করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তর আসিবার পূর্বেই মহরম উৎসব সমাগত হওয়ায় গভর্নমেন্ট উক্ত বৎসর বৃত্তি বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঢাকার বর্তমান নবাব বাহাদুরের প্রপিতামহ খাজা আলিমউল্লা সাহেব মহরমের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। পরে গভর্নমেন্ট কর্তৃক কাজে আলিমউল্লা সাহেবই মতুতউল্লিরূপে মনোনীত হন। তদীয় মৃত্যুর পরে নবাব আবদুলগণি বাহাদুর কে. সি. এস. আই. উক্ত পদে বৃত হন। তৎপরে তদীয় জীবিতাবস্থায়ই সুযোগ্যপুত্র ঢাকার নবাব বংশের কুলপ্রদীপ নবাব খাজে আসানউল্লা বাহাদুর কে. সি. আই. ই মহোদয় মতউল্লির কার্যভার গ্রহণ করেন। ঢাকার নবাব পরিবার সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও হুসনি দালানের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রতিবৎসর নবাব ষ্টেট হইতে ১২৮৩ টাকা ৮ আনা বৃত্তি নির্ধারিত আছে।

ইদ্গা :

ঢাকা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে পিলখানার সন্নিকটে ইদ্গা অবস্থিত। এই ধর্ম মন্দিরটি উচ্চপ্রাচীর-পরিবেষ্ঠিত। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা সুলতান সুজার আমলে দেওয়াল মীর আবদুল কাসেম কর্তৃক উহা নির্মিত হয়। দীনধর্মানুমোদিত নমাজের সুস্বর অদ্যাপি এই ধর্মমন্দিরে প্রতিনিয়ত শ্রুত হইয়া থাকে। ইদ্গাটির অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইয়া পড়ায় নবাব বাহাদুর ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ঢাকার নবাব ও সুবাদারগণ এই স্থানে আসিয়া নমাজ পড়িতেন।

কদম রসুল :

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অপরতীরে লাক্ষ্যানদীর পূর্বতটে নবীগঞ্জস্থিত কদমরসুল দুর্গ একটি তীর্থস্থান বলিয়া মোসলমানগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়া থাকে। মহম্মদের পদচিহ্ন এই দুর্গ মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরখণ্ডোপরি অঙ্কিত ছিল বলিয়া জানা যায়। এক্ষণে উক্ত প্রস্তরখণ্ডের তিরোধান হইয়াছে। দুর্গটি সুসংস্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদআলির বংশীয় মানোয়ারখাঁ জমিদার, নওয়ারা মহালের রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সুলতান সুজা কর্তৃক ঢাকা নগরীতে আহুত হইয়াছিলেন। মানোয়ার বহু লোকজন সমভিব্যহারে কোষা নৌকারোহণে খিজিরপুর হইতে ঢাকাভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় নবিগঞ্জের সন্নিকটে নৌকা নোঙ্গর করিয়া রাখা হইল। তথায় রাত্রিযাপন করা স্থিরীকৃত হইলে নৌকায় জনৈক

মাঝি অগ্নির অন্বেষণে তীরভূমিতে গমন করিলে ঐ ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে কতিপয় লোক একখণ্ড শিলা সম্মুখে রাখিয়া অনিমেষ-লোচনে কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। উহাদের কথোপকথনে প্রকাশ পাইল যে উহা মহম্মদের পদচিহ্ন; পূর্ব রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাহারা এখানে আসিয়া শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর মাঝি নৌকাতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সমুদয় বৃত্তান্ত মানোয়ারের কর্ণগোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে আগমন করেন এবং উহাই যে মহম্মদের পদচিহ্ন তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তাহাতে তাহারা বলিল "আপনি মানস করুন, আপনার মানস সিদ্ধি হইলেই অবগত হইতে পারিবেন।" তদনুসারে মানোয়ার মানস করিলেন যে তিনি যেন ঢাকা হইতে সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। পরে একটি খাগের কলম প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যদি এই শুষ্ক খাগটি হইতে পত্র অঙ্কুরিত হয় তবেই উহা যে মহম্মদের পদচিহ্ন তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

অতঃপর মানোয়ার ঢাকায় আগমন করিলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার দিবসত্রয় পরে খাগ হইতে কচিপাতা উৎপন্ন হইবার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া মানোয়ারের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে উহা নিশ্চয়ই "কদমরসুল"। অতঃপর তিনি খিজিরপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া নবিগঞ্জ নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণপূর্বক কদমরসুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং কতক ভূমি উহার ব্যয় নির্বাহার্থে নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ঢাকা কালেক্টরিতে শাহাজাদা সুজার দস্তখতি দলিল আছে তাহাতে ভূমি দানের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন জালালউদ্দিন আবলমুজাফর ফতেশাহের সময়ে বাবা সালিহ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে কদমরসুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি মক্কা ও মদিনা দর্শন করেন। এই দুই স্থানের মহম্মদের পদচিহ্ন তাঁহার দর্শন হয়। হিঃ ৯১২ সনে বাবা সালিহের মৃত্যু হইয়াছে।

পাচপীরের দরগা : "মোসলমান শাস্ত্রমতে ধর্মযুদ্ধে জেতার গাজি আখ্যা হইয়া থাকে। সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত মহল্লা বাঘারপুর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পাচপীর বা ফকিরের শ্রেণিবদ্ধরূপে পাঁচটি দরগার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহা, গয়েসদি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজি ও কালু নামক ভীষণযোদ্ধা পঞ্চ পলিটিকেল ফকিরের অবস্থিতি বা নমাজের স্থান বলিয়া হিন্দু ও মোসলমানগণ অতীব সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। আজও হিন্দু-মোসলমান পথিকগণ এই স্থানের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া উক্ত ফকির পঞ্চকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। মন্দিরগুলির চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকটি স্তম্ভ দৃষ্টে অনুমিত হয় কোনও সময়ে ছাদ নির্মাণেও উদ্যোগ হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এক সময়ে গাজির গীতের ভূরি প্রচলন ছিল। এখনও হিন্দু-মোসলমান-নির্বিশেষে উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। হিন্দু রাজাদিগের গুণ গরিমা যেরূপ চারণ এবং ভটিগণ মুখে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইত, সুবর্ণগ্রামের মোসলমান অধিপতিদিগের ধার্মিকতা, প্রভূতাদি ও সেইরূপে গীতাকারে গৃহে গৃহে শুনানের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।

আমার গাজির গীতের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পোড়া রাজা গায়েস্‌দি তার বেটা সমস্‌দি
পুত্র তার সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখানা গাজি, খোদাবন্দ মুলুকের রাজি
কালি যুগে যার অবতার।।
বাদসাই ছাড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির"।।

গয়েস্‌দি, বাদশাহা গয়েসুদ্দিন, সমস্‌দি, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন পাঠান শাসনকর্তা

সমসুদ্দীন, সিকান্দর, বঙ্গের প্রখ্যাতনামা বাদশাহ, যাহার হাতে বঙ্গদেশ প্রথম জরিপ হয়। গাজি, ধর্মযুদ্ধজেতা গাজিসা; কালু, হিন্দুফকির, গাজির মন্ত্রণাদাতা প্রিয়তম সহচর।[১৬] পিতা সিকান্দর বাদশাহ বর্তমানেই গাজিসা ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মটুক রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। পরে তথা হইতে ক্রমশ ভাটির দিকে আগমন করেন। এক দিকে ধর্ম, অন্যদিকে রাজ্য-বিস্তার ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আজও নাবিকগণ নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে পাচপীর ও বদরের নাম উল্লেখ করিয়া থাকে।

পারুলীয়ার দরগা :

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানোয়ারখাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান সরিফখাঁ দরবেশ হইয়া পারুলীয়া গ্রামে দরগা নির্মাণকরত ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ধার্মিক সরিফখাঁ, অতুল ঐশ্বর্য, পথপতিত পদদলিত বালুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহার পবিত্র ভজনালয় পারুলিয়া গ্রামে বর্তমান আছে। হিন্দু মোসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পারুলীয়া দরগার শিলালিপি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :
"কায়দা জিনৎ বিস্তে নাছের জেওজা এ দেওয়া সরিফ্।
মসজিতে আলি বেণা চু গম্বজে আখ্জর জরিপ্।।
সাল তারিখাস্ বাগোপ্তা হাতেফ্ আজরূরে সুমার।
এক হাজারো একশ দো বিস্ত শস্ আজ্ হিজ্রে নাজিফ্।।

অর্থাৎ : দেওয়ান সাহেবের বংশীয় নাছের আলিখাঁর কন্যা দেওয়ান সরিফ খান বাহাদুরের স্ত্রী, নীলাকাশ তুল্য সুদৃশ্য প্রকাণ্ড একটি মসজিদ হিজরি ১১২৬ সনে নির্মাণ করাইলেন।

দেওয়ান সরিফখাঁ প্রত্যহ লাখপুর হইতে পারুলিয়া গ্রামে নমাজ পড়িবার জন্য আগমন করিতেন। তাঁহার আসিবার পথে নৌকা যাতায়াতের জন্য যে একটি খাল খনিত হইয়াছিল উহার নাম "দেওয়ানখালি।" রায়পুরা থানার উত্তর দিকস্থ সাধার চরের উত্তরভাগে এই খাল অদ্যাপি বর্তমান আছে।

সাধু সরিফখাঁ হয়বৎ নগরস্থ পৈত্রিক আবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া পারুলিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার অংশানুযায়ী কতক ভূসম্পত্তি স্বীয় নামোল্লোখে তৌজিভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার জমিদারি নং ৮৬৬৩,তপ্পে সরিফপুর হাজার চৌদ্দ।

সরিফখাঁর সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।[১৭]

পাগলা সাহেবের দরগা :

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত হবিবপুর গ্রামের দক্ষিণে সদর রাস্তার দক্ষিণ দিকে কুমড়াদি গ্রামে একটি দরগা আছে। ইহা পাগলা সাহেবের দরগা বলিয়া সুপরিচিত। শিশু সন্তানের উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ কামনায় হিন্দু-মোসলমান-নির্বিশেষে লোকে পাগলা সাহেবের নামে মানসিক চুল আদায় করিয়া থাকে। এই পীর পাগলা সাহেব নামে কেন পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ইনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন।

ভগবচ্চিন্তায় একান্ত মনোনিবেশ জন্যই ইহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইনি দ্রব্যাদি অপহরণকারীর নাম ধাম সবিস্তারে বলিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। চোর ধৃত হইলে উহাদিগকে দেওয়ালের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পরে একে একে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতেন। এইরূপে অসংখ্য চৌর্যাপরাধির ছিন্ন মস্তক মালাকারে একত্র গ্রথিত করিয়া নিকটবর্তী খাল মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। এজন্য এই খালটি এক্ষণে মুণ্ডমালার খাল বলিয়া এতদেশে প্রসিদ্ধ।

মহজুমপুরের মসজিদ :

"মহজুমপুরের মসজিদস্থিত একটি স্তম্ভের প্রস্তরখণ্ড হইতে অনবরত ঘর্মাকারে জলনিসৃত হইত। পুত্র কামনায় বন্ধ্যা স্ত্রীগণ, ঐ স্তম্ভ আলিঙ্গন করিত। কিন্তু অপবিত্রতা স্পর্শে নাকি অনেক দিন হইতে ঐ স্তম্ভ গুণ-বিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঘর্মশীল বারুণ প্রস্তরের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। সম্ভবত স্তম্ভগাত্রে ঐ প্রকার একখানা প্রস্তর অলক্ষ্যভাবে স্থাপিত ছিল, তাহা হইতেই ঘর্মাকারে জলের উদগম হইয়া স্তম্ভের মূলদেশে পতিত হইত। পরবর্তী কোনও সময়ে ঐ বারুণ প্রস্তরখণ্ড অপহৃত হওয়ায় স্তম্ভটি গুণ-বিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে।

পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফের দরগা :

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত মোগড়াপাড়া বাজারের অনতি উত্তরে দুইটি গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদীর্ঘ অট্টালিকায় সুপ্রসিদ্ধ পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফ ও তদীয় পিতা ও পত্নী সমাহিত হন। প্রত্যেকটি সমাধি মন্দিরের শীর্ষ দেশে দুইটি করিয়া সুবর্ণ পুষ্কল ছিল। হিন্দু-মোসলমান নির্বিশেষে রোগাদি মুক্তি কামনায় এই মসজিদে মানসিক করিয়া থাকে। স্বধর্মনিষ্ঠ প্রত্যেক মোসলমানই এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিবার সময়ে দরগায় নমাজ পড়িয়া থাকেন।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল কোনও দুষ্ট লোকে সমাধি শীর্যস্থিত সুবর্ণ পুষ্কল অপহরণ করিয়াছে।

পীর সাহেবের প্রতি সর্বসাধারণের অচলাভক্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক কৃষকই তদীয় শ্রমলব্ধ ফসলের কিয়দংশ পীরের উদ্দেশ্যে প্রদান না করিয়া গ্রহণ করে না।

ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময়ে আর্বিভূত হইয়াছিলেন। ইহার সমাধি স্থানের সন্নিকটে যে মসজিদ বিদ্যমান আছে, উহা ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে স্বয়ং খন্দকার সাহেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদ গাত্রস্থিত প্রস্তরফলকে হিজরি ১১১২ (১৭০০ খ্রি অঃ) সন লিখিত আছে। উক্ত মসজিদের সংলগ্ন সমাধিস্থান ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই সমাধিক্ষেত্রে আরও যে কত অজ্ঞাতনামা পীরের সমাধি আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

এই মসজিদে প্রবেশকালে বামপার্শ্বের দেওয়ালে যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহাতে চুনের প্রলেপ দিলে নষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ বিশ্বাসে লোকে উহাতে চুনের প্রলেপ দিত। ইহাতেই ক্রমে ক্রমে দুই ইঞ্চি পরিমাণ চুন সঞ্চিত হইয়া যায়। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব সেই চুন পরিষ্কার করাইয়া হিঃ ৮৮৯ (১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে) সনে লিখিত একখানা শিলালিপি প্রাপ্ত হন। উহা জালালুদ্দিন আবুল মজঋফর ফাতশাহার বেশরক্ষক মোকরবউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ও খোদিত হয়। ইনি মোয়াজ্জমাবাদ এবং লাউর নামক স্থানদ্বয়ের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই শিলালিপিখানা বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদের প্রস্তরফলকের এক বৎসর পরে খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীনত্ব হিসেবে ইহা ঢাকা জেলায় দ্বিতীয় স্থানীয়।

মগড়াপাড়া বাজারে মুন্নাসা দরবেশের সমাধিস্থান আছে। এই দরবেশ সম্ভবত পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফের সমসাময়িক। এই পথে যাতায়াত করিবার সময়ে ধার্মিক মোসলমানগণ এই মসজিদে নমাজ পড়িয়া থাকেন।

দমদমা দুর্গ :

মোগড়াপাড়া ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ কয়েকখানা গ্রামসহ কোঙরসুন্দর প্রভৃতি কতিপয় স্থান পাঠান-শাসন সময়ে শহরতলী শহর সোনারগাঁ বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এইস্থানেই পাঠান ভূপতিগণের রাজপ্রাসাদ ছিল। ইহার চতুর্দিকে বহুতল মসজিদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মোগড়াপাড়ার অনতিদূরে একটি প্রাচীন ভগ্ন দুর্গের শীর্ষভাগে প্রকাণ্ড তিন্তিরি বৃক্ষ স্বীয় মস্তক উত্তোলনপূর্বক সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুর্গের সমুদয় চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়াছে। মহরমের সময়ে এখানকার গোলাকার উচ্চভূমি "অসুর খানা" রূপে ব্যবহৃত হইত। মহরমের দশম

দিবসে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থানীয় মোসলমানগণ এখানে তাজিয়াদি রাখিয়া দিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে এখানকার মোসলমানগণ ফেরাজি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব প্রথার বিলোপ সাধন করিয়াছে।

J. A. S. B. 1874 : List of ancient monument.

শাহ আবদুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি :

মোগড়াপাড়া গ্রামের উত্তরাংশে গোহাটা মহল্লায় সুপ্রসিদ্ধ পীরশাহ আবদুল আলার সমাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইনি পোকাই দেওয়ান নামে পরিচিত। কথিত আছে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক দ্বাদশ বৎসরকাল নিবিড় অরণ্যমধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই সময়ে ইহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল; এমনকি আহারাদির জন্যও ইনি কোনও সময়ে ধ্যান ভগ্ন করিয়াছিলেন না। ইহার অনুচরবর্গ এই পরমযোগী মহাপুরুষের অন্বেষণে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে ইহাকে একটি ঢিপি মধ্যে ধ্যান-মগ্নাবস্থায় প্রাপ্ত হয়। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ ১৮৬৪ সনে সুবর্ণগ্রামে এরূপ বয়োবৃদ্ধ লোক বিদ্যমান ছিলেন যাহারা এই মহাপুরুষের পুত্র শাহ ইমাম বক্‌স বা চুলু মিএগকে তথায় জীবিতাবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। চুলু মিএগ বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহট্ট হইতে পিতার সমাধি স্থান পরিদর্শন করিতে এখানে আগমন করেন, এবং কতিপয় বৎসর এখানে বাস করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। পিতাপুত্রের সমাধি একইস্থানে পাশাপাশিভাবে রহিয়াছে। J. A. S. B. 1874 : pt I.

শাহ আবদুল আলমের সমাধির সন্নিকটে একখণ্ড প্রস্তর অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ডোপরি যোগাসনবদ্ধ হইয়াই ইনি দ্বাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার দেওয়ালের উপরে একখানা খড়ের দ্বারা এই সমাধিটি রক্ষিত হইয়াছে।

পারিলের দরগা :

মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত পারিল গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ দরগা বর্তমান আছে। দরগার চতুর্দিকে যে সমুদয় প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থিত কোনও কোনও প্রস্তরফলকে পারসি ও আরবি ভাষায় পারিল গ্রামের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিজরি ৬১১ সনে শাহ গাজিমুলুক একরামখান নামধেয় জনৈক আউলিয়া দরবেশ এইস্থানে আগমন করিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। শাহ সাহেব যে স্থানে সমাহিত হন সেইখানেই এই দরগাটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এই দরগাটিকে অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

ধামরাইর পাচপীর :

খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম-প্রচারোৎসাহোন্মত্ত দরবেশগণ পশ্চিম এশিয়া হইতে ধর্মপ্রচারব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিত এবং ভারতীয় মোসলমান রাজন্যবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইত। এই সময়ে শাহজালাল ৩৬০ জন দরবেশসহ এতদঞ্চলে আগমন করেন। এই আউলিয়াগণ বঙ্গের বিভিন্নস্থানেই দীন ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন।

উঁহাদিগের মধ্যে মীর সৈয়দালী তেব্রিজি (তেব্জি প্রদেশের বাদসা ফকির), মিশরদেশবাসী হাজি মীর মহম্মদ, হাজি মিফ্‌তাউদ্দিন তাইকি, মীর মকদুল সাহেব, সেনাপতি পীর জঙ্গি সাহেব এবং ভগিনী পাগলা বিবি, ধামরাই গ্রামে আগমন করিয়া এতদঞ্চলে মোসলমান ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ইহাদিগের মধ্যে মীর সৈয়দালী তেব্রিজি এতদঞ্চলে "সৈয়দালী পাতশা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার দরগা ধামরাইর পাঠান-টোলায় অবস্থিত। এই দরগাটি "বড় দরগা"

নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত হাজি মীর মহম্মদ ও মিফ্‌তাউদ্দিন তাইকির দরগা মোকাম টোলায়, মীর মকদুল সাহেব (ইনি জঙ্গ বাহাদুর নামে খ্যাত) ও সেনাপতি পীর জঙ্গি সাহেবের দরগা মাইফরাসপাড়ায়, এবং পাগলা বিবির দরগা কাইলাগার বাগানগড়ে অবস্থিত।
কোণ্ডা খন্দকারের দরগা : পালবংশীয় রাজা হরিশচন্দ্রের অনন্তর বংশ তরুরাজ খাঁ মোগল শাসন সময়ে হুগলীর ফৌজদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তরুরাজের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে ভাগ্যবন্ত রায় স্বধর্মনিষ্ঠ ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। মোসলমানসংশ্রব দোষে জাতিপাত বিবেচনা করিয়া তিনি সমাধিযোগে তনুত্যাগ করেন। তিনি সাভার ও ফুলবাড়িয়ার সন্নিহিত কোণ্ডা নামক নিজ গ্রামেই সমাহিত হন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষ "খন্দকার" এবং সমাধি মন্দির "খন্দকারের" দরগা বলিয়া খ্যাত। হিন্দু-মোসলমান-নির্বিশেষে সকলেই এই দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সিন্নি প্রদান করে। দরগায় একজন খাদিম নিযুক্ত আছে। এই দরগা জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঢাকার নবাব বাহাদুর কর্তৃক সংস্কৃত হয়। ভাকুর্তার রায় বংশ প্রদত্ত বহু জমি "পিরাণ" নানকার ছিল। এইস্থানে কুড়ি বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি সরোবর এখনও বিদ্যমান আছে। কোণ্ডা গ্রামের ভাগ্যবন্তপাড়া এই ভাগ্যবন্তের নামানুসারেই হইয়াছে।

বাস্তার মাদারি ফকিরের আস্তানা :

বাস্তা গ্রামের মাদারি ফকিরের অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শ্রুত হইয়া যায়। মাঘীপূর্ণিমার দিন এখনও এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে। রোগমুক্তির জন্য এই স্থানে অনেকে মানত করিয়া সিন্নি প্রদান করে।

মীরপুরের সা আলিসাহেবের দরগা :

ঢাকা শহরের ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে মীরপুর গ্রামের সান্নকটে সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া সাআলি সাহেবের দরগা অবস্থিত। এই দরগাটি সমচতুষ্কোণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৩৬ ফুট। উচ্চতাও প্রায় তদনুরূপ হইবে। দরগা মধ্যে শাহআলি সাহেবের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কথিত আছে যে প্রায় চারিশতাধিক বৎসর পূর্বে শাহআলি নামে বোগ্‌দাদের জনৈক রাজকুমার সংসারের বীতস্পৃহ হইয়া চারিটি শিষ্যসহ নানা দেশ পর্যটনপূর্বক এখানে সমাগত হন, এবং একটি ক্ষুদ্র মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দেড় বৎসর কাল অনশনব্রত গ্রহণপূর্বক মসজিদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং ঐ সময় মধ্যে কেহ যেন তাঁহার ধ্যানযোগ ভঙ্গ না করে এজন্য শিষ্য-মণ্ডলীকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছিলেন। দেড়বৎসর অতীত হইবার একটি দিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে শিষ্যগণ মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিতে পাইয়া কৌতূহলপরবশ হইয়া দ্বার উন্মোচনপূর্বক দেখিতে পাইল যে সাধু তথায় নাই কিন্তু তৎপরিবর্তে একটি পাত্র মধ্যস্থিত শোণিতরাশি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংস্পর্শে উদ্বেলিত হইতেছে, তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তদবস্থ চিত্তে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলে সাধুর স্বরের অনুকরণে কে যেন ঐ শোণিতরাশি সমাধিস্থ করিবার জন্য আদেশ করিতেছে এরূপ অনুমিত হয়। শিষ্যমণ্ডলী প্রত্যাদেশ অনুযায়ী গুরুর দেহাবশেষ সমাধিস্থ করিল। সাধুর শেষচিহ্ন বক্ষোধারণ করিয়াছে বলিয়া দরগাটি পূণ্যস্থানের ন্যায় আজও সম্মানিত হইতেছে।

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে মীরপুরের জনৈক মোসলমান ব্যবসায়ী, শাহআলি সাহেবের মানত করিয়া কারবারে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল। কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী সাধুর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজও শত শত নরনারী শাহআলি সাহেবের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়া থাকে।

ঢাকার অবদান কল্পতরু স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুলগণি কে. সি. এস. আই. মহোদয় তথায় আর একটি মসজিদ এবং সাধু ফকির ও দূর দেশান্তর হইতে সমাগত মোসলমান নরনারীর আশ্রয়ের জন্য নাতিক্ষুদ্র একটি ইষ্টক নির্মিত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দরগার সন্নিকটে একটি পুষ্পোদ্যান এবং নাতিদীর্ঘ একটি পুষ্করিণীও খনিত হইয়াছে। ঢাকার নবাব পরিবারের বদান্যতায় মীরপুরের এই দরগাটির বাৎসরিক উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। মীরপুরের নদী হইতে এই দরগা পর্যন্ত এবং ঢাকা-গোয়ালন্দ রাস্তা হইতে দরগা পর্যন্ত দুইটি রাস্তাও তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন।

আজিমপুরের মসজিদ :

কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধের পরে, একদা নবাব সিরাজদৌল্লার মীরমুন্সি, মহম্মদ দেওয়ান নামক কোনও ব্যক্তি পাল্কিতে আরোহণপূর্বক মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়া গমন করিবার সময়ে মহম্মদ দেওয়ানের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি সংসারে নিতান্ত বীতস্পৃহ হইয়া নানাস্থানে পর্যটনপূর্বক আজিমপুরা নামক স্থানে আগমনপূর্বক ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে তিনি কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ দেওয়ানের বংশধরগণ মধ্যে এক শাখা বাবুপুরার সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছে। এই বংশীয় বাবু খাঁ দেওয়ানের নামানুসারে স্থানের নাম বাবুপুরা হইয়াছে।

হিন্দু-মোসলমান-নির্বিশেষে সকলেই আজিমপুরার মসজিদটিকে নিতান্ত সম্মানের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

হাসারার দরগা :

ইহা আলমগাজির দরগা নামে খ্যাত। রোগমুক্ত হইবার জন্য হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পীড়িত হইলে এই দরগায় সিন্নি মানত করিয়া থাকে। বিক্রমপুর অঞ্চলে হাসারার এই দরগাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আলম গাজি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব ছিলেন। তেঘরিয়ার সৈয়দ বংশের হস্তলিখিত প্রাচীন একখানা পারসি পুস্তকে উঁহাদিগের বংশ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশীয় সৈয়দ আলম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জয়নাল আবেদিনের বংশধর। ঢাকায় বঙ্গের মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এই সৈয়দ আলমের পুত্র সৈয়দ ইমাম (প্রকাশ্যে সৈয়দ হিঙ্গু) ও সৈয়দ ঝিঙ্গন তেঘরিয়া গ্রামে উপনীত হন। আলম গাজির পিতৃস্বসার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ সৈয়দ হিঙ্গু এই মহিলার পাণিগ্রহণপূর্বক তেঘরিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতে থাকেন। অদ্যাপি ইহাদিগের বংশধরগণ তেঘরিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কোনও কারণে হাসারার সিংহ চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণের সহিত আলম গাজির মনোমালিন্য ঘটিলে গাজি সাহেব প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া দর্পনারায়ণের বংশীয় স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সংহার করিয়াছিলেন; কেবল একটি মাত্র বধূ শিশুপুত্রসহ পিত্রালয়ে ছিল বলিয়া অব্যাহতি পায়। কালক্রমে এই শিশু কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হন। এবং স্বীয় বংশের হন্তারক আলম গাজিকে নিহত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া হাসারা গ্রামে আগমনপূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করেন। কথা হয়, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি জেতার হস্তগত হইবে। এই যুদ্ধের ফলে আলম গাজি নিহত হন। আলমের বৃদ্ধ মাতা গলদশ্রুনয়নে পুত্রহন্তাকেই পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন এবং আলমের সমুদয় সম্পত্তি তাহাকে প্রদান করেন। আলমের সমাধিস্থানেই এই দরগা নির্মিত হইয়াছে। আজ পর্যন্তও হাসারার সিংহ চৌধুরিগণ এই দরগায় সর্বাগ্রে সিন্নি প্রদান করিবার অধিকারী। গাজির বংশধরগণ কর্তৃক দরগার কার্যাদি সুসম্পন্ন হইতেছে। এই দরগার

সংলগ্ন উত্তরে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, তাহার পূর্বাপার দিয়া শ্রীনগর হইতে ঢাকায় যাতায়াতের একটি রাস্তা আছে।

নানকপন্থী মঠ : ইদগার অনতিদূরে রমনার কালীবাড়ির ঠিক পশ্চিমে একটি প্রাচীন শিখ সঙ্গত আছ। টেইলার সাহেব ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় দ্বাদশটি সঙ্গত সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থানের অনুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যে মৃত মোহন্তগণের সমাধি বিদ্যমান থাকিয়া ঢাকার প্রাচীন শিখ কীর্তি সজীব রাখিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থ সাহেবের পূজা হয়। সম্মুখের উচ্চ বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মর্মর প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ গুরু নানকের পদচিহ্ন স্থাপিত আছে। সঙ্গতের বৈঠকখানাটি সায়েস্তাখানি ধরনে নির্মিত। প্রাঙ্গণমধ্যে অষ্ট কোণাকার একটি প্রকাণ্ড ইদারা আছে। উহা গুরুনানকের ইন্দারা বলিয়া কথিত হয়। প্রবাদ এই যে গুরু নানক এক সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি এই ইন্দারা হইতে জলপান করেন। এজন্যই এই ইন্দারার জল নানাবিধ অলৌকিক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।[১৮] আবার কেহ কেহ বলেন যে, নবম শিখগুরু তেগ বাহাগুদর দিল্লিশ্বর ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ঢাকায় তাঁহার বহু শিষ্যমণ্ডলী জমিয়াছিল। তিনিই এই সঙ্গতটির প্রতিষ্ঠাতা।

এই সঙ্গতকে নথা সাহেবের সঙ্গত বলে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের সময়ে নথা সাহেব ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, এজন্য আবার কেহ কেহ নথা সাহেবকেই ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অনুমান করেন।

যাহা হউক ঢাকায় একসময়ে যে গুরু নানকের প্রতিষ্ঠিত শিখধর্মের রশ্মি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এজন্য যে মধ্যে মধ্যে একাধিকবার শিখ গুরুগণের এই নগরে পদার্পণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কূপমধ্যস্থিত গুরুমুখী ভাষায় লিখিত প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে. ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মোহন্ত প্রেম দাস কর্তৃক এই ইন্দারাটি একবার সংস্কৃত হইয়াছিল।

আরমানি গির্জা :

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আরমানিগণ ঢাকাতে বাণিজ্যব্যপদেশে আসিয়া বাস করেন। পূর্বে এখানে আরমানিদিগের সংখ্যা অনেক ছিল। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। প্রথমত ইহারা একটি ক্ষুদ্র গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদিগের প্রাধান্য এই নগরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে। ১৭৮১ খ্রি আরমানিটোলাতে একটি বৃহৎ গির্জা নির্মিত হয়।

গ্রিক গির্জা :

আরমানিদিগের আগমনের পরে গ্রিকগণ এখানে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় গ্রিকগণের দলপতি ধনী শ্রেষ্ঠ Alexis Argyen ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় বিপুল ধনরাশি তাহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে ইহারা ঢাকাতে একটি গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

তেজগাঁর গির্জা (পর্তুগিজ) :

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজগণ বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেন। এই বৎসর John De Silveyra চারিখানা বাণিজ্য পোতসহ বেঙ্গালাতে কুঠি নির্মাণোদ্দেশ্যে মালদ্বীপ হইতে আগমন করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে ইহারা শ্রীপুর ও লড়িকুলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তেজগাঁর গির্জা Anguatine ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের বহুপূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। এই ধর্মমন্দিরের সহিত দক্ষিণ ভারতস্থিত গির্জার সাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে তেজগাঁর গির্জা সম্ভবত Vertomannus কর্তৃক উল্লিখিত খ্রিষ্টান বণিকগণ কর্তৃকই নির্মিত হইয়া থাকিবে। Vertomannus ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গালা নগরস্থিত খ্রিষ্টানগণ

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Dr. Taylor অনুমান করেন উক্ত খ্রিষ্টান বণিকগণ তেজগাঁতে যে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন রোমান ক্যাথলিকগণ তাহারই সংস্কার সাধন করিয়া পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন।

ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগারি নামক স্থানেও পর্তুগীজ দিগের একটি গির্জা আছে।

১. ডাক উজ্জ্বল গহনার অংশ বিশেষ (Reflector)। জরা ও কাজের নিচে "ডাক" দেওয়া হয় ; তাহাতে কারুকার্য প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর দেখায়। "ডাক" দেশজ শব্দ, স্থানীয় কর্মকারগণের নিকট এই শব্দটি সুপরিচিত।

২. পাণ্ডা ব্রজলাল তেওয়ারি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে জনৈক সন্ন্যাসীর হস্তে পূর্বে দেবীর অর্চনার ভার অর্পিত ছিল, তদীয় পরলোকান্তে তেওয়ারি মহাশয়দিগের দ্বারাই এক্ষণে উহা সম্পন্ন হইতেছে।

৩. আমাদের বিবেচনায় কেদার রায়ের অধঃপতনের পরেই এই চক্র কোনও ক্রমে কৃষ্ণদাসের হস্তগত হইয়াছিল।

৪. জয়দুর্গার শরীরের কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং অপরাংশ গৌর বর্ণ ছিল।

৫. এইস্থানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রবাদ ঐ স্থান হইতে মাধব পাওয়া গিয়াছে এজন্যই উহা "মাধবকাইনামে সুপরিচিত।"

৬. কেহ কেহ তন্ত্রচূড়ামণ্যোক্ত "নিতম্বং কালমাধবে" এই শ্লোকাংশ অবলম্বন করিয়া ধামরাই একটি পীঠস্থান বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যশোমাধবের চালীর উপরে, ঠিক মধ্যস্থলে, যে মহাদেব মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে "অশিতাঙ্গ শিব" বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

৭. "চৈত্রে মাসি চর্তুদশ্যাং মদনস্য মহোৎসব। জুগুপ্সিতোক্তিভিস্তত্র গীতবাদ্যাদিভির্নৃণাম্। ভগবাংস্তুষ্যতে কামঃ পুত্র পৌত্র সমৃদ্ধিদঃ" ইতি তিথিতত্ত্বম্ "চৈত্র শুক্লত্রয়োদশ্যাং মদনং দমণাত্মক্। কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবদ্বীজয়েদ্দাজনেন তু"।। ইতি ভবিষ্যে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন বঙ্গদেশে মদনোৎসব নাই, উহা দোলযাত্রার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বর্তমানেও ধামরাইতে মদনোৎসব প্রচলিত দেখিতে পাই।

৮. "এরূপ কথিত আছে যে মনাই ফকির নামক একজন মোসলমান সাধু ব্যাঘ্রারোহণে সুধারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তদৃষ্টে সুধারাম বলিয়াছিলেন, "ভাই মনাই, জীবিত প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলেই নানাস্থানে যাইতে পারে, তাহাতে আর বাহাদুরি কি? যদি কাঠের ঘোড়ায় বেড়াতে পারিস তবে বুঝবো যে তোর সিদ্ধি হয়েছে বটে। এইরূপ বলিয়া রথযাত্রায় ব্যবহৃত একটি কাষ্ঠ নির্মিত অশ্ব মনাইকে দেখাইয়াছিলেন। মনাই ফকির সুধারামের বাক্যানুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকার করায় সুধারাম নিজে সেই কাষ্ঠনির্মিত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া সর্বত্র পর্যটনরত সকলকে বিস্মিত করিলেন। সে কাঠের ঘোড়া এখনও ঢাকা জেলান্তর্গত বাউলের বাজার নামক স্থানে বিদ্যমান আছে"—

প্রতিভা ১৩১৮ সন ৪র্থ সংখ্যা।

৯. Almashrag Vol I. No. 5

১০. Vide Report of Mr J. G. Dunbar.

১১. Govt. Correspondence in the office of the Commissioner of Dacca Division.

১২. Governor Generals of India and Taylor's Topography of Dacca.

১৩. Vide Correspondence in the Board of Revenue

১৪. Vide Report of Mr J. G. Dunbar.

১৫. Records in the Nawab Bahadur's office.

১৬. কালু, বিভীষণ শ্রেণিস্থ কোনও হিন্দু ফকির। ইহার কূটমন্ত্রণার বলে মোসলমানগণ সুবর্ণগ্রামে স্বাধীনতা হরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যই কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ কালুর নামও বন্দনার সর্বশেষে যোজিত হইয়াছে।

১৭. কথিত আছে, একদা জনৈক ক্ষৌরকার দেওয়ান সরিফর্খার বামহস্তের কনুই পর্যন্ত জলসিক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হুজুর, আপনার বামহস্ত ভিজা কেন।" সাধু সরিফর্খা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে "ব্রহ্মপুত্র নদে এক মহাজনের নৌকা জলমগ্ন হইতেছিল, এই সময়ে উক্ত মহাজন আমাকে "মানত" করায় আমি এইমাত্র তাহার নৌকা তুলিয়া দিলাম। সে মানসিক লইয়া আসিতেছে।" এই কথা বলিয়া তিনি উক্ত ক্ষৌরকারকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই বৃত্তান্ত অপর কাহারও

কর্ণগোচর হইলে ক্ষৌরকারের অমঙ্গল হইবে ইহাও বলিয়াছিলেন। অনতিবিলম্বে উক্ত মহাজন মানসিক সহ উপনীত হইল। এতদ্দৃষ্টে নাপিত অত্যন্ত নিকম্ময়াবিষ্ট হইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু একথা গোপন রাখিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িবামাত্রই ক্ষৌরকার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ক্ষৌরকার যে স্থানে বসিয়া দেওয়ান্ সরিফখাঁর সহিত কথোপকথন করিতেছিল উহা অদ্যাপি ইষ্টক দ্বারা চতুষ্কোণাকারে বাঁধান রহিয়াছে, এখানে এবং সরিফ ও তদীয় পত্নীর সমাধিস্থলে দুগ্ধ, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির লোকই সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে।

১৮. প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল একদা সাধক-প্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ব্রহ্মচারী মহোদয় এই কূপ জল দ্বারা রোগ মুক্তির আশ্চর্য বিবরণ আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন। রোগমুক্তির জন্য অনেকানেক হিন্দু এখান হইতে জল লইয়া যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
ঐতিহাসিক স্থান

আবদুল্লাপুর :

ঢাকা হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় ১১ মাইল দূরে, এবং রামপাল হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই স্থান পূর্বে পাইকপাড়ার অন্তর্গত ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন কর্তৃক হজরৎ আদম নিহত হইলে[১] বলদৃপ্ত মোসলমান বাহিনীর সহিত আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়ার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র প্রান্তরে (এই স্থান কানাই চঙ্গের মাঠ বলিয়া পরিচিত) বল্লালের ভীষণ রণাভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাসে ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই যুদ্ধেই বল্লাল ভূপতি নিহত হইয়াছিলেন।[২] এই যুদ্ধে বল্লালের চণ্ডাল জাতীয় "কানাই চঙ্গ" নামক এক সৈনিক পুরুষ অসীম বিক্রমপ্রকাশ করিয়া রণাঙ্গনে প্রাণবিসর্জন দিয়াছিল। এই বীরপুরুষের নামানুসারেই যুদ্ধক্ষেত্র "কানাই চঙ্গের মঠ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

বল্লালের পতনের সঙ্গে বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামের হিন্দু-স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া যায়। বল্লাল চরিত মতে বল্লাল ভূপতি ১৩০০ শকাব্দের (১৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[৩]

আন্তিবল :

টলেমির লিখিত আন্তিবলের অবস্থান লইয়া অনেকেই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। Mc. Crindle আন্তিবলকে বুড়িগঙ্গার সহিত অভিন্ন মনে করেন। তৎকালে আন্তিবলই ভারতের পূর্বসীমা বলিয়া নির্দেশিত হইত। ভারতের কোনও স্থানের দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে আন্তিবলের তুলনাই করা হইত। অর্থাৎ আন্তিবল ভারতীয় ভৌগোলিক দিকের কুমধ্য (O. Meridian) বলিয়া গণ্য ছিল।

উইলফোর্ড টলেমির লিখিত আহ্লাদনকে আন্তিবলের অপর নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গিবাজার নামক স্থানকেই তিনি আন্তিবল বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক।

ডাঃ টেইলার লিখিয়াছেন "টলেমির লিখিত আন্তিবল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। আটি ভাওয়াল হইতেই যে আন্তিবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই স্থান পূর্বে আন্তোমেলা (সংস্কৃত হাতিমল্ল বা হাতিবন্দ) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু নরপতিগণ এই স্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এই স্থানের এবম্বিধ নাম হইয়াছে। বানার এবং লাক্ষা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একডালা নামক স্থানেই আন্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানে হাতীবন্দ নামে একটি স্থান আছে তথায় পূর্বে রাজাদিগের হস্তী রক্ষিত হইত।"

Vide Mc Crindles Translation of Ptolemy : Asiatic Researches XIV Dr. Taylor's Topography of Dacca.

আদমপুর :

বরাব গ্রামের অনতি উত্তরবর্তী, আদমপুর নামক স্থান ঈশাখাঁর নন্দন আদমখাঁর স্মৃতির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। এই স্থানে ঘাটলা সমন্বিত এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনিত আছে। ইহা আদমখাঁর বাগানবাড়ি বলিয়া অনুমিত হয়।

আমিনপুর :

শহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে সোনারগাঁয়ের ক্রোড়িয়ান অবস্থিত করিত। আমিনপুরে ক্রোড়ীবাড়ির একটি ঝিকটির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

আড়াইহাজার :

আড়াইহাজার চৌধুরিদিগের পূর্বপুরুষ গজেন্দ্র চৌধুরি আদেশমাত্র আড়াইহাজার সৈন্য উপস্থিত করিতেন বলিয়া আড়াইহাজারি চৌধুরি বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই গৌরবাত্মক রাজাদেশ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদধ্যুষিত সুবিস্তৃত গ্রাম আড়াইহাজার নামে অভিহিত করেন। এই চৌধুরিদিগের অধিকারে মেঘনাদে বর্তমান প্রচলিত কুৎ ও জলকর এই উভয় ধর্মক্রান্ত "মাশুলে দরিয়া-ই" বলিয়া একরূপ কর আদায় হইত।

ইদ্রাকপুর :

ঢাকা হইতে ১৪ মাইল ও ফিরিঙ্গিবাজার হইতে ২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে মেঘনাদ লাক্ষা ও ধলেশ্বরী এই নদ-নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মগদিগের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য খান খানান মোয়াজ্জখাঁ (মীরজুমলা) এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঢাকা নগরী আক্রমণ করিতে হইলে এই স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এই পথ ভিন্ন অন্য জলপথ সুগম ছিল না। সুতরাং এই স্থানটিকে সুরক্ষিত করিতে পারিলে মগ এবং পর্তুগিজ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ঢাকা নগরী এক প্রকার নিরাপদ হইবে এই উদ্দেশ্যেই এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণতীরে নির্মিত হয়।

১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার তদনীন্তন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেটারসন সাহেবের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালেও এই দুর্গটি সুদৃঢ় ছিল।

উদ্ধবগঞ্জ :

শহর সোনারগাঁয়ের এক মাইল দূরবর্তী পূর্বদিকে মানাখালি নদীতটে অবস্থিত। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি পরিজ্ঞাত হন যে, শহর সোনারগাঁও ব্রহ্মপুত্র নদ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে।" উদ্ধবগঞ্জকেই তিনি সোনারগাঁও বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

তিনি যে এই বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় মোগড়াপারেই মোসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ব্রহ্মপুত্র হইতে মেঘনাদ পর্যন্ত যে খাল খনিত হইয়াছিল, তাহার নাম "মেনিখাল" বা গাঙ্গিনা: এই খালটি পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত আছে। ঈশাখাঁ এই খালটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

Montgomery Martins Eastern India Vol. III P. 43
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874 Pt. I.

এগারসিন্ধু :

ঢাকা হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরবর্তী পূর্বোত্তর প্রান্তেক দেশে নয়ানবাজারের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদী ও নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এইস্থান হইতেই বানার নদীর উদ্ভব হইয়াছে।

এখানে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সুবর্ণগ্রামের উত্তর সীমাপরিরক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল।

মোগলবীর তারসুনের হত্যাকাণ্ডের পরে শাহাবাজ খাঁ বিপুল বাহিনী সহ ঈশাখাঁর রাজত্ব আক্রমণ করিলে তিনি এই দুর্গটি সুরক্ষিত করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে শাহাবাজ খাঁ বানার নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসর বর্ষার প্রকোপ তত অধিক হইয়াছিল না। সুতরাং মোগল বাহিনী নদীর ধারেই অবস্থান করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাঠানেরা তখন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পঞ্চদশটি খাল খনন করাইয়া মোগল ছাউনির দিকে বর্ষার জলস্রোত ঢলাইয়া দিয়াছিল, ফলে তাহাতে মোগল সৈন্যদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

এই ঘটনার প্রায় দশবৎসর পরে ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বীরবর মানসিংহ নন্দন দুর্জন সিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রীত হইয়া মান সিংহ ঈশা খাঁর সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর দিল্লির দরবারে উপনীত হইয়া সম্রাট আকবর হইতে "দেওয়ান মসনদ আলি উপাধি এবং বাইশ পরগনার আধিপত্য লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মিঃ বিভারিজ এগারসিন্ধু ও কোঙরসুন্দর অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আকবর নামায় এইস্থান "বারসিন্ধুর" বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

J. A. S. B. 1874 and 1904 Elliot Vol. VI.

একডালা :

দুরদুরিয়ার ৮ মাইল দক্ষিণে বানার ও লাক্ষানদীর সঙ্গমস্থলে এই স্থান অবস্থিত। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর গ্রন্থকার জিয়াউদ্দিন বারুণী লিখিয়াছিলেন "দিল্লিশ্বর ফিরোজ শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিয়া হাজি ইলিয়াসের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং হাজি ইলিয়াসকে একডালার দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অবশেষে একডালার নিকটবর্তী উন্মুক্ত একলক্ষ বাঙালি হিন্দু মোসলমান এই ভীষণ রণযজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল।" দুর্গাবরোধ কালে হাজি ইলিয়াস ছদ্মবেশে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজা বিয়াবনী নামক জনৈক সাধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এই একডালার স্থান নির্ণয়ে অনেকানেক মনস্বী ব্যক্তিই অল্পাধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। মিঃ ওয়েষ্টমেক্ট ইহাকে প্রথমত দিনাজপুর জেলায় পরে পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল দুরবর্তী কোনও স্থানে মিঃ টমাস পুনর্ভবা নদী তীরবর্তী জগদলা নামক স্থানে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়ের নিকটবর্তী শাহরদিঘির অনতিদূরে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আবার ডাক্তার টেইলার, মিঃ হাণ্টার, মিঃ বিভারিজ প্রমুখ মনস্বীগণ ইহাকে ঢাকা জেলায় অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

একডালার অপর নাম "আজাদপুর" রাখা হইয়াছিল। পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর এবং ঢাকা জেলায় একডালার সন্নিহিত স্থানে আজাদপুর নামে কোনও স্থান আছে কিনা তদ্বিষয়ে কেহই অনুসন্ধান করেন নাই। প্রতিবর্ষে সাধু সন্দর্শনার্থে হোসেন শাহের ঢাকা হইতে পাণ্ডুয়ায় পদব্রজে গমন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া অক্ষয়বাবু প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ একডালাকে ঢাকা জেলায় অবস্থিত বলিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পুণ্যস্থান প্রভৃতি দর্শন লালসায় ধার্মিক মোসলমানের পক্ষে দূরদেশে পদব্রজে গমন করা অসম্ভব কেন আমরা বুঝিতে পারি না।

ঢাকার একডালার নিকটে একজন মোসলমান সাধুর সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। উহাই ইতিহাসোল্লিখিত "রাজা বিয়াবাণীর" সমাধি মন্দির কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয় বটে। কিন্তু পাণ্ডুয়ার একডালার নিকট কোনও সমাধি মন্দির দৃষ্ট হয় না।

বারুণীর লিখিত একডালার বিবরণ পাঠে উহা ঢাকার একডালা বলিয়াই অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

Vide J. A. S. B. 1895 : Dr. Taylor's Topography of Dacca.

কর্তাভু বা কত্রাপুর :

লাক্ষা নদীতীরে অধুনা তপ্পা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ খিজিরপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত। এইস্থানে ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার ছিল। শাহাবাজখাঁ খিজিরপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁও নগর হস্তগত করেন। পরে এই স্থানে আগমনপূর্বক ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মিঃ বিভারিজ বলেন "ঈশাখাঁর রাজধানী কর্তাভূতে ছিল, খিজিরপুরে নহে।" আকবরনামায় ঈশাখাঁর সহিত মানসিংহ তনয় দুর্জন সিংহের নৌযুদ্ধে দুর্জন সিংহ প্রাণত্যাগ করেন। India office. Mss. No. 236. এ ইহা "কাত্রাব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ২৩৫ সংখ্যক Mss. এ "কাত্রাভু" অথবা "কত্রাসু" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "মাসির-উল-উমরার" গ্রন্থকার বলেন. "কত্রাপুর"। ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে "কাটারব" বলিয়াছেন। কত্রাবু সরকার বাজুহারের অন্তর্গত বলিয়া জঙ্গলবাড়ির সনদে লিখিত হইয়াছে।

Sebastian Manrique সপ্তদশ শতাব্দের প্রারম্ভ সময়ে Catrabo এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডাঃ ওয়াইজ বলেন, 'ইহা একটি তপ্পা এবং এই স্থান লাক্ষাতীরে খিজিরপুরের বিপরীত কুলে অবস্থিত। ইহা ঈশাখাঁর বংশধরগণের সম্পত্তির অন্তর্গত। বিভারিজ সাহেব বলেন, "কত্রাব বলিয়া কোনও তপ্পা বা গ্রাম নাই।" আইন-ই-আকবরির "কাটারমলবাজু" এবং কাটারব অভিন্ন। উহার রাজস্ব ধার্য ছিল ৭৫০০০। Rennel এবং Tiefentheler লিখিয়াছেন "কাটারবল'। "সোরাব" বলিয়া একটি স্থান ঢাকার উত্তরে অবস্থিত দেখা যায়। এই স্থান বানার নদীর দক্ষিণ তীরে এবং একডালার কিছু উত্তরে সংস্থিত। বিভারিজ বলেন, সম্ভবত উহাই "কত্রাভু"। স্থানান্তরে আবার তিনি লিখিয়াছেন, "টেইলারের উল্লিখিত "কুঠিবাড়ি-ই সম্ভবত "কত্রাভু" হইবে।"

বিভারিজ সাহেবের অনুমান আমাদের নিকটে সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। আকবরনামায় শাহাবাজের অভিযানের যে একটি সুন্দর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে এই স্থানকে "পনার" বা লাক্ষাতীরে নির্দেশিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

J. A. S. B. 1874 and 1994.
Akbar-Namah, Translated by H. Beveridge

কলাগাছিয়া :

স্বনামপ্রসিদ্ধ নদীর তীরে। এই স্থানে একটি দুর্গের অবস্থান অবগত হওয়া যায়। এই সোনারগাঁও হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং শ্রীপুরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু নদী এই স্থান এবং দুর্গটি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি শুল্কালয় ছিল।

ঈশাখাঁ মসনদ আলি চাঁদরায়ের দুহিতা সোনামণিকে লাভ করিবার আশায় চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, রায়রাজগণ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই তদধিকৃত কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1874, pt. I.

কাজি-কসবা :

এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের অনতিদূরে অবস্থিত। কথিত আছে, যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে বোগদাদনিবাসী মহম্মদ সমফিউদ্দিন নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মোসলমান যুবক পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। অবশেষে সেলিমের অনুরোধে তিনি পূর্ববঙ্গের প্রধান কাজির পদলাভ করিয়া কাজি মহম্মদ নামে পরিচিত হন। এই কাজিসাহেব কসবা নামক গ্রামে সীবায় বাসস্থান মনোনীত করিয়া দিল্লিশ্বরকাশে আবেদন করাতে সেলিমের অনুগ্রহে তিনশত বায়ান্ন দ্রোণ ভূমির সহিত উক্ত গ্রাম নিষ্কর জায়গিরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থান কাজি-

কসবা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত আত্মরক্ষার জন্য তিনি একদল মোসলমান সিপাহীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগের বাসস্থানের জন্য একটি গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ গ্রাম সিপাহীপাড়া নামে কথিত হইয়া থাকে। সিপাহীপাড়ায় এখনও উহাদিগের বংশধর বর্তমান থাকিয়া কাজিগণের পূর্ব গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কাজি ইমানুদ্দিনের নিকটে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পাঞ্জাযুক্ত এক সনদ ছিল। তাহাতে আকবর প্রদত্ত জায়গীরের স্বত্ব কাজিদিগকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও নতুন জায়গিরদানের বিষয় উল্লিখিত আছে, ইহার পরেও কাজিদিগের বংশ বৃদ্ধি হইলে, পূর্ব জায়গীরের আয়দ্বারা তাঁহাদের সম্যক্ ভরণপোষণ কষ্টকর বলিয়া সম্রাট শাহ আলম পুনরায় কালকা গ্রাম জায়গির দেন। তাহাতে পূর্বদত্ত জায়গীরের উল্লেখ আছে।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889.
ভারতী, ১৩১২, ভাদ্রসংখ্যা।

কেদারপুর :

এই স্থান ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। কেদারপুর নামে একটি পরগনার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবত টেইলার সাহেব এই স্থানকে কেদারবাড়ির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। এই স্থানে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। কেদারবাড়ির কোনও কোনও স্থান খনন করিবার সময় মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইষ্টকস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব দতীয় ধাত্রীতনয়, ঢাকার সুবাদার, ফেদাই খাঁ আজিম খাঁর আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঢাকা পরিত্যাগপূর্বক কেদারপুরে অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের শাসনকর্তার পক্ষে যে ইহা নিতান্তই অসম্মানজনক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

Taylor's Topography of Dacca.

কোহতস্তান-ই ঢাকা ও বিলায়তে ঢাকা :

"মখ্‌জানে-আফগান-ই" গ্রন্থে লিখিত আছে, কতলুখাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহিনী আফগানগণের অধিনায়ক হন। নসিব খাঁ, লোদি খাঁ ও জামান খাঁ নামে কতলু খাঁর তিন পুত্র ছিল। ঈশাখাঁর কাজে সুলেমান, ওসমান্, অলি ও ইব্রাহিম এই কয় পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পরে প্রথমে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান, তৎপরে ওসমান, আফগানগণের নেতা হন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তদীয় পুত্র হিম্মৎসিংহ সুলেমানহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তীরে ইহাদিগের জায়গির ছিল। মানসিংহের নিকট হইতে ওসমান, উড়িষ্যা, সপ্তগ্রাম ও পূর্ববঙ্গে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" "কোহিস্তান-ই ঢাকা" অর্থাৎ ঢাকার পার্বত্যপ্রদেশ (ভাওয়াল অথবা ধামরাই অঞ্চল?) এবং বিলায়তে ঢাকা" অর্থাৎ ঢাকা জেলাময় শহর, ঈশাখাঁ ও ওসমানের বাসস্থান ছিল। নেক-উজিয়ালের যুদ্ধে পাঠানদলপতি ওসমান নিহত হইলে ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ, অলিখাঁকে প্রথমত নেক-উজিয়াল এবং ঢাকানগরী এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত তদীয় বাসস্থানে এবং পরে ঢাকার দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

কেহ কেহ অনুমান করেন, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির পূর্বদিকস্থ খিলগাঁও গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ঈশাখাঁ লোহিনী অবস্থান করিতেন এবং উহাই "বিলায়তের ঢাকা" বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোঙরসুন্দর :

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত "কাটারে সুন্দর"

নামক স্থানে যে একটি জলাশয় ছিল, তাহাতে মলিন বস্ত্র ধৌত করিলে উহা অপূর্ব শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইত।

এই দীর্ঘিকা এক্ষণে "কাসনগরের দীঘি" বলিয়া সুপরিচিত। এই বৃহদায়তন দীর্ঘিকার পরিমাণফল প্রায় ১০ একর।

কোণ্ডরসুন্দরের এই স্বচ্ছসলিলা-দীর্ঘিকা এবং মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালের রথের ভগ্নাবশেষ আজও আর্য রাজধানীর অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয়, এখানেই শেষ হিন্দু রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আকবর-নামায় এই স্থান "কুমার-সমুন্দর" (বা "কোয়র-সিন্দুর") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবুলফজল এই স্থানে তোটকের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের অপর তটে সংস্থিত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিঃ বিভারিজ কোণ্ডর-সুন্দর ও এগারসিন্ধু অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, উহা বর্তমান নিকলি থানার অন্তর্গত। কোণ্ডর-সুন্দর এবং কুমার সমুন্দর দুইটি স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া মনে হয়। কোণ্ডর-সুন্দর শহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যুর পরে, রাজধানী কোণ্ডর-সুন্দর মুসলমানগণের হস্তগত হয় এবং তাহার সংলগ্ন মোগড়াপাড় নাম প্রদানপূর্বক দক্ষিণ দিকে মোসলমানগণের রাজধানী নির্মিত হইয়াছিল।

Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari
J. A. S. B., 1874 & 1904 : Elliot Vol. Page 74.

খিজিরপুর :

নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরপূর্ব দিকে ঢাকা হইতে প্রায় ৯ মাইল অন্তরে লাক্ষানদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও হইতে এই স্থান প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে সংস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ বারভূঞাগণের অন্যতম ঈশাখাঁ মসনদ আলি এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, পরে মীরজুমলাকর্তৃক আর একটি দুর্গ এই স্থানে নির্মিত হয়। এই শেষোক্ত দুর্গই খিজিরপুরের কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ।

খিজিরপুর নামে যে একটি পরগনা কালেক্টরির তৌজিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার উদ্ভব এই খিজিরপুর হইতেই হইয়াছে। বর্তমান সময়ে খিজিরপুরান্তর্গত কতক স্থান গভর্নমেন্টের খাসমহলের অন্তর্গত। তৌজির নম্বর ৯৮৭১; উহা দুই ভাগে জরিপ হইয়াছে। খিজিরপুরের উত্তর ও পশ্চিমদিকে "ঈশাপুর" নামে একটি তপ্পার পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশাখাঁর সহিত এই স্থানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি?

খিজিরপুরের উত্তরে "পাঠানতলী" নামে একটি গ্রাম আছে; উহা পরগনা নসরৎশাহীর অন্তর্গত।

খিজিরপুর হইতে পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গাতীরবর্তী ফতুল্লা নামক স্থান পর্যন্ত প্রসারিত একটি প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন আজও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই রাস্তা ঢাকার রাস্তার সহিত ফতুল্লার সন্নিকটে মিলিত হইয়াছে।

এই স্থানের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানমধ্যে শ্বেতমর্মর প্রস্তর নির্মিত একটি মকবেরা বিদ্যমান আছে; উহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জনৈক তনয়াবর সমাধি বলিয়া এতদঞ্চলে পরিচিত।

খিজিরপুরের দুর্গমধ্যে ইষ্টকনির্মিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মসজিদের গঠনপ্রণালি যোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত গোয়ালদী মসজিদের অনুরূপ। মসজিদের দ্বারদেশের শিলালিপিখানা অপহৃত হওয়ায় এতৎসম্বন্ধীয় তথ্য তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহা জনৈক পীরের সমাধিস্থান বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। লাক্ষার তীরে যে একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা "গোসলখানা" বা "বৈঠকখানার" ভগ্নাবশেষ বলিয়া

জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ওয়াইজ সাহেবের মতে উহা খিজিরপুর দুর্গের উত্তর দিকের অংশবিশেষ মাত্র।

চাঁদরায়ের রূপবতী বিধবা কন্যা সোনামণিকে ঈশা খাঁ কৌশলে হস্তগত করিয়া এই দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের সহিত এই উপলক্ষে ঈশাখাঁর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে খিজিরপুরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। পরে উহা সংস্কৃত হইয়াছিল। দুর্গাভ্যন্তরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষস্বরূপ রাশি রাশি ইষ্টকস্তূপ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মীরজুমলার আসাম অভিযানসময়ে এহিতিসিমখাঁ এইস্থানে অবস্থান করিয়া তদীয় অনুপস্থিতিসময়ে জাহাঙ্গীরনগরের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আসাম অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে বীরাগ্রগণ্য মীরজুমলা হিঃ ১০৭৩ সনের ২রা রমজান, বুধবার খিজিরপুরের ২ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে নৌকামধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে তদীয় শবদেহ খিজিরপুর আনয়ন করা হয়। এই স্থানেই তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরে সমাহিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, তদীয় শেষ অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। মীরজুমলার পরিবারবর্গ, সেনাপতি দিলিরখাঁ ও মীর আবদুল্লার তত্ত্বদানে কিয়ৎকাল পর্যন্ত খিজিরপুরেই অবস্থান করিয়াছিল।

মীরজুমলার মৃত্যু হইলে, শাসনকর্তা দায়ুদখাঁর প্রতি ঢাকার শাসনভার অস্থায়ীভাবে অর্পিত হইয়াছিল; তিনি ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার সন্নিকটে আগমন করেন, তিনি খিজিরপুরে অবস্থান করিয়াই শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন।

ইসলামখাঁ মেসেদির সময়ে আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরম সা মোগলের শরণাপন্ন হইলে মগেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক খিজিরপুর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। এই স্থানে তাহারা একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে একখানা চিঠি লিখিয়া একটি বৃক্ষশাখাতে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। তাহাতে পরবর্তী বৎসরে ঢাকা লুণ্ঠন করিবে বলিয়া উল্লিখিত ছিল।

মোগল শাসনসময়ে ইহা একটি প্রধান নবিস্থান ছিল। এই স্থান হইতেই মোগল সুবাদারগণ দ্বিগ্বজয়ে বহির্গত হইতেন।

Stewart's History of Bengal, J. A. S. B., 1874. Elliot Vol VI.
Fathiyyah-i-Ibriyyah.

ঘণকপাড়া, গৌরীপাড়া : দাগরাইর সন্নিকটে অবস্থিত। পাঠানগণ বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে ওসমানের অধীনে এই স্থানে সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করিয়াছিল। পাঠানদিগের নির্মিত দুর্গাদির ভগ্নস্তূপ এক্ষণেও বিদ্যমান থাকিয়া উহাদিগের প্রাচীন কীর্তিকলাপে সজীব রাখিয়াছে। ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলামখাঁ এই স্থানেই বঙ্গের রাজধানী সংস্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু নিম্নভূমি বলিয়া তদীয় সংকল্প কার্যে পরিণত করেন নাই।

Tarikhi-i-Dacca
Khan Bahadur Syed Aulad Hussen's Antiquities of Dacca.

গোয়ালপাড়া :

পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে এবং জাফরগঞ্জের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে ১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে সেকেন্দরশাহের সহিত গিয়াসউদ্দিনের যুদ্ধ হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মকুশল ছিলেন। কিন্তু তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তদ্রূপ ছিল না; এজন্য বিমাতার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। একদা গিয়াস বিমাতার ঘোরতর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া প্রাণভয়ে সোনারগাঁও অভিমুখে পলায়ন করিয়া এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন রাজ্য অধিকার করিবার কামনায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পিতার প্রাণনাশ না হয়, গিয়াসউদ্দিন সেজন্য সেনাগণকে বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। যুদ্ধস্থলে একটি বর্শা সেকেন্দরের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশীতিবর্ষ পূর্বেও সেকেন্দরের সমাধি এই স্থানে দৃষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

জাফরগঞ্জের পশ্চিমে গোয়ারীয়া গ্রামে সেকেন্দরের দরগা এবং মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিষ্ঠিত "লাঙ্গরখানা"র চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

Vide Riajus-Salatin : J. A. S. B. 1874;
Taylor's Topography of Dacca.

জাঙ্গলীয়া :

মেঘনাদতটে সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত একটি জনপদ। মোগলশাসন সময়ে জাঙ্গলীয়া একটি নাবিস্থান ছিল।

জিঞ্জিরা :

জিঞ্জিরা একটি ক্ষুদ্র জনপদ। বুড়িগঙ্গা নদী ঢাকা ও জিঞ্জিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। জিঞ্জিরার প্রাসাদ সা-সুজানির্মিত বড় কাটরার বিপরীতদিকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিঞ্জিরা ও ঢাকায় যাতায়াতের জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়িগঙ্গার বক্ষোপরি এক ইষ্টকনির্মিত সেতু নবাবি আমলে বিদ্যমান ছিল। উহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। জনসাধারণ ঢাকা নগরী হইতে যেন নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত জিঞ্জিরা ও অন্যান্য স্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই ওই সেতু নির্মিত হয়। বর্তমান সময়ে জিঞ্জিরায় দর্শনযোগ্য তেমন কিছুই নাই। নবাবনির্মিত প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও ভগ্নচূড় অট্টালিকার নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বিষাদস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়। টেইলার সাহেব তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিমখাঁকে জিঞ্জিরার প্রাসাদনির্মাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৪]

জিঞ্জিরার রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের বিষাদস্মৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে. একসময়ে এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাজ-সওকতজঙ্গ-হোসেনকুলি-আলিবর্দী-সিরাজের পুরমহিলা ও বংশধরগণের ব্যথিতহৃদয়ের তপ্তশ্বাস এবং ক্রন্দনের অস্ফুট রোল বহির্গত হইত। এই মূক প্রাসাদের প্রাচীর ও প্রতি ইষ্টকখণ্ড উহাদিগের গভীর মর্মবেদনার চিরসহচররূপে বিরাজমান ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ও প্রতিদ্বন্দ্বী ঘেসিটী বেগম ও আমিনা বেগমের গর্বোন্নত গ্রীবার ঈষৎ আন্দোলনে শত শত অনুচরবর্গ কৃতার্থম্মন্য হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হইত, অদৃষ্টনেমির আশ্চর্য পরিবর্তনে উভয়ের ভাগ্যসূত্র একত্র গ্রথিত হইয়া এই প্রাসাদের একপ্রান্তে উভয়েই বিষাদক্লিষ্ট বদনে কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মতিঝিলের সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকায়, নানাবিধ বিলাসবাসনামোদের মধ্যে অবস্থান যাহার পক্ষে শোভনীয়, জিঞ্জিরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদৌলার নাম আজ পর্যন্তও সর্বসাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদবাক্যের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যাহার তর্জনীতাড়নায় একসময়ে ইংরেজ-বণিককুলকেও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাঁহার জননী, প্রিয়তমা মহিষী ও শিশুতনয়া যে সময়ে বুড়িগঙ্গাতীরে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া মীরণের বন্দীরূপে জিঞ্জিরার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিল. সেই সকরুণ দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রতিপালক প্রভুপুত্রের শোণিতপাতদ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, কতিপয় দিবসমধ্যে, আলিবর্দী, সরফরাজের বেগম ও তদীয় পরিবারস্থ অপরাপর পুরাঙ্গনাগণের সহিত সরফরাজনন্দন হাফেজআলিখাঁ ও আমানিখাঁকে এই প্রাসাদেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজের বংশধরগণকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে আলিবর্দীর পাপলব্ধ সিংহাসন সুদৃঢ় এবং কণ্টকপরিশূণ্য হয়, এই বিবেচনাতেই দূরদর্শী নবাব উঁহাদিগকে রাজধানীর নিকটে রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু উহারা যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ঢাকার তদানীন্তন নায়েবনাজিমদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার নবাব সিরাজদৌলা বঙ্গের মসনদে আরোহণ করিয়া সওকতজঙ্গ এবং হোসেন কুলিখাঁর পরিবারবর্গকেও এইস্থানেই প্রেরণ করেন। পলাশীর রণাভিনয়ের পরে, বিশ্বাসঘাতক হস্তে বন্দী হইয়া, সিরাজের মাতা ও শিশুকন্যা এবং বেগম প্রভৃতি এই স্থানেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব-পরিবারবর্গের বিষাদস্মৃতি বহুকাল পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আজ জিঞ্জিরা একটি ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লিতে পরিণত হইয়াছে। শোকভারাক্রান্ত জিঞ্জিরা বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাবগণের শ্মশানভূমি, ঐতিহাসিকের চক্ষে পূণ্যক্ষেত্র ও পীঠস্থানের অন্যতম একটি।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের অবসান হইলে, ক্লাইব সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ বিহার-উড়িয্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলিবর্দীর সময় হইতে মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্ত পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ যোড়শ বর্ষকাল মধ্যে সরফরাজের পুত্রদ্বয়মধ্যে কোন অশান্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল না। অতি দীনভাবেই তাঁহারা এতকাল জিঞ্জিরার প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি মীরজাফর সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে পারিলেন না। মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সরফরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজআলিকে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ মুর্শিদাবাদ আগমন করিয়া একরূপ বন্দীভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ক্লাইভের নিকটে যে দীনতা ও স্বীয় হীনাবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অতি বিনীতভাবে এই সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম অবগত হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন। কিন্তু সরফরাজের দ্বিতীয় তনয় আমানিখাঁর চরিত্র তদীয় জৈষ্ঠ্য সহোদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি স্বভাবতই কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী ছিলেন। অথবা দীর্ঘকালব্যাপী নৈরাশ্যই তাহাকে শত বিপদপাতেও নির্ভীক এবং সহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। যখন দেখিলেন যে, এই সুদীর্ঘ যোড়শ বৎসর কালমধ্যেও তিনি অদৃষ্টলক্ষ্মীর প্রসাদকণিকা লাভে সমর্থ হইলেন না, বরং উত্তরোত্তর নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাউক, দেখি কি হয়।

এদিকে মীরজাফরের দারুণ অর্থকোষে ঢাকার রাজকোষও একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল এমনকি, সাম্রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহই কষ্টকর বিবেচনায় কেবলমাত্র দ্বিশত সংখ্যক সৈন্য ঢাকার লালবাগ দুর্গে রক্ষিত হইল। যাহারা রহিল, তাহাদিগকেও অতি সামান্য মাত্র বেতন প্রদান করা হইত; সুতরাং সৈন্যগণের আর উৎশাহ ও উদ্যম রহিল না। সুশিক্ষিত এবং কার্যদক্ষ প্রবীণ সৈন্যও ঢাকার সৈন্যশ্রেণির মধ্যে রহিল না। এই সমুদয় সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমানিখাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনায়, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবাব জেসারৎখাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া লালবাগের দুর্গ অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জেসারৎখাঁকে নিহত করিতে পারিলেই অন্তত ঢাকার নবাবিপদ তাহারই প্রাপ্য হইবে, এই অমুলক দুরাশা আমানিখাঁ মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। এই

উদ্দেশ্যে, তিনি ২২শে অক্টোবর তারিখে অতি সঙ্গোপনে জিঞ্জিরার বন্দিশালা হইতে বহির্গত হইয়া লালবাগের দুর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু আমানিখাঁর প্রতি বিধাতা নিতান্তই বিরূপ। নির্দিষ্ট দিবসের দুই দিন পূর্বে আমানিখাঁর বিশ্বাসঘাতক জনৈক অনুচর জেসারৎখাঁর নিকটে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। জেসারৎখাঁ তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈন্য প্রেরণপূর্বক আমানিখাঁ এবং তদীয় কতিপয় অনুচরবর্গকে ধৃত করিয়া, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। এই সময়ে ঢাকার ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষ ৬০ জন সৈনিক পুরুষ দ্বারা নবাব জেসারৎখাঁর শাহায্য করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহব্যাপারে মীরজাফরের মনের অশান্তি আরও শতগুণে বর্ধিত হইল।

ইংরেজকর্তৃক মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নিষ্ঠুর চরিত্র এবং অসংখ্য নরহত্যাপরাধের বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসাময়িক জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।[৫] বস্তুত তিনি যে নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মীরণের যথেচ্ছচারিতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপযুক্ত শাসন না করায়, জনসাধারণ মীরজাফরকেও মীরণের কার্যকলাপের সহকারিই ভাবিত। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের এক গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কিন্তু মুতুক্ষারীণকার গোলাম হোসেন মীরণের আদেশক্রমেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলিবর্দীমহিষী ও তদীয় কন্যাদ্বয় (ঘেসেটি বেগম ও আমিনাবেগম); সিরাজমহিষী সুফিন্নেসা বেগম ও তাহার শিশুকন্যাগণ, লুৎফেন্নেসা বেগম ও তদীয় শিশুকন্যা এবং নওয়াজিসের পালকপুত্র (বাদশা কুলীখাঁর পুত্র), মোরাদদৌলা, মীরজাফরের আদেশক্রমে জিঞ্জিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে ছিলেন।[৬] উহাদিগকে হত্যা করিতে পারিলেই সিংহাসন কণ্টক পরিশূন্য হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া কূটনীতিবিশারদ নিষ্ঠুর মীরণ ঢাকার নায়েব জেসারৎখাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।[৭]

জেসারৎখাঁ অতি ধর্মভীরু লোক ছিলেন। মীরণের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। অনন্তর সংবাদবাহক স্বয়ংই এই কার্যোদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন যে, যদি জেসারৎখাঁ আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্তত করে, তবে যেন সে নিজেই এই কার্য সম্পন্ন করে। সংবাদবাহক এই নিশীথ রাত্রিতে মুর্শিদাবাদে যাইবার ছল করিয়া নওয়াজিসমহিষী ঘেসেটী বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম, নওয়াজিসের ভাবী উত্তরাধিকারী মৃত এক্রাম-উদৌলার শিশু পুত্র মুরাদদৌলা, সিরাজবেগম সুফিন্নেসা এবং সিরাজের শিশুকন্যা (সুফিন্নেসার গর্ভজাত) এই প্রাণীপঞ্চককে জিঞ্জিরার প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে খরস্রোতা ধলেশ্বরীবক্ষে আনয়ন পূর্বক ৭০ জন অনুচরবর্গসহ জলমগ্ন করিয়া দেয়।[৮] এইরূপে আলিবর্দী, নওয়াজিস ও সিরাজের বংশ ধ্বংস হইল।

হোসেনকুলি ও সরফরাজের বংশধরগণ কোম্পানির হস্তে দেওয়ানি ভার অর্পিত হওয়ার পরেও বন্দীভাবে জিঞ্জিরার প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করেন এবং বার্ষিক মঃ ৩৪৭৫৫ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। টেইলার সাহেব যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তখনও উহাদের বংশধরগণ ইংরেজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।

পরের পৃষ্ঠায় জিঞ্জিরার প্রাসাদস্থিত বন্দীবর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইল। কোম্পানির আমলে তাঁহারা ঢাকার নিজামত হইতে এই হারে মোশাহেরা প্রাপ্ত হইতেন :

	বন্দীগণের নাম	পরিচয়	কোন্ সনে বন্দী হয়	কাহা কর্তৃক বন্দী	মোশাহেরা
১।	হাফিজ উল্লা	সরফরাজ খাঁর তনয়	১৭৪৪	আলিবর্দী খাঁ	১০০৲
২।	—	হাফেজউল্লার জননী	"	"	২০৲
৩।	—	হাফেজউল্লার ভগ্নী	"	"	৫০৲
৪।	মুদরেনা বেগম	হাফেজউল্লার তনয়া	"	"	১৫৲
৫।	ভালু বেগম	হাফেজউল্লা মহিষী	"	"	৫০৲
৬।	সুকুরুল্লা খাঁ	সরফরাজের অন্যতম তনয়	"	"	৫০০৲
৭।	মির্জা মোগল	ঐ	"	"	৮০৲
৮।	—	মির্জা মোগলের জননী	"	"	২০৲
৯।	মীর জুই	সরফরাজের অন্যতম পুত্র	"	"	৮০৲
১০।	—	ঐ মাতা	"	"	২০৲
১১।	মির্জা বুরহেন	সরফরাজের অন্যতম পুত্র	"	"	৮০৲
১২।	—	ঐ মাতা	"	"	২০৲
১৩।	—	সরফরাজের ভগ্নী	"	আলিবর্দী খাঁ	৩০৲
১৪।	—	আগামির্জার জননী ও সরফরাজের জনৈক পুত্র	"	"	২০৲
১৫।	—	আগা মির্জার স্ত্রী	"	"	৮০৲
১৬।	মীর আসাদ	সরফরাজের জামাতা	"	"	৮০৲
১৭।	নাজীবলন্নেছা	মীর আসাদের দুহিতা	"	"	২৫৲
১৮।	কারমোসন্নেছা	ঐ	"	"	২৫৲
১৯।	মতি বেগম	সরফরাজ নন্দিনী	"	"	৫০৲
২১।	আজিজ বেগম	ঐ	"	"	৫০
২২।	মৌতিম বেগম	ঐ	"	"	৩০
২৩।	বিবি ওকিয়ৎ	সরফরাজের স্ত্রী	"	"	২০৲
২৪।	—	সরফরাজের ভ্রাতুস্পুত্র গুজনফা হোসেন খাঁর মাতা	"	"	২০৲
২৫।	লাডালি বেগম	গুজনফা হোসেন খাঁর স্ত্রী	"	"	১৮০৲
২৬।	জেসারৎজঙ্গ	সওকৎজঙ্গের পুত্র	১৭৫৫	সিরাজদ্দৌল্লা	১০৲
২৭।	সৈফুদ্দিন মহম্মদ খাঁ	"	"	"	১০০৲
২৮।	মির্জা জুব্বা	"	"	"	৮০৲
২৯।	মির্জা মেগলু	"	"	"	৮০
৩০।	মার্জা ভোলা	"	"	"	৮০৲
৩১।	বুন্নি বেগম	সওকৎজঙ্গ দুহিতা	"	"	৬০৲
৩২।	বুন্নি জি	হোসেন কুলীখাঁর স্ত্রী	১৭৫৬	"	১০০৲
৩৩।	উজমমন্নেছা	ঐ	"	"	৩৬০
৩৪।	সাহেবজী	সওকৎজঙ্গ মহিষী	"	"	৬০০৲
৩৫।	সীতারাম উকিল	সরাই-এর জনৈক খোজার প্রতিভূ	"	"	১৫৲
৩৬।	উমদুলন্নেছা	সিরাজদ্দৌল্লার কন্যা	১৭৫৭	মীরজাফর	৫০০৲
৩৭।	লুৎফুলন্নেছা	ঐ	"	"	১০০৲

টেরা :

ভাওয়ালের অন্তর্গত, কালীগঞ্জের নিকটে লাক্ষানদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এইস্থানে গাজিবংশীয়গণের সুরম্য প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একখানা প্রাচীন দলিলদৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, হীরাগাজির ভ্রাতা দৌলতগাজি হিঃ ১০৫০ সনের দিল্লি হইতে ভাওয়ালের এক নতুন বন্দোহস্তী সনদ প্রাপ্ত হন।

গাজিবংশীয়গণ ভাওয়াল পরগনা প্রথমত ঈশাখাঁর অধীনে থাকিয়া ভোগ করেন। পরে উহারা সবিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ঈশাখাঁর আনুগত্য পরিত্যাগকরত দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত লইয়া ভোগ করিতে থাকেন। এই সময়ে গাজিবংশীয় পল্লুনসা গাজি ভাওয়ালের সঙ্গে চাঁদপ্রতাপ, কাশিমপুর, তালিপাবাদ এবং সুলতানপ্রতাপ প্রভৃতি পরগনাগুলিও বন্দোবস্ত লইয়া এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের আধিপত্য করিতে থাকেন।

অধুনা গাজিবংশীয়গণ সামান্য গৃহস্থরূপে টেরা গ্রামে জীবনযাপন করিতেছেন।

ঠাকুরতলা :

ভাওয়ালের অন্তর্গত সাতখামার গ্রামের উত্তরে ঠাকুরতলা গ্রামে একটি প্রাচিন বাড়ির ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বাড়ির সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাযুগল আজও বিদ্যমান থাকিয়া এই স্থানের অতীত গৌরবগাথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দীর্ঘিকাদ্বয়ের পাড় ইষ্টকনির্মিত। সন্নিকটে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ প্রায় ৮ পাখী জমি ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে। স্থানীয় জনসাধারণ দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ বলিয়া এই স্থানে পূজা দিয়া থাকে।

ডবাক :

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণবিরচিত প্রশস্তিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে তাঁহাকে সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তপূরাদি প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণকর্তৃক সর্বকরদান, আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ আধুনিক রাজশাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শত বৎসর পূর্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবেগের পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব হইয়া ময়মনসিংহের পশ্চিমপ্রান্তে বিধৌতকরতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকা ও পাবনা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথ উপরোক্ত বিষয়টি একেবারে প্রণিধান করেন নাই।

মিঃ স্টৈ.পলটন বলেন, "ব্রহ্মপুত্র নদ গাড়ো পর্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ শাহবাজপুরের উত্তরাংশস্থিত গঙ্গা ও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান এবং গঙ্গাতীরবর্তী গৌড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগস্থান পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত।" বঙ্গ ও ডবাক তিনি অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু তাহা হইলে একই সময়ে ডবাক ও সমতট দুইটি পৃথক রাজ্য বলিয়া কীর্তিত হইবার কারণ কি?

আমাদের মতে ঢাকা জেলার উত্তরাংশই এক সময় ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত। সমতট ও ডবাক এই উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় আধুনিক ঢাকাকেই রাজ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ডাকুরাই :

তালিপাবাদ পরগনার অন্তর্গত তুরাগ নদীর তীরবর্তী বোয়ালী পোষ্ট অফিসের ৩/৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে ডাকুরাই মৌজা মধ্যে ঢোলসমুদ্র নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা ও তাহার পাড়ে "মাঠের

জলা" নামক একটি প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়। উহা একটি বৌদ্ধ চৈত্যের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই ভূমিতে ৪/৫ খাদা পরিমিত স্থানে ব্যাপিয়া বহু অট্টালিকা ও মঠের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার সন্নিকটে কোটামণির পুকুর। ঢোলসমুদ্র অত্যন্ত গভীর। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬০০ × ৩০০ হাত হইবে। কথিত আছে, এই সুবৃহৎ জলাশয়টি খনিত হইলে রাজা উহার গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য "ঢুলি" দিগকে তলদেশে নামাইয়া দেন। তাহারা খুব জোরে ঢোল বাজাইলেও তীরস্থিত সমবেত জনমণ্ডলীর কর্ণে উহার শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল না। এই জন্যই উহার নাম রাখা হয় ঢোলসমুদ্র।

এই স্থানে পালবংশীয় যশোপাল রাজার অন্যতম রাজবাটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ডেমরা :

ঢাকার উত্তর-পূর্বে, বালু এবং লাক্ষানদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় ৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত। বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায়কে পরাজিত করিয়া মহারাজ মানসিংহ এইস্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিল। এই স্থানে ঈশাখাঁর সহিত মানসিংহের একটি যুদ্ধ হইয়াছিল, ফলে, ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া এগারসিন্দুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই স্থান বস্ত্রবাণিজ্যের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকা শহরের বস্ত্রব্যবসায়ীগণ ডেমরার হাট হইতে বহু সহস্র টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া থাকেন।

ঢাকা :

ঢাকা অতি প্রাচীন সময় হইতে পরিচিত। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি "ডবাক ও সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।" সমতটের সহিত পাশাপাশি ভাবে ডবাকের উল্লেখ থাকায় উহা আধুনিক ঢাকাকেই বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই। Sir A. Phayre কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দেও ঢাকা নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমালঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে "দুখাবাজু" বলিয়া এই স্থান সপ্তম সরকার বাজুহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আকবর-নামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এই স্থানে একটি রাজকীয় সেনাসন্নিবেশ (Imperial Thanah) সংস্থাপিত ছিল। "ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেন, মোগল সেনাপতি শাহাবাজ-খাঁর অধীনে অমিতবিক্রমে পাঠানসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। ঈশাখাঁ একবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এইবার, বন্দী থানাদার সৈয়দ মহম্মদদ্বারা পুনরায় সন্ধির কথা চালাইয়া তাহাতে কৃতকার্য হন।"

১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ ঢাকাতে বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এই স্থানের নাম "জাহাঙ্গীর-নগর" বা "জাহাঙ্গীরবাদ" রাখিয়াছিলেন। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।[১০]

বঙ্গদেশে মোগলপতাকাস্তম্ভ প্রোথিত হইবার পর মগেরা তিনবার ঢাকা লুণ্ঠন করিয়াছিল। নবাব খানজাদখাঁ এরূপ ভিরু স্বভাবের লোক ছিলেন যে তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেন না। মোল্লা মুরশিদ ও হাকিম হায়দারকে ঢাকায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজমহলে অবস্থান করিতেন। মগেরা সসৈন্য ঢাকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধিদ্বয় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মগী সৈন্যের তাণ্ডব নৃত্যে ঢাকা শহর টলটলায়মান হইয়াছিল। উহারা নগর ভস্মসাৎ করিয়া প্রচুর ধনরাশি লুণ্ঠন ও আবালবৃদ্ধনির্বিশেষে বহুলোক বন্দী করিয়া চট্টগ্রামে প্রদেশে লইয়া যায়।

পলাশীর যুদ্ধাবসানে, ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সন্ন্যাসীগণ ঢাকা শহর লুণ্ঠন করিয়াছিল। সার্ভেয়ার রেনেল সন্নাসীগণকর্তৃক আহত হইয়া ৬ মাসকাল ঢাকাতে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতব্যাপী সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ঢাকার সিপাহিগণও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষগণের কার্যতৎপরতায় উহা অচিরেই প্রশমিত হয়।

মোগল শাসন সময়ে ঢাকা নগরীর উত্তরদক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী হইতে টঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল এবং পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পূর্বে পোস্তগোলা পর্যন্ত প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তৎকালে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল নয় লক্ষ।[১১] বিশপ হিবার যৎকালে ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন, তখনও এখানে ৯০,০০০ হাজার গৃহ এবং প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাসী ছিল বলিয়া জানা যায়।

ত্রিবেণি :

ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদ ও নদীত্রয়ের সম্মিলনস্থান ত্রিবেণি বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে সোনারগাঁও পরগনায় অবস্থিত।

কথিত আছে, যযাতির পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য কতারভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণি নগর সংস্থানপূর্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

লাক্ষ্যানদী হইতে বর্তমান সময়ে যে স্থান দিয়া সুবর্ণগ্রামের মধ্যে ত্রিবেণির খাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার নিকটেই দুর্গ অবস্থিত ছিল। মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী নদী হইতে যাহাতে বিপক্ষ শত্রু সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিতে না পারে, এ জন্যই এই দুর্গটি দ্বিতীয় বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য চাঁদরায় এই দুর্গটি অবরোধ করিয়াছিলেন।

তেজগাঁও :

বর্তমান ঢাকা শহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে পর্তুগিজদের একটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত আছে। "হিষ্টরি অব কটন মেনুফেকচারর অব ঢাকা" নামক গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা লেখকের মতে এই গির্জা ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ম্যানরিক এই গির্জার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে এতদঞ্চলে আগমন করেন। ঢাকার তদানীন্তন মৌলবীগণ "মদ্যপায়ী এবং শূকরমাংসভোজী" এই "কাফেরদিগগে" এতদঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের এবম্বিধ আচরণের বিষয় দিল্লিশ্বর আকবরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি উহাদিগকে কোনও প্রকারে উৎপীড়ন করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। তেজগাঁয়ের সন্নিকটবর্তী কতক জমি তিনি পর্তুগিজদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টিয়ানদিগের বঙ্গদেশে জমিদারীলাভের ইহাই প্রথম সোপানস্বরূপ হইয়াছিল।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ারের সময়ে উক্ত গির্জা একটি সুদৃশ্য অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছিল।

তেজগাঁয়ে পর্তুগিজ ফরাসি, ইংরেজ ও দিনেমারদিগের বাণিজ্যকুঠি ছিল।

History of the Cotton Manufacturer of Dacca District.
Calcutta Review. 1845 : Page 250.
Taylor's Topography of Dacca.

তোটক বা টোক তুগমা (Tugma) :

টলেমির উল্লিখিত তুগমা (Tugma) এল এড্রিসির টোক (Taukhe) প্লিনির আস্তেমেলা এবং নবম শতাব্দীর মোসলমান ভ্রমণকারীগণের লিখিত তাফেক্ (Tafek) একই স্থান বলিয়া মনে হয়।

উইলফোর্ডের মতে আন্তিবল ও তুগ্‌মা অভিন্ন, সুতরাং তিনি উহা বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থান বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন।

ডি. এন. ভিল এর মতে তুগ্‌মা ত্রিপুরা পর্বতশ্রেণির উত্তরদিকে অবস্থিত।

ডাঃ টেইলার ইহাকে টোক অথবা নয়ানবাজার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই স্থান পালবংশীয় শিশুপাল রাজার নাবিস্থান ছিল। ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থান উচ্চ এবং জঙ্গলময়। গ্রামটি আয়তনে মন্দ নহে। এই স্থানে প্রতি সপ্তাহে যে হাট বসে, তাহাতে কাষ্টাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই হাটে কোচ এবং রাজবংশীয়গণ তুলা, হরিণের শৃঙ্গ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে আনয়ন করে। টেইলার সাহেবের সময়েও এই স্থানে পয়সার প্রচলন ছিল না। আদানপ্রদান কড়িতেই সম্পন্ন হইত।

আকবর-নামায় এই স্থান "কুমার-সমুন্দর" বন্দরের বিপরীতদিকস্থ নদের তীরপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ ও মাসুমকাবুলীর বিরুদ্ধে অভিযানকালে মোগল সেনাপতি শাহাবাজখাঁ এই স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই স্থানে মোগল-পাঠানে জলে ও স্থলে যে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহতে মোটের উপর বাদশাহপক্ষেরই জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু বিপক্ষগণও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

দলৈরবাগ :

মোগড়াপারের অদূরবর্তী শহর সোনারগাঁও অন্তর্গত দলৈরবাগ নামক স্থানে কায়স্থবংশোদ্ভব রায় রামচন্দ্র দলৈর ভদ্রাসন ছিল। "সাজেরদলৈ" কথাটি সুবর্ণগ্রামের সর্বত্র আজিও প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ যুদ্ধাধ্যক্ষ। রামচন্দ্র সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্তি বিলুপ্ত হইলেও দীঘি, পুষ্করিণী ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ তদীয় কীর্তিকলাপের নামত চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। কাল-স্রোতে বীরবর রামচন্দ্রের ভদ্রাসন নির্দীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিঘলীর ছিট :

শ্রীপুর স্টেশন হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ পরিখাবেষ্টিত এই স্থানের গভীর অরণ্যমধ্যে বিশাল রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে চণ্ডাল রাজার বাড়ি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় এই স্থানে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজধানী বিদ্যমান ছিল।

দুরদুরিয়া :

এই স্থান কাপাসিয়া থানার নিকটে এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ একডালার ৮ মাইল উত্তরে বানারনদীর তীরে অবস্থিত। দুরদুরিয়ার একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই স্থানের বিপরীত দিকে বানার নদীর অপর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগরীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এতদুভয় স্থানই বৌদ্ধ নরপতিগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। স্থানীয় প্রবাদমতে উহা বল্লাল রাজার বাড়ি বলিয়া কথিত হয়। "রাণীবাড়ি" বলিয়াও এই স্থান অভিহিত হইয়া থাকে। ধামরাইর যশোপাল রাজবংশীয় রাণী ভবানী, মোসলমান আক্রমণকালে এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান "রাণীবাড়ি" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মহারাজ বল্লাল ভূপতি যে সময়ে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন সম্ভবত সেই সময়ে এই স্থানেও তাঁহার একটি সাময়িক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেশবসেন গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া দুরদুরিয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে রাণী ভবানী এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া উহা "রাণীবাড়ি দুর্গ" নামে পরিচিত হইয়া পড়ে।

দেওয়ানবাগ :

নায়ারণগঞ্জ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্তী উত্তর-পূর্বদিকে আকাটিয়ার খালের সহিত লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানোয়ারখাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিহাবুদ্দিন তালিসের গ্রন্থে মানোয়ারখাঁ জমিদারের নৌযুদ্ধে কৃতিত্বের বিষয় একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। দেওয়ান-বাগের যে স্থান খনন করা যায়, তথায়ই প্রচুর পরিমাণে ইষ্টকাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই দেওয়ান-বাগের কিছুদূরে পশ্চিম ও উত্তরদিকে গর্জন ও ভবিত রায়ের বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানোয়ারখাঁর বাড়ি সুপ্রশস্ত পরিখায় পরিবেষ্টিত ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকায় পরিশোভিত। উত্তরদিকে "মিঠা পুকুর" বলিয়া ইসলামধর্মানুমোদিত পূর্বপশ্চিম-দীর্ঘে খনিত একটি পুষ্করিণীদৃষ্টে অনুমান হয়, উহা অন্দর মহলের পবিত্র জলাশয় ছিল। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তটে প্রকাণ্ড মসজিদ আজও বর্তমান রহিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া দেওয়ান সাহেব নমাজ পড়িতেন, তাহা সুনীল প্রস্তরে খচিত।

গত ১৯০৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই স্থানের একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিবার সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর ৭টি কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধাপা :

ঢাকা হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে, ফতুল্লার সন্নিকটে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। মগ ও পর্তুগিজ দস্যুগণের উপদ্রব নিবারণার্থে মোগল সুবাদারগণ কর্তৃক এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ ও ভগ্নবাটিকার চিহ্ন এক্ষণেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জজ মিঃ পেটারসন, কোম্পানির অনজ্ঞানুসারে, জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মিঃ ডাউডেস্ ওয়েল এর নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধাপার বিপরীত দিকে বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অপর একটি দুর্গ সংস্থাপিত ছিল; কিন্তু উহা নদীভাঙ্গনে সলিলশায়ী হইয়া যায়। তিনি ধাপার দুর্গকে "ফুটিশল্লার দুর্গ" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছিলেন। রেনেলের মানচিত্রে ইহা "দাপেকা কেল্লা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রেনেল ১৭৬৫ সনের ৫ই মে তারিখে এই কেল্লার একটি নক্শা প্রস্তুত করিয়া কোম্পানির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাতইয়া-ইব্রাইয়া" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "ধাপা হইতে সংগ্রাম-গড় পর্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত "আল" নির্মিত হইয়াছিল। এই পথে তৎকালে বর্ষাকালেও পদব্রজে বা ঘোটকারোহণে ঢাকা হইতে ১৮ ক্রোশ দূরবর্তী সংগ্রাম-গড়ে উপনীত হওয়া যাইত।"

সায়েস্তাখাঁর সময়ে মগদিগের উপদ্রব নিরাবরণজন্য মহম্মদ বেগ অবাকাশ একশত রণতরীসহ আবুল হাসানের সাহাযার্থে এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে ধাপা একটি প্রধান নাবিস্থান ছিল।

Rennel's Memories : Papers relating to the East India Affairs : MSS. Translation of Shihabuddin Talish's Fathiy-yah-i-Ibriyyah by Prof. Jadu Nath Sarkar.

ধামরাই :

এই স্থান ঢাকা নগরী হইতে উত্তর-পশ্চিমকোণে প্রায় ২০ মাইল অন্তরে, বংশাই নদীর শাখা কাঁকলাজানি নামক নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই স্থান সম্ভবত দুই হাজার কিংবা ততোধিক

বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নীরবে বহন করিতেছে। প্রাচীন দলিলাদিতে এই স্থান "ধর্মরাজিয়া" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ধামরাই ধর্মরাজিয়ারই অপভ্রংশ মাত্র। মহারাজ অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকা বা কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকাবদান হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক যে সমুদয় ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্মরাজিকা বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্মরাজিয়া নামকরণ হইয়া থাকিবে। ধামা এবং রাই নামধেয় কোন এক গোপ দম্পতির নামানুসারে স্থানের নাম "ধামরাই" হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এখানে "ধামার হাট" বলিয়া একটি মহল্লা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে কি একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই স্থান পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। পরে উহা গাজিবংশীয়গণের হস্তগত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থান পাঠান দলপতিগণের লীলানিকেতনে পরিণত হয়। এই স্থানের সন্নিকটবর্তী গণকপাড়া নামক স্থানেই ইসলামখাঁ প্রথমত বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

এই স্থান নিম্নলিখিত বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত, যথা - ইসলামপুর, ঠাকুরবাড়ি পঞ্চাশ, কায়ারআগ, কাগজিয়াপাড়া, পাঠানটোলা, মীরকীটোলা, বাগনগর, গোন্দাপাড়া, ঝবারবাগ, সদাগরটোলা, ঘড়িদারপাড়া, দক্ষিণপাড়া, উত্তরপাড়া, সলঘাট, হুজুরীটোলা, কাজিপুর, লাকুড়িপাড়া, নয়ানগর, বড়বাজার, সুরিপাড়া, সৈতপুর, মাইফরাসপাড়া, ধামারহাট, সোন্দলপুর, মোকামটোলা, কুঞ্জনগর, যাত্রাবাড়ি, বাসাবাড়ি, কামদেবখুলী, কামারখুলী, চাঁদপুর, কায়েতপাড়া, আনন্দনগর, সায়েস্তাপুর, গোয়ালনগর, ঢেতালীপাড়া, রিফুকরপাড়া, সুজনীটোলা, কামারখুলি, রথখোলা, মালিখুলি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি।

কাজির দীঘি, থানার পুষ্করিণী, ঈশাই দীঘি, তাড়াগড় দীঘি, কুঞ্জনগরের দীঘি, চাঁদপুর দীঘি, আনন্দনগরের দীঘি, রাখালঘাটার দীঘি, বাস্তবাড়ির দীঘি, জশাই দীঘি প্রভৃতি বহুতর জলাশয় এই স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধামরাইর যশোমাধব, আদ্যাশক্তি ও বাসুদেব প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা।

ধামরাইর রথ অতি প্রসিদ্ধ। সর্বপ্রথমে বাঁশের রথ ছিল। পরে বালিয়াটির ভক্ত জমিদারগণ একখানা প্রকাণ্ড আয়তনের কাঠের রথ প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৩১২ সনে যে রথটি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে ২১ হস্ত ও প্রস্থে ২০½ হস্ত এবং উচ্চতায় ৪৫ হাত। পূর্বে রথ চালাইবার উপযুক্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। একদা কাশিমপুরের জনৈক জমিদার ৺যশোমাধব সন্দর্শনার্থে ধামরাই আগমন করেন। তিনি এই অভাব পূরণ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ধামরাইর আনির জমিদার ৺অমর রায়, ৺বিনোদ রায়, উলাইলের (বর্তমান কর্ণপাড়ার) জমিদার ৺রামশঙ্কর মিত্র মজুমদার ও ৺বিষ্ণুপ্রসাদ মজুমদার এবং আনির জমিদার ৺শ্যাম রায়চৌধুরি, ৺ভবানী চৌধুরি প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বাসুদেব বাড়ি হইতে লাকুরিয়াপাড়া পর্যন্ত ¾ মাইল দৈর্ঘ্য ও ২৭/২৮ হাত প্রশস্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন।

উত্থান একাদশীতেও মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর রথযাত্রা, পূর্নযাত্রা, উত্থানৈকাদশী প্রভৃতি পর্বোপলক্ষে ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক ধামরাইতে আগমন করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত রথ উপলক্ষে এখানে যে মেলা জমিয়া থাকে, তাহাই ধামরাইর রথমেলা নামে অভিহিত হয়। রথযাত্রার দিনে মাধবকে বৃহৎ কাষ্ঠময় রথে আরোহণ করাইয়া গুণ্ডিচা বাড়িতে এবং পুণ্যযাত্রার দিন গুণ্ডিচা বাড়ি হইতে মন্দিরে আনয়ন করা হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যশোপালের বংশ ধ্বংস হইলে মাধব বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থায় জঙ্গল মধ্যে পড়িয়াছিল। পশ্চাৎ গোবিন্দ প্রসাদ রায় নামক স্থানীয় জনৈক জমিদার

উহা প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পর্বোপলক্ষে মাধবকে নিকটস্থ বংশীনদীর যে স্থানে স্নান করাইতেন, বর্তমানে উহা তীর্থঘাট বলিয়া সুপরিচিত। ইনি এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটি স্বীয় জামাতা রামজীবন মৌলিককে যৌতুকস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

ধামরাই গ্রামে ফরাসী বণিকগণ একটি কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তও যে উক্ত বণিকগণ এই স্থানে বস্ত্র ব্যবসায় করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়।

রেনেলের ম্যাপে ধামরাই হইতে কিছুদূরে ঢোলসমুদ্রের অবস্থান চিহ্নিত হইয়াছে. ঢোলসমুদ্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ হস্ত এবং প্রস্থে ৩০০ হস্ত হইবে। ইহার উত্তর ও পশ্চিম পারে ইষ্টক নির্মিত সোপানাবলির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, এই দীর্ঘিকা খনন করিবার সময়ে উহার গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য ঢুলিদিগকে তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হয়। বাদকগণ অত্যন্ত জোরে ঢোল বাজাইলেও দর্শকবৃন্দের শ্রবণবিবরে উহার শব্দ একেবারেই প্রবেশ করিয়াছিল না। এ জন্যই এই গভীর জলাশয়ের নাম রাখা হইয়াছিল "ঢোল সমুদ্র।"

ঢোল সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী অপর জলাশয়টি "কোটামণির পুকুর" নামে পরিচিত। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে রাজবাটির বৃহৎ ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ ইষ্টক গ্রথিত বলিয়াই মনে হয়। কূপ খনন করিলে ভূগর্ভে বহু ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইষ্টকগুলি হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ধামরাই হইতে ৬/৭ মাইল দূরে যশোপালের রাজধানী মাধবপুর, এখন গাজিবাড়িতে পরিণত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেন।

ধর্মরাজিয়া দলিলের নকল :

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রসন্নালঙ্কৃত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরাজ বাদশাহক শ্রীযুক্ত আরঙ্গজেব পদানত। *** শুভ রাজ্যে তন্নিযুক্ত নবারক শ্রীযুক্ত খানক মহাশয়া নামাধিকারে তন্নিযুক্ত জয়ারীদারক শ্রীযুক্ত ইস্পিঞ্জিয়ার খান মহাশয়া নামাধিকারে তন্নিযুক্ত সিকদারক শ্রীলালবিহারী মহালস্য বিষয়িনী সুলতান প্রতাপান্তর্গত ধর্মরাজি, পাকিয় কায়েস্তপল্লি গ্রামনিবাসিন শ্রীগোপীনাথ মজুমদারকস্য সভায়ামনেক সমুপস্থিত পঞ্চ নবত্যধিক পঞ্চদশ শকাব্দে সুরতানপ্রত্যাপান্তর্গত কায়েস্তপল্লি গ্রাম নিবাসী গোপীনাথ দেবকস্য স্ত্রী শ্রীমতী গঙ্গাদাসী তৎপদে গোপীনাথ দেবকস্য স্বর্গকামনয়া তস্য জল-ভূমি-বৃক্ষ সমেতং নিজাংশ তালুকং অত্র নিবাসীনে শ্রীরামজীবন মৌলিকায় দত্তবানিতি সন ১০৮২। ২৩শে অগ্রহায়ণ।

উভয়ানুমত্যা শ্রীশিবরাম শর্মণা লিখিত মদিমতি।

অত্রার্থে সাক্ষি

শ্রীগোপীনাথ শর্মা।

শ্রীঅভিরাম দাস। শ্রীজগত বল্লভ দেবস্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দাসস্য। মহেশ শর্মা।

শ্রীগোপীনাথ দেবক।

ধীরাশ্রম :

ঢাকা হইতে প্রায় ১৪ মাইল উত্তরে জয়দেবপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। মোগল শাসন সময়ে ভাওয়াল অঞ্চলের রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্যাদি নির্বাহ করিবার জন্য এই স্থানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অদ্যাপি এখানে নবাবি আমলের থানাবাড়ির স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে।

নলখী হাট :

ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত। এই স্থানে নয় দিবস ব্যাপী বাৎসরিক একটি সুবৃহৎ মেলার অধিবেশন হইত। এই মেলায় বিভিন্ন স্থানের তন্তুবায়গণ সমাগত হইয়া সম্বৎসরের মালপত্র খরিদ করিত। বর্তমান সময়ে এই মেলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

Papers relating to the East Indian Affairs P. 154

নপাড়া :

ভাওয়াল পরগনায় অবস্থিত। রেনেল এবং ডাঃ টেইলার এই স্থানের অপর নাম ভাওয়াল বলিয়া লিখিয়াছেন। ঢাকা হইতে জলপথে নগরী যাইতে একদিন লাগে। এই স্থানে পর্তুগিজদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি গীর্জা আছে। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঐ গির্জা স্থাপিত হইয়াছে।

নাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট :

এই উভয়স্থানই নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকস্থ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম নাঙ্গলবন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রতীরবর্তী পঞ্চমী ঘাটে পঞ্চপাণ্ডব তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। নাঙ্গলবন্ধের জয়কালী, অন্নপূর্ণা এবং শ্মশানকালী প্রসিদ্ধ দেবতা। জয়কালী ও অন্নপূর্ণার মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প দৃষ্টে উহা হিন্দু শাসন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

নাঙ্গলবন্ধের একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষমূল "প্রেমতলা" নামে অভিহিত। অশোকাষ্টমীর সময়ে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব এই স্থানে সমাগত হইয়া খোল-করতাল সংযোগে অহোরাত্র হরিনাম কীর্তন করিয়া থাকে। এজন্যই ইহা প্রেমতলা নামে পরিচিত।

নাজিরপুর :

পারজোয়ারের অন্তর্গত; ঢাকা হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী উত্তরপশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গার শাখা নদীতীরে অবস্থিত। মীরজুমলার আসাম অভিযান সময়ে এহিতিসিমখাঁ তদীয় প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। রায় ভগবতী দাসের হস্তে দেওয়ানি বিভাগের কার্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে মগদস্যুগণ ঢাকার সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং এহিতিসিমের পালক-পুত্রকে (ইনি মোগল নৌ-বাহিনীর জনৈক সর্দার ছিলেন) ধৃত ও বন্দী করিয়া নাজিরপুর অভিমুখে প্রস্থান করে এবং নাজিরপুর পর্যন্ত সমুদয় স্থান জল-দস্যুগণের করতলগত হইয়া পড়ে। সায়েস্তাখাঁ রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইলে নওয়ার দারোগা মহম্মদ বেগ কতিপয় রণতরী সহ এই স্থান পর্যন্ত আসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

Mss. Translation of Shihabuddin Talishe's Fathiyyahi-Ibriyyah, by Prof. Jadunath Sarkar : Page 125 b.

ফতুল্লা :

ঢাকা হইতে ৬ মাইল পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গার উত্তর তটে অবস্থিত। কথিত আছে, সা ফতে উল্লা নামধেয় দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গীরের জনৈক "মুরসেদ" এর নামানুসারে এই স্থানের নাম ফতুল্লা হইয়াছে। সা ফতে উল্লার বংশধরগণ অদ্যাপি ফতুল্লাতেই বাস করিতেছেন। এই স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত "ধাপা" নগরীতে মোগলের প্রধান নাবিস্থান ছিল। Report of the East Indian affairs নামক গ্রন্থে ধাপার দূর্গকেই "ফুটিশাল্লার দুর্গ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ফতেজঙ্গপুর :

বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাস্ত করিয়া জয়নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ

মানসিংহ কর্তৃক এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। অধুনা এই স্থান দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। ইলিয়ট কৃত ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কেদার রায় মোগল সেনাপতি কিলমককে শ্রীনগর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিলমক কেদার রায়ের পঞ্চশত রণতরীর ভীষণ আক্রমণ হইতে কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; পরে মহারাজ মানসিংহ কিলমকের শাহায্যার্থে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলে কেদার রায় পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু রাজসন্নিধানে নীত হইবার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ফতেজঙ্গপুরের সংলগ্ন গ্রামটা নগর নামে পরিচিত। এই স্থানের পূর্বনাম শ্রীনগর। এখানেই কিলমক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজাদি দৃষ্টে জানা যায়, ফতেজঙ্গপুর হইতে দামোদ সাহেব নামক জনৈক মোসলমান সেনানায়ক রূপলাবণ্যবতী দিগম্বরী নাম্নি হিন্দু বালিকাকে বলপূর্বক মোসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে ফতেজঙ্গপুরে তৎকালে মোসলমান ভূপতিগণের একটি সেনানিবাস ছিল।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'কাচকীর দরজা' রায় রাজগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়া লেদামের নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই রাস্তা সোজাসুজিভাবে না যাইয়া বক্রভাবাপন্ন হইয়া নগর ফতেজঙ্গপুরের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। কালগঙ্গা নদীর একটি শাখানদীতীরে এই স্থান অবস্থিত ছিল। ঐ নদী কালীগঙ্গা বা "ফতেজঙ্গপুরের বাইদ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কতিপয় বৎসর হইল নগর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে অষ্টধাতুময় একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার চালিতে ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত চিহ্ন রহিয়াছে। তদৃষ্টে অনুমিত হয় এই মূর্তিটি প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইবে।

ফিরিঙ্গি বাজার :

ইছামতী নদীতীরে, নায়ারণগঞ্জের বিপরীত দিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ১০ মাইল অন্তর এই স্থানটি অবস্থিত। নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে চাটিগাঁ অধিকৃত হইলে তিনি ফিরিঙ্গি বন্দীদিগকে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি বাজার হইয়াছে। মোগল শাসন সময়ে ফিরিঙ্গি বাজার একটি সমৃদ্ধশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। এই স্থানে একটি গির্জাঘর আছে, তথায় রোমান ক্যাথলিক-পাদরি আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থান "সাবন্দর" বলিয়া পরিচিত ছিল।

Shibhabuddin Talishe's Fath-i-yyah-Ibriyyah.
Stewart's History of Bengal.
Dr. Taylor's Topography of Dacca.

বক্তারপুর :

খিজিরপুরের ৩০ মাইল উত্তরে লাক্ষ্যানদীতীরে অবস্থিত। এই স্থানেই ঈশাখাঁ মসনদআলি বাস করিতেন। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি শাহাবাজখাঁ পাঠান দলপতি মাসুমখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে "ভাটি প্রদেশে" বিতাড়িত করেন। অতপর তিনি বক্তারপুর ধ্বংস করিয়া সোনারগাঁও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

J. A. S. B., 1874 Pt. I.

বজ্রপুর :

ঢাকা হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরবর্তী উত্তরপূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের শাখাতটে এই স্থান অবস্থিত। আকবরনামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটি পথ ছিল; একটি নদীতীর ধরিয়া, অপরটি ভাওয়াল পরগনার মধ্যে দিয়া।

মোগল সেনাপতি শাহাবাজ খাঁ এই স্থানে পাঠান দলপতি মাসুম কাবুলির অধীনে

উহাদিগের এক প্রবল বাহিনী একত্রিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধীনস্থ সেনানায়ক তারসুনখাঁকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তারসুন ভাওয়ালের পথে বজরাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বজরাপুরের খণ্ডযুদ্ধে বীর তারসুন বন্দী হন।

Elliot Vol., VI. Page 74.

বজ্রযোগিনী :

এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত। ঢাকা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত। এই স্থানেই বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠিত যে বজ্রযোগিনী মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার নামকরণ তদীয় জন্মভূমির নামানুসারেই হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

য়ুয়নচঙের সমতটের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে এই স্থানে তৎকালে একটি সঙ্ঘারাম ছিল। এই স্থানে একটি দেউলবাড়ি ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। দেউলবাড়িসমূহে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুষ্করিণী খনন করিবার সময় এখনও এখানে বহু প্রাচীন কীর্তিকলাপের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বন্দর :

মোগল শাসন সময়ে বন্দর একটি প্রধান নাবিস্থান ছিল। মগদিগের অত্যাচারের কবল হইতে উৎপীড়িত দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য আমির-উল-উমার সায়েস্তাখাঁ রাজা ইন্দ্রমনের অধীনে শতাধিক রণপোত এই স্থানে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতেন।

বন্দরের রায়চৌধুরিগণের অধ্যুষিত ভদ্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব প্রদত্ত বলিয়া, রাজবাড়ি নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা দ্রুহ্যর অনন্তরবংশীয় কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। রাজার প্রদত্ত বলিয়া রাজবাড়ি নাম হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজা কৃষ্ণদেব, অনেক ব্রাহ্মণ, ভদ্র ও আত্মীয় কুটুম্বাদিকেও ভদ্রাসন ও সম্পত্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কাহারও বাড়ি রাজবাড়ি বলিয়া খ্যাত হয় নাই।

বর্মিয়া :

ভাওয়ালের অন্তর্গত। ঢাকা হইতে ৩৫ মাইল উত্তর-দিকে অবস্থিত। এই স্থানে একটি প্রাচীন বাড়ি, ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর ও ইন্দারা আছে। এই বাড়ি পরানশুক ঠাকুরের বাড়ি বলিয়া পরিচিত। মৃজাবংশীয় মোগল জমিদারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পরানশুক ঠাকুর ময়মনসিংহ চলিয়া যান এবং তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দশমহাবিদ্যা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দশমহাবিদ্যার পূজা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। মৃজা জমিদারগণের বংশধরগণ এখনও বর্মিয়াতে বাস করিতেছেন।

বাজাসন :

ঢাকা হইতে প্রায় ২১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সূয়াপুর গ্রামের পূর্বে নান্নার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন নামক মৌজায় কৈকুড়ি বিলের তীরে বহুকালের পতিত "ভিটা ভূমি" দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই মৃৎস্তূপ ৫০।৬০ ফুট উচ্চ এবং উহার প্রসারতাও প্রায় অর্ধ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। উহা বাজাসনের ভিটা বলিয়া পরিচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাজাসন শব্দ বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ। বজ্রাসন বৌদ্ধযোগী ও তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত আসন। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্যগণ এক সময়ে এই "আসন" সাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন।

"বাজাসনের ভিটার নিম্নভাগে ৬/৭টি প্রকাণ্ড স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে অবগত হওয়া যায়। "বাজাসনের ভিটা খুঁড়িতে বহুসংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায়, কিন্তু নানা

প্রকার প্রবাদ শুনিয়া লোকে ঐ স্থান খনন করিতে ভয় পায়। এই প্রবাদগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের আশ্রম ছিল, এই জন্য লৌকিক সংস্কার উহাকে ভূত ও প্রেতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্তী কয়েকখানা গ্রামের প্রাচীন দলিলপত্রে প্রকাশ যে এই গ্রামগুলি এক সময়ে বাজাসন তালুকের অন্তর্গত ছিল।

বাজাসনের প্রাচীন সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন এই যে ভিটার সান্নিধ্যে একদা অত্যন্ত বড় রকমের একটি মেলার অধিবেশন হইত। এই স্থানে জিয়াসপুকুর নামে একটি পুকুর আছে; এই পুকুরের জলের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই মহোদয় সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল "বজ্রাসন বিহারে" অধ্যয়ন করেন এবং এই বজ্রাসন বিহারের পূর্বস্থিত বিক্রমপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় এই "বজ্রাসন'ই তৎকালে বজ্রাসন বিহার বলিয়া পরিচিত ছিল।

বেঙ্গলা :

ভার্টোমেনাস ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গালা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি এই স্থানকে বহু সম্পদশালী ও সুশস্যপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রিষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ মধ্যে অনেকেই বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই স্থান গঙ্গার পূর্বদিকস্থ মোহনার নিকটে অবস্থিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঢাকার একটি মহল্লার নাম "বাঙ্গালা বাজার।" এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্যের জন্য সুবিখ্যাত। মিঃ ষ্টেপলটন বলেন, "দোলাইখাড়ি দিয়াই পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়া লাক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই খালের অপর পার্শ্বস্থিত দ্বীপাকার স্থানটি যাহা ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি বাঙ্গালাবাজার, ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, সাউজিয়াল নগর এবং রুকনপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত, তাহাই ভার্টোমেনাসের উল্লিখিত বেঙ্গালা শহর বলিয়া অনুমিত হয়।"

ঢাকার "বাঙ্গলা-বাজার" নামক স্থানই প্রাচীন বেঙ্গালা শহরের বিলুপ্ত চিহ্ন রক্ষা করিতেছে বলিয়া টেইলার সাহেবও লিখিয়াছেন। মন্টিব্রান উহা চাটিগাঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

Dr. Taylor's Topography of Dacca.
J. A. S. B. 1910.
Malte Brun's Geography Vol. III P. 122.

ভাটি :

মেঘনাদ নদ ও হুগলি নদী এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ পূর্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার এবং লাক্ষ্যার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত স্থান ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা ১৮টি ভাটি নামে পরিচিত ছিল। আবুলফজল, ঈশাখাঁ মসনদআলিকে ভাটি প্রদেশের যে সীমা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া প্রফেসর ডাউসন, মিঃ বিভারিজ প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবর্গকেও গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে। তাহার মতে "ভাটি প্রদেশের দক্ষিণ সীমা" তাণ্ডা নগরী ও সমুদ্র এবং উত্তর সীমা তিব্বতের গিরিমালার পাদদেশে।" বিভারিজ সাহেব বলেন, উহা নিশ্চয়ই লিপিকরপ্রমাদ হইবে। তিনি বলেন, 'তাণ্ডার দক্ষিণ এবং সমুদ্র ও ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণির সীমান্ত প্রদেশের উত্তর এই

সীমাবদ্ধ স্থানই আবুলফজল ভাটি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকিবেন" অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য ভাটি প্রদেশের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। বিভারিজ সাহেবের মতে বর্তমান ঢাকা ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় লইয়াই ভাটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্তী স্থানগুলিই ভাটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবুলফজল এই ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩০০ × ২০০ ক্রোশ বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন।

বারভূঞা—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। Beveridge on Lsakhan.

মগবাজার :

ঢাকা শহরের প্রায় ২ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। ইসলাম খাঁ মেসেদির শাসনসময়ে আরাকানরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার জনৈক কর্মচারীর পুত্র তদীয় সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরমশাহ ঊনবিংশতি হস্তী, চারি পাঁচ সহস্র অনুচর ও তদীয় পরিবারবর্গ সহ ভুলুয়ার ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলে, তিনি উহাকে স্থলপথে ঢাকাতে প্রেরণ করেন। ইসলামখাঁ এই ধরমশাহকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মগবাজার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মোগল সরকার হইতে মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মগদিগের বসবাস হেতু এই স্থান মগবাজার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মগড়াপার :

ঢাকা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্তী পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই মগড়াপার ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক গ্রাম সহ কোঙরসুন্দর প্রভৃতি কতকগুলি স্থান মোসলমান শাসনসময়ে শহরতলি শহর সোনারগাঁ বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানেই মোসলমান ভূপতিগণের রাজপ্রাসাদ ছিল। ইহার চতুর্দিকে বহুতল মসজিদ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দমদমা নামক গোলাকৃতি স্থানে এখানকার মোসলমানগণ মহরমের দশম দিবসে তাজিয়াদি সাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখিয়া দেয়।

মোগড়াপারের রাস্তার সন্নিকটে একখণ্ড প্রস্তরলিপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে, নবাব আলাউদ্দিন আবুল মজফ্ফর হোসেন শাহের সময়ে ত্রিপুরা ও মোয়াজ্জমাবাদের শাসনকর্তা খোয়াসখাঁ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

মণিপুর :

ঢাকা হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মণিপুর-রাজ নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীর্তিচন্দ্র মণিপুরের রাজসিংহাসন হস্তগত করেন। নরসিংহের ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইযা বারংবার মণিপুর আক্রমণ করেন। রাজা কীর্তিচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেন্দ্র সিংহ ধৃত হইয়া প্রথমে নদীয়া, পরে মুর্শিদাবাদ এবং তৎপরে ঢাকায় আনীত হন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে মণিপুর-রাজবংশীয় পার্বতী সিংহ, নীলাম্বর সিংহ ও নরেন্দ্রজিৎ সিংহ, দুইজন হাবিলদার, দুইজন নায়েক এবং বিংশতিজন সিপাহিসহ ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলে পথিমধ্যে ধৃত হইয়া এই স্থানে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মণিপুররাজ পরিবারস্থ বন্দীগণ ১২ টাকা হইতে ৯০ টাকা পেনশন পাইতেন। ঢাকার এই মণিপুরে পূর্বপশ্চিম দীঘালি একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে বীরেন্দ্র সিংহের সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের অনতিদূরে বর্তমান Agricultural Firm-এর চতুঃসীমানার মধ্যে পঞ্চবিংশতি হস্ত উচ্চ ইষ্টকনির্মিত চতুষ্কোণাকার একটি ভগ্ন স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে মগদিগের বিজয় স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ঢাকা নগরী মগদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। কিন্তু মোগল সুবাদারগণ যে মগদিগের জয়স্তম্ভটির বিলোপ সাধন করেন নাই, ইহা নিতান্তই আশ্চর্যজনক

বলিয়া বোধ হয়। স্তম্ভগাত্রে একখানা শিলালিপি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু উহার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় উহা কাহারও সমাধি স্থান হইবে।

মশ্বাদি :

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত। মহেশ্বর নামা জনৈক বৈদ্যবংশীয় এক বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি মশ্বাদিকে মহেশ্বরদি নামে পরিবর্তিত করিয়া একটি পরগনা গঠিত করেন। সোনারগাঁয়ের কতক গ্রাম লইয়া এই পরগনার নামকরণ হয়।

শাহাবাজ খাঁ ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার কত্রাপুর লুণ্ঠন করিয়া মশ্বাদি নামক প্রসিদ্ধ নগর অধিকার করেন। এই স্থানে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি শাহাবাজের হস্তগত হইয়াছিল।

Elliot. Vol. vi.

মালকানগর :

বিক্রমপুরের অন্তর্গত। মীরগঞ্জ হইতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে এই স্থানে বিক্রমপুর পরগনার কাননগুর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাননগু দেবীদাস বসুর মেঘরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছে। এই মেঘরার মধ্যে তিনখানা ইষ্টক ফলকে দেবীদাস বসুর নিয়োগপত্র অথবা পরিচয় ক্ষোদিত ছিল। তন্মধ্যে একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপর দুইখানা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল দেবীদাসের অনন্তরবংশ শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসু মহাশয় স্বীয় পূর্বপুরুষের কীর্তিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ইষ্টকফলকদ্বয়ের অনুলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রথম ইষ্টক ফলক

বাদসা * * * আত্তর *
জেব আলমগীর আম
লে নওয়াব আমেরূল
ওমরা দেওয়ান বাদসা
* হাজি সফি খাঁ শ্রী

দ্বিতীয় ইষ্টক ফলক

শ্রীগোবিন্দ চরণ আসবন্দ
শ্রীদেবী দাস বষু কা
নো গোই নাওয়ারা এতমা
ম শ্রী নষাই খায * স
সন ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র

খোদিত ইষ্টকলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, দিল্লিশ্বর ঔরঙ্গজেবের সময়ে নবাব আমীর-উল-উমরা সায়েস্তা খাঁ ও বাদশাহের দেওয়ান হাজি সুফি খাঁর আমলে ১০৮৭ বঙ্গাব্দে (১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে) দেবীদাস বসু কাননগু এবং নমাই খাযনবীশ নাওয়ারার এহিতিমাম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মাছিমাবাদ :

সুপ্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদ আলির পৌত্র মাছিমখাঁর নামানুসারে এই স্থান মাছিমাবাদ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাছিমখাঁ এই স্থানেই স্বীয় বাসস্থান নির্ধারণ করেন। এই স্থানে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও তন্মধ্যবর্তী ভূভাগে হাওয়াখানার ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। হাওয়াখানার চতুঃপার্শ্বেই দীর্ঘিকা—কি মনোরম দৃশ্য। এই স্থানের কাজিপরিবার আজও মোসলমানসমাজে বিশেষ সম্মানিত।

উপরোক্ত মাছিমখাঁর চারিপুত্র—লতিফখাঁ, মহম্মদখাঁ, মানোয়ারখাঁ, সরিফখাঁ। পিতার

মৃত্যুর পরে লতিফখাঁ হয়বৎনগরে, মহম্মদখাঁ জঙ্গলবাড়িতে ও মানোয়ারখাঁ দেওয়ানবাগে ভদ্রাসন নির্মাণ করিয়া বাস করেন।

মোয়াজ্জমাবাদ :

সোনারগাঁয়ের ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী মোয়াজ্জমপুর নামক স্থানকেই মিঃ ব্লকম্যান মোয়াজ্জমাবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক। মেঘনাদের তীর হইতে ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বভাগ সুরমা নদীর দক্ষিণতীর পর্যন্ত সমুদয় স্থান মোয়াজ্জমাবাদের অন্তর্গত ছিল। মোয়াজ্জমাবাদে পাঠান রাজগণের টাঁকশাল ছিল। এই স্থান হজরৎ-ই-জালাল বলিয়া অভিহিত হইত।

যাত্রাপুর :

ইছামতীতটে, ঢাকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখান হইতে ইছামতীর বাঁক ঘুরিয়া ঢাকায় পৌঁছিতে কিছু বেশি সময় লাগে। টেভারনিয়ার এখান হইতে ঢাকায় যাইবার একটি সোজা পথের কথা লিখিয়াছেন।

সায়েস্তাখাঁ রাজমহল হইতে রওনা হইয়া ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিবার জন্য শুভদিনের প্রতীক্ষায় এই স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সায়েস্তাখাঁর তনয় আকিদাৎ এই স্থানে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সায়েস্তাখাঁ তাহাকে এই স্থান হইতে রাজমহলের ফৌজদার পদে অভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। নওরাব অন্যতম সর্দার মিরাক সুলতানকে নবাব এই স্থান হইতেই হকিকৎ খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

সায়েস্তাখাঁর সময়ে মগেরা যাত্রাপুর অঞ্চলে উপদ্রব আরম্ভ করিলে তিনি রুকুন-উদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তির অধীনে স্বীয় নৌসেনা সজ্জিত করিয়া উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নবাবি সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মগেরা ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়া যায়।

Tavernier's Travels in India. Book I.

রঘুরামপুর :

বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রঘুরাম রায় নামক জনৈক রাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম রঘুরামপুর হইয়াছে। রঘুরাম রায়ের পরেই বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিশালবক্ষা পদ্মার গর্ভে বিক্রমপুরের যে সমুদয় পল্লি বিলুপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরিশপুর একটি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পল্লি ছিল। সেখানে রায়দীঘি নামক এক বৃহৎ জলাশয়ের পাড়ে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসিত। কথিত আছে, রঘুরামের সহোদর হরিশচন্দ্র ঐ স্থানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তথায় তিনি প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহপূর্বক দুর্গোৎসব করিতেন।

রাম মালিক নামে রঘুরামের জনৈক সেনাপতির বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে, শত্রুপক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে রাম মালিক একমাত্র লাঠির শাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে যে একটি গ্রাম্যছড়া এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটি।।
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ।।

গুলি ফিরে ঝাকে।
রামের লাঠির পাকে।।
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি"।।

রঘুরামপুরের অদূরে "মানিককান্দার মাঠ" নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। সম্ভবত রঘুরায়ের লাঠিয়াল সেনার অধিনায়ক রামমালিকের নামে ঐ প্রান্তরের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

"রঘুরামপুরের হরিশচন্দ্রের দীঘি নামে একটি পুরাতন জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যে একটি স্থানে অল্প জল থাকে, তাহাও জলজ তৃণাদিদ্বারা আবৃত থাকে। উক্ত তৃণগুল্ম এরূপ পুরু যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ঐ তৃণস্তর একটু একটু করিয়া প্রতিদিন নামিয়া যাইতে থাকে। সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে প্রায় সমস্ত তৃণগুল্মই তলাইয়া যায়। তখন পরিষ্কার জল উহার উপরে ঢল ঢল করিতে থাকে। ইহার পরে ৭।৮ দিনের মধ্যে আবার পুকুরটি ক্রমে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জলজ উদ্ভিদস্তর পুনরায় ভাসিয়া উঠে এবং জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আশ্চর্য দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই।

রঘুরামপুরে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয়ই রঘুরাম ও হরিশচন্দ্রের কীর্তিকলাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রঘুরামপুরের অনতিদূরে উত্তরে "দেওসারের দীঘি" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় এখনও অর্ধ ভরাট অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই দেওসার নাম সম্ভবত দেবসার নামেরই অপভ্রংশ। বহু দেবদেবীর স্থান বলিয়াই ঐ স্থানের নামে দেবসার হইয়া থাকিবে।

রঘুরামপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে "সুখবাসপুর" নামে একটি গ্রাম বর্তমান আছে। এই গ্রামে যে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা নয়নগোচর হইয়া থাকে তাহা সুখবাসপুরের দীঘি বলিয়া পরিচিত। জনশ্রুতি এই যে, এই দীঘির পূর্বপারে রঘুরায়ের একটি আরামবাটি ছিল। তিনি অবকাশের সময় এই বাটিতে অবস্থিতি করিয়া শান্তিসুখ অনুভব করিতেন বলিয়া এই স্থান সুখবাসপুর আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রঘুরামপুরের অল্পদূর দক্ষিণে "শঙ্করবন্ধ" নামে একটি গ্রাম আছে। এই স্থানে রঘুরামরায়ের সভাপণ্ডিত শঙ্কর চক্রবর্তীর বাসস্থান ছিল। রঘুরাম স্বীয় সভাপণ্ডিতকে এই স্থান নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। এজন্যই ইহা শঙ্করবন্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাস— শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।
ভারতী ১৩১২ ভাদ্র সংখ্যা।

রণভাওয়াল :

ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত একটি তপ্পা। আকবর শাহের সময়ে ভাওয়াল "বাজু" নামে পরিচিত।

ষোড়শ শতাব্দে ভাওয়াল পরগনায় বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ফজল গাজির আবির্ভাব হয়। গাজিবংশ ইহার পূর্ব হইতেই ভাওয়ালে আধিপত্য করিতেছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে খ্রিষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পালোয়ান শাহের পুত্র কারফরমাসা দিল্লির বাদশাহ হইতে ভাওয়াল পরগনার আধিপত্য গ্রহণ করিয়া লাক্ষ্যানদীর তীরে চৌরাগ্রামে স্বীয় আবাসস্থান নির্ধারিত করেন। অতঃপর আকবরের সময়ে ইহার বংশধর ফজলগাজি বঙ্গীয় অপর একাদশ ভূঞাগণের সঙ্গে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঈশাখাঁ এই দ্বাদশ ভৌমিকের নেতা ছিলেন।

ভাওয়ালের উত্তরাঞ্চলস্থিত এগারসিন্ধু নামক স্থানে আকবর সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সহিত ঈশাখাঁর রণাভিনয় সংঘটিত হইবার জন্য ভাওয়ালের উত্তরভাগ "রণভাওয়াল" নামে পরিচিত হইয়া পড়ে। ঈশাখাঁর গর্বোন্নত মস্তক মোগল পতাকা মূলে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি স্বীয় "বাইশপরগনার" সঙ্গে ভাওয়াল পরগনার উত্তর অংশ দিল্লির সম্রাট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া আনেন।

রাজাবাড়ি :

জয়দেবপুরের উত্তর-পূর্বদিকে রাজাবাড়ি নামক স্থানে খ্রিষ্টিয় নবম শতাব্দে বৌদ্ধ নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। উত্তরকালে এই বংশীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রায় ভ্রাতৃগণ অতিশয় উৎপীড়ক রাজা ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে ভাওয়ালের অনেক হিন্দু ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উহাদের বাটির ভগ্ন অট্টালিকা ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা এবং একটি সুবৃহৎ মঠ ও "বান্দানবাড়ি" নামক বন্দীশালার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মঠটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

বিক্রমপুরান্তর্গত পদ্মানদীর তীরে অপর রাজাবাড়ির পরিচয়। চাঁদরায় ঐ স্থানে মাতৃশ্মশানোপরি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহা রাজাবাড়ির মঠ বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত।

রাজাবাড়ির এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্ধ মাইল দীর্ঘ ও পোয়া মাইল প্রশস্ত একটি দীঘি বিদ্যমান আছে। উহা "কেশারমার" দীঘি বলিয়া পরিচিত। এই দীর্ঘিকার পারস্থিত প্রসিদ্ধ হাটটি বিক্রমপুরের "দীঘির পারের হাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। "কেশারমারদিঘি" সম্বন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

রাণী-ঝি :

ঢাকা হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী পূর্ব-দক্ষিণদিকে, লক্ষ্মণখলার অনতিদূরে এই স্থান অবস্থিত। "এই প্রদেশের জনসাধারণ বল্লাল জননীকে রাণী-ঝি বলিয়া সম্বোধন করিত। বল্লাল প্রসূতির নামানুসারেই এই স্থান রাণী-ঝি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, এইস্থানে রাণী নির্বাসনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

রামপাল :

ঢাকা নগরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ৩ মাইল পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। ইহা যে অতি প্রাচীন স্থান, বর্তমান অবস্থায়ও দর্শনমাত্রেই তাহার প্রতীতি জন্মে। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে।

কৌলিন্যমর্যাদাসংস্থাপক মহারাজ বল্লাল সেন রামপালে যে বৃহৎ রাজভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা এক বৃহৎ পরিখা দ্বারা সমচতুষ্কোণ আকারে পরিবেষ্টিত ছিল। এই পরিখার প্রস্থ অন্যূন ২৫০ হস্ত। বর্তমান সময়ে এই পরিখার অনেক স্থান ভরাট হইয়া ক্ষেত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে; তথাপি উভয় পাড়ের সমতল ভূমি হইতে ইহার গভীরতা ১২-১৩ হাত বর্তমান আছে। বাড়ির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২০০ শত হাত; প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিম অন্যূন ১০০০ হাত হইবে। বাড়ির পূর্বদিকে ইহার এক প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বার দৃষ্ট হয়।

লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষণ সেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ির মধ্যে একটি পুকুর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে অগ্নিকুণ্ড বলে। ঐ স্থানাবাসীগণ বলে ইহা খনন করিলে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অগ্নিকুণ্ডে

মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন সমুদয় পরিবারসহ আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বাড়ির দক্ষিণের পরিখার দক্ষিণ পাড়ে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয়। লোকে ইহাকে রাজার বহির্বাটি বলিয়া নির্দেশ করে। এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের দক্ষিণাংশেই সেই ব্রাহ্মণাশীর্বাদলব্ধ-জীবন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষ বর্তমান আছে। মল্লকাষ্ঠ সম্বন্ধীয় উপাখ্যান কতদূর সত্য, সত্য হইলেও, এই গজারি গাছটি ব্রাহ্মণ-আর্শীবাদ-সঞ্জীবিত সেই স্তম্ভ কিনা, তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। বৃক্ষটি বিশালদেহ নহে। ইহার গোড়ার বেড় ৪৪ হাত হইবে। ৫-৬ হাত উর্ধ্বে উহা দুটি মূল শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল ব্যতীত অন্য কুত্রাপি শাল বা গজারি বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না।

রাজার বহির্বাটির দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ রামপালের দীঘি। এই দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিম প্রায় সহস্র হস্ত প্রশস্ত। ইহার আয়তন দক্ষিণদিকে আরও বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে মহারাজ বল্লাল ভূপতি এই দীর্ঘিকাটি খনন করাইয়াছিলেন। একটি প্রচলিত কথাও ইহার সমর্থন করিতেছে।[১১] এরূপ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না। শুধু দীঘিটির নাম রামপাল নহে, একটি বিস্তৃত স্থানই রামপাল নামে অভিহিত।

বল্লালবাড়ির পশ্চিমেস্থিত রামপালের দরজার পশ্চিমপার্শ্বে অন্য একটি বৃহৎ জলাশয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও দৈর্ঘ্যে সহস্র হস্ত, এবং প্রস্থে ৫-৬ শত হস্ত হইবে। ইহা "কোদালদহ' নামে পরিচিত।

বল্লাল বাড়ি ও রামপালের দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তর-দক্ষিণদিকে একটি প্রকাণ্ড রাস্তা আছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী হইতে দক্ষিণে কীর্তিনাশা নদী পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১০-১২ মাইল হইবে। ইহার পাশ এখনও কোনও কোনও স্থানে ৩০-৩৫ হাত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বল্লাল বাড়ির পশ্চিম পরিখার পশ্চিম পাড় হইতে কোদালদহের উত্তর পাড় দিয়া পশ্চিমমুখে পদ্মাতীর পর্যন্ত আর একটি প্রশস্ত রাস্তারও ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত রামপালের দরজা হইতেই এই রাস্তার আরম্ভ হইয়াছে। এই রাস্তাটিও পদ্মাপার পর্যন্ত প্রায় ২৫-২৬ মাইল দীর্ঘ।

রামপাল যে বহু সৌধরাজিসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল, তাহার বহু নিদর্শন রামপাল ও তন্নিকটবর্তী পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়া দেউল প্রভৃতি স্থানে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালের পূর্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীর কাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাকহাটির খাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টকগ্রথিত বলিয়াই মনে হয়।

ভূমি খনন করিয়া সময়ে সময়ে অনেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল জোড়া দেউল নামক স্থানে এক মুসলমান, স্বর্ণনির্মিত একটি তরবারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলা পায়। রাজপুর নামক স্থানেও একব্যক্তি কয়েকটি প্রাচীন সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একবার সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক এস্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়াছিলেন।

রামপালের সমৃদ্ধির সময় এখানে তাঁতি, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত ছিল। রামপালের সৌভাগ্য অস্তমিত হইলে, পরে যখন জাহাঙ্গিরনগরের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকে। এখনও শাখারি বাজার নামক স্থানে ও শাখারি দীঘি রামপালের অদূরে দৃষ্ট হয়।

আনুমানিক ৪৪৭ শকাব্দে এই স্থানে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের অধ্যাপক ছিলেন।

রাজনগর :

এই স্থান ঢাকা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; এক্ষণে উহা কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। এই স্থানের পূর্বনাম ছিল বিলদাওনিয়া। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই স্থানে তদীয় রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া উহাকে রাজনগরে অভিহিত করিয়াছিলেন। রাজনগরের "রঙ্গমহাল" "নবরত্ন" "পঞ্চরত্ন" "সপ্তদশরত্ন" ও "একুশরত্ন" প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্যরাজি সৌন্দর্য ও স্থাপত্য কৌশলে বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্তিগরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই স্থান ধনে, জনে, বিদ্যায়, শিক্ষা, সম্ভ্রমে দেশের আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইত। রাজবল্লভের অনন্তরবংশীয়গণের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে রাজনগরের গৌরব রায়মৃত্যুঞ্জয়ের অধস্তন বংশীয়গণ দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছিল। রায়মৃত্যুঞ্জয় খালসার দেওয়ান পদে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনগরের প্রাসাদাদির অনুকরণেই শিবনিবাসের হর্ম্যরাজি ঢাকাই শিল্পীগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

রাজনগরের পুরাতন দীঘির পশ্চিমতটে চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত যে একটি প্রকাণ্ড মেলার অধিবেশন হইত, উহা "কালবৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। "সুখসাগর", "মতিসাগর", "রাণীসাগর", "কৃষ্ণসাগর", "রাজসাগর" প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরোবর রাজনগরের শোভাবর্ধন করিত। ১২৭৬ সনে কীর্তিনাশার তরঙ্গ প্রহারে রাজনগর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

মহারাজ রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিভাবলে সামান্য মোহরের পদ হইতে ঢাকার ডেপুটিনবাবি ও পাটনার সুবাদারি পদ পর্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লিশ্বর শাহ আলমের সহিত মীরজাফরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজবল্লভ অমিতবিক্রম প্রকাশপূর্বক বাদশাহী সৈন্য অযোধ্যা পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া মুতাক্ষরণীকার লিখিয়াছেন। মীরনের মৃত্যুর পরে নবাবি সৈন্যের নেতৃত্ব রাজবল্লভের উপরেই ন্যস্ত হয়। ইংরেজ সেনানায়ক কাপ্তান ক্লাডিয়াস উক্ত যুদ্ধে রাজবল্লভের অধীনে থাকিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি "রায় রায়া সালার জঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হন। মীরনের মৃত্যু হইলে দেওয়ানি অথবা ডেপুটি নবাবপদে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এই বিষয় লইয়া ইংরেজদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। একপক্ষ মীরকাসিমের পক্ষপাতী অপরপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবল্লভের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল বিষময় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরে মীরকাশিমই প্রথমত দেওয়ানি পদ পরে নবাবি পদ লাভ করেন।

এ সম্বন্ধে মিঃ বিভারিজের উক্তি এস্থলে করা গেল। "At this distance of time it is difficult, and perhaps hardly worth while to discuss whether Raj Bullav would not have been a better choice than Mir Kassim. I think, however that probably hasting, choice was a mistake, Mirjaffir, favoured Raj Bullav and surely he had a right to be consulted ; and Raj Bullav's appointment was after all, more natural than Mir Kassim's. For it was not proposed to give Raj Bullav the power for himself. He was only to exercise it as guardian for Miran's infant son Sidu, who I suppose was the undoubted heir, Mirjafer, therefore, would have had no jealousy of Raj Bullav, whereas Mir Kassim's appointment to the Dewanship at once made him fear that he would be deposed.

মীরকাসিমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ফলেই পরে রাজবল্লভের শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হয়।

লক্ষ্মণখোলা :

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত রাণী-ঝি নামক স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে, সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন স্বনামে একটি হাট বসাইয়াছিলেন।

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

লড়িকুল :

পদ্মা ও মেঘনাদের মধ্যবর্তী ভূভাগে ঢাকা হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত বলিয়া মেজর রেনেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে একটি পর্তুগিজ গির্জার ধ্বংসাবশেষ তিনি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে পর্তুগিজগণের লবণের কারবার ছিল। লড়িকুল এক্ষণে কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত Rennell's memoris নামক পুস্তিকার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, "The name of this place may perhaps be connected with the title of the Marquis of Lourical, Who was in 1741. Viceroy of Goa &c &c. অর্থাৎ ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ার গভর্নর মার্কুইস অব লরিকেল-এর নামানুসারে এই স্থানের নাম লড়িকুল রাখা হয়। কিন্তু এই অনুমান সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ Ven Den Brouche, De Barros এবং Blaev-এর মানচিত্রে আমরা শ্রীপুরের সন্নিকটে "নুরকুলী" নামক স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাই। Blaev-এর মানচিত্র ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত De Barros-এর মানচিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে "নুরকুলী" (লড়িকুল) নামক স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যে নুরকুলী লড়িকুলেরই অপভ্রংশ মাত্র; বৈদেশিকগণের হস্তলিখিত পুস্তকে দেশীয় স্থানসমূহের নামে এতাদৃশ্য বৈষম্য হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

খ্রিষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে পর্তুগিজগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোগল শাসন সময়ে "লড়িকুল" একটি প্রধান নাবিস্থান ছিল।

নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ লড়িকুল বন্দরে দারোগা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাহায্যার্থে আবুল হোসেন (ইনি মীরজুমলার আসাম অভিযানে নৌ-যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন) দেড়শত রণতরীসহ শ্রীপুরে অবস্থান কবিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে মগেরা ফরিদপুরের পথ হইয়া লড়িকুলের সমীপবর্তী হইলে আবুল হোসেন দেড়শত নৌবহরসহ উহাদিগকে আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়া খিজিরপুর হইতে মহম্মদ বেগ অবকাশ আবুল হোসেনের শাহায্যার্থে এই স্থানে আগমন করেন। মোগলের দুর্জয় কামান মেঘমন্দ্রে গর্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে অনেক মগবীর জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল। ফলে মগেরা বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল।

চট্টগ্রাম অভিযানের প্রাক্কালে এই স্থানের পর্তুগিজদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য নবাব সায়েস্তাখাঁ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে লড়িকুলের দারোগা জিয়াউদ্দিন ইউসুফই তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন।

শৈলাট :

ভাওয়ালের অন্তর্গত শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে পালবংশীয় শিশুপাল রাজার নির্মিত রাজপ্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবাড়ির বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশি পরিপূর্ণ পরিখা, পরিখার মধ্যবর্তী ভগ্ন ইষ্টকালয়সমূহ এবং রাজবাটির সম্মুখস্থ পুষ্পবাটিকা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজবাটির চতুর্দিকস্থ গভীর পরিখা ও বৃক্ষবাটিকা এবং বাটি হইতে প্রায় ১৬ হাত পরিমিত প্রশস্ত ইষ্টকনির্মিত রাজপথ ও চতুর্দিকস্থ প্রায় ৫ মাইল ব্যাপী অনেক প্রাচীন বাটির ভগ্নাবশেষ এইস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানের দক্ষিণপার্শ্বে শিশুপালের পুষ্পোদ্যান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

শাইটহালিয়া :

শৈলাটের প্রায় ২ মাইল পূর্বদিকে এই স্থান অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান গভীর অরণ্যানি সঙ্কুল ছিল। এই স্থানেও একটি প্রাচীন রাজবাটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা দাস রাজার বাড়ি বলিয়া কথিত হয়। বর্তমান সময়ে রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপ এই স্থানে বিদ্যমান আছে। এই স্থান হইতে "মাসের ডোব" নামক স্থান পর্যন্ত ইষ্টকনির্মিত একটি সুপ্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি ২ ক্রোশ ব্যাপী পরিখাবেষ্টিত ছিল। এই স্থানে গোপী রায়ের পুষ্করিণী বলিয়া একটি দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিটি পাড় ইষ্টকনির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০ গজ হইবে।

শ্রীপুর :

সোনারগাঁ হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে কালীগঙ্গার তীরে বিদ্যমান ছিল। ডাক্তার ওয়াইজ এই স্থানকে চড়ায় পরিণত দেখেন। তৎকালে উহা "শ্রীপুরেরটেক" নামে অভিহিত হইত। তথায় বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের অফিস ছিল। সম্পূর্ণ স্থান পদ্মা-গর্ভে বিলীন হইয়া একটুকু মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাই শ্রীপুরেরটেক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীপুরের সেই "টেক" কখন বা নদীর জলে, কখন বা চড়ায় বেষ্টিত থাকিয়া আপনার শীর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম রহিয়াছে। এক্ষণেও এই টেকের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট পিটারসন সাহেব ঢাকা জেলার দুর্গ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে চণ্ডীপুরের নিকট একটি প্রাচীন কেল্লা ছিল, উহা শ্রীপুরের কেল্লা বলিয়া বিবেচিত হইত। মেজর রেনেল এই প্রসিদ্ধ স্থানটি সম্বন্ধে কোনও কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই।

শ্রীপুরেই দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্তি ধ্বংস করিয়াই পদ্মার এই অংশ কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীপুরের রায় রাজগণের রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য যাবতীয় রাজোচিত বন্দোবস্ত বিদ্যমান ছিল। তৎসন্নিহিত আড়াকুল বাড়িয়া নামক স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটিশ্বর পল্লিতে দেবালয় ছিল। এই স্থানগুলি কালীগঙ্গা নদীর তটে সংস্থাপিত ছিল।[১১] জনপ্রবাদ যে, ক্রোড় টাকা বেদিমূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এজন্য ঐ শিবলিঙ্গের নাম হয় কোটিশ্বর। পরে স্থানের নামও কোটিশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। এই কোটিশ্বর পল্লিতে রায় রাজগণ কর্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণ নির্মিত দশভুজা মূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণে উহাকে স্বর্ণময়ী বলিত।

শাহ সুজা বঙ্গদেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণকালে এই স্থানে আগমন করিয়াই আরাকান রাজের প্রেরিত নৌবাহিনীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

কার্ভালো সহিত আরাকানরাজ সেলিম সার জলযুদ্ধে তদীয় রণতরীসমূহ বিধ্বস্ত হইলে কার্ভালো তাহার রণতরীসমূহের সংস্কারসাধন জন্য এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোগল শাসন সময়ে এই স্থানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সারজন হারবার্ট সোনারগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর, ও চাটিগাঁ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরীসমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রালফ্‌ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাকলা হইতে শ্রীপুর হইয়া সোনারগাঁয়ে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীপুর গঙ্গানদীর পারে, রাজার নাম চাঁদ

রায়; তাহারা সকলেই জেলালউদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। ইহার কারণ এই যে, এই স্থানে এত নদী ও দ্বীপ আছে যে তাহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে পারে সুতরাং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্যরা তাহাদের কিছুই করিতে পারে না। এখানে বিস্তর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।"

রালফ্‌ফিচ ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর শ্রীপুরে পুনরায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক এই স্থান হইতেই পোতারোহণে পেগুতে প্রস্থান করেন। রেনেলের মানচিত্রে কালীগঙ্গার নামও চিত্র প্রদর্শিত হইলেও ঐ সময়ের অব্যবহিত পূর্বে কোটিশ্বর ও শ্রীপুর নগরী নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় তাহাদের নাম উহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।

সমতট :

বরাহমিহিরকৃত কুর্মবিভাগ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ ও সমতট পৃথক দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "তবকৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থে সমতটের সন্‌কট বা সাঁকট নাম লিখিত আছে।
ফাহিয়ানের সময়ে সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পরে সমতটের সামন্ত রাজগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ পর্যটক ইৎচিং সমতট-রাজ হো-লো-শে-পো-তোর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎচিং-এর মতে সমতট পূর্ব ভারতে অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে সেঙ্গচি নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটে আগমন করেন। ঐ সময়ে রাজভট সমতটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ফার্গুসন সাহেব সমগ্র ঢাকা জেলাকেই সমতট আখ্যা প্রদান করিতে সমুৎসুক। ওয়াটার্সের মতে উহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্বভাগে অবিস্থিত ছিল। ওয়াটার্সের মতই আমাদিগের নিকট সমীচিন বলিয়া মনে হয়।

সাভার :

বংশী নদীর পূর্বতীরে ধলেশ্বরী ও বংশী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে ঢাকা হইতে ১৩ মাইল বায়ুকোণে সংস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবাহ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া সাভারের কিয়দংশ বুভুক্ষু নদীর কুক্ষিগত হইলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখনও এই পল্লিটি ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে এবং বংশী নদীর পূর্বতটেই অবস্থিত রহিয়াছে।

খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থান সম্ভার বা সম্ভাগ প্রদেশের রাজধানী ছিল। ধামরাইর উত্তর-পশ্চিম কৌণিক দেশে সম্ভাগ নামে যে একটি ক্ষুদ্র পল্লি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা অদ্যাপি সম্ভাগ প্রদেশের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধামরাই প্রভৃতি স্থানও যে তৎকালে এই সম্ভার প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনাধীনে সম্ভার প্রদেশ বিপুল বৈভব ও প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই প্রাচীন স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য এবম্বিধ জটিল প্রবাদকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উদঘাটন করা এক্ষণে সহজসাধ্য নহে। পরবর্তী রাজা হরিশচন্দ্র এবং কর্ণখাঁর কীর্তিকাহিনীতেই সমুদয় প্রাচীন সত্য আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এই স্থানে বর্তমানকালের মোটামুটি একটি নক্‌সা এবং রাজাসনে প্রাপ্ত বিবিধ কারুকার্যখচিত কয়েকখানা ইষ্টকখণ্ডের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

প্রাচীন সম্ভাগরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, এই স্থান পরবর্তীকালে সর্বেশ্বর নগরী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। পালবংশীয় রাজন্যবর্গ বহুকাল পর্যন্ত এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, পালবংশীয় রাজা হরিশচন্দ্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সর্বেশ্বর নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

সর্বেশ্বর নগরের পূর্বাংশে "বলীমেহর" নামক স্থানে রাজা হরিশচন্দ্রের পরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মোসলমান শাসন সময়ে বলীমেহার, "মসজিদপুর" ও "ইমামদীপুর" এই উভয়বিধ নাম ধারণ করে। প্রাচীন রাজধানীর অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; এখনও মৃত্তিকা খনন করিলে নানা বর্ণের প্রস্তর ও বিবিধ আকারের ইষ্টকাদি নয়নগোচর হইয়া থাকে। বলীমেহার এখন ছোট বলীমেহার ও বড় বলীমেহার এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

রাজান্তঃপুরের উত্তরে কাটাগাঙ্গ নামে একটি পরিখা আছে। বংশীনদী হইতে উৎপন্ন হইয়া উহা পূর্বাভিমুখে সাগরীদীঘির উত্তরতীর পর্যন্ত আসিয়াছে, তথা হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া রাজবাটি হইতে ২ মাইল উত্তরে বংশীনদীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। এই পরিখাটির পরিসর বর্তমান সময়ে প্রায় ৩০-৩৫ হাত হইবে।

যে স্থানে রাজার গোমহিষাদি ও গোপালকেরা বাস করিত, তাহা "গোপেরবাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান রাজাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে এবং সাধাপুর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। গোপেরবাড়ির দক্ষিণে এবং সাধাপুরের সংলগ্ন উত্তরদিকে রাজার মালী বাস করিত বলিয়া ঐ স্থান "মালীবাড়ি" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্থানে রথযাত্রা হইত তাহা "রথখোলা" নামে পরিচিত। রাজধানীর প্রায় এক ক্রোশ দূরে এখন যে স্থান "ফুলবাড়িয়" বলিয়া পরিচিত, তথায় রাজার অতি বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান ছিল। বর্তমান সময়ে ফুলবাড়ি একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

যে স্থানে রাজা প্রতিদিন স্নানকার্য সমাধা করিতেন, তাহা এখনও "রাজঘাট" নামে অভিহিত হয়। রাজঘাটের পার্শ্ববর্তী নদী এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যে একটি ক্ষীণ পয়ঃপ্রণালির লেখা রাজাঘাটের সন্নিকটে বিদ্যমান আছে, তাহা বর্তমান তুরাগ নদীর একটি উপশাখা মাত্র। রাজাঘাট এখন একটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজধানীর উত্তরসংলগ্ন দুর্গমধ্যে রাজার সৈন্যসামন্ত অবস্থান করিত। বর্তমান সময়ে উহা "কোঠবাড়ি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৪] উহা আধুনিক সাভারের উত্তরে অবস্থিত। উচ্চ মৃৎস্তূপসমন্বিত গভীর পরিখাবেষ্টিত এই স্থানটিকে দূর হইতে একটি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট পাহাড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই মৃৎস্তূপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৯০ ফুট, প্রস্থ ৩৮৮ ফুট এবং উচ্চতা কিঞ্চিদধিক ২৫ ফুট হইবে। এই স্তূপের মধ্যভাগে ৩-৪ হাত নিম্ন একটি গহ্বর ছিল। বিপক্ষগণ নদীগর্ভ হইতে গোলাবর্ষণ করিলে সৈন্যগণ এই গহ্বর মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কোঠবাড়ির দক্ষিণ পূর্বাংশে "ভাণ্ডাইবিল" নামক একটি বিল আছে। এই বিলভূমির মধ্যস্থান উচ্চ মৃৎস্তূপ পরিবেষ্টিত।

যে স্থানে সেনানিবাস ছিল, তাহা "সেনাপাড়া" এবং বিস্তৃত জলাশয়টি সেনাপাড়ার পুষ্করিণী বলিয়া বিখ্যাত। সেনানিবাসে সৈন্যসামন্ত এবং সেনাপতি বাস করিতেন। সেনাপতির বাড়ির চতুর্দিক পরিখাবেষ্টিত ছিল। এখনও উহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেনাপাড়াকে অনেকে এখন "কাতলাপুর" বলিয়া থাকেন। কাতলাপুর সাভারের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

রাজা হরিশচন্দ্রের দুই মহিষী ছিল। তাঁহাদের একের নাম কর্ণাবতী এবং অপরের নাম ফুলেশ্বরী। ইহাদের উভয়েরই নিজ নিজ বিলাসভবন ছিল। যে স্থানে কর্ণাবতীর বিলাসভবন ছিল, তাহা কর্ণপাড়া[১৫] বলিয়া পরিচিত। রাজার বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান মধ্যে যে স্থানে ফুলেশ্বরীর বিলাসভবন ছিল, তাহা ফুলবাড়িয়া বা রাজফুলবাড়িয়া নামে পরিচিত। কর্ণপাড়া সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এবং ফুলবাড়িয়া কর্ণপাড়া হইতে প্রায় এক মাইল অন্তর অবস্থিত।

কর্ণপাড়ায় এখনও একটি উচ্চ মৃৎস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি রাজার

"তাম্বুলবাড়ি" বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের নিকটে উহা একটি বিশাল চৈত্যের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভারে বৌদ্ধ প্রভাবকালে এই চৈত্য হইতে ভগবান অমিতাভের অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাক্যাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত সন্দেহ নাই। এই স্তূপের তলস্থ ভূমির পরিমাণ একবিঘার ন্যূন নহে। ভিত্তি প্রায় অর্ধ বিঘা পরিমিত জমিতে সংস্থিত। এখনও এই স্তূপটির উচ্চতা ১৫-১৬ হাত হইবে। কর্ণপাড়ার দক্ষিণদিকে রাজগুরুর আশ্রম ছিল। এই স্থানের অনতিদূরে একটি জলাশয় বিদ্যমান আছে। উহা "জিয়সপুকুর" বলিয়া পরিচিত। ইহা রাজগুরুর পুকুর বলিয়াও অভিহিত হয়। এই পুকুরের সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ অতি অল্প দিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলবাসী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই পুকুরে পূজা দিয়া থাকে।

রাজধানীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে ৫০টি জলাশয় আছে, তাহা লোকে "সাড়েবারগণ্ডা" বলিয়া থাকে। রাজমহিষীদ্বয় যে পুকুর খনন করাইয়াছিলেন তাহা "সতিনীপুকুর" বলিয়া খ্যাত। বিধবা রাজমাতা যে পুকুর খনন করান, তাহার নাম "নিরামিষ পুকুর।" এতদ্ব্যতীত "আমিষপুকুর", "কোদালধোয়া", "দোয়াতধোয়া", "রাজদীঘি", "সাগরদিঘি", "সুখসাগর" প্রভৃতি অনেক সুবৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান থাকিয়া রাজা হরিশচন্দ্রের কীর্তিকলাপের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

সাগরদিঘির পূর্বতীরে রাজার বাগান ছিল, উহা "রাজবাড়ির বাগিচা" বলিয়া পরিচিত। এই সাগরদিঘি হইতেই বরাকর দক্ষিণাভিমুখে একটি পয়ঃপ্রণালি মীরপুর গ্রামে তুরাগ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উহা "বিলবাঘিল" নামে অভিহিত হয়।

নিরামিষ দীঘির উত্তর-পূর্বে কাটাগাঙ্গের পশ্চিমে প্রায় বিংশতি হস্ত উচ্চ একটি মৃৎস্তূপ বর্তমান আছে। স্তূপের উপরে ইষ্টকবাধান দুইটি কূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানটি "নহবৎখানা" বলিয়া কথিত হয়। এই নহবৎখানার উত্তর-পশ্চিমে মঠবাড়ির পুকুর। ইহার তীরদেশে একটি অভ্রভেদী মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঠাভ্যন্তরে ভগবান অমিতাভের সুমধুরবাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত।

"ছাইলা কামসা নামক স্থানে লম্বা প্রাচীরাকার উচ্চমঞ্চে চাঁদমারী অর্থাৎ সৈন্যদিগের তীর চালনা করিয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার স্থান ছিল। এই স্থানটি রাজধানী হইতে প্রায় অর্ধ মাইল ব্যবধান। "গুলাইল বাড়ি" নামক স্থানে "গুলালি" সৈন্যগণ অবস্থান করিত। দগ্ধ মৃত্তিকায় প্রস্তুত কতিপয় গুটিকার ভগ্নাবশেষ আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি।

"চাইরা চৌমাথা" ও "মেরীখোলা" নামক স্থানে দুইটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। চারিটি বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমস্থলে পূর্বোল্লিখিত বাজারটি সংস্থাপিত ছিল বলিয়া উহা "চাইরা চৌমাথা" বাজার বলিয়া অভিহিত হইত।

অদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশচন্দ্রের কন্যাদ্বয় পেটিকা নগরের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিল। হরিশচন্দ্র ধার্মিক রাজা ছিলেন। ধর্মানুসারে তিনি বার্ধক্যে বনে গমন করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় দামুরাজা ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ রাজ্যশাসন প্রণালিতে ততদূর অভিজ্ঞ না থাকায় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। ক্রমশই রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। হরিশচন্দ্র হইতে অধঃস্তন দ্বাদশ পুরুষ শিবচন্দ্র নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নানাতীর্থ ভ্রমণ করেন। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎশাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে রাজবংশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশাল রাজবাটির অধিকাংশই পতিত ও জঙ্গলময় হইয়া পড়াতে রাজবংশীয়রা সর্বেশ্বর নগরী পরিত্যাগ করিয়া ফুলবাড়িয়ার নিকটবর্তী কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের পরবর্তী একাদশ পুরুষ তরুরাজখাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তরুরাজের পুত্রচতুষ্টয় শুভরাজ, যুবরাজ, বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত নামে পরিচিত। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার

সহিত হুসনীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা তথায়ই বাস করিতে থাকেন। তাহাদের বংশধরগণ সেনাবাড়ির চৌধুরি উপাধি ধারণ করিয়া সেনাবাড়ি নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত রায় নবাব সরকারে কার্য করিতেন। ভাগ্যবন্ত রায় স্ব-ধর্মনিষ্ঠ ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। মোসলমান সংশ্রবদোষে জাতিপাত বিবেচনা করিয়া তিনি সমাধিযোগে তনুত্যাগ করেন। তিনি সাভার ও ফুলবাড়িয়ার নিকটবর্তী কোণ্ডা নামক গ্রামেই সমাহিত হন। সমাধিস্থ মহাপুরুষ "খন্দকার" এবং সমাধি মন্দির "খন্দকারের দরগা" বলিয়া খ্যাত।

কোণ্ডা গ্রামের ভাগ্যবন্তপাড়া ভাগ্যবন্তের প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংলগ্ন "বুরুজের টেক" সকলের পরিচিত। এইস্থানে সান্ত্রী, প্রহরী নিযুক্ত থাকিত।

রাজা হরিশচন্দ্রের রাজসিংহাসন যে স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার নাম রাজাসন; কেহ কেহ ইহাকে "বাজাসন" বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই রাজাসন, নান্নার এবং সূয়াপুরের বাজাসন ও বজ্রাসন হইতে পৃথক। প্রাচীনকালে এই স্থানেও একটি বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাসন হইতে ডবাক রাজ্যে যাতায়াতের নিমিত্ত সাগরদিঘি হইতে তুরাগ ও বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি খাল খনিত হইয়াছিল। ইহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজাসনে পিলখানার ঘাট বলিয়া একটি স্থান আছে, ইহাতে অনুমিত হয়, এখানে রাজার পিলখানা ছিল। রাজাসন বর্তমানে একটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে। সাভার এবং সাভারের উত্তরস্থলে জঙ্গলময় ভূখণ্ডে রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, রাজাসন হইতে তাহা প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয়, রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানীর সীমা নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ছিল না।

ফুলবাড়িয়া হইতে এক ক্রোশ পূর্বে এবং রাজাসন হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে গান্ধারিয়া গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দিকে পরিখা বেষ্টিত ছিল। পরিখাটি পূর্ব দিকে দুইটি শাখা দ্বারা তুরাগ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমদিক হইতে আর একটি পয়ঃপ্রণালি বংশী নদী হইতে বহির্গত হইয়া পরিখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই পরিখাবেষ্টিত স্থান মধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা রাবণ রাজার বাড়ি বলিয়া কথিত হয়। ইনি হরিশচন্দ্রের সমসাময়িক রাবণ ভূপতি সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ ছিলেন। তদীয় প্রাসাদ সঙ্গীতজ্ঞের আশ্রয়স্থল ছিল। তৌর্যত্রিণীক সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনাস্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশবিখ্যাত ছিল। ইহার বহুসংখ্যক ঢালি সৈন্য ছিল। "ঢালিপাড়া" বলিয়া একটি স্থান ইহার সন্নিকটে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

সোনারগাঁও :

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অধুনা এই স্থান পানাম নামে পরিচিত। এই স্থানেই পাঠান রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা ইহাকে হাবেলি সোনারগাঁও বলিয়া অভিহিত করিতেন। সোনারগাঁর রাজধানী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। রাজ প্রাসাদের সদর দরজায় সুবিস্তৃত পরিখার উপরে একটি চলৎসেতু সর্বদা বিস্তারিত থাকিত, রাত্রিযোগে উঠাইয়া রাখিলে কাহারও পুরীপ্রবেশের উপায় ছিল না। পরিখার উপরিস্থিত একটি প্রাচীন সেতুর সম্মুখভাগ তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে এই তোরণদ্বার আবদ্ধ থাকিত, সুতরাং দিবাভাগ ভিন্ন নগরে প্রবেশ করিবার অথবা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অন্য উপায় ছিল না।

খ্রিষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দে আফ্রিকাদেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা "দুর্ভেদ্য দুরাক্রম্য, সোনারগাঁও" নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার বন্দরে যাবা দ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্যতরণী দেখিতে পান। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, তৎকালে সুবর্ণগ্রাম সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যস্থান ছিল। সুবর্ণগ্রামে অনেক সাধু, বিদ্বান ও রাজনৈতিকের আবাসভূমি ছিল। রাজা কংসনারায়ণের পুত্র

যদুনারায়ণ হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জেলালুদ্দিন নামধারণ করেন। এই সময়ে তিনি মোসলমান ধর্মের প্রকৃত উপদেশ ও রাজ্য সুশাসিতকরণের সুযুক্তি লাভার্থ এই স্থান হইতে সেখ জাহিদকে গৌড়ে আনয়ন করেন।

১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্‌ফ ফিচ্‌ সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীপুর হইতে সোনারগাঁও শহর ৬ লিগ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান, সমুদয় রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খ্রিষ্টানদিগকে তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার ঘরগুলিও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং খড় দ্বারা আবৃত। দরমা দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। ইহা হইতেই ব্যাঘ্রভল্লুকের উৎপাত হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ লোকই ধনবান, অধিবাসীরা মাংসাশী নহে, অথবা কোনরূপ জীব হিংসা করে না। চাউল, দুগ্ধ, ফলমূলাদি খাইয়া জীবনধারণ করে। কটিদেশে সামান্য একটু বস্ত্র জড়াইয়া রাখে, শরীরের আর সমুদয় স্থান অনাবৃত থাকে। অনেক কার্পাস বস্ত্র এইস্থান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ভিন্ন ধান্য, চাউল ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, সিংহল, পেগু, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াও উদ্ধৃত্ত হয়। পিটার হেলিন এই স্থানটি দ্বীপ মধ্যে, গঙ্গার প্রধান প্রবাহের তীরে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মেজর রেনেল তদীয় মেময়ের-এ এইস্থান গ্রামে পরিণত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে ডাঃ বুকানন সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সুবর্ণগ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।" উদ্ধবগঞ্জকেই তিনি রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলগাছিয়ার দক্ষিণে সোনারগাঁও নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। সুবর্ণগ্রামের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কলাগাছিয়ার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীপুর নগরী বিদ্যমান ছিল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎকাল পূর্বেই শ্রীপুর ধ্বংস হইয়া যায়।

পাঠান শাসন সময়ে সোনারগাঁও "হজরৎই জালাল" নামে অভিহিত হইত।

Ibn Batuta : Translation P. 194 and 195.

Montgomery Martin's Eastern India.

Bowrey : Hakluyt's Society Series II. Vol. XII

Cunningham's India : Archeological Reports Vol. XV, P. 135

Murray's Discovery in Asia Vol. II Ch. 99

Cosmographie of Peter Heylyn.

হাইড়া :

দেওয়ান মসনদ আলির বংশ নিবীর্য হইয়া পড়িলে, সোনারগাঁও হাইড়ার চৌধুরিদিগের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই চৌধুরিবংশ বিশাল ভূভাগের জমিদার ছিলেন। ইহাদিগকে ৮২০০০ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। ঈশাখাঁর সময়ে চৌধুরিবংশের জমিদারি আরম্ভ হইয়াই মনোয়ারখাঁর মৃত্যুর পরে ইহাদের প্রবল প্রতাপ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই বংশীয় কীর্তিমান হরিদাস রায়চৌধুরি ও তদ্বংশধরগণ অসীম প্রতাপে প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত স্বাধিকার শাসনের পর তাঁহার প্রপৌত্র শিবরাম এবং তৎপুত্র কাশীরাম রায়, প্রকৃতিমণ্ডলী ও অধীনস্থ তালুকদার, জিম্বাদার, মহালদার প্রভৃতি সর্বশ্রেণিস্থ লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। ফলে, উভয়ে নবাব সরকারে নীত ও বন্দীকৃত এবং বিচারে সম্‌সের (তরবারী) বা খোরেস্‌ (খানা) উভয়ের অন্যতর অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া আদিষ্ট হন। কাশীরাম সম্‌সের স্বীকার করিলে তাহার শিরচ্ছেদন হয়। শিবরাম মোসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করেন। ইহার পরে চৌধুরিবংশ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।

হাজিগঞ্জ :

নায়ারণগঞ্জের সন্নিকটে লাক্ষ্যানদীর তীরে অবস্থিত। রেনেলের ১৭নং মানচিত্রে এই স্থানে একটি দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহা কেল্লা বলিয়া লিখিত আছে। হাজিগঞ্জের দুর্গ মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্টুয়ার্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, সোনাবিবি (চাঁদ রায়ের কন্যা, ঈশাখাঁ ইহার নাম দিয়াছিলেন আলি নেয়ামত বিবি) এই দুর্গে থাকিয়া, সুবর্ণগ্রাম আক্রমণকারী মগদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইবার প্রাক্কালে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

বর্তমানে ইহা হাফেজমঞ্জিল নামে অভিহিত হইতেছে। ঢাকার স্বর্গীয় নবাব খাজে আসান উল্লা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেহেস্তগত খাজে হাফেজ উল্লার নামানুসারে ইহা হাফেজমঞ্জিল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্গের প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন হইয়া রাজপথ চলিয়াছে।

হাতিবন্দ :

বানার এবং লাক্ষ্যা নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে, একডালার অনতিদূরে অবস্থিত। এইস্থান পূর্বে আন্তোমেলা নামে পরিচিত হইত। টলেমি আন্তিবলের সহিত এই স্থান অভিন্ন মনে করেন। পালবংশীয় ভূপালগণ এই স্থানে খেদা নির্মাণ করিয়া হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া উহা হাতিবন্দ বা হাতিমল্ল বলিয়া কথিত হইত।

Dr. Taylor's Topography of Dacca.

হামছাদি :

সোনারগাঁও অন্তর্গত এই গ্রামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা কৃষ্ণদেব সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমত নবাব সরকারে বক্সী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বক্সী নামে সুপরিচিত। কৃষ্ণদেবের কীর্তির মধ্যে হামছাদি গ্রামে কৃষ্ণসাগর, রামসাগর, পিলখানা ও যাত্রাবাড়ির দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে।

হোসেনপুর :

মেজর রেনেল এই স্থানকে ওসমপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই স্থানে একটি পর্তুগিজ গির্জার ভগ্নাবশেষ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামটি ঢাকা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্তী উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই গ্রামের নিম্ন দিয়া একটি খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে সিলেট নদীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

এই স্থানের গির্জার বিষয় হান্টার সাহেব উল্লেখ করেন নাই। List of Ancient Monuments গ্রন্থেও এই বিষয়ে কিছুই লিখিত হয় নাই।

Pere Barbier ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি একখানা চিঠিতে উসুমপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র Letters edifianteset Curieuses (Tome XIII. P. 272) সংজ্ঞক পত্রাবলীব অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানে মোগল সম্রাটের অনেক পর্তুগিজ কর্মচারীর আবাসস্থান বলিয়া তাহাতে লিখিত হইয়াছে। Pere Barbier স্বয়ং Bishop Laynez এর সহিত ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (ক)

প্রশস্তি - পরিচয়

আসরফপুরের তাম্রশাসন :

১ম

১। স্বস্তি। জয়ত্যবিদ্যাহতি হেতু ভূত সংত্তীর্ণ সংসার মহাম্বুরাশি অনুত্তরা বা ি(প্ত) * * *
২। * * * ভগরা (ং) মুনীন্দ্র। জয়ত্যশেষ ক্ষিতিপাল মুলি[১] মালা মণি দ্যোতিত পাদপীঠ * * *
৩। (পাদ প্রণতোত্তমাংগ শ্রীদেবখড়্গো নৃপতি র্জিতারিঃ। টল্যোদ্যানি কাতরলা সং * * *
৪। (মহা) দেবী শ্রীপ্রভাবত্য ভূজ্যমাণক পটকদ্বয় ভন্তদীকা (ভট্টারিকা?) (শু) ভং (হুং) সুকারা ভূজ্য * * *
৫। ককোদার চোরকে শ্রীমিত্রবল্যাঃ সামন্ত-বাণ্টি যোকেন ভূজ্যামানক হ্যর্ধ * * *
৬। (রে) লতলকে শ্রীনেত্রভটেন ভূজ্যমানকহ্যর্ধ পাটক পরানাটননাদবর্মি * * *
৭। ৎপলশতৈ দশ দ্রোণ বাপা শিব হুদিকা শোগ্গ বর্গে নর্ত্তকী অর্ধ পাটক * * *
৮। * * * শ্রীমেতে শ্রীশবস্তিরেণ ভূজ্যমানক মহত্তর শিখরাদিভিঃ কৃষ্যমা * * *[২]
৯। (প) টক বিহার বাস্ত দ্বয়েণ বোল্লবায়িকা উগ্রবোরকে বন্দ্য জ্ঞানমতিনা * * *
১০। কপাটক তীসনাদজয় দত্তকটকে দ্রোণিমঠিকায়ো পাটক। ই * * *[৩]
১১। যু পাটকেযু দশ দ্রোণাধিকেযু সমুপগত বিষয়পতী[৪] কুটুম্বিনশ্চ সমা * * *[৫]।
১২। (বি) দিত মস্ত ভবতাং এতে দশ দ্রোণাধিক নব পাটকা যথা ভূঞ্জনাদ্ * *[৬]।
১৩। রাজ রাজ ভট্ট স্যায়ুষ্মামার্থং আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্র পাদৈকারী
১৪। * * বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়মেকগণ্ডীকৃতং তদ্বিষয়পত্যাদি। * * *[৮]।
১৫। '* * র্ভবিতম্যমিতি সম্বৎ' ১০ + ৩ বৈশাখ দি ১০ + ৩ আয়ুশ্চলং
১৬। () পূণ্যং বসর্বগতি দুঃখ ভয়াপহারি ভূমিশ্চ দানমি ()
১৭। বুধ্বা ভোগীশ্বরৈঃ সকরুনৈঃ প্রতি পালনীয়ম্।। দূতকোহত্র পরম সৌ[৯]।
১৮। (লি) খিতং জয়কর্মান্তবাসকে পরম সৌগতোপাসক পুরদাসে (নে)[১০]।

বঙ্গানুবাদ : স্বস্তি। ভগবান মুনীন্দ্র যিনি অবিদ্যার কারণ সমূহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জয়। ১-২ রাজা দেবখড়্গা, যাহার পাদ-পীঠ অশেষ ক্ষিতিপাল গণের মৌলিস্থিত মণিরাজি দ্বারা সমুদ্ভাসিত, * * * যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, তাঁহার জয়।

মহাদেবী প্রভাবতী কর্তৃক ভূজ্যমান তল্লোদ্যানি কাতরলাস্থিত পাটকদ্বয়; শুভাংসুক নাম্নী জনৈক মহিলা কর্তৃক ভূজ্যমান অর্ধপাটক।

কেদারচোরকস্থিত শ্রীমিত্রাবলির অধিকারভুক্ত এবং সামন্ত বণ্টিয়োক কর্তৃক ভূজ্যমান সার্ধপাটক; শ্রীনেত্রভট্ট কর্তৃক বূজ্যমান রেলতলকস্থিত অর্ধপাটক।

পরানাটন নাদর্মিস্থিত * * *।
পলশতস্থিতদশ দ্রোণ বাপা পরিমিত ভূমি;
শিব হুদিকা শোগ্গ বর্গ স্থিত অর্ধপাটক;

শ্রীসর্বান্তর কর্তৃক ভূজ্যমান মহত্তর ও শিখর প্রভৃতি কর্তৃক কর্ষিত বিহার বাস্তুদ্বয় সমেত এক পাটক ভূমি।

রল্লবারিকউগ্রবোরকস্থিত বন্দ্যজ্ঞান মতি কর্তৃক ভূজ্যমান পাটকপরিমাণ ভূমি।

তীসনাদজয়দত্তকটকস্থিত দ্রোণিমাঠিকার পাটক পরিমাণ ভূমি। ৩-১০।

দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সমূহান্তর্গত বিষয়পতী ও কুটুম্বগণকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে (১১-১২)।

আপনারা পরিজ্ঞাত হউন যে, এই দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি বর্তমান ভোগকারীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রাজরাজ ভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্যকে দান করা গেল। এইরূপে বিহার বিহারিকা-চতুষ্টয় একগণ্ডীভুক্ত করা হইল। সুতরাং বিষয়পতী * * * গণ বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারিবে না ১২ - ১৫।

সম্বৎ ১০ + ৩ দি ১০ + ৩ বৈশাখ। ১৫।

জীবন ক্ষণস্থায়ী * * * ভূমি দান দ্বারা দুঃখ ভয় দুরীভূত হয়, ইহা জানিয়া এবং করুণা পরবশ হইয়া সমুদয় সুখৈশ্বর্য উপভোগকারিগণ ইহা রক্ষা করিবে। (১৫ - ১৭)।

পরম সৌগত (সৌমত) * * * ইহার সংবাদ বাহক জয় কর্মান্ত বাসক হইতে পরসৌগতোপাসক পুরদাস কর্তৃক লিখিত। (১৭ - ১৮)।

২য়

১। জয়ন্তি ভিন্নানুশয়ান্ধকারা বৈনেয় পদ্যান্যববোধয়ন্ত বাচোঙ্শবো মার * *

২। * * লক্ষ্মী বিক্ষেপ দক্ষা জিন ভাস্করস্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্তৌ ভগবতি সুগতে সর্বলোক।

৩। * * * তদুর্মেশান্তরূপে ভব বিভবভিদাং যোগিনাং যোগগম্য তৎসংঘে চাপ্রমেয়ে বি

৪। বিধ গুণনিধৌ ভক্তিবাবেদ্যগুর্বীং শ্রীমৎখড়্গোদ্যমেন ক্ষিতিরিয়মভিতোনির্জিতায়েন

৫। (পশ্চাঃ ?) তজঃ শ্রীজাতখড়া ক্ষিতিপরিতরভবদ্যোন সর্বারিসংঘো বিধ্বস্তঃশূরভাবা

৬। তৃণমিব মরুতা দন্তিনেবাশ্ববৃন্দং তস্মা শ্রীদেব খড়্গো নরপতিরভবৎ তৎসুতো রাজরা

৭। জঃ দত্তং রত্নত্রায়ায় ত্রিভবভয়ভিদা যেনদানং স্বভূমেঃ। মিদিকিল্লিকা শালিবর্দকে

৮। তলপাটকে শত্রুকেন ভূজ্যমানকপাটকৎ গুবাকবাস্তুদ্বয়েন সহ অর্ধপাটক উপা

৯। সকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিযোকেন ভূজ্যমানক বিংশতি দ্রোণবাপা মর্কটাসীপাটকে

১০। সুলব্ধাদিভি ভূজ্যমানক সপ্তা বিংশতির্দ্রোণ বাপা' রাজদাসদুগর্গ টাভ্যাং কৃয্যমাণ

১১। (কো)(কা?) ত্রয়োদশ দ্রোণ বাপা বুদ্ধ মণ্ডপপ্রাপি বৃহৎ পরমেশ্বরেণ প্রতিপাদিতক বৎসনাগ

১২। পাটক নবরোপ্যে শ্রীউদীর্ণ খড়্গোন প্রতিপাদিত শত্রুকেন ভূজ্যমানক পাটকাপ

১৩। রনাটন (ক?) নীলে অর্ধপাটক দরপাটকে পি পাটক দ্বারোদকে অর্ধ পাটক˝ ব্বারমুগ্গ

১৪। কায়াৎ চাপপ্রাপি অর্ধপাটক ইত্যেবং শট্সু˝ পাটকেষু দশঃ দ্রোণাধিকেষু সমুপগ

১৫। তবিষয়পতিনধিকরণানি কুটুম্বিনশ্চ সমাজ্ঞাপয়তি এতে পাটকা দশ দ্রোণাধিকা

১৬। যথাভূজনাদপনীয় শালীবর্দক আচার্য সংঘমিত্রস্য বিহারে প্রতিপাদিত্যস্তদ্বিযয়

১৭। পত্যাদি কুটুম্বিভিনিরাবাধৈর্ভবিতব্যমিত দূতকোত্র শ্রীযজ্ঞবর্মা। ইতি কমল

১৮। দলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুয্যজীবিতং চ সকল মিদমুদাহৃতং চবু

১৯। ধ্যা˝ নহি পুরুধৈ পরকীত্তরো বিলো— ।। এতান্যেতাং˝; ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রাং ভূ

২০। যো ভূয়ো প্রার্থয়ত্যৌষ রামঃ। সামান্যোয়ং ধর্ম সেতু নৃপাণাং কালে কালে

২১। পালনীয়ঃ ক্রমেনঃ। বহুভির্বিবসুধা দত্তা রাজভি সগরাদিভি য

২২। স্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলম্। জয়কমান্তবাসকাৎ

২৩। লিখিতং পরম সৌগত পুরুদাসেনেতিং।। সম্বৎ ১০ + ৩

২৪। পৌষ দি ২০ + ৫।

বঙ্গানুবাদ

দ্বিতীয়

উদ্‌গ্রীবোপবিষ্ট বৃষমূর্তি

শ্রীমদ্দেব খড়্গ :

ভাস্কর প্রতিম জিনের তোজোময় বাক্যাবলি, যৎকর্তৃক অনুশয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, বৈনায়িক (বুদ্ধ মতাবলম্বী) দিগের বিবেক-বুদ্ধি পদ্মের ন্যায় উন্মেষিত হইয়াছে, এবং যাহা মারের প্রভাব * * * বিদুরিত করিতে সমর্থ, তাহা জয়যুক্ত হইয়াছে। (১-২)

সর্বলোকন্দ্য তৈরিলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভববিভবভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য, ধর্ম এবং তদীয় অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক, শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম সমগ্র ক্ষিতিতল জয় করিয়াছিলেন। (২-৫)।

তাহা হইতে ক্ষিতিপতি শ্রীজাত খড়্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বীয় সৌর্যপ্রভাবে ইনি বাত-বিক্ষিপ্ততৃণ এবং করি-তাড়িত অশ্ববৃন্দের ন্যায় অরি-সংঘ বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৫০৬)।

তৎপুত্র নরপতি শ্রীদেবখড়্গ। ত্রিভুবনের ভয়-নিরাশক্ষম রাজ রাজ নামধেয় তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইনি রত্ন-ত্রয়োদ্দেশ্যে (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) স্বভূমি দান করিতেছেন (৬-৭)।

মিদিকিল্লিকাশালিবর্দকান্তর্গত তলপাটকস্থিত, শত্রুক কর্তৃক ভূজ্যমান পাটক পরিমাণ ভূমির অন্তর্গত গুবাকবাস্তুদ্বয় সমেত অর্ধপাটক এবং উপাসক কর্তৃক ভুক্ত, অধুনা স্বস্তিযোগ কর্তৃক ভূজ্যমান বিংশতি দ্রোণবাপ ভূমি;

মর্কটাসীপাটকান্তর্গত সুলব্ধ প্রভৃতি ভুজ্যমান সপ্তবিংশতি দ্রোণবাপক ভূমি, রাজ দাস ও দুর্গত্ত কর্তৃক কর্ষিত ত্রয়োদশ দ্রোণাবাপক ভূমি, বুদ্ধমণ্ডপ পর্যন্ত প্রসারিত বৃহৎ পরমেশ্বরের দত্ত বৎস নাগপাটক ;

নবরোপ্যস্থিত শ্রীউদীর্ণখড়্গ প্রদত্ত শত্রুক কর্তৃক ভূজ্যমান পাটক পরিমাণ ভূমি ;
পরনাটক (নাটক?) নীলান্তর্গত অর্ধপাটক ;
দরপাকান্তর্গত পাটক পরিমাণ ভূমি ;
দ্বারোদকস্থিত অর্ধপাটক ;
চাট পর্যন্ত বিস্তৃত ববার মুগ্‌গকস্থিত অর্ধপাটক ভূমি (৭-১৪)।

বিষয়পতি, কর্মচারীবর্গ এবং কুটুম্বগণের বিদিতার্থে আদেশ প্রচারিত হইল যে দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সমূহ বর্তমান ভোগকারিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া শালিকবর্দকস্থিত আচার্য সংঘামিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইল। বিষয়পতি ও কুটুম্বগণ কোনও প্রকারে উহার বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারিবে না। শ্রীযজ্ঞ বর্মা ইহার সংবাদবাহক (১৫-১৭)।

শ্রী এবং মানবজীবন কমল দলস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং পূর্বোক্ত সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরকীয় কীর্তি-রাজি কেহই বিলুপ্ত করিবে না। ভবিষৎ রাজণ্যবর্গের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র ইহা বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সাধারণ ধর্ম

সেতু রাজগণের সর্বদাই পালনীয়। সগর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু নরপতিই ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, তবুও যখন যে নরপতি ভূমির অধীশ্বর থাকেন, দানের ফল তিনিই প্রাপ্ত হন (১৭-২২)।

জয়কর্মান্তবাসক হইতে পরম সৌগত পুরদাস কর্তৃক লিখিত ইতি সম্বৎ ১০+৩ (২২-২৩)।

পৌষ দি ২০ + ৫। (২৪)।

১৮৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে মিএগ্রা বক্সাখাঁ নামক জনৈক কৃষক প্রাচীন জলাশয়ের সন্নিকটবর্তী মৃত্তিকাস্তূপ মধ্যে পিতল ও অষ্টধাতু নির্মিত চল্লিশটি চৈত্যসহ উক্ত তাম্রশাসনদ্বয় প্রাপ্ত হয়। মুড়াপাড়ার জমিদার প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার একখানা এশিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পণ করেন। অপর ফলকটি লাকরশির চৌধুরি-বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত হেনরি বিভারিজ মহোদয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। চৈত্যগুলির মধ্যে দুইটি মাত্র তারকবাবুর হস্তগত হয়। তন্মধ্যে একটি—তিনি ডাক্তার হোর্নেলকে এবং অপরটি খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন মহাশয়কে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাঠক ভূমি আচার্যবন্দ্য সংঘামিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্টয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই ফলকে রাজা শ্রীদেবখড়্গ ও রাণী প্রভাবতীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ফলোকোল্লিখিত পরনাতননাদবর্মি ও পলশত বিহার আমরা আধুনিক বর্মিয়া ও পলাশ নামক স্থানদ্বয় বলিয়া মনে করি। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ১৩ই বৈশাখ তারিখে পরমসৌগত পুরোদাস কর্তৃক প্রথম ফলকখানা উৎকীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্‌পাটক পরিমাণ ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ এই রত্নত্রয়োদ্দেশ্যের সালিবর্ধক বিহারের আচার্য সংঘামিত্রকে প্রদান করা হইয়াছে। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ২৫শে পৌষ তারিখে সৌগতোপাসক পুরোদাস কর্তৃক উহা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই তাম্রশাসনোল্লিখিত তালপাটক এবং দত্তগাও স্থানদ্বয় অধুনা রায়পুরা থানান্তর্গত তালপাড়া এবং দত্তগাও বলিয়া আমরা মনে করি।

উক্ত তাম্রশাসনদ্বয় হইতে খড়্গ বংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। খড়্গোদ্যম
২। জাত খড়্গ (পুত্র)
৩। দেব খড়্গ (পুত্র)
৪। রাজ রাজ (পুত্র)

চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্মিত এবং ছত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চারিপার্শ্বে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, তন্নিম্নে অপর বুদ্ধ মূর্তি এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন-সংবদ্ধ বুদ্ধ মূর্তি বিরাজিত।

বেলাব-তাম্রশাসন

বিষ্ণুচক্র সমন্বিত রাজমুদ্রা :

১। ওঁ সিদ্ধি। স্বায়ম্ভুর মিহাপত্যং মুনিরাত্রি দি (র্দি) বৌকসাং। তস্য চন্নাষনং তেজ স্তেনাজা।
২। য়ত চন্দ্রমাঃ। বৌহিণেয়ো বুধস্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ স্বয়ং-বৃতঃ কীর্ত্যা।
৩। চৌর্বশ্যাচ ভূরচয়ঃ।। সোপ্যায়ুং সমাজীজনস্মানু সমোরজ্জস্ততো জজ্ঞি বান্ ক্ষ্মা।
৪। পালো নহুষস্ততোজনি মহারাজোযয়াতিঃ সুতম্ সোপি প্রাপ যদুং ততঃক্ষিতি ভূ
৫। জাং বংশোয় মুজ্জম্ভতে বীরশ্রীশ্চ হরিশচন্দ্র যত্র ব শঃ প্রত্যক্ষ মৈবেক্ষত্ত সোপীহ
৬। গোপীশত কেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ অর্ঘঃ পুমানংশ কৃতাবতা

৭। রঃ প্রাদুর্ব্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ। পুংসামাবরণং ত্রয়ী নচ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি
৮। ত্রয্যান্ (ং) চাদ্ভুত-সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদগমৈ বর্মণঃ ভর্মাণোতি গভীর নাম দধতঃ
৯। শ্লাঘ্যৌ ভুজৌ বিভ্রতো ভেজুঃ সিংহপুর গুহামিব মৃগেন্দ্রণাং হরের্বান্ধবাঃ
১০। অভবদথকচিদ্যাদবীনাং চমুনাং সমরবিজয়ধারাঃ মঙ্গলং বজ্রবর্মাশম
১১। ন ইব রিপুণ্যং সোমবন্ধান্ধবানাং কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ (প) ণ্ডিতনাম্।। জা
১২। ত্রবর্মা ততো জাতো গাঙ্গেয়ইব শান্তনোঃ (।) দয়াব্রতং রণক্রীড়া ত্যাগো যস্যমহো
১৩। ৎসবঃ গৃহ্নন্বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কল্পস্য বীরস্ত্রিয়ং যো * * * প্রথম হ্রিয়ং পরিভবং
১৪। স্তাং কামরূপশ্রিয়ং নিন্দন্দিব্য ভূজশ্রিয়ং
১৫। সাচ্ছিয়ং বিতত বাদ্যাং সার্ব ভৌমশ্রিয়ং। বীর শ্রিয়ামজনি সামলবর্ম দেবঃ
১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথম মঙ্গল নামধেয়ঃ কিম্বর্ণয়াম্যখিল ভূপগুণোপপন্নো দৌযৈ
১৭। ম নাগপি পদংনকৃত প্রভূর্মে। ততোদয়ী সূনুরভূত প্রভূত প্রতাপ বীরেষ্বপিসঙ্গ
১৮। রেষু যশ্চন্দ্র (স) প্রতিবিম্বতং স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে স্ম।। তস্যামালব্য দেব্যা
১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভূবঃ পূর্ণেপ্যশে
২০। য ভূপাল পুত্রীণামবরোধনে তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামল বর্মণঃ। আসী
২১। ত্তয়োঃ সু (সু) নুবিহান্তরং যঃ শ্রীভোজ বর্মোভয় বংশ (দী পঃ পাত্রেষু সর্বাসু দশাসু যে
২২। নস্নেহোনু লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ।। হাধিক (ক) ষ্টমবীর মধ্য ভূবনং ভুয়োপি কং (কিং) রক্ষসা
২৩। মুৎপাতয়ো মু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ।। ইতি যঃ গুণগাথাভি স্তুষ্টা
২৪। বপুরুষোত্তমঃ মজ্জষন্নিব বাগ্ ব্রহ্মময়ানন্দ মহোদধৌ।। সখলু শ্রীবিক্রমপুর
২৫। সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ মা (ম) হারাজাধিরাজ শ্রীসামল বর্ম দেবপা
২৬। দানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র ভূক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টাগুচ্ছ খ
২৮। গুল সং উয্যালিকা গ্রামে গুবাকাদি সমেত সপাদনব দ্রোণাধি
২৯। ক পাটক ভূমৌ সমুপ গতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রা
৩০। জপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত পীঠিকাবিত্ত মহাধর্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি কি
৩১। গ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপ
৩২। টলিক মহাপ্রতিহার মহাভোগিক মহাব্যূহপতি মহাপীলুপতি মহাগ
৩৩। গস্থ দৌস্সাধিক চৌরোদ্ধবণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি
৩৪। ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়েক বিষয় পত্যাদীন অন্যাংশ্চ সক
৩৫। ল রাজ পাদোপ জীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান ইহা কীর্তিতান্ চট্টভট্ট জাতি
৩৬। য়ান্ জনপাদন ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রহ্মাণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হ স্মানয়তি
৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তুভ (ব) তাম্। যথোপরিলিখিতা ভূমিরিয়ম্ স্ব
৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণ পূতি গোচর পর্যন্তা সতলা সো দ্দেশা সাম্রপনসা স
৩৯। গুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থ (লা) সগর্তোষরা সহ্য দশাপরাধা পরি
৪০। হৃত সর্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যা সমস্ত রাজভোগক
৪১। র হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা সাবর্ণ্ণ সগোত্রায় ভৃগু চ্যবন আপ্নবান ঔ
৪২। র্ব্ব জমদগ্নি প্রবরায় বাজসনেয় চরণায় যজুর্বেদ কণ্ব শাখাধ্যায়ি
৪৩। নে মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায়াং সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেব

৪৪। শর্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেব শর্মণঃ পৌত্রায় বিশ্বরূপ দেব শর্ম
৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্মণে শ্রীমতা ভোজ
৪৬। বর্মদেবেন পূণ্যে অহনি বিধিবদুক পর্বকৎ কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেব ভ
৪৭। ট্টাবক মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভি বৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষি
৪৮। তি সমকালং যাবদ্ভুমি চ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীবিষ্ণু চক্রমুদ্রায়া তাম্রশা
৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তা স্মাভিঃ।। ভবন্তি চাত্র ধর্মনুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।
৫০। স্বদত্তাম্পরদত্তা স্বা যো হরেত বসুন্ধরাম সবিষ্ঠায়াং কিমির্ভূত্বাং পিতৃভিঃ সহ প চাতে।।
৫১। শ্রীমদ্ভোজ দেব পাদীর সম্বৎ ৫ শ্রাবণ দিনে ১৯ নি অনুমহাক্ষনি।

ওঁ সিদ্ধি। স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে অত্রিমুনি স্বয়ম্ভুর অপত্য ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন (১—২)।

তাহা (চন্দ্রমা) হইতে রৌহিণের বুধ এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরুরবা জন্মগ্রহণ করিয়া কীর্তি এবং উর্বশী এবং বসুন্ধরা কর্তৃক স্বয়ংবৃত হইয়াছিলেন। (২—৩)।

সেই মনুপ্রতিম (পুরূরবা) আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। রাজা আয়ু হইতে ভূপাল নহুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। (৩—৫)।

এই বংশে পূজ্য-পুরুষ, অংশাবতীর, মহাভারতের সূত্রধার গোপী শতকোলীকার শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন। (৫—৭)।

ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) পুরুষের আবরণ। তাহার (বেদবিদ্যার) অভাব ছিল না বলিয়াই অনগ্না, ত্রয়ী বিদ্যার এবং অদ্ভুত সময় ক্রীড়ায় আনন্দহেতু রোমোদগম দ্বারা বর্মিণঃ হরির বান্ধব সমূহ "বর্মন" এই গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া সিংহ বিবরতুল্য সিংহপুর নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। (৭—৯)।

অনন্তর কোনও সময়ে বজ্রবর্মা যাদবীয় সৈন্যের মঙ্গলময় এবং অপ্রতিহত বিজয়শ্রীর হেতুভূত হইয়াছিলেন। তিনি অরিকূলের শমন, বান্ধবগণের চন্দ্র, কবিকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন। (১০—১১)।

শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্মা হইতেও জাত্রবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত এবং যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। (১১—১৩)।

তিনি বৈণ্য পৃথুশ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের ভূজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রীয় সাৎ করিয়া, সার্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। (১৩—১৫)।

জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান সামল বর্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি আর বলিব? (যেমন) সেই অখিলভূপগুণোপন্ন আমার প্রভূতে কিয়ৎ পরিমাণেও দোষ স্পর্শ করে নাই। (১৫—১৭)।

সেইরূপ প্রভৃত প্রতাপশালী বীরগণ মধ্যেও উদয়ীসুনু বীরসমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রহাস নামক খড়্গ ফলকে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। (১৭—১৮)

সেই জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কামদেবের বৈজয়ন্তী রূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিল। (১৮—১৯)।

অশেষ ভূপাল-কন্যাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তিনিই (মালব্যদেবী) সামল বর্মার অগ্রমহিষী ছিলেন। (১৯—২০)।

উভয়কূল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্মা নামে তাহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না; অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন। (২০—২২)।

হা ধিক! কষ্টের বিষয়, অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। তবে কি আবার রাক্ষসগণের উৎপাৎ উপস্থিত? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবণ শূন্য বা শত্রুশূন্য। (এই রাজাভোজ) কুশলী হউন। এইরূপে বাগ্‌ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া গুণগাথাসমূহে পুরষোত্তম যাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন :

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী) হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্মাদেব পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ শ্রীপুণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে, কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল উষ্যালিকা গ্রামে, গুবাকাদি সমেত সপাদ নবদ্রোণাধিকপাটক ভূমিতে (এক পাটক সোয়া নয় দ্রোণ পরিমিত) সমুপগত সমুদয় রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাত্য, পুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি, বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাভোগিক, মহাব্যূহপতি, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃ সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলব্যাপৃতক, হস্তিব্যাপৃতক, অশ্বাব্যাপৃতক, মহিষ ব্যাপৃতক, অজ ব্যাপৃতক, অবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, প্রভৃতি এবং অধ্যক্ষ প্রচারোক্ত কিন্তু অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবিদিগকে চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসীগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তম গণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—সকলের অভিমত হউক, স্বসীমাবচ্ছিন্ন তৃণ-পুতি গোচর পর্যন্ত সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সলবণা সজলাস্থালা সগর্ত্তোষরা, যাহার (যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতীগৃহীতার)। দশটি অপরাধ সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট, ভাট জাতীয় প্রবেশাধিকার বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না রাজভোগ্যকর ও হিরণ্যপ্রত্যয় সহিত, উপরিলিখিত ভূমি সাবর্ণ্য গোত্রীয়, ভৃগুচ্যবন আপ্নবান, ঔব, জমদগ্ন প্রবর রাজসনের চরণোক্ত যজুর্বেদের কণ্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্মাকে এই পুণ্য দিনে বিধিবৎ উদক স্পর্শপূর্বক ভগবান বসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া, মাতাপিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য, চন্দ্র সূর্য ক্ষিতি সমকাল পর্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীভোজ বর্মদেব প্রদান করিলাম। এতদ্বিষয়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোক আছে—স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যিনি ভূমি হরণ করিবেন তিনি বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ভোজ বর্মদেব পাদীয় রংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে ৫৮ নি (বদ্ধ)। অনু। মহাক্ষ (পটলিক) নি [বদ্ধ]।

পরিশিষ্ট (খ)

১৬৬৩।৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার অস্থায়ী সুবাদার দায়ুদখাঁর সময়ে ঢাকাতে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহা আমরা ১৮শ অধ্যায়ে লিখিয়াছি। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সায়েস্তাখাঁর শাসনসময়েও তাহার জের মিটে নাই। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলায় বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় এবং আত্মবিক্রয় করিয়া উদর পালনের চেষ্টা করিয়াছে। মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন হইত। এতৎসম্পর্কীয় যে একখানা দলিলের অনুলিপি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গারাম নামধেয় জনৈক চণ্ডাল স্ত্রী পুত্র কন্যাসমেত অষ্ট মুদ্রায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। মনুষ্য বিক্রয়ের যত খানা দলিল এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই খানাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

মনুষ্য বিক্রয় দলিলের নকল :

"ও সমস্ত সুপ্রসন্নালঙ্কৃত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ সুল্লতান বগদাদশাহ আরঙ্গজেবশাহ দেবপালাভ্যুদায়িণী শুভরম্ভে তন্নিযুজিতা গাওমণ্ডলাধিপ শ্রীমৃত খানখানান জনাধিকার চতুরশিত্যধিক পঞ্চাদশ শত শকাব্দে সুল্লুতান প্রতাপ জায়গিরদার শ্রীযুক্ত শাহমুরাদবেগ মহাশয়া নামাধিকারে ধামরাই গ্রামান্তর্গত কায়স্থ পাড়া, বাস্তব্য শ্রীগোপচন্দ্র চক্রবর্তীনঃ সভায়ামনেক দ্বিজ স্বজ্জনাধিষ্ঠিতায়া তথা কায়স্থপাড়া বাস্তব্য শ্রীরামজীবন মৌলিকতসকাযাদষ্টমুদ্রা গৃহীত্বা বিক্রমপুর নিবাসী চণ্ডাল শ্রীগঙ্গারাম নামানং স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেতং স্বেচ্ছায়া লিখিতং বিত্তং দাতৃ-স্থানে আত্মানং বিক্রীতবানিতি। সন ১০৬৯।২৭ মাঘস্য

শ্রীগঙ্গারাম চণ্ডালস্য পুত্রঃ
অত্র লেখ্য সাক্ষীনঃ।
চন্দ্রশেখর দেবশর্মা। রাঘবানন্দ দাসঃ।
রাধাবল্লভ দেবঃ।
রাজমাছি সাং ডভারি।

পরিশিষ্ট (গ)

দেবালয়াদি। বীরভদ্রাশ্রম :
ঢাকা শহরের এক্রামপুর নামক মহল্লায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রগোস্বামীর নামানুসারে এই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রচার-কার্যে ব্রতী হইয়া বীরভদ্রগোস্বামী ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধভাগে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস যে "নিত্যানন্দ বংশাবলী" রচনা করেন, তাহাতে বীরভদ্রগোস্বামীর ঢাকায় আগমনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বীরভদ্রগোস্বামীর চেষ্টায় ঢাকার অধিকাংশ নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, বীরভদ্রগোস্বামীর উদ্যমে সেই প্রেম বন্যার বীচি বিক্ষেপ ঢাকা পর্যন্তও আসিয়া পৌছিয়াছিল।

জয়দেবপুরের ইন্দ্রেশ্বর :
জয়দেবপুরের পূর্বনাম পাড়াবাড়ি। ভাওয়ালের রাজবংশের পূর্বপুরুষ জয়দেব রায়ের নামানুসারে উহার নাম জয়দেবপুর রাখা হয়। জয়দেব রায়ের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি স্বীয় আবাস ভূমির পোয়া মাইল পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ইন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে এই শিব ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়। এই স্থান শিববাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখনও ঐ শিব ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জয়দেবপুরের নীলমাধব :
জয়দেবপুরের রাজবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ পুষ্করিণী খননকালে প্রস্তরময় এই মাধব মূর্তি প্রাপ্ত হন। তিনি মহাসমারোহে এই মাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি উহার পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান সময়ে নীলমাধব জয়দেবপুরের রাজবাটিতে গৃহদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জনসাধারণের পূজাপোচার গ্রহণ করিতেছেন। এক সময়ে মাধবরূপী বিষ্ণুর পূজা ঢাকা জেলায় অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। ভাওয়ালের নানাস্থানে "মাণিক মাধব" "জটামাধব" "বেণীমাধব" প্রভৃতি মূর্তি পূজিত হইতে দেখা যায়।

কাতলাপুরের আখড়া :
সাভারের সন্নিকটবর্তী কাতলাপুর নামক স্থানে কানাইলাল নামক বিগ্রহের আখড়া বিদ্যমান আছে। আখড়াটি প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আনন্দরাম মাঝি কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। কানাইলালের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত। কানাইলাল বিগ্রহ ব্যতীত এই স্থানে আরও দুটি প্রাচীন মূর্তি রহিয়াছে। ইহার একটি নরসিংহ মূর্তি এবং অপরটি চতর্ভুজনারায়ণ মূর্তি।

কানাইলাল সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আনন্দীরাম মাঝি জাতিতে জালিক ছিল। সে নবাব সরকারের নৌকা বাহিত। একদা পদ্মানদী অতিক্রমকালে আনন্দীরাম নৌকার ভিতর হইতে শুনিতে পাইল, কে তাহাকে "আনন্দী রাম" "আনন্দী রাম" বলিয়া ডাকিতেছে। আনন্দী রাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল "কে আপনি?" উত্তর হইল, "আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি কানাইলাল, পাষাণ মূর্তিতে নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন আমাকে উঠাও, আমি আর নদীগর্ভে থাকিব না।" আনন্দী রাম উঠাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে

দেববাণী হইল "জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই আমাকে উঠাইবে।" আনন্দী রাম তদনুসারে কার্য করিয়া কানাইলালকে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। পুনরায় দৈববাণী হওয়াতে তাঁহাকে তথা হইতে কাতলাপুরে আনা হইয়াছে। আখড়াটি জনৈক জালিক কর্তৃক পরিচালিত। উহার ৩ খাদা ৫ পাখী দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দির ইষ্টক নির্মিত।

প্রতিভা—১৩১৯ সন কার্তিক সংখ্যা।

সাবারের মহাপ্রভু ও কোণ্ডার গোবিন্দ জিউ : সাভার নিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ পালের দয়ারাম, রামমোহন, গোকুল ও মায়ারাম নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দয়ারাম অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোক ছিলেন। সাভার গ্রামের কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত ষড়ভুজ মহাপ্রভু এবং কোণ্ডা গ্রামের গোবিন্দজিউ বিগ্রহ ইনিই স্থাপনা করেন। গোবিন্দজিউর সেবার জন্য, ধামরাই গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে নলাম নামক স্থানে কতক ভূমি ও তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

লাঙ্গলবন্ধের বিগ্রহাদি : ব্রহ্মপুত্র নদের যে শাখাটি সোনারগাঁয়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া লাক্ষ্যানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই লৌহিত্য শাখার পশ্চিমতটে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া কতকগুলি দেবালয় বিরাজমান রহিয়াছে। এখানকার সমুদয় বিগ্রহের মধ্যে জয়কালীই প্রসিদ্ধ ও পুরাতন। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে বারপাড়ার মিত্র বংশের কুলপুরোহিত বারপাড়া নিবাসী মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী মৃন্ময়ী জয়কালী মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, লৌহিত্য তটে কালী স্থাপনের জন্য মাধব শর্মা কামাখ্যাতে মহামায়া কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

পুরাতন মন্দিরটি জীর্ণ হওয়াতে ভক্তেরা সুন্দর একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এযাবৎ অনেকবার জয়কালীর কলেবর সংস্করণ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের মনে এরূপ সংস্কার যে জয়কালী সমীপে কোনরূপ অভাব মোচনের জন্য মানস সংকল্প করিলে অচিরে সংকল্প-সিদ্ধি হয়। জয়কালীর বাড়ির সংলগ্ন দক্ষিণে একটি মঠের অভ্যন্তরে শিব স্থাপিত আছেন। শিবের অবস্থানগৃহ পূর্বে ঝিকটি ঘর ছিল; তৎপরে পঞ্চরত্ন মঠ নির্মিত হইয়াছে। জয়কালী স্থাপয়িতা মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর ভগিনী জয়কালী স্থাপনের সমকালে এই শিব স্থাপন করিয়াছেন। কালীঘাটস্থ কালিকা দেবীর যেমন নকুলেশ্বর ভৈরব, সেইরূপ জয়কালীদেবীর ভৈরব এই শিব বটে।

এই শিবালয়ের দক্ষিণে রক্ষাকালীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে নাট-মন্দির এবং পূর্বদিকে ঘাট বিরাজিত। রক্ষাকালী মূর্তিটি শিবসিংহবাহিনী। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে বারপাড়ার মিত্র বংশের অন্যতম কুলপুরোহিত কাশীনাথ চক্রবর্তী এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। রক্ষাকালী মূর্তিটি পূর্বে মৃন্ময়ী ছিল, সম্প্রতি দারুময়ী হইয়াছে।

রক্ষাকালী বাড়ির দক্ষিণে পাষাণময়ী কালী একখানা টিনের ঘরে স্থাপিত। ইহার পূর্ব-দক্ষিণদিকে একটি ঘাট আছে, দুপতারা নিবাসী দয়াময়ী চৌধুরাণী স্নানযাত্রীর সুবিধার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল এই ঘাটটি নির্মাণ করিয়াছেন।

এই ঘাটের দক্ষিণদিকে বৃহৎ একটি বটগাছ। এই বটতলারই নাম প্রেমতলা। চৈত্র মাসে বটতলাতে তিন-চারি শত বাউল-বাউলিনী সমবেত হইয়া নৃত্যগীতে ছয়-সাত দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকে। এখানেও একটি মৃন্ময়ী কালীমূর্তি স্থাপিত আছে।

প্রেমতলার নাতিদূরে ক্ষুদ্র একটি ইষ্টক গৃহে গৌর-গদাধর যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। চরগঙ্গারাম-নিবাসী গোস্বামীগণ কর্তৃক এই যুগল মৃণ্মূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে অপর একটি কালীবাড়ি প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বন্দর-নিবাসী কীর্তিনারায়ণ চৌধুরি এই মৃন্ময়ী কালীমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং এখানে লৌহিত্য জলে একটি ঘাট নির্মাণ করিয়াছেন।

কীর্তিনারায়ণ চৌধুরির পৌত্র কালীনারায়ণ চৌধুরি কালীকাদেবীর নবসংস্করণ করিয়াছেন, এবং সুন্দর একটি মন্দির এবং মন্দিরের দক্ষিণভাগে একটি পঞ্চরত্ন মঠ নির্মাণ করিয়াছেন।

জয়কালীবাড়ির উত্তরে বরদেশ্রবী নামে অষ্টভুজা মৃন্ময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। ইহার পূর্বদিকে বারপাড়া নিবাসী রামভদ্র মিত্র কর্তৃক নির্মিত দুইশত বৎসরের পুরাতন একটি ঘাট ছিল। উহা রাজঘাট নামে পরিচিত ছিল। সেই ঘাটটি জীর্ণবিদীর্ণ হওয়াতে, উহার উপরে অপর একটি নতুন ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। বালিয়াটি-নিবাসী শাহা বাবুগণ এই নতুন ঘাটের নির্মাতা। বরদেশ্বরীর বাড়ির উত্তরভাগে শ্মশানভূমির উত্তরে খাল, খালের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত গৌর-নিতাই স্থাপিত। ইহার উত্তরে, বাজারের পূর্বদিকে একটি বৃহৎ ঘাট বিরাজিত। এই ঘাটটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া সকলে অনুমান করে। ইহা বলরামের ঘাট নামে খ্যাত। সোপানগুলি স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইলে স্থানীয় জমিদার কর্তৃক কিছুদিন পূর্বে উহা মেরামত হইয়াছে। ঘাটের দুই পার্শ্বে উদাসীন সন্ন্যাসীদিগের বাসের নিমিত্ত যে দুইটি কোঠা ছিল তাহা ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইলে পুনরায় নির্মিত হয় নাই। ইহার উত্তরে আধুনিক নির্মিত সুন্দর একটি সেতু। সেই সেতুর স্থানে পূর্বে একটি পাকা পুল ছিল, উহা ভূমিকম্পে পতিত হইয়াছে। সেতুর উত্তরে ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত অপর মৃণ্ময়ী কালীমূর্তি মাধব ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এই কালীবাড়ির উত্তরে অন্নপূর্ণার বাড়ি। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে মৃন্ময়ী অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠিতা। অন্নপূর্ণার বাড়ির পূর্বাংশ একটি ঘাট শোভিত। ত্রিশ বৎসর অতীত হইল এই ঘাটটি স্থানীয় কুম্ভকারগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

নাঙ্গলবন্ধ, তাজপুর, গোপালনগর, চরগঙ্গারাম, এই চারি স্থানেই বর্ণিত বিগ্রহ সমুদয় অধিষ্ঠিত। এই চারিটি স্থান নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনের উত্তর-পূর্ব কোণে চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে দুইটি মহাতীর্থ—একটি চন্দ্রনাথ, অপরটি জয়কালী পদাশ্রিত লৌহিত্য। অধিকাংশ লোকের এরূপ বিশ্বাস—এখানে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়। অশোকাষ্টমী ব্যতীত, আষাঢ়ী পূর্ণিমা স্নান উপলক্ষ্যে এখানে যে আর একটি ক্ষুদ্র মেলা গঠিত হয়, ইহাতে ২-৩ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়—অধিকাংশই স্ত্রীলোক যাত্রী। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, চূড়ামণি, অর্ধোদয় প্রভৃতি যোগ উপলক্ষ্যে এখানে সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত যোগ স্নানই লৌহিত্য শাখার পশ্চিম পারের ঘাটসমূহে সম্পাদিত হয়। পূর্ব পারে অতি সুন্দর ঘাট থাকা সত্ত্বেও যাত্রীদের কেহ পূর্বপারে অবগাহন করে না। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "লৌহিত্যাৎ পশ্চিমভাগে সদাবহতি জাহ্নবী"। লোকের এরূপ বিশ্বাস যে পশ্চিম পারেই লৌহিত্য স্নানের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়. পূর্ব পারের স্নান অপুণ্যজনক।

এতদ্দেশে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে লৌহিত্য শাখার পূর্ব পারের প্রদেশ সমুদয় পাণ্ডববর্জিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পাণ্ডববর্জিত বলিলে সেই সকল প্রদেশে পাণ্ডবেরা যান নাই, অথবা উঁহাদের অধিকার ছিল না. এরূপ বুঝিতে হইবে না ; পাণ্ডবদিগের শাসনকালে যে সকল ধর্মানুযায়ী আচার-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। লৌহিত্য শাখার পশ্চিমপারের দেশসমূহে পাণ্ডবীয় ধর্মাচারের যে আংশিক ব্যত্যয় না ঘটিয়াছে এমন নহে. কিন্তু পূর্ব পারের দেশসমুদয় অধিক পরিমাণে পাণ্ডবীয় ধর্মাচারভ্রষ্ট। কাহারই অবিদিত নাই. লৌহিত্য শাখার পূর্বতীরবর্তী দেশসমূহে বাস করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলিন্য বজায় থাকে না। লৌহিত্য শাখার পূর্বতীরবর্তী দেশ পাণ্ডববর্জিত এই উক্তি বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে—অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

আদমপুরার শিববাড়ি : আদমপুরার মদনমোহন ভৌমিকের পত্নী শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী

দেবী একদা তদীয় পিত্রালয় সম্মান্দী গ্রামে আগমন করিয়া এক পুকুরপারের বেলবৃক্ষমূলে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে সংজ্ঞালাভ করিলে প্রত্যাদেশ হয় যে এই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে, মহাদেবমূর্তি প্রোথিত আছে। তদনুসারে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় তথায় শ্বেতপ্রস্তরময় অনিন্দ্যসুন্দর মহাদেব ও একটি বৃষমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মহাদেবের এক হস্তে শিঙ্গা, কর্ণে ধুস্তুরপুষ্প, বক্ষে ও কটিদেশে কপালমালা বিরাজিত। মূর্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। উচ্চতা কিঞ্চিদধিক এক ফুট হইবে। এই মূর্তি এক্ষণে আদমপুরা গ্রামে পূজিত হইতেছে। বহু দূরদেশান্তর হইতে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোক রোগমুক্তি কামনায় এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

সোনারগাঁয়ের ডরাই-দেবী : "প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে, এক জাতীয় লোক বাস করে, ইহারাই এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। পুরাকালে ইহাদের বাহুল্য ছিল। এই জাতিকে মোসলমান রাজত্বের সময়েও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুবধরূপ কিরাত ব্যবসায় করিতে হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত "ডঁই" বা "ডোঁয়াই" বলিয়া একটি কথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দু শাসন-সময়ে এই সম্প্রদায়ের উপর রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কিরাত ব্যবসায়জনিত পাপ বিমোচনার্থ ইহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। প্রাকৃত ভাষায় ডণ্ডী বলিয়া একটি শব্দ আছে, উহা হইতে ডঁই বা ডোঁয়াই শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। ডণ্ডী শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পুরাকালে এই আদিম শূদ্রজাতীয় লোকেরা ডঁরাইদেবীর উপাসনা করিত। সোনারগাঁয় এই দেবীর উপাসনা আজও প্রচলিত আছে। ডরাই-পূজায় অনেক অনার্যোচিত কার্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ডরাই দেবী অনার্য দেবী ছিলেন এবং কালক্রমে মনসার বা দ্বিহস্ত দানবমাতা বনদুর্গার মূর্তিভেদে পরিণত হইয়াছেন। যদিও ডরাই-পূজায় কোথাও কোথাও বনদুর্গা বা মনসা আনীত হন, তথাচ বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ মনসা পূজার সহিত তুলনায় ডরাই-পূজা সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। মনসা-পূজা শ্রাবণের সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু ডরাইদেবীর পূজার নির্ধারিত কাল নাই। কোথাও কোথাও নব-গর্ভিনীর ভীতি বিনাশার্থ ডরাইদেবীর কালক্রমে-সংশোধিত পাঁচালি গীত হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে আবার নপুংসকের গান, ডরাই পূজার এক প্রধান অঙ্গরূপে আজও প্রচলিত আছে। পুরাকালে ডরাই-পূজায় কোনও মূর্তির সংশ্রব ছিল না, কেবল পাঁচালিই গীত হইত।

বাঘরার বাসুদেব : বাঘরা অতি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থান বিক্রমপুরের পশ্চিমসীমায় মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঘরার পশ্চিমপ্রান্তে বিধৌত করিয়া "সাতার" নাম্নী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিক্রমপুরের পশ্চিমসীমা-রেখারূপে প্রবাহিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে করাল-রূপিণী পদ্মা বিক্রমপুরের অনেকানেক স্থান কুক্ষিগত করিলে, তদীয় স্রোতোবাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা সাতারকে ক্ষীণতোয়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্তমান সময়ে সাতার একটি খালে পরিণত হইয়াছে।

প্রায় দ্বিশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সরকার, ভট্টাচার্য ও আচার্য এবং কায়স্থগণের মধ্যে মাঝি বংশের আধিপত্য ছিল। ইহার কিছুকাল পরে চক্রবর্তী বংশ অন্যস্থান হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই চক্রবর্তী বংশীয় জনৈক পূর্বপুরুষ বাসুদেব মূর্তি প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, এই গ্রামে "চাঁদরায়ের দীঘি" নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয় ছিল। ঐ দীঘিতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ গোপ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পৌষ-সংক্রান্তি দিন মৎস্য ধরিবার জন্য জলে নামে; এই সময়ে পূর্বোক্ত চক্রবর্তী বংশের একজন প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব প্রাপ্ত হন। বাসুদেব প্রাপ্ত হইবার রাত্রিতেই প্রত্যাদেশ হয়, "এই দীঘির সন্নিকটবর্তী পশ্চিমদিকস্থ পুষ্করিণীতেই আসন ও পূজা পদ্ধতি পাওয়া যাইবে।" বস্তুত তৎপর দিবস "আম্বলি" বংশের

জনৈক ব্যক্তি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ পূজাপদ্ধতি এবং গোপগণের মধ্যে একজন প্রস্তর-নির্মিত আসনপ্রাপ্ত হন। এই তাম্রফলকখানা বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাসুদেব প্রতিষ্ঠা লইয়া চক্রবর্তী ও আম্বলিদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। একপক্ষ বলেন, "ঠাকুর দিব না", অপরপক্ষ বলেন, "আসন দিব না।" গোপগণ আসনের দাবি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এতদুপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে অনেক মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দেন যে, ঠাকুর ঐ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৎসরের মধ্যে ছয়মাসকাল একপক্ষের বাড়িতে এবং অপর ছয়মাস অপরপক্ষের বাড়িতে থাকিবেন। ইহাতে বৎসরের পর্বগুলি উভয়ের পালায় সমানভাগে পড়ে না, সুতরাং উভয়পক্ষের আয়ের তারতম্য হইতে থাকে। এই আয়ের তারতম্যহেতু অভিনব বিরোধের কারণ উপস্থিত হয়। ফলে উভয়পক্ষকেই রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় (১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে) মিঃ ওয়ালটার ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি প্রত্যেক পক্ষকেই চারিমাসকাল সেবার অধিকারী করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এইরূপে চারিমাসকাল এক বাড়িতে এবং তাহার পরের চারিমাসকাল অন্য বাড়িতে ঠাকুরকে থাকিতে হয়, যেন ১৬ মাসে বৎসর শেষ হইয়া প্রত্যেক পর্ব যথাক্রমে উভয়ের পালায় পড়ে। এই চারিমাস পালার নাম এক "বতর"। আজ পর্যন্তও এইভাবেই উভয় বংশের বংশধরগণের মধ্যে পালানুসারে পূজা চলিতেছে।

পূর্বোক্ত আম্বলি-বংশের কেহই নাই। সেই বংশের একটি দৌহিত্র সন্তান এখন বাসুদেবের সেবাইত। চক্রবর্তী বংশের মধ্যেও এখন একমাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল চক্রবর্তী মহাশয় আছেন। অন্যান্য হিস্যা দৌহিত্রে পর্যবসিত, কতক বা বিক্রীত হইয়া পূর্বকথিত সরকার বংশে আসিয়াছে।

এই বাসুদেব কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, গরুড়াসনোপরি সংস্থিত। উপরের চালায় দুই ধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং মধ্যস্থলে ভগবানের দশাবতার খোদিত।

মালধার কালী : বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ গ্রামের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ নাদিমশার দীঘির অনতিদূরে মালধা গ্রামে কালীকা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ এই দেবী জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। একটু বিশেষত্ব এই যে লোলরসনা এই কালীকাদেবীর মস্তকটি মাত্র একটি ঘটের উপরে স্থাপিত আছে। ঘটোপরি যে একটি নারিকেল ফল আছে তাহারই একদিকে দেবীর মুখমণ্ডল নির্মিত হইয়াছে। এই মুখমণ্ডল কতিপয় বৎসারান্তে পরিবর্তিত করিয়া অভিনবভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটি মেলা জমিয়া থাকে। এই সুরম্য স্থানটিতে আগমন করিলেই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। বস্তুত এইরূপ স্থান বিক্রমপুরে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কামারখাড়ার ত্রিবিক্রম :

প্রাচীন কাঁচাদিয়া গ্রাম কীর্তিনাশের কুক্ষিগত হইলে ঐ গ্রামবাসী অনেকানেক লোক কামারখাড়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র সেন মহাশয় কামারখাড়া গ্রামে স্বীয় বাসভবন-নির্মাণ করিবার বহুকাল পরে "রাম ভদ্রের ছাড়া" নামক একটি জঙ্গলাবৃত স্থান ক্রয় করেন। তিনি ১৯২৭ বঙ্গাব্দে ঐ স্থানের "মঘ্যাই দীঘির" সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিয়া কার্যারম্ভ করেন। খননের পূর্বে পুকুরের জল নিষ্কাশিত করা হইলে একটি কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ স্তম্ভ তথায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভটি উত্তোলনের জন্য বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে স্থানচ্যুত করা সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।

এদিকে "দেবাংশি" পুকুর বলিয়া একটা জনরব উঠিল। মাঠিয়ালগণ এ সকল কথা শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। সুতরাং ঐ বৎসর খননকার্য স্থগিত রহিল। উক্ত সেন মহাশয়

পরলোকগমন করিলে পিতার অনুষ্ঠিত কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তৎপরবর্তী বৎসরে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয় বহুলোক সংগ্রহপূর্বক খননকার্য আরম্ভ করেন। খনন করা সত্ত্বেও সুদূরপ্রোথিত সেই সুমার্জিত স্তম্ভটি উত্তোলন করা সম্ভবপর হইল না। পরে ২৫শে ফাল্গুন তারিখে খনন করিবার সময়ে এই অনিন্দ্যসুন্দর ত্রিবিক্রম মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। চালি সহিত মূর্তিখানা প্রায় ১৩-১৪ ইঞ্চি হইবে। এই গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্তিটির মস্তকে কিরীট, এবং বক্ষদেশ বৈজয়ন্তীমালা ও যজ্ঞসূত্রে পরিশোভিত। পার্শ্বদ্বয়ে কমলা ও ভারতী মূর্তি দণ্ডায়মান। প্রস্ফুটিত শতদলোপরি মূর্তিটি অবস্থিত। পাদদেশে অষ্টধাতু নির্মিত গরুড়মূর্তি করজোড়ে দণ্ডায়মান। চালিখানাও অষ্টধাতুবিনির্মিত। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় মূর্তিগুলি রজতনির্মিত। ১২৯৮ সনের দোলপূর্ণিমা তিথিতে এই মূর্তিটি স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। এই দেবমূর্তির বিষয়ে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়।

বাঘিয়ার শিববাড়ি : মেঘনাদের শাখা "আকালমেঘনদ" হইতে যে সুপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালি উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত তাহা বাঘিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই খালের অনতিদূরে বাঘিয়া গ্রামে সায়েস্তাখানি ধরণে নির্মিত কেবলমাত্র খিলানের উপরে গ্রথিত একটি সুদৃশ্য মন্দির মধ্যে পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, বাঘিয়া নিবাসী ৺রূপরাম গুপ্ত মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া লস্করদিঘি নামক প্রশস্ত দীর্ঘিকা এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত শিবপ্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘিকা উৎসর্গের উদ্বৃত্ত ও প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তদীয় পুরোহিত ৺মুক্তরাম ঘোষাল মহাশয় স্বতন্ত্র একটি প্রকাণ্ড জলাশয় এবং উহার তীরদেশে একটি মন্দির নির্মাণপূর্বক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর সোপানাবলি নির্মাণ করিবার সময়ে যে দুইটি কাষ্ঠনির্মিত স্তম্ভ জলমধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাঘিয়ার এই শিব অতি জাগ্রত। প্রায় দ্বিশত বৎসর যাবৎ ইনি জনসাধারণের পুজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

যুচবনী তলা :

ঢাকা হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে, ধলেশ্বরীর পশ্চিম এবং ইছামতীর দক্ষিণে ও পূর্বতীরে পালদিয়া গ্রাম অবস্থিত। বিখ্যাত তালতলার খাল এই গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ধলেশ্বরীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী দুইটি মেলা এইস্থানে জমিয়া থাকে। গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে যে মেলাটির অধিবেশন হয়, তাহা স্থাপয়িতার নামানুসারে "লক্ষ্মীঘোষেরমেলা" বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমভাগের মেলাটি সুবচনীর মেলা নামে অভিহিত। এই শেষোক্ত স্থানে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ চতুর্দিকে স্বীয় শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ সর্ববিধ্বংসীকালের ধ্বংসনীতি উপেক্ষা করিয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষটি সর্বসাধারণের নিকট 'সুবচনী' বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার পাদদেশ অসংখ্য হিন্দুনরনারী কর্তৃক তৈল ও সিন্দুরানুলিপ্ত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। রিপুমুক্তি কামনায় অথবা পুত্রের বিহার অন্তে নববধুর সুবচনী অর্থাৎ প্রিয়বাদিত্ব প্রার্থনা করিয়া মাতা সুবচনীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। সুবচনীদেবীর অর্চনা এইস্থানে সংসাধিত হয় বলিয়া স্থানের নাম "সুবচনীতলা" এবং মেলার নাম "সুবচনীর মেলা" হইয়াছে। মেলার সময়ে "বেঁদের গান" নিম্নশ্রেণির গৃহস্থগণের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে।

বালুশাইর দুর্গাবাড়ি :

ঈশাখাঁ মসনদআলি মোগলের পতাকামূলে স্বীয় গর্বোন্নত মস্তক লুণ্ঠিত করিলে বাদশাহ আকবর তাঁহার দরবার ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটি অমাত্য প্রেরণ করেন। এই দ্বাদশ জন অমাত্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল মির্জামহম্মদ খোদানেওয়াজ খাঁ। ইনি পারস্য সম্রাট শাহ তমাসুপের

জনৈক ওমরাহের পুত্র। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যরাজের নিকট হইতে নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এই সময়ে মির্জা মহম্মদ খোদানেওয়াজ খাঁও পারস্য সৈন্যের অধিনায়ক স্বরূপ তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময়ের প্রথমভাগে ইনি কোনও একটি রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ঈশাখাঁর দরবারে অমাত্যরূপে প্রেরিত হন। স্বীয় প্রতিভাবলে ইনি ঈশাখাঁর নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মহেশ্বরদি পরগনায় একখণ্ড বৃহৎ ভূমি জায়গিরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় স্বীয় বাসোপযোগী স্থান নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত স্থানের নাম "বালুশাইর" প্রদান করেন। ইনি মির্জা আবদুল করিম খাঁ ও মির্জা মহম্মদ ফরিদ খাঁ নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। আবদুল করিম একজন প্রসিদ্ধ তাপস ছিলেন। আরবি ও পারসি ভাষায় ইনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, আবদুল করিম অন্যের মনোগত ভাব বলিয়া দিতে পারিতেন এবং যোগ বলে লোকলোচনের অন্তরাল হইতে পারিতেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পবিত্র সমাধিস্থান "দুর্গাবাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। এখনও তাঁহার নামে লোক মানস ও সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে।

খাজাখিজির :

খাজাখিজির সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহার বিষয়ে মোসলমানগণ মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। কোরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মুসা ও জসুয়ার অল্‌খেদর বা জুলকরনাইন এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে গ্রিকবীর অলিকসন্দর জুলকরনাইন নামে পরিচিত। এজন্য অনেকে অলিকসন্দরের সহিত খাজাখিজিরের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী। আবার অনেকে ইহাকে ইলিয়াস বা ইলিজা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক। ইলিয়াস জীবন-নির্ঝর (আব-ই-হায়েৎ) আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। প্রতীচ্য সাহিত্যে খাজাখিজির অপরিচিত নহে। Parnell এর Hermit কবিতা, এবং Voltaire এর Leading পুস্তিকায় 'L' Ermite প্রসঙ্গে খাজাখিজিরের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। Deutsch বলেন, Talmud এ ইলিজা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমর দেবযোনী বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি আরবদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এরূপ লিখিত আছে। আবার কেহ কেহ ইহাকে জুলকরনাইন বা কৈকোবাদের সহচর, উপদেষ্টা এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এশিয়া মাইনরে খিজির ইলিয়াস St. George of Cappadocia নামে পরিচিত।

বর্তমান সময়ে খাজাখিজির ভারতীয় নদ-নদী এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থানপূর্বক বিপন্ন নাবিকদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। চল্লিশ্ দিনব্যাপী কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া খাজাখিজিরের দর্শন লালসায় তন্ময় চিত্তে নদীতীরে অবস্থান করিলেই নাকি তাঁহার দর্শন লাভ সুলভ হয়। সর্বসম্প্রদায়ের মোসলমানগণ বিপদুদ্ধরণের জন্য, রোগ মুক্তি কামনায়, অথবা সন্তান লাভ মানসে ইহার পুজোপোচার প্রদান করিয়া থাকে।

ঢাকার নবাব মকরমখাঁর সময়ে বাংলার মোসলমানগণের এই পর্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বে এই পর্ব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এতদুপলক্ষ্যে ঢাকায় সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দিক হইতে কদলীবৃক্ষ ও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত তরণী, গৃহ ও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসব "বেরা" উৎসব নামেও পরিচিত। পূর্বে তিনশত হস্ত বিস্তৃত আলোকযানও প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মোসলমানেরও বেরা থাকিত। বুড়িগঙ্গা বক্ষ এইরূপে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া নয়ন মনোরম অপূর্ব শোভা ধারণ করিত। এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার

প্রদোষে আদ্রক, তণ্ডুল ও কদলীমণ্ডিত নৈবেদ্যসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেয়। মোসমানগণ ব্যতীত জালিক ও নমঃশূদ্রগণ কর্তৃকও এই পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

Vide J. A. S. B. 1894 : Quarterly Review 1869.
বাংলার ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বড় কাটরার শিলালিপি : বড় কাটরার তোরণ দ্বারে পারস্য ভাষায় লিখিত যে একখণ্ড প্রস্তর ফলক বিদ্যমান ছিল তাহার অস্তিত্ব অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত শিলালিপির ইংরাজি অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। সম্ভবত এই প্রাসাদ প্রথমে সম্রাটতনয় শাহ-সুজার আবাসভবন স্বরূপেই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহা মনোমত না হওয়ায় সরাইখানাতে পরিণত হয়। এতৎসংলগ্ন দ্বাবিংশতি পণ্যশালার আয় দ্বারা সমাগত যাত্রীদিগের অভাব বিমোচন এবং এই প্রাসাদের সংস্কার সাধিত হইবে বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপিখানা সাদুদ্দিন মহম্মদ সিরাজি কর্তৃক লিখিত।

"Sultan Sha Shuja was employed in the performance of Charitable acts. Therefore Abul Kassem Tubba Hosseinee Ulsummance, in the Hopes of the mercy of God, erected this building of auspicious structures, together with twenty-two Dookans, or shops adjoining to the end that the profits arising from them be solely appropriated by the agents, overseers, to their repairs and the necessities of the indigent, who on their arrival are to be accommodated with lodgings free of expenses. And this condition is not to be violated lest on the day of retribution the violator be punished. This inscription was written by Sadadoordeen Mahammed Sherazee".

Vide Glimpses of Bengal.

কয়েকটি সংশোধিত কথা :

রমণার কালীবাড়ির মঠটির শীর্ষদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া গেলে গভর্নমেন্ট কর্তৃক সংস্কৃত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঐ মঠের সংস্কারসাধন জন্য ১১০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চশত মুদ্রা সাধারণের চাঁদায় সংগৃহীত হয়, অবশিষ্ট সমুদয় অর্থই ঢাকা জর্জকোর্টের প্রখ্যাতনামা উকিল, ঢাকার অন্যতম নেতা সর্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় প্রদান করিয়াছেন। কালীবাড়ির সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীটি গভর্নমেন্ট কর্তৃক খনিত হইয়াছে। মঠটি লোহাগড়ার জনৈক রাজা নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়াও কিংবদন্তী আছে।

বুনিয়া রাজবংশীয়া রাণী ভবানীকে কেহ কেহ শিশুপালের অনন্তর বংশীয়া বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ তালতলার খালের পূর্বপারে যে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া আনন্দময়ীকালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বুভুক্ষু ধলেশ্বরী নদীর ভীষণ তরঙ্গাঘাতে অধুনা উক্ত মন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ে মহারাজের বৃত্তিভোগী রায়পুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় স্বীয় বসতবাটিতে সামান্য টিনের ঘরে মায়ের স্থান করিয়া যথারীতি অর্চনাদি করিতেছেন। ঐ স্থানে মাঘ মাসে একটি বাৎসরিক মেলার অধিবেশন হয়।

ঢাকার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রাচীনকাল হইতে মুসলমানাগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত)

পরমপূজনীয় জ্যৈষ্ঠতাত
স্বর্গীয় ব্রজমোহন রায়
ও
পরমারাধ্যা ধাত্রীমাতা
স্বর্গীয়া বিদ্যাদাসীর
পুণ্য নামে ভক্তিসহকারে
তাঁহাদিগের অকৃতি দীনসন্তান
কর্তৃক এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গের অনুকম্পায় আজ ঢাকার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই খণ্ডে অতি প্রাচীন কাল হইতে মোসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যবর্গের অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বাহির করিতে পারিব কিনা জানি না। খড়কুটা মালমসল্লাই আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি; ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যতর হস্তের রচনা কৌশলে দেশমাতৃকার শ্রীমূর্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিলে আনন্দিত হইব।

ঐতিহাসিক যুগে গৌড় বঙ্গ ও মগধের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মগধের প্রাধান্যের ইতিহাস। এই সময়ে গৌড়-বঙ্গ সম্ভবত আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই মগধের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধের গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। "অষ্টম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়বঙ্গে বড়ই দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ে উত্তর-ভারতে সার্বভৌম-তন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে, বিভিন্ন প্রদেশে, স্থিতিশীল স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বঙ্গের ভাগ্যে এই বিপ্লবজনিত ক্লেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল। ফলে, দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে দশম শতাব্দীর অন্ত পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের গৌরবময় যুগ। এই যুগেই গৌড়বঙ্গে সুপ্ত প্রজাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। এই যুগেই গৌড়বঙ্গের প্রকৃতিপুঞ্জ মাতৃভূমির "মাৎস্যন্যায়" বিদূরিত করিবার জন্য প্রজাশক্তির যে বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে চিরকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এই যুগেই বলদৃপ্ত বঙ্গীয় বিজয়-বাহিনীর বাহুবলে গৌড়বঙ্গের প্রাধান্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগেই গৌড়বঙ্গের শিল্পীকূল অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র ভারত চমকিত করিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, বঙ্গ গৌড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিলে উভয় প্রদেশই হীনবল হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই উভয় প্রদেশ পুনরায় এক রাজছত্র তলে সম্মিলিত হইলেও বিলুপ্ত অতীত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড় এক অভিনব বৈদেশিক রাজশক্তির পদানত হইলে নদী-মেখলা বেষ্টিত বঙ্গ বহুকাল পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দশম শতাব্দীর শেষ পাদে গৌড়ের আলিঙ্গন-পাশ মুক্ত করিয়া বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী শ্রীবিক্রমপুরে বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের জয়স্কন্ধাবার—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবিক্রমপুর কেন্দ্র হইতেই চন্দ্র-বর্ম ও সেন রাজগণ বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ঢাকার ইতিহাসকেই প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। এজন্য ভারতের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গৌড়বঙ্গের ইতিহাস রচনা করা কর্তব্য। এই গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচারভার সুধী পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত।

এই গ্রন্থ মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য পূর্বসূরীগণের লেখার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই সমুদয় মহাত্মাগণের প্রতি প্রতিযোগিতার ভাগ পোষণ করা তো দূরের কথা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া গৌরব বোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেও ভরসা পাই না। আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সমীচীন ও প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই অকপটে প্রকাশ করিয়াছি। বিশেষজ্ঞগণের বিচারে আমার মন্তব্য দোষ-যুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে ইতিহাস রচনার পথ-প্রদর্শক পরম-শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র-বিরচিত গৌড় রাজমালা প্রায় দুই বৎসর কাল পর্যন্ত এই লেখকের নিত্য সহচর ছিল। স্থানে স্থানে মতভেদ থাকিলেও একথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিব যে, গৌড়-রাজমালার ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতেই বঙ্গদেশে ইতিহাস রচনার প্রণালি আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ অপরিশোধনীয় ঋণপাশে আবদ্ধ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তদ্‌বিরচিত Pal Kings of Bengal গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে দয়া করিয়া প্রমাণ-পঞ্জি সংগ্রহ করিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পাল রাজগণ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয়ই এই অমূল্য গ্রন্থে অতি বিচক্ষণতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাল রাজগণের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করিবার সময়ে এই পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত প্রমাণ-পঞ্জিই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। চন্দ্ররাজগণের বিবরণ মুদ্রিত হইবার সময়ে, রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, গৌড়-রাজমালার ন্যায় এই উপাদেয় গ্রন্থখানি তদবধি একদিনের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে ভরসা হয় নাই। রাখালবাবুর গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে; সুতরাং এই অবসরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

পণ্ডিতপ্রবর কিলহন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় বলে প্রাচীন শিলালিপি এবং ধাতুপট্টলিপির পাঠোদ্ধার হইয়া এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি, এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাদিতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গভাষায় এই সমুদয় লেখমালার সঙ্কলন করিয়া লেখমালার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে অক্ষয়বাবুর এই অমূল্য পুস্তক ও পাদটীকার লিখিত তদীয় মন্তব্যাদি হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি। বঙ্গভাষা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় পুরাতন লিপির সম্যক পরিচয় লাভের উপায় ছিল না, সুতরাং পূজ্যপাদ মৈত্রেয় মহাশয়ের গ্রন্থ যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মাত্রেরই গৌরবের আদরের জিনিস হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রামচরিত গ্রন্থ এবং উহার ভূমিকা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধী শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পবন দূতম্ গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হিরবর্মার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে এবং সেন রাজগণের ইতিহাস রচনাকালে মনোমোহনবাবুর লিখিত গবেষণাপূর্ণ বিবিধ নিবন্ধ হইতে অনেক অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। বল্লাল চরিতের সমালোচনা কালে শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস লিখিত পুস্তক হইতেও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বহুভাষাবিদ্ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত

রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক সুহৃদয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ সর্বদা নানা উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঢাকার ইতিহাসে ব্যবহার করিবার জন্য অনেকগুলি ব্লক দিয়াছেন। এজন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকার ইতিহাস রচনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া শ্রীযুক্ত কাজিমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকি চৌধুরি, শ্রীযুক্তা খোদাইজা বেগম সাহেবা, শ্রীযুক্তা পরিবানু বিবিসাহেবা, শ্রীযুক্তা আমিনা বানু বিবি সাহেবা, খান বাহাদুর খাজেমহম্মদ আজম, রাজা শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, অনারেবল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় প্রভৃতি ঢাকার জমিদারবর্গ আমাকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। দেশের এই সমুদয় মহানুভব ব্যক্তির উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য যে এই সকল মহাত্মাগণের নিকট আমি চিরঋণী।

অবশেষে যে মহানুভবের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, যিনি সর্বদা আমাকে এই কার্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বিক্রমপুরের কৃতি সুসন্তান সেই স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পুঙ্গব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ মধ্যে এই অকৃতি দীন লেখকের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিবারই সম্ভাবনা, মুদ্রাকর প্রমাদও যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং দয়া করিয়া কেহ কোনও ভ্রম দর্শাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

দক্ষিণ বিক্রমপুর
গ্রাম—নগর। পোঃ উপসী।
মহালয়া, ২১শে আশ্বিন
১৩২২ সাল

যতীন্দ্রমোহন রায়

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা : বঙ্গ হরিকেল-সমতট

প্রাচীন বঙ্গ :

অধুনা জ্যোতিষ্ক, পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, কর্বট, কৌশিকীকচ্ছ, উপবঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশ বলিতে পূর্ববঙ্গ বুঝাইত। ঐতিহাসিক যুগেও বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল গৌড় এবং পূর্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বরোদায় আবিষ্কৃত কর্করাজের তাম্রশাসনে গৌড় ও বঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[১]। ওয়ানি ও রাধনপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, গুর্জরপতি বৎসরাজ গৌড়ীয় শরদিন্দুপাদ ধবল রাজ ছত্রদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন[২]। এখানে দুইটি রাজছত্রের বিষয় উল্লিখিত হওয়ায় এবং গৌড়বঙ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বৎসরাজকর্তৃক জিত শ্বেতছত্রদ্বয়ের একটি গৌড়ের এবং অপরটি বঙ্গের রাজছত্র। প্রাচীন বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বহু তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে বঙ্গদেশ প্রাচ্য-জনপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে[৩]। গরুড়পুরাণে উহাকে ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ-দিক্‌বর্তী বলা হইয়াছে। আবার "আগ্নেষ্যামঙ্গ বঙ্গোপ-বঙ্গ-ত্রিপুর-কোষলাঃ", ইত্যাদি জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্মচক্র-বচন দ্বারা ইহার অবস্থান অগ্নিকোণে নির্দেশিত হইয়াছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎ-সংহিতা মতে গৌড় ও বঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াই প্রতীত হয়[৪]। যোগ-বিশিষ্ট রচনাকালেও তাম্রলিপ্ত, গৌড়, পুণ্ড্র, মাধ, বঙ্গ, উপবঙ্গা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। পানীনীয় মহাভাষ্যে লিখিত আছে "অঙ্গানাং বিষয়ে দেগঃ। বঙ্গা, সুম্মা, পুণ্ড্রাঃ" (Keilhorn's Ed. II ২৪২)। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে বঙ্গ ও গৌড়ের সীমা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে :

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশে ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।।[৫]
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ"।।

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। ঐ স্থানে গমন করিলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশের (ভুবনেশ্বর) শেষ সীমা পর্যন্ত ভূভাগ গৌড় নামে পরিচিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ সর্বশাস্ত্রবিশারদ। স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও লিখিয়াছেন, "বঙ্গে স্বর্ণপ্রমাদয়ঃ" অর্থাৎ বঙ্গদেশে স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানের উল্লেখ না করিয়া পূর্ববঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতিকেই বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন "সুহ্ম দেশীয় নৃপতিগণ বেতসের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বঙ্গবাসীগণ নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলে, রঘু তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন[৬]। পরে তিনি কপিসা নদী পার হইয়া উৎকলদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নদী মেখলা বেষ্টিত পূর্ববঙ্গকেই কালিদাস বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন স্থানকে পঞ্চভাবে বিভক্ত করেন ; যথা —(১) রাঢ় (হুগলীনদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী), (২) বাগড়ি (পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী), (৩) বারেন্দ্র (পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্বে করতোয়া, এতন্মধ্যবর্তী ভূভাগ), (৪) মিথিলা (পূর্বে মহানন্দা ও গৌড়রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগীরথী, এই ভূমিখণ্ড), (৫) বঙ্গ (করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী স্থান)[৭]। মনীষি মিঃ হেমিল্টন লিখিয়াছেন, "বাংলার রাজধানী এই বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা নামক স্থানের অনতিদূরে বহুপূর্বে এবং পরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বঙ্গ হইতে সমুদয় প্রদেশগুলিও বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে"[৮]। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব বলেন, Banga the country to the east of and beyond the delta[৯]।

কিরাদিয়া ও গঙ্গারিডয় :

এরিয়ান, ডিওডোরাস এবং টলেমি প্রমুখ গ্রিক-গ্রন্থকারগণের লিখিত পুস্তকাদিতে বঙ্গের উল্লেখ না থাকিলেও "কিরাদিয়া" ও "গঙ্গারিডয়" রাজ্যদ্বয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পেরিপ্লুস গ্রন্থে "কিরাদিয়া" প্রদেশের পূর্ব-সীমা গঙ্গানদীর মোহনা বলিয়া লিখিত আছে[১০]। কিন্তু প্রাচীন রাজমালার গ্রন্থকারদ্বয় কিরাত রাজ্যের সীমা পশ্চিমে বঙ্গের সহিত সংলগ্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পেরিপ্লুস গ্রন্থের লিখিত সীমা নির্ভুল নহে। টলেমির কিরাদিয়া, ত্রিপুর রাজ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপিতে ডবাক এবং সমতট প্রদেশের নাম উল্লিখিত হইলেও "গঙ্গারিডয়" রাজ্যের নাম পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবত ইহার পূর্বেই "গঙ্গারিডয়" নাম বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গঙ্গারিডয় :

ডিওডোরাস লিখিয়াছেন, "গঙ্গানদী গঙ্গারিডয় রাজ্যের পূর্বসীমা। গাঙ্গেয়গণের বহুসংখ্যক মহাকায় হস্তী আছে। এজন্য এইদেশ কখনও কোনও বৈদেশিক ভূপতি কর্তৃক বিজিত হয় নাই। কারণ, অপরাপর সমুদয় জাতিই গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী অগণ্য রণকুঞ্জরবৃন্দের কথা শুনিয়া ভয় পায়[১১]। ডিওডোরাস সম্ভবত গঙ্গারিডয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিতে ভুল করিয়াছেন। কারণ, মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পূর্বসীমায় গঙ্গারিডয় রাজ্য অবস্থিত ; সুতরাং ইহার পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে গঙ্গারিডয় রাজ্য এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতির পক্ষে ষষ্ঠিসহস্র পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিশেষত অসংখ্য রণকুঞ্জর তৎকালে পূর্ববঙ্গেই সুলভ ছিল।

গঙ্গারিডয় ও বঙ্গ ; গঙ্গে বন্দর :

বাংলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, তাহা রাঢ় নামে অভিহিত ; প্রাচীনকালে ইহা সুহ্মনামে পরিচিত ছিল। গৌড় রাজমালার গ্রন্থকার যথার্থই লিখিয়াছেন, "গঙ্গারিডয়" রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। বাংলার অপর দুইটি বিভগ, পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" গঙ্গারিডয় রাজ্যের রাজধানী প্রথমত পার্থেলিস নগরে, পরে গঙ্গেনগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই গঙ্গেনগর গঙ্গার মোহনার নিকট অবস্থিত ছিল, এবং এইস্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত। গঙ্গানদীর মোহনা বলিলে ভাগীরথীর মোহনা বুঝাইতে পারে না, পদ্মানদীর মোহনাই বুঝিতে হইবে ; কারণ, পদ্মানদীই প্রকৃত গঙ্গা, ভাগীরথী শাখানদী মাত্র। মসলিনের ক্রয় বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হইত।

অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশের শ্বেত স্নিগ্ধ দুকূলের বিষয় লিখিত আছে[১২]। সুতরাং গঙ্গেবন্দর সম্ভবত সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।

বঙ্গলম্ :

মোসলমান বিজয়ের পরেও গৌড়, লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্মৌতি বলিলে পশ্চিমবঙ্গ এবং "বঙ্গ" অথবা "দিয়ার-ই-বঙ্গ" বলিলে জলময় পূর্ববঙ্গ বুঝাইত। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রিয়ারসন সাহেব বঙ্গভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, "ইহা নিম্নবঙ্গ বা ব-দ্বীপের ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে পূর্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা যতদূর বঙ্গভাষা কথিত হয়, সেই সমুদয় স্থানই বাংলা নামে অভিহিত হয়। ইংরাজি "বেঙ্গল" হইতে "বেঙ্গলি" নামের উদ্ভব হইয়াছে। "বঙ্গলম্" শব্দ তাঞ্জোর হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই আরবিক ভাষায় "বাংলার" সৃষ্টি হইয়াছে। আরবিক হইতে পারস্য ভাষায় ইহা প্রবেশ লাভ করে। "আইন-ই-আকবরি" গ্রন্থে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "নামি আসলি বাংলা বঙ্গ্" অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত নাম বঙ্গ[১৩]। নদীমাতৃক পূর্ব-বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর জলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইত ; এবং অধিবাসীগণ উচ্চ "আল" বাঁধিয়া জলপ্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইত ; তজ্জন্যই প্রথমে বঙ্গ+আল্ হইতে বঙ্গাল এবং পরে বঙ্গালা ও বাংলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত প্রথমে আবুল ফজল কর্তৃক প্রচারিত হয়। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ আবুল ফজলের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, বঙ্গ+আলয়, হইতে প্রথমে বঙ্গালয় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে অপভ্রংশে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাংলাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"যখন বঙ্গাল শব্দটা বাংলা রূপ ধারণ করিয়া খুব চলিত হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব বাংলা বুঝায়। "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে" ভূসুকু বা শান্তিদেব লিখিয়াছেন[১৪]।

"বাজণাব পাড়ী পঁউয়া খালে বাহিউ অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।। ধ্রু।।
আজি ভূসু বঙ্গালী ভাইলী নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী"।। ধ্রু।।

অর্থাৎ "বজ্রনৌকা পাড়িদিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গালদেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভূসু, আজ তুমি সত্যসত্যই বাঙ্গালী হইলে, যে হেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলে।"

বঙ্গালদেশ :

তিরুমলয়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতি রাজেন্দ্রচোল "বঙ্গালদেশে" রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৫]। গোহারওয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত চেদিরাজ কর্ণদেবের তাম্রশাসনে "বঙ্গাল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা : বঙ্গাল-ভঙ্গ-নিপুণঃ পরিভূতো পাণ্ড্যোলাটেশ লুণ্ঠন-পটুর্জিত গুর্জরেন্দ্র"।

ইৎচিঙের ভারত ভ্রমণের কিছুকাল পরে, চীনদূত মাহুয়ান (Ma-human) বঙ্গদেশ আগমন করেন। ইউংলো (young-lo) কর্তৃক চীন সম্রাট হুইতি (Huiti) রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য মাহুয়ান পশ্চিম মহাসাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হন, তাহার আভাস, তদ্বিরচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে "পন্-কো-লো" (Pan-ko-lo) রাজ্যের নামোল্লেখ রহিয়াছে ; ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মাহুয়ান বাংলা দেশকেই পন্-কো-লো নামে অভিহিত করিয়াছেন। অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গবাসী জনসাধারণ ঢাকা, তথা পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গাল আখ্যা প্রদান করিয়া বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন স্মৃতিটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। আসামীয়গণ এখনও বঙ্গালশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বঙ্গের প্রাচীনত্ব :

আর্য সভ্যতার প্রথম আলোকরেখা বঙ্গের কিরীট চুম্বন করিবার অবসর প্রাপ্ত না হইলেও উহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গদেশ আর্য্য ঋষিগণের পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্য ঋষিগণের পূতকর-প্রসূত অসীম শাস্ত্র-জলধি মন্থন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, বঙ্গদেশ ও বঙ্গনাম কতকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং কত প্রবল-প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণ-পরম্পরায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ নানাস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের আরণ্যক অংশেও বঙ্গনামের উল্লেখ রহিয়াছে। ঐতরের আরণ্যকের "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রা অত্যায়মায় স্তানীমানি বয়াংসি। বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিস্র", শ্লোকে বঙ্গনাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারত[১৬], বিষ্ণুপুরাণ[১৭], গরুড়পুরাণ[১৮], মৎস্যপুরাণ[১৯] এবং হরিবংশ[২০] প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি দীর্ঘতমা, বলি-পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্মও পুণ্ড্র এই পুত্র-পঞ্চক উৎপাদন করেন ; তাহাদিগের নামানুসারেই বঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ-রাজ্য স্থাপিত হয়।

আর্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে বহু আর্যসন্তান বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে উহারা অনার্যভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ জন্যই মানব-ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে, দ্বিজাতীকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন[২১]। বৌধায়ন সূত্রকারও মনুর মনুসরণ করিয়া পুণ্ড্র, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন[২২]।

এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশ আর্য ঋষিগণের চক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না! অধিকন্তু মনুসংহিতায় তীর্থের প্রসঙ্গ থাকায় এই সমুদয় স্থানে আর্যগণের আবির্ভাবই সূচিত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে, পরশুরাম লৌহিত্য তীর্থের সৃষ্টি করেন। সম্ভবত পরশুরামই প্রথমে এই প্রদেশে একটি আর্য-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের সময়ে বঙ্গভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা দশরথ অভিমানিনী কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি বিধান জন্য বলিতেছেন,—

"দ্রাবিড়াসিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশীকোশলাঃ।।
তত্র জাতং বহু ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি! যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি"।।

রামায়ণ ; অযো, ১০স, ৩৭।৩৮।।

অর্থাৎ, সমৃদ্ধ দ্রাবিড় সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি জনপদে ছাগ, মেষ, ধন, ধান্যাদি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে ; তুমি সেই সকল দ্রবের মধ্যে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। মহারাজা দশরথের এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গরাজ্য তাঁহার শাসনাধীনে ছিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে ভীমসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে সমুদয় রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গরাজ্য অন্যতম। ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ—

অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বহুবীর্যেন নিজঘান্ মহামৃধে।।
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছ নিলয়ং রাজানাঞ্চ মহৌজসম্।।

উভৌ বল-ভৃতৌ বীরা বুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।।
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষব।।"

অর্থাৎ অনন্তর মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী নৃপতিকে স্বীয় বীর্যবলে মহাসমরে নিহত করিয়া, ভীমসেন পুণ্ড্রাধিপতি বহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা, এই দুই প্রখর পরাক্রান্ত বীর্যসম্পন্ন বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিলেন। অতঃপর, বঙ্গ-রাজ্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া তিনি, মহারাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে, তাম্রলিপ্ত ও কর্বটাধিপতি, সুহ্মপতি ও পর্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।"

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভীমসেন যে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেনকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, উহারা পূর্ববঙ্গেরই অধীশ্বর ছিলেন। কারণ, ভীমসেন পুণ্ড্র ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশ অতিক্রম করিয়াই বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরে তথা হইতে দক্ষিণবঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময়েই তাম্রলিপ্তি, কর্বটও সুহ্মদেশ জয় করিয়াছিলেন।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে লিখিত আছে, অর্জুন সমুদ্রতীরস্থিত বাঙ্গালি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ; যথা —

"ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কেশরী।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্।।
তত্র তত্র চ ভূরীণি ম্লেচ্ছ-সৈন্যান্যনেকশঃ।
বিজিষো ধনুষা রাজন্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ"।।

ভীষ্মপর্বে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর-সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করতঃ মদবারিযুক্ত পর্বতাকার দশসহস্র হস্তি লইয়া ভীমনন্দন ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া, অতি সত্বর পর্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং সেই হস্তী দ্বারা ভীম তনয়ের রথখানিরও রোধ করিলেন। বঙ্গরাজ স্বীয় মদমত্ত বারণ দ্বারা দুর্য্যোধনের রথ আবরণ না করিলে, ভীমনন্দন মহাবীর ঘটোৎকচের শক্তি অস্ত্রে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল।

অর্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন! তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গস্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অন্যান্য স্থান সমূহ দর্শন করিয়া কলিঙ্গদেশ অতিক্রমপূর্বক বহুবিধ স্থান এবং ধনীগণের হর্ম্মাদি অবলোকন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি তাপসগণ শোভিত মহেন্দ্রপর্বত দর্শন করিয়া দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরস্থিত পথে ধীরে ধীরে মণিপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন[২৩]। অর্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে রমণীর অট্টালিকা সমূহ বিরাজিত ছিল এবং দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্তী পথ দ্বারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে এক অনুল্লেখনামা বঙ্গরাজের সন্ধান পাওয়া যায়[২৪]। এই বঙ্গরাজের কন্যার নাম সুপ্রদেবী। বয়স্থা হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হইয়াছিল না। ফলে, এই অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবন ভারাবনতা কন্যা কামগৃধিনী হইয়া স্বৈরাচার সুখোদ্দেশে একাকিনী পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সার্থপতি বঙ্গ হইতে মগধে যাইতেছিলেন. সুপ্রদেবী তাহাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্থপতিকেই সার্থসিংহ বলা

যাইতে পারে[২৫]। সুপ্রদেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সার্থসিংহের ঔরসজাত বলা যাইতে পারে। ইউয়ান চোয়াং ইহাকে জম্বু দ্বীপের মহাবণিক ও ইহার নাম সিংহ বলিয়াছেন। যাহা হউক, বঙ্গরাজের দৌহিত্র এই সিংহ বাহু শত যোজন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর ও গ্রাম সমূহ নিবেশিত করেন। সিংহবাহুর রাষ্ট্র "লাড় রট্ঠ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রে লাড়কে "লাঢ়" বলে। "লাড়" বা লাঢ়" বর্তমান রাঢ় ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেহ কেহ সিংহপুরকে হুগলী জেলার সিঙ্গুর বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। তৎকালে রাঢ় ভীষণ অরণ্যানি সঙ্কুল ছিল। সিংহবাহু, স্বীয় ভগিনী সিংহশ্রী বলিকে মহিষী করিয়া অরণ্য মধ্যস্থিত সিংহপুর নগরে রাজত্ব করিতে থাকে। সিংহবাহুর পুত্রই বিজয়বাহু বা বিজয়সিংহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিজয়সিংহ, তাম্রপর্ণি দ্বীপ জয় করায় তদীয় নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নির্বাণোন্মুখ ভগবান বুদ্ধ যেদিন কুশীনগরের শালতরুদ্বয়ের মধ্যে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ পোতারোহণে সেইদিনই তাম্রপর্নি দ্বীপে সদলবলে উপনীত হইয়াছিলেন[২৬]।

পালি বিনয় পিটক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান বুদ্ধদেব তদীয় শিষ্যবর্গকে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার গৃহবিশেষে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন[২৭]। মহাকবি ভাস বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অবন্তীর শাসনকর্তা প্রদ্যোতের সমসাময়িক এক বঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন[২৮]।

হরিকেল :

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে, "আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদচ্ছত্র-স্মিতানাংশ্রিয়াম্", ইত্যাদি উক্তিতে হরিকেল শব্দ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে[২৯]। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতে[৩০] লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় বল্লভানন্দের নিকট দেড়কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলে বল্লভানন্দ ঋণ পরিশোধ যাবৎ হরিকেলীয় প্রদেশ তাহার অধিকারে রাখিয়া ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন[৩১]। খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভুত জৈনাচার্য হেমচন্দ্রসূরী-বিরচিত অভিধান চিন্তামণিতে হরিকেল শব্দটিকে বঙ্গের নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[৩২]। হরিকেলের শিল লোকনাথ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও এরূপ প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র সগৌরবে অঙ্কিত হইত। পণ্ডিত-প্রবর ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে[৩৩]। হরিকেল নাম খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে! ইৎসিং সিংহল হইতে সমুদ্রপথে উত্তরপূর্বাভিমুখে যাইবার সময়ে পূর্বভারতের পূর্ব সীমা "হরিকেল" রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন[৩৪]। সুতরাং হরিকেল বা বঙ্গ যে পূর্ববঙ্গেরই নামান্তর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সমতট :

খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবত প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে মিথিলা ও ওড্রদেশের নামের সহিত সমতটের নামও গ্রথিত করা হইয়াছে[৩৫]। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং, সেঙ্গচী ও ইৎসিং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমতটের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত বাঘাউরায় প্রাপ্ত প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ একখানি বিষ্ণু মূর্তির পাদ পীঠস্থ লিপিতে. নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে, সোমপুর মহা বিহারের আচার্য বীর্যেন্দ্র কর্তৃক বুদ্ধ গয়ায় প্রতিষ্ঠাপিত একখানি বুদ্ধ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে সমতটের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারী পণ্ডিতগণ ইউয়ান চোয়াং-এর বিবরণী হইতে সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইলেও তাঁহারা

একমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। ফার্গুসনের মতে সোনারগাঁতে, ওয়াটার্সের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে, কানিংহামের মতে যশোহরে, সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে সমতটের রাজধানীর অবস্থান নির্দেশ করা শক্ত। ইউয়ান চোয়াং যখন বলিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে ১২০০—১৩০০ লী বা ২০০—২১৭ মাইল দক্ষিণে এবং তাম্রলিপ্তি হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল পূর্বদিকে সমতট অবস্থিত, তখন তিনি হয়ত সমতটের রাজধানীর দূরত্বই নির্দেশ করিয়াছেন। কামরূপ হইতে সমতটে অথবা সমতট হইতে তাম্রলিপ্তিতে তিনি জলপথে কতদূর গমন করিয়াছিলেন এবং স্থলপথেই বা তাঁহাকে কতদূর যাইতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তাম্রলিপ্তি হইতে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব ১৭৫ মাইল। সুতরাং সমতটের রাজধানী যে সোনারগাঁয়ের অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট (সোমকোট) নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংসচিহ্ন সহ অধুনা এই স্থান কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম যে যুক্তির আশ্রয়ে তমোলুক হইতে ১৩০ মাইল দূরবর্তী যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারই যুক্তি শিরোধার্য করিয়া আমরা তমোলুক হইতে ১৭০ মাইল দূরবর্তী সোম কোটে সমতটের রাজধানীর স্থান অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

প্রাচীন কামরূপের রাজধানী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে ; কানিংহাম সাহেবের মতে[৩৬] কামতাপুরে (লাল বাজার) গেইট সাহেবের মতে[৩৭] কোচবিহারের কোনও স্থানে বা রংপুরের পূর্ব প্রান্তে অথবা গোয়াল পাড়ায় ; আবার কেহ কেহ গৌহাটিতে কামরূপের রাজধানী স্থাপিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সোমকোট হইতে কামতাপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, এবং গৌহাটির দূরত্ব যথাক্রমে ২১৫, ২২০, ২০৫ এবং ২২৫ মাইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চৈনিক পরিব্রাজকের লিখিত কামরূপ হইতে সমতটের দূরত্বের সহিত সেমকোটও উল্লিখিত স্থানগুলির দূরত্ব প্রায় মিলিয়া যায়। এই সমুদয় কারণে অনুমান হয়, সমতটের রাজধানী সোমকোটেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক সমতটের প্রান্তঃস্থিত শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভিভিয়েন ডি. সেন্ট মার্টিন শ্রীক্ষেত্রকে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত শ্রীহট্ট নগরের সহিত অভিন্ন মনে করেন[৩৮]। কিন্তু ওয়াটার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাকে ত্রিপুরা জেলার অংশবিশেষ বলিয়া ধার্য করিয়াছেন[৩৯]। কিন্তু বিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে শ্রীক্ষেত্র ইরাবতী তীরবর্তী বর্তমান প্রোম নগরীর সহিত অভিন্ন[৪০]। শ্রীক্ষেত্র সমতটের উত্তরপূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। ইহার দক্ষিণপূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বারাবতী প্রদেশ। ইহারও পূর্বদিকে ঈশানপুর[৪১]।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী সমতট, বঙ্গ ও হরিকেলকে একই প্রদেশের নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহাদিগের মতে সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ববঙ্গই প্রাচীনকালে সমতট, বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।

---

১. Ind. Ant Vol. X II P. 100.

২. Ind. Ant. Vol. X I P 157 Epi. Ind. Vol. VI P. 243.

৩. "অঙ্গ বঙ্গা মদ্‌গুরুকা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ

* প্ব * * * *

* * * * * *

শাল্বা মাগধ গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদ স্মৃতা"। মৎস্যপুরাণ।

৪. বৃহৎ সংহিতা, কর্ম্ম বিভাগ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক।

৫. উক্ত তন্ত্র-বচনোল্লিখিত "ব্রহ্মপুত্রান্তগং" পদের অর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের অন্ত পর্যন্ত গামী অর্থাৎ উহার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ হইলে, অসঙ্গতি উপস্থিত হয় ; কারণ ব্রহ্মপুত্রের অন্তসীমা হিমালয় পর্ব্বত। বস্তুত বঙ্গদেশ হিমালয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ নহে। অন্তশব্দ সামীপ্য বাচী, সুতরাং বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রান্তগ অর্থাৎ উহার প্রাণে, বা তীরে বঙ্গদেশ অবস্থিত, বঙ্গদেশের কিয়দংশ যে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার কেহ বা "ব্রহ্মপুত্র অন্ত সীমাবর্ত্তী যাহার," এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

লঘুভারতে করতোয়া নদী গৌড়-বঙ্গের সীমা-নির্দেশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ;—

বৃহৎ পরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী।
সীমা নিদর্শ নং মধ্যদেশয়ো গৌড় বঙ্গয়োঃ।।

৬. রঘুবংশ ৪র্থ স্বর্গ, ৩৫-৩৮ শ্লোক।

৭. Vide Buchanon Hamilton's Hindisthan Vol. I page 114.

৮. Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The Capital of Bengal both before and afterwards having long been Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole"—Hamilton's Hindusthan vol. I.

৯. J. A. S. B. 1873 No. III and H. Balochman's History and Geography of Bengal.

১০. Mc. Crindle's Ancient India as described by Ptolemy. Page 191 — Periplus of the Erythrean Sea.

১১. Mc. Crindle's Ancient India as described by Magas thenes and Arian.

১২. বাঙ্গকম্ শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকলম্ ; অর্থশাস্ত্র ২ অধিঃ। ১১ অঃ।

১৩. Linguistic Survey of India. Vol. V Part I. Edited by G. A. Grierson Esq. C. I. E.

১৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১।

১৫. Vangala-desa, where the rain wind never stopped (and from which) Govinda Chandra fled, having descended (from his) male elephant".
Tirumalai Rock Inscription of Rajendra Chola I Epigraphia India Vol. IX.

১৬. মহাভারত আদি ১০৪।৫।

১৭. বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৮৩ অঃ।

১৮. গরুড় পুরাণ পূর্বখণ্ড, ১৪৪ অঃ, ৭১ শ্লোক।

১৯. মৎস্যপুরাণ ৪৮ অঃ ৭৭।৭৮।

২০. হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, ৩২ অঃ, ৩২-৪২ শ্লোক। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

২১. "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি"।। মনু ১০ম অধ্যায়।।
দেবল স্মৃতিতে আছে, "সিন্ধু-সৌবীর সৌরাষ্ট্রাস্তথা প্রত্যন্ত বাসিনঃ।।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গোড্রান্ গত্বা সংস্কার মর্হতি"।।

২২. বৌধায়ন সূত্র ১।১।২।

২৩. "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ।
জাগম তানি সর্বাণি তথা ন্যায়তনানিচ।।
সকলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়ত নানি চ।
হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি প্রেক্ষামাণোযযৌ প্রভুঃ।।
মহেন্দ্র পর্বতং দৃষ্টা তাপসৈরূপশোভিতং।
সমুদ্র তীরেণ পরে মণিপুরং জগামহ"।।
মহাভারত-আদিপর্ব।

২৪. Mahavansa : chapter VI : and 11th book of the Si-yu-ki.

২৫. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫।

২৬. Upham's Sacred Books of Ceylon, I. Page 69 and vol II. Page 164.

২৭. Culla-Vagga VI I. Budhism in Translation Page 412.

২৮. "অস্মৎ সম্বন্ধো মাগধাঃ কাশিরাজো বঙ্গ সৌরাষ্ট্রমৈথিলঃ শূরসেনঃ।
এতে নানার্থৈ লোভয়ন্তো গুণৈর্মাং কন্তে বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা"।।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ম্।

২৯. শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন—৫ম শ্লোক, সাহিত্য, ১৩২ ভাদ্র।

৩০. বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

৩১. "যদি স্যান্নৃপতির্দ্দদ্যাৎ করা দান সমন্বিতম্।
আধিত্বে হরিকেলীয়ং ঋণং দাতুং তদোৎসহে"।।

সোসাইটির বল্লাল চরিত, ১৮ পৃষ্ঠা।

৩২. "বঙ্গান্ত হরিকেলিয়াঃ"—অভিধান চিন্তামণি, ৯৫৭ শ্লোক।

৩৩. Etude SurL' Iconographie Boudhipue deL' Inde, premier partic Page 200.

৩৪. J. Takakusu's It sing Page XIV

৩৫. বৃহৎ সংহিতা—১৪ অঃ, ৬ শ্লোক।

৩৬. Cunningham's Ancient Geography of India. Page 503.

৩৭. Gait's History of Assam Page 24-25.

৩৮. Cunningham's Ancient Geography of India Page 593.

৩৯. Watters on Yuan Chwang, Vol II. Page 189.

৪০. Beal's Records of Western Countries Vol. II Page 200.

৪১. Ibid.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৌর্যবংশ

মৌর্যসম্রাট অশোক :
খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান অমিতাভ কপিলবস্তু নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাংখ্যকার কপিলের নীরস জ্ঞানালোচনায় বিশ্বজনীন প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত করেন। সেই সময়ে বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও সাম্যবাদের বিজয় শঙ্খ-নিনাদ ধীরে ধীরে দুর্বল ও ক্ষীণ হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতীয় প্রধান ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া প্রায় সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের একমাত্র ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইয়া ছিল।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১৭২—২৩১ অব্দ পর্যন্ত অমিতবিক্রমে শাসন করেন। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট কনষ্টেন্টাইন স্বয়ং খ্রিষ্টিয় ধর্মাবলম্বন পূর্বক যেমন উহা সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় প্রধান ধর্মরূপে পরিগণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ মগধাধিপ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মকে ভারতের জাতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গুজরাট, পেশোয়ার, দিল্লি, আলাহাবাদ এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শিলাশাসনসমূহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সিরিয়ারাজ এন্টিওকাস থিয়স (দ্বিতীয়), মিশরাধিপতি তিলেমী ফিলাডেলফস্, মাকিদন-রাজ এন্টিগোনাস্ গোনাটস, সাইরিনরাজ মেগাস্, এপিরাস-ভূপাল আলেকজন্ডর প্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। তিব্বতের অন্তর্গত কম্বোজদেশ, কাবুলের উপত্যকাস্থিত প্রদেশসমূহ, কঙ্কণ, গোদাবরী এবং নর্মদা-তীরবর্তী স্থান এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থিত প্রদেশগুলিতেও বৌদ্ধধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন।

ধর্ম রাজিয়া ও শাকাসরস্তম্ভ :
অশোকের আদেশ-লিপি সমূহে বাংলার কোনও অংশেরই নামোল্লেখ না থাকায়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্‌সেন্টস্মিথ ঢাকা অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া তদীয় মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, উহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং (৬২৫-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ নামক বাংলার প্রধান নগর চতুষ্টয়ের উপকণ্ঠে অশোক-স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৌর্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন[১]। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম যে উক্ত ধর্ম রাজিয়ার অন্যতম একটি তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন দলিলাদিতে ধামরাই ধর্মরাজি বলিয়া উক্ত হইয়াছে[২]। অনুমান হয়, উত্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধামারণ গ্রামেও ঐরূপ একটি ধর্ম রাজিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল ; ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত মির্জাপুর নামক গ্রামের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত শাকাসর গ্রামে অতি প্রাচীন একটি প্রস্তর স্তম্ভ

পরিলক্ষিত হয়। এই প্রস্তরস্তম্ভটি "সিদ্ধি মাধব" নামে পরিচিত। ইনি বহুকাল যাবৎ জন-সাধারণের ভক্তি-উপচার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। স্থানীয় হিন্দুগণ এই স্তম্ভের নিকট বন্যবরাহ, এবং মোসলমানগণ কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "At mirzapur in Bhowal an upright slab called Siddhi Madhava is worshipped by all the inhabitants, Muhammadans sacrificing cocks and Hindus swine."[৩]।

"পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ" গ্রন্থ প্রণেতার মতে এই স্তম্ভটি বৌদ্ধ যুগের অন্যতম কীর্তি নিদর্শন। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল টন সাহেবের মতে উহা বিষ্ণুস্তম্ভ। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় নাকি ইহাকে গরূড়স্তম্ভ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক[৪]।

অষ্টকোণ সমন্বিত এই স্তম্ভটি প্রায় ৬ ফিট উচ্চ এবং উহার বেষ্টনি ১ ফিট ৫ ইঞ্চি। যে কয়েকটি মূর্তি উহাতে খোদিত রহিয়াছে, তাহা এরূপ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহা হইতে উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব! শীর্ষদেশের অধিকাংশ মূর্তিগুলিই মুদ্রাসন-সংবদ্ধ ও ধ্যানমগ্ন, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তক কীরিট-শোভিত।

স্তম্ভটি স্থাপনাবধিই যদি উহা বিষ্ণুস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত হইত, তবে বরাহ ও কুক্কুটাদি বলির প্রথা প্রবর্তিত হইবার কারণ কি? মাধব শব্দের অর্থ মহাভারতে নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে— "মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি ; তিনি (মাধব), মৌনধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব।"

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে লিখিত আছে ঃ—

"মাচ ব্রহ্ম স্বরূপা যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।।
মহালক্ষ্মী স্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামীচ মাধব।।"

ইহাদ্বারা প্রতিপন্ত হয় যে, মাধব গঙ্গার পতি বা মহাদেবকেও বুঝাইতে পারে। শব্দরত্নাবলীতে মাধবী শব্দের অর্থ, "দুর্গা, মাধবস্য পত্নী চ" বলিয়া লিখিত আছে। বুদ্ধদেব ও শঙ্কর উভয়েই মহাযোগী। সুতরাং বৌদ্ধমূর্তিই পরবর্তী কালে মাধব বা মহাদেব রূপে পরিণত হইয়া জন সাধারণের নিকট বলি ও পূজোপচার প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই স্তম্ভটিকে আমরা জয়স্তম্ভ বলিয়াই অনুমান করি। ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভের সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই স্তম্ভটি মহারাজ অশোক কর্তৃক ধর্ম রাজিকা প্রতিষ্ঠান কালেই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগে ইহাতে মূর্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে এরূপ স্তম্ভ আর নাই।

ধামরাই হইতে শাকাসর অধিক দূরবর্তী নহে। সুতরাং শাকাসরে প্রাপ্ত স্তম্ভটিকে ধামরাইর ধর্মরাজিয়া স্তম্ভ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। উপরোক্ত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিয়া অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত নির্দেশ করা যাইতে পারে[৫]।

মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য এক এক জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব প্রদেশের শাসন-কর্তা তোসলি নামক স্থানে অবস্থান করিয়া কলিঙ্গ প্রভৃতি নবজিত স্থানের সহিত পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন[৬]।

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রম কালক্রমে খর্ব হইতে লাগিল। ফলে, অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। দশমপুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যবংশ বিলুপ্ত হইল। এই সময়েই অঙ্গ এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে বঙ্গদেশেও স্বাধীনতার রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ :

দোর্দণ্ড-প্রতাপ-সৈন্য ব্যূহের সহায়তায় যে বলদৃপ্ত প্রকাণ্ড মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অশোকের মৃত্যুর ৪০। ৫০ বৎসর পরেই, উহা কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহা একটি সমস্যার বিষয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন[৭], "মৌর্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাহ্মণ-প্রভাব। সম্রাট অশোক স্বয়ং একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সর্বধর্মের প্রতিই তিনি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনি "আত্ম পাষণ্ড পূজা" নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহার অপরাপর অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, তিনি তদীয় সাম্রাজ্যে পশুবলি রহিত করিয়াছিলেন। জীবহিংসা রহিত হইলে যজ্ঞ-পূজাদিতে বলিও রহিত হইবে, সুতরাং বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজ জীবদুঃখকাতর সম্রাটের জীবহিংসা নিবারণের মূলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-দ্বেষী বৌদ্ধরাজার ব্রাহ্মণ নির্যাতনের স্পৃহা দেখিতে পাইলেন। ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ অশোকের এই অনুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন না। পরে আবার যখন সম্রাট "দণ্ড সমতা" ও "ব্যবহার সমতা" রক্ষার জন্য অনুশাসন প্রচার করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ইহার উপর অশোক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া "ধর্ম মহা মাত্র" নামে একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধীয় যে সমুদয় বিধি ব্যবস্থা পূর্বে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তৎসমুদয়ের ভার এখন তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। ফলে, ব্রাহ্মণ-সমাজে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অশোকের জীবিতকাল মধ্যে তাঁহারা কোনও উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হীন-বল মৌর্যরাজগণের শাসনসময়ে তাঁহারা মৌর্যরাজের প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে গ্রিকেরা মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আক্রমণ করিত। একবার তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র যখন পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মৌর্যাধিপ বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট সৈন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উৎসকের মধ্যে হঠাৎ একটি শর রাজার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজা বৃহদ্রথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত লইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্ত সেবক পুষ্যমিত্র এইরূপে মৌর্যবংশের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্র পাঠে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্র সৈন্যগণ সহ পাটলিপুত্রে অবস্থান করিয়া তদীয় পুত্রকে বিদিশার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিপ্লবের মূলে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। যেখান হইতে অহিংসাধর্ম বিঘোষিত হইয়াছিল, অশোকের রাজধানী সেই পাটলিপুত্রের বুকের উপর বসিয়া পুষ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক অহিংসাধর্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন[৮]। তদীয় জননী প্রতিমাসে "বিদ্যাচার্য ব্রাহ্মণগণকে" ৮০০ সুবর্ণমুদ্রা দান করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বস্তুত তিনি ব্রাহ্মণগণের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। এই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ সম্পাদন জন্যই সুবিখ্যাত পাতঞ্জলি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকতাই তিনি তদীয় "মহাভাষ্য" রচনা করেন[৯] ; কাণ্বগণের সময়ে মনুসংহিতা বিরচিত হয় ; এই সময়েই মহাভারত ও রামায়ণ বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয় এবং নাট্যশাস্ত্র লিখিত হয়। এইরূপ অশোক যে "ভূদেব" দিগকে মিথ্যা বা অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুনরায় পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় আছে। অশোকের অনুশাসন গুলি পাঠ করিলে অশোক যে পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন, বা তিনি যে হিন্দুধর্মের বিদ্বেষ্টা

ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না! অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসন গুলির মধ্যে গির্ণার গিরির প্রথম লিপিতে "ই ধন কিঞ্চি জীবং আরভিপ্তা প্রজুহি তব্যং" উক্তিই একমাত্র পশুবধ নিবারক। কিন্তু এই উক্তি হইতেও যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারণ আদেশ যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, এই লিপিরই অন্যত্র তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ তিনটি প্রাণী নিহত করিবার কথা লিপিতে অনেকগুলি জন্তুকে অবধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও যজ্ঞ শব্দের উল্লেখ নাই। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভ লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রমণদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি যেরূপ ব্যস্ত, ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলের জন্যও তিনি তদ্রূপ মনোযোগী। সমাজের উচ্চ স্তর হইতে ব্রাহ্মণদিগকে যে কখনও তিনি চ্যুত করিয়াছিলেন তাহা তাহার কোনও উক্তিতেই পরিলক্ষিত হয় না। মালবিকাগ্নি মিত্র বা মৃচ্ছকটিক নাটক মৌর্যযুগের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের প্রায় ৩।৪ শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মহাযানীর বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ধর্মের মধ্যে গ্লানি ও মলিনতা প্রবেশ করায়, তৎকালীন লেখকগণ বৌদ্ধ মতবাদের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, বুঝা যাইতেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম মহামাত্রগণ অশোক প্রবর্তিত ধর্ম বিধি প্রচার করিতেন! ইহা সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। সুতরাং এই কার্য যে কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস্য নহে।

কলিঙ্গ বিজয়ের পরে অশোক রাজশক্তি প্রসারের প্রতি মনোযোগী হন নাই। ধর্মের উচ্চ আদর্শ—লোক হিতসাধনই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। তাহার ত্রয়োদশ শিলা লিপিতে লিখিত আছে, "আমার পুত্র পৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন না, যদি কখনও তাহারা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শমতায় ও নম্রতায় আনন্দ অনুভব করিবে। তাহারা ধর্ম বিজয়কে যথার্থ বিজয় মনে করিবে, তাহাতে ইহ পরকালে সুখ হইবে।" চতুর্থ অনুশাসনে লিখিত আছে, "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ এই ধর্মাচরণ কল্পান্ত পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। তাহারা ধর্মনিষ্ঠ ও সৎস্বভাব হইয়া ইহার প্রচার করিবে। ধর্ম-প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম। দুঃশীলের ধর্মাচরণ অসম্ভব।" সুতরাং অশোকের পুত্র ও পৌত্রাধির যে দেশ বিজয়ের স্পৃহা বিলুপ্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অশোকের পৌত্র দশরথের পরে যে কয়জন মৌর্য রাজা মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের শৌর্য বীর্যের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সময়েই কলিঙ্গ, ও অন্ধ্র স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং মৌর্য-রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহদ্রথ অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন। সুতরাং স্বীয় বিজয় গৌরবে স্ফীর্ত তদীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র যে দুর্বল বৃহদ্রথকে রাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণে অভিলাষী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি?

গঙ্গে বন্দর :

এই সময়ে কিরাদিয়া প্রদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত "গঙ্গে" বন্দর ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত "পেরিপ্লুস" গ্রন্থে লিখিত আছে, কিরাদিয়া প্রদেশে প্রচুর তেজপত্র উৎপন্ন হয়! উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তথা হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়, তথায় চীনদেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যে বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যায়"। এই গঙ্গে বন্দরের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। মেজর রেণেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, ডি এন ভিল রাজমহলকে, উইলফোর্ড হুগলী-নগরীকে, হীরেন দুলিয়াপুর নামক স্থানকে এবং টেইলার মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটবর্তী ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বারুণী মেলার স্থানকে, প্রাচীন গঙ্গে বন্দর বলিয়া প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। টেইলার সাহেব বারুণীমেলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই এই বারুণীমেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে এই স্থানের

নাম ছিল (লক্ষ্মীবাজার বা লক্ষবাজার?)।" কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষমুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না। ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপতির আদেশ ছিল[১০]। গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল ও এবোল্লাই (আলাবাল্লে) ডায়া ক্রোসিয়া (ডুরিদার চারখানা) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মসলীন বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত।

আন্তিবল প্রাচ্য ভারতের কুমধ্য :

টলেমির গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত আন্তিবল নামক স্থানের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উইলফোর্ড টলেমির লিখিত আত্নাদনকে আন্তিবল নামক স্থানের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থানকেই তিনি আন্তিবল বলিয়া নির্দেশ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ডাক্তার টেইলার বলেন, "টলেমির লিখিত আন্তিবল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। আটি ভাওয়াল হইতেই যে আন্তিবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই স্থানে পূর্বে আন্তোমেলা (সংস্কৃত হাতিমল্ল বা হাতিবন্দ?) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু নরপতিগণ এইস্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এইস্থানের এবম্বিধ নামকরণ হইয়াছে। বানার এবং লাক্ষ্যা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একডালা নামক স্থানেই আন্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানের সন্নিকটে হাতিবন্দ নামে একটি স্থান আছে, তথায় পূর্বে হিন্দু রাজাদিগের হস্তী রক্ষিত হইত।"

ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল আন্তিবলকে বুড়িগঙ্গার সহিত অভিন্ন মনে করেন। তিনি বলেন, তৎকালে আন্তিবলই ভারতের পূর্বসীমা বলিয়া নির্দেশিত হইত। প্রাচ্য ভারতের কোনও স্থানের 'দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে আন্তিবলের তুলনায়ই করা হইত অর্থাৎ আন্তিবল ভারতীয় ভৌগোলিক-দিগের কুমধ্য বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের কুমধ্য সর্বদাই উজ্জয়িনী বা অবন্তি। বিষুবদ্‌বৃত্তের উপর অবস্থিত বলিয়া লঙ্কাই প্রধান কুমধ্য, সেই জন্যই শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন :

> "রাক্ষসালয়ঃ দেবৌকঃ শৈলয়োর্মধ্যসূত্রগাঃ।
> রোহিতকমবন্তী চ যথা সন্নিহিতং সরঃ।।"

মহামতি ভাস্করাচার্য বলেন ঃ—

> "যল্লঙ্কোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্‌স্পৃশৎ।
> সূত্রং মেরু গতং বুধৈর্নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ।
> আদৌ প্রাগুদয়ো পরত্র বিষয়ে পশচাদ্ধি রেখোদয়াৎ
> স্যাৎ তস্মাৎ ক্রিয়তে তদন্তর ভবং খেটৈষবৃণং স্বং ফলম্‌।।"

অর্থাৎ— "লঙ্কা, উজ্জয়িনী এবং কুরুক্ষেত্রাদি দেশকে স্পর্শ করিয়া যে রেখা মেরু পর্যন্ত গমন করে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পৃথিবীর মধ্যরেখা বলেন, এই রেখাতে যে সময়ে সূর্যের উদয় হয় তৎপূর্বে রেখা-দেশ হইতে পূর্বদেশে এবং রেখোদয়ের পরে পশ্চিম দেশে উদয় হইয়া থাকে। এই উদয়ান্তর কাল, উদয়ান্তর যোজন দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়।" নিরক্ষ-রেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন এক স্থানের দূরতাকে নিরক্ষান্তর এবং মধ্যবেখা হইতে পূর্ব পশ্চিমে কোন এক স্থানের দূরতাকে, দেশান্তর বলা হয়। ভূমণ্ডলে নিরক্ষরেখা একাধিক নাই, কিন্তু মধ্যরেখা জ্যোতির্বিদগণের ইচ্ছাও সুবিধা অনুসারে সর্বত্রই কল্পিত হইতে পারে। সম্ভবত এজনাই এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিদগণ আন্তিবল-স্পৃষ্ট রেখাকেই মধ্যরেখা বলিয়া কল্পনা করিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমি-বার্তায়" লিখিত আছে,—

> "স ব্রহ্মপুত্রং তত আজগাম বুধাষ্টমীং প্রাপ্য মধৌ মহাত্মা।
> সন্তর্প্য দেবান্‌ সলিলৈঃ পিতংশ্চ স্নাত্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তীর্থম্‌।।
> গ্রামং ততোহগাৎ স সুবর্ণ নাম যত্রাপতৎসা বিষুবাখ্যরেখা।

ভূবোহর্দ্ধভাগং স বিলোক্য সম্যক্ ঋক্ষোদয়ঞ্চাস্তমনং স্থিতিঞ্চ।।
ততোহতিহৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রপেদে কোটালিপাটে নবনির্ম্মিতং যৎ"।।

ভবভূমিবার্তা :
অর্থাৎ "ক্রমে তিনি (গঙ্গাগতি) এই সময় চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে দেব ও পিতৃগণের তর্পণান্তে তথায় স্নান পূজাদি নির্বাহ পূর্বক পুনরায় তথা হইতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি সুবর্ণগ্রামে আগমন করিলেন। এইস্থানে বিযুব নামক রেখা পতিত হয় বলিয়া, তিনি পৃথিবীর মধ্যভাগ, এবং নক্ষত্রের উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনপূর্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে নিজ নব নির্মিত কোটালি পাড়স্থ বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

বিক্রমপুরের পঞ্জিকা :
পূর্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। Caestral Survey Report হইতে জানা যায় যে উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুইদণ্ড আট পল। বিক্রমপুরের দৃষ্টান্তনুযায়ী নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশান্তর আর বদল হয় নাই ; উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তরও দুইদণ্ড চৌত্রিশ পলই স্থিরতর ছিল। কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে দেশান্তর আর বদল হয় নাই, সেই দুই দণ্ড চৌত্রিশ পলই অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। রাঘবানন্দ যে দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, তাহা বিক্রমপুরের দেশান্তর, নবদ্বীপের বা কলিকাতার নহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেড়পাড়া এবং ফতেজঙ্গপুর জ্যোতিষ আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যরেখা হইতে বেড়পাড়ার দেশান্তর ২দণ্ড ৩৪ পল হইয়া থাকে। "সিদ্ধান্ত রহস্য" পুঁথিতে লিখিত আছে—

সুমেরু লঙ্কান্তর ভূমি মধ্যরেখা স্বদেশান্তর যোজনং (২০০) হি যৎ।
ভুক্তিঘ্নমষ্টাত্রি হৃতং বিলিপ্তা গ্রহাদিকে প্রাক্ পরয়ো ঋণং স্বং।।"

সোনারগাঁও বিক্রমপুরের মানমন্দির :
উপরোক্ত প্রমাণের সাহায্যে কেহ কেহ নিজদেশের দেশান্তর ২০০ যোজন ধরিয়া তাহাকে ৭৮ দ্বারা ভাগ করণান্তর দেশান্তর ২ দণ্ড ৩৪ পল দেখাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই চট্টগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান পর্যন্ত সকল জ্যোতির্বিদই বলিয়া থাকেন যে, অস্মদ্দেশের দেশান্তর ২০০ যোজন বা ২ দণ্ড ৩৪ পল। বস্তুত এরূপ গণনা সমীচীন হয় না। বেড়পাড়ার যাম্যোত্তরবৃত্ত (Meridian) ঠিক মধ্যরেখা না হইলেও বঙ্গদেশে জ্যোতির্গণনার জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল সন্দেহ নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামপাল উহার সমসূত্রগ হইবে। ঢাকা কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। কার্তিক বারুণীর মেলার স্থান রামপাল হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। উল্লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুশাসনকাল হইতেই সোনারগাঁও, বিক্রমপুর জ্যোতিষ আলোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে, নক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনার্থ, এ অঞ্চলে মানমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী প্রাচীন গঙ্গে বন্দরের সন্নিকটে এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং গঙ্গে বন্দরের স্থানে বা তন্নিকটবর্তী কোনও স্থানেই পরবর্তী কালে কার্তিক বারুণীর মেলানুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছিল।

১. "অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্ম্মবাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাশনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাস্যীৎ।"

২. ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

ধামরাই গ্রামে প্রাপ্ত ধর্ম্মরাজি দলিলের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

৩. The Dacca Review Vol. IV Nos 3-6.

৪. পূর্ব্ববঙ্গে পাল রাজগণ (পৃঃ ৩৯, ১০৩) শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত।

৫. মিঃ ভিন্‌সেণ্টস্মিথ পূর্বসীমা যমুনা পর্যন্ত নির্দেশিত করিয়াছেন।
Vide map shewing the extent of Asoka's Empere in V. A. Smih's Early History of India, to face Page 150.

৬. Early History of India-V. A. Smith, Page 152.
তোসলির অবস্থান এখনও প্রকৃত রূপে নির্ণীত হয় নাই।

৭. J. A. S. B. 1910.

৮. মহারাজ অশোক যে সমুদয় ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র তাহার অধিকাংশই ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, ভীমপ্রবাহী পদ্মার তরঙ্গ ভীতিই পূর্ববঙ্গের ধর্ম্মরাজিকা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

৯. মহর্ষি পতঞ্জলি তদীয় মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন ; —

"অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্
অরুণৎ যবনঃ মাধ্য মিকান্
ইহ পুষ্প মিত্রং যজয়ামঃ"।

১০. ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

২৯০ খ্রিষ্টাব্দ—৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ
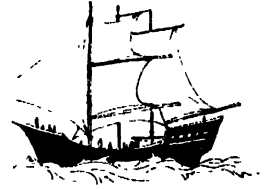
ঘটোৎকচ :

খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্য ভারতে যে কতিপয় সামন্তরাজ শকাধিকার গ্রাস করিয়া স্বাবলম্বনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুপ্ত বংশীয় সামন্তই প্রধান। কিন্তু যে মহা সামন্ত শক প্রাধান্যের উচ্ছেদ কামনায় প্রথমত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণের শিলালিপিতে তাঁহার "গুপ্ত" উপাধিটিই মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গুপ্তবংশীয় মহারাজ ঘটোৎকচ ২৯০ খ্রিষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অল্পে অল্পে যে মহাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই তদীয় পুত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৌর্য-সম্রাট প্রথিত-নামা চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় অত্যল্প কাল মধ্যেই অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ প্রভৃতি সমুদয় জনপদ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল[১]। তাঁহার অভিষেক কাল (৩২০ খ্রিষ্টাব্দ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি) হইতে যে নূতন সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই "গুপ্তসংবৎ" বা "গুপ্তাব্দ" নামক একটি অভিনব অব্দ গণনার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সুধীগণ স্থির করিয়াছেন[২]। এই সময়ে নেপালের লিচ্ছবি বংশের প্রতাপ পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেই মহা শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশকে পরাজয় করিয়া হিমানী-মণ্ডিত নেপালের পার্বত্য প্রদেশেও তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিরাজ স্বীয় দুহিতা কুমার দেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করকমলে সমর্পন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপাল-বিজয়ের পরেই চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবি-রাজকন্যা বিবাহ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ; কারণ, পিতৃরাজ্যে কুমার দেবীর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। সেজন্যই চন্দ্রগুপ্ত তদীয় প্রচলিত মুদ্রায় স্বীয়নাম, পত্নীর নাম এবং শ্বশুরকুলের নাম সংযুক্ত করিয়া মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন[৩]। চন্দ্রগুপ্তের একাধিক মহিষী ও একাধিক পুত্র বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমার দেবীর গর্ভজ যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তকেই আপনার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ৩২৬-৩৭৫ :

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সমর বিদ্যায় ও শান্তি সংস্থাপনে এরূপ বিচক্ষণ ও পারদর্শী ছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রথিতনামা রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে সংস্থিত রহিয়াছে ; বস্তুত তাঁহার শৌর্য বীর্য এবং রণ-পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই তিনি পার্শ্ববর্তী নৃপতিগণের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ ছিল, জয়াকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ছিল না। সুতরাং পর-রাষ্ট্রগ্রহণই নৃপতিগণের কর্তব্য, এই নীতির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্যই তদীয় সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই রাজ্য-বিস্তারে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং রাজ্যজয়ের বিবরণ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় অনুরক্তি এবং ব্রাহ্মণলভ্য বিদ্যায় অসামান্য জ্ঞান থাকা

সত্ত্বেও ধর্মের গোড়ামি তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ অশোকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্যই, যে অশোক ধর্মের জয়কেই প্রধানতম জয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাঁহার শিলাশাসন-স্তম্ভগাত্রের পার্শ্বেক দেশে তদীয় পার্থিব বিজয় কাহিনীর গৌরব গাথা, সুপণ্ডিত ও কবি হরিসেন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই[৪]।

উক্ত শিলালিপিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অভিযান প্রসঙ্গ ব্যতীত তদীয় শাসন সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। রাজকবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রা চতুরংশিত করিয়াছেন। ১ম—দক্ষিণাপথের একাদশ সংখ্যক রাজন্যবর্গের প্রতিকূলে,—২য়—আর্যাবর্তের নৃপতি কুলের বিরুদ্ধে (এখানে নয়জন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং আরও কতিপয় অনুল্লিখিত-নামা রাজার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে) ; ৩য়—অসভ্য বন্য সর্দার দিগের প্রতিপক্ষে ; ৪র্থ—সীমান্তবর্তী রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাল প্রভাবে স্থানগুলির অবস্থান্তর ও নামান্তর হওয়াতে যুদ্ধস্থানগুলির অবস্থান নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইবার উপায় নাই।

অশোকস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত প্রশস্তি :

উক্ত অশোক স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে লিখিত আছে,—"সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুর-আদি প্রত্যন্তভি র্স্মালবার্জ্জুনায়ন-যৌধেয় মাদ্রকাভির-প্রার্জ্জুন-সনকানীক-কাক-খর-পরিক-আদিভিশ্চ সর্ব্বকরদান-আজ্ঞাকরণ-প্রণামাগমন পরিতোষিত-প্রচণ্ড শাসনস্য" * * * * ইত্যাদি[৫]। অর্থাৎ মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্তস্থিত রাজ্যের নৃপতিগণ দ্বারা এবং মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভির, প্রার্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতি কর্তৃক সর্বকরদান, আজ্ঞাকরণ প্রণাম ও আগমন দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

সমতট ও ডবাক প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যান্তর্গত ও প্রান্তসীমায় অবস্থিত অথবা ঐ সমুদয় রাজ্য তদীয় সাম্রাজ্যের বহিঃপ্রান্ত দেশে স্থিত ছিল এতদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, উপরোক্ত শাসনোল্লিখিত "প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ" পদাংশের প্রকৃত মর্মোদ্‌ঘাটন হইলেই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে! এতৎসম্বন্ধে ফ্লিট সাহেব বলেন, "প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ—This may denote either the Kings within the frontiers of Samatata and the following countries i.e. the neighbouring Kings of those countries, or the Kings or chieftains just outside the frontiers of them. Upon the interpretation that is accepted, will depend the question whether Samudra Gupta's Empire included those countries, or whether it only extended upto, and was bounded by their frontiers"[৬]। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যন্ত নৃপতিগণ যে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে সম্মত ও তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ঐ সমুদয় রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তদীয় সাম্রাজ্যের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিল। ঢাকা শহরের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে এবং ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালিপার অঞ্চলে গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে এতৎ প্রদেশে ঐ মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং এতদঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডবাক :

ডবাকের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়! মিঃ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ বর্তমান রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন[৭]। মিঃ ষ্টেপেলটনের মতে, "ব্রহ্মপুত্র নদ গাড়ো পর্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের

উত্তরাংশস্থিত গঙ্গাও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান এবং গঙ্গাতীরবর্তী গৌড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগ স্থান পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত"[৮]।

মিঃ স্মিথের নির্দেশিত ভূভাগ পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে পুণ্ড্রের কোনও উল্লেখ নাই ; দুদ্ধর্ষ পরাক্রমশালী মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজধানীর প্রায় দ্বারদেশে অবস্থিত থাকিয়া পুণ্ড্র রাজ্য যে স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। উহা খাস গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এ জন্যই প্রত্যন্ত রাজ্য সমূহের উল্লেখ কালে রাজ কবি পুণ্ড্র রাজ্যের নাম করেন নাই।

ডবাকের অবস্থান নির্ণয় :

ডবাক রাজ্যের নাম অন্য কোথাও উল্লিখিত না হইলেও উক্ত শিলালিপি হইতেই উহার স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। শত বৎসর পূর্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবেগের পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব হইয়া ময়মনসিংহের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকা ও পাবনা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সম্ভবত মিঃ স্মিথ উপরোক্ত বিষয়গুলি একেবারেই প্রণিধান করেন নাই। রাজকবি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির পরম্পরা রক্ষা করিয়া পর্যায়ক্রমে নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডবাক রাজ্য এরূপ স্থানে সংস্থিত যে উহার এক প্রান্তে সমতট এবং অপর প্রান্তে কামরূপ অবস্থিত ; অর্থাৎ সমতট ও কামরূপ রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগই ডবাক নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঢাকা জেলার উত্তরাংশকেই ডবাক বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফ্লিট সাহেবের মতে ডবাক ঢাকারই নামান্তর মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ, সমতট ও ডবাক এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গুপ্ত রাজগণের সামন্ত রাজ্য রূপে পরিগণিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতভাষায় "ঢক্কী প্রাকৃত" নাম দৃষ্ট হয়। "ঢক্কী প্রাকৃত" সম্ভবত ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত দেশজ ভাষা। পূর্বে "ডবাক" প্রদেশে যে ভাষার প্রচলন ছিল, পরবর্তীকালে উহাই "ঢক্কী প্রাকৃত" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল কিনা তাহা চিন্তনীয় বিষয় বটে।

শিলালিপি এবং আবিষ্কৃত গুপ্ত রাজগণের মুদ্রাদির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশিত হইতে পারে। উত্তর ভারতের উর্বরা এবং জন-বহুল সমুদয় প্রদেশই তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের পরে এরূপ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অন্য কোনও নৃপতিই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, গান্ধার এবং কাবুলের কুষাণবংশীয় নৃপতিবর্গ, অক্ষাস নদী তীরবর্তী মহাবল পরাক্রান্ত রাজন্যগণ এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপাধিপতির সহিত ও তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই সমুদ্রগুপ্ত তদীয় বিজয় কাহিনী চিরস্মরণীয় এবং তাঁহার সার্বভৌম রাজচক্রবর্তীত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের পরে আর কোনও নৃপতিই এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, এতদুপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে মুক্ত হস্তে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদি সম্মুখস্থ অশ্বের অনুরূপ প্রভূত সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার উক্ত অশ্বমেধমুদ্রা নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সঙ্গীত চর্চার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় সুবর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রার উপরে বীণাপাণি মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র অসাধারণ বীর, যোদ্ধা ও রাজনীতি বিশারদ ছিলেন, তাহা নহে . পরন্তু কাব্য এবং সঙ্গীতালোচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি

বহু সঙ্গীতজ্ঞ এবং কাব্যামোদী ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিলেন। অনেক সময়ে রাজসভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কূট তর্কবিতর্কেও সময় অতিবাহিত করিতেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহাকে ভারতীয় নেপোলিয়ান বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার মৃত্যুর বৎসর স্থিররূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও তিনি যে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল পর্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহিষী দত্তদেবীর গর্ভজ পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) খ্রিষ্টাব্দ ৩৭৫-৪১৩ :

আনুমানিক ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দে, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পরলোকান্তে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। পিতামহের নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রগুপ্ত রাখা হইয়াছিল। ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। সিংহাসনে আরোহণের কিয়ৎকাল পরে ইনি "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহার এই উপাধিগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল বিবেচিত হয়। ইনি পিতার শৌর্যবীর্য এবং যুদ্ধ প্রিয়তারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

দিল্লির নিকটবর্তী মিহিরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত একটি লৌহস্তম্ভে "চন্দ্র" নামধেয় একজন নৃপতির দিগ্বিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিহিরৌলীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ "চন্দ্রের" অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী। মিহিরৌলী স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোভি লিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধি বাস্যতে জলনিধি র্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ।।
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিত স্যেতরাং
মূর্ত্যা কর্ম্ম জিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুত ভুজো যস্য প্রতাপে মহা
ন্নাদ্যাপ্যুৎ সৃজতি প্রণাশিত রিপোর্য্যত্নস্যাশেষঃ ক্ষিতিম্।।
প্রাপ্তেন স্বভূজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধি রাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুঃ পদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণুর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ।।

মিঃ প্রিন্সেপের মতে এই শিলালিপি খ্রিষ্টিয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডাঃ ভাউদাজি উহাকে গুপ্ত রাজগণের পরবর্তী সময়ের বলিয়া অনুমান করেন। আবার অক্ষর তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মিঃ ফার্গুসন ইহাকে গুপ্তবংশীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফ্লিট সাহেব উহাকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলেও তিনি বলেন "ইহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই শিলালিপিতে শকদিগের বিষয় উল্লিখিত না হওয়ায় উপরোক্ত অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। মিহিরৌলী নামক স্থানে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং নামের সৌসাদৃশ্য বিবেচনায় ইহা ইউয়ান চোয়াং-এর অনুল্লিখিত নামা, মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও হওয়াও অসম্ভব নহে"। কিন্তু এই অনুমান লিপির ভাষা দ্বারাও সমর্থিত হয় না। শ্বেত-হূণ-রাজ মিহিরকুল একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা

বলিয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। ডাক্তার হোরণ্‌লীর মতে লিপির অক্ষরাবলি উত্তর পূর্ব ভারতীয় গুপ্ত লিপিরই অনুরূপ। এরূপ অক্ষরের ভারতীয় লিপি সমূহ সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে স্কন্দ গুপ্তের সময় (৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উত্তর-পূর্ব-ভারতীয় অক্ষরের প্রায় সমুদয় খোদিত লিপি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান জনপদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র ও তৎপৌত্রের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছে। এজন্য হোরণ্‌লি সাহেব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই লৌহস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ৪১০ খ্রিষ্টাব্দে লৌহস্তম্ভের নির্মাণ কাল স্থির করিয়াছেন। মিঃ ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে, লৌহস্তম্ভের চন্দ্র এবং শিশু নিয়ার পর্বত লিপির উল্লিখিত সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা অভিন্ন হইতে পারে না। চন্দ্রবর্মা আলাহাবাদের স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপির বর্ণিত আর্যাবর্তের অন্যতম রাজা হওয়াই সম্ভব, তিনি কামরূপ বা আসামের রাজা হইতে পারেন। শুশুনিয়ার খোদিত লিপিতে যে পুষ্করের উল্লেখ আছে তাহা আজমীঢ়ে হওয়া অসম্ভব। স্মিথ সাহেব ডাঃ হোরণ্‌লির মতই সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, "মহারাজ চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না। তাঁহারই সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ হোরণ্‌লি যে সময় স্থির করিয়াছেন, তাহা আরও প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী লিপি অবশ্যই ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বেই খোদিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভাগবত বা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত এই বিষ্ণুধ্বজ (লৌহস্তম্ভ)। তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তও বৈষ্ণব ছিলেন। তিনিই পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুধ্বজ লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ও ইহার গাত্রে লিপি খোদিত হয়, তৎকালে স্তম্ভটি এখানে ছিল না। এই খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, বিষ্ণুপদ নামক গিরির উপরই প্রথমে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষ্ণুপদ গিরি মথুরাস্থ কোন একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে হইবে, তথা হইতে অনঙ্গপাল দিল্লিতে আনয়নপূর্বক পুনঃ স্থাপন করেন"[৯]। গৌড় রাজমালার লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথের মতানুসরণে ইহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শিলালেখ বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বলেন, "সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবত বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[১০]। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বঙ্গবিজয়ী "চন্দ্র" ও গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারে না। "মিহিরৌলী বা উদয়গিরির শিলালিপি সমূহের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, উভয়ের বহু পার্থক্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভ-লিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্যাবর্তের পশ্চিমাংশে খ্রিষ্টিয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত ইহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই ; পরন্তু, প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসাড় স্তম্ভ লিপির অক্ষরগুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভ লিপি বিষ্ণুপদ গিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটি বিষ্ণুপদ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, একটি গয়াধামে ও দ্বিতীয়টি পুষ্করে। শুশুনিয়া পর্বতের খোদিত লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুষ্করাধিপতি সিংহ বর্মার (সিদ্ধ বর্মা নহে) পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা কর্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল[১১]। সুতরাং এই উভয় চন্দ্রবর্মাই এক ব্যক্তি এবং বিষ্ণুপদ গিরি পুষ্করে হওয়াই অধিক সম্ভব। সিংহ বর্মার পুত্র কিরূপে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি ও শুশুনিয়া-শিলালিপি উভয়ই বৈষ্ণব-খোদিত-লিপি। প্রথমটি ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক অনুষ্ঠিত। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে শুশুনিয়ার শিলালিপি খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীরর পরবর্তী হইতে পারে না[১২]। লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপির অক্ষর শুশুনিয়া-খোদিত লিপির অনুরূপ[১৩]।

শুশুনিয়া-শিলালিপিতে পুষ্করণ বা পুষ্করণা নামক দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্ট বা চারণগণের গ্রন্থে বর্তমান মারোয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোকরণা বা পুষ্করণা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, দেখিয়াছেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইল পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালবদেশের মন্দসোর নগরে একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে শুশুনিয়ার খোদিত লিপির রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ৪৬১ বিক্রমাব্দে বা ৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে দশপুরে (মন্দসোরে) জয় বর্মার পৌত্র, সিংহ বর্মার পুত্র নরবর্মা নামক একজন নৃপতি বর্তমান ছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা মালবাধিপতি বন্ধুবর্মা, নরবর্মার বংশ সম্ভূত। সুতরাং মন্দসোর-লিপি এবং শুশুনিয়ার খোদিত লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে মালবরাজ সিংহ বর্মার পুত্র শুশুনিয়ার খোদিত লিপির লিখিত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্মা। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়কালে এই চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৪]। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে চন্দ্রবর্মা দিগ্বিজয় মানসে বঙ্গদেশে উপনীত হইলে বঙ্গবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবত তৎকালে গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তদীয় পিতা মহারাজ ঘটোৎকচ চন্দ্রবর্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং শুশুনিয়া পর্বতে তদীয় দিগ্বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; পরে, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্মাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বয়ং পরম বৈষ্ণব হইলেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ এবং প্রবাদাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং তদীয় ভ্রমণের শেষ দুই বৎসর (৪১১-৪১২ খ্রিষ্টাব্দ) তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেবমূর্তির চিত্র সঙ্কলনে নিরত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মল্ল যোদ্ধার এবং সিংহ বাহিনী মূর্তিবিশিষ্ট বহুমুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ আদিত্য সেনের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত এবং কান্যকুব্জাধিপতি মৌখরী বংশীয় হরিবর্মা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই হরিবর্মা গুপ্তবংশীয় জয়গুপ্তের কন্যা জয়স্বামির পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৩-৪৫৫ :

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজমহিষী ধ্রুবদেবীর গর্ভজাত তনয় কুমার গুপ্ত সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন[১৫]। ইহার প্রপৌত্রেরও এই নাম রাখা হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে ইহাকে প্রথম কুমার গুপ্ত নামে পরিচিত করা হয়। ইহার সমসাময়িক যে সমুদয় লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে ইনিও দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১১৩ গুপ্তসম্বতে (৪৩২ খ্রিষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের একখানি তাম্রশাসন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদি-সম্মুখস্থ অশ্বের মূর্তি সম্বলিত মুদ্রা ঢাকার সন্নিকটবর্তী মানেশ্বর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ কুমার গুপ্তের রাজ্যকাল পূর্ণ হইবার অত্যল্পকাল পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রবংশের সহিত ইহার তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে পুষ্যমিত্রগণই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্তু যুবরাজ স্কন্দ গুপ্তের অতুল প্রতাপ এবং অসামান্য রণকৌশলে বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে গুপ্ত সম্রাটেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। কৃষ্ণগুপ্তের পুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত এবং মৌখরী হরি বর্মার পুত্র আদিত্য বর্মা ১ম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক। আদিত্যবর্মা শ্রীহর্ষের কন্যা হর্ষ গুপ্তাকে বিবাহ করেন।

প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন আর্যাবর্ত যে কোনও দিন বিদেশীয় জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তৎকালে কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইলে যখন কুমার গুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে হূণগণ ধীরে ধীরে পঞ্চনন্দ, কাশ্মীর, দরদ ও খসদেশ আক্রমণ করিয়া উহা শ্মশানে পরিণত করিতে লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত এই হূণ জাতির সম্মুখে গান্ধারের কুষাণ রাজ্য স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না। বাহ্লীক ও কপিশাও হূণগণের পদানত হইল। পরাক্রান্ত হূণগণ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিল তখন সম্রাট বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। কুমার স্কন্দগুপ্ত তৎকালে মথুরার শাসনকর্তা রূপে বিরাজিত। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের অসীম রণনৈপুণ্যও হূণগণের শক্তি পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইল না। মথুরা শত্রুসৈন্যের করকবলিত হইল। পাটলিপুত্র নগরী ও উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ছিলনা।

স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫-৪৮০ :

৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইলে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড় নামক স্থানে স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি যেমন অসাধারণ ধীর তেমনই রণনীতিবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে মধ্য-এশিয়াবাসী হূণগণ প্রলয় প্লাবনের মত সমগ্র উত্তরাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগের উপদ্রবে কত সুশস্য শ্যামল ক্ষেত্র, কত সমৃদ্ধ নগর যে ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত প্রথম বারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে উহারা পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী গান্ধারাধিপতি কুষাণবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া ক্রমশ মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আনুমানিক ৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের দ্বারদেশে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এবার তিনি উহাদিগের গতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। হূণদিগের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, অনুমিত হয় ; কারণ তদীয় রাজত্বের প্রথমভাগে প্রচারিত যে সমুদয় সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বে ও সৌন্দর্যে প্রাচীন গুপ্ত সম্রাটগণের প্রচারিত মুদ্রার অনুরূপ হইলেও শেষভাগের প্রচারিত মুদ্রাগুলিতে সুবর্ণের ভাগ ১০৮ হইতে ৭৩ গ্রেণে নামিয়া আসিয়াছিল। হূণদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য' ধ্বংসমুখে পতিত হয়। স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণনায়ক তোরমাণ শাহ এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত গুপ্তরাজগণ ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষগুপ্তের পুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত এবং আদিত্য বর্মার তনয় ঈশ্বর বর্মা ইহার সমসাময়িক।

পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ :

৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে সমকালে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। ইহার কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণী আনন্দের পুত্র পুরগুপ্ত মগধ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি প্রদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ের যে কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাদ্দিকে "প্রকাশাদিত্য" কথাটি লিখিত আছে। উহা পুরগুপ্তের উপাধি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মাতার নাম অনন্তদেবী ; সম্ভবত ইনি মৌখরী অনন্ত বর্মার তনয়া। ইনি সম্ভবত ৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে তদীয় সেনাপতি ভট্টার্ক বল্লভী জয় করেন। পূর্বমালবাধিপতি বুদ্ধগুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক। বুধগুপ্তের অধীনে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণু ইরান প্রদেশের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। এই ধন্যবিষ্ণুর

সময়েই, আনুমানিক ৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে হূণরাজ তোরমান শাহ রাজপুতনা ও মালব প্রদেশের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পুরগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এখনও এই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই।

মিঃ এলেন বলেন[১৬], "পুরগুপ্তের যে সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে একটির পশ্চাদ্ভাগে "শ্রীবিক্রমঃ" এই কথা কয়টি লিখিত আছে, দেখিয়ে পাওয়া যায়। সুতরাং অন্যান্য গুপ্ত রাজগণের ন্যায়, পুরগুপ্তের "আদিত্য" উপাধি-যুক্ত নাম "বিক্রমাদিত্য" ছিল বলিয়াই মনে হয়।" পরমার্থ-বিরচিত বসুবন্ধুর জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অযোধ্যাধিপতি বিক্রমাদিত্য, বসুবন্ধুর উপদেশে সদ্ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বীয় রাজ্ঞী ও যুবরাজ বালাদিত্যকে বসুবন্ধুর নিকটে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; পরে, বালাদিত্য পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বসুবন্ধুকে রাজসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, গুপ্তরাজগণ মধ্যে "প্রকাশাদিত্য" উপাধি কাহার ছিল, তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে। প্রকাশাদিত্য, সম্ভবত স্কন্দগুপ্তের পুত্র বা উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভিতরি-মুদ্রার ন্যায় অপর কোনও তাম্রশাসন, শিলালিপি বা প্রমাণের অভাবে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্কন্দগুপ্তের পরে তদীয় ভ্রাতা পুরগুপ্তই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মল্লযোদ্ধার প্রতিমূর্তিযুক্ত যে সমুদয় মুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সমুদয় মুদ্রার ওজন ১৪৪ গ্রেণ অপেক্ষাও অধিক। এত ভারি মুদ্রা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই। এই মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠদেশে, রাজমূর্তির পাদদ্বয়ের মধ্যে, "ভা" এই কথাটি লিখিত রহিয়াছে। এবম্বিধ চিহ্নও স্কন্দগুপ্তের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই। মুদ্রাগুলির পশ্চাদ্দিকের অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ; কিন্তু ইহার প্রথমে "পর" এবং শেষে "আদিত্য" শব্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ; সুতরাং উহা ভারি ওজন-বিশিষ্ট স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। আকৃতি ও বিশুদ্ধতার হিসাবে এই মুদ্রাগুলিকে অধিকতর পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না ; সম্ভবত নরসিংহ গুপ্তের পরবর্তী হইবে না। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে, রাজার হস্তের নিম্নে, "চন্দ্র" এই কথাটি লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের স্থলেই সংক্ষিপ্তভাবে চন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে "শ্রীবিক্রমঃ" বা "শ্রীবিক্রমাদিত্যঃ" স্থলে "শ্রীদ্বাদশাদিত্যঃ" শব্দ লিখিত রহিয়াছে। মিঃ র‍্যাপসন "শ্রীদ্বাদশাদিত্য" পাঠোদ্ধার করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিয়াছেন কেন জানি না[১৭]। এই মুদ্রাগুলি যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নহে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহা নিশ্চয়ই চন্দ্রগুপ্ত নামধেয় পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ মধ্যে কাহারও হইবে। এই গুপ্ত নৃপতিকে "তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সেন্টপিটার্সবর্গ মিউজিয়মে গুপ্তবংশীয় ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা রক্ষিত আছে[১৮]। সুতরাং পরবর্তী গুপ্তরাজগণ মধ্যে প্রকাশাদিত্য, ঘটোৎকচ ও তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের সত্ত্বা অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের পশ্চিম-ভারতে অবস্থানের সুযোগে, বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব-ভারতে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভিতরি রাজমুদ্রায় পুরগুপ্তের অধঃস্তন বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; সুতরাং উপরোক্ত রাজত্রয় যে স্কন্দগুপ্তের অধঃস্তনবংশীয়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব, পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তবংশীয় রাজগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অপর কোনও অভিনব প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, পুরগুপ্তের বিদ্রোহ, স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। হোরণ্‌লি সাহেব স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুকাল ৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[১৯]। মিঃ স্মিথও উহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[২০]। মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তি কোনও সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। পুরগুপ্তের মহিষীর নাম মহাদেবী শ্রীবৎস দেবী।

পুরগুপ্ত পরলোকগমন করিলে, তদীয় পুত্র নরসিংহগুপ্ত "বালাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরমার্থের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের ন্যায় ইনিও বসুবন্ধুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বসুবন্ধুর শিক্ষাপ্রভাবে বালাদিত্য বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া ওঠেন, এবং সেজন্যই বৌদ্ধধর্মের প্রধান শিক্ষাস্থান মগধের সন্নিকটবর্তী নালন্দাতে কারুকার্যখচিত সুন্দর একটি স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নরসিংহগুপ্তের কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। মিহিরকুল ৫১০ খ্রিষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন[২১] | ডাঃ হোরণ্‌লির মতে মিহিরকুলের সিংহাসন প্রাপ্তি ৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে]। মন্দসোর-লিপি হইতে জানা যায় যে, মিহিরকুল ৫৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যশোধর্মনের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন | ডাঃ হোরণ্‌লি মিহিরকুলের পরাজয় ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[২৩]]। তাহা হইলে, ইহার পূর্বেই নরসিংহগুপ্ত মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবত ৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে অথবা তৎসমীপবর্তি কোনও সময়ে নরসিংহগুপ্ত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ভিতরি রাজ-মুদ্রার ফ্লিট সাহেবের পাঠোদ্ধার হইতে জানা গিয়াছে যে, বালাদিত্য-মহিষীর নাম মহালক্ষ্মীদেবী[২৪]। এই মহালক্ষ্মীদেবীর গর্ভেই দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের জন্ম হয়।

কালীঘাটে গুপ্তরাজগণের যে সমুদয় মুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই নরসিংহগুপ্ত এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রা। ঐ মুদ্রাগুলির মধ্যে কতকগুলি মুদ্রায় রাজার হস্তের নিম্নে "বিষ্ণু" এই শব্দটি লিখিত আছে। সম্ভবত ঐ মুদ্রাগুলি গুপ্তবংশীয় বিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রা। ইনি দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পরেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুগুপ্ত "চন্দ্রাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ ইহার মুদ্রার পশ্চাদ্দিকে "চন্দ্রাদিত্য" শব্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ হোরণ্‌লি এই মুদ্রাগুলিকে যশোধর্মনের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। তিনি মুদ্রার পশ্চাদ্দিকের শব্দটি "ধর্মাদিত্য" বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বস্তুত এই শব্দটি ধর্মাদিত্য নহে, চন্দ্রাদিত্যই বটে। মুদ্রাগুলি যে গুপ্তরাজগণেরই অনুরূপ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পুরগুপ্তের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র নরসিংহ, বালাদিত্য নাম পরিগ্রহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মে ইহার অনুরাগ ছিল বলিয়া, ইনি নালন্দে একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব-মালবাধিপতি ভানুগুপ্ত ইহার সমসাময়িক। ৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের সমকালে বালাদিত্যের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র কুমার গুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত ইনিই গুপ্তবংশীয় শেষ সম্রাট। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার পরে যে একাদশ জন গুপ্ত রাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে মগধের গুপ্তরাজ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু মগধেরও সমুদয় ভূভাগ তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌখরী নামক অপর এক রাজবংশও তৎকালে ঐ স্থানের একাংশে রাজত্ব করিতেন।

অপসড় গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত, আদিত্যসেন কর্তৃক বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে ঃ—মহারাজা কুমারগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত, তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার গুপ্ত ; ইনি ঈশান বর্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের পুত্র রাজশ্রী দামোদর গুপ্ত ; ইনি হূণ-দ্বেষ্টা মৌখরী দিগকে সমরে পরাজয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মহাসেন গুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ সুস্থিত বর্মাকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জন করিয়াছিলেন। বীরবর মাধবগুপ্ত ইহার পুত্র। ইনিই হর্ষদেবের সহচর এবং আদিত্য সেনের পিতা।

কানিংহাম, ফ্লিট, ডাক্তার হোরণ্‌লি, বেল্‌ডেন, স্মিথ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণ যখন মগধে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় হইতেই আদিত্য সেনের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম মগধে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনেব মৃত্যুর পর ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে,

কৃষ্ণগুপ্তের অধঃস্তন পুরুষ আদিত্যসেন, স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্বক মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের দেহান্ত হইলে গুপ্তবংশীয় মাধবগুপ্ত এবং তদীয় পুত্র আদিত্য সেন মগধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে আদিত্য সেন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ পূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তেরও "মহারাজাধিরাজ" উপাধি পরিলক্ষিত হয়। দেবগুপ্তের ভগ্নি দেবগুপ্তের সহিত মৌখরী-রাজ ভোগবর্মার, এবং ভোগবর্মার কন্যা, আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর সহিত নেপালের লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে[২৫]। মগধেও গৌড়মণ্ডলে এই পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব অপ্রতিহত হইলেও পূর্ববঙ্গে উহাদিগের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ :

খ্রিষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাটগণ অমিত-বিক্রমে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে সমগ্র আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং গুপ্ত সম্রাটগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর শেষপাদে স্কন্দগুপ্ত পেশাবর হইতে বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধুকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজ সম্মানে বিভূষিত ও স্বয়ং বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ বিচলিত হইয়া উঠে। ফলে ইহারা পুষ্যমিত্র বংশের শরণাপন্ন হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রগণও এই সুযোগে তাঁহাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথমে তাঁহারা গুপ্তবাহিনী পরাজিত ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও স্কন্দগুপ্তের সুকৌশলে এবং রণনিপুণতায় পুষ্যমিত্রগণের সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত সম্রাটের নিকট পরাজিত হইলেও, তোমরাণ ও মিহিরকুল প্রমুখ শক ক্ষত্রিয়গণের ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তসাম্রাজ্য জর্জরিত ও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। এই উভয় শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের যেরূপ শক্তিক্ষয় হইয়াছিল. তাহা আর পূরণ হইল না। সুযোগ পাইয়া অধীন সামন্তগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন পূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মালবাধিপতি যশোধর্মন অত্যল্পকাল মধ্যে, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে আরব সমুদ্রতীরবর্তী সমুদয় ভূভাগ, হস্তগত করিয়া বসিলেন। সুরাষ্ট্র অঞ্চলে মৈত্রক বংশও শক্তি সঞ্চয় পূর্বক শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে হীনবল গুপ্ত সম্রাট-গণের শ্লথকর-ধৃত শাসন হইতে ক্রমে ক্রমে সকল অধিকারই বিচ্যুত হইতে লাগিল। পাটলিপুত্রবাসী গুপ্ত-সম্রাট-বংশীয় কেহ কেহ গৌড় ও বঙ্গে আসিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রে, গুপ্ত ও বর্দ্ধন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল দেখিয়া. মগধ ও গৌড়ের গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে, প্রাচ্য ভারতে তান্ত্রিকগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ মন্ত্রযান, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়, তান্ত্রিকতায় আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল। এই কয় সম্প্রদায়ই বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাচ্য ভারত হইতে বৈদিক প্রাধান্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তরাজপাট একবারে উন্মূলিত হইল।

গুপ্তরাজগণের বংশলতা
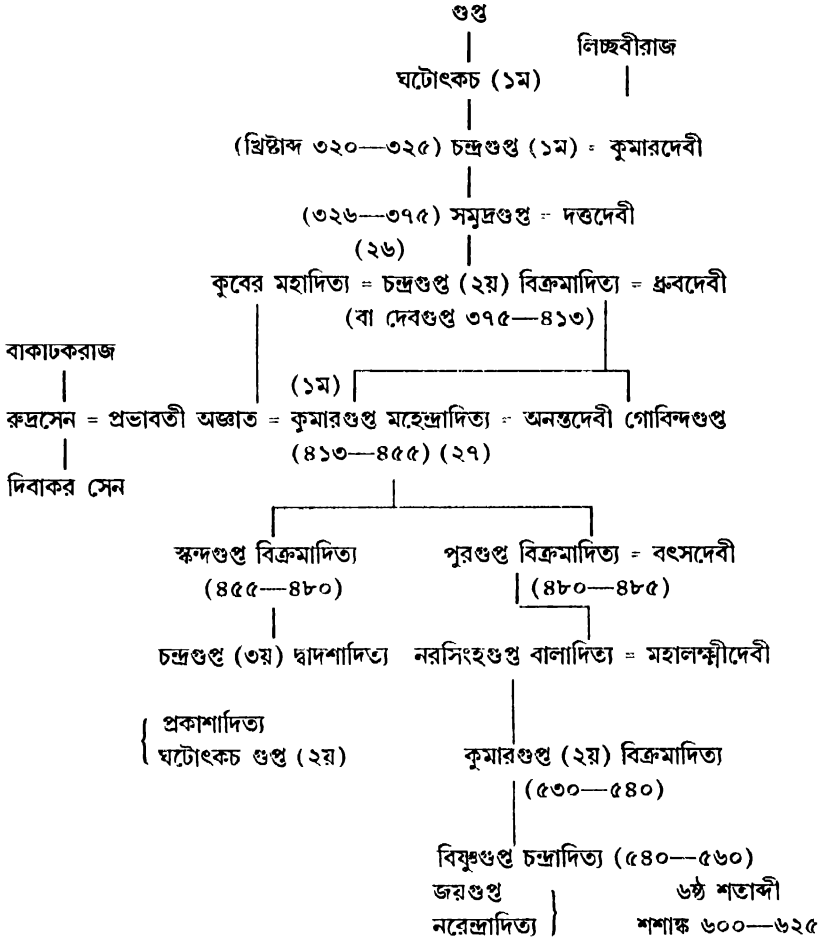
১. "অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাং স্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্ত বংশজাঃ।"
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—উপসংহার পাদ)।

২. Early History of India (2nd Ed pp 266) by V.A. Smith

৩ Ibid

৪ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত শিলালিপি পরবর্তী সময়ে উৎকীর্ণ হয় নাই। (J. R. A. S. 1898 p 386)। ভাষা ও রচনা প্রণালি দৃষ্টে উহা ৩৬০ খ্রিষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এলাহাবাদের দুর্গে উক্ত শিলাস্তম্ভ সংস্থাপিত রহিয়াছে, সম্ভবত উহা স্থানান্তরিত হইয়াই ঐ স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে (Foot note page 267 V. A Smith's Early H of India)

৫. Fleet's Gupta Inscriptions Page 8.
৬. Fleet's Gupta Inscriptions No. 1 Page 8. Foot note.
৭. Vide Map Shewing the Conquest of Samudra Gupta & The Gupta Empire in V. A. Smith's Early History of India (second edition) to face Page 270.
৮. J. A. S. B. 1906.
৯. J. R. A. S. 1899.
১০. গৌড় রাজমালা ৫ পৃষ্ঠা।
১১. পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় খোদিত লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ঃ—
(১) "চক্র স্বামীন ঃ দাস (+) (?) গ্রেণ (+) তি সৃষ্টঃ
(২) পুষ্করণাধি পতের্মহারাজ শ্রী সিঙ্হ বর্ম্মণঃ পুত্রস্য
(৩) মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্ম্মণঃ কৃতিঃ
অর্থাৎ চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক উৎসর্গীকৃত পুষ্করণাদিপতি মহারাজ শ্রীসিংহ বর্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্মার অনুষ্ঠান।
১২. প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৯।
১৩. প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২০।
১৪. "রুদ্রদেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম গণপতি নাগ নাগ সেনাচ্যুত বলবর্মাদ্য নেকার্য্যাবর্তরাজ প্রসভোদ্ধরর্নৈদ্ধত্ত প্রভাব মহতঃ"।
১৫. বামন প্রনীত কাব্যালঙ্কার সূত্রে লিখিত আছে ঃ—
"সোহয়ং সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্ত তনয়ঃ চন্দ্রপ্রকাশ যুবা।
জাতো ভূপতি রাশ্রয়ঃ কৃতধিয়ং দিষ্ট্যাকৃতার্থ শ্রমঃ"।।
অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত তনয় যুবক চন্দ্রপ্রকাশ বিবুধ মণ্ডলীর আশ্রয় স্থল, ইহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। ইহা দ্বারা পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্র প্রকাশ এবং বালাদিত্য (কুমার গুপ্ত) নামক দুই পুত্র ছিল। বালাদিত্য বৌদ্ধদিগকে প্রীতি চক্ষে দেখিতেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে পিতৃসিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রকাশ পরাজিত হন এবং বালাদিত্য সিংহাসনে আরোহন করেন (J. A. S. B 1905)। কিন্তু এই বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে চন্দ্রপ্রকাশই কুমারগুপ্ত নাম ধারণ পূর্বক পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে "কৃতার্থ শ্রমঃ" শব্দের সার্থকতা থাকে না।
১৬. Allan's Catalogue of Indian Coins Pages Li-Liii.
১৭. Num. Chron. 1891. P 57.
১৮. Allan's Catalogue of Indian Coins Page 'Liv.
১৯. J. A. S. B. 1889 Page 96.
২০. Vincent Smith's Early History of Indian Page 293.
২১. Vincent Smith's Early History of India Page 298.
২২. Indian Antiquary 1889 Page 230.
২৩. J R. A. S. 1909 Page 230.
২৪. Indian Antiquary 1890 Page 227.
২৫. "দেবী বাষ্ট বলাঢ্য মৌখরীকুল শ্রীবর্মচূড়ামণি
খ্যাতিহ্রেপিত-বৈরিভূপতিগণ-শ্রীভোগবর্মোদ্ভবা
দৌহিত্রী মগধাধিপস্য মহতঃ আদিত্য সেনস্য যা
ব্যঢা শ্রীরিব তেন সা ক্ষিতিভূজা শ্রীবৎসদেবাদবাৎ।"
২৬. Indian Antiquary 1912. Page 214-215
Vakataka Cpperplate-K. B. Pathak.
২৭ কুমার গুপ্তের মুদ্রায় রাজমূর্তির দুই পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্তি পরিলক্ষিত হয়: স্ত্রীমূর্তি দুইটি কুমার গুপ্তের পট্টমহিষীদ্বয় বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যশোধর্মন; ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব; শশাঙ্ক; হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মা

যশোধর্মন :

গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল পর্যন্ত কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যভারতের মালব-রাজ যশোধর্মন তোরমাণের পুত্র হূণা-ধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া, পুনরায় সাম্রাজ্যের ঐক্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে বালাদিত্যের মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে তৎকালে যশোধর্মনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। দাশোর বা মন্দসোর নগরের সন্নিকটে প্রাপ্ত, যশোধর্মন কর্তৃক স্থাপিত, প্রস্তর স্তম্ভে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, "গুপ্তনাথগণ" এবং হূণাধিপগণ" যে সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় রাজ্যও উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[১]। লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া "গহন তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য ভূখণ্ডের সমুদয় রাজগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিল"[২]। মন্দসোরে আবিষ্কৃত ৫৮৯ মালব-বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ যশোধর্মন-বিষ্ণুবর্দ্ধনের অপর একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে[৩] —

> "প্রাচো নৃপায় সুবৃহতশ্চ বহুনুদীচঃ
> সাম্না যুধাচ বশগাৎ প্রবিধায় যেন।
> নামাপরং জগতি কান্ত মদো দুরাপং
> রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর ইত্যুদুঢ়ম্"।

"যিনি (যশোধর্মন) প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীচ্যনৃপতিগণকে সন্ধি সূত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, জগতে শ্রুতিসুখকর এবং দুলর্ভ "রাজাধিরাজ পরমেশ্বর," এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন।"

উক্ত লিপিতে প্রাচ্য নৃপতিগণের উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মহারাজ যশোধর্মন ৫৮৯ মালব বিক্রমাব্দের (৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের) পূর্বেই পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইউয়ান চোয়াং বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, এবং মাতার উপদেশে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন[৪]। মন্দসোর লিপিতে উক্ত হইয়াছে, মিহিরকুল নৃপতি যশোধর্মনের পাদযুগল অর্চনা করিয়াছিলেন[৫]। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ মন্দসোর লিপির উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং-লিখিত বিবরণীর উপরই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি উহা অত্যুক্তি দোষদুষ্ট, এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসাবাদ বলিয়া অনুমান করেন[৬]। মন্দসোর লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজকবি কর্তৃক বিরচিত; পক্ষান্তরে ইউয়ান-চোয়াংএর বিবরণী জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। ডাঃ হোরণ্লি স্মিথ সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজকবির উক্তিতেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন[৭]। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "Yasodharman took the honour to himself, and erected two columns of victory inscribed with

boasting words to commemorate the defeat of the foreign invaders. in these records he claims to have brought under his sway lands which even the Guptas and Huns could not subdue, and to have been master of northern India from Brahmaputra to the Western Ocean. and from the Himalya to mount Mohendra. in Ganjam. But the indefinite expression of the boasts and the silence of Hiuen Tsang suggest that Yasodharman made the most of his achievements, and that his court poet gave him something more than his due of praise. Nothing whatever is known about either his ancestry or his successors ; his name stands absolutely alone and unrelated. The belief. therefore is waranted that his reign was short, and of much less importance than that claimed for it by his magniloquent inscriptions[৮]। অর্থাৎ , যশোধর্মন (জেতার) সম্মান স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীর পরাজয়বার্তার স্বারকস্বরূপ দুইটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া উহাতে আড়ম্বরযুক্ত এবং অতি প্রশংসাবাদ পূর্ণ প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন। এই প্রশস্তিতে, "গুপ্ত-নাথ-গণ" এবং "হূণাধিপগণ" যে সকল দেশ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পয়োধি পর্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে গঞ্জামের অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত সমুদয় আর্যবর্ত ভূভাগের একাধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এবম্বিধ অনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত আত্মম্ভরিতা এবং ইউয়ান চোয়াং এর নীরবতা হইতে অনুমিত হয় যে, যশোধর্মনের কৃত-কার্যতার বিষয় অতিরিক্তভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে ; রাজকবি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ অথবা অধঃস্তন পুরুষদিগের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তাঁহার মানের সহিত অন্য কোনও ঘটনা পরম্পরার সংশ্রব পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবত অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট প্রশস্তির লিখিত বিবরণ অপেক্ষা তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী এবং বিশেষত্ব বিহীন বলিয়াই মনে হয়।"

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন-শিলাদিত্য সম্বন্ধেও একটি মাত্র প্রশস্তি ব্যতিত অপর কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যশোধর্মনের তিনখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের সৌভাগ্য যে, মহাকবি বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিত কাব্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যশোধর্মনের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। হর্ষবর্দ্ধনও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে আর্যাবর্তের একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের পরই তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। যশোধর্মনও অনন্য-সাধারণ-রণ-নৈপুন্যের প্রভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় বিপুল সাম্রাজ্যও কর্ণধার-হীন তরণীর ন্যায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্বপুরুষ বা অধঃস্তন পুরুষদিগের বিষয় অবগত না হইলেও যশোধর্মন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হন নাই এরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইবার কোনও কারণ নাই।

ইউয়ান চোয়াংএর লিখিত মিহিরকুল প্রসঙ্গ :

ইউয়ান-চোয়াং মিহিরকুল সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই[৯] "(ইউয়ান চোয়াং-এর ভারতাগমনের) কতিপয় শতাব্দী পূর্বে পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। ইনি অবসর মত বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচন করিতে সমুৎসুক হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্যকে তৎসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্যগণের অর্থাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাভেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন, সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্যগণ রাজানুগ্রহকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। এজন্যই

তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-অনুচর বহুকালাবধি ধর্ম-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তর্কে প্রাজ্ঞ এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্যগণ রাজসমীপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চনদ ভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম নিষ্কাশন এবং বৌদ্ধাচার্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

বালাদিত্য ও মিহিরকুল :

তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এজন্য তিনি মিহিরকুলের তাদৃশ গোর নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বীয় সাম্রাজ্যর সীমান্ত প্রদেশ সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কৃতকার্যের ফলে মিহিরকুলের ক্রোধনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ; তিনি বিপুল বাহিনী সমভিব্যহারে মগধাভিমুখে অভিযান করিলেন।

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক পার্বত্য ও মরুময় প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালাদিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন ; এজন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মিহিরকুল-রাজ, বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং নৌপথে ঐ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের সুকৌশলে প্রবল প্রতাপান্বিত মিহিরকুল শত্রু-সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল লজ্জা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখমণ্ডল স্বীয় পরিচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মন্ত্রীগণ-পরিবেষ্টিত রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ বালাদিত্য তদীয় জনৈক আমাত্যকে মিহিরকুলের মুখাববণ উন্মোচন করিবার জন্য আদেশ করিলে, মিহিরকুল উত্তর করিলেন "প্রভু এবং প্রজা স্থান বিনিময় করিয়াছে ; শত্রুর মুখাবলোকন করা নিষ্ফল, বাক্যালাপের সময় আমার মুখসন্দর্শন করিলে কি লাভ হইবে?" বালাদিত্য বারত্রয় আদেশ প্রদান করিয়াও বিফলমনোরথ হইল, তিনি তাঁহাকে শাস্তিপ্রদান করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বালাদিত্যের আদেশ এবং বহু অনুরোধ সত্ত্বেও মিহিরকুল মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন।

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় মনস্বিনী ও জ্যোতিষ-বিদ্যা-পারদর্শিনী ছিলেন। মিহিরকুলের প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বালাদিত্যের আদেশে মিহিরকুল তাঁহার সমীপে নীত হইলে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আহা! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইওনা, সমস্ত পার্থিব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ; সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনানুসারে চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ কর।" রাজ-মাতার বহু আকিঞ্চনে মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে বালাদিত্য মিহিরকুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে মুক্তিপ্রদান পূর্বক বিদায় দিলেন।

মন্দসোরলিপি ও ইউয়ান-চোয়াংএর কাহিনীর সমালোচনা :

চৈনিক পরিব্রাজকের আড়ম্বরপূর্ণ কাহিনী কতদূর সত্য তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতার কাহিনীর সহিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে অশোক এবং কণিষ্কের প্রতি আরোপিত নিষ্ঠুরতার এরূপ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। কিন্তু বালাদিত্যের বৌদ্ধধর্মানুরক্তির বিষয় পরমার্থ ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; ইহা হইতে মনে হয় যে, মিহিরকুল-বালাদিত্য বিষয়ক কাহিনী কিয়ৎ

পরিমাণে সত্য হইতেও পারে। সম্ভবত নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য তোরমাণ নন্দন মিহিরকুলকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বালাদিত্য ভারতবর্ষকে হূণগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বালাদিত্য যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা প্রহৃত রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বালাদিত্যের শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই, তাঁহার মুদ্রাদিতেও এরূপ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তিনি পরবর্তী গুপ্তরাজগণ অপেক্ষা বিশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। পক্ষান্তরে দাসোর বা মন্দসোর লিপিত্রয় আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউয়ান-চোয়াং লিখিত বালাদিত্য কর্তৃক মিহিরকুলের পরাজয় কাহিনী দুর্বোধ্যও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য এবং যশোধর্মনের সম্মিলিত শক্তিই মিহিরকুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল[১০]। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাশোর বা মন্দসোর লিপি অথবা ইউয়ান-চোয়াংএর উক্তি ইহার কোনটিতেই হূণ রাজের বিরুদ্ধে বালাদিত্য ও যশোধর্মনের সহযোগিতার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। দুইটি প্রমাণই এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, হূণ-রাজ-বিজয়ের যশোমাল্য একজনেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। ফ্লিটসাহেব এই দুইটি প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালাদিত্য মগধে, এবং যশোধর্মন পশ্চিম দিকে, মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১১]।

কিন্তু, যশোধর্মন এবং বালাদিত্য উভয়ে, বিভিন্ন সময়ে, মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পুনরায় মদক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। মন্দ-সোর-লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজকবি কর্তৃক বিরচিত ; পক্ষান্তরে বিদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণী শতাধিক বৎসর পরে জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। এমতাবস্থায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রবাদ অবলম্বনে বৈদেশিক কর্তৃক পরবর্তী সময়ে বিরচিত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিশেষত ইউয়ান-চোয়াংএর লিখিত বিবরণী একটি মনোরম উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের মনে হয়, হূণরাজ মিহিরকুলের প্রবল আক্রমণ এবং অত্যাচারের স্রোত হইতে বালাদিত্য মগধ রাজ্য রক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র, এবং পরে, যশোধর্মন মিহিরকুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইউয়ান চোয়াং এই দুইটি পৃথক ঘটনা একই ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইয়াছি মনে করিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। হয়ত বা তিনি বালাদিত্য ও যশোধর্মন কর্তৃক মিহিরকুলের পরাজয় ও পতন কাহিনী শ্রবণ করিয়া উহা একই ঘটনাস্রোতের ফল মনে করিয়াছেন ; এবং বসু-বন্ধুর অকৃত্রিম সুহৃদ্ বৌদ্ধধর্মের ভক্তিমান সেবক, সদ্ধর্মের সহায়ক ও উৎসাহ দাতা বালাদিত্যের মস্তকে এই যশোমাল্য অর্পন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। একপক্ষে স্বদেশীয় প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি এবং অপর পক্ষে সদ্ধমের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বৈদেশিকের বহুপরবর্তী সময়ে লিখিত কাহিনী। রাজকবি যশোধর্মনকে একটু অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেও এই ক্ষেত্রে বৈদেশিকের উক্তিতেই সন্দেহ স্থাপন করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত মিহিরকুলের সময়ে হূণ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তোরমাণের প্রতিষ্ঠিত হূণ সাম্রাজ্য বহুকাল পর্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নিকটে স্বীয় গর্বোন্নত মস্তক স্থির রাখিতে অক্ষম হইয়াছিল : ফলে উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় উহার পতন ও একটু দ্রুত সংঘটিত হইয়াছিল। হূণ-শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ; প্রাচীন উন্নত সভ্যতার নিকটেই বর্বর রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাঃ হোরণ্লি ইউয়ান-চোয়াং এর বিবরণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"What are we to think of its historical trustworthiness when Huen Tsang places Mihir Kula, and by implication his supposed conqueror Baladitya, 'some Centuries Previous' to

his own time and when he represents Baladitya as holding a position subject to the orders of Mihir Kula!"

অর্থাৎ ইউয়ান-চোয়াং মিহিরকুল এবং তাঁহার তথা-কথিত বিজেতা বালাদিত্যকে বহুশতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত এবং তাঁহাকে মিহিরকুলের আজ্ঞাধীন সাঁমন্ত নরপতি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্ধন :

মন্দসোর লিপিত্রয়ের একখানিতে যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন এই দুইটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হোরণ্‌লি বলেন, প্রশস্তিতে "স এব নরাধিপতিঃ" (the very same sovereign) উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন। কিন্তু ঐ প্রশস্তিতে "বিজয়তে জগতীম্ পুনশ্চ শ্রীবিষ্ণুবর্দ্ধন নরাধিপতিঃ স এব," লিখিত আছে। সুতরাং অপর কোনও প্রশস্তি বা প্রমাণাবলি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটি মাত্র প্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়া যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে ৫৯০ মালবাব্দে বা ৫৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রীর ভ্রাতা দক্ষ একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। ইহাতে যশোধর্মনকে কেবলমাত্র "জনেন্দ্র" বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রশংসাবাদে প্রশস্তির অনেক স্থান অধিকৃত হইয়াছে। প্রশস্তি-দাতা পুরুষানুক্রমেই বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং তদীয় পূর্বপুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। যশোধর্মন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এই "নরাধিপতি" উত্তর ও পূর্বদিকস্থ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া "রাজাধিরাজ" এবং "পরমেশ্বর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি "ঔলিকর-লাঞ্ছিত" কিরীট ধারণ করিতেন। যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন হইলে বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রশংসাবাদ মধ্যে মিহিরকুলের পরাজয় কাহিনী অনুল্লিখিত থাকিবার কারণ কি? অবশ্য ৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে মিহিরকুলের পরাজয় ব্যাপার সংঘটিত হইলে প্রশস্তিতে উহা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু ৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে মিহিরকুলের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রশস্তির সহিত মন্দসোরে প্রাপ্ত কুমারগুপ্ত (১ম) ও বন্ধু-বর্মার প্রশস্তি, বুধগুপ্ত এবং মাতৃবিষ্ণুর ইরাণ প্রশস্তি এবং শশাঙ্ক ও মাধবরাজের তাম্রশাসন তুলনা করিলে মনে হয়, বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্মনের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন[১২]।

যশোধর্মন বৃদ্ধ সম্রাট স্কন্দগুপ্তের অধীন তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সৌভাগ্যবলে সামান্য সৈনিকের পদ হইতে রাজপদবি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তরুণ সৈনিক বৃদ্ধ গুপ্ত সম্রাটের পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘকালব্যাপী হূণযুদ্ধে বহুস্থানে অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "শত শত যুদ্ধে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করতঃ অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে সম্রাট নিহত হইলে যশোধর্মা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।" কথিত আছে, "স্কন্দগুপ্ত হূণ সমরে জীবনাহুতি প্রদান করিলে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে ইনি সুবর্ণ-নির্মিত গরুড়-ধ্বজ গ্রহণ পূর্বক জলে ঝম্প দিয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধের পরিচর্যার সবল-দেহ হন। বৃদ্ধ, অবসর মত এই নবাগত যুবকটিকে তথাগতের কথা, সদ্ধর্মের বিবরণ, প্রাচীন রাজগণের কাহিনী, শ্রবণ করাইতেন। গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যাভাবে কিরূপে সদ্ধর্মের অবনতি হইয়াছিল, শক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কিরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, ভগবান তথাগতের প্রতিষ্ঠিত সাম্য সংস্থাপক সদ্ধর্মের শাখা ভেদ ও শাখা সমূহের কলহ, হীনযান মহাযানের দ্বন্দ্ব, লিচ্ছবি বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও সমুদ্রগুপ্ত গোপনে সদ্ধর্মের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সত্ত্বেও উত্তরাপথবাসিগণ, গুপ্তসম্রাটগণের সহায়তায় বলীয়ান ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া

যশোধর্মের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং সদ্ধর্মের প্রণষ্ট-গৌরবের পুনরুদ্ধার-স্পৃহা বলবতী হইয়া পড়ে। অদম্য অধ্যবসায় এবং অসীম শৌর্যবীর্যের প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অনুগাঙ্গ প্রদেশে এবং মগধে, গুপ্ত রাজগণ তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল, লৌহিত্য তীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের শোণিতপিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্মের ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে, গভীর নিশীথে, পশুহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সঙ্গোপনে রক্ষা করিত, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্বতে, বালুকাতপ্ত উত্তর মরুদেশে, খস ও হূণগণ কম্পিত হইত, এবং সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে, পূর্ব সমুদ্রতীরে, হরিদ্বর্ণ তালীবন বেষ্টিত মহেন্দ্রগিরির শীর্ষে তাঁহার জয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল।"

ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র :

ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালীপার এবং ঘাগরাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে যথাক্রমে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক "মহারাজাধিরাজ" ত্রয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে[১৩]। ডাক্তার হোরণ্‌লি অনুমান করেন, ধর্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ যশোধর্মেরই নামান্তর, এবং গোপচন্দ্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে এই তাম্রশাসন চতুষ্টয়ই জাল বা কূট শাসন বলিয়া প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মিঃ পার্জিটার রাখালবাবুর যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক যে, এই তাম্রশাসন গুলি কৃত্রিম নহে[১৪]। কিন্তু তর্কসঙ্কুল বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলেও, এই তাম্রশাসনগুলি হইতে অনেক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে।

প্রথম তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে, তদীয় অনুগ্রহে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারক-মণ্ডলের অধীশ্বর রূপে এবং জজাব বারক মণ্ডলের "বিষয়-পতি" পদে সমাসীন ছিলেন।

এই লিপি ধর্মাদিত্যের অথবা স্থাণুদত্তের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। "সাধনিক" বাতভোগ, "বিষয় মহত্তর" ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসখ, কুলস্বামী, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, অর্জুন-বপ্প, কুণ্ডলিপ্ত পুরঃসর প্রকৃতি বৃন্দের নিকট হইতে পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত রীত্যনুযায়ী এবং শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে "অষ্টক-নবক-নল" দ্বারা অংশ বিভাগ করিয়া ধ্রুবিলাতিস্থিত "ক্ষেত্র-কুল্য-বাপত্রয়" দ্বাদশ দীনার মূল্যে ক্রয় করতঃ চন্দ্রতারার্কস্থিতি কাল যাবৎ পরাত্রানুগ্রহকাঙ্ক্ষী হইয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনের এবং ষড়ঙ্গাধ্যায়ী চন্দ্রস্বামীকে যথাবিধি উদক পূর্বক সম্প্রদান করিয়াছেন।

ধর্মাদিত্যের সময়ের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বারকমণ্ডলের অধীশ্বরের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু "নব্যাবকাশিকের" মহা প্রতিহারোপরিক নাগদেবের নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবত এই সময়ে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারকমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, এবং মণ্ডলের শাসনভার মহাপ্রতিহারোপরিকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। বিষয়ের "ব্যাপার-কারণ্ডয়" পদে গোপালস্বামী, নাগদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বসুদেবস্বামী জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন প্রমূখ "অধিকরণ মহত্তর" এবং সোম ঘোষ পুরঃসর "বিষয় মহত্তর" দিগের নিকট হইতে পূর্বাঞ্চল প্রচলিত মর্যাদানুযায়ী এবং পুস্তপাল জন্মভূতির অবধারণানুসারে "প্রবর্তবাপাধিক কুল্য পরিমিত বীজ বপনোপযোগীভূমি" দিনারদ্বয় মূল্যে ক্রয় করিয়া মাতাপিতার ও স্বীয় পুণ্য বৃদ্ধিমানসে কাণ-বাজসনেয় লৌহিত্যগোত্রীয় সোমস্বামীনামক গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। প্রথম তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি ও "প্রতীত ধর্মশীল" শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারেই অষ্টক-নবক নলদ্বারা অংশীকৃত করা হইয়াছে।

প্রথম তাম্রশাসনখানি মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে;

দ্বিতীয় তাম্রশাসন খানিতে কোনও তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহাও ধর্মাদিত্যের রাজত্ব সময়েই প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয়খানি মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই উভয় তাম্রশাসনেই উপরিক নাগদেব মহাপ্রতিহার, জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন অধিকরণ মহত্তর, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারক মণ্ডলের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথম ও তৃতীয় তাম্রশাসনে ঘোষ চন্দ্র ও অনাচার এই দুইজনের নাম এবং তিনখানিতেই শিবচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপরোক্ত তিনজনের জীবিতকালেই তাম্রশাসনত্রয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই, সম্ভবত তৎকালে তিনি যুবকমাত্র ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে তাহাকে "প্রতীত ধর্মশীল" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তৎকালে শিবচন্দ্র বিশ্বাসী ও ধর্মশীল বলিয়া বারকমণ্ডলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইবার পরে দ্বিতীয় তাম্রশাসন এবং তাহার পরে তৃতীয় তাম্রশাসন খানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মিঃ পার্জিটার অনুমান করেন ;—

১। ধর্মাদিত্য কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্বাঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

২। প্রথম তাম্রশাসন তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে এবং দ্বিতীয় খানি তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

৩। ধর্মাদিত্যের পরেই গোপচন্দ্রের আবির্ভাব হয় ; এতদুভয়ের মধ্যে অপর কোনও রাজা কর্তৃক পূর্বাঞ্চল শাসিত হয় নাই ; অথবা হইলেও, তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল।

ডাঃ হোরণ্‌লি ধর্মাদিত্যও যশোধর্মন অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। "যশোধর্মন ৫২৫—৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যেই দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া ৫২৯—৩০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; সুতরাং পূর্বাঞ্চলে তাঁহার রাজত্ব ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে প্রথম তাম্রশাসন ৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ধরিলে ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়, সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দের পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল না। ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ গোপচন্দ্রের রাজ্যারম্ভের সন অনুমান করিলে তদীয় ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।"

কিন্তু ধর্মাদিত্য ও যশোধর্মনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "বিক্রমাদিত্য" "শ্রীমহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য," "বালাদিত্য," "ক্রমাদিত্য," "প্রকাশাদিত্য," "চন্দ্রাদিত্য," "নরেন্দ্রাদিত্য," "দ্বাদশাদিত্য" প্রভৃতি "আদিত্য"-শব্দ সংযুক্ত উপাধি গুপ্তরাজগণেরই প্রিয় ছিল। সুতরাং পরবর্তী গুপ্তরাজগণমধ্যেই হয়ত কেহ "ধর্মাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবাধিপতি যশোধর্মন সম্ভবত ধর্মাদিত্যকে পরাজিত করিয়াই "লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠে" বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যশোধর্মনের অভ্যুদয়ের পূর্বে ধর্মাদিত্য সমুদয় প্রাচ্য ভারত অধিকার করিয়া "মহারাজাধিরাজ" "পরম ভট্টারক" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার হোরণ্‌লির মতে গোবীচন্দ্র বা গোপিচন্দ্র এবং গোপচন্দ্র অভিন্ন। এই গোপিচন্দ্রের উল্লেখ নামা তারানাথের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তাহাতে গোপিচন্দ্র বালাদিত্যের পৌত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় কুমার গুপ্তই যশোধর্মনের নিকটে পরাজিত হন। যশোধর্মনের রাজত্বের শেষভাগে হয়ত গোপচন্দ্র তাঁহার শ্লথকর হইতে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

ঘাগ্‌রাহাটীর তাম্রশাসন[১৫] পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহা মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচার দেবের রাজ্যাঙ্কের চতুর্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে উপরিক জীবদত্ত নব্যাব

কাশিস্থিত সুবর্ণবোথ্যের অন্তরঙ্গপদে এবং পবিত্রুক বারক মণ্ডলের বিষয় পতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "বর্তমান কাল পর্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়[১৬]।

১। রাজা ভূমি দান করেন নাই বা ভূমি দানে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

২। কে ভূমি দান করিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত হয় নাই।

৩। এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্মচারীর নাম লিখিত আছে। দান সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রচার কালে রাজ-কর্মচারীদিগের নাম লিখিত হয় না।

৪। চতুর্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, অনুমান, সুপ্রতীক স্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপিত কবিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীক স্বামীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে পদটি মধ্যস্থ। সম্ভবত সুপ্রতীক স্বামীই এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূমি-গৃহীতা বলিতেছেন, "বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চির বসন্নখিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্র প্রবর্তনীয়", অর্থাৎ আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্তন করিব।" এরূপ উক্তি অভিনব, এ পর্যন্ত কোনও তাম্রশাসনেই এরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের ন্যায় সমাচার দেবকে পরম ভট্টারক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহাকে শুধু মহারাজাধিরাজই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় তাম্রশাসনের সময় হইতেই স্থানীয় রাজগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধিশ্বর ছিলেন[১৭]। সুতরাং পূর্ববঙ্গে তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্বাঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, সম্ভবত সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিবার পরে, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ অন্তে তিনি পূর্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৬৪৬।৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন[১৮]। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল; এই সময়েই হয়ত পূর্ববঙ্গের স্থানীয় রাজগণ পুনরায় স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পূর্বাঞ্চল জয় করিবার পূর্বেও পূর্ববঙ্গে স্বাধীন নরপতি বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদিগকে জয় করিয়াই তিনি তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং সমাচার দেবের আবির্ভাব সপ্তম-শতাব্দের প্রথমপাদে, হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়ের পূর্বে, অথবা ঐ শতাব্দের চতুর্থপাদে তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে, সংঘটিত হইয়াছিল। তাম্র শাসনে উৎকীর্ণ লিপিমালা দৃষ্টে মিঃ পার্জিটার সমাচার দেবের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বলিয়া অনুমান করেন।

চারিখানি তাম্রশাসনেই রাজমুদ্রা মুদ্রিত ছিল। প্রথম তিনখানিতে রাজমুদ্রা বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খানির রাজমুদ্রা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজমুদ্রা গোলাকৃতি এবং মধ্যদেশ দুইটি সমান্তরাল রেখা দ্বারা অসমান রূপে বিভক্ত হইয়াছে। উপরার্দ্ধে রাজমুদ্রার-চিহ্ন অঙ্কিত এবং নিম্নার্দ্ধে "বারক মণ্ডল বিষয়াধিকরণস্য" লিখিত আছে। উপরার্দ্ধের দুই দিকে দুইটি বৃক্ষ এবং তন্মধ্যবর্তী স্থানে পদ্ম-পুষ্প ও মৃণাল-বিজড়িত একটি স্ত্রীমূর্তি (লক্ষ্মী?) দণ্ডায়মান, ও দুইপার্শ্ব হইতে করিদ্বয় ইহার মস্তকোপরি সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই রাজমুদ্রা, মজঃফরপুর জেলান্তর্গত বসড় নামক স্থানে ডাঃ ব্লক কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রাচীন গুপ্তরাজগণের রাজমুদ্রার প্রায় অনুরূপ। ইহা বারক মণ্ডল বিষয়াধিপতির রাজমুদ্রা। ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন ব্যতীত এ পর্যন্ত অপর কোনও তাম্রশাসনেই রাজকর্মচারীগণের রাজমুদ্রা অঙ্কিত হয় নাই। সম্ভবত গুপ্তরাজগণের সময়ে বারক মণ্ডলের বিষয়াধিপতির এই রাজমুদ্রা ছিল, এবং বিষয়াধিপতির মৃত্যু হইলে উহা তদীয় অধস্তন পুরুষগণের হস্তগত হয় ; গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে কিয়ৎকাল পর্যন্ত ইহারাই বারক মণ্ডলে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া

আসিতেছিল। স্থানীশ্বর-রাজগণের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলে গুপ্ত-রাজগণের কর্মচারিবৃন্দের অধস্তন পুরুষাদিগের প্রভাব পুনরায় বঙ্গদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। গুপ্ত রাজগণের সময়ে তাহাদিগের কোন কোন রাজকীয় কার্যে কর্মচারিগণ বংশপরম্পরায় নিযুক্ত থাকিতেন[১৯]।

এই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলের এবং মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত হইয়াছিল; কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হইত।

প্রথম তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, তৎকালে বারক মণ্ডল মহারাজ স্থাণুদত্তের দ্বারা শাসিত হইত ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনের সময়ে মহারাজের পদ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং উপরিক নাগদেব কর্তৃক উহার শাসন কার্য নির্বাহ হইত। তিনি মহাপ্রতিহার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহপ্রতিহার শব্দে দ্বারপাল বুঝায় ("chief warder of the gate"), কিন্তু তৃতীয় তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া "মূল ক্রিয়ামাত্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মণ্ডলান্তর্গত বিষয়গুলি একজন বিষয় পতির অধীনে অথবা অধিকরণ (a Board of officials) দ্বারা শাসিত হইত। অধিকরণের অধীনে সাধনিক, ব্যাপারকারণ্ডয় (বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যের পরিদর্শক), মহত্তর, পুস্তপাল, কুলবার প্রভৃতি ছিল।

পুস্তপালের পদ মহত্তরদিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ-সম্বলিত কাগজ-পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মণকেও অধিকরণিক ও মহত্তরদিগের নিকট আবেদন করিয়া ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইত।

নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানত অর্ণবপোত দ্বারাই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার-কারণ্ডয়ের" হস্তে ন্যস্ত ছিল; তাহার অধীনে ব্যাপারাণ্ডয় পদ ছিল। ব্যাপার কারণ্ডয় হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। কারণ প্রথম তাম্রশাসনে সাধনিক ভূমিদাতা এবং ২য় ৩য় শাসনের দাতা "ব্যাপার" কর্মচারীগণ ; উহারা ভূমিক্রয়ের জন্য অধিকরণ ও মহত্তরের নিকট প্রার্থী হইয়াছিল কিন্তু সাধনিক কেবলমাত্র মহত্তরের নিকটেই প্রার্থী হইয়া শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করাইতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার ভূমি ক্রয়কালে সাধনিক বলিতেছেন "ইচ্ছাম্যহৎ ভবতাং সকাশাৎ", কিন্তু ব্যাপার কারণ্ডয় গোপাল স্বামী "সাদর মভিগম্য" বলিতেছেন, ইচ্ছেয়ম্ ভবতাং প্রসাদাৎ।"

ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব, মহারাজাধিরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও "মণ্ডল" বা "বিষয়ের" শাসন কার্যে "উপরিক" গণই সর্বেসর্বা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই "উপরিক" গণও মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত হইতেন ; বারক মণ্ডলের উপরিক স্থানুদত্তকে আমরা মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। ধর্মাদিত্যের অপর তাম্রশাসনে নাগদেব "মহাপ্রতি-হারোপরিক" বলিয়া পরিচিত। উভয় তাম্রশাসন আলোচনা করিলে "মহারাজ" ও "মহাপ্রহারোপরিক" এই দুইটি বিরুদ পৃথক হইলেও উভয়ের তুল্যাধিকারছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। ধর্মাদিত্যের সময়ে, নাগদেবকে আমরা "মহাপ্রতিহারোপরিক" রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই ; কিন্তু গোপচন্দ্রের সময়ে, নাগদেব "মহা প্রতিহার-ব্যাপরাণ্ড্য-ধৃত-মূল-ক্রিয়ামাত্য" পদে সমাসীন। "মূলক্রিয়ামাত্য" শব্দ সর্বপ্রধান মন্ত্রীপদ বাচ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের শাসনকালে জীবদত্ত সুবর্ণ বীথির অধ্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গোপরিক অর্থাৎ গুপ্ত মন্ত্রণা সচিবগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই উপরিকগণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা, এবং বিষয়পতিগণ স্থানীয় শাসনকর্তা ছিলেন। ধর্মাদিত্যের সময়ে, বারক-মণ্ডলে জজাব, এবং সমাচার দেবের সময়ে, পবিক্রক বিষয়-পতিপদে সমাসীন ছিলেন। গোপচন্দ্রের সময়ে কে বিষয়পতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা জানা যায় না ; সম্ভবত নাগদেবই উপরিক ও বিষয়পতির কার্য নির্বাহ করিতেন। অধিকরণ বিভাগে, ধর্মাদিত্য ও

গোপচন্দ্র এই উভয়ের শাসন সময়েই, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেন প্রধান অধিকরণিক বা বিচারপতি ছিলেন। সমাচার দেবের সময়ের তাম্রশাসনে দামুক জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বা প্রধান বিচারপতি পদে আসীন ছিলেন।

তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে ভূমির পরিমাপ করা হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে ; শিবচন্দ্রকে ১৮ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্যন্ত কার্যক্ষম বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে, প্রথম ও তৃতীয় তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ৫২ বৎসরের অধিক হয় না, বরং ৪০।৫০ বৎসরও হইতে পারে। প্রথম এবং তৃতীয় তাম্রশাসনে অনাচার এবং ঘোষচন্দ্র নামক মহত্তর দ্বয়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাদিগের প্রতি ও উপরোক্ত যুক্তিই প্রযুজ্য। অতএব ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্ক হইতে গোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত, ৫২ বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়া ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রকে "প্রতীত ধর্মশীল" বলা হইয়াছে ; কিন্তু প্রথম শাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই। প্রথম তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইবার সময়ে শিবচন্দ্রের সততা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হইতেছে ; সুতরাং প্রথম তাম্রশাসন শিবচন্দ্রের যৌবন সময়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসন তাহার পরিণত বয়সে উৎকীর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আরও দেখিতেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনের পার্থক্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনের সময়ের পার্থক্য অপেক্ষা বেশি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনে অধিকরণ-মহত্তর, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেনের নাম উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের উপরোক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে। তৃতীয় তাম্রশাসন গোপচন্দ্রের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খানি ধর্মাদিত্যের কোনও অনির্দিষ্ট রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ১৯ বৎসরের কম হইতে পারে না ; বরঞ্চ কিছু বেশি হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই পার্থক্য ১৯ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশি হইতেও পারে না, যেহেতু উভয় তাম্রশাসনের সময়েই "জ্যেষ্ঠকায়স্থ" নয়সেনকে আমরা অধিকরণ মহত্তর পদে সমাসীন দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন সম্ভবত ধর্মাদিত্যের রাজত্বের শেষ সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ; এবং ধর্মাদিত্যের পরে এবং গোপচন্দ্রের পূর্বে যদি অপর কোনও রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তথাপি তাঁহার রাজত্ব যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না, ইহা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে "নব্যাবকাশিকায়ম্" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিঃ পার্জিটার বলেন এই শব্দটি (নব্য+অবকাশিক) এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উহা একটি স্থানের নাম (সম্ভবত বারকমণ্ডলের রাজধানী বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু মিঃ হোরণ্‌লির মতে, নব্যাবকাশিক কোনও স্থানের নাম হইতে পারে না। তিনি বলেন, সম্ভবত এই শব্দটি দ্বারা "অভিনব অরাজকতার সময়" সূচিত হইয়াছে। এই শব্দটি, দ্বিতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যের রাজত্ব সময়ে, এবং তৃতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালেও উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে "মহারাজাধিরাজের" অভাব হইয়া অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। উপরোক্ত উভয় সময়েই উপরিক নাগদেব কর্তৃক বারকমণ্ডল শাসিত হইত। সুতরাং প্রাদেশিক শাসন কর্তার পদও শূন্য হইয়াছিল না। প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ স্থাণুদত্তকে আমরা বারকমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে "মহাপ্রতিহারোপরিক" এবং " মহাপ্রতিহার-ব্যাপারাণ্ড্য-ধৃতমূল ক্রিয়ামাত্য-উপরিক" কর্তৃক "মহারাজের" স্থান অধিকৃত হইয়াছে। হয়ত, মহারাজ স্থাণুদত্তের মৃত্যু হইলে, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত নূতন মহারাজা সেই সময়ে শৈশবও অতিক্রম করেন নাই, সুতরাং মন্ত্রী কর্তৃকই মণ্ডল শাসিত হইত। কিন্তু চতুর্থ তাম্রশাসনেও "নব্যাব কাশিকায়ম্" শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায়, এই অনুমানের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবকে সম্রাট পদে বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজাধিরাজ

সমাচারদেবের "চরণ-কমল-যুগল" আরাধনা করিয়া উপরিক জীবদত্ত নব্যাবকাশিকার সুবর্ণবোথ্যের অন্তরঙ্গপদে, এবং উক্ত উপরিক জীবদত্তের অনুমোদনক্রমে পবিত্রুক বারক মণ্ডলের বিষয় পদি পদে, অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[২০]। এই তাম্রশাসনে, নব্যাবকাশিক শব্দটি যে কোনও স্থানের নাম স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা না হইলে অর্থবোধ ও সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বিশেষত এই তাম্রশাসনখানি সমাচারদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ। সুতরাং এই তাম্রশাসন খানি তৃতীয় তাম্রশাসনের অন্তত ১৪ বৎসর পরেই প্রদত্ত হইয়াছে! অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় তাম্রশাসন ও চতুর্থ তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য অন্যূন (১৯+১৪) ৩৩ বৎসর। তাহা হইলে "নব্য" শব্দটির আর সার্থকতা কোথায়? এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বোধ হয়, "নব্যাবকাশিক" বারকমণ্ডলের রাজধানী ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না।

৩০০ গুপ্তাব্দে বা ৬২৯—৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গঞ্জাম-তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন সদ্বীপ গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরার" সম্রাট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ ভাগে, যে সুযোগে পশ্চিমদিকে স্থানীশ্বরের প্রভাকর বর্দ্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক পূর্বদিকে "লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন[২১]। শশাঙ্কের বহুমুদ্রা বাংলার নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলিতে "শশাঙ্ক" এবং কতকগুলিতে "নরেন্দ্রগুপ্ত" নাম লিখিত আছে। ডাক্তার বুলার বলেন, তিনি হর্ষ চরিতের একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিয়াছেন ; তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম যে নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি যে গুপ্ত বংশসম্ভূত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজ-বংশের কোনও খোদিত লিপিতে শশাঙ্কের বা নরেন্দ্রগুপ্তের নাম বা বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই। মগধের গুপ্ত রাজবংশের মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। "উত্তরকালে যদি কখনও শশাঙ্কের বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত মাধবগুপ্তের পূর্ববর্তী রাজা। অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক মৃত হইলে বা কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজচ্যুত হইলে কনিষ্ঠের বা তদ্বংশীয়গণের রাজ্যকালীন উৎকীর্ণ লিপিতে জ্যেষ্ঠের নাম পাওয়া যায় না[২২]।

"ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, স্থানীশ্বরের (থানেশ্বরের) অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তরাপথের পশ্চিম ভাগের স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন এবং "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রভাকরবর্দ্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্বভৌম নৃপতির পদলাভের জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রভাকর বর্দ্ধনের জামাতা মৌখরী গ্রহবর্মা পাঞ্চালের রাজধানী কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, মালব হইতে দেবগুপ্ত (?) সসৈন্যে কান্যকুব্জাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ কান্যকুব্জে উপনীত হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবর্মাকে নিহত এবং রাজপুরী অধিকৃত করিয়া, তদীয়পত্নী, স্থানীশ্বর রাজদুহিতা রাজ্যশ্রীকে, লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইবামাত্র, প্রভাকর বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন দশসহস্র অশ্বারোহী লইয়া, মালব-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া, সহজেই মালব সৈন্যের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয়ের শ্রান্তিদূর হইতে না হইতেই, ভগিনীর কারামোচনের পূর্বেই, তিনি প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়াধিপ শশাঙ্ক। "যিনি স্বীয় রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ হইতে কান্যকুব্জ জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে[২৩]।

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা এবং বোধিদ্রুমনাশ এই দুইটি কলঙ্ককালিমা শশাঙ্কের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়রাজ মালার লেখক, বিবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, এই উভয় অভিযোগই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ভাণ্ডীর, "দেবভূয়ম্ গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনের গুপ্ত নামা চ গৃহীত কুশ স্থলে," উক্তি হইতে মনে হয় যে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী গুপ্ত নামধেয় কোন গৌড়াধিপ। পরে এই গুপ্তকে "কুল পুত্র" নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; সুতরাং ইনি শশাঙ্ক হইতে অভিন্ন হইতে পারেন না। অথবা "শশাঙ্ক হয়ত আত্মরক্ষার জন্য রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন, হয়ত পিতৃরাজ্য রক্ষার্থ গুপ্ত-বংশ-সম্ভূত রাজগণের চিরশত্রু স্থানীশ্বরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই অতিবাহিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন প্রাপ্তির ছয় বৎসর কাল মধ্যে শশাঙ্ক বিজিত হন নাই। হর্ষের রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্থানীশ্বরের অগণিত সেনা তাহাকে গৌড়বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় গর্বোন্নত মস্তক অবনত করেন নাই[২৪]।

হর্ষবর্ধন ৬০৬—৬৪৭ :

অপসড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সংসর্গ কামনা করিয়াছিলেন[২৫]। এই মাধবগুপ্তই হয়ত শশাঙ্কের দুর্দশার কারণ। অদৃষ্টনেমীর আবর্তনে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথে যে সমুদয় রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসবিশেষ গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের অধঃপতন আরব্ধ হইল। বহুদূরে, প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রে, স্থানীশ্বরের গৌরব ভাস্কর সমুদিত হইতেছিল। তখনও গুপ্ত রাজগণ সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। গুপ্ত বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া জয়বর্দ্ধন ধন্য হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপে হিমানী মণ্ডিত শিখরে বসিয়া কাম্বোজ-রাজ ভয়ে কম্পিত হইতেন। পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত, হিমাচলের পাদদেশ হইতে নর্মদা তীর পর্যন্ত, হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধ প্রজাপুঞ্জের প্রিয়কার্য সাধন নিমিত্ত অরাতিভবনে প্রাণত্যাগ করিলে[২৬] তদীয় কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন পঞ্চসহস্র হস্তী, দ্বিসহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ গৌড় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন[২৭]। কিন্তু ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়াও "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তন-বতী-বসুন্ধরার অধীশ্বর মহারাজাধি-রাজ" শশাঙ্কের[২৮] বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে তদীয় সাম্রাজ্য "পঞ্চ ভারত" বিজেতা হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিমালয় হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশ, মালব, গুর্জর এবং সৌরাষ্ট্র রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে, জামাতা বলভীপতি এবং পূর্বে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মাও তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিতেন। সুতরাং সমতট ও বঙ্গ যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীহর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট তাঁহার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াং বাংলার বিভিন্ন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে তথাকার কোনও নৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত সমতট প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মুলিত হইয়াছিল[২৯]। ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণী হইতে জানা যায়, ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সমতট রাজ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—"সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্তী ; ভূমি নিম্ন ও উর্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০ লি বা ৪ মাইল। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার

প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্ট সহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্ন সহকারে বিদ্যা উপার্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) উভয়ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেব মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্তি আটফিট উচ্চ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

শীলভদ্র :

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া নালন্দা সংঘারামে আচার্য ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হয়। এই আচার্যের মুখে জটিল ধর্মশাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি দুরূহ সমস্যা সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এইরূপে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূর দেশান্তরেও তাঁহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের একজন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিগ্বিজয়মানসে মগধে উপনীত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রিয়-নিকেতন নালন্দা সংঘারামের আচার্য ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের যশোগৌরবের খ্যাতি সুদূর দাক্ষিণাত্যেও শ্রুত হইত। এজন্য এই পণ্ডিত প্রবরের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অসূয়া পরবশ হইয়া, ইনি দুর্গম গিরিকন্দর ও নদনদী সমাকুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিগন্ত-বিশ্রুত-কীর্তি আচার্য্য প্রবরের সহিত তর্ক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর সভায় উপনীত হইয়া বলিলেন, "আমি দাক্ষিণাত্যবাসী, এই রাজ্যের একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মনীষীর বিষয় শ্রুত হইয়াছি ; আমি "অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মগধরাজ বলিলেন, "হাঁ, এখানে অশেষ মনীষা সম্পন্ন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন বটে।" এই কথা বলিয়াই রাজা আচার্য ধর্মপালের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "দাক্ষিণাত্যবাসী একজন পণ্ডিত বহুদূর দেশান্তর হইতে আপনার সহিত শাস্ত্রের বিচার করিতে এইস্থানে আগমন করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক রাজসভায় আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিবেন কি?" আচার্য ধর্মপাল মগধরাজের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া, অগৌণে রাজসমীপে উপনীত হইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে তদীয় প্রধান শিষ্য শীলভদ্র প্রমুখ অপরাপর শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন?" ধর্মপাল উত্তর করিলেন, "জ্ঞানসূর্য অস্তমিত হইবার পর (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদীয় প্রচারিত ধর্মমতের একটি মাত্র প্রদীপ ধীরভাবে জ্বলিতেছে, ধর্ম-বিরোধী পণ্ডিত-কীট-সমূহ মেঘখণ্ডের ন্যায় উদিত হইয়াছে, সুতরাং আমি উহার একটিকে তর্কযুদ্ধে ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছি।"

শীলভদ্র গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি, এই বিধর্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকেই অনুমতি প্রদান করুন।" আচার্য ধর্মপাল শীলভদ্রের পূর্ব-বিবরণ সমুদয় পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুমতি করিলেন। কিন্তু এই সময়ে শীলভদ্রের বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, এজন্য শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার নবীন বয়স এবং ইনি একাকি এই বিষম তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন কিনা, এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং তদীয় প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য ধর্মপাল তাহাদিগের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন, "কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দন্ত উদগত হইয়াছে তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে শীলভদ্র এই বিধর্মীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।"

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্কযুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশান্তর হইতে যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। প্রথমত দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বিবিধ কূট-যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তারপর শীলভদ্র অপূর্ব যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সমুদয় মতবাদ খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন।

"মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু শীলভদ্র রাজদত্ত এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই, সে অল্পেই সন্তুষ্ট, এবং স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ ; সুতরাং গ্রাম লইয়া আমি কি করিব?" ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, "ধর্মরাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে ; যদি এই সময় পণ্ডিত ও মূর্খে পার্থক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্মপথে গমনকালে উৎসাহ প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, এই দান গ্রহণ করুন।" অতঃপর শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সংঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমুদয় আয় ছিল। এই স্থান "গুণমতির বিহার" হইতে ২০ লি বা ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এবং গয়া হইতে ৪০।৫০ লি বা ১০।১২ মাইল উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা চৈনিক শ্রমণ ইউয়ান চোয়াংকে তদীয় রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তিনবার তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্বীয় গুরু শীলভদ্রের উপদেশে তথায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ভাস্করবর্মা :

শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তি সংপত্ত্যুপাত্ত জয়শব্দান্বয়ার্থস্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ন্নবাসকাৎ।" সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কামরূপরাজ এক সময়ে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবত ভাস্করবর্মা কান্য-কুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তাঁহার সাম্রাজ্যমধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সুযোগ বুঝিয়া মগধাধিপ আদিত্য সেন সমুদয় প্রাচ্যভারত হস্তগত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাস্করবর্মা হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি রাজ্যাপহারক অর্জুন অরুণাশ্বকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনদূতকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের চৈনিক গ্রন্থসমূহে ভাস্কর বর্মা প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন[৩০]। সম্ভবত যে সুযোগে হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি অর্জুন বলপূর্বক স্বীয় প্রভুর

সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সেই শুভ অবসরে ভাস্করবর্মা প্রাচ্যভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র পূর্ববঙ্গ যে ভাস্করবর্মার শাসন মান্য করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সেঙ্গচির বিবরণ :

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে সেঙ্গচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন[৩১]। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে তৎকালে তিনি "হো-লো-শে-পো-তো" নামক একজন নিষ্ঠাবান "উপাসককে" সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক, সদ্ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক, এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন[৩২]। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহস্র শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক সমটাধিপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া চতুঃসহস্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউয়ান চোয়াং এই শ্রমণ দিগকে প্রাচীন স্থবির মতাবলম্বী দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইৎসিং এর সময়ে তাহারা মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল[৩৩]।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সেঙ্গচির লিখিত সমতট রাজের সহিত আসরফ-পুরের তাম্র শাসনোল্লিখিত দেবখড়্গ তনয় রাজ রাজ ভট্টের একত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী[৩৪]। কিন্তু আমরা ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করিনা[৩৫]। ফরাসী পণ্ডিত মোঁসো সেভানিজ এই সমতট-রাজের নাম হর্ষভট বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু মিঃ ওয়াটার্স "হো-লো-শে" এই অক্ষর ত্রয়ের মর্ম "রাজ" শব্দ দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ বীল ও ওয়াটার্সের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সেঙ্গচির লিখিত সমতটের রাজার নাম (হো-লো-শে=রাজ ; পো-তো=ভট) রাজভট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু নামবাচক শব্দের লিপি মালার একাংশ, ইচ্ছামত, মর্মার্থ দ্যোতকরূপে এবং অপরাংশ যথাযথরূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়। ওয়াটার্সের ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেও নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবখড়্গ তনয় রাজ রাজভট্টের সহিত সেঙ্গচির লিখিত "রাজভটে"র অপর কোনও সম্বন্ধের আরোপ করা যায় না। পরবর্তী সময়ে এতৎ-সংসৃষ্ট কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও এই একীকরণের ঐতিহাসিক স্বপ্ন ফলবতী হইবে কিনা সন্দেহ।

---

১. "যে ভূক্তা গুপ্ত নাথৈর্ন্ন সকল বসুধাক্রান্তি দৃষ্ট-প্রতাপৈ
ন্নাজ্ঞা হূণাধিপানাং ক্ষিতিপতিমুকুটাদ্ধ্যাসিনী যান প্রবিষ্টা।
দেশাংস্তান্ ধন্ব শৈল দ্রুমশ (গ) হন সরিদ্‌ভীরবাহূপগূঢান্
বীর্যাবস্কন্ন রাজ্ঞঃ স্বগৃহ পরিসরাবজ্ঞায়া যো ভূনক্তি"।।

Fleet's Gupta Inscription No. 33.

২. "আ লৌহিত্যোপ কণ্ঠাৎতাল বন গহনোপত্যকাদামহেন্দ্রাৎ
আ গঙ্গাশ্লিষ্ট সানোস্তুহিন শিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ
সামন্তৈর্যস্য বাহু দ্রবিণ হৃত মদৈঃ পাদয়োবানমদ্ভিশ্চূড়া
রত্নাংশু রাজি ব্যাতিকর শাবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে"। Ibid.

৩ Fleet's Gupta Inscription No 35.

৪. Beal's Budhist Records of the Western world
Vol I page 168—1

৫. "স্থাণোরণ্যত্র যেন প্রণতি কৃপণতাং প্রাপিতাং নোত্তমাঙ্গং।
যস্যাশ্লিষ্টো ভুজাভ্যাং বহতি হিমগিরি দুর্গ্গশব্দাভি মানম্।।
নীচৈস্তেনাপি যস্য প্রণতিভুজ বলা বর্জ্জন ক্লিষ্ট মুর্দ্ধা।
চূড়া পুষ্পোপহারৈ র্মিহিরকুল নৃপেণার্চ্চিতং পাদযুগ্মং"।।

Fleet's Gupta Inscription No. 33.

৬. Vincent Smith's Early History of India

Page 301—302 (2nd Edition)

৭. J. R. A. S. 1909.

৮. Vincent Smith's Early History of India Page 301—302.

৯. Beal's Records of Western Countries Vol. I Page 167—171.
প্রাচীন ভারত—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত, ২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা।

১০. "The cruelty practised by Mihiragula became so unbearable that the native princes, under the leadership of Balakitya, King of magadha (the same as Narasimhagupta), and Yasodharman, a Raja of Central India, formed a confederacy against the foreign tyrant.—" V. A. Smith's History of India. Page 300.

১১. Indian Antiquary 1889. Page 228.

১২. Allan's Catalogue of Indian Coins :—
Gupta dynasties. Page. L v iii
Fleet's Gupta Inscription on 19.
Indian Antiquary VI Page 143.

১৩. ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট।

১৪. Journal and Proceedings Asiatic Society of Bengal.

Vol. VII. No. 8 1911.

১৫. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭শ ভাগ।

১৭. Harsa, when at the height of his power, exercised a certain amount of control as suzerain over the whole of Bengal, even as far east as the distant kingdom of Kamrupa or Assam, and seems to have possessed full sovereign authority over western and central Bengal-- Vincent Smith's Early History of India, 2nd. Ed. p. 366.

১৮. J. A. S. B.. August, 1911.

১৯. প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে (১১৭ গুপ্ত-সংবৎ বা ৪৩৫—৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, পৃথিবীসেন নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ শৈলেশ্বর নামক মহাদেবের পদপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান করিয়া ছিলেন। এই পৃথিবীসেন প্রথমে প্রথম কুমারগুপ্তের মন্ত্রী ও কুমারামাত্য এবং পরে প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন।

২০. "এতচ্চারণ-করল (কমল?) যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণবোথ্যাধিকৃতান্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্ত ভদনুমোদিত কবাবক-মণ্ডলে বিষয়-পতি পরিচক" &c &c

২১. গৌড় রাজ মালা ৭.....৮ পৃষ্ঠা।

২২. প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩১৯।

২৩. গৌড় রাজ মালা ৬.....৭ পৃষ্ঠা।

২৪. প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩০৯।

২৫. "আজৌ ময়া বিনিহতা বলিনো দ্বিশগু
কৃত্যাং ন মেস্ত্যপরমিতাবধার্য্য বীরঃ
শ্রীহর্ষদেব নিজ সঙ্গম বাঞ্ছয়া চ"***

২৬. "উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাঙ্কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণআনুজ্‌ঝিতবানরাতি ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ।"

Banskhera Plate of Harsha. Epi. Indica vol IV.

২৭. Beal's Records vol I Page 213.

২৮. Epi. Indiva vol VI. Page 143.

২৯. গৌড়রাজমালা ১৩ পৃষ্ঠা।

৩০. V. A. Smith's H. of India 2nd edition Page 327.

৩১. Introduction to I-Tsing's Record of the Buddhist Religion—Translated by J. Taka kusu Page XL—XLi.

৩২. Beal's Life of Hiuen Tsang. Page XXX Thomas Watters on Yuan Chwang Vol II. Page 188.

৩৩. I-Tsing's Record of the Buddhist Religion. translated by J. Takakusu.

৩৪. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা।

৩৫. ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

শূরবংশ

আদিশূর :

শূর-বংশের ইতিহাস আলোচনায় প্রখ্যাতনামা মহারাজ আদিশূরের নাম স্বতঃই সর্বাগ্রে সকলের মনে উদিত হয়। কিন্তু আদি-শূরের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে আলোচনা করিবার উপযুক্ত মালমসল্লা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অধুনা এই আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বহু মনীষী সন্দেহ করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছিলেন, "Bengali tradition traces the origin of many notable families to five Brahmans and Five Kayasths supposed to have been imported from Kanauj by a half-mythical King named Adisura in order to revive orthodox Hindu customs, which had fallen into disuse during the time when Buddhism was pre dominant. But no authentic record of this monarch has been discoverd, and his real existence may be doubted. If he ever existed he must have reigned in Bengal earlier than the Palas." ....[১]।

আদিশূরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ : গৌড় রাজমালার গ্রন্থকার মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি. এ. ও প্রত্নতত্ত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. এতদ্বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা মিঃ স্মিথের উক্তির পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে, আদিশূরের ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ ; কারণ পরবর্তীকালে রচিত পরস্পর-বিরোধী কুলগ্রন্থ নিচয় এবং প্রচলিত কিম্বদন্তী ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই ; এবং ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট ভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। গৌড় রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, "ভবদেব সাবর্ণ গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রামবাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দঘটীবংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়ি-শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃদ্ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তন কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তির ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড় নৃপ হইতে হস্তিনী ভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যেভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রীয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণমাত্রেই আদিশূর আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয়-সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল

প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র"[২] অন্যত্র লিখিত হইয়াছে "বাৎস্যগোত্র ছাড়িয়া দিলে বর্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড় পড়তায় ৩৪/৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্বে [১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদবাণাঙ্গ শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না[৩]।

"ভুবনেশ্বরের কুল প্রশস্তিতে ভবদেবের উর্দ্ধতন সাতপুরুষের নাম দেওয়া হইয়াছে! প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি, গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ মুনির পরেই প্রথম ভবদেবের নাম করিয়াছেন। তিনি যখন প্রথম ভবদেবের[৪] কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তখন অবগত থাকিলে এবং সত্য হইলে তিনি অবশ্যই আদিশূর কর্তৃক বেদগর্ভ বা পরাশরের আনয়ন বার্তা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। সুতরাং তাঁহার নাম না থাকাই সন্দেহ জনক"[৫]। আমরা কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ভবদেব প্রশস্তিতে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণায়নের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ এই ব্যাপার ভবদেব বংশের বিশেষত্ব নহে। ভবদেবের উর্দ্ধতন পুরুষগণ মধ্যে যাহারা কৃতী ছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে। ইহাই ভবদেব-বংশের বিশেষত্ব। সম্ভবত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে কেশব পর্যন্ত এই বংশে কোনও খ্যাতনামা লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই ; পরে প্রথম ভবদেবই এই বংশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন ; সে জন্যই প্রথম ভবদেব হইতে সপ্তম পুরুষের নাম কীর্তিত হইয়াছে।

খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গে গোবিন্দ চন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গের পিতামহ আদিদেব যে বঙ্গরাজের বিশ্রাম সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সম্ভবত বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র। প্রথম ভবদেব বোধ হয় খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাদুর্ভূত পাল বংশীয় নারায়ণ পাল দেবের নিকট হইতেই হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ নারায়ণপাল দেব পরম ভট্টারক ও পরম সৌগত বলিয়া কীর্তিত হইলেও তিনি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশুপত আচার্যকে দেবসেবা নির্বাহার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন, বলিয়া জানা যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি পরম উদার ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল এবং হিন্দুধর্ম শনৈঃশনৈর পূর্ব প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। রাজাগণ প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ বিধানার্থ হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ছিলেন।

বেদগর্ভের ৬ষ্ঠ পুত্র বশিষ্ঠবাসের জন্য সিদ্ধল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই সিদ্ধল গাঁইর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধলগ্রামী বলিয়া পরিচিত করিলেই সেই বংশ যে বেদগর্ভাত্মজ বশিষ্ঠের অনন্তর-বংশ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এ জন্যই [গৌড় নৃপতি হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও] ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই বংশকে সিদ্ধল গ্রামী বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে। প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি লিখিয়াছেন—

"সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সিকুলে যে যজ্ঞিরে শ্রোত্রীয়া
স্তেষাং শাসনভূময়োহজনি গ্রহংগ্রামাঃ শতং সন্ততে।
আর্যাবর্তভুবাংবিভূষণমিহখ্যাতস্তু সর্বাগ্রিমো গ্রামঃ
সিদ্ধল এব কেবল মলঙ্কারোহস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ।।

অর্থাৎ, "সাবর্ণমুনির সুমহান বংশে যে সকল শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশত খানি গ্রামেই বাস করিতেন। তন্মধ্যে আর্যাবর্ত ভূমির ভূষণ স্বরূপ সিদ্ধল গ্রামই সমুদয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বদা বিখ্যাত রাঢ়াশ্রীর অলঙ্কার স্বরূপে বর্তমান।" এস্থলে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ থাকায় ভবদেব যে বেদগর্ভবংশসম্ভূত তাহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, আদিশূরের নামোল্লেখ করিয়া বংশ-পরিচয় বিবৃতি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ভবদেব-জননী সাঙ্গকা দেবী বন্দ্যঘটী বংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে[৬]। সুতরাং বঙ্গাধিপতি হরিবর্ম দেবের পূর্বেই যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞী নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ত্রিপুরায় প্রাপ্ত সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসন খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন[৭]।

ত্রিপুরার তাম্রশাসন :

এই তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, "সুব্বুঙ্গ" বিষয়স্থিত অটবী ভূখণ্ডে প্রদোষশর্মা "দেবাবসথ" নির্মাণ করাইয়া, "ভগবান অবিদিতান্তানন্ত নারায়ণ" স্থাপিত করিয়া, দেবতার বলি-চরু-সত্র-প্রবর্তনের জন্য ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের জন্য রাজসমীপে ভূমিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অটবী ভূখণ্ডের কত পাটক ভূমি কোন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার বিভাগ সূচনার জন্য, এই তাম্রশাসনে শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—'ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে, তাহা কুল-শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের আলোচ্য"[৮]। প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ. পি. আর. এস. মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, "সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা এই ত্রিপুরার শাসনের পাঠোদ্ধারের পূর্বে লোকে বিশেষভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞগণও সম্ভবত তাহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আদিশূর কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায়, ইহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাম্রশাসনেই এমন একটি কথা রাধাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে আদিশূর কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে "দ্বিজ-সত্তমেরা" ও শূদ্রানীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে বর্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রানী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান ও সম্ভবত পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপতি ও তৎকর্তৃক আনীত বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই"[৯]।

কুলশাস্ত্র ও শিলালিপি :

যদিও মহারাজ আদিশূর-সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার

প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল এবং সেন রাজগণের ন্যায় ইহার নামাঙ্কিত কোনও শিলালেখ বা তাম্রশাসন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি লোক পরম্পরাগত প্রাচীন ও প্রবল কিম্বদন্তী, পুরুষানুক্রমিক রক্ষিত ও সংগৃহীত কুলাচার্যগণের বিবরণ, পরস্পরবিরোধী হইলেও, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কুলাচার্যগণের বিবরণীগুলিতে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এই সমুদয় কিম্বদন্তী ও কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মহারাজ আদিশূর নামে একজন নরপতি বঙ্গে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন[১০]। প্রবল জনশ্রুতির যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকে তবে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ; যে পর্যন্ত এই জনশ্রুতি কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী বলিয়া স্থিরীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত উহা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অধিকাংশ শিলালেখ এবং তাম্রপট্টোল্লিখিত প্রমাণগুলিও যেরূপ অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট ও অনিরপেক্ষ[১১] কুলগ্রন্থগুলিও তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। বহু আবর্জনাই ইহাতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শিলাফলক এবং তাম্রশাসনের শ্লোকগুলির মর্ম যেরূপ বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কুলগ্রন্থাদির প্রমাণগুলিও ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইলে, বিশেষ বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলির যথার্থ মূল্য নির্ণীত হয় নাই এবং এতদর্থে কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। কুলশাস্ত্রগুলিকে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থাদির কুলগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া বরং বিভিন্ন কুলশাস্ত্র হইতে কোনও সারোদ্ধার করা যায় কি না তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। যিনি এই কার্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে কঠোর বিচারকের ন্যায় কার্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেরূপ কুলগ্রন্থ আবিষ্কারের বন্যা আসিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত নিরাপদ নহে।

আদিশূরের নামের সহিত বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমনের বিবরণ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু ইহার পূর্বেও যে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং আদিশূরই যে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্মের উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণই আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে[১২]। সমুদয় কুলজ্ঞগণের মতেই আদিশূর যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্যু, হোম ও উদগান এই তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্যু সম্বন্ধীয় কার্য যজুঃ দ্বারা, হোমক্রিয়া ঋক্ দ্বারা, উদগান সাম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে[১৩]। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইলে, শুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ পরম্পরা :

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্মের প্রধান সহায় এবং আশ্রয়দাতা। প্রবল পরাক্রান্ত কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে এই ঘটনার কারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" প্রবন্ধে যে কয়েকটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল।

(১) "আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তি বৌদ্ধরাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাংলায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ্রপাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শান্তি কামনায় যজ্ঞ নির্বাহ করিতে রাজার সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়।

(৩) তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্ঞীর চান্দ্রায়ণ ব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পত্নীর অনুরোধে সদ্বিদ্বান বেদবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন।

(৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে করস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।

(৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনীত হয়।

উপরে যে কয়টি মত উদ্ধৃত হইল, সবগুলিই পরস্পর বিরোধী। আমাদের বিবেচনায় উহার কোনটিই প্রকৃত নহে। ইহা বহু পূর্ব ঘটনার দূর-শ্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সমুদয় বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, আদিশূরের সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে একদল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন পূর্বক উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে ক্ষিতীশের পুত্র ফট্টনারায়ণ (রাঢ়ীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), সুধানিধির পুত্র ছান্দর (রাঢ়ীয়) ও ধরাধর (বারেন্দ্র), বীতারাগের পুত্র দক্ষ (রাঢ়ীয়) ও সুষেণ (বারেন্দ্র), তিমিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র) এবং সৌভরীর পুত্র বেদগর্ভ রাঢ়ীয় ও পরাশর (বারেন্দ্র) হইতে যথাক্রমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুল উদ্ভুত হইয়া সমুদয় বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে. আদিশূর বঙ্গের তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ দর্শনে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনয়ন করেন। তাঁহারা পত্নী ও ভৃত্য সহ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও দেবীবরের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস গোত্রজ বীতরাগ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিথিমেধা (বা মেধাতিথি) ও সাবর্ণ গোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড় আগমন করেন। বঙ্গে সমাগত ব্রাহ্মণগণের নাম সম্বন্ধে বারেন্দ্র কুলাচার্যগণ মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। "কেহ কেহ বলেন, শাণ্ডিল্য গোত্রজ নারায়ণ, কাশ্যপগোত্রজ সুষেণ, বাৎস গোত্রজ ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহারা কে কোন গ্রাম হইতে আগমন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে।

কোন কোন কুলাচার্য গণের মতে ইহারা কোলাঞ্চ দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। শব্দ রত্নাবলি মতে কোলাঞ্চ কনোজের নামান্তর মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন কম্বোজ দেশ হতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকেরা বঙ্গে সমাগত হইয়াছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসে লিখিয়াছিলেন, —নেপালে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর কাম্বোজ দেশ।

বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়নের কাল :

বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল সম্বন্ধেও বহু মতামত লক্ষিত হইয়া থাকে। "কুলার্ণবের" মতে "বেদ বাণাহিমেশাকে" অর্থাৎ ৮৫৪ বা ৬৫৪ শাকে[১৪] "বাচস্পতি মিশ্রের মতে "বেদবাণাঙ্কশাকে" অথবা "বেদ বাণাঙ্গ শাকে" অর্থাৎ ৯৫৪ বা ৬৫৪ শাকে, "বারেন্দ্র কুল পঞ্জী" মতে বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে" অথবা "বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে" অর্থাৎ ৬০৪ বা ৬৫৪ শাকে, ভট্টগ্রন্থ মতে "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামা গতি বেদমুক্তা তদা। কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরু পূর্ণ দিশে। সহর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে"। অর্থাৎ ৯৯৯ শাকে। "ক্ষিতীশ বংসাবলি" মতে "নব নবত্যধিক নবশতী শকাব্দে" অর্থাৎ ৯৯৯ শাকে. কায়স্থ কৌস্তভের মতে ৩৮০ বঙ্গাব্দে (৮১৪ শাকে)। "দত্তবংশমালা" মতে "শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে" অর্থাৎ ৮০৪ শাকে। সম্বন্ধে নির্ণয়ের মতে ৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৮৬৪

শকাব্দে, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" রচয়িতার মতে ৯৫৪ শকাব্দে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে (৮৮৬ শকে), বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচয়িতার মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকাব্দের মধ্যে[১৫], গৌড়রাজমালা-লেখকের মতে আনুমানিক ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৮২ শকাব্দে, লঘু ভারত কারের মতে ৯৫১ শকাব্দে মহারাজ আদিশূরের রাজ্যারম্ভ হয়[১৬]। বিপ্রকল্পলতা মতে ৮৬৪ শকাব্দে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন[১৭]। এই সমুদয় পরস্পরবিরোধী প্রমাণেব উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। হয়ত আদিশূর নামে খ্যাত কোনও রাজা বঙ্গের সিংহাসন এক সময়ে সমলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী কুলগ্রন্থ লেখকগণ এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য নানাপ্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং এজন্যই কুলগ্রন্থ সমূহে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আদিশূরের আবির্ভাবকাল :

অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গৌড়ে পাল নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। একাদশ শতাব্দে শূর-রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ হইতে বাংলার ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশ আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই[১৮]। কিন্তু ৭৮০—১১০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে আদিশূরের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না! সুতরাং আদিশূরের অভ্যুদয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্দেশিত করিতে হইবে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন, মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্যন্ত গত হইয়াছিল। সুতরাং বল্লালসেনের সময়কে আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ১২/১৩ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরব্ধ হয়। সুতরাং ১১১৯—৩৯০ = ৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কাল নির্দেশিত হইতে পারে।

চতুর্ভূজের হরিচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে, বরেন্দ্র ভূমে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই গ্রামে বিপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত গ্রাম খানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৯]। এই ধর্মপাল গৌড়ীয় পালবংশীয় ধর্মপালের প্রায় ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দিগের কুলগ্রন্থ, চতুর্ভূজ বিরচিত হরি চরিত কাব্য এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে আবির্ভূত হইযাছিলেন। তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই[২০]। বরেন্দ্র কুলগ্রন্থ মতে বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রীয় বীজীপুরুষ সুষেণ (ইনি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম) হইতে স্বর্ণলেখ ১০ম পুরুষ অধস্তন। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসারে ৩০ বৎসরে একপুরুষ গণনা করিয়া সুষেণ হইতে স্বর্ণলেখ পর্যন্ত ৩০০ বৎসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ধর্মপালের সমসাময়িক স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক সুষেণ হইতে ৩০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। এই হিসাবেও ১০২৪—৩০০ = ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন কুলাচার্য হরিমিশ্র সেনবংশীয় নৃপতি কনৌজ মাধবের সমসাময়িক। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিমিশ্রের গ্রন্থ আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু পূজাপাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এই হরিমিশ্রের কারিকায় বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণায়নের অত্যল্পকাল পরেই পাল রাজগণ বঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পালরাজগণ যে ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে বঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আধুনিক অনুসন্ধানে নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং আদিশূরকে পাল রাজগণের

পূর্বেই স্থাপিত করিতে হইবে। আবার, বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলী পাঠে জানা যায়, পালবংশীয় দেবপালের পিতা ধর্মপাল ক্ষিতীশে পৌত্র ভট্টনারায়ণ-সুত আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন[২১]। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম আদিগাঞি ওঝা, রাঢ়ীয় শ্রেণির মতে আদি বরাহ বন্দ্য। আদিগাঞি ওঝা ও আদি বরাহ বন্দ্য একই ব্যক্তি। ইনি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি।

"তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে।
ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।।
তৎপুত্রা ভূরিবিখ্যাতাঃ সর্ব শাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ।
আদ্যো বরাহ বাটুশ্চ রামো নানো নিপোস্তথা"।

—হরিমিশ্র।

ধর্মপাল সম্ভবত ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষিতীশ ও আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্দেশ করা যাইতে পারে।

যশোবর্মা ও আদিশূর :

উল্লিখিত বিবরণ সত্য হইলে আদিশূর যে পালবংশীয় নৃপতি ধর্মপালের তিন পুরুষ পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। বপ্পভটিসূরি চরিত, রাজশেখরের প্রবন্ধ কোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মদেবের পুত্র আমরাজ গৌড়াধিপ ধর্মপালের চিরশত্রু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সর্বদাই বাদ বিসম্বাদ হইত। তাহা হইলে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ আমরাজের পিতা যশোবর্মদেবের সমসাময়িক ছিলেন : সুতরাং বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর হয়ত কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ আদিশূর হয়ত কান্যকুব্জাধিপ যশোবর্মদেবের সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে যশোবর্মদেব প্রায় ৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন[২২]। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "মহাকবি ভবভূতি উক্ত কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মদেবের রাজসভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য কর্তৃক সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। কুমারিল-শিষ্য রাজকবি ভবভূতিও যে ভারতব্যাপী এই আন্দোলনে স্বীয় গুরুর সহায়ক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই[২৩]। সুতরাং কান্যকুব্জের অনতি-দূরবর্তী বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠানকল্পে ভবভূতি-নিয়ন্ত্রিত যশোবর্মদেব যে আদিশূরের সাহায্য করিয়া থাকিলেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? অতএব মনে হয়, আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণানয়ন-প্রসঙ্গ কুলাচার্যগণের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অসার কল্পনা মাত্র নহে"[২৪]। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কল্পনার আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে যশোবর্মা নামক একজন নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীর প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যশোবর্মার দিগ্বিজয় কাহিনী তদীয় সভা কবি বাক্‌পতিরাজ কর্তৃক "গউড় বহো" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, "যশোবর্মা পলায়নপর মগহ নাহ" বা মগধ নাথকে নিহত করিয়া, দারু চিনির সুগন্ধে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিজেতার পদানত হইয়াছিলেন"[২৫]। চীনদেশের ইতিহাসে যশোবর্মা I-cha-fon-mo নামে পরিচিত[২৬]। চীনদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে যশোবর্মা চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যশোবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী "গৌড়পতি" সম্ভবত আদিত্য সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয়

জীবিত গুপ্ত। তৎকালে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্তিত উত্তরাপথের পূর্বংশের অধিপতি "গৌড়াধিপ" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু "বঙ্গপতি" এই সামন্ত চক্রের বহির্ভূত ছিলেন[২৭]। যশোবর্মা কর্তৃক পরাজিত এই বঙ্গপতির পরিচয় অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

আদিশূর ও জয়ন্ত :

ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ঁবংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা গ্রন্থে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" লিখিত আছে, দেখিতে পাইয়া, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষ" এবং "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগে" প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনিই রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত গৌড়াধির জয়ন্ত। পরে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ও "সাহিত্য" ১২শ ভাগ ৭২৩ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবুর মতের পোষকতা করিয়াছেন। "গৌড়ের ইতিহাস" এবং "বাংলার পুরাবৃত্ত" গ্রন্থেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে, নগেন্দ্রবাবু উপরোক্ত বচনের আকর "প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত" "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" গ্রন্থ হইতে তিনি যে আর একটি অভিনব তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহা এই—

"বেদবাণাঙ্গশাকেতুনৃপোহভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।।

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজা হন, এবং ৬৬৮ শাকে সাগ্নিক বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।

কিন্তু এই বচনটি "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" উদ্ধৃত হয় নাই কেন তাহা কৌতূহলজনক। "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর" উপরোক্ত বচনটি ঁবংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দৃষ্টিপথই বা অতিক্রম করিয়াছিল নে তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কলিকাতা সাহিত্যসভায় "আদিশূর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষ, রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী-ধৃত বচন দুইটির পাঠশুদ্ধি বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইয়া উহাব যথার্থ নিরূপণ জন্য সমিতির সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থকে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ঁবংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের বাড়ি হইতে "কুলদোষ" নাম একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, "এই কুলদোষ গ্রন্থই যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব কর্তৃক "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুলপঞ্জিকা' বা "কুলকারিকা" নামে অভিহিত এবং রাজন্যকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই গ্রন্থে বসু মহাশয় ধৃত—

বেদ বাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোহভূচ্‌চাদি শূরকঃ।
বসু কর্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।।

দেখিতে পাওয়া যায় না।

২য় পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে—

"বেদবাণাঙ্গ শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।

"কুলদোষ" গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" বচন নাই, আছে—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী"।।

এই গ্রন্থে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের সময় নির্দেশক শ্লোক পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসুধর্মাষ্টকে শাকে নৃপ (বো) ভু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ"।।

কিন্তু বংশীবদন বিদ্যারত্নের বাড়িতে "কুলমঞ্জরী" গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বংশীবদন বিদ্যারত্নের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়া আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৬৮ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না"। যখন রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী গ্রন্থ উক্ত বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়িতে খুজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতেছে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কুলদোষ গ্রন্থে আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব প্রতিপাদক কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহারা অভিন্ন ছিলেন বলিয়া যে তথাকথিত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহা ভিত্তিহীন।

রাজতরঙ্গিণীর জয়ন্ত-জয়াপীড়-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত। আমরা রাজতরঙ্গিণীর এই স্থানটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম[২৮]।

"স্বদেশ গমনানুজ্ঞাৎ সৈন্যস্যাপ্ত মুখেন সঃ।
দত্বা নিশায়ামেকাকী নিযযৌ কটকান্তরাৎ।।
* * *
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্র বর্দ্ধনম্।।
তস্মিন্ সৌরাজ্য রম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌর বিভূতিভিঃ।
লাস্যং স দৃষ্টুমবিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্।।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ।
ততো দেব গৃহদ্বার-শিলা মধ্যাস্ত স ক্ষণম্।।
তেজোবিশেষ চকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্।
নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শ তম্।।
অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া।
অংসপৃষ্ঠেহথ ধাবন্তং করং তস্যান্তরান্তরা।।
অচিন্তয়ৎ ততো গূঢ়ং চরন্নেষ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তর কুলোদ্ভবঃ।।
এবং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ।
অংস পৃষ্ঠেন যেনায়ং লসৎ পাণিঃ প্রতিক্ষণম্।।
লোলশ্রোত্রপুটোমদোৎকমধুপাপাতাত্যয়েহপি দ্বিপঃ।
সিংহো হকত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্য বিপ্রেক্ষিতা।।
মেঘৌন্মুখ্য-শমেহপাশান্ত-বদনোদ্গীর্ণ স্বরো-বর্হিণঃ।
শ্চেষ্টানাং বিরমেন্ন হেতু বিগমেহপাভ্যাস-দীর্ঘা স্থিতিঃ।।
ইত্যন্ত শ্চিন্তয়ন্তী সা কৃত্বা সংক্রান্ত সংবিদম্।
সখীমভিন্ন-হৃদয়াং বিসসর্জ্জ তদন্তিকম।।
প্রাগ্‌বৎ পৃষ্ঠংগতে পাণৌ পুগ খণ্ডাং স্তয়ার্পিতান্।
বক্ত্রে ক্ষিপন্ জয়া-পীড়ঃ পরিবৃত্য দদর্শ-তাম্।।
ভ্রূসংজ্ঞয়াসি কস্য ত্বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রুবঃ।
দদত্যা বীটিকাস্তস্যা বৃত্তান্ত মুপলব্ধবান।।

তয়া জনিত দাক্ষিণ্যস্তৈর্মধুরভাষিতৈঃ।
সখ্যাঃসমাপ্ত নৃত্যায়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ।।
অগ্রাম্য পেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী।
উপাচরৎ পরার্দ্ধ্যশ্রীঃ সোহপ্যভূদ্বিস্মিতো যথা।।
ততঃ শশাঙ্ক ধবলে সঞ্জাতে রজনী মুখে।
পাণিনালম্ব্য ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা।।
ততঃ কাঞ্চনপর্য্যঙ্ক-শায়ী মৈরেয়-মত্তয়া।
তয়ার্থিতোহপি শিতিলং বিদধে নাধরাং শুকম্।।
প্রবেশয়ন্নিব বৃহদ্‌বক্ষস্তাং সত্রপাং ততঃ।
দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমব্রবীৎ।।
ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয় হারিণী।
কিন্তু কালানুরোধোহয়ং সাপরাধং করোতি মাম্।।
দাসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহস্ম্যকৃত্রিমৈঃ।
অচিরাজ্‌জ্ঞাতবৃত্তান্তা ধ্রুবং দাক্ষিণ্যমেষ্যসি।।
কার্য্যশেষ মনিষ্পাদ্য সজ্জং মানিনি কঞ্চন।
অভোগে কৃতসংকল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্।।
তামেব মুক্ত্বা পর্য্যঙ্কং সাঙ্গুলীয়েন পাণিনা।
বাদয়ন্নিব নিশ্বস্য শ্লোকমেতং পপাঠ সঃ।।
অসমাপ্ত জিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ।
শ্লোকেনাত্মাগতং তেন পঠিতেন মহীভূজা।
সা কলাকুশলাজ্ঞাসীন্মহান্তং কঞ্চিদেব তম্।।
গন্তুকামঞ্চ তং প্রাতর্নৃপং প্রণয়িনী বলাৎ।
অর্থয়িত্বা চিরং কালমপ্রস্থান মযাচত।।
একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতস্তটম্।
চিরায়াতো গৃহং তস্যা দদর্শ ভূশবিহ্বলম্।।
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমুচে সা শুচিস্মিতা!
সিংহোহত্র সুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহন্তি দেহিনঃ।।
নরনাগাশ্ব সংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে!
ত্বয্যভূবং চিরায়াতে তদ্ভয়েন সমাকুলা।।
রাজানো রাজপুত্রা বা তদ্ভয়েন বিসূত্রিতাঃ।
গৃহেভ্যো নাত্র নির্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে।।
তামিতি ব্রুতবর্তীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্য চ।
সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়া পীড়োহত্যবাহয়ৎ।।
অপরেদ্যুর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরান্তরাৎ।
সিংহাগম প্রতীক্ষোহভূন্মহাবটতরোরধঃ।।
অদৃশ্যত ততো দূরাদুৎফুল্লবকুলচ্ছবিঃ।
অট্টহাসঃ কৃতান্তস্য সঞ্চারীব মৃগাধিপঃ।।
অধ্বনান্যেন যান্তং তমথ মন্থরগামিনম্।
রাজসিংহো নদন্ সিংহং সমাহুয়ত হেলয়া।।
স্তব্ধশ্রোত্রো ব্যাত্তবক্ত্রঃ কম্প্রকূর্চ্চঃ প্রদীপ্তদৃক্।

উদস্তপূর্ব্বকায়স্তং সর্গজ্জঃ সমুপাদ্রবৎ।।
তস্য ন্যস্যাননবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা।
ক্ষিপ্রকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ।।
শোণিতং জঙ্ঘগন্দেভ-সিন্দুরাভং বিমুঞ্চতা।
এক প্রহারভিন্নেন তেনাত্যজ্যত জীবিতম্।।
আমুক্ত ব্রণপট্টঃ স কফোণি মথ গোপয়ন্।
প্রবিশ্য নর্ত্তকীবেশ্ম নিশি সুষ্বাপ পূর্ব্ববৎ।।
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাংশ্রুত্বা সিংহং হতং নৃপঃ।
প্রহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্ দ্রষ্টুং জয়ন্তো নির্যযৌ স্বয়ম্।।
সদৃষ্টাতং মহাকায়মেক প্রহৃতি সংহৃতম্।
সাশ্চর্য্যো নিশ্চয়াম্মেনে প্রহর্ত্তার মমানুষম্।।
তস্য তন্তান্তরাল্লব্ধং কেয়ূরং পার্শ্বগার্পিতম্।
শ্রীজয়াপীড়নামাঙ্কং দদর্শাথ সবিস্ময়ঃ।।
স্যাৎ কুতোহত্র স ভূপাল ইতি ব্রুবতি পার্থিবে।
জয়াপীড়াগমাশাঙ্কপুরমাসীদ্ ভয়াকুলম্।।
ততঃ পৌরান বিমৃশ্যৈবং জয়ন্তঃ ক্ষিতিপোহব্রবীৎ।
প্রহর্ষাবসরে মূঢ়া কস্মাদ্ বো ভয়সম্ভবঃ।।
শ্রূয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভুজ বলোর্জ্জিতঃ।
কেনাপি হেতুনা ভ্রামন্নেকাক্যেব দিগন্তরে।।
রাজপুত্রঃ কল্লট ইত্যুক্তা কল্যাণ দেব্যসৌ।
তস্মৈ নিয়মিতা দাতুং নিষ্পুত্রেণ সুতা ময়া।।
সেহন্বেষ্যশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্তস্তদ্রত্নাহরণেচ্ছয়া।
রত্নদ্বীপং প্রতিষ্ঠাসোর্নিধানাসাদনং গৃহাৎ।।
অস্মিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবন শাসিনা।
ব্রুয়াদেনং মমান্বিষ্য যোহস্মৈ দদ্যামভীপ্সিতম্।।
বাচি স প্রত্যয়াঃ পৌরা ভুপতেঃ সত্যবাদিনঃ।
অন্বিষ্য কমলাবাস-বর্ত্তিনং তং নববেদয়ন্।।
সামাত্যান্তঃ পুরোহভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তম্।
ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতি নির্ণায় বিহিতোৎসবঃ।।
কল্যাণ দেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভি নিবেশিনা।
রাজলক্ষ্যা ব্যাপাস্তায়া ইব সোহজিগ্রহৎ করম্।।
ব্যধাদ্ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্"।

ইহার মর্ম এই যে, জজ্জা নামক এক ব্যক্তি জয়াপীড়ের রাজত্ব হস্তগত করিলে তিনি অনুযাত্রীগণ সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং একাকি ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক পুন্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করেন। জয়াপীড় নগরে প্রবেশ করিয়া সন্দর্শন করিলেন যে কার্তিকেয় মন্দিরে আরতি হইতেছে। সেই সময় দেবনর্তকী কমলা মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল ; জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হন। কমলাও এই অপরিচিত যুবার সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করে। এই বারবিলাসিনীর গৃহসজ্জা দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই রমণী সুবর্ণ-পর্যঙ্কে শয়ন করিত এবং তাহার আহারের পাত্রাদিও সুবর্ণ-নির্মিত ছিল। কমলা সংস্কৃত জানিত, কিন্তু বারাঙ্গনা-সুলভ

মদ্যপানেও অভ্যস্তা ছিল। এই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহভয় উপস্থিত হইয়াছিল। নগরবাসীরা এই সিংহকে বিনাশ করিতে পারে নাই। জয়াপীড় কমলার মুখে নগরবাসীদিগের বিপদের কথা শুনিয়া, সিংহের উদ্দেশে গমন করেন ; জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনিষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গদ সিংহ-মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে। পরদিন নগরবাসিগণের মুখে সিংহের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্ত সপার্ষদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত কেয়ূর দেখিতে পান। তিনি ইতঃপূর্বেই লোকমুখে জয়াপীড়ের পূর্ব-দেশাভিযান প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ছিলেন। জয়াপীড়কে অনুসন্ধান করিয়া কমলার গৃহে পাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন পূর্বক আপনার কন্যা কল্যাণী দেবীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। জয়াপীড়, জয়ন্তের আলয়ে কিছুকাল অবস্থানপূর্বক গৌড়ের পাঁচজন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে রাজচক্রবর্তী করেন। অতঃপর জয়াপীড় নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীকে ও বারাঙ্গনা কমলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

এইরূপ অলৌকিক উপাখ্যান লইয়া সরস উপন্যাস রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে ইহার স্থান হইতে পারে না।

রাজতরঙ্গিণী যে সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডাঃ বুলার বলেন, "রাজতরঙ্গিণীর বিবরণগুলি কাশ্মীর বা ভারতে ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার পূর্বে প্রথম হইতে কর্কটক রাজবংশের প্রথমাংশ পর্যন্ত বিচারপূর্বক সংস্কার করা আবশ্যক[২৯]। রাজতরঙ্গিণীর ভূমিকায় ডাঃ ষ্টাইন গ্রন্থের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কলহন মিশ্রকে সমসাময়িক ঘটনা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় না। ঐতিহাসিক ষ্টাইন লিখিয়াছেন—

"Miraculous stories & legends taken from traditional lore are related in a form showing that the chronicler fully shared the nave credulity from which they had sprung. Manifest impossibilities exaggerations and superstitious beliefs such as which we must expect to find mixed up with historical reminiscences in popular tradition, are reproduced without a mark of doubt and critical misgiving :—

All the above observations combine to show that Kalhan knew nothing of that critical spirit which to us now apears the indespensible qualification of the Historian. Prepared as he himself is to believe, we cannot expect him to have chosen his authorities to the events they profess to relate. Still less can we credit him with a critical examination of the statements he chose to reproduce from them "[৩০]।

Allusions have been made already to the fact that the Indian mind has never learned to divide mythology & legendary tradition from true history That spirit of doubt does not arise which alone can teach how to separate tradition from historic truth, to distingwish between the facts and the reflections they have left in the popular mind".[৩১]

বস্তুত রাজতরঙ্গিণী-রচয়িতা অলৌকিক উপাখ্যান ও গল্পসমূহ বিচারপূর্বক গ্রহণ করে নাই, অকপট ভাবেই উহাতে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। পরম্পরাগত প্রাচীন ও প্রবল কিম্বদন্তী এবং বিচিত্র ও পৌরাণিক উপকথা ওতপ্রোতভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্যই এই সমুদয় বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া

ইতিহাসের সহিত গ্রথিত করা আবশ্যক। কিন্তু কহ্লন মিশ্র উপাখ্যান বা কিম্বদন্তীতে অণুমাত্রও অবিশ্বাসের রেখাপাত করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ জয়াপীড়ের পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে অথবা গৌড়দেশে আগমনের কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন।[৩২] ষ্টাইন সাহেবও জাপীড়ের গৌড়বিজয় কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।[৩৩]

কহ্লনের মতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-তরঙ্গিণীর অনুবাদক ষ্টাইন সাহেব উহা নির্ভুল বলিয়া মনে করেন না। তিনি এতদ্বিষয়ে বহু পর্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জয়াপীড় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ৭৭২—৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং জয়ন্ত-কাহিনীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই স্থাপিত করিতে হয়। জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমণের পূর্বে তিনি একজন সামান্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার দৌড় এই পর্যন্ত যে তিনি রাজধানী হইতে ব্যাঘ্র-ভীতি দূর করিতেও সমর্থ হন নাই। জয়াপীড়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়াই জামাতার সাহায্যে তিনি তথাকথিত "পঞ্চ গৌড়াধিপ" গণকে (?) জয় করিয়া আপনার রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের একজন সামান্য রাজা দ্বারা সংঘটিত না হইয়া "পঞ্চ গৌড়াধিপ" (?) জয়ন্তের পক্ষেই কতকটা সম্বপর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে ; সুতরাং আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন হইলে, জয়ন্তের ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, কনোজরাজ যশোবর্মদেব ৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম তনয় আমরাজ বপভট্ট সূরি কর্তৃক অল্প বয়সেই জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ জৈনধর্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তিনি যে বৈদিক ধর্মের উন্নতি ও প্রসারকল্পে আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সম্ভবত যশোবর্মই এই কার্যে আদিশূরের প্রধান সহায় ছিলেন। জয়ন্তের জামাতা কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের পিতামহ ললিতাদিত্য "বাকপতিরাজ-শ্রীভবভূতি" প্রভৃতি কবিগণ সেবিত কনোজাধিপতি যশোবর্মদেবকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্ত কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা যশোবর্মার জীবিতকাল মধ্যে কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? যশোবর্মার সমসাময়িক "আদিশূর" ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের বহু পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং আদিশূর এবং জয়ন্তকে অভিন্ন মনে করিবার যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। গৌড়রাজমালা প্রণেতার ন্যায় আমরাও বলি, "যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিংবা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র তাহা বলা কঠিন।"

"মাৎস্য-ন্যায়" বিদূরিত করিবার জন্য গৌড়ীয় প্রকৃতি-পুঞ্জ বপ্যট তনয় গোপালদেবকে ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৭২—৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন এবং তৎকর্তৃক পঞ্চগৌড়াধিপগণের (?) পরাজয়ের কাহিনী কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ৭২৩—৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ; তৎপরে কুবলয়াপীড় ১ বৎসর, বজ্রাদিত্য ৭ বৎসর, পৃথীব্যাপীড় ৪ বৎসর, সংগ্রামপীড় ৭ দিবস, এবং তৎপরে জয়াপীড় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জয়াপীড় প্রথমত স্বরাজ্যে থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং কতিপয় বৎসর পরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। অতএব ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন সম্ভবপর হয় না। ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বা

তৎপরবর্তী সময়ে গৌড় মণ্ডলে জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তের সার্বভৌমশ্রী অর্জন করিবার কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, "মাৎস্যন্যায় প্রপীড়িত" গৌড়ীয় প্রকৃতি পুঞ্জের "রাজভট্ট-বংশ পতিত" গোপালদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে সংস্থাপনের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়।

বৎসরাজ ও আদিশূর : শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময়-নির্ণয় প্রসঙ্গে এক অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "বৎস রাজদেব, তদীয় পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ (৭০২—৭২৭ শকাব্দ) পর্যন্ত কান্যকুব্জে পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কনৌজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালবদেশ হইতে গৌড়দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনৌজপতিদিগকে আর্যাবর্তের সর্বপ্রধান নরপতি করিয়া তোলে।" ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় নাসিকের একখানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ) লিখিত তাম্র শাসনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দরাজের পিতা পৌররাজ গৌড় বঙ্গবিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া উভয়ের রাজছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কৈলাস বাবু বলেন, "এমতাবস্থায় ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ইনিই আদিশূর। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও শৈব হওয়ারই সম্ভব। আদিশূর কোনবংশীয় নরপতি তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আদিশূর কিংবা তাহার উত্তর-পুরুষ কোন রাজা দিনাজপুর অঞ্চলে যে শিব নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দিরস্তম্ভের খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহারা আপনাদিগকে কম্বোজ বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কম্বোজ বংশীয় কোন সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন"।[৩১] উপরোক্ত অনুমানের কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। দিনাজপুর স্তম্ভলিপির "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা" বাক্যাংশ দৃষ্টে তিনি বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজ বংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

কৈলাস বাবু এখানে সম্ভবত গুর্জরপতি বৎসরাজের বিষয়ই বলিতেছেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পরে গুর্জর জাতি কর্তৃক মধ্য ভারত বিজিত হইয়াছিল। গুর্জরের প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি অবন্তীরাজকে পরাজিত এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং উভয়ের রাজছত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। "ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুব শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গুর্জরপতি বৎসরাজকে উত্তরপথ হইতে তাড়িত করেন এবং গৌড়বঙ্গের ছত্রদ্বয় হস্তগত করেন।" এই সমুদয় ঘটনা ৭০৫ শকাব্দের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল, কারণ জৈন হরিবংশ প্রণেতা জিন সেন লিখিয়াছেন[৩৫] ---

> "শাকেস্বব্দ শতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চো চত্তরেযূত্তরাং
> পাতীন্দ্রায়ুধ নাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
> পূর্বাং শ্রীমদবন্তি ভূভৃতি নৃপে বৎসাদি (ধ) রাজেহ পরাং
> সৌর্য্যাণআমধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেহ বতি"।

অর্থাৎ—৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক শাসন করিতেছিলেন, কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ (রাষ্ট্রকুট রাজধ্রুব) দক্ষিণ দিক শাসন করিতেছিলেন, পূর্বদিকে অবন্তীরাজের শাসনাধিনে ছিল এবং পশ্চিম দিক বৎসরাজ কর্তৃক শাসিত হইতেছিল, এবং সৌর্যগণের রাজ্য বীর জয় বরাহের শাসনাধীনে ছিল!

"কিন্তু যশোবর্মার ন্যায় বৎসরাজকেও শত্রুর তাড়নায়, অচিরকাল মধ্যেই গৌড়-বঙ্গ-বিজয়-ফল-সম্ভোগ বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশ নিচয় ত্যাগ করিয়া কাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন"[৩৬]। ধ্রুবশাসিত গুর্জর রাজ কিয়ৎকাল পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থেই যত্নবান ছিলেন। সুতরাং বৎসরাজ কর্তৃক গৌড়ের সিংহাসনে তদীয় সেনাপতিকে সংস্থাপিত করিবার কল্পনা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধনপুরের তাম্রশাসনে গুর্জরপতি বৎসরাজের গৌড় বঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ লইয়াছে[৩৭] —

"হেলা স্বীকৃত গৌড় রাজ্য কলমা মত্তং প্রবেশ্যাচিরা-
দ্দুর্মাগং মরুমধ্যমপ্রতি বলৈর্যো বৎসরাজং বলৈঃ।
গৌড়ীয়ং শরদিন্দু পাদধবলং ছত্রদ্বয়ং কেবলং
তস্মান্নাহৃত তদ্‌যশোপি ককুভাং প্রান্তেস্থিতং তৎক্ষণাৎ"।।

অর্থাৎ "তিনি (ধ্রুব) অতুল পরাক্রম-সৈন্য বলের দ্বারা, হেলায় গৌড়রাজ্য জয়জনিত অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরু মধ্যে তাড়িত করিয়া কেবল যে (তাঁহার) গৌড়জয়লব্ধ শরদিন্দু ধবল ছত্রদ্বয়ই কাড়িয়া লইয়াছিলেন এমন নহে ; তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বরোদায় প্রাপ্ত ইন্দ্ররাজ তনয় কর্করাজের ৭৩৪ শকাব্দের তাম্রশাসনে এই ঘটনা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে[৩৮] —

"গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি নির্জয় দুর্বিদগ্ধ সদ্‌গুর্জরেশ্বর দিগগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বা ভুজঃ বিহত মালব রক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্য ফলানি ভুঙ্‌ক্তে।।"

অর্থাৎ—"প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ) পারজিত মালবরাজকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহার (কর্করাজের) এক হস্তকে গৌড়েন্দ্র এবং বঙ্গপতি বিজেতা দুরাশা মত্ত গুর্জর-পতির আক্রমণার্থ আগমন পথের সুদৃঢ় অর্গলে পরিণত করিয়া, অপর হস্তকে রাজ্যফল স্বরূপ উপভোগ করেন।" এই গুর্জব-পতি যে বৎসরাজ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ ধ্রুব কর্তৃক গুজরাট ও মালবে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, আর কোনও গুর্জরপতির পুনর্বার গৌড়বঙ্গ বিজয়ের অবসর পাইবার সম্ভাবনা ছিল না[৩৯]। গুর্জরপতি বৎসরাজ যে বঙ্গাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজছত্র হস্তগত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানা যায় নাই। সুতরাং বৎসরাজের সহিত আদিশূর বা তদ্বংশীয় কোনও নৃপতির সংশ্রব কল্পনা করা সমীচীন নহে।

আদিশূর ও বীরসেন :

কানিংহাম সাহেব, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আদিশূর ও বীরসেনকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদনুসারে স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আদিশূরকে বীরসেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু অধুনা এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার হরনলি বলেন, বিজয়সেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাঁহার মতে বল্লালের পিতার রাজ্যশাসনকালে ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গণনা দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। পিতা পুত্রের মধ্যে কখনই অত্যাধিক অন্তর হইতে পারে না।

কামরূপাধিপতি হর্ষদেব ও বঙ্গরাজ :

নেপালাধিপতি জয়দেব পরচক্রকামের ১৫৩ হর্ষ সম্বতের (৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দের) শিলালিপিতে কামরূপরাজ হর্ষদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, জয়দেব (নেপালরাজ), ভগদত্ত বংশীয় "গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশলপতি" এই হর্ষদেবের

কন্যা রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৪০]। প্রাচীন কামরূপের নৃপতিগণ নরক এবং ভগদত্তের বংশধর বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতেন। হর্ষদেব সম্ভবত কামরূপের প্রাচীনরাজবংশ সমুদ্ভব ছিলেন ; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া, কামরূপের পশ্চিম সীমান্তস্থিত করতোয়া নদী পার হইয়া বঙ্গরাজ্য উল্লঙ্ঘন পূর্বক যশোবর্মার সাম্রাজ্যের অধঃপতন জনিত উত্তরাপথব্যাপী বিপ্লবের সুযোগে গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং কোশল লইয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কামরূপের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বঙ্গরাজ্য, হয়ত হর্ষদেবের এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল, অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া এই অভিনব সাম্রাজ্য-চক্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষদেবের সমসাময়িক বঙ্গরাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিতে বঙ্গে শূররাজ বংশের আবির্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্ধারিত হইলে, আদিশূর বা তাহার পুত্রকে হর্ষদেবের সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না।

আদিশূরের পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপ :

কোনও কোনও কুলগ্রন্থকারের মতে, আদিশূরের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজবংশ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম উন্মূলনের সবিশেষ চেষ্টা করে। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে —

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোহভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদি দেশে,
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরিদিতি সুতপতিঃস্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমির রিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্।।"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে —

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস।।"
(কুলরমা)।

এখানে "বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্", বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাগণকে না বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নরপতিগণের বংশও বুঝাইতে পারে।

রবিসেন মহামণ্ডল প্রণীত কুলপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে —

"আসীৎ পুরা বৈদ্যবংশে লক্ষ্মীনারায়ণো নৃপঃ।
গাঙ্গেয় ইব ধর্মাত্মা দৃঢ় ব্রতো মহাবলঃ।।
দানে বৈকর্তনঃ কর্ণো রণে চাপি ধনঞ্জয়ঃ।
নিহত্যনাস্তিকান বৌদ্ধান্ আদিশূরাখ্যঃ কীর্তিতঃ।।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য যদা বঙ্গে বভূবহ—
তদানয়ৎ দ্বিজান্ পঞ্চ সাগ্নিকান্ কান্যকুব্জতঃ।।"

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে —

"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাং স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্।।"

আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতিব নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি ব্রাহ্মণদিগকে "সুজিত-সুগত-বৃন্দে" গৌড়রাজ্যে অনুগ্রহ পূর্বক আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুলাচার্যগণের মতে আদিশূর এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া বঙ্গের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রাজবংশের পরিচয় কোনও কুলশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই।

আদিশূরের রাজধানী :

আদিশূরের রাজধানী কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য- বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন, "এখনও পূর্ববঙ্গের বহু লোকের বিশ্বাস, আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন এবং এখানে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই। গৌড়াধিপ আদিশূর কোনও কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা, তাহারই বিশ্বাসজনক প্রামাণাভাব। আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ডবর্দ্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল"[৪২]। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "বারেন্দ্রকুল পঞ্জীর" লিখিত—

"সকল গুম সমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকর বর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং,
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং।।"

এই বচনটি অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্‌বিধৌতপাদ গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

"গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা" এবং "বঙ্গের পুরাবৃত্ত"—রচয়িতা প্রভৃতি অনেকে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে লঘুভারত-কর্তা ৺গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, সম্বন্ধনির্ণয়প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, পণ্ডিতাগ্রণি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এবং আদিশূর ও বল্লাল সেন প্রণেতা প্রভৃতি অনেকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের পক্ষপাতী। আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন এখন পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাঁহার রাজধানী কোনস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তবুও কিন্তু একথা স্থির যে আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে তাঁহার রাজধানী প্রাচীন বঙ্গেই স্থাপন করিতে হইবে।

নগেন্দ্র বাবুর উক্তির সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ উহার মূলে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নাই। কুল-গ্রন্থগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত হয় নাই। তৎকালে গৌড়রাজ্য বলিতে গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় প্রদেশই বুঝাইত। রামদেবের "বৈদিক কুলমঞ্জরী" গ্রন্থে সামলবর্মা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরোপান্তে পুরী" নির্মাণ করিয়াছিলেন। অপরাপর কুলগ্রন্থ সমূহেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে লিখিত গৌড় শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত না হইয়া প্রদেশার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং গৌড় ও বঙ্গ যে সুরসরিদবধৌত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গঙ্গার প্রবাহ যে বহু পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক মনীষিই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মেজর রেনেল, বুকানন, মেবিল্টন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মধুপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমস্থ নিম্নভূমি গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে রাজসাহীর চলন বিলে এবং ঢাকার আইরল বিলেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এ বিষয় ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং "সুরসরিদবধৌতপাদ" প্রমাণের বলে আদিশূরের রাজধানীকে পশ্চিমবঙ্গে নেওয়া চলে না।

খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয়পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর অন্ত পর্যন্ত গৌড় মণ্ডলে পালরাজ গণের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে শূররাজের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না। আবার বাক্‌পতি রাজের "গৌড়বহো" কাব্য হইতে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্তিত উত্তরা পাথের পূর্বাংশের অধিপতি "গৌড়াধিপ" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন! সুতরাং তৎকালে গৌড় মণ্ডল যে

মগধাধিপতির করায়ত্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যশোবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী এই "গৌড়পতিকে" গৌড়রাজমালার লেখক আদিত্য সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[৪৩] এবং আমরাও উহাই সত্য বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে গৌড়পতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তৎকালে আদিশূরকে গৌড়ে স্থাপন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

শূর বংশাবলী :

কুলাচার্য গণের লিখিত গ্রন্থসমূহে আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু উহা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। কুলগ্রন্থে এবং প্রাচীন কুলজ্ঞগণের কথানুসারে নিম্নলিখিত বংশাবলী জানা যায়, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কবিশূর তৎপুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, তাহার পর প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাহার পরে অনুশূর গৌড়ে রাজা হন[৪৪]। আচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তদীয় ঐতিহাসিক চিত্রের ৮৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছিলেন, "বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র একদেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্যদেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ এবং প্রদ্যুম্নের রাজ্য রাঢ় দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

আইন্-ই-আকবরি গ্রন্থে আদিশূর-বংশ নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে —

১। আদিশূর
২। জর্মেনি ভান্ (যামিনী ভানু)?
৩। আনরুদ (অনিরুদ্ধ)?
৪। পরতাপ রুদর (প্রতাপ রুদ্র)?
৫। ভবদৎ (ভবদত্ত)?
৬। রেকদেত্ত (রঘুদেব)?
৭। গিরধার (গিরিধারী)?
৮। পরতিহিধর (পৃথ্বীধর)?
৯। শিস্‌টিধর (সৃষ্টিধর)?
১০। পিরভাকর (প্রভাকব)?
১১। জয়ধর।

বিপ্রকল্প লতা গ্রন্থে লিখিত আছে —

"আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্যঃ শাল বান্নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গ রাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্ম পরিপালকঃ।
তদ্বংশে জনিত শ্চৈকঃ প্রতাপ চন্দ্র ভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিত শ্চান্য স্তেজঃশেখর সংজ্ঞকঃ।।
বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে দনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।।

কিন্তু ইহাতেও শালবান্, প্রতাপ চন্দ্র, তেজঃশেখর ও আদিশূরের পরস্পরের সম্পর্ক নির্মিত হয় না। লঘুভারত-প্রণেতা তেজঃ শেখরকে আদিশূরের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[৮]। জামনা নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর জয়সেন বিশ্বাস মহাশয় তদীয় বৈদ্যকুল চন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"যেননীতা দ্বিজাঃ পূর্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্য কীর্তিতঃ।।
লক্ষ্মী নারায়ণ সন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান্।
কারিকা কুল কর্তাসৌ মহাবংশস্য সম্মতঃ।।"

অর্থাৎ—যিনি বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁহার উপাধি আদিশূর এবং তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ বিমল, তিনি বহুকারিকা প্রণয়ন করেন, কুলীনগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

"সাহিত্য দর্পণ" প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ "ভূশূরকে ভানুদেব" নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথা—

"মম তাত পাদানাং মহাপাত্রা চতুর্দশ ভাষা বিলাসিনী ভুজঙ্গ মহাকবীশ্বর শ্রীচন্দ্র শেখর সান্ধিবিগ্রহিকাণাং—

দুর্গালঙিঘত বিগ্রহো মনসিজং সম্মীলয়ন্ তেজসা,
প্রোদ্যদ্রাজকলো গৃহীত গরিমা বিশ্বগ্ বৃতো ভোগিভিঃ।
নক্ষত্রেশকৃতেক্ষণো গিরি গুরৌ গাড়াং রুচিং ধারায়ন্,
গামাক্রম্য বিভূতিভূষিত তনুং রাজত্যুমাবল্লভঃ।।"

অত্র প্রকরণেন অভিধয়া উমানাম্নী মহাদেবী তদ্বল্লভ ভানুদেব নৃপতিরূপে অর্থে নিয়ন্ত্রিতে ব্যঞ্জনয়ৈব গৌরীবল্লভরূপঃ অর্থো বোধ্যতে।"

সাহিত্য দর্পণ, ৫২/৫৩ পৃষ্ঠা।

অশেষ-শাস্ত্রার্থদর্শী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "এখানে বৈদ্যকুল কেশরী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর কবীন্দ্রের কথা বলিতেছেন যে তিনি চতুর্দশ ভাষায় মহাপণ্ডিত ও মহারাজ ভানুদেবের প্রধানমাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। রাজমহিষীর নাম উমা ছিল। আমরা মনে করি, এই ভানুদেব, যামিনীভানু, ভূশূর এবং বিমল সেন একই ব্যক্তি!" উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত আদিশূরের বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত হইল[১৬]।

প্রকৃত নাম	উপনাম
১। মহারাজ শালবান সেন	×
২। প্রতাপচন্দ্র সেন	কবিশূর
৩। তেজঃ শেখর সেন	মাধবশূর
৪। লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	আদিশূর
৫। বিমল সেন	ভূশূর, যামিনী ভানু বা ভানুদেব।
৬। অনিরুদ্ধ সেন	ক্ষিতিশূর
৭। প্রতাপরুদ্র সেন	ধরাশূর
৮। ভূদত্ত সেন (ভবদত্ত সেন)?	
৯। রঘুদেব সেন	×
১০। গিরিধারী সেন	×
১১। পৃথ্বীধর সেন	×
১২। সৃষ্টিধর সেন	×
১৩। জয়ধর সেন	×

গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আদিশূরের

পর ভূশূর রাজা হন। ভূশূর রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাত শতী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণি বিভাগ করেন। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম প্রদান করেন[৪৭]। ইনি সাতশতী দিগকে ২৮ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ইহার পর অবনীশূর, ধরনীশূর, যথাক্রমে রাজা হন। ধরাশূর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ দিগকে কুলাচল ও সৎশ্রোত্রীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বন্দ্য প্রভৃতি ২২টি গাঞী সচ্ছোত্রীয় বলিয়া কথিত হয়[৪৮]। তিরুমালয়ের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ়ের মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল এবং বঙ্গের গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেন। বাংলার পুরাবৃত্ত প্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই রণশূর ধরাশূরের পুত্র! কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের বংশাবলী সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। সুতরাং কোন বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? সম্ভবত প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী সময়ে কুলশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং উহা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। আবার অনেকস্থলে কুলগ্রন্থগুলি কোনও উদ্দেশ্য মূলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়; অভিনব ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকপাতে কুলগ্রন্থের অনেক স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে ইতিহাস রচনা করা নিরাপদ নহে।

১. V. A. Smith's Early History of India (2nd Edition) Pages 366-367. কিন্তু এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কারিকার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার পূর্ব মতের আংশিক পরিবর্তন করিয়াছেন।

২. গৌড় রাজমালা—৫৯ পৃষ্ঠা।

৩. গৌড় রাজমালা ৫৮—৫৯ পৃষ্ঠা।

৪. বাচস্পতি প্রশস্তিতে লিখিত ভবদেব-বংশমালা উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীআদিদেব=সরস্বতী (বঙ্গ রাজের রাজ্য লক্ষ্মীর বিশ্রাম সচীব, মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধি বিগ্রহী)

গোবর্দ্ধন=সঙ্গোকা (বন্দ্যঘটী বংশীয়া) (ইনি বীরস্থলী মধ্যে ভুজলীলা দ্বারা এবং বাগ্মী তাত্ত্বিকদিগের সভাস্থলে স্বীয় বিদ্যাবত্তা দ্বারা বসুমতী ও সরস্বতীকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন)
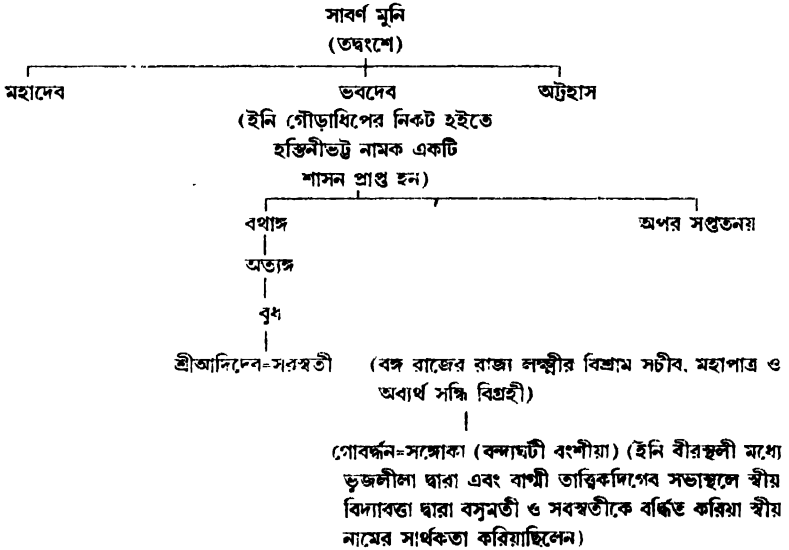
(হরিবর্মদেব এবং তদীয় পুত্রের মন্ত্রণা সচিব)

৫. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—আশ্বিন, ১৩২০।

৬. "বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রহ্মণঃপ্রযতাং সুতাং।
সাঙ্গকামঙ্গনা রত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্"।।

৭. সাহিত্য ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০, ১৪৬ পৃষ্ঠা। ডাঃ বুলার এই তাম্রশাসনের লিপিকাল দশম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাগোবিন্দ বাবুর নির্দেশিত কালই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

৮. সাহিত্য ১৩২১ ; জ্যৈষ্ঠ ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৯. প্রতিভা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠা।

১০. আদিশূর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটি উপাধি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রবি মহামণ্ডল কৃত "কুল-প্রদীপ" এবং জয় সেনের "বৈদ্য কুলচন্দ্রিকায়" ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

১১. As the authors who composed the grants cannot be expected to be impartial in their account of the reigning monarch, much of what they say about him cannot be accepted as historically true. And even in the case of his ancestors, the vague praise that we often find, must be regarded simply as meaningless, & & &. Early History of Dakkan by R. G. Bhandarkar, introduction page ii.

১২. "সস্ত্রীকান্ শাস্ত্র সংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৮ পৃঃ পাদটীকা।

১৩. "অধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্যাদৃগ্‌ভি হোত্রং দ্বিজোত্তমাঃ।
উদ্‌গানং সামভিশ্চক্রে' ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ"। কূর্ম্ম পুরাণ, ৪৯ অঃ।

১৪. "শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় বলেন, কুলার্ণব গ্রন্থে "বেদ বাণাহিমে শাকে" পাঠ দেখা যায়। ইহার পাঠান্তর দেখা যায় না, কিন্তু অর্থান্তর ঘটিযা ৮৫৪ শক হইয়াছে। অহিম অর্থ ৮ ধরা হইয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি ৭টি বর্ষ পর্বত আছে, তন্মধ্যে অহিম অর্থাৎ হিমালয় বাদে ৬টি পর্বত অবশিষ্ট থাকে, তদনুসারেই অহিম অর্থে ৬ বুঝিতে হইবে। সূর্য সিদ্ধান্তের মতে ৭টি গ্রহ আছে। যথা—"চন্দ্রামরেজ্য ভূপুত্র সূর্য শুক্রেন্দ্র জেন্দবঃ। অর্থাৎ "শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র" এখানে চন্দ্র সপ্তমে আছে। চন্দ্রের এক নাম হিম। এই সপ্ত গ্রহকে অহিম করিলে অর্থাৎ চন্দ্র বাদ দিলে ৬টি থাকে, এরূপে ও অহিম অর্থ ৬ হয় ; শব্দটি "অহিম" ধরিলে বসন্ত হইতে হিমঋতু পর্যন্ত ৬ ঋতু হয়, এই অর্থেও ৬ পাওয়া যায়। সুতরাং ৮ হইবেনা, ৬ হইএব ; অতবে "বেদ বাণাহিম" অর্থ ৬৫৪ পাওয়া গেল"।

১৫. রাজনাকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী ধৃত" বসুকর্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬৬৮ শাক বা ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দ ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১৬. "শূন্যবহ্নি বিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজশেখর বংশৈক আদিশূরো নৃপোহভবৎ"।।

লঘুভারত ২ খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা।

"কলির ৪৯৭২ গতাব্দে (১৭৯৩ শাকে) লঘু ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয়। সেই সময়ে গ্রন্থকর্তা, কলির ৪২৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজ্য করা লিখিতেছেন। কলির গতাব্দ ৪৯৭২ হইতে ৪২৩০ বিয়োগ করিলে ৮৪২ অঙ্ক লব্ধ হয়। শকাব্দ ১৭৯৩ হইতে ৮৪২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ৯৫১ লব্ধাঙ্ক শকাব্দার মানজ্ঞাপক। অথবা কলির ৩১৭৯ বৎসর শকাব্দারম্ভ হয়, —৪১৩০ হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে ৯৫১, শকাব্দার মানজ্ঞাপক অঙ্ক পাওয়া যায়।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৩ পৃষ্ঠা পাদটীকা

১৭. "বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা
তদ্বংশে কুলতিঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ"

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ৯৫১ কে শাক মনে না করিয়া সংবৎ বলিয়া অনুমান করেন। কারণ, বিপ্রকল্পলতা-গ্রন্থাকার ইহার অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন —
"বেদষট্ ভণি মানাব্দে শাকে সদগুণ সাগরঃ।
গৌড় রাজ্যাধি রাজঃ সন্ অভিষিক্তো মহামতিঃ"।।

৯৫১ শকাব্দে জন্ম হইলে ৮৬৪ শকাব্দে রাজ্যাভিষেক হয় না। ৯৫১ সংবতে ৮১৬ শকাব্দ হয়। আদিশূর ৮১৬ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬৪ শকাব্দে গৌড় রাজ্যের রাজা হইতে পারেন

১৮. রাজেন্দ্র চোলের ১০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের

পরিচয় পাওয়া যায়। নবাবিষ্কৃত বিজয় সেনের তাম্রশাসনে বিজয়সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাসদেবী শূররাজ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "রাম চরিত" পুস্তকে রামপালের অধীন সামন্তরূপে অপার-মন্দারাধিপতি লক্ষ্মীশূরের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। বিজয় সেনের প্রতিগ্রহ-কর্তা বাৎসগোত্রীয় এবং তাহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভোজবর্মার বেলাব লিপির প্রতিগ্রহ কর্তা সাবর্ণগোত্রীয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

১৯. হরিচরিত কাব্য ১৩শ অধ্যায়।
২০. South Indian Inscriptions Vol. III.
২১. "রাজা শ্রীধর্মপালঃ সুখ সুরধুনী তীর দেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুত তনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকণক রজতৈর্ধামসারাভি ধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুবপুর সদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ"।।

লাহেড়ী কুলপঞ্জী।

২২. Dr. Bhandarkar's Notices of Sanskrit Mss 188-384., Page 15
২৩. মালতী মাধবে পরিব্রাজিকা কামন্দকীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা বৌদ্ধ সমাজের ভগ্নাবস্থা চিত্রিত করা হইয়াছে। বীরচরিত এবং উত্তরচরিতে বৈদিক মার্গ প্রবর্তনের চেষ্টা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়
২৪. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1912. Page 348.
২৫. গউড়বহো—Bombay Sanskrit Series No. 34.
২৬. M M. Chavannes and Levi. Journal Asiatic Society of Bengal 1895 Page 353.
২৭. গৌড় রাজমালা ১৫ পৃষ্ঠা।
২৮. রাজতরঙ্গিণী চতুর্থ তরঙ্গ ৪১৯—৪৬৮ শ্লোক।
২৯. Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol XII. Page 58- 59.
৩০. Stein's Introduction to Raj Tarangini Page 28.
৩১. Stein's Introduction to Raj Tarangini Page 29.
৩২. V. A Smiths Early History of Indian 3rd Ed. Page 375
৩৩. Chronicles of the Kings of Kashmere Vol. I Page 94
৩৪. নব্যভারত ১২৯৬, বৈশাখ।
৩৫. Indian Antiqury XV Page 141 and J R A S. 1909 p 253 গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা।
৩৬. গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা ; প্রবাসী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ ২০৯ পৃষ্ঠা।
৩৭ Indian Antiquary Vol. XI Page 157 Epigraphia Indica Vol VI Page 243
৩৮. Indian Antiquary Vol. XII Page 190.
৩৯. গৌড়রাজমালা ২০ পৃষ্ঠা।
৪০. "মাদ্যদ্দন্তি সমূহ-দন্তমূষল-ক্ষুণ্ণাবি ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশল পতি-শ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিত গুণৈর্যুক্তাপ্রভূতাকুলৈ-
যে নোঢ়া ভগদত্ত রাজ কুলজালক্ষ্মীরিবক্ষ্মাভুজা।।"
Indian Antiquary, vol. IX, Page 178
৪১ "সুকৃত সুকৃত সংঘাঃ সর্ব-শাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তি বাক্যৈঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড় রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুল বরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়াস্তু।।"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ মাংশ ১০৯ পৃষ্ঠা।
৪৩. গৌড়রাজ মালা ১৫ পৃষ্ঠা।
৪৪. পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী অনুসারে আদিশূর বংশীয় সাতজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। যথা :—
"আদিশূরো ভূশূরোশ্চ ক্ষিতিশূরোবনীশূরঃ।
ধরনীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণশূরো।।
এতে সপ্তশূরোঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ"।।

৪৫. বল্লাল মোহমুদগর ৩২৪ পৃষ্ঠা।

৪৬. বল্লালমোহমুদগর ৩২৬ পৃষ্ঠা।

৪৭. "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সূতেন চ।
ক্রিয়তে গাঞী সংজ্ঞানি তেষাংস্থান বিনির্ণয়াৎ"।

৪৮. এই জন্য রাঢ়ীদিগের মধ্যে এই কথাটি প্রচলিত হয় যে, "পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই"।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খড়্গ রাজগণ

আসরফ পুরের তাম্রশাসন :

কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়বঙ্গের সহিত কান্যকুব্জের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতেই বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেছিল বলিয়া অনুমিত হয়। রায়পুরা-থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত দেব-খড়্গের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত বঙ্গের এক অভিনব বাজবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবংশ ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক ছিলেন। উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই, "আবিদ্যাহতি হেতুভূত সংসার মহাম্বুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মূণীন্দ্রের" এবং "অনুশয়ান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ বৈনায়িক দিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষকারী ভাস্করপ্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলির" জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য[১] কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অণুকরণে নির্মিত এবং আতপত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তী চতুষ্টয়, তন্নিম্নে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্তী এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন সংবদ্ধ বুদ্ধ মূর্তি বিরাজিত। এই চৈত্যটি এবং অপরাপর চৈত্র সম্ভবত দ্বিতীয় তাম্রশাসনোল্লিখিত বুদ্ধ-মণ্ডপে অথবা বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়েই রক্ষিত হইত।

এই তাম্রশাসনে খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ দেব খড়্গ এবং রাজরাজ ভট্টব্যতীত মহাদেবী প্রভাবতী, এবং উদীর্ণ খড়্গেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদীর্ণ খড়্গও এই খড়্গবংশীয়ই ছিলেন, কিন্তু দেবখড়্গের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না। পরের পৃষ্ঠায় এই খড়্গরাজ গণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।

রাজরাজ ভট্ট।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ. মহাশয়ের মতে রাজভট্ট সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে, খড়্গবংশীয় প্রথম নরপতি খড়্গোদ্যম সমতটে স্বীয় প্রাধান্য-বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২]।

খড়্গরাজগণের আবির্ভাব কাল :

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ডে লিখিয়াছেন, "আমরা তাম্রশাসনের লিপি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, গজাম হইতে আবিষ্কৃত

শশাঙ্ক দেবের মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসন এবং অফ্‌সড় হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ আদিত্য সেনের খোদিত লিপির অক্ষর বিন্যাসের সহিত দেবখড়োর তাম্রপট্ট লিপির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে দেবখড়্গকেও আমরা খ্রিষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। ৬৫০—৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে চীনা পরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতটপতি রাজভটের বৌদ্ধধর্মানুরাগিতা ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখন দেবখড়্গপুত্র উক্ত রাজরাজভট ও রাজভট উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। ইৎসিং-এর আগমনের পূর্বে প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে রাজভট নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন। সম্ভবত য়ূঅনচু অঙ্গ কামরূপ হইয়া সমতট রাজ্যে আসিলেও রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, অথবা সমতটপতি দেবখড়্গ তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই,—একারণ তিনি বৌদ্ধ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিলেও নৃপতির নামোল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই"[৩]। কিন্তু অক্ষরতত্ত্বের আলোচনায় আসরফপুর তাম্রশাসনের ভূমিদাতা দেবখড়োর আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর পূর্বে নির্দেশ করা অসম্ভব। দেবখড়্গ বা রাজরাজভট্ট যে সমতটের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং ইৎসিং কথিত সমতট-রাজ "হো-লো-শে-পো-ত"-ই যে দেবখড়্গ তদীয় রাজরাজ ভট্ট তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। নামের সমতা(?) এবং বৌদ্ধধর্মানুরক্তি ব্যতীত উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের অপর কোনও কারণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসই এই অনুমানের প্রধান পরিপন্থী।

আসরফপুর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী মদীয় সতীর্থ ৺গঙ্গামোহন লস্কর এম. এ. উভয় তাম্রশাসনের লেখমালার আলোচনা করিয়া উহা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন[৪]। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ও এই তাম্রশাসনের কাল ৮ম শতাব্দী বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে[৫]। ৺গঙ্গামোহন লস্কর লিখিয়াছিলেন, "অক্ষরগুলি উত্তর ভারতীয় প্রাচীন কুটিলাক্ষর সদৃশ। "মাত্রা"সমূহ বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় নাই ; 'প', 'ম', 'য', 'ষ', 'স' প্রভৃতি অক্ষরমাত্রা শূন্যরূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছে। সুযোগ সত্ত্বেও "অবগ্রহ" চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। "বিরাম" পরিলক্ষিত হয় না। সংবৎ শব্দে "ৎ" ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি পাল ও সেনরাজ গণের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়"[৬]।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় বলেন "অষ্টম শতাব্দীর শাসনাবলী এবং লেখ-মালার সহিত তুলনা করিলে নিমিষে প্রতীয়মান হইবে যে এই তাম্রশাসনদ্বয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এমন কি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমালার সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাম্রশাসনদ্বয় তাহাদের পূর্ববর্তী। হর্ষ সম্বতের ৬৬ বৎসর (৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ) মানাঙ্কযুক্ত মহারাজ আদিত্য সেনের সাহাপুরের মূর্তীলিপি এবং মহারাজ আদিত্য সেনেরই অপসড় শিলালিপির সহিত আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি উক্ত লিপিদ্বয় হইতে প্রাচীনতর। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন এবং বাঁশখারায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরের সহিত আসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য আছে যে, দেখিয়াই মনে হয়, এই চারিখানি তাম্রশাসন একই সময়ের"[৭]। পরে, আবার লিখিত হইয়াছে, "ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে আসরফপুরের তাম্রশাসনের ভূমিদাতা মহারাজ দেবখড়্গ হর্ষের সমসাময়িক রাজা। ইৎচিঙ্গের বিবরণ পড়িয়া এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না"[৮]।

বস্তুত আসরফপুরের তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসের সহিত আদিত্যসেনের সাহাপুর মূর্ত্তীলিপি, অপসড় শিলালিপি, বাঁশখারা তাম্রশাসন, এবং গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসনের লেখমালা তুলনা করিলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হইয়া বরং বিসদৃশই লক্ষিত হইয়া থাকে। আসরফপুর তাম্রশাসনের ("ˊ") রেফগুলি সর্বত্রই অক্ষরের

মাথার উপর প্রলম্বমান। কিন্তু বাঁশখারা লিপির সর্বত্র এবং অপসড় লিপির কোনও কোনও স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ; অনেক স্থলেই "রেফ" মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই ; যে অক্ষরের সহিত "রেফ" যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বামদিকে মাত্রার সমসূত্রের একটি ক্ষুদ্র রেখা টানা হইয়াছে। বাঁশখারা লিপির "স" এর নিচের দিকের বামকোণের বক্রাগ্রভাগ বড়শীর ন্যায়; কিন্তু আসরফপুর লিপিতে "স" এর ঐ স্থানটি চ্যাপ্টা, সুতরাং রেখাগুলি পরস্পর সংলগ্ন না হওয়ায় মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে। আবার বাঁশখারা লিপিতে, এই বক্রস্থান হইতে যে রেখাটি দক্ষিণদিকের প্রলম্বমান রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আসরফপুর তাম্রশাসনে এই রেখা অর্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়াই প্রলম্বমান রেখা স্পর্শ করিয়াছে। অপসড় ও বাঁশখারা লিপির "গ" এর নিচের দিকে বামকোণের বক্র টানটির অভাব আসরফপুর লিপিতে পরিলক্ষিত হয়; প্রাচীনকালের লিপির ন্যায় ইহার উপরিভাগ সরল রেখাকৃতি না হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে এবং সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে যেরূপ কিলকের আকার দৃষ্ট হয়, আসরফপুর তাম্রশাসনে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। অপসড় লিপির "ন" বর্তমান দেবনাগর অক্ষরের অনুরূপ, পক্ষান্তরে আসরফপুর লিপির "ন" এর ডানদিকের প্রলম্বমান রেখা বিলুপ্ত। বাঁশখারা লিপির "য" এর নিচের দিকে বামকোণের অর্দ্ধবৃত্তটি একটু বেশি গোলাকার, বামদিকের উপরের রেখাটিও মাত্রা হইতে ঋজুভাবে এই অর্দ্ধবৃত্তটি ডিম্বাকার, বামদিকের উপরের মাত্রা হইতে বক্রভাবাপন্ন হইয়াই নিম্নস্থ অর্দ্ধবৃত্তের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির "শ" এর উপরিভাগ বাঁশখারা ও অপসড় লিপির "শ" উপরিভাগের ন্যায় চ্যাপ্টা না হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির "ঘ" এর ডিম্বাকার স্থানদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক নেই, কিন্তু অপসড় লিপিতে "ঘ" এর ফাঁকটি অনেক বেশি। ৭ম শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায় "প", "ম", "য", "ষ", "স" এর উপরিভাগ খোলা হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত (া), (ি), (ী), (ে) (ো) প্রাচীনকালের ন্যায় মাত্রার উপরে না হইয়া, পরবর্তীকালের ন্যায় মাত্রা হইতে প্রলম্বমান। আসরফপুর লিপির একার দামোদর গুপ্ত প্রণীত 'কুট্টিনীমতম্' নামক হস্ত লিখিত পুঁথিতে ব্যবহৃত একারের অনুরূপ। অপসড় লিপির "জ" পুরাতন ঢঙ্গের পক্ষান্তরে আসরফপুর তাম্রশাসনের "জ", "ত", "ট", "র" ও "ল" সপ্তম শতাব্দীর বহুপরবর্তীকালের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শ্রীহর্ষের মধুবন ও বাঁশখারা লিপি, শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্মার লিপি, আদিত্যসেনের অপসড় শিলালিপি ও সাহাপুরের মূর্তীলিপি হইতে আসরফপুর লিপিতে মাত্রা সমূহের ক্রমবিকাশ অধিকতর পরিস্ফুট। লিপিমালা পর্যালোচনা করিয়া আসরফপুর তাম্রপট্টোল্লিখিত "ত" ও "র" ৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গোয়ালিয়রের ভোজপ্রশস্তির, "গ", ১০৪২ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কর্ণদেবের তাম্রশাসনের "স" ৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রশস্তির, "ব", 'জ", ও "দ" ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পেহোবা প্রশস্তির, "প" ৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বৈজনাথ প্রশস্তির অনুরূপ বলা যাইতে পারে। আলোচ্য লিপিতে উপাধ্মানীয় ও জিহ্বামূলীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই অপসড় ও বাঁশখারা লিপির ন্যায়, "ম" এর নিচের দিকে বামকোণে পুঁটুলি দেখা যায় না, তৎস্থলে উপরমুখী একটি টান আছে। এই লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রথা দেবপালের ঘোঁষরাবা প্রশস্তিতে ও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। পরবর্তীকালে অপর কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র অক্ষরতত্ত্বের আলোচনা করিয়া, খড়্গরাজগণের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। অক্ষরবিন্যাস দৃষ্টে আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া নবম শতাব্দীর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বহুকাল পরে, নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে খড়্গোদ্যম এবং ঐ শতাব্দীর শেষপাদে দেবখড়্গ ও রাজ রাজভট্টের আবির্ভাবকাল অনুমান করা যাইতে পারে।

সুতরাং ইৎ-সিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেবখড়্গ-তনয় রাজ-রাজভট্টের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা নিষ্ফল। খড়্গরাজগণ সম্ভবত গৌড়ীয় পাল নৃপতিগণের সামন্ত ভূপতি রূপেই সুবর্ণগ্রাম অঞ্চল শাসন করিতেন।

খড়্গোদ্যম :

"সর্বলোক-বন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভব-বিভব-ভেদ-কারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক", খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম "সমগ্র-ক্ষিতিতল" জয় করিলেও ("ক্ষিতিরিয়মভিতো নির্জিতা যেন") তাঁহার রাজোপাধি দৃষ্ট হয় না। বিভিন্ন তাম্রশাসনোল্লিখিত নৃপতিগণের ন্যায় খড়্গবংশীয় রাজগণ "পরমভট্টারক", উপাধিতেও ভূষিত হন নাই। লিপিকর "পরম সৌগতো পাসক" পুরদাস জাতখড়্গকে "ক্ষিতিপতি" এবং দেব খড়গকে "নৃপতি" বা "নরপতি" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং খড়্গবংশীয় রাজগণকে সামন্তরাজা বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত।

জাতখড়্গ :

খড়্গোদ্যম-তনয়-"ক্ষিতিপতি" জাতখড়্গ স্বীয় শৌর্যপ্রভাবে "বাত বিক্ষিপ্ত তৃণ এবং করি-তাড়িত অশ্ববৃন্দের ন্যায় অরি-সংঘ বিধ্বস্ত" করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ("যেন সর্বারি সংঘো বিধ্বস্তঃ শূরভাবা তৃণমিব মরুতা দন্তিনেবাশ্ববৃন্দং")। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অবিরত রাজবিপ্লবে এবং পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড়বঙ্গ জর্জরিত হইবার পরে পরাক্রান্ত-শত্রু বিদারন-পটু জাতখড়্গের শাসনাধীনে পূর্ববঙ্গের প্রজাপুঞ্জ ক্ষণকালের জন্য ও শান্তির কোমল-ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দেবখড়্গ :

জাতখড়্গের পরে,"অশেষ-ক্ষিতি-পাল-মৌলি-মালামণি-দ্যোতিত-পাদ-পীঠ" অরিজিৎ দেবখড়্গ পিতৃ সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই নরপতিই আসরফপুর তাম্রশাসনদ্বয়ের প্রতি পাদয়িতা। প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামণার্থে আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।[৯] দেব খড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে, ১৩ই বৈশাখ তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাধিক ষট্‌পাটক ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দক স্থিত আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে[১০]। এই তাম্রশাসন খানিও দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরমসৌগত পুরদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

খড়্গবংশের রাজমুদ্রা :

দ্বিতীয় তাম্র-শাসনের শীর্ষদেশের মধ্যস্থলে একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে 'শ্রীমদ্দেবখড়্গ' এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর উদগ্রীবোপবিষ্ট বৃষমূর্তী অঙ্কিত। অর্হৎ-গণের ধ্বজা ও বাহন সমূহ মধ্যে বৃষ অন্যতম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে[১১]। সম্ভবত খড়্গ রাজগণ এই বৃষভ-লাঞ্ছিত ধ্বজা ব্যবহার করিতেন।

বুদ্ধমণ্ডপ ও বিহার :

আসরফপুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবখড়্গের শাসনকালে সুবর্ণগ্রামের কোনও স্থানে একটি বুদ্ধ-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল[১২]। এই বুদ্ধমণ্ডপটি কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাম্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম ; সুতরাং বুদ্ধমণ্ডপটি যে আসরফপুরের অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল

তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে খড়্গারাজগণের রাজত্বকালে সুবর্ণ-গ্রাম-স্থিত বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নৃপতি দেবখড়্গা কুমার রাজ রাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি আচার্য বন্দ্য সংঘ মিত্রকে প্রদান করিয়া বিহার বিহারিকা চতুষ্টয় একগণ্ডীভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে সংঘমিত্র শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারের আচার্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শালিবর্দ্ধক সম্ভবত রায়পুরা থানার অন্তর্গত শাবর্দিয়া মৌজা বা গ্রাম। শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারটিই সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার ছিল; সেকারণে এই বিহারের ভারই আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

খড়্গারাজগণের রাজ্য বিস্তৃতি :

খড়্গারাজগণ বঙ্গের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদিগের রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহাদের রাজধানীই বা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অদ্যাপি তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে। নলিনীবাবু 'পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিভা পত্রিকায় এবং 'A forgotten Kingdom of East Bengal' প্রবন্ধে ১৯১৪ সনের মার্চ মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই খড়্গারাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন, এবং কুমিল্লার অনতি দূরবর্তী বড় কামতা বা কর্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল আসরফ তাম্রশাসনোক্ত "লিখিতং জয় কর্মান্তবাসকে পরম সৌগতোপাসক-পুরদাসেন" এবং "জয় কর্মান্ত বাসকাৎ লিখিতং পরম-সৌগত পুরাদাসেনেতি[১৩]" এই কথা কয়টি, এবং বড় কামতায় প্রাপ্ত একটি ভগ্ন নর্তেশ্বর মূর্তীর পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি[১৪]। এই নর্তেশ্বর মূর্তীর পাদপীঠে লিখিত আছে[১৫]। ---

১। 'শ্রীমল্লড (?) হ চন্দ্র-দেব-পাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা * * * যঃ চতুর্দশ্যা (?) তিথৌ বৃহস্পতিবারে যু (পু) ষ্য নক্ষত্রে কর্মান্তপাল শ্রী।

২। কুসুম-দেব-সুত শ্রীভাবুদে (ব)-কারিত-শ্রীনর্তেশ্বর ভট্টা * * *(চন্দ্রশর্মা?) আষাঢ় দিনে ১৪।। খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্বাক্ষর (রং)। খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি।।"

অর্থাৎ শ্রীমল্লডহ চন্দ্রদেবের বিজয়রাজ্যের অষ্ট-পূর্ব-দাশমিক-সমন্বিত সংবতে কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রে আষাঢ় মাসের ১৪ই তারিখে কর্মান্ত পাল শ্রীকুসুম দেবের পুত্র শ্রীভাবুদেব শ্রীনর্তেশ্বর ভট্টারকের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদয় অক্ষর রাতাক দ্বারা খনিত। শ্রীমধুসূদন দ্বারাও খনিত।,

নলিনীবাবু কর্মান্তকে একটি নগরের নাম মনে করিয়া কুসুমদেবকে তথাকার রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং আসরফপুর লিপিদ্বয়ে উৎকীর্ণ "জয় কর্মান্তবাসক" ও কামতা শিলালিপির "কর্মান্ত"কে অভিন্ন স্থান মনে করিয়া, ইৎসিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেবখড়্গা তনয় রাজরাজ ভট্টের সমন্বয় বিধান করিয়া, "কর্মান্ত" নগরকে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কুমিল্লা বা কমলাঙ্ক সমতটের অন্তর্গত কিনা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে সমতটের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বস্থিত চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত "শ্রক্ষেত্র" বা "শ্রীক্ষত্র" দেশ বর্তমান ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া বিস্তৃত[১৬]। সুতরাং সমতটের রাজধানী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন --

"গ্রাম সীমা তৃপশল্যং মালং গ্রামান্তরাটবী।
পর্যান্তভূঃ পরিসবঃ স্যাৎ কর্মান্তস্তু কর্মভূঃ।।"

শব্দ কল্পদ্রুমে, "কর্মান্তঃ কর্মভূঃ কৃষ্টভূমিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে কর্মান্তিক শব্দের প্রতিশব্দ কর্মকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু সংহিতায় কর্মান্ত শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ---

"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষাণ্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকর-কর্মান্তে. ভীরূনন্ত নির্বেশনে।।"[১৭]।

এই শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি লিখিয়াছেন, "কর্মান্তাঃ ভক্ষ্য কার্পাস বাপাদয়," কুল্লুক ভট্টের টীকায় লিখিত আছে "কর্মান্তেষু ইক্ষু ধান্যাদি সংগ্রহ স্থানেষু।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর্মান্ত শব্দ শিল্পশালা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে —

"ধাতু-সমুত্থিতং তজ্জাত-কর্মান্তেষু প্রযোজয়েৎ।" লেহাধ্যক্ষঃ তাম্র সীস-ত্রপু বৈকৃন্ত-আরকূট-বৃত্ত কংসতাল-লোধ্রক-কর্মান্তন্ কারয়েৎ।" খন্যাধ্যক্ষঃ শঙ্খ বজ্রমণি-মুক্তা-প্রবাল-ক্ষার কর্মান্তান্ কারয়েৎ।"[১৮]।

"দ্রব্য-বন-কর্মান্তাংশ্চ প্রযোজয়েৎ।"
বহিরন্তশ্চ কর্মান্তা বিভক্তাঃ সর্বাভাণ্ডিকাঃ।
আজীব-পুর-রক্ষার্থাঃ কার্য্যাঃ কুপ্যোপ জীবিনা।।[১৯]

"আকর, কর্মান্ত-দ্রব্যহস্তি বন-বজ্র বণিক্ পথ প্রচারাণ্ বারিস্থল পথপণ্য পত্তনানি চ নিবেশয়েৎ।"[২০]।

উপরিউদ্ধৃত প্রমাণের বলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. মহাশয় কর্মান্তপাল শব্দের অর্থ "ধন্যাদি সংগ্রহ স্থানের কার্যাধ্যক্ষ [the superientendent of the grain market], কৃষ্টভূমির অধ্যক্ষ, অথবা ধাতু, মণি, মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সমূহকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া শিল্পরূপে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত শিল্পমালা বা কারখানা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্মচারী" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্মান্ত শব্দকে সংজ্ঞাবাচক বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। কামতার নর্তেশ্বর মূর্তীর পাদপীঠ লিপিতে উল্লিখিত কুসুমদেব সম্ভবত এইরূপ রাজকর্মচারী ছিলেন। এমতাবস্থায়, আসরফপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "জয়কর্মান্ত বসাক" শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজা দেবখড়্গ বা তৎপুত্র বাজরাজ ভট্টকল্পিত "কর্মন্ত নগর" হইতে দানা দেশ প্রচার করেন নাই। "বরং লেখক বৌদ্ধ পূরোদাসই দেব খড়্গের কর্মান্তপাল বা কর্মান্তিক হইলেও হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাসস্থান বা কারখানা হইতেই লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে"।

আসরফপুরের তাম্রশাসনে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া দেবখড়্গ অথবা রাজরাজভট্টকে সচ্ছন্দে সমতটের অধিপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ বা দেবখড়্গের "পরমেশ্বর" "পরম ভট্টারক" অথবা "মহারাজ" প্রভৃতি কোনও বিশেষণই পরিলক্ষিত হয় না। ভূমিদান সময়ে অপরাপর তাম্রশাসনের ন্যায় বিভিন্ন রাজকর্মচারীবর্গকে জানাইয়া ও বাজাদেশ প্রচার করা হয় নাই; কেবলমাত্র 'বিষয়পতি' এবং 'কুটুম্ব'গণকেই দানের বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় খড়্গরাজগণের রাজ্য কতিপয় গ্রামমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল[২১]। এই তাম্রশাসনোক্ত 'পরনাতননাদ বর্মি', 'পলশত', 'তলপাটক', 'দত্তকটক', 'শালি বর্দ্ধক', 'কোড়ার চোরক', 'নবরোপ্য' প্রভৃতি স্থান কাপাসিয়া ও রায়পুরা থানান্তর্গত বর্মিয়া, পলাশ, তলাপাড়া, দত্তগাঁও, শাবর্দ্দিয়া, কোতালের চর, নবিপুর প্রভৃতি গ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবত সুবর্ণগ্রাম এবং ভাওয়ালের কতকাংশ লইয়াই খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পক্ষান্তরে ইৎসিং-এর সমতট বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, সমতটাধিপতি একজন গণনীয় রাজা ছিলেন। সম্ভবত ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমা; বরিশাল, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সমুদয়; ঢাকা জেলার মধুপুর বনভূমি এবং ভাওয়ালের কতকাংশ ব্যতীত সমগ্র স্থান; এবং খুলনা জেলার কতকাংশ লইয়াই সমতট রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

১. ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠায় এই চৈত্যটির একখানি আলোকচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।
২. J. A. S. B. March, 1914, page 87.
৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা।
৪. Memoirs Asiatic Society of Bengal vol. I, page 86.
৫. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1885 page 51.
৬. Memoirs Asiatic Society of Bengal vol I. page 87.
৭. প্রতিভা ১৩২০, চৈত্র, ৩৮১ পৃষ্ঠা।
Journal of the Asiatic Society of Bengal, March 1914, page 86
৮. প্রতিভা ১৩২০, চৈত্র, ৩৮২ পৃষ্ঠা।
৯. ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা।
১০. ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা।
১১. 'বৃযো গজোহশ্বঃ প্লবগ ক্রৌঞ্চোহব্জং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকর স্তথা।
শ্যেনো বজ্রং মৃগশ্ছাগো নন্দ্যাবর্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণী সিংহোঽর্হতাং ধ্বজাঃ'।।
হেমচন্দ্রঃ।
১২. 'বুদ্ধমণ্ডপ প্রাপি বৃহৎ পরমেশ্বরণ প্রতিপাদিতক বৎসনাগ পাটক'।
১৩. স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লিখিয়াছিলেন, 'Both the charters were issued in the same year (samvat 13) from the jaya Karmanta Vasaka' অর্থাৎ এয়োদশ রাজ্যাঙ্কে জয়কর্মান্ত বাসক নামক স্থান হইতে তাম্র শাসনদ্বয় প্রচারিত হইয়াছিল।
১৪. উৎকীর্ণ শিলালিপি সমন্বিত এই ভগ্ন নটেস মূর্তীটি শ্রীযুক্ত বাবুর প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত আছে।
১৫. সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২১।
নলিনীবাবুর উৎকীর্ণ লিপির চিত্র সহ ১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের প্রতিভা পত্রিকায় উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. মহাশয় সাহিত্য পত্রিকায় উহার সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ বাবুর পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।
১৬. Waters, Vol II. Pages 189.
১৭. মনুসংহিতা ৭।৬২।
১৮ অর্থশাস্ত্র-২ অধিঃ ১২ অঃ।
১৯. অর্থশাস্ত্র-২ অধিঃ। ১৭ অঃ।
২০. অর্থশাস্ত্র-২ অধিঃ। ২১ অঃ।
২১. স্বর্গীয় গঙ্গামোহনও এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, 'These Kings were local Kings of no very extensive dominion'- Memoirs of A. S B Vol Page 86

সপ্তম অধ্যায়

পাল রাজগণ

মাৎস্যন্যায় :

গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র মহারাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত এবং শূররাজ আদিশূরের মৃত্যুর পরে কোনও রাজাই মগধ গৌড় এবং বঙ্গে স্বীয় প্রাধান্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এইসময়ে উত্তরাপথের প্রাচ্যভূখণ্ডে সার্বভৌম শাসনতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিগণ সর্বদা আত্ম-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। অবিরত রাজ-বিপ্লবে গৌড়বঙ্গ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মা, গুর্জরপতি বৎসরাজ, রাষ্ট্রকূট বংশীয় ধ্রুব, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রভৃতি বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাবৃন্দ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়বঙ্গে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। 'সুযোগ পাইয়া মদ-বল-দৃপ্ত দুষ্টগণ দুর্বল প্রতিবেশীকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করিতেছিল। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, 'গৌড়ের এক রাজমহিষী গৌড়ের সিংহাসনে যে রাজা উপবেশন করিতেন তাঁহাকেই বিনাশ করিতেন'[১]। এই সময়ের গৌড়বঙ্গের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যভূখণ্ডের অপর পাঁচটি বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না'[২]। এই অরাজক অবস্থাই সংস্কৃত ভাষায় 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত হয়[৩]।

গোপাল (৭৮০-৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) :

এই মাৎস্যন্যায়ের ফলেই গৌড়বঙ্গে পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গে মাৎস্যন্যায় প্রবর্তীত হইলে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্যই, প্রকৃতিপুঞ্জ দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতি-কুশল বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে গৌড়বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্বাচিত করিয়া) দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর দিঙ্‌মণ্ডল-প্রধাবিত জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলীতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[৪]। লামা তারানাথও জনসাধারণের এই নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন[৫]।

দেবপালদেবের মুঙ্গেরলিপি হইতে জানা যায় যে "তিনি (গোপাল দেব) সমুদ্র পর্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন-বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল। তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনা পদাঘাতোত্থিত ধুলি-পটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের

জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপযোগী পদ প্রচারক্ষম অবস্থাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত"[৬] ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে গোপাল দেবের রাজ্য সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ গৌড়বঙ্গের অরাজকতা নিবারণ, স্থানীয় বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর লিপিতে লোকনাথ এবং গোপালদেব তুল্যভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে, "যিনি কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিনীর সুবিমল সলিল ধারায় অজ্ঞান পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক (কামদেব) অরির পরাক্রম সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান দশবল লোকনাথের জয় হউক। এবং যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিত বক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞানতরঙ্গিনীর সুবিমল সলিল-ধারায় লোক সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের সঞ্জাত মাৎস্যন্যায়ের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হউক[৭]।

ধর্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে গোপালদেবের পত্নীর নাম 'দদ্দদেবী'। অধ্যাপক কিলহর্ণ দদ্দদেবীকে ভদ্র নামক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে।

গোপালদেব নালন্দ নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ দেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আবির্ভাবকাল :

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে গোপালদেব ৭৩০-৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং গোপালদেবের নিকট হইতেই বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত ছত্রদ্বয় হস্তগত করিয়াছিলেন[৮]। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর সম্ভবত তদীয় মাতুল পুত্র ভণ্ডির বংশ কনৌজের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুর্জরপতি বৎসরাজ বলপূর্বক এই ভণ্ডির অনন্তর বংশীয়গণের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন[৯]। বৎসরাজ কর্তৃক ভণ্ডির বংশের অধিকার লোপ, এবং কনৌজের সিংহাসন হস্তগত করা, ধ্রুব ধারাবর্ষ ৭০৫-৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে (উত্তরদিকের) অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ইন্দ্রায়ুধ গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের আশ্রিত ছিলেন এবং ধর্মপাল ইহাকে কনৌজের সিংহাসন হইতে চ্যুত করিলে বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই কান্যকুব্জ হইতে বৎসরাজ কর্তৃক ভণ্ডির বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই বৎসরাজ গৌড় ও বঙ্গের শ্বেত-ছত্রদ্বয় হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষাংশে গৌড়বঙ্গ গুর্জর, রাষ্ট্রকূট এবং কামরূপাধিপতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং তৎকালে গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অভিনব রাজশক্তির সমুদয় উদ্যম নিয়োজিত হইলে ধর্মপাল আর্যাবর্ত জয় করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবত বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড় বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[১০]। বৎসরাজ ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত

ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভবত তিনি তৎকালে ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মরুময় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এই সময়ে গোপালদেব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১১]। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা ইহার সন্নিকটবর্তী কোনও সময়ে গোপালদেব সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

তারানাথের মতে গোপালদেব ৪৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[১২]। মিঃ স্মিথও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু সম্ভবত গোপালদেব প্রৌঢ়বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; কারণ শত্রুর আক্রমণে দীর্ণ গৌড়বঙ্গকে অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণনীতি বিশারদ প্রবীণবয়ঃ লোকের সাহায্যই আবশ্যক হইয়াছিল। মিঃ স্মিথের মতে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে গোপালদেবের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। গোপাল-তনয় ধর্মপাল যে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যেই পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব পুরুষ :

খালিমপুরের তাম্রশাসনে গোপালের পিতামহ দয়িত-বিষ্ণু সর্ববিদ্যাবিৎ ('সর্ববিদ্যাবদাত') এবং তদীয় পিতা বপ্যট শত্রুজিৎ (খণ্ডিতারাতি) এবং তাঁহার কীর্তিমালা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়বঙ্গ কনৌজ-রাজ যশোবর্মদেবের পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়িত-বিষ্ণু বিপুলবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়[১৩]। তোরমাণের প্রথম বর্ষে উৎকীর্ণ ইরান প্রস্তর লিপিতে ইন্দ্র-বিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণ বিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, ধন্যবিষ্ণুর ভ্রাতা, মাতৃবিষ্ণু নামধেয় জনৈক মহারাজের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। দয়িত বিষ্ণুর সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে।

ধর্মপাল ৭৯৫-৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ :

গৌড় ও বঙ্গের প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবের গলদেশে রাজমালা অর্পণ করিলেও, সম্ভবত তিনি অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই; তদীয় প্রণয়পাত্রী, মহিষী দদ্দ দেবীর গর্ভজাত ধর্মপালই তাহার ফলভোগী হইয়াছিলেন। ধর্মপাল অতি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন; তিনি প্রায় সমুদয় আর্যবর্তেই স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্রৈকূটক বিহারের আচার্য মহাযান-মতাবলম্বী হরিভদ্র অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তিনি ধর্মপালের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য হরিভদ্র ধর্মপালকে "রাজ ভট-বংশ পতিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন[১৪]। ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে পালরাজগণ আসরফপুরের তাম্রশাসনোক্ত দেবখড়্গ-তনয় রাজরাজভট্টের অনন্তরবংশ। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রাজভট্ট' শব্দের অর্থ 'The descendant of a military officer of some King' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[১৫]। খড়্গ রাজগণ মধ্যে দেবখড়্গ তনয় রাজরাজভট্টের প্রতিষ্ঠা ও যশোগৌরবের এরূপ কোনও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে অনন্তর বংশীয়গণ তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদানপূর্বক গৌরবান্বিত হইতে পারেন। পালরাজগণের সহিত খড়্গবংশের কোনও সম্বন্ধ থাকিলে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ বা দেবখড়্গের নাম উল্লিখিত থাকিবারই অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। বিশেষত আসরফপুরের তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসের বিষয় পর্যালোচনা করিলে রাজরাজভট্টকে ধর্মপালের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা চলে না; এমতাবস্থায় পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পালবংশীয় নরপতিগণের সহিত যে সমতট-বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় এবং গবেষণার ফলে পালরাজগণের

যে কয়খানি প্রস্তরলিপি বা তাম্রশাসন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা 'গৌড়েশ্বর' ও 'গৌড়াধিপ' বলিয়া কীর্তিত হইলেও প্রতিহার-রাজ ভোজের সাগর তালের শিলালিপিতে ধর্মপালকে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার সেনাগণকে বাঙলি (বঙ্গান্) বলা হইয়াছে। বঙ্গ পালরাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলে এরূপ উক্তি নিরর্থক হয়। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তরলিপির (গরুড় স্তম্ভলিপি) দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে, 'সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে, শত্রু (ইন্দ্রদেব) কেবল পূর্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও সদ্যঃ দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ; আর আমি সেই পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি[১৬]। এস্থলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, 'তদধিক' শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল নরপালগণ যে বাঙ্গালি ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়'[১৭]।

তারানাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গে আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ধর্মপাল হয়ত গোপালের জীবিতাবস্থায় বঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্মপালের সময় নিরূপণ :

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন[১৮], 'কোন্ সময়ে যে ধর্মপাল পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্বভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘ বর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, অমোঘ বর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে-

"স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহত স্তৌ ধর্ম চক্রায়ুধৌ[১৯]

ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া, (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন। ধর্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে[২০]। অনেকে মনে করেন, ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২/৩ বৎসর পূর্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং অমোঘ বর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসর কালস্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিককালব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২/১ বৎসর পূর্বে, (৮১৫ কি ৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে) ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত এবং চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই, পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের এত অল্পকাল পূর্বে, ধর্মপালের রাজ্যলাভ অনুমানের কারণ, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে-ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট তিলক শ্রীপরবলের দুহিতা রণ্ণা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য ভারতের অন্তর্গত 'পথরি' নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের রাজত্বকালে (সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে) পরবলের প্রধান

মন্ত্রী কর্তৃক এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত এই স্তম্ভ লিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্মপালের পত্নী রত্নাদেবীর পিতা। এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্মপাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন তাঁহার 'অভি বর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যের ৩২ সম্বতে' সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারানাথের মতানুসারে, ৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিমপুরের শাসনোক্ত ৩২ বৎসর, এবং জনশ্রুতির ৬৪ বৎসরের মধ্যে, ধর্মপাল অন্যূন ৫০ বৎসর বা ৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।' গত কতিপয় বৎসর মধ্যে বহু খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় ধর্মপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কানিংহাম, হোরণ্‌লি, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির মত ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনব আলোকপাতে ধর্মপালের কাল-নির্ণয় কতকটা সুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্যই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেন্টস্মিথ ধর্মপালের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে নির্দেশ করিয়াছেন[২১]।

নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ধর্মপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 'সেই বলবান্ রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন, এবং পুরাণ-প্রসিদ্ধ বলি রাজা যেমন পুরাকালে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও যাচকরূপী চক্রায়ুধ বামনাবতারকে তৎসমস্ত দান করিয়াছিলেন, এই বলবান্ রাজাও সেইরূপ প্রণতি পরায়ণ বামনরূপে চরণাবনত চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন'[২২]। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে, ৭০৫ শাকে বা ৭৮৩-৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে, ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক পালন করিতেছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে[২৩]। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,-ভাগলপুর তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজই জৈন হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর দিক্‌পাল ইন্দ্রায়ুধ।

গোয়ালিয়র-নগর-প্রান্তস্থিত সাগরতাল নামক স্থানে প্রাপ্ত দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র মিহির ভোজের শিলালিপিতে নাগভট্টের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে, -'আদিপুরুষ (বিষ্ণু) পুনরায় বৎসরাজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত-কীর্তি এবং গজসেনা বিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই (নাগভট্ট) নামধারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌমার কালের প্রজ্জ্বলিত প্রতাপ-বহ্নিতে অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন। বেদোক্ত পুণ্য কর্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে কর ধার্য করিয়াছিলেন। পরাধীনতা যাঁহার নীচ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেই চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াও তিনি বিনয়াবনত দেহে বিরাজ করিতেন। দুর্জয় শত্রুর (বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠগজ, অশ্ব, রথ সমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের ন্যায় অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোক দাতা উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্ববাসীগণের হিতে রত তাঁহার অসাধারণ (অতীন্দ্রিয়) পরাক্রম (আত্ম বৈভব) আনর্ত, মালব, তুরুষ্ক, বৎস, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজগণের গিরিদুর্গ বলপূর্বক অধিকার দ্বারা, শৈশবকাল হইতে (আকুমারং) পৃথিবীতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'[২৪]।

সাগর তাল লিপির এই পরাশ্রিত চক্রায়ুধ যে ধর্মপাল কর্তৃক কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত চক্রায়ুধ, এবং এই বঙ্গপতি যে স্বয়ং ধর্মপাল, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না[২৫]। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই শেষোক্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্ট নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন

এবং ধর্ম (পাল) এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন[২৬]। এই তাম্রশাসনে আরও লিখিত আছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত গুর্জররাজের নামই নাগভট্ট[২৭]। এই নাগভট্ট যে দ্বিতীয় নাগভট্ট তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ যোধপুর রাজ্যান্তর্গত বিলাডা জেলার বুচকলা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎস রাজদেব পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনাগভট্টদেবের প্রবর্দ্ধমান রাজ্যের' উল্লেখ দৃষ্ট হয়[২৮]।

উল্লিখিত ভাগলপুরের তাম্রশাসন, গোয়ালিয়রের প্রস্তরলিপি, এবং প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌড়বঙ্গপতি ধর্মপাল, কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ, রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দ এবং গুর্জর প্রতিহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্ট সমসাময়িক[২৯]।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ ৭১৬ শকাব্দের (৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে দক্ষিণাপথস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে ইনি কতিপয় ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন[৩০]। তোর খেড়ের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও জীবিত ছিলেন[৩১]। ৭৩৬ শকাব্দে বা ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় গোবিন্দ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসন প্রাপ্ত হন[৩২]। সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দকে আমরা ৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ধর্মপাল ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং গুর্জর প্রতিহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্ট কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৩৩]। শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার কর্তৃক আংশিক প্রকাশিত প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন হইতে এই পরাজিত গুর্জরপতির নাম নাগভট্ট বলিয়া জানা গিয়েছে। সুতরাং ৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে উপস্থিত হইলে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বেই ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; এবং এ জনাই সাগরতল লিপিতে 'পরাশ্রয় কৃত স্ফুট নীচভাব' এই বিশেষণ দ্বারা চক্রায়ুধকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর প্রতিহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্টকে, পরাজিত করেন; ইহার পূর্বে দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধ ও ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন; ইহারও পূর্বে ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ইহারও পূর্বে ধর্মপাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্মপালের রাজ্যাভিষেক কাল ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে (সম্ভবত ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) নির্দেশ করা যাইতে পারে। তারানাথের মতে ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গৌড় রাজমালা-লেখক ধর্মপালের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। খালিমপুরের তাম্রশাসন তাঁহার ৩২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ধর্মপালের রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর অনুমান করাই সঙ্গত।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গের শাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটতিলক

শ্রীপরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৩৪]। মধ্যভারতে পাথারি নামক স্থানে অবস্থিত একটি দেবমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে পরবলের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'এপর্যন্ত এই স্তম্ভলিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোনও রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্মপালের পত্নী রণ্ণাদেবীর পিতা"[৩৫]। পরবল ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যাকে ধর্মপালের বিবাহ করা অসম্ভব বলিয়াই আপাতত মনে হইতে পারে। সম্ভবত এজন্যই প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অনেকের মতে ধর্মপাল-রাজমহিষী রণ্ণাদেবী এই পরবলের কন্যা। রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কর্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রণ্ণাদেবী হইতেছেন, রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী অর্থাৎ রাষ্ট্রকূট সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত কর্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট পরবল, ৩য় গোবিন্দরই একটি বিরুদ পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ৩য় গোবিন্দই রণ্ণাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্মপালের শ্বশুর। (Dynasties of the Kanarese Districts, P. 394 in Bom, Gaz. Vol I. pt, II) এই মতই সমীচীন[৩৬]।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'পাথারির মন্দির নির্মাণকালে পরবল নিশ্চয়ই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন; কারণ, ধর্মোদ্দেশ্যে দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠান তরুণ রাজার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিশেষত পরবল এবং তাঁহার পিতা এই উভয়েই যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে[৩৭]। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পরে পরবলের পিতা এবং জেজ্জর পুত্র কক্করাজ, নাগাবলোক নামক গুর্জরের জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন[৩৮]। এমতাবস্থায় কক্করাজ এবং পরবলকে ৭৫৬-৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং কক্করাজ এবং পরবল যে এক শতাব্দীরও অধিককাল জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং নাগাবলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্করাজের পুত্র পরবল ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে, দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের পর বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ধর্মপালের পরবলের দুহিতার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, বরং খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। পরবল যে তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ্ধ ছিল তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পাথারি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে কেহ কেহ অনুমান করিতেন যে পরবল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘবর্ষেরই অপর নাম[৩৯]। তৃতীয় গোবিন্দ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ তৃতীয় 'গোবিন্দের অনুজ ইন্দ্ররাজের পুত্র নহেন। পাথারি লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ, পক্ষান্তরে তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ। তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্করাজের অভ্যুদয়কাল ৮১২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৮২১ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ জ্জুছ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত নাগাবলোকের সমসাময়িক[৪০]। সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

'রাষ্ট্রকূট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধর্মপালের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রকূট মহাসামন্তাধিপতি কর্করাজ সুবর্ণবর্ষের (বরোদায় প্রাপ্ত) ৭৩৪ শকাব্দের (৮১২ খ্রিষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,-

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কর্করাজের পিতা ইন্দ্ররাজকে 'লাট' মণ্ডলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই নিমিত্তই হয়ত রাষ্ট্রকূট পরবলকে লাট (গুজরাত) ত্যাগ করিয়া, পাথারি-প্রদেশে সরিয়া আসিতে হইয়াছিল। গুর্জরের উচ্চাভিলাষী প্রতিহার রাজগণ এখানে হয়ত পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিহার রাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্মরক্ষার উপায়ান্তর ছিল না। সম্ভবত এই সূত্রেই পরবল রণ্ণাদেবীকে ধর্মপালের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন'[৪১]।

ধর্মপালের রাজ্য বিস্তৃতি :

তারানাথ লিখিয়াছেন, 'ধর্মপাল কামরুপ, তিরহুতি, গৌড় প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার রাজ্য পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দিল্লি?) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'

ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, 'অগ্রগামী (নাসির নামক) সেনা সমূহের (চরণাঘাতোত্থিত) ধুলি পটলে দশদিক্ আচ্ছান্নকারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া, তাহাকে (পুরাণ প্রসিদ্ধ অসংখ্য) মান্ধাতৃ সৈন্যের সংমিশ্রণ (ব্যতিকর) মনে করিয়া, মহেন্দ্র (ভয়ে) চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন; (কিন্তু সেই সেনাদল যুদ্ধ বাসনায় পুলকিত গাত্র হইলেও, তাহাদের পক্ষে (ধর্মপাল) রাজার শত্রু কালক্ষয়কারী বাহুযুগলের সাহায্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, এবং কীর প্রভৃতি[৪২] জনপদের (সামন্ত?) নরপালগণকে প্রণতি পরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত-পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণ কলস উদ্ধৃত করাইয়া, কান্যকুব্জকে (অভিষিক্ত করাইয়া) রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন[৪৩]।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন.[৪৪] উপরোক্ত দুইটি শ্লোকে 'ধর্মপালের শাসন সময়ের দুইটি উল্লেকযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র (মহেন্দ্র) নামক নরপতির ধর্মপালের হস্তে পরাভব; অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য মনে করিয়া, এতদূর বিহুল হইয়াছিলেন যে, ধর্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, ধর্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।' পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে' প্রতীয়মান হয় যে ভোজ মৎস্যাদি দেশের রাজন্যবর্গ, কান্যকুব্জবিধপতি চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক কালে, প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে, সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার পূর্বেই ধর্মপালকে কাঙ্গড়া, তুরুষ্ক, পঞ্চনদ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিতে হইয়াছিল। 'ধর্মপাল কান্যকুব্জের স্বাধীনতা হরণ করিয়াও, তাহার জন্য একজন স্বতন্ত্র রাজা নিযুক্ত করায় কান্যকুব্জ পুনরায় রাজশ্রী প্রাপ্ত[৪৫] হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, শাসন সৌকার্যার্থই-সম্ভবত ধর্মপাল চক্রায়ুধকে স্বীয় সামন্ত-রাজরূপে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

নাগভট্ট ও ধর্মপাল :

পাল নরপতিগণের তাম্রশাসনাদিতে গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্টের সহিত ধর্মপালের বিরোধ বা পরাজয়ের বিবরণ উল্লিখিত না হইলেও নাগভট্টের পৌত্র মিহিরভোজের সাগরতাল লিপিতে ইহার স্পষ্টত উল্লেখ রহিয়াছে[৪৬]। 'নাগভট্ট পিতৃরাজ্যের ন্যায় ।ধিকারি সূত্রে পিতার উচ্চাভিলাষও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও নাগভট্টের ধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না'[৪৭]। সাগরতাল লিপিতে দ্বিতীয় নাগভট্ট কর্তৃক

আনর্ত, মালব, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎসও মৎস্যাদি রাজগণের গিরিদুর্গ অধিকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, মালব, তুরুষ্ক, মৎস্য প্রভৃতি দেশ ধর্মপাল এবং তদীয় সামন্ত কান্যকুব্জাধিপতি চক্রায়ুধের শাসনাধীন ছিল। গুর্জরপতি এই সমুদয় প্রদেশ আক্রমণ করিলে চক্রায়ুধ এবং ধর্মপাল সম্ভবত একযোগে নাগভট্টের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অপ্রতিহত গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফলে ইহারা উভয়েই পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন।

ধর্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ :

নাগভট্টের পিতা বৎসরাজও অত্যন্ত পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন; তিনি প্রায় সমুদয় আর্যাবর্তে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারাবর্ষের হস্তে বৎসরাজকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভট্টের প্রবল এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ নাগভট্ট কর্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জররাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকট রক্ষিত প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিলে ধর্মও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হন নাই; গত্যন্তর ছিলনা বলিয়াই ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট-পতিকে গুর্জরপতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে নাগভট্ট গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পিতার ন্যায় মরুপ্রদেশে আশ্রয়লাভ করিতে বাধ্য হন। গুর্জর গণের পুনঃ পুনঃ উত্তরাপথ আক্রমণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই গোবিন্দ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে গুর্জর রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলস্বরূপ গুর্জর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন[৪৮]। সুতরাং গোবিন্দ সমুদয় উত্তরাপথ জয় করিয়া হিমালয় পর্বতে উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতাবনত ধর্মপাল ও চন্দ্রায়ুধ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন[৪৯]। প্রথম অমোঘ বর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, প্রথম অমোঘবর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ গৌড়ীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫০]। রাষ্ট্রকূট পতির সহিত ধর্মপালের বিরোধের অপর কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গুর্জরপতি ২য় নাগভট্টকে দমন করিবার জন্য যে ধর্মপালকে গোবিন্দের নিকট নতশির হইতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অমোঘ বর্ষের শিলালিপিতে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিনা, বুঝা যায় না।

বাহুকধবল ও ধর্মপাল :

বোম্বাই প্রদেশস্থিত উনানগরে আবিষ্কৃত ধবলের প্রপৌত্র ২য় অবনীবর্মার একখানি তাম্রশাসনে বাহুকধবল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তদনন্তর মহানুভব শ্রীমান বাহুক ধবল জন্মগ্রহণ করেন. তিনি নিত্য ধর্মপালন করিলেও, রণোদাত্ত হইয়া, ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছিলেন[৫১]। বাহুকধবল গুর্জর প্রতিহার বংশীয় ২য় নাগভট্টের অধীন সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত ছিলেন[৫২]। ২য় নাগভট্টের সহিত ধর্মপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বাহুকধবল হয়ত স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থে ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাগরতাললিপিতে এবং উনা তাম্রশাসনে উল্লিখিত ধর্মপালের পরাজয় অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

উত্তরাপথে ধর্মপালের সার্বভৌমত্ব :

গুর্জরপতি ২য় নাগভট্টকে মরুপ্রদেশে বিতাড়িত এবং উত্তরাপথের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্তন করিলে, ধর্মপাল উত্তরাপথের সার্বভৌমত্ব লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে

উক্ত হইয়াছে, 'সত্যব্রত-পালন-পরায়ন শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম সমন্বিত বাক্‌পাল নামে এই রাজার এক (অনুজ) ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাসস্থল ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু পতাকিনী শূন্য করিয়াছিলেন'[৫৩]। দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, 'দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেদার তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া (স্নান-তর্পনাদি) সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপে এই রাজার দুষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক আনুসঙ্গিক সিদ্ধিও ভৃত্যবর্গের পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল। সেই নরপতি, দিগ্বিজয় ব্যাপারের অবসানে, (তৎকাল প্রসিদ্ধ) উৎকৃষ্ট পুরস্কার বিতরণের দ্বারা পরাজিত ভূপালবৃন্দের পরাজয় জনিত চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বস্ব ভবনে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলে, ভূপালবৃন্দ স্ব স্ব রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, যে সময়ে রাজাধিরাজের সমুচিত কার্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্মর মানবের হৃদয়ের ন্যায়, প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠত[৫৪]। কেদার তীর্থ হিমালয় পর্বতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। সুতরাং এতদ্বারা ধর্মপালের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও পশ্চিম সীমা সূচিত হইয়াছে। মধ্যভারতে রাষ্ট্রকূট শ্রীপরবল ধর্মপালের আশ্রয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে 'সীমান্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, গৃহ চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক্ সমূহ (?) কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে'[৫৫]।

গৌড় রাজমালা-প্রণেতা বলেন, 'এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণির প্রজার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজা রঞ্জনে সফল মনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি?'

দেবপাল (৮৩০-৮৬৫) :

ধর্মপাল দেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে 'যুবরাজ ত্রিভুবন পালের' নাম উল্লিখিত হইয়াছে[৫৬]; ইহা দেবপাল দেবের নামান্তর কিনা, জানা যায় নাই। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করিয়াছেন,-ধর্মপাল দেব বর্তমান থাকিতেই, ত্রিভুবনপাল পরলোক গমন করায়, দেবপাল দেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার কোনরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই[৫৭]। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ধর্মপাল প্রৌঢ়কালে রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দেবপালের জন্ম। কিন্তু ত্রিভুবনপাল ধর্মপালের পূর্ব মহিষীর গর্ভজাত। সম্ভবত ধর্মপালের শেষাবস্থায় গৌড় রাজধানীতে তাঁহার আত্মায় রাষ্ট্রকূটগণের প্রভাব বাড়িয়াছিল; তাহাদের চেষ্টাতেই রাষ্ট্র-কূট-রাজ-দৌহিত্র দেবপাল গৌড়-সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন''[৫৮]। বলাবাহুল্য যে এই সমুদয়ই বসুজ মহাশয়ের কল্পনা প্রসুত। ডাক্তার হুল্‌জ্ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। স্যার উইলিয়ম জোন্সের টিপ্পনীসহ ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপির মর্ম ইংরেজি

ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু পাঠোদ্ধার শৈথিল্যে এবং ব্যাখ্যাবিভ্রাটে দেবপাল দেব (ধর্মপালের ভ্রাতা) বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেকের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এই ভ্রম সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেবপাল দেব এই তাম্রশাসনে আপনাকে ধর্মপাল দেবের পুত্র বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন[৫৯]।

নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে[৬০] -

"রামস্যের গৃহীত-সত্য তপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রে রূপপাদিতুল-মহিমা বাক্‌পাল নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকারোদোকাতপত্রাদিশঃ।।
তস্মাদুপেন্দ্র চরিতৈর্জগতীং পুনানঃ
পুত্রোবভূব বিজয়ী জয়পাল নামা।
ধর্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্বজেভুবন রাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় উপরি উদ্ধৃত শেষোক্ত শ্লোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন[৬১], 'এই শ্লোকের ব্যাখ্যা -বিভ্রাটে পালবংশীয় নরপালগণের বংশ বিবরণ ভ্রম সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। "তস্মাৎ"-শব্দকে (পূর্বশ্লোকোক্ত) বাক্‌পালের দ্যোতক রূপে গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার হুল্‌জ্‌ এবং অন্যান্য মনীষিগণ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেব কিন্তু তাঁহার (মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে (একাদশ শ্লোকে) আপনাকে ধর্মপালের পুত্র বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান শ্লোকে সেই দেবপাল জয়পালের 'পূর্বজ' বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, জয়পালকে ও ধর্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ স্বয়ং দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সাধন করিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন, -দেবপালদেব মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপালের পুত্র এবং অন্যান্য লিপিতে ধর্মপালের ভ্রাতার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, মুঙ্গের লিপির উক্তিকে সত্য, এবং অন্যান্য লিপির উক্তিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে[৬২]। কোনও তাম্রশাসনের বংশ-বিবরণই ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না; সকল তাম্রশাসনে একই বংশ বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই অনুমান করা কর্তব্য। এখানে 'তস্মাৎ' শব্দে ধর্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইত। 'তস্মাৎ' শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপালকে ধর্মপালের ভ্রাতার পুত্র কল্পনা, করিয়া, মনীষিগণই এই অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।'

সুতরাং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ধর্মপাল, বাক্‌পাল, জয়পাল ও দেবপালের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়-

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে, নারায়ণপাল, মহীপাল, বিগ্রহপাল প্রভৃতি পরবর্তী পাল রাজগণের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে এবং ধর্মপালের তাম্রশাসনেই বা বাক্‌পালের নাম কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। ইহাদিগের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাক্‌পাল ও তৎপুত্র জয়পালের শাখায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা ইহাদের উল্লেখ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে ধর্মপাল, বাক্‌পাল, দেবপাল ও জয়পালের সম্বন্ধ নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।—
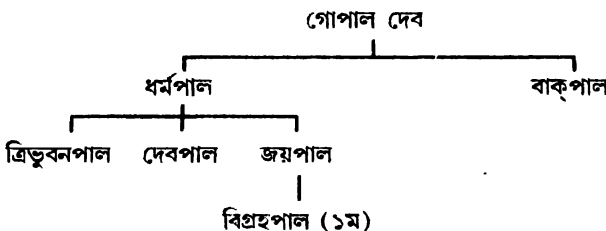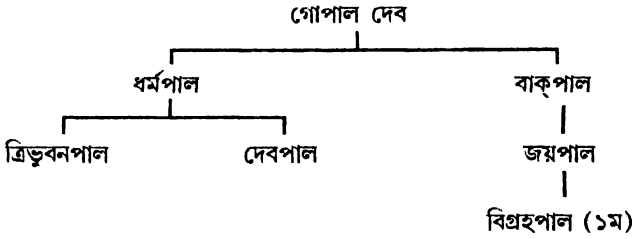
কিন্তু এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেবপালকে জয়পালের 'পূর্বজ বলিয়া পরিচিত করিবার কারণ কি তাহা প্রতিভাত হয় না। দেবপাল, জয়পালের 'পূর্বজ' বলিয়া উল্লিখিত থাকায় জয়পালকে ধর্মপালের পুত্র এবং দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে 'বাক্‌পালের গুণ- কর্মাদির উল্লেখ থাকিলেও, ইহা মুখ্যত (তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ধর্মপালেরই প্রশংসা বিজ্ঞাপক'[৬৩]। সুতরাং ৫ম শ্লোকের 'তস্মাৎ' শব্দটিকে ধর্মপালের দ্যোতকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারায়ণ পাল ও তদ্বংশীয় পাল নরপতিগণের তাম্রশাসনোক্ত বংশ বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম তাম্রশাসনে শ্লোকগুলিই অপরাপর তাম্রশাসনে যথাযথ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু 'ছান্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশে' নারায়ণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর পণ্ডিতাগ্রণী ও বহুশিষ্যের অধ্যাপক উমাপতিকে ক্ষ্মাপাল জয়পাল তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান করিয়াছিলেন[৬৪]। এস্থলে জয়পালের পিতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। গৌড়বঙ্গাধিপতি ধর্মপাল জয়পালের পিতা হইলে নারায়ণ জয়পালের সঙ্গে তদীয় পিতা ধর্মপালের নাম উল্লেখ করিতে সম্ভবত বিস্মৃত হইতেন না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জয়পালের পিতা গৌড়বঙ্গাধিপতি ছিলেন না। নারায়ণ পাল ও তদ্বংশীয় পালরাজগণের তাম্রশাসনে যে ভাবে বাক্‌পাল ও জয়পালের গুণকীর্তন করা হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে নারায়ণ পাল প্রভৃতি পাক্‌পাল ও তৎপুত্র জয়পালের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া শেষোক্ত বংশলতাই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি।

রাজ্যবিস্তৃতি :

দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 'একদিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি-চিহ্ন সেতুবন্ধ,-একদিকে বরুণ-নিকেতন অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদ-সমুদ্র),-এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা (দেবপাল) নিঃসপত্ন ভাবে উপভোগ করিয়াছেন'[৬৫]। গৌড়রাজমালায় এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,-'একথা কবি-কল্পিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে গৌড়াধিপ এবং গৌড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে এবং দেবপাল এই অভিলাষ পুরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় নরপতি-সমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না[৬৬]। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ, ভট্টগুরব মিশ্রের দিনাজপুর স্তম্ভলিপিতে উক্ত হইয়াছে, 'সেই দর্ভপাণির নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল-নৃপতি মতঙ্গজ মদাভিসিক্ত শিলা সংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক হইতে মহেশ ললাট শোভি ইন্দুকিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্বত পর্যন্ত, সূর্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগ রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র (মধ্যবর্তী) সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন'[৬৭]। তারানাথ বলেন, দেবপাল বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী সমুদয় ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন।

উৎকলেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ও দেবপাল :

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, যে ভ্রাতার (দেবপাল দেবের) নির্দেশ ক্রম সেই বলবান (জয়পালদিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে (তাঁহার) নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া, (স্বকীয়) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বরও তদীয় উচ্চ মস্তকে (জয়পালের) যুদ্ধোদ্যমোপশম-কারিণী (জয়পালের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির যুদ্ধ সংক্রান্ত বাদানুবাদ উপশমিত হইয়া গিয়াছিল)আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, চিরকাল (পরমসুখে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন'[৬৯]। ডাক্তার হুলজ্ লিখিয়া গিয়াছেন, 'The sense of this stanzr seems to be that Jaypala supported the King of Pragjyotisa successfully against the king of Utkala.'[৭০] কিন্তু শ্লোকের মধ্যে এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে উৎকলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়[৭১]। দিনাজপুরের গুরুড়স্তম্ভ লিপিতেও 'উৎকলকুল-উৎকিলিত' করিবার কথা পাওয়া যায়[৭২]। গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে,[৭৩] 'ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবত এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক্‌জ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গৌড়াধিপের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিয়া, মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যিনি জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উৎকলপতি যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খ্রিষ্টিয় নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দের, অর্থাৎ কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪২) কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, উড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা সপ্তম শতাব্দে যেমন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের এবং অষ্টম শতাব্দে গৌড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাল কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের কাল হইতে উৎকলপতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পালরাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'।

কামরূপাধিপতি বনমালের তেজপুর-তাম্রশাসন ও বলবর্মার নওগাঁও-তাম্রশাসন হইতে হর্জরবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ অবগত হওয়া যায়। তেজপুর শহরের সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্মপুত্রতীরস্থিত পর্বতগাত্র লিপিতে নরপতি হর্জরের নাম এবং লিপির সন ৫১০ অব্দ উৎকীর্ণ আছে। ডাক্তার কিলহর্ণ এই অঙ্ক গুপ্তাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই লিপির সন ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ হয়। হর্জর ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তদীয় পৌত্র জয়মালকে দেবপালের সমসাময়িক না ধরিয়া তাঁহার পুত্র বনমালকেই দেবপালের সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত।

উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-বিজয়ের যশোমাল্য দেবপালের খুল্লতাত পুত্র জয়পালের মস্তকেই অর্পিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে এবং গরুড়স্তম্ভ লিপিতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

কাম্বোজ ও হূণগণ এবং দেবপাল :

দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে, দেবপালের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, 'যুবক অশ্বগণ ও কম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বকীয়-হর্ষ-সম্ভূত হ্রেষারব মিশ্রিত হ্রেষারবকারী প্রিয়তমা বৃন্দের দর্শনলাভ করিয়াছিল[৭৬]। গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপিতেও দেবপাল 'মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক (হিমালয়) পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[৭৭]। খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দীতে কম্বোজগণ যে হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া গৌড়রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বানগড়ের ভগ্ন-স্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাড়ির উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গিয়াছে[৭৮]। সুতরাং অনুমান হয় দেবপালের শাসনকালে কম্বোজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে দেবপাল সসৈন্য হিমালয় প্রদেশে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

দেবপাল দেব-কর্তৃক হূণ-গর্ব খর্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে[৭৯]। 'ষষ্ঠ শতাব্দের প্রথমার্ধে যশোধর্ম কর্তৃক পরাজিত হূণরাজ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর, হূণরাজের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত মধ্যভারতে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত হূণপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিত থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকর বর্দ্ধন 'হূণ হরিণের সিংহ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং ৬০৫ (খ্রিষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে 'হূণ-হত্যার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন', এরূপ উল্লেখ আছে[৮০]। মিহিরভোজের পুত্র কান্যকুব্জরাজ মহেন্দ্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহাশামন্ত দ্বিতীয় অবনি বর্মাযোগের, উনায়প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সংবতের (৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে তাঁহার পিতা বলবর্মা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি জজ্জপাদি নৃপতিগণকে নিহত করিয়া, ভুবন হূণবংশ হীন করিয়াছিলেন[৮১]। দেবপালের পরবর্তী যুগে, খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দে, হূণগণ মালবে উদীয়মান পরমার রাজবংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' এবং পরমার রাজগণের প্রশস্তি হইতে জানা যায়, পরমার রাজ দ্বিতীয় শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল মুঞ্জরাজ (৯৭৪-৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) এবং সিন্ধুরাজ, যথাক্রমে হূণরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত মালবের হূণগণের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন[৮২]।

দ্রাবিড়েশ্বর, গুর্জরপতি ও দেবপাল :

গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায় যে, 'মন্ত্রী কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর দেবপালদের উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া, হূণ গর্ব খর্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[৮৩]। আবার ৫ম শ্লোক হইতে দেবপালের বিন্ধ্যপর্বতে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গও অবগত হওয়া যায়[৮৪]। দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, 'অপর নৃপতিবৃন্দের গর্ব খর্বকারক সেই রাজার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল[৮৫]। বিন্ধ্যপর্বত, গুর্জর ও দ্রাবিড় বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্বতে গমন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিবার কথা হইতে তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ইহারা উভয়েই দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে এই দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথের নাম কি?

যে দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথ দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয় নাই। গৌড় রাজমালা লেখকের মতে 'এই দ্রবিড়রাজ অবশ্য

মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয়কৃষ্ণ (অনুমানি ৮৭৭-৯১৩) এবং গুর্জরনাথ গুর্জরের প্রতিহার বংশীয় মিহিরভোজ, যিনি তৎকালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন[৮৬]। দেবপাল কান্যকুব্জ-বিজয়ী গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রামভদ্র ও মিহিরভোজের (দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজের) সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই[৮৭], কিন্তু তিনি তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ যে ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দেই পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্মপালের প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অমোঘবর্ষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সৌন্দত্তির শিলালিপি ৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অকালবর্ষ বা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। পক্ষান্তরে কান্হেরি গুহার শিলালেখ ইহার দুই বৎসর পরে ৭৯৯ শকে বা ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণের পিতা প্রথম অমোঘ বর্ষের শাসন সময়ে খোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং আপাতত এই উভয় শিলালেখ-বর্ণিত তারিখে বৈষম্য দেখা গেলেও, অমোঘবর্ষ বিরচিত 'প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকায়' ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিবেক-প্রবুদ্ধ অমোঘবর্ষ পরিণত বয়সে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক রত্নমালিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন[৮৯]। সুতরাং অমোঘবর্ষের জীবিতকাল মধ্যে তদীয় পুত্র অকালবর্ষ ও দ্বিতীয়কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কান্হেরি ও সৌন্দত্তির শিলালেখ-বর্ণিত সময়ের বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যাহা হউক দ্বিতীয়কৃষ্ণ যে ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সিংহাসন লাভ করেন নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু দেবপাল যে ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এজন্য আমরা মনে করি রাষ্ট্রকূটপতি প্রথম অমোঘবর্ষের সহিতই গৌড়বঙ্গাধিপতি দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আবার প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন[৯০]। সুতরাং ইহা হইতেও গৌড়-বঙ্গাধিপতির সহিত প্রথম অমোঘবর্ষের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অমোঘবর্ষ যষ্টি বৎসরেরও অধিককাল মান্যখেটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সুতরাং তিনি সম্ভবত দেবপাল দেবেরই সমসাময়িক। কিন্তু এই পাল রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বে বিজয়লক্ষ্মী কাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করা শক্ত, কারণ আমরা উভয়পক্ষের প্রশস্তিকারকেই সমস্বরে জয়ঘোষণা করিতে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, পাল রাষ্ট্রকূটের এই সংঘর্ষের ফলে দেবপাল বা প্রথম অমোঘবর্ষ কেহই জয়লাভ করেন নাই[৯১]। ফ্লিট সাহেব সিরুর লিপির উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন[৯২]।

যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত দৌলতপুরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে বা ৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত গুর্জর প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র, রামভদ্রের পুত্র, প্রথম ভোজদেবের (মিহির ভোজের) একখানি তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্যকুব্জ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে[৯৩]। সুতরাং ৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যে মহোদয় বা কান্যকুব্জ প্রথম ভোজদেবের হস্তগত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দেবপালকে সম্ভবত প্রথম ভোজদেবের সহিত সর্বদা কলহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত প্রথম ভোজদেবের শিলালিপিতে ভোজদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে[৯৪]।

"যস্যবৈরি বৃহদ্বঙ্গান্দহতঃ কোপ-বহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণ সাংরাশীন্ পাতুর্বৈতৃষ্ণমাবভৌ"।।

অর্থাৎ কোপাগ্নির দ্বারা পরাক্রান্ত শত্রু বঙ্গগণকে দহনকারী এবং প্রতাপের দ্বারা সাগরের জলরাশি পানকারি তাঁহার তৃষ্ণাভাব শোভা পাইয়াছিল'[৯৫]। কিন্তু গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে প্রথম

ভোজদেব কর্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয়, গোয়ালিয়র প্রশস্তি রচনা করিবার সময়ে মিহিরভোজের সহিত দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ফলে মিহিরভোজ তৎকালে সম্ভবত দেবপালকে পরাজয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের কোনও অংশই অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই[৯৬]।

কিন্তু গুর্জরগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করিতে দেবপালও সক্ষম হন নাই। বারম্বার কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত হইয়া গুর্জরগণ মিহিরভোজের নেতৃত্বাধীনে ৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে মহোদয় বা কানুকুব্জ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই অধিকার এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল যে ইতিহাসে বৎসরাজের বংশ মহোদয়-প্রতিহার-বংশ নামে বিখ্যাত। মিহিরভোজ উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদ সীমান্ত-স্থিত হূণ রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, উত্তর-পূর্বে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণপূর্বে নর্মদার উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেবপালের মন্ত্রিগণ :

গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুরবমিশ্রের প্রপিতামহ দর্ভপাণি দেবপালেরও প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেবলমাত্র বাক্‌পাল-তনয় জয়পালের ভুজবলেই দেবপাল আর্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, দর্ভপাণির নীতি কৌশলের সম্বন্ধও তাহার সহিত বর্তমান ছিল। দেবপাল দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। 'নানা মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল-বিসর্পি-ধুলি পটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল নামক নরপাল উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন[৯৭]।' 'সুররাজ কল্প দেবপাল নরপতি সেই মন্ত্রিবরকে অগ্রে চন্দ্র বিম্বানুকারী মহার্হ আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত-পাদ-পাংসু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন'[৯৮]। 'প্রবল পরাক্রান্ত পালসাম্রাজ্যের সিংহাসনে স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে দেবপালদেবের 'সচকিত ভাবে' উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতি পুঞ্জ কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক-মন্ত্রিগণকেই (King Maker) রাজ-নির্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'সচকিত' শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতে সেই ঐতিহাসিকতত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদর্শন বিজ্ঞাপনার্থ 'সচকিত'-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধ নরপালগণের শাসন সময়ে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদপর্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ 'অগ্রে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, first offered to him a chair of state. মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়'[৯৯]।

দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর। তিনি সম্ভবত দেবপালের একজন সেনাপতি ছিলেন; কারণ গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 'তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াও বিক্রম প্রকাশেব পাত্রাপাত্র বিচার সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায় ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না'[১০০]। সোমেশ্বর-তনয় কেদারমিশ্র দর্ভপাণির পরে দেবপালের অমাত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা যোগ্যপাত্র পাইয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্বকর্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন'[১০১]। এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর দেবপালের উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া হূণ-গর্ব খর্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জরনাথ দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলা ভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজ্যকাল :

দর্ভপানি, সোমেশ্বর এবং কেদার মিশ্র এই তিন পুরুষ যখন দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন, তখন দেবপাল যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। দেবপালদের মুঙ্গের-লিপি তদীয় বিজয়রাজ্যের ৩৩ সংবৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেবপালের রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর নির্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি সম্ভবত ৮৩৫-৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ গৌড়বঙ্গের শাসনকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।

দেবপালের ধর্মমত :

দেবপালের রাজত্বকালে নগরহার নগরের (বর্তমান জালালাবাদ) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্রে অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্কবিহারে গমন করিয়াছিলেন, তথায় সর্বজ্ঞ শান্তি নামক আচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বুদ্ধগয়াধামের মহাবোধি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাচ্যভারতে আগমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল যশোবর্মপুর নামক[১০২] তৎকাল-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারে অবস্থিতি করিয়া দেবপাল কর্তৃক পুজিত হইয়াছিলেন[১০৩]। দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সংঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন[১০৪]। দেবপাল যেমন বৌদ্ধাচার্য বীর দেবের পূজা করিয়াছিলেন তদ্রূপ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মর্যাদা-রক্ষায়ও যত্নবান্ ছিলেন। মুঙ্গের লিপি দ্বারা তিনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মর্যাদা-রক্ষায়ও যত্নবান্ ছিলেন। মুঙ্গের লিপি দ্বারা তিনি উপমন্যব গোত্রীয় আশলায়ন শাখার ব্রহ্মচারী বিশ্বরাতের পৌত্র বরাহরাতের পুত্র বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগর ভুক্তির ক্রিমিরক বিষয়ান্তর্গত মেষিকা গ্রাম নিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য প্রদান করিয়াছিলেন[১০৫]।

দেবপাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মুঙ্গের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 'সত্যযুগে যে দানপথ বলিয়া রাজা কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কর্ম যাহার অনুসরণ করিতেন, কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবে যে দানপথ কলিতাড়নে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই রাজা কর্তৃক সেই পুরাতন দানপথ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে[১০৬]।

বিগ্রহপাল (১ম) ৮৬৫-৮৭০/সম্বন্ধ নির্ণয় :

দেবপালের মৃত্যুর পরে প্রথম বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি প্রথম শূরপাল বলিয়াও পরিচিত। ডাঃ কিলহর্ণের মতে প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল প্রথম গোপাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র ও ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র[১০৭]। কিন্তু এই মত এখনও সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। এখনও দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সেন্টিনারি রিভিউ পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে আমগাছি-লিপির আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ হরণ্‌লি বলিয়া ছিলেন, 'তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার পুত্র ; কারণ, (৫ম শ্লোকের) 'তৎসূনুঃ' অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য দেবপালকেই সূচিত করিতেছে'[১০৮]। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ডাঃ হরণ্‌লির মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, 'রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপাল দেবকে দেবপাল পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপাল দেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে (৫১ ৫২ পংক্তিতে) রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে (১৬ শ্লোকে) দেবপালের পরবর্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহপালকে, অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পাল বংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে[১০৯]।

পালরাজগণের বংশলতা-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির রচনারীতি পর্যপেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, গোপাল দেবের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, ধর্মপালের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, বাক্‌পালের প্রশংসায় একটি শ্লোক, জয়পালের শৌর্যবর্ণনায় দুইটি শ্লোক, বিগ্রহপালের পরিচয় জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক এবং দেবপালের প্রসঙ্গে শ্লোকার্দ্ধমাত্র রচিত হইয়াছে। বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র হইলে পালরাজ-কুলগৌরব দেবপালের এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্বাভাবিক হয়না। সুতরাং বিগ্রহপাল যে দেবপালের পুত্র নহেন তাহা সুনিশ্চিত।

গরুড়স্তম্ভ লিপিতে লিখিত হইয়াছে, 'সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি (কেদার মিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারকারী নানা সাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন'[১১০]। নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, জয়পালের 'অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বিমল জলধারার ন্যায় বিমল অসিধারায় শত্রুবনিতা বর্গের সধবা জনোচিত অঙ্গবাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সুহৃদবর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎ সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন'[১১১]। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে দেবপালের পরে ও নারায়ণ পালের পূর্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্রশাসনে নারায়ণপালের পিতার নাম বিগ্রহপাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার, গরুড়স্তম্ভ লিপিতে শূরপালকে 'নরপাল' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সুতরাং শূরপাল ও বিগ্রহপাল অভিন্ন না হইলে গরুড়স্তম্ভ লিপিতে বিগ্রহপালের নাম এবং নারায়ণ পাল প্রভৃতির তাম্রশাসনগুলিতে শূরপালের নাম উল্লিখিত না হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সুতরাং শূরপাল যে বিগ্রহপালেরই নামান্তরমাত্র তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ডাঃ হরণ্‌লি লিখিয়াছেন[১১২], 'বাদল স্তম্ভলিপিতে শূরপাল দেবপালের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বাদলস্তম্ভ লিপিতে পালরাজ গণের বংশলতা বিবৃত করা প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য নহে, উহাতে তাঁহাদিগের মন্ত্রিবর্গের বংশ বিবরণই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রিগণের বংশ বিবরণ পাল রাজগণের বংশ বিবরণের পাশাপাশিভাবে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা হইতেই পাল রাজগণের বংশলতা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠশ্লোকে দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শ্লোক হতে জানা যায় যে, যিনি উৎকল-কুল উৎকিলিত করিয়া হূণ গর্ব খর্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জরনাথ দর্প চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্র সেই গৌড়েশ্বর পাল রাজার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চদশ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে এই কেদার মিশ্র শূরপালেরও মন্ত্রী ছিলেন। আবার দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে যিনি বাদল স্তম্ভলিপির লিখিত দিগ্বিজয় ব্যাপার সংশোধন করিয়াছিলেন তিনিই দেবপাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেদার মিশ্র দেবপাল এবং শূরপাল এই উভয় নরপতিরই মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দেবপালের পরে শূরপালই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে বিগ্রহ পালই দেবপালের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শূরপাল এবং বিগ্রহপাল যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গরুড়স্তম্ভ লিপির ২৫শে শ্লোকে 'নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শূরপালের অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতানুসরণ করিয়া অনেকে এই শ্লোকে শূরপাল দেবের অভিষেক ক্রিয়ার সন্ধানলাভ করিয়া থাকে। 'কিন্তু 'ভূয়ঃ' শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বহুলোকে আত্মকল্যাণ কামনায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া থাকে। 'নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শূরপাল নামক নরপালও তাহাই করিতেন। ভূয়ঃ শব্দে কেদার মিশ্রের অনেকবার যজ্ঞ করিবার এবং শূরপালও অনেকবার যজ্ঞস্থলে মস্তকে শান্তিবারি করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,-(ক) শূরপাল দেবের শাসন সময়েও, বরেন্দ্র মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (খ) বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তিবারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদার মিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপাল দেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন'[১১৩]।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন[১১২]। কিন্তু তাহা হইলে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র গরুড়-স্তম্ভ-লিপিতে নারায়ণ পালের অব্যবহিত পূর্বে তাহার পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া দেবপালের পুত্রের নাম উল্লেখ করিবেন কেন?

প্রথম বিগ্রহপাল দেবের বিমল অসিধারায় শত্রু বণিতাবর্গের অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কিনা, অথবা তিনি কোন শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্বর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎ-সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গৌড়রাজমালার লেখক বলিয়াছেন, 'ভাগলপুরের তাম্রশাসনে যে প্রশস্তিকার ধর্মপাল কর্তৃক কান্যকুব্জ-বিজয় এবং দেবপালের আদেশে জয়পাল কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল-বিজয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা না বলিয়া ছাড়িতেন, এরূপ বোধ হয় না। বিগ্রহপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন'[১১৫]। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্ভবত অল্পকাল মাত্র রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল পুত্র-হস্তে রাজ্যভার সমর্পন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন[১১৬]।

বিগ্রহপাল হৈহর-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই লজ্জা দেবীর বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশে এবং পতিবংশে পরম 'পাবন-বিধি' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল[১১৭]।

নারায়ণ পাল

(৮৭০-৯২৫)

রাজ্যকাল :

প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে পর মহারাণী লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নারায়ণ পাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ পাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সৎসমতটজন্মা শুভদাস-তনয় শ্রীমান মংখদাস নামক শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল[১১৮]। নারায়ণ পালের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদন্তপুর নামক স্থানে জনৈক বণিক কর্তৃক একটি পিত্তলময়ী পার্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং নারায়ণ

পাল যে ৫৫ বৎসর কাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

গুর্জরপতি ভোজদেব ও নারায়ণ পাল :

নারায়ণ পাল এবং তদীয় পিতা বিগ্রহপালের সময় হইতেই পালরাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। দেবপালের সময়েই গুর্জরপ্রতিহারগণের বিজয়-বৈজয়ন্তী মহোদয় বা কান্যকুব্জে উড্ডীন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে পাল-সাম্রাজ্যের কোনও অংশই পরহস্তগত হয় নাই। এই সময়ে গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। 'অজাতশত্রু' বিগ্রহপাল বা তদীয় পুত্র 'বিজিগীষু' নারায়ণ পাল এই গুর্জরগণের অপ্রতিহত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। সামন্ত-চক্রের মিলিত শক্তির সাহায্যে গুর্জরপতি প্রথম ভোজদেব বারাণসী হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়া মুদ্গগিরি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুদ্গগিরিতে নারায়ণ পালের সহিত ভোজদেব এবং তদীয় সামন্ত-রাজগণের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণ পালের পরবর্তী রাজগণের লিপিতে এরূপ কোনও কথাই পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা গুর্জরগণের পরাজয় সূচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে ভোজদেবের সামন্ত-চক্রমধ্যে কলচুরি বংশীয় প্রথম গুণাম্ভোধিদেব এবং মাণ্ডব্যপুরের প্রতিহার-বংশীয় কক্ক এই উভয় রাজার বংশধরগণের খোদিত লিপিতে গৌড় যুদ্ধে যশোলাভের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।

কক্কের পুত্র বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ যোধপুর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কক্ক গৌড়ীয়গণের সহিত মুদ্গগিরির যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন[১১৯]। কলচুরি বংশীয় প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রথম গুণাম্ভোধিদেব (প্রথম গুণ সাগর) সংগ্রামে গৌড়-লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছিলেন[১২০]। এখন দেখা যাউক, কোন সময়ে ভোজদেবও তদীয় সামন্তগণ কর্তৃক মুদ্গগিরি বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ভাগলপুরের তাম্রশাসন মুদ্গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি তীরভুক্তির অন্তর্গত কক্ষ-বিষয়স্থিত মুকুতিকা গ্রাম 'কলসপোত' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের এবং পাশুপতাচার্য পরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান কবিয়াছিলেন। সুতরাং নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত যে তীরভুক্তি এবং মুদ্গগিরি তাঁহার শাসনাধীন ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেবপালের মন্ত্রিগণ :

দেউলিতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসনে তদীয় প্রপিতামহ দ্বিতীয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'প্রথম অমোঘবর্ষের, গুর্জরের ভয় উৎপাদনকারী, লাটের ঐশ্বর্য জনিত বৃথা-গর্বহরণকারী, গৌড়গণের বিনয় ব্রতের শিক্ষাগুরু, সাগরতীর বাসিগণেব নিদ্রাহরণকারী, দ্বারস্থ অঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ এবং মগধগণকে আজ্ঞাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল ভুবনপালনকারী শ্রীকৃষ্ণরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল'[১২২]। গৌড়গণের বিনয় ব্রতের শিক্ষা গুরু রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সময় গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে কোন্ নৃপতি সমাসীন ছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ত্রিপুরির (জবলপুবেব নিকটবর্তী তেবারের) কলচুরি-রাজ কর্ণের (১০৪২ খ্রিষ্টাব্দের বারাণসীতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে কলচুরি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোকল্ল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে[১২৩],-

> "ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকুট-ভূপালে।
> শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ"।। (৯ শ্লোকঃ)।

"যাহার ভূজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষকে এবং রাজা শঙ্করগণকে অভয় দান করিয়াছিল"।

"বিল হরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকল্ল-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,-
"জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথীমপূর্ব্বকীর্ত্তিস্তম্ভ-দ্বন্দ্ব মারোপ্যতে স্ম।
কৌম্ভোস্তব্যান্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবের্ষাঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ'।।
(১৭ শ্লোকঃ)।

"যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দুইটি অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন,-দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোকল্লের জামাতা দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। ভোজ অবশ্যই গুর্জর-প্রতিহার মিহির-ভোজ; চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষ। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ শত্রুর হস্ত হইতে কোকল্ল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন? তৎকালে গৌড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন রাষ্ট্রকূট রাজ বা কান্যকুব্জ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজ, কলচুরিরাজ কোকল্ল, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চান্দেল্লরাজ শ্রীহর্ষ, আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত হইয়া, বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"।

কোন শত্রুর হস্ত হইতে কোকল্ল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত। তবে ইহা স্থির যে, কোকল্লদেব চিত্রকূট ভূপাল হর্ষদেবের এবং রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক হইলে তাঁহাকে গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় প্রথম ভোজদেবের এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তবুও কোকল্লদেব যে দেবপালের হস্ত হইতেই ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অভয়দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। পরন্তু, প্রথম ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রধান ও প্রবল শত্রু দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব এবং চালুক্যবংশীয় তৃতীয় গুণক বিজয়াদিত্য ব্যতীত অপর কেহই হইতে পারে না। আমরা জানি যে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপৌত্র ধ্রুবরাজদেব বা দ্বিতীয় ধ্রুব, প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে মিহিরভোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১২৬]। গুণক বিজয়াদিত্য (৩য়) ও, 'দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কৃষ্ণের ভীতি উৎপাদন পূর্বক তাঁহার রাজধানী মান্যক্ষেত্র ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কলচুরিরাজ কোকল্লদেব হয়ত ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের এই বিপদের সময়েই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, প্রথম ভোজদেবকে কোকল্লদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং কোকল্লের আশ্রিত ভোজদেব প্রথম ভোজের পৌত্র দ্বিতীয় ভোজদেব হওয়াই সম্ভব। প্রথম ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্র পালের মৃত্যুর পর প্রতিহার রাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় ভোজদেব নির্ব্বিবাদে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নারায়ণ পালের চরিত্র :

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা, দানশীলতা এবং সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রসংসা করা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, 'যিনি পৃথিবী পালনার্থ দিক্ পালগণ কর্তৃক বিভক্ত শ্রী (গুণ সমূহ) আত্ম শরীরে ধারণ করিতেছেন, সেই পুণ্যোত্তর শ্রীমান নারায়ণ পাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপাল দেব লজ্জা দেবীর গর্ভে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র সমস্ত-সামন্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ সংস্পর্শ সুশোভিত-পাদ পীঠসংযুক্ত ন্যায়ার্জিত রাজ সিংহাসন আত্ম-চরিত্র (জ্যোতিঃ) সংস্পর্শে অলঙ্কৃত করিতেছেন। চিত্তক্ষেত্রে পুরাণ-বর্ণিত পবিত্র বৃত্তান্তের ন্যায় প্রতীয়মান নারায়ণপাল দেবের (ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ) চতুর্বর্গ-নিধানভূত পবিত্র চরিত্রের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জন্য সকল মহীপালই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সজ্জন-মনোমোদিনী সু-উক্তি দ্বারা তিনি সাতিবাহন রাজাকে অকাল্পনিক সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় (কর্ণনামক) অঙ্গাধিপতির (দানশীলতার) কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইন্দীবরশ্যাম অসিপত্র, রণস্থলে বিস্ফুরিত হইবার সময়ে, তাঁহাকে শত্রুগণ (ভয়াতিশয্যে) পীত লোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত। তিনি প্রজ্ঞাবলে

এবং বাহুবলে জগদ্বাসীগণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিত ভাবে আত্মধর্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; -তাঁহার নিকট 'অর্থিজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যায়, এর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে না। তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র (বিরুদ্ধ) গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি (ঐশ্বর্য্য-গৌরবে) শ্রীপতি (লক্ষ্মীপতি) হইলেও, অমলিন-কর্মপরায়ণ বলিয়া) অ-কৃষ্ণ-কর্মা;-বিদ্বদ্বর্গের অধিনায়ক হইলেও, (ভোগৈশ্বর্যের অধিকারী বলিয়া) মহাভোগী;-প্রতাপে অলন-সদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, (কার্যকালে) পুণ্যশ্লোক নলের তুল্য বলিয়াই সুপরিচিত। তদীয় শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ শুভ্র যশঃ ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, (তাহা অতি শুভ্র বলিয়াই) রুদ্রদেবের (সুবিখ্যাত শুভ্র) অট্টহাস্যও তাঁহার শোভাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না; এবং (তদীয় যশোরাশির প্রভাতিশয্যে) সিদ্ধাঙ্গানাগণের মস্তকার্পিত (শুভ্র) কেতকী মালাও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর না হইয়া, কেবল অলি-গুঞ্জন রবই অনুমেয় হইয়া রহিয়াছে'।[১২৮]

রাজ্যপাল ৯২৫-৯৩০ :

নারায়ণ পালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজ্যপাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'তিনি (রাজ্যপাল) অগাধ-জলধিমূল-তুল্য-গভীর-গর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুলাচল-তুল্য সমুচ্চকক্ষ-সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন[১২৯]। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট কুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১৩০]। এই রাষ্ট্রকূট কুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ মৌলি তুঙ্গদেবের পরিচয় প্রসঙ্গে মনীষিগণ নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃ কিলহর্ণের মতে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগতুঙ্গই ভাগ্যদেবীর পিতা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রাষ্ট্রকূটপতি শুভতুঙ্গ ২য় কৃষ্ণই রাজ্য পালের শ্বশুর[১৩২]। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাবোধি (বুদ্ধগয়া) হইতে তুঙ্গ ধর্মাবলোক নামক যে একজন নৃপতির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,[১৩৩] সেই তুঙ্গ ধর্মাবলোকের কন্যার সহিতই রাজ্যপালের বিবাহ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয়ই অনুমান মাত্র।

দ্বিতীয় গোপাল ৯৩০-৯৪৫ :

রাজ্যপাল দেবের মৃত্যুর পর ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের প্রশস্তিতে রাজ্যপালের ন্যায় এই গোপাল দেব সম্বন্ধে ও গৌরব জনক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু, গোপাল দেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বাগীশ্বরী মূর্তী[১৩৫], গয়ার মহাবোধিতে শক্র সেন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা[১৩৬], এবং তাঁহার পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধের বিক্রমশিলা বিহারে লিখিত 'অষ্ট সামস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায়[১৩৭], গোপাল দেব অপহৃত পাল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৯৪৫-৯৭৫ :

দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই বিগ্রহপালকে গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। খাজুরাবোগ্রামে আবিষ্কৃত চন্দেল্ল বংশীয় যশোবর্ম দেবের ১০১১ বিক্রমাব্দে (৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদি, কুরু ও গুর্জর রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৩৮]। সুতরাং ৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যে গৌড় ও মিথিলা যশোবর্মদেব বা লক্ষবর্মের হস্তগত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিগ্রহপাল যশোবর্মার ভয়েই গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া নদী-মেখলা-বেষ্টিত পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক আত্মরক্ষা করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু যশোবর্মার ভয়ে নহে, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তাঁহাকে গৌড় দেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৮৮৮ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি গৌড়দেশ হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় বা বাণগড়ের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাটীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তর স্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপির 'কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ' পদ হইতে জানা গিয়াছে[১৩৯]। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে লিখিত আছে যে, 'সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ কোটি-বর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেইরূপ রত্ন-কোটি বর্ষী-বিগ্রহপাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ দায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনের সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল'[১৪০]। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মহীপাল দেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য হইতে 'চন্দ্র'-রূপে উদ্ভুত বলিয়া, এবং তজ্জন্য তাঁহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন[১৪১]।' আমরা এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ, মহীপালদেবের বাণগড় লিপির পরবর্তী শ্লোকে (১১শ শ্লোকে) লিখিত আছে যে, 'তদীয় অভ্রতুল্য সেনা গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জল-প্রচুর পূর্বাঞ্চল স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল সীকরোৎ ক্ষেপে তরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল'[১৪২]। ইহাতে বিগ্রহপাল দেবের নানা স্থানে আশ্রয়লাভের চেষ্টাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়[১৪৩]। কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির আক্রমণে গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া বিগ্রহপাল সম্ভবত বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত সমতটে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হতবল ছিন্নভিন্ন কটক-সমূহ পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশসমূহে লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল[১৪৪]।

বিগ্রহ পালের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৪৫]। সুতরাং তিনি যে ত্রিংশৎ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মহীপাল ১ম ৯৭৫-১০২৬ :

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় পুত্র প্রথম মহীপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল কেবলমাত্র সমতটের আধিপত্যই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে সমতট প্রদেশে থাকিয়া বলসঞ্চয় ও সৈন্য পরিচালনা পূর্বক 'রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, 'অনধি কৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন'[১৪৬]। মহীপাল সমুদয় রাজন্যবৃন্দের মস্তকে চরণপদ্ম ন্যস্ত করুন আর নাই করুন তিনি যে পৈত্রিক রাজ্যের উদ্ধারসাধন পূর্বক একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 'প্রজাশক্তির সাহায্যে যে পালরাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কোনও আকস্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহার পতন হইলেও প্রজাসাধারণে প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে বিলম্ব হয় নাই[১৪৭]'। কিন্তু অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে যাইয়া দক্ষিণাপথাধিশ্বর দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের তিরুময়-লিপিতে মহীপালের সমসাময়িক ভূপতিরূপে আমরা দক্ষিণরাঢ়ে রণসুরকে, দণ্ডভুক্তিতে (উৎকল রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশ)[১৪৮] ধর্মপালকে এবং বঙ্গাল দেশে গোবিন্দ চন্দ্রকে দেখিতে পাই। ইহারা যে মহীপালের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য যে, মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের বিনষ্ঠ ও অপহৃত অংশের

উদ্ধারসাধন করিতে সমর্থ হইলেও ভাগ্যবিপর্যয়ের সময়ে তাঁহার পিতা যে স্থানে আশ্রয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তরাধিকার-সূত্রে পালসাম্রাজ্যের যে ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঘাউরা নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তীর পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে[১৪৯]ঃ

(১ম) "ওঁ সম্বত্ ৩ মাধ দিনে ২৭? (১৪?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে

(২য়) কীর্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাথ্য সমতটে বিলকিন্ন

(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য বসুদত্ত সুত

(৪র্থ) স্যমাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযসো অভিবৃদ্ধয়ে'।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক মহীপাল দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের সমতটে প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপালের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। একজন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র এবং অপরজন তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র। প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় মহীপালের প্রপিতামহ। সুতরাং এক্ষণে কথা হইতেছে, বাঘাউরা লিপির এই মহীপাল কে?' দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য-বিস্তৃতি করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট-বঙ্গে বর্মবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাঘাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষত প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত বাঘাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমালা এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

মদনপাল দেবের মহলি-লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, 'সেই বিগ্রহপাল দেবের চন্দনবারির-মনোহর-কীর্তি-প্রভা-পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কীর্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দ মহাদেবের ন্যায় দ্বিতীয় "দ্বিজেশ মৌলি" হইয়াছিলেন'[১৫০]। মনহলিলিপির এই উক্তি যে অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অধস্তন-পুরুষের শাসনলিপিতে পূর্বপুরুষের অপযশের কথা লিপিবদ্ধ হইতে কুত্রাপি দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'দ্বিজেশ মৌলি' শব্দে চশ্লিষ্ট প্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবপক্ষে তাহার অর্থ সুগম, মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না। তিনি পরলোকগত ইহয়া (শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন) এরূপ অর্থে 'শিববদ্বভূ' প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। প্রশস্তিতে পরাভবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিাই, তাহা ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিতে পারে[১৫১]। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপাল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অলীক। রামচরিতে লিখিত আছে, তৃতীয় বিগ্রহপাল উপরত হইলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে নীতি-বিগর্হিত আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে রামপালের সহিত অপর ভ্রাতা শূরপালকেও লৌহ নিগড়বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খলস্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে বলিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতরাং তিনি বলপূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যগ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। রামপাল দেব যে সময়ে কারারুদ্ধ, সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সেনা লইয়া বিদ্রোহীদিগের সম্মিলিত সেনা সমূহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন[১৫২]।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় মহীপাল অতি অল্পকাল মাত্রই সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং যে কয়দিন ছিলেন তাহা ভ্রাতৃ-নির্যাতনেই ব্যয়িত হইয়াছিল; পরে বরেন্দ্রর প্রজা-বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পূর্ববঙ্গে আধিপত্য-বিস্তার বা বিনষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিবার একেবারেই অবসর ছিল না। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঘাউরা-লিপি প্রথম মহীপাল দেবেরই তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার

করিয়া বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ববঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে আর কেহই তাহা মুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই।

মহীপাল দেবের নবম-রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ে গোকলিকা মণ্ডলে চুটপল্লিকা বর্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে কৃষ্ণাদিত্য দেব শর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল[১৫৩]। নালন্দ মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বী-বিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, গুরুদত্তের পুত্র, তৈলাঢ়ক বাসী মহাযান মতাবলম্বী জ্যাতিষ বালাদিত্য, মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন[১৫৪]। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি-মন্দির-প্রাঙ্গনস্থিত একটি মূর্ত্তীর পাদপীঠস্থ খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহীপাল দেবের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের দশম সম্বৎসরে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১৫৫]। মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় পিত্তল মূর্ত্তী মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৫৭]। সারনাথে প্রাপ্ত ১০৮৩ সম্বতের ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহীপাল দেবের আদেশে বারাণসী ধামে স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক তদীয় অনুজদ্বয় কর্তৃক ঈশান ও চিত্রা ঘণ্টাদিব শত কীর্ত্তিরত্ন প্রতিষ্ঠিত, ধর্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্ম চক্র সংস্কৃত এবং অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকূটী নির্মিত হইয়াছিল[১৫৮]। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মহীপাল দেব ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহীপাল দেব ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহীপালের পিতৃ-সিংহাসন লাভের অনতিকাল পরেই তুরস্কগণ কর্তৃক উত্তরাপথ বিজয়ের সূত্রপাত হইতেছিল। দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামানী রাজ্যের সেনানায়ক আলপ্তিগীন গজনীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রীতদাস সবুক্তগীন গজনীব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তদীয় দশম রাজ্যাঙ্কে, ৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহিরাজ্য অধিকার বদ্ধপরিকর হইয়া উহা আক্রমণ করিতে আরম্ভ 'সবুক্তগীন আরব্ধসাহি রাজ্য-ধ্বংস-সাধন ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া ৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী মহমুদ প্রবলতর পরাক্রমে বারম্বার আক্রমণ করিয়া সাহিরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্যাবর্তের এই ঘোর দুর্দিনের সময় সাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কালঞ্জরের (জেজাভুক্তি) অধিপতিগণ প্রাণপণে বিপন্ন সাহিরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। মহমুদের গতিরোধ করিতে যাইয়া সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি অনঙ্গপাল এবং পৌত্র সাহি ত্রিলোচন পাল একে একে প্রাণ বিসর্জন করিলে সাহিরাজ্য মহমুদের করায়ত্ত হইয়াছিল। 'শেষ মুহূর্তে আর্যাবর্ত-রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতিহার, চন্দেল্ল ও লোহর বংশীয় রাজগণ, যখন সাহিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তখনও মহীপাল আর্যাবর্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধার্থে সমবেত আর্যাবর্ত-রাজগণের মধ্যে গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গৌড়েশ্বর সাহি-রাজগণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই'[১৫৯] শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহীপালের এই অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন[১৬০], 'মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের ঔদাসীন্যের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গ জয়ের পর মৌর্য অশোকের ন্যায় (কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে) বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বারাণসীধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া মহীপাল এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আর্যাবর্তের অপরার্দ্ধের তীর্থক্ষেত্রের কীর্ত্তিরত্নের কি দশা হইতেছিল, সে দিকে দৃক্‌পাত করিবারও তাঁহার অবসর ছিল না।'

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন[১৬১], 'বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। তখনও রাজেন্দ্র চোল রাঢ়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল আপন পৈতৃক সম্পদ্ উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে নিজের গৌড়রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষত যে কালঞ্জর পতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতাস্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই।' শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন[১৬২], 'চন্দজ মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণ চিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুত মহীপালের ঔদাসীন্যের কোনও উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাপুরুষতাও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্মযুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।' 'প্রাচীন সাহী-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহমুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর তখন 'বারাণসীধামকে কীর্তিরত্ন সজ্জিত করিতে গিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন'। 'স্থানীস্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্বাদ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে "কর্মানুষ্ঠান" করিতেছিলেন। দুর্জের গোপাদ্রিদুর্গ অধিকৃত হইল, প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট্ট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপাল দেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হইলেন। মহমুদ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে, চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাত বংশীয় অর্জুন রাজ্যপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন[১৬৩]। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন?'

যিনি 'অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুবলে দিগ্বিজয়ী চোল-ভূপতি রাজেন্দ্র চোলের উত্তরবঙ্গ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে কাপুরুষ বলা চলে না। মহমুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের সময়ে, সাহি রাজ্যের পতনকালে বা কান্যকুব্জ ও কালঞ্জর রাজ্যের বিপদে মহীপালও নিরাপদ ছিলেন না। সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয় দেব[১৬৪] ও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল এই সময়েই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল; আর্যাবর্তের অপরাংশের কি দশা হইতেছিল, হয়ত তাঁহার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর ছিল না; অথবা হয়ত তিনি সেরূপ ক্ষমতাশালীও ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, 'তিনি স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন, সুলতান মামুদের অভিজানর্নিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার ঔদাসীন্য উত্তরাপথের সর্বনাশের অন্যতম কারণ। যদি মহীপাল গৌড়রাষ্ট্রের সেনাবল লইয়া সাহি জয়পাল, অনঙ্গপাল, বা ত্রিলোচন পালের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।' কিন্তু মগধে গোবিন্দ পাল ও বঙ্গে লক্ষণ সেনের পুত্রগণ প্রায় দ্বিশত বৎসর পরে মহীপালের এই ঔদাসীন্যের ফলভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) 'সাগর দীঘি' এবং বরেন্দ্রে (দিনাজপুর জেলায়) 'মহীপাল দীঘি' অদ্যাপি মহীপালের পরহিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। তিনটি সুবৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ-বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'মহীশূর', দিনাজপুর জেলার 'মহীসন্তোস' এবং মুর্শিদাবাদ জেলার 'মহীপাল'-মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মহীসার গ্রাম এবং মহীসারের বিপুলায়তন দীর্ঘিকা প্রথম মহীপাল দেবেরই অন্যতম কীর্তি বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাচুর তলার 'ঠারিণ বাড়ি' অপরটি মহীসারের দিগম্বরী বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে মহীসারে চাঁদ কেদার

রায়ের গুরু গোসাই ভট্টাচার্য সিদ্ধিলাভ করেন[১৬৬]। বিক্রমপুরের মধ্যে মহীসার এক প্রাচীনতম স্থান। এই স্থানের মৃত্তিকা খননকালে প্রায়ই ইষ্টকাদি এবং দেবদেবীর মূর্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১. Indian Antiquary vol IV. page 366

২. 'In Odivisa. in Bengal, and the other five provinces of the east, each kshatriya brahman and Merchant constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the Country.
The Indian Antiquary vol. IV. Page 365-366

৩. 'মাৎসন্যায়' সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক ন্যায়। তাহার অর্থ, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার জনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথ বর্ম-বিরচিত 'লৌকিক ন্যায় সংগ্রহ' গ্রন্থে 'মাৎস্যন্যায়' এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা –
'প্রবল-নির্বল-বিবোধে সবলেন নির্বল-বাধাবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ। অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষু দৃশ্যতে যথাহি বাসিষ্টে প্রহ্লাদখ্যানে তৎ সমাধিং প্রস্তুতোক্তম্,-
এতাবতাথ কালের তদ্রসাতল-মণ্ডলং
বভুবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায় কদার্থতম্।।
যথা ঃ-প্রবলা মাৎস্যা নির্বলাং স্তান্নাশয়ন্তি স্মেতি ন্যায়ার্থঃ।'
অধ্যাপক বোধলিঙ্গ একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা -
পরস্পরাভিষতয়া জগতো ভিন্ন বর্তনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যোন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।।
Von Bohtlingk's Inde Spruche.
গৌড় লেখমালা-১৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় মাৎস্যান্যায়োপহিতুম্' নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'To escape from being absor bed into another kingdom. or to avoid being swallowed up like a fish.' অর্থাৎ অন্যরাজ্য ভুক্ত হইবার আশঙ্কা বিদুরিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর মৎস্যের উদরগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা দূরীকরণ জন্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মাৎস্যন্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে' 'অপ্রণীতো হি মাৎস্যনায় মুদ্ভাবয়তি বলীয়ান বলং হি গ্রসতে দণ্ডধরী ভাবে' অর্থাৎ দণ্ড অপ্রণীত থাকিলে মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব উপস্থিত হয়, দণ্ডধরের অভাবে বলবান হীনবলকে গ্রাস করিয়া থাকে।

৪. 'মাৎস্যন্যায়মপোহিতং প্রকৃতি ভির্লক্ষ্যাঃ করোগ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।।
যথানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশি দির্শা মশয়ে
শ্বেতিয়া যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাতি ভারশ্রিয়া।।'
খালিমপুর তাম্রশাসন, গৌড়লেখ মালা ১২ পৃষ্ঠা।

৫. 'The widow of one of these departed chiefs used to kill every night the person who had been chosen as king. until after several years, Gopal, who had been elected king managed to free himself. and obtained the kingdom.'
Cunningham's Archaeological Survey Reports vol XV. Page 148.

৬. 'বিজিতা যেনাজলর্ধেবসুন্ধরাং বিমোক্সিতামোঘ পরিগ্রহ ইতি·
সবাষ্প মুদ্বাষ্প বিলোচনান্ পুনর্বনেষু বন্ধুন্ দদৃ (শু) মর্ত্তঙ্গজাঃ।।
চলৎস্বমন্তেযু বলেষু যস্য বিশ্বম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচার ক্ষম মন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচীরং বভূব।।'
গৌড় লেখমালা ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২ পৃষ্ঠা।

৭. 'মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক সম্বোধি বিদ্যা সরিদমল জল-ক্ষালিতাজ্ঞান পঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপশান্তিং

স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপাল দেবঃ।।'

৮. V. a. Smith's Early History of India, 3rd Edi. Page 378 & 397-398.

৯. Archaeological Survey of India. Annual Report—1903-1904. Page 280-281.

১০. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. V. Page 47.

১১. গৌড়রাজ মালা ২২ পৃষ্ঠা।

১২. Indian Antiquary vol IV Page 366.

১৩. Stein's Introduction to Rajtarangini Page 49. and Gouda vaho.

১৪. Introduction to Ramacarita by Sandhyakara Nandi. Edited by Mahamahopadhaya Harprasad Sastri · Page 6.

'রাজ্যে রাজভটাদি বংশ পতিত শ্রীদর্মপালস্যবৈ
তত্ত্বালোক বিধায়িনী বিরচিতা সৎপঞ্জিকেযং ময়া'।

১৫ Introduction to Ram charita—page 6

১৬ শত্রুঃ পুরোদিশ পতির্নদিগন্তরেষু
তত্রাপি দৈত্য পতিভিজিত এব (সদাঃ)
ধর্মঃ কৃত স্তদধিপ স্ত্বখিলাসু দিক্ষু
স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিঃ যঃ।'

গৌড়লেখমালা ৭১, ৭২ ; ৭৭ পৃষ্ঠা।

১৭. গৌড়লেখ মালা ৭৭ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা।

১৮. গৌড় রাজমালা ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা।

১৯. Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic. Society, Page 116.

২০. Epigraphia Indica. Vol VIII. Appendix II, Page-3.

২১. V A. Smith's Early History of India, 3rd Edition Page 398.

"জিতেন্দ্ররাজ প্রভৃতি নরাতী নুপার্জিতা যেন মহোদয় শ্রী।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায়।'

গৌড়লেখমালা ৫৭ ৬৫ পৃষ্ঠা।

Journal of the Royal Asiatic Society. 1909. Page 253. & Rajendra lal' Sanskrı M S.S. vol VI Page 80.

২৪. 'আদাঃ পুমান্ পুনবপি স্ফুট কীর্তিরম্মা
জ্জাতস্ স এব কিল নাগভট্ট স্তদাখ্যঃ।
যত্রান্ধ্র-সৈন্ধব-বিদর্ভ কলিঙ্গ-ভূপৈঃ
কৌমার ধামনি পতঙ্গ সমৈ রপাতি।।
এয্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধি মিচ্ছু
যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ।
জিত্বা পরাশ্রয় কৃত-স্ফুটনীচ ভাবং
চক্রায়ুধং বিনয় নম্র বপু র্ব্যরাজৎ।।
দুর্বাব বৈরি (?) বব বারণ বাজিবার
যানৌঘ সংঘটন ঘোব বারণ বাজিবার
যানৌঘ সংঘটন ঘোব ঘনান্ধকারং।
নির্জিত্য বঙ্গপতি মাবির ভূ দ্বিবস্বা
নুদান্নিব ত্রিজগদেক বিকাশ-কোষঃ।।
আনর্ত-মালব-কিরাত তুরুষ্ক বৎস-
মৎস্যাদিরাজ গিবিদুর্গ হটাপহারৈঃ :
যস্যাত্ম-বৈভব মতীন্দ্রিয়-মাকুমার-
মাবির্বভুব বিশ্ব জননী বৃত্তেঃ'।।

Annual Report · Archaeological Survey of India 1903-04 Page 281

গৌড়রাজমালা ২৬ পৃষ্ঠা

২৫. গুর্জর এবং মালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার (পেশোয়ার প্রদেশ) হইতে মিথিলার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, উত্তরাপথের সার্বভৌমের সমুন্নত পদলাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া, তিনি আয়ুধ-রাজ বংশীয় আর একজনকে (চক্রায়ুধকে) স্বকীয় মহাসামন্তরূপে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

২৬. 'হিমবৎ পর্বত নির্ঝরাম্বু-তুরগৈ পীতঞ্চ গাঢ়ঙ্গজৈ
ধ্বনিতং মজ্জন্ তূর্য্যকৈ দ্বিগুনিতম্ ভূয়োহপি তৎ কন্দরে।
স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহতি স্তৌ ধর্ম চক্রায়ুধৌ
হিমবান্ কীর্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্তি নারায়ণঃ'।
Journal of the Bomay Branch of the Royal Asiatic Society 1900. Page 118.

২৭. 'স নাগভট্ট চন্দ্রগুপ্ত নৃপয়ো যর্শোয্যং (?) রণে
স্বহার্য্য মপহার্য্য ধৈর্য্য বিকলানথোন্মুলয়ন্।
যশোর্জন পরো নৃপান্ স্বভূবিশালি শস্যানিব
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিপৎ স্বপদ এব চান্যানপি"।।
Journal of the Bomay Branch of the Royal Asiatic Society 1906. Page 118.

২৮. Epigraphia Indica. vol. IX Pages 198-200.

২৯. Epigraphia Indica. vol. IX Page 26 note 4.

৩০. Epigraphia Indica. vol. IX Page 105.

৩১. Epigraphia Indica, vol. III. Page 54 & 161. vol VII. Appendix. Page12.

৩২. সিরুর ও নীলগুপ্ত স্থান দ্বয়ে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে ৭৮৮ শকাব্দে বা ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম অমোঘবর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্ক গণিত হইত. সুতরাং ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর। ডাঃ ক্লিহর্ণ শকাব্দের অতীত বর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের পর প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বের প্রথম বৎসর পতিত হইতে পারে না; কিন্তু ৮১৫ বা ৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে পতিত হইবার পক্ষে কোনও বাঁধা থাকে না।
Epigraphia Indica, vol. VI Page 104-5
Epigraphia Indica. vol. IV Page 210.
Epigraphia Indica. vol. VIII Appendix. II Page 3.

৩৩. 'সংধায়াশু শিলীমুখাং স্বসময়াং বাণাসনস্যোপরি
প্রাপ্তং বর্দ্ধিত বংধুজীব বিভবং পদ্মভিবৃদ্ধ্যন্বিতং।
সন্নক্ষত্র মুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জন্যবদ্ গুর্জরো
নষ্টঃ ক্বাপি ভয়াত্তথা ন সমরং স্বপ্নোপি পশ্যোদ্যথা।।'
Epigraphia Indica. vol VI Pages 242-44.

৩৪. 'শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট তিলকস্য।
রন্নাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন।'
গৌড়লেখমালা-৩৬. ৩৭ পৃষ্ঠা।

৩৫. গৌড়রাজ মালা ২৪ পৃষ্ঠা।

৩৬. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড. ১৫৫ পৃষ্ঠা. পাদটীকা

৩৭ Epigraphia Indica vol IX Page 253.

৩৮. Introduction to Ramacarita—by mahamahopadhya H. P. Shastri Page 5.

৩৯ Epigraphia Indica IX Page 251

৪০ Epigraphia Indica IX Page 251

৪১ গৌড়রাজ মালা ২৪. ২৫ পৃষ্ঠা

৪২ বুন্দেলখণ্ড ও জয়পুর ভোজ ও মৎস্যদেশ বলিয়া প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল। মদ্র. কুরুও যদু পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম। অবান্ত বা উজ্জয়িনী মালব দেশের রাজধানী। যবন তুরুস্ক দেশেরই নামান্তর পূর্বকালে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে আফগানিস্থানের অধিকাংশ স্থান গান্ধাব রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাচঙ্গড়া বা জ্বালামুখী কীর দেশ বলিয়া পরিচিত। ভোজ মৎস্যাদি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক

কিলহর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন, 'kanyakubja itself was in the Country of the Panchalas in madhyadesha. According to the topographical list of the Brihatsamhita, the Kurus and Matsyas also belong to the middle country, the Madras to the north west, the Gandharas to the northern and kiras to the North East division of India. The Avantis are the people of Ujjayini in Malva. Yadus according to the Lakkha Mandal prasasti, were long ruling in part of the Punjab, but they are found also south of the jamuna: and south of the river and north of the Narmada probably were also the Bhojas who head the list.'

Epigraphia Indica vol IV Page 246.

৪৩. 'নাসীর-ধূলী-ধবল-দশদিশাং দ্রাগপশ্যান্নিয়ত্তাং
ধত্তে মাঙ্কাতৃ সৈন্য-ব্যতিকর চকিতোধ্যান তন্বীম্মহেন্দ্রঃ।
তাসামপ্যাহবেচ্ছা-পুলকিত বপুযান্বাহিনীনা স্বিধাভূং।
সাহায্যং যস্য বাহেবা নিখিল-রিপুকুলধ্বংসিনোর্নাবকাশঃ।।
ভোজৈর্ম্মৎসোঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদু যবনাবন্তি-গান্ধার কীরৈ
র্ভূপৈ র্ব্যালোল-মৌলি প্রণতি পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্গীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎ পঞ্চাল বৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়-স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্ সললিত-চলিত-ভ্রূলতালক্ষ্ম যেন।।'

গৌড় লেখমালা ১৩, ১৪, ২১, ২২ পৃষ্ঠা।

৪৪. গৌড় লেখমালা ২১ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা।

৪৫. নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে এই ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৬. Annual Report, Archaeological Survey of India 1903-04. Page 281.

৪৭. গৌড় রাজমালা, ২৫পৃষ্ঠা।

৪৮. Indian Antiqua. Y. vol XII. Page 160

৪৯. Pal Kings of Bengal (manuscript) by Babu R D.Banerjee M.A.

৫০. 'করল-মালব-গৌড়ান্ সগুর্জরাংশ্চিত্রকূটগিরিদুর্গস্থান্।
বদ্ধা কাঞ্চীশানথ স্ব কীর্ত্তি নারায়ণো জাতঃ'।

Epigraphia Indica vol VI Page 102-03

৫১. 'অজনি ততোহপি শ্রীমান বাধ্বক ধবলো মহানুভাবো যঃ।
ধর্ম্ম ভবন্নপি নিত্যং বণোদ্যতো নিনশাদ ধর্ম্মং।।

Epigraphia Indica vol. IX Page 5.

৫২. Epigraphia Indica, vol. IX Page 7.

৫৩. 'রামস্যেব গৃহীত-সত্য তপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য মহিমা বাক্ পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈক বসতি র্ভ্রাতুস্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরক বোদেকাত পত্রা দিশঃ'

গৌড় লেখমালা, ৫৭, ৬৫ পৃষ্ঠা।

৫৪. 'কেদারে র্বিধিনোপযুক্ত পয়সাং গঙ্গা সমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপানুষ্ঠিত বতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান সাধয়তোনুষঙ্গ জনিতা সিদ্ধি পরত্রাপ্য ভূৎ।
তৈ তৈ র্দিগ্বিজয়াবসান সময় সম্প্রেষিতানাং পরৈঃ
সৎকারৈ রপনীয় খেদমখিলং স্বাং স্বাং গতানাং ভুবম
কৃত্যাস্ত্রাবয়তাং যদীয় মুচিতং প্রীত্যা নৃপাণাম ভূৎ
সোৎকণ্ঠং হৃদয়ং দিবশ্চ্যুত বতাং জাতিস্মরাণামিব'

গৌড় লেখমালা, ১৪, ২২ পৃষ্ঠা।

৫৫. 'গোপৈ সীম্নি বনেচরৈ র্বনভুবি গ্রামোপ কণ্ঠে জনৈঃ

ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগনৈঃ প্রত্যাপনং মানপৈঃ।
লীলা বেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈরূদ্গীত মাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা বিচলিতা নম্রং সদৈ বাননং'।।

গৌড় লেখমালা, ১৪, ২২ পৃষ্ঠা

৫৬. 'মত মস্ত্র ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনাবায়ণ বর্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবন পাল মুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ'।

গৌড় লেখমালা, ১৬ পৃষ্ঠা

৫৭. গৌড়লেখমালা, ২৬ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

৫৮. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড, ১৫৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা

৫৯. 'শ্লাঘ্যা পতিব্রতাসৌ মুক্তা রত্নং সমুদ্র-শুক্তিরিব।
শ্রীদেবপাল দেবং প্রসন্ন বক্তুংসুত প্রসূত'।

দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন, ১১ শ্লোক। গৌড়লেখমালা ৩৪, ৩৭ পৃষ্ঠা

৬০. গৌড়লেখমালা ৫৭ পৃষ্ঠা

৬১. গৌড় লেখমালা, ৬৫, ৬৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

৬২. J. A. S. B. vol Lxi Page 80

৬৩. গৌড় লেখামালা-৬৫ পৃষ্ঠা-পাদটীকা।

৬৪ 'তস্মাদ্ ভূষিত সাব্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্য ব্রজৈ-
র্বিদ্ধন্মৌলিরভুদুমাপতিরিতি প্রভাকর গ্রামণীঃ।
শ্মাপাল জয়পালতঃ সহি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থি গণার্হণার্দ্র হৃদয়ঃ প্রত্য গ্রহীৎ পুণ্যবান্'।।

Eggeling's Catalogue of Sanskrit Manuscript in the Indian Office Library. Part I Page 92-93.

৬৫. আগঙ্গাগম-মহিতাৎ সপত্ন শূন্যা
মাসেতোঃ প্রথিত-দশাস্যকেতু-কীর্ত্তেঃ।
উর্বী মাবরুণ নিকে (ত) নাচ্চ সিন্ধো
রালক্ষ্মী-কুল ভবনাচ্চ যো বুভোজ'।।

গৌড় লেখমালা ৩৮, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৬৬. গৌড় রাজমালা ৩২ পৃষ্ঠা।
'আরেবা-জনকান্মতঙ্গজ-মদ-স্তিম্যচ্ছিলা-সংহতে
বাগৌরী-পিতু-রীশ্বরেন্দু-কিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নোগিরেঃ।
মার্তণ্ডাস্তময়ো দয়ারুণ জলদাবারি-রাশি দ্বয়াৎ
নীতাা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদবপালো নৃপঃ।।'

গৌড় লেখমালা ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৬৮ Indian Antiquary Vol IV

৬৯ 'যস্মিন্ ভ্রাতুন্নিদেশাদ্বলবতি পবিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুর মজহাদুৎ কলানামধীশঃ।
আসাগুক্রে চিরায় প্রণযি পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাণানুপশমিত সমিৎ সং কথাং যস্য চাজ্ঞাং'।

গৌড় লেখমালা ৫৮, ৬৬ পৃষ্ঠা।

৭০ Indian Antiquary Vol XV P. 304.

৭১ গৌড় লেখমালা ৬৬ পৃষ্ঠা. পাদ টীকা

৭২ গরুড়স্তম্ভ লিপি ১৩ শ্লোক গৌড় লেখমালা ৭৪ পৃষ্ঠা।

৭৩ গৌড় রাজমালা ২৯ পৃষ্ঠা

৭৪ J A. S B 1840 Page 766 J A S.B 1897 Part I Page 285 সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ ভাগ-১১৩ পৃষ্ঠা।

৭৫ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২০শ ভাগ-১৯০ পৃষ্ঠা।

৭৬. 'কাম্বোজেষু চ যস্য যুবভি ধর্বস্তান্য রাজৌজসো
হেষা মিশ্রিত হারি হেষিত রবাঃ কান্তা শ্চিরং বীক্ষিতাঃ'
গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা

৭৭ গৌড় লেখমালা ৭৮ পৃষ্ঠা।

৭৮. 'দুর্বাবারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড় পতিনা তেনেন্দু মৌলে রয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ ভূ ভূষন্ন'।।
Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol VII Page 619.

৭৯. গরুড়স্তম্ভ লিপি ১৩শ শ্লোক, গৌড় রাজমালা ৭৪ পৃষ্ঠা।

৮০. অথ কদাচিৎ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনং কবচহবম্ আহূয় হূণান্ হন্তুং হরিণান্ ইব হরিহবিণেশ কিশোরম্ অপরিমিত বলানুযাতং চিরন্তনৈঃ অমাত্যৈঃ অনুবর্ত্তেশ্চ মহাশামন্তৈঃ কৃত্বা সাভিসারম্ উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ'।
জীবনানন্দ বিদ্যাসাগরেব সংস্করণ হর্ষচরিত ৫ম উচ্ছাস ৩১০ পৃষ্ঠা।

৮১. Epigraphia Indica Vol. IX. P 8

৮২. গৌড়রাজমালা ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

৮৩. 'উৎকীলিতোৎকল-কুল হৃত-হূণ-গর্বং
খর্বী কৃত দ্রবিড় গুর্জর নাথ দর্পং।
ভূপীঠ মব্ধি রশনাভরণ স্খুভোজ
গৌড়েশ্বব শ্চির মুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং"।।
গৌড় লেখমালা ৭৪, ৮১ পৃষ্ঠা।

৮৪. গৌড় লেখমালা ৭২ পৃষ্ঠা, গরুড়স্তম্ভ লিপি।

৮৫. 'ভ্রাম্যাদ্ভির্বিজয় ক্রমেণ করিভি (ঃ স্বা) মেব বিন্ধ্যাটবী
মুদ্দামপ্লবমান বাষ্প পযসো দৃষ্টাঃ পুনর্বান্ধবাঃ'।
গৌড় লেখমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

৮৬ গৌড় রাজমালা ৩০ পৃষ্ঠা।

৮৭. দ্বিতীয় নাগভট্টের পুত্র রামভদ্রই সম্ভবত দেবপাল কর্তৃক পবাজিত হইয়াছিলেন।

৮৮. Bhandarkar's History of Deccan Page 200.

৮৯. 'বিবেকাত্যক্ত বাজোন বাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলঙ্ কৃতিঃ'।
Bhandarkar's Search for Sanskrit Mss for 1883-84. Notes & c Page ii

৯০. 'অরিনৃপতি মুকুট ঘট্টিত চবণঃ সকল ভূবন বন্দিত শৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈবর্চিতোহতিশয় ধবলঃ।।
Epigraphia Indica Vol VI P 103 & India Antiquary Vol XII P 218

৯১. প্রবাসী ১৩১৯, চৈত্র ৫৮২ পৃষ্ঠা।

৯২. 'The Sirur inscription claims that worship was done to him by the Kings of Anga, Vanga, Magadha, Malava and Vengis As regards Anga, Vanga and Magadha places which lay very far to the East, in the directions of Bengal,—the assertion is doubtless hyperbolical'
Bombay Gazetteer Vol part ii Page 402

৯৩. Epigraphia Indica. Vol V P 211

৯৪. Epigraphia Indica. Vol IX P 5

৯৫. গৌড় রাজমালা, ২৭ পৃষ্ঠা
রামভদ্রের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্যই সম্ভবত ভোজদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন।

৯৬. প্রথম ভোজদেবের সাগর তাল লিপিতে দেবপালের পরাজয়ের কোনই উল্লেখ নাই-Annual Report

of the Archaeological Survey of India. 1903—4. Page 281.

৯৭. 'মাদ্যন্নানা-গজেন্দ্র-স্রবদন বরতোদ্দাম-দান-প্রবাহো
স্পৃষ্ট ক্ষৌণী-বিসর্পি-প্রবল-ঘনরজঃ-সম্বৃতাশাবকাশং।
দিক্‌চক্রায়াত-ভূভৃৎ-পরিকর-বিসরদ্বাহিনী-দুর্বিলোক
স্তস্থৌ-শ্রীদেবপালো নৃপতি রবসরাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য'।।
গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৯৮. দত্ত্বাপ্যানম্রমূর্দ্ধ পচ্ছবি-পীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজ কল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ'।
গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৯৯. গৌড় লেখমালা ৭৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

১০০. গৌড় লেখমালা, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১০১. গৌড়লেখমালা, ৮০ পৃষ্ঠা।

১০২ বর্তমান ঘোষরাবা নামক স্থানেই সম্ভবত যশোবর্মপুরের বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১০৩. 'তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তি সাবঃ
শ্রীদেবপাল-ভুবনাধিপলব্ধ-পূজঃ।
প্রাপ্ত-প্রভঃ প্রতিদিনোদয়-পূরিতাশঃ
পুষেব দারিতত্তমঃ প্রসরো বরাজ'।। গৌড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৪. 'ভিক্ষোরাত্মাসমঃ সুহৃত্ত্বজ ইব শ্রীসত্যবোধের্নিজো
নালন্দা পরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতের্য স্থিতঃ'। গৌড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৫. দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন।

১০৬. 'যঃপূর্বং বলিনাকৃতঃ কৃতযুগ যেনাগমত্ত্বার্গব-
স্ত্রেতায়াং প্রহৃতঃ প্রিয় প্রণয়িনা কর্ণেন যো দ্বাপরে।
বিচ্ছিন্নঃ কলিনা শক-দ্বিষি গতে কালেন লোকান্তরং
যেন ত্যাগপথঃ স এব হি পুন র্বিস্পষ্ট মুন্মীলিতঃ।। গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা।

১০৭. Epigraphia Indica, Vol VIII. Appendix I. P 17

১০৮. 'It seems clear from this grant that Vigrahapal was not a nephew, but a son of Deva Pala; for the pronoun 'his son' (tat sunuh) must refer to the nearest preceding noun which is Deva pala.' Centenary Review-Appendix II P 206 কিন্তু তাম্রশাসনে জয়পালের প্রশংসা বিজ্ঞাপক শ্লোক উল্লিখিত হওয়ায় এইস্থান যে দুর্বোধ্য হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন' this reference is obscured through the interpolation of an inter mediate verse in praise of jaya pala, whish makes it appear as it Vigraha pala were a son of Jaya Pala'—Ibid.

১০৯. গৌড় লেখমালা ৬৭ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

১১০ যস্যোজাস্য বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্রইয় ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূযঃ স্বযং।
নানাম্ভোনিধি-মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ-সঙ্গী (?) চিরং
শ্রদ্ধাসত্ত্বঃপ্লুত-মানসোনত শিরা জগ্রাহ পূতস্পযঃ'। গৌড় লেখমালা ৭৪, ৮২ পৃষ্ঠা।

১১১ 'শ্রীমান্ বিগ্রহপাল স্তৎ সুনুরজাত শত্রু রিবজাতঃ।
শত্রু-বনিতা-প্রসাধন বিলোপ-বিমলাসি-জলধারঃ
রিপবো যেন গুর্বীণাং বিপদা-মাস্পদীকৃতাঃ
পুরুষায়ুষ-দীর্ঘাণাং সুহৃদং সম্পদামপি গৌড় লেখমালা, ২৮, ৯৩, ৯৪, ১২৪, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

১১২ Centenary Review Appendix II Page 297.

১১৩. গৌড় লেখমালা ৮২ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

১১৪. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা।

১১৫ গৌড় রাজমালা ৩৩ পৃষ্ঠা।

১১৬. "তপো মমাস্তু রাজ্যং তে দ্বাভ্যামুক্ত মিদং দ্বয়োঃ।

'যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে'।। গৌড় লেখমালা ৬০ পৃষ্ঠা

১১৭. 'লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নু-কন্যা
পত্নী বভুব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবন-বিধিঃ পরমো বভুব"। গৌড় লেখমালা, ৫৮ পৃষ্ঠা

১১৮. গৌড় লেখমালা ৫৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

১১৯ 'ততোহপি শ্রীযুক্তঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশোমুদ্গাগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ে (ঃ) সমং রণে"।।
J. R. A. S. 1894. p. 7 : (Verse. 25).

১২০. তৎসুনুর্দ্ধাম ধাম্নাং নিধিরধিক ধিয়াং ভোজদেবাপ্তভূমিঃ
প্রত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শ্রীগুণাম্ভোধি দেবঃ।
যেনোদ্দামৈকদর্পদ্বিপঘটিতঘটাঘাতসংসক্তমুক্তা-
সোপানোদ্দস্তরাসিপ্রকটপৃথুপতেনাহৃতা গৌড়লক্ষ্মীঃ'।।
Epigraphia Indica, Vol. vii page 89.

১২১. গৌড় লেখমালা, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

১২২. তস্যোত্তর্জ্জিতগুর্জ্জরো হৃতহটল্লাটোদ্ভটশ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুঃ সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গকাঙ্গমগধৈ রভ্যর্চ্চিতাজ্ঞ শ্চিরং
সুনুস্সুনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ"।।
Epigraphia Indica Vol V page 193
গৌড় রাজমালা, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

১২৩. Epigraphia Indica. Vol II page 306

১২৪ Epigraphia Indica. Vol. I page 256

১২৫ Epigraphia Indica. Vol. II page 300-301.

১২৬. 'ধারা বর্ষ সমুন্নতিং গুরুতরমালোকা লক্ষ্মা যুতো
ধামব্যাপ্ত দিগন্তরোপি মিহিরঃ সদ্বংশ্যাবাহান্বিতঃ।
যাতঃ সোপি শমং পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং
যুন যেতীবামলতেজসা নিবহিতা হীণাশ্চ দীনা ভুবি'।।
Indian Antiquary Vol. XII Page 184

১২৭ Indian Antiquary Vol. XX Page 102-103

১২৮ গৌড় লেখমালা
নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন ১০-১৬ শ্লোক,-৬৮/৬৯ পৃষ্ঠা।
'তোয়া (শ) য়ৈ র্জ্জলধি (মূল)-গভীর-গর্ভৈ-
র্দ্দেবালয়ৈশ্চ কুল ভূধর তুল্য-কক্ষৈঃ।
বিখ্যাত কীর্ত্তির (ভব) ত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ'।
গৌড় লেখমালা,-৯৪, ৯৯ পৃষ্ঠা।

১৩০ 'তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতীধ্রান্নিধিরিব মহসাং (রাষ্ট্র) কুটা (ন্ব) যেন্দো
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গ-মৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ'
গৌড় লেখমালা, - ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৩২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাজন্যকাণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা।

১৩৩ Rajendra lal Mitra's Buddha Gaya Page 195

১৩৪ শ্রীমান্ গোপাল দেব শ্চিরতরম (বনে রেব) পত্ন্যা ইবৈকো
ভর্ত্তাভূন্নৈক-(রত্না) ব্রিত খচিত-চতুঃ সিন্ধু চিত্রাংশুকায়াঃ'
গৌড় লোখামালা. ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৩৫. 'সম্বৎ ১ আশ্বিন সুদি ৮ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপাল রাজনি শ্রীনালন্দাযাং শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টাবিকা-সুবর্ণব্রীহি-সক্তা'-বাগীশ্বরী প্রস্তব লিপি, গৌড় লেখমালা ৮৭ পৃষ্ঠা।

১৩৬. গৌড় লেখমালা-৮৯ পৃষ্ঠা

১৩৭. 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদেগাপাল দেব প্রবর্দ্ধমান কল্যাণবিজয়রাজ্যোত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিন দিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রম শিল দেব বিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী।'

১৩৮. গৌড় ক্রীড়ালতাসিস্তলিত খসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎ কাশ্মীর বীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন্ মালবানাং।
সীদৎসাবদ্যাচেদিঃ করু তরুষু মরুৎ সংজ্বরো গুর্জ্জারাণাং
তস্মাত্তস্যাং স যজ্ঞে নৃপ কুল তিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্ম রাজঃ'।।
Epigraphia Indica, Vol. I page 256

১৩৯. J.A.S.B. New Series Vol VII. Page 690

১৪০. তস্মাদ্বভূব সবিতু (বব.সু কোটি বর্ষী
কালে) ন চন্দ্র ইব বিগ্রহ পাল দেবঃ।
নেত্র-প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো (ভুবন) স্য তাপঃ।।
গৌড় লেখমালা, ৯৫ পৃষ্ঠা।

১৪১. গৌড় লেখমালা ১০০ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

১৪২. '(দেশে প্রাচি) প্রচুর-পয়সি স্বচ্ছ মাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপহত্যকা-চন্দনেষু।
কৃত্বা (সান্দ্রৈ স্তরু জড়তাং) শীকরৈ রভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়া (দ্রে) ঃ কটক মভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ'।।
গৌড় লেখমালা, ৯৫, ১০২ পৃষ্ঠা।

১৪৩. গৌড় লেখমালা-১০০ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

১৪৪. প্রবাসী ১৩২১, কার্ত্তিক ৪৬ পষ্ঠা।

১৪৫. 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পবম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপাল দেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে... সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিন ১৪।
--Bendall, Catalogue of the Sanscrit manuscripts in the british Museum, p 232, Journal of the Royal Asiatic Society, 1910 Page 151.

১৪৬. 'হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহু দর্পা-
দনধি কৃত বিলুপ্তং বাজ্য মাসাদা পিত্র্যং।
নিহিত চরণ পদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি
তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপাল দেবঃ।।' গৌড় লেখমালা, ৯৫, ১০০ পৃষ্ঠা।

১৪৭. প্রবাসী ১৩২১, কার্ত্তিক ৪৬ পৃষ্ঠা।

১৪৮ Mss Pal Kings of Bengal by R D Banerjee.

১৪৯. Dacca Review May 1914 page 58 plate
এই বিষ্ণুমূর্ত্তীটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদেব পুরাতত্ত্ব সমিতিব সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি. এ. মহাশয আবিষ্কাব কবিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম. এ মহাশয়ের সহায়তায় পঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশীল এম এ, মহাশয উক্ত পাঠেব কোন কোন ত্রুটি প্রদর্শন কবিযা ঢাকা বিভিউ পত্রিকায একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং বাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহাব পূর্ব পাঠের স্থান বিশেষ পরিবর্তন কবিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধেব অবতারণা করেন।

১৫০. 'তন্নন্দন শ্চন্দন বাবি-হাবি
কীর্ত্তি প্রভানন্দিত বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশ-মৌলিঃ শিববদ্বভূব'

১৫১. গৌড় লেখমালা, ১৫৬ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

১৫২. রামচরিত ১/২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭ টীকা।

১৫৩ মহীপালদেবের বাণগড় লিপি-গৌড় লেখমালা, ৯৭ পৃষ্ঠা।
১৫৪. বালাদিত্য প্রস্তর লিপি-গৌড় লেখমালা, ১০২ পৃষ্ঠা।
১৫৫. Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. III, P 122 No 9
১৫৬. Indian Antiquary Vol. XIV Page 165 & note 17.
১৫৭. সারনাথ লিপি-গৌড় লেখমালা, ১০৪-১০৮ পৃষ্ঠা।
১৫৮. Indian Antiquary Vol. IV Page 166.
১৫৯ বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৭ পৃষ্ঠা।
১৬০. গৌড় রাজমালা, ৪১, ৪৩ পৃষ্ঠা।
১৬১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা।
১৬২ বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৮ পৃষ্ঠা।
১৬৩. শ্রীবিদ্যাধরদেব কার্য্যনিরতঃ শ্রীরাজপালং হঠাৎ
কন্টাস্থিচ্ছিদনেক বাণ নিবহৈ হত্বা মহত্যাহবে।
ডিংডীরাবলি চংদ্রমংডল মিলন্মুক্তা কলাপোজ্জলৈ
সৈত্রলোক্যং সকলং যসোভিবচলৈ র্যোজশ্রমাপূরয়ৎ'।।
দুবকুণ্ডে আবিষ্কৃত বিক্রমসিংহের শিলালিপি।
১৬৪. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণের পুষ্পিকায় লিখিত আছে, 'সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্ গাঙ্গেয় দেব ভূজ্যমান তীরভুক্তৌ কল্যাণ বিজয় রাজ্যে নেপাল দেশীয় শ্রীভাঙ্কু শালিক শ্রী আনন্দস্য পটকাবস্থিত (কায়স্থ) পণ্ডিত শ্রীশ্রীকুরস্যাত্মজ শ্রী গোপতিনা লেখিদম্। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXII 1903, pt IP 18) সুতরাং মহীপাল দেবের রাজ্যকালে ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সোম বংশোদ্ভব গাঙ্গেয় দেব যে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া মথিলা অধিকার করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বেণ্ডল এই গাঙ্গেয় দেবকে চেদির কলচুরি বংশীয় গাঙ্গেয় দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ্র বলেন, 'ফরাসী পণ্ডিত লেভি স্বরচিত নেপালের ইতিহাস (Levis Le Nepal, Vol. II P 202 note) বেণ্ডলের উদ্ধৃত পাঠের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেণ্ডলের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেন নাই। 'গৌড়ধ্বজ' বা গৌড়রাজ্যের পতাকা অর্থে গৌড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে, চেদির কলচুরি বংশীয় কোনও রাজা কর্তৃক কখনও গৌরাধিপ উপাধি ধারণের প্রমাণ বিদ্যমান নাই। চেদিরাজ গাঙ্গেয় দেবের সময়ে মগধ যে গৌড়াধিপ মহীপালের পদানত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী জেজাভুক্তি (বুন্দেল খণ্ড) চন্দেল্ল রাজগণের অধিকৃত ছিল। সুতরাং মগধও জেজাভুক্তি ডিঙ্গাইয়া, চেদিরাজের পক্ষে মিথিলায় কল্যাণ বিজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। নেপালী লেখক কর্তৃক উল্লিখিত এই সোমবংশীয় গাঙ্গেয় দেব হয়ত মিথিলার এক জন সামন্ত নরপাল ছিলেন' (গৌড়রাজমালা ৪২ পৃষ্ঠা)। রাখালবাবু কোনও যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া এই আপত্তিকে অযথা বলিয়া বেণ্ডলের মতানুসরণ করিয়াছেন।
১৬৫ গৌড় রাজমালা' ৪১ ৪২ পৃষ্ঠা।
১৬৬. বারভূঞা শ্রী আনন্দনাথ রায় প্রণীত ১১ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়

চন্দ্র রাজগণ

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অভিনব আবিষ্কারের আলোকপাত ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবে না। পুনঃপুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ফলে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পরহস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও প্রথম মহীপালের অদৃষ্টে অধিক দিন অখণ্ড পাল-সাম্রাজ্য-সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সমর-বিজয়-যাত্রার সুযোগেই সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রীচন্দ্র হরিকেল বা পূর্ব্বঙ্গ অধিকার করিয়া পালরাজগণের সংশ্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালরাজগণের রাজমুদ্রা। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।

ইদিলপুর ও রামপাল লিপি :

ইদিলপুরে এবং রামপালে শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামপাল লিপি (শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন) এবং ইদিলপুরের তাম্রশাসন হইতে মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র দেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। স্বর্গীয় বন্ধুবর গঙ্গা মোহন লস্কর এম. এ ইদিলপুর শাসনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে. টি রেঙ্কিন মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের কোনও একটি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। গঙ্গামোহন উহার ছাপমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মূল তাম্রশাসন খানি বহু চেষ্টায়ও হস্তগত করিতে পারেন নাই।

রামপাল-লিপির উদ্ধার কর্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ। ইহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই প্রশস্তির বিবরণে উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কর্তৃক ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যার সাহিত্যে তাম্রফলকের আলোক-চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই উভয় লিপিতে এই বৌদ্ধ নৃপতিগণের যেরূপ বংশলতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

ধর্ম-চক্র-মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম্রশাসনই বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রামপাল-লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 'চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদ-পীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ নবপ্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও তাম্রপট্টে ইহার নাম পঠিত হইত। যে ভগবান অমৃতরশ্মি (চন্দ্রমা) ভক্তিবশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক[১] অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলজাত বলিয়াই যেন পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক অমাবস্যা রজনীতে সুবর্ণচন্দ্রের মাতা গর্ভাবস্থায় স্পৃসাবশত উদয়িচন্দ্রবিম্ব দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে সুবর্ণনির্মিত চন্দ্র দ্বারা স্বামী কর্তৃক পরিতোষিত হইয়াছিলেন, এজন্য লোকে (তাহার পুত্রকে) সুবর্ণচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত। '(মাতৃ-পিতৃ) উভয়কুল পাবন, (সুবর্ণচন্দ্রের) পুত্রের অপবাদ-ভীরু গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের রাজচিহ্নসূচক পুত্র যে রাজ-লক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজ্যলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা নাম্নী কাঞ্চনকান্তি কান্তার গর্ভে রাজযোগ মুহূর্তে শ্রীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজাকে একাতপত্র সুশোভিত করিয়া অরিগণকে কারানিবদ্ধ করিয়া, স্বীয় যশসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়াছিলেন।'[২]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন, 'ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্যাকে রাজকবি প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, মহিষী বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'নৃপতি' মাত্র উপাধি দর্শনে, মনে হয়, তিনি কোনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতে জ্যোতিষীগণ তাঁহার জন্মসময়ে সূচিত করিয়াছিলেন।'...'বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কি না, তাহা বর্তমান অবস্থায় (অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়) নিঃসন্দেহে বলা যায়না'।

'এখন জিজ্ঞাস্য-কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন -কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, 'তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ নরপতির (বা নরপতিগণের) রাজপতন সংঘটিত হইয়াছিল? লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের 'ত' 'ন' ও 'ম' বর্মবংশীয় ভোজবর্মদেবের বেলাবলিপি ও হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির 'ত' 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'য' কিছু বেশি আধুনিক। 'ব' বিজয়সেনের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাবলিপিতে ও ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে অবগ্রহ চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্বে নির্দেশ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেন দেবের বিক্রমপুর অধিকার করিবার পূর্বে এবং বর্মরাজ হরিবর্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য

সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * *ভোজবর্মদেব এবং তৎপরবর্তী বর্মরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপাল দেবের তনুত্যাগের পর তৎপুত্র কুমারপালদেব বরেন্দ্রভূমিতে (রামাবতী নগর হইতে) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমারপাল দেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘট্টিত হইয়া আসিতেছিল। কুমার পাল দেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, 'বৈদ্যদেবই অনুত্তরবঙ্গে' অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে নৌবল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্তৃক এই দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহবহ্নি নির্বাপিত হইলেই হয়ত পালরাজ সর্বগুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্মরাজগণের দুর্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে রহিকেল (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্টভবদেবযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্মা বা তদাত্মজ (অজ্ঞাতনামা রাজার) অধিকার হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন কামরূপ বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্মরাজগণের দুর্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং 'পরমেশ্বর ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সর্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন, অথবা বর্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালন করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হওয়া থাকিবে। অপর দিকে এই সময়েই বিজয় সেন সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে এই বিজয়সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে।'

'সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপাল দেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম দেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন এবং কুমারপাল দেবের দক্ষিণ বাহুরূপী সচিব বৈদ্যদেব, তিগ্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বর্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে বর্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশশাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।'

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলেখের পাঠোদ্ধারকারী উহার লেখমালা দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১ম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত রামপাল লিপির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে, সুতরাং অক্ষরতত্ত্বের হিসাবে রামপাললিপিকে দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ না বলিয়া দশম বা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় এই লিপির কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামপাল লিপি বেলাব লিপির পূরবর্তী। বিশেষত ভোজবর্মদেবের বেলাব লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের পূর্বে বঙ্গে সামলবর্মা ও তাহার পিতা জাতবর্মা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালরাজগণের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে জাতবর্মার পূর্বেই পালরাজগণের অধিকার পূর্ববঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বর্মরাজগণের প্রবল শক্তি উপেক্ষা

করিয়া পালরাজগণের সামন্ত-রাজ রূপে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল শাসন করিবার সামর্থ্য পূর্ববর্তী চন্দ্ররাজগণের ছিল কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায় শ্রীচন্দ্রকে বর্মরাজগণের পূর্বে স্থাপিত না করিলে পালরাজগণের সামন্ত রাজারূপে চন্দ্ররাজগণকে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং রামপাল লিপির অষ্টম শ্লোকোল্লিখিত 'অরি' শব্দ দ্বারা বর্মবংশীয় কোনও নরপতি সূচিত হইতে পারে না।

'বিগ্রহপাল যখন অনধিকারীর হস্তে পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয়ত তিনি তদীয় চন্দ্ররাজগণের আতিথ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন'। চন্দ্ররাজগণেরই উচ্চাভিলাষ ছিল। পালরাজগণের দুর্বলতার বিষয় তাঁহারা উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং মহীপাল যখন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছিলেন তখন শ্রীচন্দ্রের উচ্চাভিলাষ পূরণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

দুর্লভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে—

'সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।।'

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে মাণিকচন্দ্রের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত হইতে পারে।

সুবর্ণচন্দ্র
↓
ধাড়িচন্দ্র
↓
মাণিকচন্দ্র
↓
গোবিন্দচন্দ্র

গোবিন্দচন্দ্র বনাম গোবিন্দচন্দ্র :

কেহ কেহ উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে রামপাল ও ইদিলপুর লিপির সুবর্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র গীতের সুবর্ণচন্দ্র এই উভয়ের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রামপাল লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল অনুমান করিতে হয়। আবার ময়নামতীর গানে ময়নামতী তিলোকচাঁদের (ত্রৈলোক্যচন্দ্র?) কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র অভিন্ন হইলে মাণিকচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র না হইয়া জামাতা-রূপেই পরিচিত হইয়া পড়েন। ধাড়িচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামান্তর হইলে রামপাল লিপির চন্দ্ররাজগণ এবং ময়নাবতীর গানের গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় :
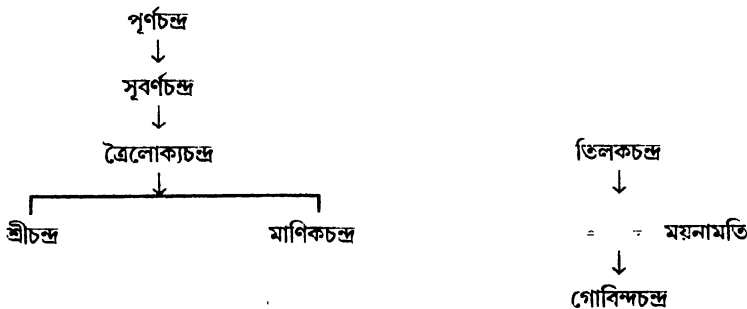
উপরোক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে এবং মাণিকচন্দ্র-তনয় গোবিন্দচন্দ্র তিরুমলয় শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইলে, বলিতে হয় যে, শ্রীচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের পরিত্যক্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং সেজন্যই রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের অধিপতি দেখিয়াছিলেন। আবার ময়নামতীর পিতা তিলোকচাঁদ এবং শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্য চন্দ্র অভিন্ন হইলে ময়নামতীকে শ্রীচন্দ্রের ভগিনী এবং মাণিকচন্দ্রকে ভিন্নবংশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে এই উভয় বংশলতা আবার নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে—
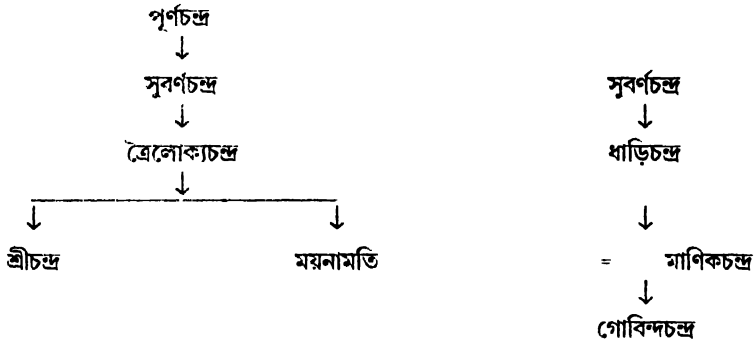
এবং শ্রীচন্দ্রকে অপুত্রক বলিয়া নির্দেশ করিয়া গোবিন্দ্রচন্দ্রকে মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, এবং ময়নামতীর পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া যে ময়নামতীর গানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, তিলকচাঁদই রামপাল লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্র কিনা, অথবা এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বয় পরস্পরবিরোধী, সুতরাং উহার একটি সত্য হইলে অপরটি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। বর্তমান সময়ে এমন কোনও প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা ময়নামতীর গানের তিলকচাঁদের সহিত রামপাল-লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, ধাড়িচন্দ্রের সহিত ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, অথবা গোবিন্দ্রচন্দ্র গীতের সুবর্ণচন্দ্রের সহিত রাম-পাল-লিপির সুবর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র নামের সামঞ্জস্য দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করা কখনও সমীচীন নহে।

পরকেশরী বর্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেব ১০১২ খ্রিষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিরুমলয় পর্বত-লিপি তদীয় রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে বা ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয় পর্বত গাত্রস্থিত তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে -

রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় :

"পরকেশরী বর্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেবের (রাজত্বের) দ্বাদশ বৎসরে-যিনি তাহার মহান্ সমরপটু সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত) দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন,-দুর্গম ওড়ডবিষয়, (যাহা তিনি) প্রবলযুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন,) মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে অক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কোনো বিরাম নাই, এবং গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন ," কর্ণভূষণ, চর্মপাদুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র

হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, যিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করি সমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রত্ন সম্পন্ন উত্তির লাড়ম্ ; বালুকাময় তীর্থ ধৌত কারিনী গঙ্গা।

উক্ত শিলালেখে যে সমুদয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ওড়্ড বিষয়—উড়িষ্যা। বহু তাম্রশাসনাদিতে ওড্রবিষয়ের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ওড়্ডবিষয় এবং ওড্রবিষয় সম্ভবত অভিন্ন।

কোশল-নাড়ু—কোশলনাড় বা দক্ষিণ কোশল (সম্বলপুর ও উড়িষ্যার গড়জাত স্থান)।

তন্দবুত্তি—দণ্ডভুক্তির বিকৃতিতে তন্দবুত্তি হইয়াছে। রামচরিতে রামপালের সামন্তচক্র মধ্যে দণ্ডভুক্তি-পতি-জয়সিংহের নাম আছে'। সম্ভবত মেদিনীপুর জেলাস্থিত দান্তন বা দাঁতগড় প্রাচীন তন্দবুত্তির রাজধানীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে কেহ কেহ মগধের অন্তর্গত উদন্তপুর বিহার হইতে পারে না। রাজেন্দ্রচোল উত্তর রাঢ়ের গঙ্গাতীর পর্যন্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি যে গঙ্গা উত্তরণপূর্বক অপর তীরেও গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তক্কণলাড়ম্-দক্ষিণরাঢ়। রায়বাহাদুর বেঙ্কয় এবং ডাক্তার হুল্‌জ্ "তক্কম্ লাড়ম্" দক্ষিণবিরাট বা দক্ষিণবেরার অর্থে এবং "উত্তিরলাড়ম্" উত্তরবেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওড়্ড বিষয়, বঙ্গালদেশ এবং গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া "লাড়"কে রাঢ় অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণরাঢের রণশূরকে পরাজিত করিয়াই বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

উত্তিরলাড়ম্-উত্তররাঢ়। কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ বিরাট অভিযান, তথা হইতে যুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর বিরাটে গমন এবং তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তক্কণলাড়ম্ এবং উত্তিরলাড়ম্, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

বঙ্গালদেশ-পূর্ববঙ্গ।

তিরুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি উড়িষ্যা, মেদিনীপুর ও দক্ষিণরাঢ় হইয়া বঙ্গাল দেশে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উত্তর রাঢ়ের মহীপালের সহিত সম্মুখযুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্বেই হউক আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত, বিবেচনা না করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চোলরাজ গঙ্গা পার হইতে সাহসী হন নাই, উত্তররাঢ় হইতেই তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পূর্ববঙ্গেই রাজত্ব করিতেন। সুতরাং গোবিন্দ চন্দ্রগীতের এবং ময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। শেষোক্ত গোবিন্দচন্দ্র "বঙ্গের গোসাঞিং" "বঙ্গাধিকারী" "বঙ্গের ঈশ্বর", "বঙ্গের মহীপাল" বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার রাজ যোলদণ্ডের পথ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষত গোবিন্দচন্দ্র হাড়িসিদ্ধাকে গুরু করিবার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, রাণী ময়নামতী পুত্রকে বলিতেছেন :-"এ দেশী আ হাড়ি নঅ বঙ্গদেশে ঘর"। সুতরাং এই গোবিন্দচন্দ্র যে বঙ্গালদেশে বা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষত যে গোবিন্দচন্দ্র মাতার উপদেশে রাজ্যপরিত্যাগ পূর্বক দীর্ঘজীবন কামনায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হাড়িসিদ্ধার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি যে কাঞ্চিপতি দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতির সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রাজ্য পাটিকানগরের ও তৎসংলগ্ন কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই।

সুরেশ্বর প্রণীত 'শব্দ প্রদীপের' ব্যঞ্জনাদিকাণ্ডে লিখিত আছে ঃ-

'শ্রীমদ্‌গোবিন্দচন্দ্রস্য রাজ্ঞো বৈদ্যগণাগ্রণী ঃ।
করণাং দয়জঃ (করণান্বয়জঃ?) শ্রীমানভূদ্‌ দেবগণঃ সুধীঃ।।
তস্মাদজায়ত সুধাকর কান্তকীর্ত্তিঃ।
শ্রীমান যশোধন ইতি প্রথিতস্তনুজঃ।
তস্মাত্মজঃ সকল বৈদ্যকসারবেত্তা
ভদ্রেশ্বরঃ কবিকদম্বক চক্রবর্তী।।
স্বৈরং নিজ গুণোৎকর্ষৈঃ শ্রীমদ্বংগেশ্বরস্য যঃ।
রাজ্যংপ্রাপ্য মলংচক্রে রামপালস্য ভূপতে।।
তস্যাত্মজঃ পরম সজ্জনকৈ রবেন্দুঃ
শ্রীমান্‌ সুরেশ্বর ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং।
পাদীশ্বরস্য ভূজনির্জিত বীর বৈরি
শ্রীভীমপাল নৃপতে ভিষগন্তরংগ।'

ইহা হইতে জানা যায় যে, পাদিশ্বর ভীমপালের 'ভিষগান্তরঙ্গ' সুরেশ্বরের পিতা 'সকল বৈদ্যকসারবেত্তা' 'কবি কদম্বক চক্রবর্তী' ভদ্রেশ্বর বঙ্গরাজ রামপালের সভাকবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন; ভদ্রেশ্বরজনক 'সুধাকর কান্তকীর্তি' যশোধন। এই যশোধনের পিতা সুধী দেবগণ, রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় 'বৈদ্যগণাগ্রণী' ছিলেন। যিনি রামপালদেবের সভাকবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার পিতামহ যে তিরুমলয়ের শিলালিপিতে উল্লিখিত বাঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভার বৈদ্যগণাগ্রণী ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় এই পাদিশ্বর ভীমপালের ভিষগান্তরঙ্গ সুরেশ্বরকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে প্রাদুর্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[৯]। সুতরাং সুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্র রাজার বৈদ্যগণাগ্রণী দেবগণকে দশম শতাব্দীর শেষপাদে, বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্থাপিত করা যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গোবিন্দচন্দ্রকে মহীপাল এবং রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[১০]। কিন্তু তিনি ময়নামতীর গানের এবং গোবিন্দচন্দ্র গীতের গোবিন্দচন্দ্রকেও রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

১. বুদ্ধদেব 'শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আর্যশুর রচিত জাতক মালার ৬ষ্ঠ স্তবকে বর্ণিত আছে -

"সংপূর্ণেহদ্যাপি তদিদং শশবিম্বং নিশাকরে।
ছায়াময়মিবাদর্শে রাজতে দিবি রাজতে।।
ততঃ প্রভৃতিলোকেন কুমুদাকর হাসনঃ
ক্ষণ দতিলকশ্চন্দ্রঃ শশাঙ্ক ইতি কীর্ত্যতে।।"

আর্যশুর রচিত জাতক মালা ৬/৩৭-৩৮

২. শ্রীচন্দ্রেব তাম্রশাসন (২-২) শ্লোক, সাহিত্য ২৪ শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
৩. Epig. Indica Vol IX pp 232 233.
গৌড়রাজ মালা ৩৯ পৃষ্ঠা।
৪. রামচরিত ২/৫ টীকা।
৫. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III p.10.
৬. Pal Kings of Bengal by Babu R D Banerjee.

৭. Pal Kings of Bengal by R. D. Banerjee.

৮. India Office Catalogue 2739. Vol v.

৯. Chronology of Indian Authors—J.A. S. B. 1907 Page 20.

১০. 'The grandfather of Bhadrasvara, Devagana by name, was Court physician of that Govinda Chandra, contemporary of mohipala and Rajendra Coda, so well known in Bengali Songs.'

Memoirs A. S B. Vol. III. p. 15.

নবম অধ্যায়

বর্মরাজগণ
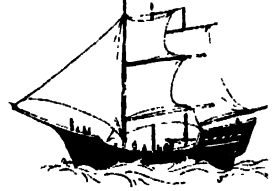
হরি বর্মা :

চন্দ্ররাজগণের শাসন-পাট উন্মূলিত হইবার পরেই সম্ভবত বঙ্গে বর্মরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বেলাবলিপি, ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি, হরিবর্ম দেবের বেজনীসার-তাম্রলেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গাধিপতি বর্ম-বংশীয় নরপালগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হরিবর্মার ১৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একখানি পুঁথি, তদীয় ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত বিমলপ্রভা নামক লঘুকাল-চক্রযান টীকা, ভুবনেশ্বর-মন্দির গাত্রে-উৎকীর্ণ ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তি, হরিবর্মার বেজনীসার লিপি, রাঘবেন্দ্র কবিশেখর-বিরচিত ভবভূমিবার্তা, প্রভৃতিতে হরিবর্মা নামক জনৈক বঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেলাব লিপির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধ্যেও এক হরিবর্মার আভাস পাওয়া যায়; এবং পঞ্চম শ্লোকোল্লিখিত 'হরের্বান্ধবাঃ' এই কথা কয়টিতে আভাস প্রাপ্ত হরিবর্মার সহিত ভোজবর্মার জ্ঞাতিত্বের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন[১]।

বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'তিনিও (যযাতি) যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই হরিও ইহলোকে গোপীশত কেলিকার মহাভারত সূত্রধর পূজ্য পুরুষ অংশাবতার কৃষ্ণ বলিয়া ও অভিহিত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেই পুরুষের আবরণত্রয়ী (বেদ), হীনাও নহে এবং নগ্নাও নহে অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদই অবলম্বন, তিনি কখন বৈদিকাচার ছাড়া নহেন এবং নগ্ন বা বৌদ্ধ ক্ষপণকাদির মত অবৈদিকাচার সম্পন্নও ছিলেন না। ত্রয়ীবিদ্যায় এবং অদ্ভুত সমরক্রীড়ার আনন্দহেতু রোমোদ্গম দ্বারা বর্মিণঃ (বর্মাবৃত কলেবর বা বর্মা উপাধিধারী) হরির বান্ধব বা জ্ঞাতিবর্গ, 'বর্মণ', এই অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বহু যুগল ধারণ করিয়া সিংহ বিবর তুল্য সিংহপুর নামক স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন[২]।

'উক্ত তিনটি শ্লোক মধ্যে যাদববংশে বহু হরির জন্ম এবং হরির 'বর্মা' উপাধি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন বঙ্গাধিপ হরিবর্মাকেই ইঙ্গিত করিতেছেন। ভুবনেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির ১৬শ শ্লোকে হরিবর্মার 'ধর্মবিজয়ী' বিশেষণ দৃষ্ট হয়[৩]। তিনি ধর্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বিধর্মী দলন করিয়াছিলেন বলিয়া, হয়ত তিনিও কৃষ্ণাবতার বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন[৪]।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসারে হরিবর্মা ভোজবর্মার পরবর্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন[৫]। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় ও দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কে শিলালিপি অপেক্ষা ভবদেবের প্রশস্তি

প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম দেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন[৬]। বাস্তবিকপক্ষেও হরিবর্মাকে ভোজবর্মার পরে স্থাপন করা অসম্ভব।

হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্মা, হরিবর্মার পিতা এবং এই তাম্রশাসন হরি বর্মার ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেও হরিবর্মার সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং হরিবর্মার সময় নিরূপণার্থে বর্তমান সময়ে ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। ভবদেব কর্তৃক ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে তাঁহার মিত্র বাচস্পতি ভবদেবভট্টের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক উক্ত মন্দির গাত্রস্থিত প্রস্তর ফলকে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি নামে পরিচিত। এই প্রশস্তির পাঠ কাপ্তেন মার্শাল সাহেব কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে [৮], এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়ছেন[৯]। পরে ডাক্তার কিলহর্ণ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থেও উহা প্রকাশ করিয়াছেন[১০]। ভবদেব প্রশস্তির বাচস্পতি বাণীতে ভবদেব ভট্ট, হরি বর্মদেব ও তদীয় পুত্রের মন্ত্রণা-সচিব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন[১১]।

আবির্ভাবকাল :

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রশস্তি-রচয়িতা ও ভবদেব সখা বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া উহাকে একাদশ শতাব্দের শেষাংশে স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি বিচারসহ নহে। প্রশস্তি রচয়িতার নাম বাচস্পতি বলিয়াই যে তিনি বাচস্পতি মিশ্রর সহিত অভিন্ন হইবেন, তাহার কোনও কারণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র 'ন্যায় সূচি নিবন্ধ' নামে ন্যায় বার্তীক তাৎপর্য গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে 'বস্বঙ্ক বসু বৎসরে' বা ৮৯৮ শকাব্দে (৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) উহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল দশম শতাব্দীর (একাদশ শতাব্দীর নহে) শেষাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

অক্ষরানুশীলন-তত্ত্ব প্রমাণে ডাক্তার কিলহর্ণ এই প্রশস্তির অক্ষরগুলিকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়াছেন[১৪]। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহারথী ডাঃ কিলহর্ণের এবংবিধ উক্তি যে সমধিক মূল্যবান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শুধু অক্ষরানুশীলন তত্ত্বের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাম্রশাসন, শিলালিপি অথবা দলিলাদির সময় নিরূপণ করা, আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্বভারতীয় অক্ষরগুলির বিবর্তনের ক্রম আজ পর্যন্তও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত, অধীত এবং পর্যপেক্ষিত হয় নাই,- হইলেও, মধ্যযুগের অক্ষরগুলির আকৃতি, স্থান এবং কালানুসারে এরূপ ভাবে পরিবর্তীত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র উহা দ্বারাই দলিলাদির সময় নির্ধারণ করা অসম্ভব[১৫]।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী ভবদেবের আবির্ভাব কাল ১০১৬-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন[১৬]। কিন্তু তাঁহার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ভবদেবের আবির্ভাবকাল আরও সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে।

অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর ও ভবদেব :

বল্লাল-গুরু চাম্পাহাট্টীয় ধর্মাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধভট্ট বিরচিত 'কর্মোপদেশিনী পদ্ধতি' গ্রন্থে ভবদেব ভট্টের নাম উল্লিখিত হইয়াছে[১৭]। দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, বল্লাল সেন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নকালে তদীয় গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্ট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষণ সংবতের কাল-নির্ণয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বল্লাল সেন ১১১৯

খ্রিষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনিরুদ্ধভট্টের আবির্ভাব কাল ধরা যাইতে পারে। ইহার পূর্বেই যে ভবদেব ভট্ট আর্বিভূত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনিরুদ্ধ ভট্টের 'কর্মোপদেশিনী পদ্ধতি ' নামক গ্রন্থে কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের সন্ধি বিগ্রহিক লক্ষ্মিধর ভট্টবিরচিত 'কল্পতরু' ('কৃত্য কল্পতরু') পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে[১৮]। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের ১১০৪-১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে[১৯]। সুতরাং অনিরুদ্ধ ভট্টকে ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা চলে না। ভবদেব ভট্ট ইহারও পূর্ববর্তী হইবেন সন্দেহ নাই।

ভবদেব এবং ভোজরাজ ও বিশ্বরূপ :

ভবদেব প্রণীত 'প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্' গ্রন্থে বিশ্বরূপের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা কালেও তিনি বঙ্গাধিপের সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন[২০]। হেমাদ্রিকৃত পরিশেষ খণ্ডে বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, ইনিই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দেবণ্ণ-বিরচিত ব্যবহারকাণ্ডেও এই বিশ্বরূপের উল্লেখ রহিয়াছে। বিশ্বরূপ, ধারেশ্বর বা ধারারাজ ভোজের পরবর্তী বলিয়া সুপরিচিত[২১]। উদয়পুর প্রশস্তি, নাগপুর-প্রশস্তি, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি ও রাসমালা[২২] একত্রে পাঠ করিলে অনুমতি হয় যে, কর্ণচেদি এবং গুর্জরাধিপতি প্রথম ভীম এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত সীমান্ত-রাজের সম্মিলিত শক্তি কর্তৃক ধারা রাজ্য আক্রান্ত হইলে ভোজরাজ এই ভীষণ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা এই সঙ্কট সময়েই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মেরুতুঙ্গের সার্দ্ধশত বৎসর পূর্বের রচিত হেমচন্দ্রের 'দ্বয়াশ্রয়' কাব্যে অথবা চেদিরাজগণের কোনও শিলালিপিতেই ভীম অথবা কর্ণদেব কর্তৃক একাদশ শতাব্দীর এই সুপ্রসিদ্ধ নৃপতির বিনাশের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না। ১০৭৮ শকাব্দে (১০২১ খ্রিষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ভোজরাজের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২৩] আলবেরুনি কর্তৃক 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে অর্থাৎ ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভোজরাজ, ধারা এবং মালবরাজ্য শাসন করিতেছিলেন[২৪]। ভোজরাজের 'রাজ মৃগাঙ্ক করণ' নামক জ্যোতিগ্রন্থ 'শাকো বেদর্তনন্দে' অর্থাৎ ৯৬৪ শকাব্দে বা ১০৪২-৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং ১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। আবার বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্গদেব চরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে :

> 'ভোজঃ ক্ষমাভৃৎ স খলু ন খলৈস্তস্য সাম্যং নরেন্দ্রৈ
> স্তৎ প্রত্যক্ষং কিমিতি ভবতা নাগতং হা হতাস্মি।
> যস্য দ্বারোড্ডমরশিখর ক্রোড় পারাবতানাং।
> নাদ ব্যাজাদিতি সকরুণং ব্যাজহারের ধারা'।

ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিহ্লন হয়ত ধারারাজ ভোজের মৃত্যুর জন্যই শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে উপরোক্ত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা ভোজরাজের মৃত্যু কল্পনা করা যায়না বলিয়া বুলার সাহেব অনুমান করেন। তিনি বলেন, হয়ত কোনও অনুল্লিখিত কারণে ভোজরাজের সন্দর্শন না পাইয়াই বিহ্লন এরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যভারত পরিভ্রমণকালে ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে ভোজরাজের মৃত্যু ১০৬২ খ্রিষ্টাব্দের পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে; কারণ এই সময়েই বিহ্লন কাশ্মীর হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন[২৫]। কিন্তু তাম্রশাসন দ্বারা বুলার সাহেবের অনুমান সমর্থন করা যায় না।

কারণ, উদয়পুর মন্দিরের প্রশস্তিতে ভোজরাজের পরবর্তী উদয়াদিত্যের সময় বিক্রম সম্বৎ ১১১৬ শক সম্বৎ ৯৮১ (১০৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[২৬]। আবার ধারারাজ জয়সিংহের ১১১২ বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ধারেশ্বর ভোজদেব এবং উদয়াদিত্যের মধ্যে জয়সিংহ নামক অপর একজন রাজার অস্তিত্ব উপলব্ধি

হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জয়সিংহই ভোজদেবের অব্যবহিত পরে এবং উদয়াদিত্যের পূর্বে ধারার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদেবকে ১১১২ বিক্রমসংবৎ বা ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ধারার সিংহাসনে রাখা চলে না। বিশ্বরূপ হয়ত এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণের বলে আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ভবদেব ভট্ট তদীয় প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্' গ্রন্থ ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পরেই এবং ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন।

প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ভবদেব :

কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল, দাহলাধিপতি কর্ণ চেদিকে রণে পরাজিত করিয়া কীর্তিবর্মার প্রহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অব্যবহিত পরে, গোপালের আদেশে উহা কীর্তিবর্মার সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল।[২৮]

উক্ত নাটকের দ্বিতীয় সর্গে বঙ্গীয় দার্শনিকগণকে মূর্তীমন্ত অহঙ্কার রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই নাটকের একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে[২৯] -

'অহংকার-'অহো মূর্খ বহুলং জগৎ। তথাহি--
নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো না শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নাহপি মহোদধেরধিকতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তু বিচারণা নৃপশ্রুভি স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে।।'

এখানে মীমাংসা-দর্শন এবং তৌতাতিতের উল্লেখ থাকায় ভবদেবপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'তৌতাতিকমততিলকম্' গ্রন্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন[৩০]। খ্রিষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দে প্রাদুর্ভূত রাজা কৃষ্ণরায়ের সমসাময়িক টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপও তদীয় 'চন্দ্রিকা' নামক টীকায় উপরোদ্ধৃত অংশের পাদদেশে লিখিয়াছেন[৩১]।—

'ভবদেববস্তুবনাথ বৎ শারিকনাথ মতানুবর্তী মহোদধিঃ চ্ছারিকনাথ প্রতিস্পর্দ্ধী ইদানীমাচার্যমতে ভবদেব মতস্য গুরুমতে ভবনাথ মত সৈব প্রাচুর্যমিতি গ্রন্থকারৈরনু ল্লিখিতমপি মতদ্বয়মস্মাভিরূৎকম্' (Nir-Sag-Press. Edi. Page 53).

সুতরাং, এস্থলে ভবদেবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলে বুঝা যাইতেছে যে প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হইবার পূর্বেই ভবদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত নাটক কীর্তিবর্মার রাজত্ব সময়ে রচিত হইয়াছিল। কীর্তিবর্মা ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন[৩২]। আবার তাঁহার ১১৫৪ বিক্রম সংবতে (১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) উৎকীর্ণলিপিও পাওয়া গিয়াছে[৩৩]। সুতরাং কীর্তিবর্মা যে ১০৫০-১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সময়ের মধ্যেই চেদিপতি কর্ণদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ণদেব ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সুতরাং ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যে তিনি কীর্তিবর্মার সেনাপতি গোপাল-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে এবং ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে ভবদেব ভট্ট বালবলভি ভুজঙ্গ, বঙ্গাধিপতি হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক ভবদেব যে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে এবং ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে হরিবর্মদেবের সচিব ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

বেলাব লিপির চতুদর্শ শ্লোকের পাদটীকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অলঙ্কাধিপ' শব্দটি রামকে লক্ষ করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে, এবং তদ্বারা

'রামপাল' নামক পাল বংশীয় নরপাল সূচিত হইয়া থাকিলে, এই শ্লোক আর hopelessly indistinct বলিয়া কথিত হইতে পারে না।' অধ্যাপক বসাক মহাশয় উক্ত শ্লোকে রামপালের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে ভোজবর্মাকে রামপালের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। রামপাল ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়া ভোজবর্মার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিবর্মা এবং তদীয় পুত্র হরিবর্মার রাজত্বকাল অনুমান করিয়া লইলেও ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পরেই হরিবর্মাকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিবর্মার সচিব 'সান্ধিবিগ্রহিক' ভবদেবভট্ট, ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং হরিবর্মার রাজ্যারম্ভকাল একাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে স্থাপন করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। ভবদেব হরিবর্মার রাজত্বের শেষাংশে তদীয় মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল 'বঙ্গাল' দেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চোল রাজের ১৩শ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই তাঁহার উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্লিট, সিউয়েল, ও ডাক্তার হুলজের গণনানুসারে অনুমান ১০১১/১২ খ্রিষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে অনুমিত হয় যে, ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই চোলরাজের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। সম্ভবত এই সময়েই হরিবর্মার পিতা জ্যোতিবর্মা পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যোতিবর্মার বিষয়ে অদ্যাবধি কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তিনি যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া হরিবর্মার রাজত্বকাল ১০২৫-১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

হরিবর্মা, 'নিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধানন্যবেচক্ষণ্য -বালভট্ট ভট্টাচার্য-গর্গ-বাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের'[৩৫] সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্বকার্য সুসম্পন্ন করিতেন। রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়েই ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্' গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "ইতি সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদ ঃ সমাপ্ত"। অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি রচিত হইবার বহু পূর্বেই তিনি বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ ভবদেব-প্রশস্তির বাচস্পতি-বাণীতে লিখিত হইয়াছে —

ভবদেব :

'যিনি ব্রহ্মাদ্বৈতবিদ্‌দিগের (অদ্বৈত বাদিগণের) উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যা সমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতাগুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিক দিগের প্রজ্ঞা খণ্ডনে পণ্ডিত,-ইনি পৃথিবী তলে সর্বজ্ঞের ন্যায় লীলা করিতেন। যিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত রূপ অর্ণবের পারদর্শী ফল সংহিতা সমূহে বিশ্বের অদ্ভুত প্রসবিতা নূতন হোরাশাস্ত্রের প্রণেতা ও প্রচারক হইয়া স্ফুটরূপে অপর বরাহ স্বরূপ হইয়াছিলেন। যিনি ধর্মশাস্ত্র পদবীতে সমুচিত প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া জীর্ণ নিবন্ধ সমুদয় অন্ধীকৃত করিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা দ্বারা মুনিদিগের ধর্ম গাথা সকল বিশদীকৃত করিয়া স্মার্তক্রিয়া বিষয়ের সংশয়রাশি ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইনি কুমারিল ভট্ট-কথিত নীতি অনুসারে মীমাংসা দর্শনের এক উপায় রচনা করেন, যাহাতে সূর্যকিরণ স্বরূপ সহস্র সহস্র ন্যায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তমোভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিক কি, ইনি সামবেদের সীমাভাগে, সমস্ত কবিকলাতে, সমুদয় আগমে এবং আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেই কৃতবিদ্য হইয়া জগতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। যাঁহার 'বাল-বলভী' ভুজঙ্গ' এই নামটি কাহার নিকট না আদৃত হইয়াছে? মীমাংসা কর্তৃকও ঐ নামটি সপুলকে আকর্ণিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে এবং উদ্‌গীত হইয়াছে'[৩৬]।

ভবদেবের কীর্তি :

'যিনি রাঢ়দেশে জলশূন্য জঙ্গলপথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমাস্থান সমূহে শ্রান্তপান্থ গণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্যন্ত ভূভাগে স্নাত কুলাঙ্গনাগণের মুখপথের প্রতিবিম্বে-বিমুগ্ধ মধুপীগণ কর্তৃক শূন্য-নলিনী বনে একটি জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (তিনি) ভবসমুদ্র পার হইবার সেতুর ন্যায় ধরাপীঠ প্রসাধনকারী ভগবান নারায়ণকে শিলারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, উহা প্রাচীদিগের বদনেন্দুর নীলবর্ণ তিলক, ভূমির লীলাবতংশ উৎপল ও সর্বসঙ্কল্পপ্রদ ভূতলের পারিজাত বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি এই প্রাসাদকে কৈলাস পর্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বর্দ্ধিতা-শ্রী এবং শ্রীবৎস লাঞ্ছন হরির মত শ্রীমান ও চক্রচিহ্ন পরিশোভিত করিয়াছিলেন; যে (প্রাসাদ) বৈজয়ন্ত (ইন্দ্রপুরী) জয় করিয়া আকাশ মার্গে বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যাহার শ্রী সন্দর্শন করিয়া মহাদেব কৈলাসেও অভিলাষ করেন না। তিনি সেই প্রাসাদের গর্ভ গৃহ মধ্যে ব্রহ্মার মুখ সমূহে বেদ বিদ্যার ন্যায় ভগবান বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্তী সংস্থাপন করেন। তিনি এই হরি মেধাকে পৃথিবীতে বিশ্রামার্থ আগত বিদ্যাধরী সদৃশ একশত মৃগনয়না ললনা দান করিয়াছিলেন। উহারা (ভগবান) ত্রিনয়ন কর্তৃক ভস্মীকৃত মদনকেও কটাক্ষপাতে উজ্জীবিত করিত এবং নানাবিধ সঙ্গীত কেলি ও শোভার আকর হইয়া কামিজনের একমাত্র সঙ্গমস্থান হইয়াছিল। তিনি সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকত মণির ন্যায় নির্মল সুচ্ছায়-জলশালিনী একটি বাটি প্রস্তুত করেন, উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিক রূপে শোভিত হইয়াছিল। তিনি স্বর্গ শোভাহারী সেই প্রাসাদের সমীপে সংসারের সারস্বরূপ একটি উদ্যান রত্ন প্রস্তুত করেন, উহা সকল মনুষ্যের নেত্র আনন্দ ক্ষরণের পাত্র, পরম রতি-উৎপাদক এবং ত্রিভুবন জয়ে ক্লান্ত অনঙ্গের বিশ্রাম স্থান'[৩৭]।

ভবদেবের পূর্বপুরুষ :

ভবদেব-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বাল বলভীভুজঙ্গ ভবদেবের পিতামহ আদিদেব 'বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মীর বিশ্রাম সচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অব্যর্থ-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন[৩৮]। আদিদেবের পুত্র (ভবদেবের পিতা) গোবর্ধন, বীরস্থলী মধ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ভুজলীলা দ্বারা বসুমতী বর্দ্ধিত করিয়া (রাজ্য বিস্তার করিয়া) স্বীয় গোবর্ধন নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন'[৩৯]। আদিদেব যে বঙ্গরাজের সচিব ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তিনি সম্ভবত বঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র। গোবর্ধন হয়ত জ্যোতিবর্মা বা হরিবর্মার একজন সেনানায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করায় মন্ত্রীপদে উন্নীর্ত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর পর ভবদেব বাল বলভীভুজঙ্গ হরিবর্মার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং হরিবর্মার মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুল্লিখিতনামা পুত্রের সময়েও সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভবদেব কেবলমাত্র ব্রহ্মাদ্বৈত বিদ্গণের উদাহরণ স্থান, উদ্ভুত বিদ্যাসমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতা গুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধাম্বুধির অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিক গণের প্রজ্ঞাখণ্ডনে পণ্ডিত ছিলেন না, তদীয় 'উজ্জ্বল-অসিযুক্ত-ভয়ঙ্কর ভুজলতার ভীষণ-রণক্রীড়া প্রভাবে রণস্থল রিপুরুধির-চর্চিত হইত'[৪০]।

প্রশস্তি রচনাকালে যে ভবদেব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা প্রশস্তি পাঠেই অনুমিত হইয়া থাকে। সম্ভবত তৎকালে তিনি হরিবর্মার অনামক পুত্রের সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কারণ, বাচস্পতি-বাণীতে হরিবর্মার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভবদেব তৎকালে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিলে উহাতে স্বীয় প্রভুর কীর্তি ঘোষণা না করিলেও তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় পুত্র পিতার উপযুক্ত ছিলেন না, সুতরাং অনুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; খুব সম্ভব, ইনি

পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই বজ্রবর্মা কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহার কিয়ৎকাল পরেই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল।

হরিবর্মার কীর্তি :

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের 'ভব ভূমি বার্তা' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে[৪১] ঃ-'মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা নগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবাল ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত। তিনি জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্মীগণের 'শর্মসংমর্দনকারী' ছিলেন। তাহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব ও গৌরব খর্ব হইয়াছিল। তিনি একাম্র কাননে হরি, হর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব পতাকা-পরিশোভিত, সুরভি কুসুম সমূহাদির সৌন্দর্য্য নন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যান সমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতায়, কমল-কহ্লার ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবর সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিখিল শাস্ত্রাস্ত্র-নিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধ অনন্য-বিচক্ষণ বালভট্ট-ভট্টাচার্য-গর্গ-বাচষ্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্তসচিবের সাহায্যে ইনি স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্বকার্য সুসম্পন্ন করিতেন এবং বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ সন্দর্শনার্থ-সমুদ্যত স্বীয় জননীর স্বচ্ছন্দগমন এজন্য একটি প্রশস্ত বর্ত্ম প্রবর্তীত করিয়াছিলেন। প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত সুনীতির অনুসরণ করিয়া ইনি সর্ববিষয়ে শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি অশেষ জনপদে তাঁহার অদ্ভুত কর্মকাহিনী বিঘোষিত। ইহার কর্ম সকল ধর্মানুগত, কীর্তিকলাপ দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। পরম দয়ালু এই নরপতি ব্রাহ্মণদিগকে ভুসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।' প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,- 'ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে বাচষ্পতি মিশ্র রচিত ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেব "ধর্মবিজয়ী" বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বৈদিক বিদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়কে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা ভবভূমিবার্তা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। হরিবর্মা অস্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হরিবর্ম দেবের সময়ে দক্ষিণাপথ হইতে জৈন বৌদ্ধাদির আক্রমণ চলিতেছিল। হরিবর্মদেবের হস্তে তাঁহারা পরাজিত হন। খুব সম্ভব এই সময়েই হরিবর্মা কলিঙ্গ পর্যন্ত অধিকার করেন এবং ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ১০৮টি দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্তি রক্ষা করিয়াছিলেন।'

তাম্রশাসনাদির প্রমাণে কবিশেখরের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্মার নির্মিত রাস্তা।

হরিবর্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।-

(ক) মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম-পাদানুধ্যাত পরম বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্মদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

(খ) পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চকুসুম শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের বড় পর্বত গ্রামস্থিত স্বশ্রীত্রিষষ্ট্যধিক ষড়দ্রোন্যাপেতহলভূমি বাৎস্যাগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্লুবৎ-ঔর্ব-জামদগ্ন্য-প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্টপুত্র বেদগর্ভ শর্মার পৌত্র, ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র, ভট্টপুত্র বেদার্থ বাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন :

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্তা' হইতে জানা যায় যে, 'যবনাগম' 'বাজ্যনাশ', 'দাবানল'

ও 'দস্যুভয়' প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া গঙ্গাগতি-প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। 'তিনি বঙ্গে আসিয়া সর্বপ্রথমে নকুলেশ সংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, গঙ্গা ও মহাপীঠগতা দেবীর দর্শন ও পূজা করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা দেখিলেন, বঙ্গের পাদপশ্রেণি ফলফুলে লতায় পাতায় পরিশোভিত, নানাজাতীয় বিহঙ্গম কুলকুজিত, ভূমি সকল শস্যে পরিপূর্ণ এবং সুমিষ্ট সলিল সকল স্থানেই সুলভ। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা বহুদিন পরে যশোহর নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান পূর্বক তথাকার নানাপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন-তথায় পথে সর্প, বনে ব্যাঘ্র, জলে কুম্ভীর, স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের চিত্ত বক্র এবং নদী সকল লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ। এই সকল দোষ দেখিয়া শুনিয়া গঙ্গাগতি তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নানা বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া তথা হইতে পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কোটালিপাড়স্থান নিকটবর্তী হইল। তিনি দেখিলেন-স্থানটি বহুশস্যে পরিপূর্ণ ও অতীব রমনীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় নাই। স্থানীয় বৃক্ষ সকল ফলভারে বিনম্র। বানর, শূকর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুষ্ট বন্যজন্তুগণের উপদ্রব ও দস্যু তস্করাদির ভয় তথায় নাই। সাধু সন্ন্যাসীগণও সেখানে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহারা সেইস্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালপাড়ের মধ্যে যেস্থান দিয়া ঘর্ঘর নদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্বদিকে এক অত্যুন্নত ভূভাগে তখন তাঁহারা ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া নয়খানি পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। পরে কোনও একসময়ে তিনি রাজ সভাপতি বাচস্পতির সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাপতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীবাদ বাক্যে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিলেন, এবং স্বয়ং ও তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্মানিত হইলেন। অনন্তর তিনি বাচস্পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা হরিবর্ম দেবও এই সময়ে গঙ্গাগতিকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; অভিলাষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি যথাযোগ্য সমস্তই আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গঙ্গাগতি রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,-রাজন্ আমার নাম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র। আমি আপনার অধিকৃত কোটালিপাড় নামক স্থানে বাস করিতেছি। সম্প্রতি আমি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছি। আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমি আপনার অধিকৃত স্থানে বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি যথাযোগ্য কর নির্দেশপূর্বক পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে তথায় বাস করিতে আমাদিগের আর কোনও ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজা এইকথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিব না। অতএব আপনার বাসস্থান এবং তাহার চতুষ্পার্শে যে সকল ভূমি আছে, আপনি কর ব্যতীত বৃত্তিস্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন। গঙ্গাগতি রাজার কথায় তুষ্ট হইয়া তথা হইতে পুনরায় কোটালিপাড়স্থ স্বগৃহে আগমন করিলেন।' কবিশেখরের বর্ণনা আড়ম্বরপূর্ণ বা অতিরঞ্জিত নহে। তিনি তদীয় পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে-বংশপরম্পরাগত ক্রমে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, সুলতান মহমুদ ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট্ট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হন। মহমুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাত বংশীয় অর্জুন রাজ্যপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-বাইহাকী' নামক পারস্যভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে[৪৩] মামুদের পুত্র মাসুদ যখন গজনীর

অধীশ্বর, তখন (১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) লাহোরের শাসনকর্তা আহম্মদ নিয়লতিগীন্ বারাণসী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।' তিনি সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া, বামতীর দিয়া চলিয়া গিয়া, হঠাৎ বেনারস নামক শহরে উপনীত হইলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাপড়ের বাজার, সুগন্ধি দ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তার বাজার লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। সকলেই সোনা, রূপা, আতর এবং মণিমুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।' সম্ভবত এই সমুদয় রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েই গঙ্গাগতি প্রাণ ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য সপরিবারে বঙ্গে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

চালুক্য বিক্রমাদিত্য ও হরিবর্মা :

কল্যাণের চালুক্য-রাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে পিতার আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিহ্লন 'বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে' এই দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :-

'গায়ন্তি স্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্র-ঘোষ-মুষিত-প্রত্যুষ নিদ্রারসাঃ
পূর্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ।।
৩।৭৪।।

'সূর্যের রথচক্রের শব্দে প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপতির বিপুল প্রতাপ উন্মলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষার শুভ্র যশ গান করিয়াছিল'[৪৪]।

১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হরিবর্মদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে এই বঙ্গরাজের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপাধিপতিকে পরাজিত করিলেও বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই, অথবা কামরূপ অভিযানের সময় তাঁহাকে বঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করিতে হয় নাই।

হরিবর্মা ও কর্ণদেব :

ভেরাঘাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনা দেবীর শিলাফলকে উক্ত হইয়াছে ঃ- 'কর্ণদেবের শৌর্যবিভ্রমের অপূর্ব প্রভায় পাণ্ড্যগণ প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল, মুরলগণ গর্ব ত্যাগ করিয়াছিল, কুঙ্গ সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল, বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবতের ন্যায় কীরগণ স্বীয় গৃহে নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিল এবং হূণগণ সানন্দে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল[৪৫]। জয়সিংহের শিলালিপিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ গর্ব ত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞা বহন করিতেন[৪৬]। কর্ণের সহিত বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

বজ্রবর্মা :

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে হরিবর্মার অনামক পুত্রের অধিকার বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন সুযোগে যাদব-বর্ম-বংশ বঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোনও উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই[৪৭]। বেলাব লিপিতে এই বর্মবংশের যেরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতির বংশে এই রাজবংশের উদ্ভব এবং বজ্রবর্মা হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ভ[৪৮]। বেলাব লিপিতে বজ্রবর্মা যাদবসেনাগণের সমরযাত্রার মঙ্গলরূপী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন; তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধবকুলের পক্ষে প্রিয়দর্শন চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং

পণ্ডিতকুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন[৪৯]। হরির (হরি বর্মার?) জ্ঞাতিবর্গ বর্মা উপাধিধারী যাদবগণ সিংহপুর নামক যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বজ্রবর্মার অভ্যুদয় হইয়াছিল।[৫০]।

সিংহপুরের অবস্থান লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, ঈশ্বর বৈদিক কাশীর নিকটে যে স্বর্ণরেখা পুরীর[৫১] নাম করিয়াছেন, তাহাই সিংহপুর। কিন্তু আবার বলিয়াছেন যে সিংহপুর ইউয়ানচোয়াং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো[৫২]। নগেন্দ্রবাবুর এই উভয়বিধ উক্তির সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব। কারণ ইউয়ানচোয়াং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো কাশ্মীরের পাদমূলে অবস্থিত, পক্ষান্তরে ঈশ্বর বৈদিকের স্বর্ণরেখা-পুরী ভাগীরতী-তীর-সংস্থিত। আর্যাবর্তের পশ্চিম সীমার পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতীয় পুরাতন রাজধানী[৫৩]। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশস্ত লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে সিংহপুরের যাদববংশীয় বর্মরাজগণের বিস্তৃত বংশাবলী বিবৃত রহিয়াছে। এই সিংহপুর তক্ষশিলা হইতে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সিংহপুর রাজধানীর বর্তমান নাম কেতস্[৫৪]। ইউয়ান চোয়াং খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন[৫৫]।

তাম্রশাসনের ৬ষ্ঠ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বজ্রবর্মা যাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি ছিল না। সম্ভবত তদীয় তনয় জাতবর্মাই এই বংশের প্রথম রাজা।

জাতবর্মা :

ভোজবর্মার তাম্রশাসনের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে- শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্মা হইতেও জাতবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। তিনি বেনের পুত্র পৃথুর শ্রীকে ধারণ করিয়া, কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অঙ্গদেশে শ্রীবিস্তার করিয়া, কামরূপ-শ্রীকে পরাভব করিয়া, দিব্য নামক কৈবর্ত-নায়কের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া সার্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন[৫৬]।

জাতবর্মা ও কর্ণদেব :

৮ম শ্লোকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জাতবর্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই কর্ণ কলচুরি চেদিবংশীয় গাঙ্গেয় দেবের পুত্র। ইনি কর্ণ চেদি নামে প্রথিত। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে লিখিত আছে যে, 'গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপাল বলরক্ষিত ও রণজিত দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবন শ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট ভূমিকাঞ্চন গজাশ্বাদি বহু দান লাভ করিয়াছিলেন'[৫৭]। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাজিত হইয়াই স্বীয় দুহিতারত্নকে বিগ্রহপালের করে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তৃতীয় বিগ্রহপালের পিতা নয়পাল দেবের সময়ে কর্ণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধে রত ছিলেন। সুতরাং অনুমান হয়, তিনি সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কর্ণদেবের যৌবন শ্রীনামা অপর কন্যা জাতবর্মা বিবাহ করিয়াছিলেন। চেদিপতি কর্ণ, রাষ্ট্রকূট মহনদেব, পালবংশীয় ৩য় বিগ্রহপাল এবং বর্মবংশীয় জাতবর্মার সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক বংশলতা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। এই বংশলতা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ণদেব, ৩য় বিগ্রহপাল এবং জাতবর্মা সমসাময়িক ছিলেন।

চেদিপতি কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয় দেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রয়াগ হইতে ৭৯৩ চেদি সংবতে (১০৪১ খ্রিষ্টাব্দ) প্রদত্ত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; আবার সম্প্রতি ডাক্তার হুল্‌জ এলাহাবাদ জেলার গোহাড়োয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া Epigraphia Indica পত্রিকার একাদশ ভাগে উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, 'শ্রীমৎ কর্ণ প্রকাশে ব্যবহরণে সপ্তম সম্বৎসরে কার্তীকমাসি শুক্লপক্ষ কার্তীকো পৌর্ণ মাস্যাং তিথৌ গুরুদিনে' ইত্যাদি। ইহা হইতে ডাক্তার ফ্লিট এই তাম্রশাসনের তারিখ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা কর্ণদেবের রাজ্যের সপ্তম বৎসরে অর্থাৎ ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল[৫৮]। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ণদেব ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবলপরাক্রান্ত কর্ণদেব প্রায় ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন[৫৯]। তাহা হইলে কর্ণদেবের রাজত্বকাল ১০৪০ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৯০০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দিব্য ও জাতবর্মা :

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিতে উক্ত হইয়াছে, 'তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব উপরত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় মহীপালদেব পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুষ্কার্যরত (অনীতিকারম্ভরত) হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে ও রামপালকে লৌহ নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া জনক-ভু (পালরাজগণের পিতৃভূমি বা বরেন্দ্র) অধিকার করিয়াছিলেন[৬০]। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন দিব্বোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেইসময়ে জাতবর্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৬১]। তৃতীয় বিগ্রহপালের পরলোক গমনের পর দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রপীড়িত বরেন্দ্রের প্রকৃতিপুঞ্জ দিব্যের সহায়তায় পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দিব্য কোনও সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল কি না তাহার প্রমাণ নাই। পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলেও অঙ্গদেশ সম্ভবত এই সময়ে মহন দেবের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং জাতবর্মা কোন সুযোগে যে অঙ্গদেশে শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। জাতবর্মার সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তিনি যে পালরাজগণের বিরুদ্ধোচরণ করিয়া অঙ্গদেশ হস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। জাতবর্মা পাল সাম্রাজ্যের দুরবস্থার সময়ে দিব্যের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন কি না, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং জাতবর্মা কোন সময়ে যে দিব্যের সহিত বল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং অঙ্গদেশে তদীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

গোবর্দ্ধন ও জাতবর্মা :

বেলাব-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, জাতবর্মা গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্মা কর্তৃক পরাজিত এই গোবর্দ্ধন কে? রামচরিতে দ্বোরপবর্দ্ধন নামক জনৈক কৌশাম্বী-অধিপতির নাম আছে[৬২]। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, লিপিকর প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন লিখিত হইয়াছে, এবং এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্মা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাতবর্মা কর্তৃক পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম জানা যায় নাই।

সামল বর্মা :

জাতবর্মার মৃত্যুর পরে সামলবর্মা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বেলাব-তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, 'জগতে প্রথম মঙ্গল-নামধারী জাতবর্মা-নন্দন সামলবর্মা বীরশ্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কর্ণদেবের দৌহিত্র। সামলবর্মা অখিল রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন

লক্ষ্মণ রাজদেব
যুবরাজ দেব
কোকল্ল
গাঙ্গেয় দেব
কর্ণ = অহলনাদেবী (হূণরাজ দুহিতা)
বজ্রবর্মা
জাতবর্মা = বীরশ্রী
গয়কর্ণ
যৌবনশ্রী
মালব্য দেবী = সামলবর্মা
ভোজবর্মা
নরসিংহ দেব
জয়সিংহ দেব
বিজয়সিংহ দেব
অজয়সিংহ দেব
১ম মহীপাল
নয়পাল
তৃতীয় বিগ্রহপাল
২য় মহীপাল
২য় শূরপাল
রাষ্ট্রকূট বংশ
কন্যা
মহনদেব
রামপাল
কুমারপাল
মদনপাল
৩য় গোপাল
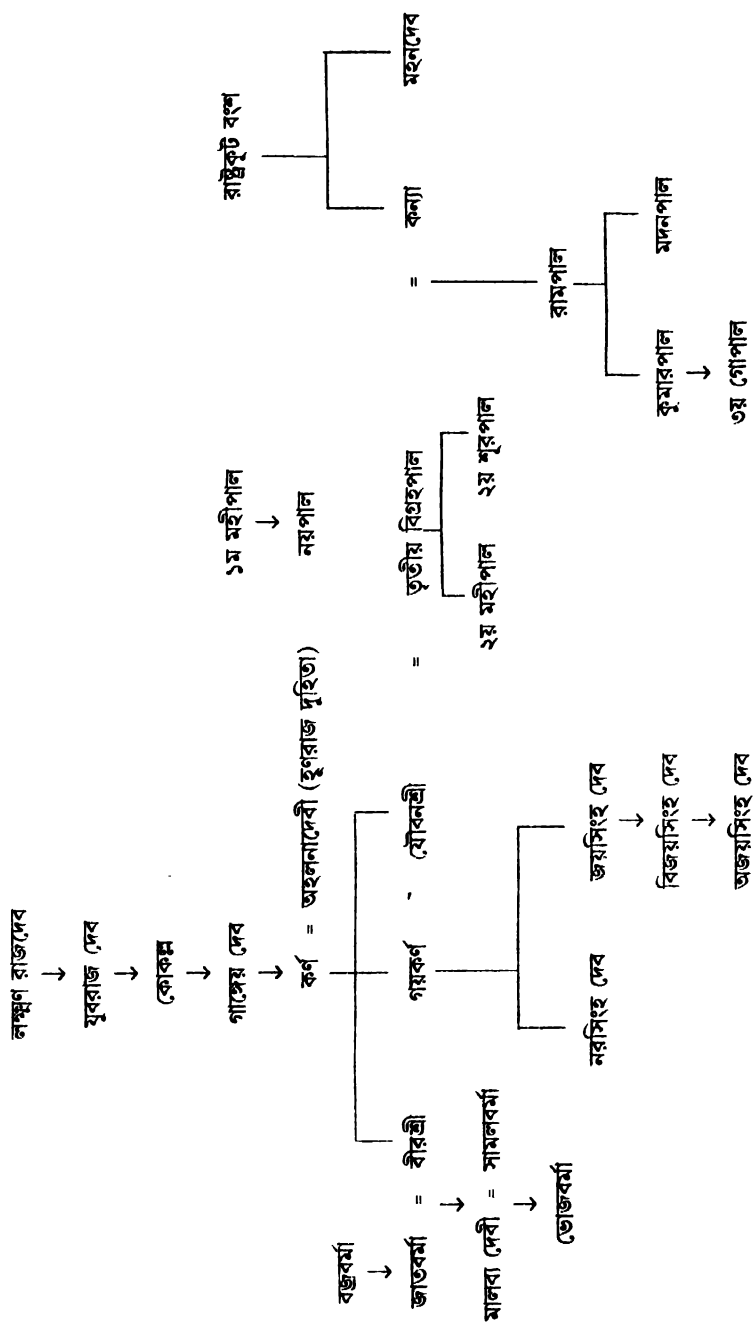
বলিয়া বেলাব লিপিতে উক্ত হইয়াছে। তাম্র শাসনের ১০ম ও ১১শ শ্লোকে সামলবর্মার শ্বশুরকুলের পরিচয় রহিয়াছে[৬৩]। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া বলিতে চাহেন যে, '১০ম শ্লোকে যে উদয়ীর নাম রহিয়াছে, তিনি ধারের পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১শ শ্লোকে যে জগদ্বিজয় মল্লের উল্লেখ আছে তিনি উদয়াদিত্য দেবের তৃতীয় পুত্র জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের নাগপুর প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ইনি দাহলাধিপতি কর্ণদেবের কবল হইতে মালব রাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ণদেব এবং উদয়াদিত্য যে সমসাময়িক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জগদ্দেবের নাম কোনও খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু চারণগণের নিকট ইনি সুপরিচিত। জগদ্দেব গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয় সিংহের সেনাপতি ছিলেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে উদয়াদিত্যনন্দন জগদ্দেবের অপূর্ব আখ্যায়িকা বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ ইহাকে ধারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় না। নব প্রকাশিত মালব ইতিহাস[৬৪] পাঠে জানা যায় যে, মালবরাজ উদয়াদিত্যের তিনপুত্র, প্রথম লক্ষ্মণদেব, দ্বিতীয় নরবর্মা, তৃতীয় জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের মৃত্যুর পর প্রথমে লক্ষ্মণ এবং পরে নরবর্মা, পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জগদ্দেব কখনও রাজা হন নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাটদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে-

'সম্বৎগারসৌ একাবন চৈত্র সুদী রবিবার।
জগদেব সীস সমীপয়ে ধারানগর পঁবার।।'

অর্থাৎ ১১৫১ বিক্রম সংবতে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) চৈত্র শুক্লপক্ষে রবিবার ধারানগরের পরমার জগদ্দেব কালীদেবীকে মাথা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 'বেলাব তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকটি দেখিলে বোধ হয় ৯ম এবং ১০ম শ্লোকের মধ্যে এক বা ততোধিক শ্লোক লেখকের অনবধানতার জন্য বাদ পড়িয়া গিয়াছে। জগদ্বিজয় মল্ল শব্দটি নাম না হইয়া মনভু বা কামের বিশেষণ হইলেও হইতে পারে। জগদ্বিজয় মল্ল শব্দটি কাহারও নামই হয় তাহা হইলেও জগদ্দেব নামের সহিত ইহার এমন কি বিশেষ সাদৃশ্য আছে? জগদ্দেব অপেক্ষা জগদেক মল্লের সহিত জগদ্বিজয় মল্লের অধিকতর সাদৃশ্য আছে। কল্যাণের চালুক্য বংশের দ্বিতীয় জগদেক মল্ল গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয় সিংহের সমসাময়িক'[৬৫]। একমাত্র বেলাব লিপির সাহায্যে সামল বর্মার শ্বশুর-বংশ ঠিক নির্ণীত হয় না। নতুন আবিষ্কার না হইলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না।

সামল বর্মা ও শ্যামল বর্মা :

বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়, তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে বহু কুলশাস্ত্র মন্থন করিয়া শ্যামল বর্মা নামক চন্দ্রবংশীয় বঙ্গাধিপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামল বর্মার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

(১) 'বিধোঃ কুলেহ জনি নৃপতি স্ত্রিবিক্রমঃ স্ববিক্রম প্রতিহতবৈরি বিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্ববনিতয়েব লোলয়ানুরূপয়া স পরিবভৌ তয়া শ্রিয়া।।
নাম্না বিজয় সেনং স জনয়ামাস নন্দনং।
স্ফুরন্নয় গুণোপেতং জেদোব্যাপ্ত দিগন্তরং।।
রাজাভূৎ সোহপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্র সদৃশ স্তদা!
প্রজাঃ সংপালয়ন্ সম্যক্ শশাস পৃথিবীং মুদা।।
মহিষ্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।

মল্ল শ্যামল বর্ম্মাণৌ জনয়া মাস নন্দনৌ।
মল্লো মল্ল সহস্র বলস্তীব্র প্রতাপোজ্জ্বলঃ পুণ্যধ্বস্তমলঃ সুকীর্ত্তি ধবলঃ
সৎকীর্ত্তি সম্মঙ্গলঃ।
দুরোৎসৃষ্টখলঃ কৃপাম্বুতরলঃ শান্তঃ প্রজা পেশলঃ শশ্বদ্বৈরিদল স্ফুরদ্ভুজবলঃ
সাক্ষাদিবাখণ্ডলঃ।।

তং সমীক্ষ্যাগ্রজং ভূপমভিষিক্তং পিতুঃ পদে।
শ্রীমান শ্যামল বর্ম্মা স দিগ্‌জয়ায় মনোদধে।।
অগণ্য সৈন্য সসিতো মহামান্যো মহীপতিঃ।
পর্য্যটন বহুশো দেশান জিতবানবনীপতীন।।

নানা দেশ বিদেশ বাস নিরতান্ লীমা বিশেষান্বিতান্ জিত্বা তীব্র পরাক্রমেণ
পৃথিবী পালান্ প্রতাপান্বিতান্।
দেশেহশেষ গুণোত্তমে নিরুপমে বাসাভিলাষাদসৌ গৌড়ান্তর্গত কান্ত
বিক্রম পুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে।।
বৈদিক কুলমঞ্জরী-রামদেব বিদ্যাভূষণ।

'চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই ত্রিবিক্রম নিজ বিক্রমে শত্রু বিক্রম বিদলিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিবিক্রম যেমন স্বীয় প্রণয়িনী (লক্ষ্মী) কর্তৃক পরিশোভিত হন, ইনিও সেইরূপ স্বীয় সর্বাঙ্গসুন্দর রাজলক্ষ্মী দ্বারা বিরাজমান ছিলেন। ইনি বিজয়সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে এই পুত্রের তেজঃ প্রভাবে সর্বদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্দ্র-প্রতিম ভূপেন্দ্র বিজয় সেন যথা-কালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন পূর্বক প্রীত মনে পৃথিবী মণ্ডল সম্যকরূপে সুশাসিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মল্ল অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র মল্লের বল ধারণ করিতেন। ইহার প্রভাবে শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত। ইনি পুণ্যবলে পাপরাশি বিদূরিত করিয়া সাতিশয় কীর্তিশালী, কৃপালু, প্রজাবৎসল ও শান্ত প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইহার ভুজবলের নিকট বৈরীদল সর্বদাই পরাভব স্বীকার করিত। ইনি অচিরকাল মধ্যেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় মহৈশ্বর্যশালী হইয়াছিলেন।

'শ্রীমান শ্যামল বর্মা অগ্রজ মল্ল বর্মাকে পিতৃ' সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। মহামান্য মহীপতি শ্যামল বর্মা অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে বহুদেশ পর্যটন করিয়া নরপতিদিগকে পরাজিত করিলেন। দেশ বিদেশবাসী বহু সংখ্যক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিবৃন্দ তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত রমণীয় বিক্রমপুরের উপান্তভাগে স্বীয় বাসার্থ এক পুরী নির্মাণ করিলেন।

(২) 'আসীদ্, গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডা শেষ ভুপালৈ রর্চ্চিত স মহীপতিঃ।
বেদ গ্রন্থ গ্রহমিতে সব বভুব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজ বলৈঃ পরিভুয় শত্রূন্।
শূরান্বয়াতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা শাকে পুনঃ শুভ তিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ।।
তস্মৈ দদৌ সুতাং ভদ্রাং কাশীরাজ্যে মহাবলঃ।
গজাশ্ব রথ রত্নাদ্যৈরাজ্যে রপি পুরষ্কৃতঃ।।
পাশ্চাত্য বৈদিক কুল পঞ্জিকা।

'গৌড়দেশে শ্যামল নামে এক ধর্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্তৃক অর্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাবশালীও

জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয় বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা নাম্নী কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।'

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য় খণ্ড-দ্বিতীয়াংশ, ১৮ পৃষ্ঠা)

(৩) 'গঙ্গায়া পূর্ব ভাগঞ্চ মেঘনা নদ্যাশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্দেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং।।
করদং রাজ্য মাসাদ্য শ্যামলাখ্যোহপ্যাশাসয়ৎ।
সেন বংশীয় ভুপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্ম ভাক্।।
সামন্ত সারের বৈদিক কুলার্ণব।

গঙ্গার পূর্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম শীল শ্যামল বর্মা সেন বংশীয় নৃপতি গণের আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয়াংশ-১৯ পৃষ্ঠা)

(৪) "ত্রিবিক্রম মহারাজ সেন বংশ সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুর সমীপতঃ।।
স্বর্ণরেখা নদীযত্র স্বর্ণ যন্ত্র ময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা সলিলৈঃ পূতা সল্লোক জন তারিণী।
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয় সেনকং।।
আসীৎ স এবং রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ।
স্ত্রিয়াং তস্যাংহি পুত্রৌ দ্বৌ মল্ল শ্যামল বর্মকৌ।।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণী রক্ষ করা বুভৌ।।
মল্ল স্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোহত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রু গণান্ সর্বান্ গৌড়দেশ নিবাসিনঃ।।
বিজিত্য রিপু শার্দ্দলং বঙ্গদেশ নিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো নাম্মা শ্যামল বর্ম্মকঃ।।
জিত্বা সর্ব্ব মহীপতিং ভূজ বলৈঃ পঞ্চাস্য তুল্যোবলী শ্রীমদ্বিক্রম পুর নাম নগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতং।
ভূপালেন্দ্র কুলাবতার কলিতঃ ক্ষৌণী সরঃপঙ্কজঃ সোহয়ং বঙ্গ শিলোমণিঃ ক্ষিতি তলে ব্যালেন্দু কীর্ত্তি পরঃ।।
ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (প্রথম সংস্করণ)

'মহারাজ ধর্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকট দিয়া প্রসন্ন সলিলা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গা সলিল সংসর্গে পবিত্র হইয়া সাধুজনগণের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিল। মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেনই সেই পুরে রাজা হন। বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। বিলোলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাশালিনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয় সেন দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্লবর্মা এবং অপর জনের নাম শ্যামল বর্মা। মল্লবর্মা ও শ্যামল বর্মা ইহারা উভয়েই রাজ্যরক্ষায় দক্ষ। মল্লবর্মা রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। শ্যামল বর্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতি ধর্মজ্ঞ শ্যামল বর্মা রাজা হইয়াছিলেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয়াংশ-১৪ পৃষ্ঠা)

এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাত নাম বৈদিক কুল পঞ্জিকায় শ্যামল বর্মার তাম্রশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত আছে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত অপর বৈদিক কুল পঞ্জিকায় শ্যামল বর্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।'

তত্র তাম্রশাসনং যথাঃ—

'ইহ খলু বিক্রমপুর নিবাসি কটক পতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যু পেত সতত বিরাজ মানাশ্বপতি গজপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্ম বংশ কুল কমল প্রকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অবিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্মদেব পাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহা ধার্মিক মহা সান্ধি বিগ্রহিক পৌরপতিক দণ্ড নায়ক বিষয়ি প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদোপ জীবিনোহধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং সমাজ্ঞা পয়তি বিদিত মস্তু ভবতাং বঙ্গবিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তে পূর্বে নাগর কুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে কুলকুণ্ঠ চতুঃসীমা বচ্ছিন্ন পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজল স্থলাসখিল নানা সাকল্যপুলা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহা ভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্লায়ণ শাখৈক দেশ ধ্যায়িনে শুনক গোত্রায় শ্রীযশোধর দেব শর্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন প্রপাতি যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ধি দেয়া ভূমি স্ত্রিংশোত্তরমতা তাদৃশ হরেণ নরকপতন ভয়ং ধর্মং গৌরবাৎ। ধর্মার্থ সংশ্লিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতি গৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্য কর্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গ গামিনৌ।।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য সত্য তদা ফলং।।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেচ্চ বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ।।
ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি।।
সত্য হেয়া ন কর্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাং কথঞ্চন।
যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনং।।
ভূমি দানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠ গতি রক্ষয়া।

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে বসুজ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্যামল বর্মা বল্লাল সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র। হেমন্ত সেনের অপর নাম ত্রিবিক্রম এবং শ্যামল বর্মা সেনরাজগণের করদ ভূপতি ছিলেন। বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্যামল বর্মা সেনবংশ-সমুদ্ভূত নহেন ; তাঁহার পিতার নাম বিজয় সেন, এবং তাঁহার মাতার নাম মালতী বা বিলোলা নহে। বসুজ মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্যামল বর্মা বারাণসী বা কান্যকুব্জ রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্যামল বর্মার প্রধান মহিষীর নাম মালব্য দেবী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে রচিত কুলশাস্ত্রের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। সুতরাং বলিতে হয় যে শ্যামল বর্মা সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মূল্য অতি অল্প। বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে

বসুজ মহাশয় টালা নিবাসী ̐গুরুচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটি হইতে একখানি তাল পত্রে লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন। ইহাও ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জিকা। এই গ্রন্থে শ্যামল বর্মার যে পরিচয় আছে, তাহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত শ্যামল বর্মার পরিচয়ের সহিত একত্র স্থাপন করাই সঙ্গত। উহাতে লিখিত আছে -

(৫) 'ত্রিবিক্রম মহারাজ শূর বংশ সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্মজ্ঞো দেশে কাশী সমীপতঃ।।
স্বর্ণরেখা পরীযত্র স্বর্ণ যন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা সলিলৈঃ পুতা স্বল্লোক জন তোষিণী।।
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না কণক সেনকং।।
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্ব্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলাচ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ।
শ্রিয়াং তস্যা হি দ্বৌ পুত্রৌ মল্ল শ্যামল বর্ম কৌ।।
স এব জনয়া মাস ক্ষৌণী রক্ষক বা বুভৌ।।
জেতুং শত্রু রিপু শার্দ্দুলং বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ।
বিজিত রিপু শার্দ্দলং বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরম ধর্মজ্ঞো নাম্না শ্যামল বর্মক।।
জিত্বা সর্ব মহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্য তুল্যোবলী।।
শ্রীমদ্বিক্রমপুর নাম নগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতং।।

ঈশ্বর বৈদিক কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

এই শেষোক্ত উভয় পুঁথিই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক 'আবিষ্কৃত' এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত। এই উভয় পুঁথি তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুঁথিতে 'কাশীপুর' স্থানে 'দেশে কাশী' স্বর্ণরেখা নদী' স্থানে 'স্বর্ণরেখা পুরী' 'বিজয় সেনকং' স্থানে 'কর্ণ সেনকং' 'পত্নী তস্য বিলোলা' স্থানে 'কন্যা তস্য বিলোলা, 'স্ত্রিয়াং' স্থানে 'শ্রিয়াং' পরিবর্তীত হইয়াছে। 'আটবৎসর পূর্বে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ বসুজ মহাশয়ের নিকটই শুনিয়াছিলেন যে সেন বংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রমের পত্নী মালতীর গর্ভে বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিজয় সেনের বিলোলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মল্লবর্মা ও শ্যামলবর্মা নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। 'শ্যামল বর্মা গৌড় দেশবাসী' শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। আট বৎসর পরে বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত শ্যামল বর্মার পরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন বসুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত হইল। বেলাব তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শ্যামলবর্মার মাতার নাম বীরশ্রী; তিনি বিশ্ববিজয়ী চেদিরাজ কর্ণের কন্যা ও গাঙ্গেয় দেবের পৌত্রী। বসুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, শূরবংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রম মালতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে কর্ণসেন নামক একপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। কর্ণের বিলোলা নাম্নী এক কন্যা ছিল, এই কন্যার গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামক দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বসুজ মহাশয় যদি বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে এই নূতন পুঁথির আবিষ্কার বার্তা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতাম। কিন্তু বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই নূতন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বেলাব তাম্রশাসনে শ্যামল বর্মার মাতামহ চেদিরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিক কৃত দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কার হওয়ায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কোন দুষ্টবুদ্ধি, অর্থলোলুপ ব্যক্তি

ঈশ্বর বৈদিকের প্রথম পুঁথি 'সংস্কার' করিয়া উদারচেতা, সরল বিশ্বাসী, দয়ার্দ্র হৃদয় বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে'[৬৭]।

বর্তমান অবস্থায় দুইটি মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে[৬৮]- (১) কুলশাস্ত্রের শ্যামল বর্মা ও যাদব বংশের জাত বর্মার পুত্র সামলবর্মা এক ব্যক্তি নহেন; (২) শ্যামল বর্মা ও সামল বর্মা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলশাস্ত্রের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ, কুলশাস্ত্রের লিখিত শ্যামল বর্মার পরিচয়ের সহিত বেলাব-তাম্রশাসনোক্ত সামল বর্মার বংশপরিচয় ঐক্য হয় না।

সামল বর্মা বা শ্যামল বর্মা নামে যে একজন নৃপতি বিক্রমপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হয়ত তাঁহার সময়েই বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে কুলাচার্যগণ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই কুলশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য বহু আবর্জনা ইহাতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'যে সময়ে কৈবর্ত নায়কের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বর রামপাল হিন্দু ধর্মানুরাগী রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া মহোৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে রাঢ়দেশে শ্যামল বর্মার অভিষেক উৎসব উপলক্ষেও ব্রাহ্মণ-গৌরব-প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেছিল। যাদব, কর্ণাট ও মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক ধর্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহাদিগের উৎসাহে নানাস্থান হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাঢ়াধিপতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের রাজলক্ষ্মী বেশিদিন সামল বর্মার প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। সামলের শ্বশুর-কুল-পালিত মালব ও মাতামহ-পুষ্ট কর্ণাটসেনা রাঢ় ভূমি পরিত্যাগ করিবার পর সেনবংশ প্রবল হইয়া তাঁহাকে রাঢ় দেশ হইতে সম্ভবত বিতাড়িত করেন এবং পূর্ববঙ্গে সেন বংশের কদরুরূপে কিছুকাল আধিপত্য করিতে থাকেন[৬৯]। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় উক্তিই বসুজ মহাশয়ের কল্পনা-প্রসূত; ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্যামল বর্মা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ :

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের অনেক কুল-গ্রন্থেই লিখিত আছে, বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্মাই পাশ্চাত্য-বৈদিকানয়নের কারণ। রাজ প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত-জনিত অনিষ্ট দূর করিবার জন্যই নাকি শ্যামল বর্মা শাকুন সত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'তৎকালে বঙ্গদেশবাসী সম্মানিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিরগ্নিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদিক কুলমঞ্জরী, সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণব, সামন্ত-চূড়ামণি-রচিত শ্যামল-চরিত, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী, রামভদ্রের বৈদিক-কুল-দীপিকা প্রভৃতি সমুদয় বৈদিক কুলগ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশে (রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে) আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না; সুতরাং শাকুনসত্ররূপ বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইয়াছিল'[৭০]। রাঢ়ী-বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থের ন্যায় বৈদিক-কুলশাস্ত্র গুলিও যে অসংবদ্ধ ও অনৈক্য দোষে দূষিত তাহা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও স্বীকার করিয়াছেন[৭১]। তিনি বলেন, 'বৈদিক কুলপঞ্জিকা ও বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে শুনক যশোধরের সঙ্গে অপর চারি গোত্রও আসিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক কুলদীপিকা, বৈদিক কুলপঞ্জী ও সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবকার এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শুণক বা শৌনক গোত্রজ যশোধরই রাজা শ্যামল বর্মার শাকুন সত্র সম্পন্ন করেন, অপর চারি গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক সে সময়ে আগমন করেন নাই। সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবকার মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে, বৈবাহিক আদান প্রদানের সুবিধা করিবার জন্য যশোধর ১০০২ শকে বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই চার গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রাজ-সম্মানিত করিয়াছিলেন। বৈদিক-কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলেন যে, শাকুন সত্র সম্পন্ন করিয়া যশোধর স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু গোড়াগমন হেতু তথায় কেহ তাঁহাকে আদর করেন নাই। তাই ব্রাহ্মণ-প্রবর আর

চারিজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিজ অনুজকে লইয়া বঙ্গে আগমন করিলেন। আবার ঈশ্বর বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, কালক্রমে শাকুন সত্র সম্পাদক ব্রাহ্মণ প্রবর যশোধর মিশ্রের বহু পুত্র-কন্যা জন্মিল। তখন এখানে উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল না, কাজেই তিনি পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন ও অবশেষে পুনরায় কনৌজে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার কথায় রাজা শ্যামল বর্মা চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে পুত্রাদি সহ আনাইয়া গ্রাম দান করিয়া তাহাতে বাস করাইলেন'[৭২]। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের যে পঞ্চ জন বঙ্গে আগমন করেন, বিভিন্ন কুল-গ্রন্থে তন্মধ্যে কোন কোন ব্যাক্তির নাম ও পিতৃ নামেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্তা, হরিবর্ম দেবের তাম্রশাসন এবং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, শ্যামল বর্মার সময়ে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না; সুতরাং শ্যামল বর্মা কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়। বস্তুত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন কুলগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের একমাত্র স্মরণ ছিল যে, তাঁহারা কর্ণাবতী[৭৩] হইতে শ্যামল বর্মা নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে যে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই প্রবাদ সুদৃঢ় সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠাপিত, কিন্তু কুলশাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

অধিকাংশ বৈদিক কুলগ্রন্থেই 'কাকেন্দুশূন্যখবিধৌশকাব্দে' বা 'সোমশূন্যাম্বরেন্দুমে' অর্থাৎ ১০০১ শকে যশোধরের বঙ্গাগমন স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জীতে 'শাকেবেদ রসেন্দুচন্দ্র গণিতে' বা ১১৬৪ শকাব্দে শ্যামল বর্মা কনোজ স্থিত ব্রাহ্মণদিগকে এদেশে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্যামল বর্মার সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে এবং শ্যামল বর্মা ও সামল বর্মা অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইলে ১০০১ শকাব্দে বা ১০৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন অসম্ভব হইবে না।

ভোজবর্মা :

শ্যামল বর্মার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র ভোজবর্মা বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ভোজবর্মা তাঁহার ৫ম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ মণ্ডল সংবদ্ধ উপ্পলিকা বা উপ্যালিকা গ্রাম, সাবর্ণ গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু-চ্যবন-অ্যাপ্নবাল-ঔর্ব জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠাতা, যজুর্বেদের কণ্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর-রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেবশর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৭৪]।

রামচরিত হইতে জানা যায় যে, বর্মবংশীয় পূর্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন[৭৫]। এই বর্মবংশীয় নরপতি কে? নবম শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপে বর্মরাজগণের শাসন লোপ পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে রামপালের সমসাময়িক রূপে কামরূপে আমরা পাল নরপতিগণকে সমাসীন দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাগ্দেশীয় বর্মরাজ কামরূপের কোন রাজা হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'যেখানে সামল বর্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে 'রামপাল' নামে পরিচিত হইয়াছে'[৭৬]। সুতরাং তাঁহার মতে রামপালের অর্চনাকারী এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম রাজা ভোজবর্মার পিতা সামল বর্মা। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'ভোজবর্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন'[৭৭]।

বর্মবংশীয় নরপতি কর্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম-রামপাল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয়-সেন বংশীয় বিজয় সেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার।

বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে –

'হাধিক্কষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং ভুয়োহপি কিং রক্ষসা
মুৎপাতোয়মু (প) স্থিতোস্তু কুশলী শঙ্কাস্বলঙ্কাধিপঃ'।

'হা ধিক্, কষ্টের বিষয়, ভুবন অদ্য বীরশূন্য হইয়াছে, আবার কি রাক্ষসদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে! এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন'[৭৮]। শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন[৭৯]। রামচরিতের একটি শ্লোকে প্রাগদশীয় এক বর্ম-রাজা যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর নানা উপঢৌকন দিয়া রামপালকে আসিয়া আরাধনা করিয়াছিল, সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজবর্মার বেলাব-শাসনে রাক্ষসদের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় ভোজবর্মাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্মরাজা। এই উৎপাত যখন পুনর্বার সমুস্থিত উৎপাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তখন অনুমান করি ভীমের মৃত্যুর পর[৮০] তদীয়-সুহৃৎ হরি যে পুনর্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন,-ইহা সেই প্রসঙ্গ।'

ভীম অথবা হরি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই। কৈবর্ত-বিদ্রোহ বরেন্দ্র ছাড়াইয়া বঙ্গদেশেও সংক্রামিত হইয়াছিল কিনা তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং হরির রামপালকে আক্রমণ করিবার জন্যই যে বঙ্গাধিপ ভোজবর্মা নানাবিধ উপঢৌকন সহ রামপালের আরাধনা করিতে যাইবেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'বঙ্গাধিপ ভোজবর্মা বিক্রমপুরের পরগনার মধ্যে যেখানে নিজনামে ভোজেশ্বর নামে দেব মূর্তী প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানই সম্ভবত অধুনা ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে[৮১]। বসুজ মহাশয়ের এই অনুমান সমর্থন করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ ভোজেশ্বর গ্রামে ভোজবর্মার প্রতিষ্ঠিত কোন মূর্তীর সন্ধান পাওয়া যায় না। অধুনা এই স্থান ভীম প্রবাহা কীর্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হইবার পূর্বেও নগেন্দ্রবাবুর লিখিত কোনও মূর্তী ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল না।

---

১. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ১৩১০, কার্ত্তিক-৩১৯ পৃষ্ঠা।
ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন-১৩১০, বৈশাখ পৃষ্ঠা।

২ সোপ্যায়ুং সমজীজনস্মনুসমো রাজ্ঞস্ততো জজ্ঞিবান্
ক্ষ্মাপালো নহুষ স্ততোজনি মহারাজ্যে যযাতিঃ সুতম্।
সোপিপ্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতিভুজাং বংশোয়মুজ্জস্ততে
বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বদ্বপ্তশঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত।।
সোপীহ গোপীশত কেলিকাবঃ।
কৃষ্ণ মহাভারত-সূত্রধারঃ
অর্ঘ্যঃ পুমানংশকৃতাবতাবঃ
প্রাদুর্বভুবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ।।
পুংসামাবরণং ত্রয়ী ন চ তযা হীনা ন নগ্না ইতি
ত্রয্যা (ন্) চাদ্ভুত-মঙ্গরেষু ১ রসাদ্রোমোদ্‌গমৈর্বর্ম্মিণঃ।
বর্ম্মাণোতিদ্দা গভীর নাম দধতঃ শ্লাঘ্যৌভুজৌ বিভ্রতো
ভেজু সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ'।।
সাহিত্য ১৩১৯, ভাদ্র, ৩৮১--৩৮২ পৃঃ
J. A. S. B. New Series vol X Page 126-127.

৩. যন্মন্ত্রশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবর্ম দেবঃ'।
ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি, ১৬শ শ্লোক।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড প্রথমাংশ) পৃষ্ঠা।

৪. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন-১৩১৯, কার্ত্তিক-৩১৯ পৃষ্ঠা।

৫. "If Hari Varma cannot be proved to have belonged to a dynasty different from that of Bhoja Varma, he can have no place in history before Bhoja Varma.'
Modern Review, 1912, P. 249

৬. বাংলার ইতিহাস-প্রথমভাগ ২৭৪ পৃষ্ঠা।

৭. "ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন দ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়া তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ'। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা।

৮. Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. vi, pages.

৯. The Antiquities of orissa Vol. ii Pages 84-85.

১০. Epig. Ind. Vol, vi, pp. 205-7.

১১. "ষন্মন্ত্রশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম্ম বিজয়ী হরিবর্ম দেবঃ।
তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতি
বর্ম্মানুগা বহল কল্পলতেষ লক্ষ্মী ঃ'।।

১২. 'The record was composed by Vacaspati Misra, A Distinguished Pandit. Author of many origical works and Commentaries. The date of Vacaspati is well-known : it was about close of the 11th Century.'

১৩. "ন্যায়সূচী নিবন্ধো সাবকারী সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ বস্কঙ্কবসু বৎসরে"। Printed Ed Page 26.

১৪. 'On palaeographical grounds I do not hesitate to assign this record...to about A.D. 1200—Epig. Ind. Vol. vi p. 205.

১৫. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1912, Septr. Page 342.

১৬. Ibid page 333-347.

১৭. 'ভবদের ভট্ট নির্ণয়ামৃতে'-India office Library Catalogue Page 475 (Mss. 1553).

১৮. 'ইতি কল্পতরু কাম ধেন্বাদি সংগ্রাহাকৃষ্টে মহামহোপাধ্যায়েন বিরচিতে সুদ্ধি প্রকরণেহন্ত্যেষ্টি বিধিঃ'-India office Library Catalogue Page 475 (Mss. folio 114 b).

১৯. Epigraphia Indica vol. IV Page 116.

২০. ইতি সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ-প্রথম অধ্যায়।

২১. Catalogos Catalogorum, Pt II page 138

২২. প্রবন্ধ চিন্তামণি ১১৭ পৃঃ, রাসমালা ৬৮ পৃঃ।

২৩. Indian Antiquary vol. vi Page 53.

২৪. Professor Sachau's Translation of Al Beruni's Indica vol. I. Page 191.

২৫. রাজতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গে উক্ত হইয়াছে –
'কাশ্মিরেভ্যো বিনির্যন্তং রাজ্যে কলশ ভূপতেঃ। (৯৩৫ শ্লোক)
অর্থাৎ রাজা কলশের রাজ্য শাসনকালে (পণ্ডিত বিহুন) কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া (কর্ণাটে) গিয়াছিলেন। ২৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে --
'একান্ন চত্বারিংশস্য বর্ষস্য তনয়ঃ সিতে।
ষষ্ঠেহ্নি বাহুলস্যাভুদভিষিক্তো মহীভূজা'।
'লৌকিকাব্দের উনচল্লিশ বৎসরে (১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে (অনন্ত দেব) পুত্র কলশকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।'
২৫৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে --
'সচ ভোজ নরেন্দ্রশ্চ দানোৎকর্ষেণ বিশ্রুতৌ।
সূরী তস্মিন্ ক্ষণে তুল্যং দ্বাবাস্তাং কবিরাজকৌ।।'
তৎকালে ভোজরাজও মান ধর্মে ক্ষিতিরাজের কলশের তুল্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; উভয়েই তুল্যজ্ঞানী, বিদ্যান এবং কবিগণের উৎসাহ দাতা ছিলেন।

'তস্মিণ্‌ ক্ষণে' এই কথা কয়টিতে কলশের রাজ্যাভিষেক কালের পরবর্তী এই সময়ই সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনমান করেন।

২৬. Journal American Or. Soc. Vol. Vii. Page 35.

২৭. 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবাক্‌পতিরাজ দেব পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীসিন্ধুরাজদেব পদানুধ্যাত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্ব শ্রীভোজদেব পদানুধ্যাত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীজয়নি (ভঘ) দেবঃ কুশলী। সংবৎ ১১১২ আষাঢ় বদি ১৩।'

Mandhata Plate of Jaysimha of Dhara, Epigraphia Indica vol. III Page 40.

২৮. গোপাল ভূমিপালান্‌ প্রসভমসিলতামাত্রমিত্রেণ জিত্বা সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতি তিলকো যেন ভুয়োভাষে চি।।'

"প্রবোধ চন্দ্রোদয়", কলিকাতা সংস্করণ, ৫ পৃষ্ঠা।

এই নাটকের তিন স্থানে কর্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—

(ক) "যেনচ। বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণংমোহমিবোর্জ্জিতম্‌ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতে বোধস্যেবোদয়ঃ কৃতঃ"। ৮ পৃষ্ঠা।

(খ) সকল ভূপাল কুল প্রলয়-কালাগ্নি রুদ্রেন চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং চন্দ্রান্বয় পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তুময়মস্য সংরম্ভঃ"। ৭ পৃষ্ঠা।

(গ) "যেন কর্ণসৈন্য সাগবং নির্মথ্য মধু মথনে নব ক্ষীর সমুদ্রং সমাসাদিতা সমর বিজয় লক্ষ্মী"।। প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অংশের সংস্কৃতানুবাদে, ৬ পৃষ্ঠা।

কবি বিহ্লন কর্ণকে "কালঞ্জর গিরিপতি বিমর্দ্দন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; সুতরাং অনুমিত হয়, চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা কর্ণদেবের হস্তে পরাজিত হইবার পরে কীর্ত্তি বর্মার সেনাপতি গোপালের হস্তে কর্ণের পবাভব হইয়াছিল।

২৯. 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'-দ্বিতীয় সর্গ।

৩০. J A.S.B New scries vol viii Page 346.

৩১. Ibid—Footnote.

৩২. Indian Antiquary Vol xvi P.204.

৩৩. Indian Antiquary Vol. xviii P.238.

৩৪. Introduction to Rama Carita Page 11.

৩৫. রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্তা-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য়াংশ), ৬০ পৃষ্ঠা।

৩৬. ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি ২০-২৪ শ্লোক-প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড-প্রথমাংশ, ৩১১ পৃষ্ঠা।

৩৭. ভবদেব ভট্টের ফুলপ্রশস্তি-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ মাংশ-২৬-৩২ শ্লোক, ৩০৮; ৩১১-১২ পৃষ্ঠা।

৩৮. তস্মাদভুদবিজনাভ্যুদয়ৈকবীজ মব্যাজ পৌরুষ মহাতরু মূল কন্দঃ।
শ্রীআদি দেব ইতি দেব ইবাদি মূর্ত্তি মর্ত্যাত্মনা ভুবন মেতদলঙ্করিষ্ণুঃ।
যো বঙ্গরাজ-রাজ্যশ্রীবিশ্রাম সচিব শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যা সন্ধিবিগ্রহী।।'

৩৯. 'বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তাত্ত্বিকানাং
দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ।
যো বর্দ্ধয়ন্‌ বসুমতীঞ্চ সবস্বতীঞ্চ
দ্বেধা ব্যধত্ত নিজনাম পদং সদর্থং।

৪০. মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ স্ফুবদসিকরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধির চর্চ্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিঃ প্রকৃতি ললিতাস্তা গিব ইতি
প্রপঞ্চং শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি।।"
যদ্‌ ব্রহ্ম তেজসি বলীযসি মন্দবীর্য্যঃ খদ্যোত পোতকরণিং তবণি স্তনোতি।
উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয় যশঃ শরীরে জাত স্তুষার শিখরী ননু জানু দঘ্নঃ।।
ব্রহ্মাদ্বৈতবিদানুদাহবণ ভূকদ্ভুত বিদ্যাদ্ভুত-

স্রষ্টা ভট্ট গিরাং গভীরিমগুণ প্রত্যক্ষ দৃশ্বা কবিঃ।
বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভ সম্ভব মুনিঃ পাষণ্ড বৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডন পণ্ডিতোহয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে।।'

৪১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড ২ য়াংশ) ৬, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৪২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাত রাজন্যকাণ্ড ২৮৪, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৩. Epigraphia India vol I p. 229

৪৪. গৌড়রাজ মালা-৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৫. 'পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতাম্মুমোজ মুরল স্তত্যাজ গর্ব্বং (গ্র) হং
(কু) ঙ্গ ঃ সদগতি মাজগাম চকপে (চকম্পে?) বঙ্গঃকলিঙ্গৈঃ সহ।
কীর কীবর দাস পঞ্জর গৃহে হূণ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্নাজনি শৌর্য্য বিভ্রম ভরং বিভ্রত্যপূর্ব্বপ্রভে।'

Bheraghat Inscription of Alhana Devi—
Epigraphia Indica, Vol. I page 11.

৪৬. Epigraphia Indica, Vol. I page 11.

৪৭. শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ অথবা গাঙ্গেয় দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্ধ হইতে পূর্বার্ধে আসিয়া একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।-

৪৮. J.A.S.B vol. X No. 5 (New series) Page 27.
সাহিত্য, ২৩ শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮১, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

৪৯. 'অভবদথ কদাচিদ্ যাদবীনাং চমূনাং
সময় বিজয় যাত্রা মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা [।]
শমন ইব রিপুণাং সোমবদ্ধান্ধবানাং
কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্।।'
J.A.S.B vol X No. 5 (New series) Page 27.

৫০. 'বর্ম্মাণোতি-গভীর-নাম দধতঃ শ্লাঘৌ ভুজৌ বিভ্রতো
ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগোন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ।'
J.A.S.B vol. X No. 5 (New series) Page 127.

৫১. বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার অত্যল্পকাল পরে বসুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ঈশ্বর বৈদিকের কুল পঞ্জিকার সহিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকাব এই স্থান তুলনা করিলে দেখা যায় যে, নবাবিষ্কৃত পুস্তকে 'সেনবংশ' স্থানে 'শূরবংশ', 'কাশীপুর সমীপতঃ' স্থানে, 'দেশে কাশী সমীপতঃ 'স্বর্ণরেখা নদী' স্থানে 'স্বর্ণরেখা পুরী' ইত্যাদি পরিবর্তীত হইয়াছে। সুতরাং কোন গ্রন্থখানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব?

৫২. ভারতবর্ষ-১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা-শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত-'কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন' শীর্ষক প্রবন্ধ।

৫৩ বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৫৪. Epigraphia Indica, Vol. xii page 37-41.
Epigraphia Indica Vol. I page 12-14.
J.A.S B vol. X No. 5 (New series) Page 127.

৫৫. Watters on Yoan Chwang vol I Page 248.

৫৬. 'জাত বর্মা ততো জাত গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ!
দয়াব্রতং রণঃ ক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ।।
গৃহ্নন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রীয়ম্
যোঙ্গেষু প্রথয়ন্ধ্রিয়ং পরিভবং স্তাং কামরূপ শ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্বন্ শ্রোত্রিয় সাচ্ছ্রিয়ং বিতত বান্ যাং সার্ব ভৌমশ্রিয়ম্।'
J.A.S.B vol X No. 5 (New series) Page 127.

৫৭. 'সহসাবিতরণজিত কর্ণঃ ক্ষৌণীং যৌবনশ্রিয়োদুহে।

অশ্রান্ত দানবারাতিশয়ো ষোড়ভূম্বনুচরঃ।।' ১/৯

টীকা :-অন্যত্র। 'যো বিগ্রহগ্লালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণমুদূঢ় বান্। সহসা বলেনাবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণোদাহলাধিপতি যেন। রণজিত এক পরন্তু রক্ষিতো ন উন্মুলিতঃ কপাল সন্ধি ঘ (ম) টানাৎ। দানবারো দান সমুচ্চয়ো ভূমি কাঞ্চন করিতুরগাদিভির্নানাপ্রকারং দানং তস্যাতিশয়ঃ প্রাচুর্য্যং স চাশ্রান্তোহ বিচ্ছিন্নো যস্য অতএব বৃষানুচরো ধর্মানুগতঃ।'

৫৮. Epigraphia Indica vol. xv. goharwa plates of Karna Deva.

৫৯. Introduction to Ramacarita-Edited by mahamahopadhya Hara Prasad Sastri page II.

৬০. রামচরিত ১৯/১৯, ৩১-৩৯।

৬১. বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৪৯ পৃষ্ঠা।

৬২. 'বৰ্দ্ধন ইতি কৌশাম্বী পতির্দ্বোরপৰ্দ্ধনঃ রামচরিত, ২/৬ টীকা।

৬৩. 'তথো দয়ী সুনুরভূৎ প্রভূত প্রতাপ বীরেষ্বপি সঙ্গরেষু।
যশচন্দ্রহা (স) প্রতি বিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখ নীক্ষতেস্ম।।
তস্য মাল্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
জগদ্বিজয় মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভূবঃ।।'

৬৪. Paramaras of Dhara and Malwa. by C. E. Lurard.

৬৫. প্রবাসী -শ্রাবণ, ১৩২০।

৬৬. বাংলার ইতিহাস-১ম খণ্ড, শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৬৭. প্রবাসী ১৩২০-৭০৪ পৃষ্ঠা।

৬৮. প্রবাসী ১৩২০ ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ৪৫৬ পৃষ্ঠা।

৬৯. বাংলার জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৭০. বাংলার জাতীয় ইতিহাস [ব্রাহ্মণ কাণ্ড, দ্বিতীয়াংশ ৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠা]।

৭১. ঐ ৬১৫, ৭, ৩৮-৪৮ পৃষ্ঠা।

৭২. বাংলার জাতীয় ইতিহাস,ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য়াংশ, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৭৩. পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রায় সমুদয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কর্ণাবতী সমাজ হইতেই তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। এই কর্ণাবতী সমাজ বারাণসীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবে উল্লিখিত হইয়াছে। সামল বর্মার মাতামহ চেদিপতি কর্ণদেবের জব্বলপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে,-
"কনক সি (শি) খরবেল্লদ্বৈজয়ন্তী সমীর প্রণীতগ ন খেলৎ খেচরী চক্রখে (দঃ)।
কিমপরমিহ কাস্যাং (শ্যাং) য (স্যা) দুগ্ধাব্ধি বীজীবল [যব] হল [কীর্ত্তে]
কীর্ত্তনং কর্ণমেরুঃ।।
অগ্রংধাম স্রে (শ্রে) য়সো বেদ বিদ্যাবল্লীকংদঃস্বঃ স্রবন্ত্যাঃ কিরীটং।
ব্রহ্মাস্তংভো যেন কর্ণাবতীতি প্রত্য [ষ্ঠাপি] ক্ষ্মাতল ব্রহ্মালো (কঃ)।"
Epi Indica vol II. P. 4.

কর্ণদেব প্রতিষ্ঠিত এই কর্ণাবেতী সমাজ হইতে সামল বর্ম্মার শাসন সময়ে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

৭৪. Journal of the Asiatic Society of Bengal (New Series) Vol X. P. 128-129.

৭৫. 'স্বপরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যায়ঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বর বারণেন চ নিজ-সান্দন-দানেন বর্মণা রাধে'।।
রামচরিত ৩/৩৪।

৭৬. বাংলার জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা।

৭৭. বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

৭৮. প্রবাসী, ১৩২১, মাঘ ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

৭৯. প্রবাসী, ১৩২১, মাঘ ৪৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

৮০. কৈবর্তরাজ ভীম যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।১৭, ২০ টীকা); যুদ্ধান্তে ভীম বিত্তপাল নামক জনৈক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।৩৬); হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (রামচরিত)

৮১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়

সেন রাজগণ

বর্ম রাজগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইলে বঙ্গে সেন রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেন রাজবংশ বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজ বংশ হইলেও কিরূপে কোন দুর্লঙ্ঘ্য সূত্র অবলম্বনে ইহারা বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, "জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয় কাহিনী ও প্রহেলিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি (কাঁটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে) এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, বল্লাল সেন দেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়াছে"[১]।

কিরূপে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বংশোদ্ভব" এই সেন রাজবংশ গৌড় বঙ্গে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেকানেক মনীষিই অল্পাধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এখনও বহু পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরার মর্মোদ্ঘাটনের আয়োজন চলিতেছে। গৌড়ীয় পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এবং বঙ্গে বর্মরাজগণের শাসনদণ্ড শিথিলতা প্রাপ্ত হইলেই যে এই আগন্তুক রাজবংশ শক্তি সঞ্চার করিয়া গৌড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"সেন রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন দেবের (রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ার প্রাপ্ত) প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় :-[২]।

> "বংশে তস্যামরস্ত্রী বিতত রত কলা-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
> ক্ষৌণীন্দ্রৈবীর সেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্তি মদ্ভির্বভুবে।
> যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয় শুচয়ঃ সূক্তি-মাধ্বীক ধারাঃ
> পারাশর্য্যেণ বিশ্ব-শ্রবণ পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ"।।

লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনেও লিখিত আছে[৩] :-

> "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণর্গণে বীরসেনস্য বংশে
> কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেন।
> কৃত্বা নির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মধিকতরাস্তুপাতা নাক নদ্যাং
> নির্ম্মিক্তো যেন যুধ্যদ্রি পুরুধিরকণা কীর্ণধারঃ কৃপাণঃ।।"

বীরসেন :

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সেন রাজগণ "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীরসেনের বংশ-সম্ভূত। বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে, বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন।[৪] গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্য বীরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই সেন রাজগণের পূর্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৫] দেবীপুরাণে অযোধ্যায় বীরসেন নামক রাজার নাম আছে দেখিয়া হান্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাংলায় আগমন করেন।

"বিপ্রকুলকল্পলতিকা" গ্রন্থের মতে দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দকেতু সেন জন্মগ্রহণ করেন, কাঁহার বংশে বীরসেন উৎপন্ন হন।[৬] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন "পারশর্য্য ব্যাস দেব যাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণনায় বিশ্ব নিবাসীগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণপ্রাপ্ত হইয়াও (মহাভারতোক্ত নল রাজার পিতা বীরসেনের কথা চিন্তা না করিয়া) কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশূর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৭]

"ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। হর্ষচরিতে আছে-রাজ গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া ভদ্রসেনের ভ্রাতা বীর সেন স্ত্রী বিশ্বাসী কলিঙ্গরাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।[৮] হর্ষচরিতেই সৌবীর পতি অন্য এক বীরসেনের নাম পাওয়া যায়।[৯] এই সকল বীরসেন সেন বংশের পূর্বপুরুষ নহেন, কারণ সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন।

সামন্তসেন :

সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ও শিলালিপিতে সর্ব প্রথমে সামন্ত সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার (সেই চন্দ্র দেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা বিশ্ব নিবাসীগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ধবল কীর্তি তরঙ্গে আকাশ তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচার পালন খ্যাতিগর্বে গর্বান্বিত রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।" তাঁহাদিগের বংশের প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাদার, শত্রু সেনাসাগরে প্রলয় তপন, সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্তি জ্যোৎস্নায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদ বনের উল্লাস লীলা সম্পাদক শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন ; এবং আজন্ম স্নেহ পাশ নিবন্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।[১০]

বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত যে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে নিহত করিয়াছিলেন।[১১] পরবর্তী শ্লোকে লিখিত আছে, "যে স্থান আজ্য ধূমের সুগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে মৃগ শিশু বৈখানস-রমণীগণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, যে স্থান ব্রহ্মপরায়ণ, ভব ভয়াক্রান্ত ধার্মিক তপস্বিগণ সেবিত সেই গঙ্গা পুলিন পরিসরের পুণ্যাশ্রম নিচয়েই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন"।[১২] সামন্তসেনের কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণের দমন ও বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাপুলিন পরিসরের অরণ্যময়— পুণ্যাশ্রমে বাস, এবং রাজ্যলাভের পূর্বে বিজয় সেনের পিতৃ পিতামহ-কর্তৃক রাঢ় মণ্ডলকে অতুল বিভবে বিভূষিতা করার উক্তিতে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়া , গৌড় রাজ্যমালার লেখক মহাশয় এই সমুদয় প্রমাণ পরম্পরা আলোচনা পূর্বক প্রাচীন লিপির "কর্ণাট" রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্য কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিহ্লন দেব রচিত "বিক্রমাঙ্ক চরিত" গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া[১৩] কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সময় যাত্রার সহিত সামন্ত সেনের বঙ্গে আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "এক সময়ে গৌড়রাজ্যের একাংশের (রাঢ়ের) সহিত কর্ণাট[১৪] রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেন বংশের প্রথম নরপতি বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন "একাঙ্গ সেনা লইয়া, অরি কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন,[১৫] এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। আবার বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের (কাটোয়ায় প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, "চন্দ্রবংশে

অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; * * * * তাঁহারা সদাচার পালন খ্যাতি গর্বে রাঢ় দেশকে অনুভূতপূর্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)। এই রাজপুত্র গণের বংশে "শত্রু সেনা সাগরের প্রলয় তপন সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৪ শ্লোক)।" এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বাংলায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা রাঢ় নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময় রচিত। এইরূপ তুল্য কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্তৃক রাঢ় শাসনার্থ নিয়োজিত, (লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরে তাম্রশাসনে কথিত) "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাট রাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্লন বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপের এবং (হয়ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয় বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দেল্লরাজ কীর্তি বর্মার (রাজত্ব ১০৪৯-১১০০খ্রিষ্টাব্দ) আশ্রিত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে "গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাট রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনা নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্ত সেন তাহারই বংশধর।[১৬]

"(কলিঙ্গাধিপতি) গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,- চোড়গঙ্গ গঙ্গার তীর পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে "মন্দারাধিপতিকে" পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন।[১৭] এই সূত্রেই হয়ত কলিঙ্গপতির সহিত গৌড়পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গ পতিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। চোড়গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথমভাগে তাঁহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময় গৌড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসম্ভব নহে; এবং রামপালের মৃত্যুর পর হয়ত চোড়গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। রামপাল রাঢ়ও অবশ্য কর্ণাট-রাজের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি অনুসারে সামন্ত সেন যে সকল কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গৌড়াধিপেরই সেনা। সামন্ত সেন এই সকল "দুর্বৃত্তগণকে" বিনাশ করিয়াও রাঢ়ে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"[১৮]।

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী অনুমান করেন, 'সম্ভবত সামন্ত সেনের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের সংশ্রব ছিল। চোড়গঙ্গ উৎকলপ্রদেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে মন্দারাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৯]। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, চোড়গঙ্গ মন্দারাধিপতিকে নিহত করিয়া সামন্ত সেনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চোড়গঙ্গ কর্তৃক উৎকল রাজ্য ১০৪০ শক বা ১১১৮-১৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বেই বিজিত হইয়াছিলেন"।

মনোমোহন বাবু সেনবংশের সময় নিরূপণ করিয়া যে বংশলতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল-

সামন্ত সেন (সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)
(১১১৯-১১২০ খ্রিষ্টাব্দ)
↓
তদীয় পুত্র
হেমন্ত সেন = যশোদেবী
↓
পুত্র
বিজয় সেন (রাঘব এবং চোড়গঙ্গের সমসাময়িক)
(১১৪০-১১৫৮-৬০?)
↓
পুত্র
বল্লাল সেন (১১৫৮-৬০-১১৭০)
↓
লক্ষ্মণ সেন (১১৭০-১২০০) = শ্রীতান্দ্রা (?)
সম্বৎ ৫১, ৭৪, ৮০, ৮১
মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের নবদ্বীপজয়
(১১৯৯)
↓
পুত্র
বিশ্বরূপ সেন

আর্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত 'চণ্ড কৌশিক'[২০] নামক পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে- 'অলমতি বিস্তরেণ। আদিষ্টোহস্মি দুষ্টামাত্য-বুদ্ধিবাগুরাহলঙঘ্য সিংহরংহসা ভ্রূভঙ্গ লীলা-সমৃদ্ধ তাশেয-কণ্টকেন সমর-সাগরান্ত ভ্রর্মভুজ দণ্ড মন্দরাকৃষ্ট-লক্ষ্মী—স্বয়ংবর প্রণয়িনা শ্রীমহীপাল দেবেন। যস্যেমাং পুরাবিদঃ প্রশস্তি গাথা মুদাহরন্তি-

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতি গহনা মার্যচাণক্য-নীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুম নগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুব মুপগতা নদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দপাজ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপাল দেবঃ''।।

এস্থলে কবি লিখিয়াছেন, মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের অবতার। সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটত্ব লাভ করিয়া পুর্নজন্ম গ্রহণ করায়, তাহাদিগকে নিধন করিবার জন্যই মহীপাল নন্দবংশের উচ্ছেদকারী চন্দ্রগুপ্ত রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় ইহাকে মহীপাল কর্তৃক রাজেন্দ্র চোলের পরাভব কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কর্ণাট রাজ্যকে চোল রাজ্যের একাংশ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন[২১]।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজ মালার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, 'চোল রাজকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গৌড় রাজমালা-লেখক কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কর্ণাট শব্দের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে, বলা যাইতে পারে অনেকদিন হইতেই প্রাচ্য ভারতের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের

চালুক্য-রাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তাঁহারাও মহীপাল দেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ফলে 'কর্ণাটলক্ষ্মী' লুণ্ঠিত হইয়াছিল,-মহীপালের বিজয়োৎসবে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেন রাজবংশের পূর্ব পুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে (দক্ষিণ রাঢ়ে কর্ণাট রাজের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙ্গালি প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত পাল রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২২]।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেন রাজগণের পূর্বপুরুষ কোনও 'ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিককে' রাজেন্দ্র চোলের বিজয়যাত্রার অনুগামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাখালবাবু গৌড় রাজমালা-রচয়িতার যুক্তিজাল খণ্ডন করিবার মানসে যে সমুদয় তর্ক উপস্থিত করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন, 'সম্ভবত কল্যাণের চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল ও তাঁহার পুত্রত্রয়ের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের যে দুরাবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে সকলই সম্ভব। কিন্তু দিগ্বিজয়ের পরে কল্যাণের চালুক্য রাজগণ যে গৌড়, মগধ বা বঙ্গের কোন প্রদেশ আয়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কল্যাণ হইতে রাঢ় বহু দূর, তখনও আর্যাবর্ত বা দাক্ষিণাত্য রাজশূন্য হয় নাই। কল্যাণ হইতে গৌড়বঙ্গের বিজয়যাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু গৌড়বঙ্গের কোনও প্রদেশ অধিকার করিয়া আয়ত্তাধীন রাখা তখন দাক্ষিণাত্যের কোনও রাজার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন প্রাচীন পাল সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ত্রিপুরিতে ও রত্নপুরে চেদিরাজগণ, জেজাভুক্তিতে চন্দ্রাত্রেয়গণ, মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। * * * * বিহ্লনদেবের বাক্য হয়ত সত্য, কিন্তু চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যে রাঢ় অধিকার করিয়া তাহার শাসনভার কর্ণাটদেশীয় সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একথা ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিকিবে কিনা সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কন্নাডা ভাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায় ; কল্যাণ এই কর্ণাট দেশে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে কর্ণাট দেশীয় কোন রাজা আর্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তে আসিয়া স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * * * * * * * ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য রাজচক্রবর্তী রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেলপাডি গ্রামে চোলেশ্বর মন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত পর কেশরীবর্মা প্রথমে রাজেন্দ্র চোল দেবের নবম রাজ্যাঙ্কের যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলরাজ কর্তৃক বা মুযঙ্গি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন[২৩]।

চালুক্যরাজ এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বালগাম্বে গ্রামে আবিষ্কৃত কন্নাডা ভাষায় লিখিত এই জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দেবের রাজ্যকালীন একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্র চোল দেবকে গজের সহিত তুলনা করিতেন। মুশঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পরাজিত হইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বোধহয় বহু কর্ণাটদেশীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেব যখন উত্তরাপথ আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছিলেন তখন হয়ত কোনও ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিক ধন-ধান্য-পূর্ণা গৌড়ভূমির খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চোল বিজয় বৈজয়ন্তীর রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোল মণ্ডল হইতে রাজেন্দ্র চোলের বিজয়-বাহিনী উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পর্যন্ত দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবত গঙ্গোত্তরণকালে প্রথম মহীপাল দেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল!

রাজেন্দ্রচোল প্রত্যাবর্তন করিলে সেই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক পুরুষ সম্ভবত রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিল, তাঁহারই বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়া প্রশস্তি ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্ত সেন কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে শত্রুসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া তিনি বিদেশীয় গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডল বাসীগণ যথাসাধ্য বিদেশীয় কণ্টকোম্মূলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির অভাব হওয়ায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সামন্ত সেন রাঢ়বাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাংলাদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাঙ্গালি হইতে পারেন নাই, সেই জন্যই অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মীর কথা তাঁহার পৌত্রের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে সামন্ত সেনের পিতৃগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্ধমান ভুক্তির বাঢ়মণ্ডল সেন রাজবংশের প্রথম অধিকার, তদ্বংশে বিজয় সেনের পূর্বে কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাঢ়ীয় সেন রাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই জন্যই রামপালের বরেন্দ্রাভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত রাজগণের মধ্যে কোনও সেন রাজের নামের উল্লেখ নাই। রামপালদেব যখন কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমন্ত সেন রাজ্যচ্যুত হইয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় দিনপাত করিতেছিলেন।'[২৪]।

লক্ষ্মণ সেন দেব কর্তৃক প্রদত্ত সুন্দরবনে, আনুলিয়ায় এবং তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ত্রয়ের ৫ম শ্লোকে কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে[২৫]। ধোয়ী কবি-বিরচিত 'পবনদূতম্' গ্রন্থের নায়ক লক্ষ্মণ সেন। এই গ্রন্থে চোল রাজধানী কাঞ্চীপুর বা কাঞ্চী নগরীকে অমর-নগর গর্ব হরণকারী, দাক্ষিণাত্য ভূষণরূপে, বর্ণনা করা হইয়াছে[২৬]। কাঞ্চী চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রিষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাঞ্চী নগরী শাস্ত্রচর্চা ও বিদ্যাবিষয়ক গৌরবের জন্য ভারত বিখ্যাত হইয়া উঠে। বর্তমান সময়ে ইহা চিঙ্গল্‌পুট জেলার অন্তর্গত কঞ্জীভেরম নামক স্থান নামে পরিচিত।

ইহাতে অনুমিত হয় সেনরাজগণের পূর্ব পুরুষের অতীত গৌরব স্মৃতির সহিত কাঞ্চী নগরীর নাম বিশেষভাবে বিজড়িত ছিল, এজন্যই লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে এবং 'পবম দুতম্' গ্রন্থে ইহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাঞ্চী নগরী চোলরাজগণের রাজধানী ছিল, সুতরাং মনে হয়, সেন রাজগণ চোল ভূপতির বিজয়যাত্রার অনুগামী হইয়াই প্রথমত রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহীপাল কর্তৃক কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠিত হইলে সামন্ত সেন পরে গৌড়ীয় সেনাকুল বিধ্বস্ত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ইহাই হয়ত দেবপাড়া প্রশস্তি কারকের উল্লেখকরা উদ্দেশ্য ছিল। কল্যাণের চালুক্যরাজ কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য (১০৪০—১০৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে) কর্তৃক গৌড়রাজ পরাজিত হইবার পূর্বেই মহীপাল কর্তৃক চোল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়েই হয়ত কর্ণাটলক্ষ্মী 'দুর্বৃত্ত' গৌড়ীয় সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

হেমন্ত সেন :

সামন্ত সেনের খোদিত লিপি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। সামন্ত সেনের পুত্রের নাম হেমন্ত সেন। হেমন্তসেন সম্বন্ধে দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে [২৭]ঃ 'ভীষ্মের ন্যায় অশেষ পরমাত্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই সামন্তসেন হইতে নিজভুজমদে মত্ত অরাতিগণের মারাঙ্ক বীর ও চিরস্থায়ীরূপে প্রকাশিত নিষ্কলঙ্ক গুণসমূহ মহিমার আধার হেমন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'তাহার মস্তকে অর্ধেন্দু চূড়ামণি মহাদেবের চরণধূলি, কণ্ঠমধ্যে সত্যবাক্, কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শত্রুগণের কেশজাল এবং বাহুযুগলের সুদৃঢ় ধনুর ন্যায় চিহ্ন নিয়ত শোভিত ছিল।'

বিজয় সেন :

হেমন্ত সেনের ঔরসে 'স্বপর-নিখিলান্ত-পুরবধূশিরোরত্ন-শ্রেণি কিরণ-সরণিস্মের-চরনা,' 'সাধ্বীব্রত বিতত নিত্যোজ্জ্বলযশা', 'ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতি', 'কান্তিমতী' মহারাজ্ঞী যশোদেবীর গর্ভে পৃথীপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুমার কাল হইতেই 'অরাতি বল ধ্বংস ও চতুর্জলধি মেখলা বলয়সীমা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া বিজয় সেন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন[২৮]। দেবপাড়া প্রশস্তি রচয়িতা কবি উমাপতি ধর লিখিয়াছেন, বিজয় সেনের কীর্তিমালা প্রাচেতস্ অর্থাৎ বাল্মীকি কিংবা পরাশর নন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,-আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম"[২৯]! অত্যুক্তি প্রিয় কবি বিজয় সেনকে রামচন্দ্র এবং অর্জুন অপেক্ষাও সমধিক বীর্যশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন[৩০]। তিনি বাহুবলে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় কনকছত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন"[৩১]। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল[৩২]।

সেনবংশের প্রকৃত প্রথম রাজা বিজয়সেন। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় এবং ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন[৩৩], 'এই তাম্রশাসন খানির দ্বারা বিজয় সেন দেব তাহার মহিষী বিলাস দেবীর কনকতুলা পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড বর্ধন ভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাস সম্ভোগ ভাট্ট বড়াগ্রামে চারিটি পাটক, কান্তি জোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশ বিনির্গত রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, বহুস্কর দেবশম্যার পৌত্র ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র বাৎস্য গোত্রীয় ঋগ্বেদের আশ্বালায়ন শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয় কর শর্মাকে তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন 'বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে' প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা'[৩৪]। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিজয়সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই বিক্রমপুরে বিজয় সেনের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বঙ্গে বর্মরাজগণের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সম্ভবত বিজয়সেনই বর্মবংশীয় ভোজবর্মা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে বঙ্গের আধিপত্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

দান সাগর গ্রন্থে লিখিত আছে -

> 'তদনু বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো[৩৫]
> দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্যবীর ধ্বজত্বম্।
> শিখর বিনিহতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
> প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ।।'

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বরেন্দ্রেই বিজয় সেনের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে 'বর্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদন পালের দুর্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন! কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড়রাজ্যের কোনও অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্ম-রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্ত সেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন'[৩৬]।

হেমন্তসেনের বরেন্দ্রে আশ্রয় লওয়ার কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। দানসাগরের ভূমিকায় হেমন্তসেন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বরেন্দ্রে গমন

লক্ষিত হয় না[৩৭]। ইহারই পরের শ্লোকে হঠাৎ বিজয় সেনের বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভাব সুসঙ্গত হয় না। 'বিজয়সেন সম্ভবত মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পরবর্তী সময়ে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গ ইহার পূর্বেই বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল, রাঢ়ে ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই বিজয়সেন গঙ্গানদী উত্তরণপূর্বক বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন'[৩৮]। এমতাবস্থায় বরেন্দ্রে বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয় কল্পনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। বিজয়সেনই বাহুবলে গৌড়বঙ্গ-কামরূপ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সেনবংশের প্রথম রাজা। সুতরাং দানসাগরের ভূমিকায় লিখিত,-

'তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্র'

সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে আলোচ্য শ্লোকটি সমুদয় চরণের অর্থ সঙ্গতি করিলে-

'তদনু বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রঃ'

পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

আবির্ভাবকাল :

বিজয় সেনের অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে মনীষিগণ মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গৌড়রাজমালার লেখক প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ মহারথী ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসরণ করিয়া সামন্ত সেনকে খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে, হেমন্ত সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এবং বিজয় সেনকে দ্বিতীয়পাদে (আনুমানিক ১১২৫-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দে) স্থাপিত করিতে প্রয়াসী[৩৯]। আবার বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির একবিংশ শ্লোক এবং লক্ষ্মণ সংবতের সময় নির্ধারণ দ্বারা বিজয় সেনের অভ্যুদয়কাল একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে[৪] -

'ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যমামন নরূঢ়নিগূঢ় দোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসাং জিগায়'।।

অর্থাৎ ঃ- 'আপনি নান্যবীর বিজয়ী' কবিদিগের এইবাক্য শ্রবণ করতঃ মনে তাহার অন্যর্থ গ্রহ হওয়াতে, (অর্থাৎ আপনি অন্য বীর বিজয়ী নহেন্) তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্ত রোধের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ এবং গৌড় অতি ত্বরায় জয় করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধীগণ এই 'নান্য'কে কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ নান্যদেব বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। নেপালের রাজা জয়প্রতাপ মল্লের কাটামুণ্ডুতে প্রাপ্ত ৭৬৯ নেপালি সম্বতের (১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দের) শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের 'কর্ণাটক' বংশীয় রাজগণের বংশলতায় 'নান্যদেব' উপরোক্ত বংশের আদিপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন[৪১]। জার্মানির প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নান্যদেব ১০১৯ শকে বা ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়[৪২]। নেপাল তরাই-এর অন্তর্গত দোস্তিয়া পরগনার সিমরুণ গড় নামক স্থানে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নান্যদেব একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। যথা --

'নন্দেন্দু বিন্দু বিধু সম্মিত শাকবর্ষে
তৎশ্রাবণ সিতদলে মুনি সিদ্ধতথ্যাম্।
স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরিলগ্নে
শ্রীনান্যদেব নৃপতির্বিদধীত বাস্তুম্'।।

সুতরাং এই নান্যদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়সেনকে একাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই নিক্ষেপ

করিতে হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া, গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, 'দেবপাড়া প্রশস্তির 'নান্য এবং কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ 'নান্যদেব' অভিন্ন হইলেও একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বিজয় সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক; পরন্তু নান্যদেব দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং সেই সময়ে বিজয় সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে! কর্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশতালিকা অনুসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ! হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দে বা ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রতিপুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ নান্যদেব মোটামুটি ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গৌড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময় কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বিজয় সেন বরেন্দ্রে যে কার্য সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপর একজন কর্ণাট ক্ষত্রিয়, নান্যদেব, পূর্বাবধিই মিথিলায় সেই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ব্রতী বিজয় সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নান্যদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক[৪৩]। বিজয় সেন মিথিলা রাজ নান্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যিনি ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মিথিলার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক বিজয়সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে নিক্ষেপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মিথিলার কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, নান্যদেবের সপ্তম পুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকাব্দে বা ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে তদীয় ৩২ রাজ্যাঙ্কে সভাস্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্যাদা জ্ঞাপক পঞ্জী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন[৪৪]। অতএব নান্যদেব হইতে তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ২২৯ বৎসরের ব্যবধান পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ধারিত তিনপুরুষে শতাব্দী গণনা ধরিয়া লইলেও ঐ সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং নান্যদেবের সমসাময়িক বিজয় সেনকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদেই অনায়াসে স্থাপিত করা যাইতে পারে।

রাখাল বাবু বলেন, 'কুমার দেবীর সারনাথ লিপিতে, রামপাল চরিতে, বা বৈদ্যদেব ও মদনপালের তাম্রশাসনে এমন কোন কথাই নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বিজয়সেনকে খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করা যায়। সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল দেবের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে মহীপাল দেব ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা হইলে পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্যায় লিখিত হইতে পারে[৪৫] -

খ্রিষ্টাব্দ ১০২৫- প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু

খ্রিষ্টাব্দ ১০৪০- নয়পাল দেবের মৃত্যু। (গয়ায় কৃষ্ণ দ্বরিকা মন্দির ও নরসিংহ দেবের খোদিত লিপি ১৫শ রাজ্যাঙ্ক উৎকীর্ণ)

* খ্রিষ্টাব্দ ১০৫৩- তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের মৃত্যু। (আমগাছির তাম্রশাসন ১৩শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)

* খ্রিষ্টাব্দ ১০৫৫- ২য় মহীপালের মৃত্যু।

খ্রিষ্টাব্দ ১০৫৫- ২য় শূরপাল দেবের মৃত্যু।

খ্রিষ্টাব্দ ১০৯৭- রামপাল দেবের মৃত্যু (চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি ৪২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।

খ্রিষ্টাব্দ ১১০০- কুমার পাল দেবের মৃত্যু।
৩য় গোপালের মৃত্যু।

* খ্রিষ্টাব্দ ১১০৫- বিজয় সেন দেব কর্তৃক দক্ষিণ বরেন্দ্র জয়।

* খ্রিষ্টাব্দ ১১০৯- উত্তর বরেন্দ্রে মদনপাল দেব কর্তৃক তাম্রশাসন প্রদান।

* খ্রিষ্টাব্দ ১১১৪- মদনপাল দেবের মৃত্যু। (জয়নগরের খোদিত লিপি ১৪শ রাজ্যাঙ্ক)।
খ্রিষ্টাব্দ ১১১৯- বল্লাল সেনের মৃত্যু।
* খ্রিষ্টাব্দ ১১২০- লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক বরেন্দ্র বিজয় ও পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

'রামচরিত হইতে জানা গিয়াছে যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন -

"সিংহী সুত বিক্রান্তোনার্জ্জুন ধাম্না ভুব প্রদীপেন।
কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম (তাম্)।।
চণ্ডীচরণ সরোজ প্রাসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং।
নখলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ্ জগদ্বিজয়ঃ লক্ষ্মীঃ'[৪৬]।

কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে বা ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দুই তিন বৎসর পূর্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘট্টায় স্নান করিয়া বামন স্বামী শর্মাকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদনপাল কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাতীরবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গগমন করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয় মদন পাল দেব ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন[৪৭]। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই গৌড়েন্দ্র সম্ভবত মদনপাল দেব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার পাল ও মদন পালের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন[৪৮], তাহা সম্ভবত নির্ভুল হয় নাই। শ্রীযুক্ত আর্থার ভিনিস্ কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিগুলিই গণনা করিয়াছেন[৪৯], কিন্তু শুক্লপক্ষের হরিবাসরেও ভূমিদান করিবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না। সুতরাং ভিনিস্ সাহেবের গণিত সনগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 'মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবৎ সংক্রান্তিতে হরিবাসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।' আমরা ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব গণিতাধ্যাপক জ্যোতিষশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন, এম, এ. মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, ১০৬০ হইতে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১০৬২, ১০৬৬ *, ১০৭০ *, ১০৭৩, ১০৭৭, ১০৮১, ১০৮৫ *, ১১০০, ১১০৪ (দশমীযুক্ত একাদশী) ১১১৫, ১১১৯, ১১২৩, ১১৩৪ (শুদ্ধ দ্বাদশী), ১১৩৮, ১১৪২, ১১৫৩, ১১৫৭ সনে বিষুব-সংক্রান্তি দিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী কি শুদ্ধ দ্বাদশী তিথি পড়িয়াছিল। তারকাচিহ্নিত তিন বৎসরে শেষ রাত্রিতে সংক্রমণ হওয়ায় পরদিন সংক্রান্তি কৃত্য হইয়াছিল এবং সেই পরদিন একাদশী ও দ্বাদশী হইয়াছিল। ১১১৫ খ্রিষ্টাব্দে বিষুব সংক্রান্তির দিন প্রথম দ্বাদশী এবং পরে ত্রয়োদশী ছিল, কাজেই একাদশীর উপবাস পূর্বদিন হইয়াছিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের বিষুবদিন সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া জানা যায় যে, শুক্রবার ৩৬ দণ্ড ৫৮ পলে এবং ৩৯ দণ্ড ৩২ পলে বা ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে মহাবিষুবসংক্রান্তি হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন এ দেশের জন্য প্রত্যুষে ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে শুক্লা দশমী ত্যাগ হয়, এবং রাত্রি ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে একাদশী ত্যাগ হয়, সুতরাং দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস না হইয়া পরদিন ১লা বৈশাখ একাদশীর উপবাস হইয়াছিল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে 'সূর্যগত্যা বৈশাখ দিনে ১'; ইহার অর্থ ১লা বৈশাখ করিয়া যে রাত্রিতে সংক্রমণ হইয়াছিল, তাহার পরদিন হরিবাসরে ভূমিদান করা গ্রহণ করিলে, ১১০০ খ্রিষ্টাব্দই সুসঙ্গত হয়।

কুমার দেবীর সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রামপাল খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালদেব বোধহয় অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতে' একটি মাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন[৫১]। বিশেষত তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপালদেব শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন[৫২]। তৃতীয় গোপালদেবও অতি অল্পকালই সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং শৈশবেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৫৩]। তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদন পাল দেব গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েন্দ্র মদন পালদেবকেই সম্ভবত বিজয় সেন পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। সুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

দেবপাড়া প্রশস্তির একবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে [৫৫]—

"শূরং মন্যইবাসিনান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘ্যসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহ র্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহযামিকৈর্নিয়ামিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ"।।

অর্থাৎ, হে নান্য! তুমি কি আপনাকে শূর বলিয়া মনে কর? হে রাঘব! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘা করিতেছ? হে বর্ধন! তুমি স্পর্ধা ত্যাগ কর। হে বীর! অদ্যাপি কি তোমার দর্প দূর হইল না? (বিজয় সেন কর্তৃক কারানিবদ্ধ) বন্দী ভূপালদিগের পরস্পরের এবম্বিধ কথোপকথনে কারাগৃহের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদন-ক্লান্তি নিয়মিত হইয়াছিল।' সুতরাং ইহাতে মনে হয়, বিজয় সেন নান্য, রাঘব, বর্ধন এবং বীর নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত নান্যদেব যে মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রামপালের বরেন্দ্র অভিযানের সহযাত্রী 'কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্ধন'[৫৬] এবং 'নানারত্নকূটকুট্টিমবিকটকোটাটবিকণ্ঠীরবো দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী বীরগুণ'[৫৭] নামক নরপতিদ্বয় বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত, বর্দ্ধন এবং বীর নামক ভূপালদ্বয় কিনা তাহা জানা যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী এই রাঘবকে কলিঙ্গাধিপতি রাঘব বলিয়া মনে করেন[৫৮]। তিনি বলেন, '১১৫৬-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাঘব নামক একজন রাজাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়[৫৯]। রাঘবের রাজত্বের প্রথমাংশে (১১৫৬-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে) বিজয় সেনের রাজত্বের শেষাংশ পতিত হইয়াছিল অনমান করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।[৬০]'

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের তাম্রশাসনানুসারে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে[৬১]। চোড়গঙ্গ ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন[৬২]। তৎপরে তদীয় পুত্র ভানুদেবকে আমরা ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই এবং পরে ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বা তৎসমীপবর্তী কোনও সময়ে রাঘব রাজ্য লাভ করেন[৬৩]। সুতরাং কলিঙ্গাধিপতি রাঘবকে বন্দী করিতে হইলে বিজয় সেন যে ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দেরও পরে জীবিত থাকিয়া সমরক্রীড়া করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ সম্বতের আরম্ভ কাল (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ) লক্ষ্মণ সেনের জন্মসন ধরিয়া লইলেও লক্ষ্মণ সেনের জন্মসময়ে তদীয় পিতামহের বয়ঃক্রম যে অন্যূন ৪০ বৎসর হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দে

বিজয় সেনের বয়স ৭৭ বৎসর হয়। সুতরাং ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পরে অশীতিপর বৃদ্ধ বিজয় সেন যে বানপ্রস্থাবলম্বন না করিয়া দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষত দেবপাড়া প্রশস্তির বিংশ শ্লোকের শেষার্ধে বিজয় সেন কর্তৃক কলিঙ্গ এবং কামরূপ বিজয়ের প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই শ্লোকে কলিঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহারই অব্যবহিত পরের শ্লোকে রাঘবের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঘব এবং কলিঙ্গাধিপতি অভিন্ন নহেন। কলিঙ্গ বিজয়ের আভাস পূর্ব শ্লোকেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ প্রশস্তিকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কলিঙ্গপতির নামোল্লেখ করাই যদি প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য হইত তবে গৌড়াধিপের এবং কামরূপরাজেরও নামোল্লেখ করা হইল না কেন? সুতরাং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবপাড়া প্রশস্তির রাঘবের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের পৌত্র রাঘবের অভিন্নত্ব কল্পনা করিবার অপর কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

বল্লাল চরিতে লিখিত আছে[৬৪],-

'তস্মাদ্বিজয় সেনোভূচ্চোড়গঙ্গ সখো নৃপঃ।
যোজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎসাং চতুঃসাগর মেখলাম্''।।

চোড়গঙ্গ ও বিজয় সেন :

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ ১০৭৮-১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে বিজয়সেনের সমসাময়িক ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজয় সেনের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন[৬৫], 'উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৬৬]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্তবর্মা উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্মা মন্দার দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৬৭]। এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে বৈদ্যদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। 'দক্ষিণ বঙ্গের সমর বিজয় ব্যাপারে চতুর্দিক হইতে সমুত্থিত তদীয় নৌবাট হী হী রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজসমূহ গম্য স্থানের অসদ্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণা-সমূহ আকাসে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে চন্দ্র মণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত'[৬৮]। বিজয়সেন এইসময়ে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। চোড়গঙ্গের এই গৌড়াভিযানের পরে বোধ হয় তিনি দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় বোধ হয়, বিজয় সেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন'।

বিজয় সেন যে চোড়গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন অথবা চোড়গঙ্গ কর্তৃক দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণের ফলেই যে তিনি বিজয় সেন কর্তৃক রাঢ় দেশে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়া সম্ভবত চোড়গঙ্গকে কলিঙ্গের কোনও স্থানেই পরাজিত করিয়াছিলেন। এই কলিঙ্গ বিজয়ের প্রসঙ্গেই বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপালের রাজত্বের শেষ সময় হইতেই বিজয় সেনের প্রতাপ পালরাজ্যে অনুভূত হইতেছিল। রামপালের পুত্র কুমার পাল অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন[৬৯] সন্দেহ নাই, কিন্তু তদীয় মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের বাহুবল-রক্ষিত পাল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন সংঘটিত হইতে আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কুমার পালের পুত্র গোপাল দেবের পরে রামপালের অপর পুত্র মদন পাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যোৎস্না-ধবল-কীর্তিপুর দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্তসাগর মেখলা পৃথিবীকে পালন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সময়েই পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন

সংগঠিত হইয়াছিল। মদন পালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যে পাল রাজগণের শৌর্যবিক্রমে কুন্তল, অঙ্গ, কর্ণাট এবং মধ্যদেশের রাজন্যবর্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ খর্ব হইয়াছিল[৭০], কালের কঠোর শাসনে বঙ্গীয় প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় রাজবংশের বংশধর মদনপাল দেব সমগ্র বরেন্দ্রীর অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েই বিজয় সেন বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই, রামপালের মৃত্যুর পরে, পাল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোড়গঙ্গ বিজয় বাহিনী সহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে, বঙ্গের বর্মরাজগণের হীনাবস্থা ও গৌড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সন্দর্শন করিয়াই সম্ভবত বিজয় সেন রাঢ়েও বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। রাঢ়ে ও বঙ্গে এই অভিনব রাজশক্তির অভ্যুদয় দেখিয়াই বোধহয় বৈদ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গের কোনও স্থানে জলযুদ্ধে বিজয় সেনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং এই জলযুদ্ধের ফলে বিজয় সেন বৈদ্যদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

দিব্যোক ও বিজয় সেন :

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে, "প্রতিদিন রণস্থলে তৎকর্তৃক পরাজিত নৃপতিগণকে কাহার সাধ্য গণনা করে? এ জগতে তাঁহার স্ববংশের পূর্ব পুরুষ সুধাংশুই কেবল রাজ্য উপাধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংখ্যাতীত কপীন্দ্র-সৈন্য-নেতা রামচন্দ্র বা পাণ্ডব চমূনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলনা করিব? তিনি ঘড়্গলতাবতাংসি ভুজদ্বারা সপ্ত-সমুদ্র বেষ্টিত বসুধাচক্র একরাজ্য-ফল স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। (দেবতাগণ মধ্যে) এক এক গুণে দিদ্ধ হইয়া কেহ সংহার করেন, কেহ রক্ষা করেন, কেহ জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইনি বহুগুণ দ্বারা বিদ্বেষিগণকে দলন, আশ্রিতগণকে পালন, এবং শত্রুগণকে সংহার পূর্বক (স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করিয়া) স্বয়ং দেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।[৭১] প্রতিপক্ষ রাজগণকে দিব্যভূমি দান করিয়া (স্বর্গে প্রেরণ করিয়া) বিনিময়ে স্বয়ং পৃথিবীর রাজ্য রাখিয়া তিনি বীরাসৃগ্লিপ্ত স্বীয় অসিকেই দানপত্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। যদি ইহার অন্যথা হইত তবে ভোগে বিবাদোন্মুখী বসুমতী আকৃষ্ট কৃপাণধারী এই রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইবে এবং শত্রুসন্ততিগণই বা কেন (রণে) ভঙ্গ দিবে"? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "উদ্ধৃত শিলালেখের ১৭ শ, ১৮ শ, ও ১৯ শ শ্লোক হইতে কতকটা প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস পাইতেছি। ঐ শ্লোকত্রয়ের দ্ব্যর্থ রহিয়াছে। ১৭ শ শ্লোকোক্ত রাম ও পার্থ একপক্ষে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র ও মহাবীর অর্জুন, অপরপক্ষে গৌড়াধিপ রামপাল ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ অঙ্গাধিপ মহনকে ইঙ্গিত করিতেছে। ১৮ শ শ্লোকের "দিব্যাঃ প্রজাঃ", মদন পালের মনহলি-তাম্রলেখের ১৫ শ শ্লোক-বর্ণিত "দিব্য প্রজা"[৭২] এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপির ১৯ শ শ্লোকের "দিব্যভুবঃ" এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতোক্ত (৪।২) "দিব্য বিশয়"[৭৩] যেন একই বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছে।" "তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের লীলাস্থলী উত্তর রাঢ় বটে, কিন্তু যখন ২য় মহীপালের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমি কৈবর্ত নায়ক দিব্যের অধিকারে আসিল, শূরপাল ও রামপাল পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় বিজয় সেন নৌবিতান সাহায্যে গঙ্গার অপর পারে নিদ্রাবলী নামক স্থানে[৭৪] আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎপরে নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সহিত তাঁহাকে একাধিকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গৌড়াধিপ রামপালের আহ্বানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্ষ্মী-অর্জন ও কৈবর্ত নায়ক ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয়সেনেরও ভাবী সৌভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রামপাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামন্ত রাজগণ সকলে মিলিয়া কৈবর্ত প্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐ ব্যাপারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল সন্দেহ নাই। অত্যুক্তিপ্রিয়

বিজয় সেনের প্রশস্তিকার "দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতাং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যেন বিজয় সেনের উপরই সেই পুরা বাহাদুরি দিতে চান। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয় সেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে পার্শ্ববর্তী সকল নৃপতির সহিতই তাঁহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। সুতরাং যে পালবংশের হইয়া একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পালবংশই তাঁহার উদীয়মান প্রভাব খর্ব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাই বিজয় সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ "পরিতিক্ষিতিভৃৎ" অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন"[৭৫]।

রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত-চক্রের অন্যতম নিদ্রাবলীর বিজয়রাজের সহিত বিজয়সেনের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া নগেন্দ্রবাবু বিজয়সেনকে কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবপাড়া প্রশস্তির লিখিত "দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতাং" প্রভৃতি উক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিদ্রাবলীর বিজয়রাজই যে সেন বংশীয় বিজয় সেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সামন্ত সেনের পূর্ববর্তী সেনবংশীয়গণ রাঢ় দেশে বাস করিতেন। সামন্ত সেনও হেমন্ত সেনের বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন যে প্রথমে রাঢ় ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই সম্ভবত বরেন্দ্র ভূমিতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে।

বল্লাল সেনের সীতাহাটি-তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে[৭৬], "তাহা [হেমন্ত সেন] হইতে অখিল পার্থিব চক্রবর্তী পৃথ্বিপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে সাহসাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছেন এবং দিক্‌পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্তি গীত হইত"।

সাহসাঙ্ক ও বিজয় সেন :

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন[৭৭], "একে একে পাল রাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয় সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল[৭৮]। রামচরিতে দেবগ্রাম বাল বলভী-পতি বিক্রমরাজ ও[৭৯] রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয় সেনকে বিক্রমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও একজন অতি বিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক[৮০] নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন।"

নগেন্দ্রবাবু "বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক" পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয়ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রম রাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই?

জীমূতবাহন ও বিজয় সেন :

দায়ভাগ কার জীমূতবাহন, বিশ্বক্ সেনের আমাত্য ও প্রাড়্ বিবাক ছিলেন বলিয়া এডুমিশ্রের কারিকায় উক্ত হইয়াছে[৮১]। ইনি সাবর্ণগোত্রীয় পরিভদ্র কুলোদ্ভব। জীমূতবাহন ১০১৩—১০১৪ শাকে বা ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন[৮২]। বিষ্‌বক্ সেন বিজয় সেনেরই নামান্তর ; সুতরাং বোধ হইতেছে, যে সময়ে বিজয় সেন রাঢ় মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া একদিকে পালরাজ এবং অপর দিকে বর্মবংশীয় নৃপতিগণের কবল হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন, ঐ সময়ে জীমূতবাহন তদীয় অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিজয় সেনের নৌবিতান :

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে[৮৩], "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়াচ্ছলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ পথে যে নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্দুকলার ন্যায় জ্বলিতেছে"। ইহার তাৎপর্য এই যে—"মহাদেবের মস্তক হইতে গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত পরাজয় না করিলে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমস্ত অধিকার হইতে পারে না। এজন্য, বিজয় সেনের রণতরীসমূহ শিবের মস্তক পর্যন্ত গমন করিয়াছিল, এবং তথায় একখানি রণতরী ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে"। সুতরাং ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয় সেন নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ ভূপতি বিজয় সেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিজয় সেনের এই বঙ্গীয় নৌবহর গঙ্গার বীচিমেখলা আলোড়িত করিয়া হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে! "বাচঃ পল্লবয়িত" উমাপতি ধরের এই উক্তি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে কতদূর টিকিবে তাহা বলা যায় না। গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "গৌড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [পাশ্চত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে "নৌবিতান" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্মরাজ "কর্তৃক বিজয় সেনের গতিরুদ্ধ হইয়াছিল"[৮৪]। কিন্তু পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয় সেনের যে নৌবিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষত বর্মরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে সম্ভবত এই নৌবিতান প্রেরিত হইয়াছিল।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে[৮৫], "সর্বদা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের যূপস্তম্ভের অগ্রভাগ অবলম্বন পূর্বক কালক্রমে ধর্ম একপদ হইয়াও সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আহত-শত্রু-নিকর পরিব্যাপ্ত মেরু প্রদেশের পাদদেশ হইতে অমরদিগকে যজ্ঞদ্বারা আহ্বান করিয়া তিনি স্বর্গ ও মর্তের অধিবাসীবৃন্দকে স্বীয় আবাস ভূমির পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক অত্যুচ্চ দেব মন্দির নির্মাণ এবং বিস্তৃত জলাশয় সমূহ খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর পরস্পরের সৌসাদৃশ্য সংঘটন করিয়াছিলেন"।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন[৮৬], "কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেরুই উক্ত শ্লোকের মেরু। সুতরাং কর্ণমেরু-ভূথিত ভূস্বর্গ কাশীধামে গিয়া বিজয় সেন শত্রুকুল সংহার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই আভাস পাইতেছি। বলা বাহুল্য, তৎকালে কাশীধামে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি যে সকল দেব বা ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বারাণসীর মধ্যবর্তী কর্ণমেরুর পার্শ্ববর্তী কর্ণাবতী-সমাজস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়"। এই অনুমান হয়ত সত্য হইতে পারে। যাহা হউক এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন বারাণসী পর্যন্তও তদীয় বিজয় বাহিনী প্রেরণ

করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয় সেনের "নৌবিতান" গঙ্গা বাহিয়া যে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্তত ইহা যে গৌড়-বঙ্গের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বিজয় সেনের ধর্মানুরাগ :

পূর্বোল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে বিজয় সেনের বৈদিক ধর্মানুরাগ সূচিত হয়। বিজয় সেনের এই বৈদিক ধর্মানুরাগের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রভৃত বিভবশালী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়! কবি উমাপতিধর সেই অভূতপূর্ব বিভব প্রাপ্তি এবং রাজার দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন[৮৭], "তাঁহার প্রসাদে শ্রোয়িত ব্রাহ্মণগণ এরূপ বহু বৈভবশালী হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রীয় রমণীগণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীজ, মরকতকে শাকপত্র, রৌপ্যকে অলাবু পুষ্প, রত্নকে দাড়িম্ব-বীজ এবং স্বর্ণকে কুষ্মাণ্ডলতার বিকশিত কুসুম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিল"।

বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রের দেওপাড়া নামক স্থানে স্বীয় বিজয়কীর্তির স্তম্ভস্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বরের বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব মন্দিরের পুরোভাগে "পাতাল প্রদেশস্থ নাগরমণীগণের মুকুটমণির কিরণ জালে উজ্জ্বল এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়াছিলেন"[৮৮]। "ভূপাল স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে মহাদেবকে কল্প-কাপালিক বেশে সজ্জীভূত করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র চর্মের পরিবর্তে বিচিত্র কৈশের বস্ত্র দ্বারা, সর্পমালার পরিবর্তে হৃদয়ে লম্বমান স্থূল হার দ্বারা, ভস্মের পরিবর্তে চন্দনানুলেপন দ্বারা, জপমালা-গ্রথিত নীলমুক্তা দ্বারা, এবং নরকপাল-পরিবর্তে মনোহর মুক্তাদ্বারা, তদীয় নেপথ্য-কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন"[৮৯]। বিজয় সেনের "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্টেও মনে হয় তিনি পরম শৈব ছিলেন। সেখ শুভোদয়ায় লিখিত আছে, "তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না"।

বল্লাল সেন :

"এই (বিজয় সেন) হইতে অশেস ভুবনোৎসব কারনেন্দু জগৎপতি বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! তিনি যে কেবল সমুদয় নরেশ্বর গণের একমাত্র চক্রবর্তী ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সমগ্র বিবুধমণ্ডলীর ও চক্রবর্তী ছিলেন"[৯০]। "পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার ন্যায়, বাল রজনীকর-শেখরের পত্নী গৌরীর ন্যায়, মহারাজ বিজয় সেনের প্রধানা মহিষী বিলাস দেবী অন্তঃপুরের মৌলি-মণি স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন ; ইনি সুতপস্যার সুকৃতির ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় বল্লাল সেনকে প্রসব করিয়াছিলেন। যে নরদেব সিংহ পিতার অনন্তর একমাত্র বীর বলিয়া সিংহাসন রূপ পর্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন"[৯১]।

বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী :

বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন—বল্লাল সেন বিষ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র[৯২], কেহ বলেন, তিন ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। কথিত আছে, "রাজা বিজয় সেন বল্লাল জননীকে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে নির্বাসিত করেন। বল্লালের মাতা বিজয়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন, কিন্তু সপত্নীর সহিত তাঁহার বনিত না ; তজ্জন্যই তিনি নির্বাসিত হন। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বল্লাল সেনের জন্ম হয়, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। অরণ্যপ্রদেশে জন্ম হওয়াতে, রাজকুমারের বল্লাল নাম হয়"[৯৩]। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় কিম্বদন্তীর বিশেষ কোনও মূল্য নাই, সুতরাং কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই এগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি। কেহ কেহ বল্লাল সেনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া, বরলাল বা বললাম (বলরাম?) নাম সুসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বল্লাল নামধেয় তিনজন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম বীর বল্লাল ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বীর বল্লাল (ত্রিভুবন-মল্ল-ভুজবল বীর গঙ্গ) ১১৭৩—১২১২ খ্রিষ্টাব্দে, তৃতীয় বীর

বল্লাল ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন[৯৪]। সুতরাং "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" সেন রাজগণের মধ্যে বল্লাল নাম থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

দানসাগর গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে লিখিত আছে —

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোহপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ"।।

এই মহাপুরুষ স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভা এবং রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গীয় প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদয়ে যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। সম্ভবত এক সময়ে তিনি অবতার রূপে পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই দান সাগরে তাঁহাকে "প্রত্যক্ষ নারায়ণ" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এজন্যই হয়ত বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। দান সাগরে উক্ত হইয়াছে[৯৫] ঃ—

"দৈন্যোত্তাপভৃতামকালজলদ সর্বোত্তরক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্তাতোহজনি গুণার্বিভাব গর্ভেশ্বরঃ"।।

এ স্থলে, "গুণার্বিভাব গর্ভেশ্বর" পদটী প্রণিধানযোগ্য। বিজয় সেন কি বল্লালের জন্ম হইতেই তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধীকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেম?

মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয়া রামদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেন রাজগণ গৌড়বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিবার পরেও সুদুর দাক্ষিণাত্যের সহিত সংশ্রব রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

আবির্ভাবকাল :

বল্লাল সেনের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বল্লাল সেন বিরচিত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ হইতে বল্লাল সেনের রাজ্যাভিষেকের কাল আবিষ্কার করিয়াছেন[৯৭]। অদ্ভুত সাগরের "সপ্তর্ষীনামদ্ভুতানি" প্রকরণে লিখিত আছে,—"ভুজ-বসু-দশ-মিতে (১০৮২ শকে) শ্রীমদ বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ বর্ষৈকষষ্ঠিমুনির্বিনিহিতো বিশেষায়াম্", ইহাতে ১০৮২ শক বা ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। বল্লাল সেন রচিত দানসাগর নামক নিবন্ধে লিখিত আছে—

"নিখিল চক্র তিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণে-
শশি নব দর্শমিতে শক বর্ষে দানসাগর রচিত"[৯৮]।

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন "দান সাগর" রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই প্রদেশে সংগৃহীত বল্লাল সেন রচিত যে অদ্ভুত সাগরের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে ঃ—[৯৯]।

"শাকে খনব খেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুত সাগরং
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালান-স্তংভরাহুর্মহীপতিঃ।।
গ্রন্থেহ স্মিনসমাপ্ত এব তনয়া সাম্রাজ্যরক্ষা-মহা-
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষন্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভার্থ্য সঃ।
নানা দান চিতাংবু সংচলনতঃ সূর্যাত্মজা সংগমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্যানুযাতো গতঃ।।
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি রতি শ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোদ্ভুত সাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল ভূমী ভূজঃ।
খ্যাতঃ কেবল মগ্নবঃ (?) সগরজ-স্তোমস্য তৎ পূরণ
প্রাবীণ্যেন ভগীরথস্তু ভূবনে ঽবদ্যাপি বিদ্যোততে"।।

অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল সেন ১০৯১ শাকে অদ্ভুত সাগরের আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া এবং তনয়ের উপর সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের উদ্যোগে অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত হইয়াছিল!

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের রচনা কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের যে সমুদয় পুঁথিতে কাল বিজ্ঞাপক শ্লোক রহিয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে লিপিবদ্ধ হওয়াই সম্ভব; কারণ উক্ত দুই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বোম্বাইয়ের কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত "দান সাগর" ও অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লাল সেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক নাগরী বা বাংলা অক্ষরে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল সেন এতদ্দেশে আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনিগণ কতশত কুলশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোনও তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য কোনও ব্রাহ্মণ হয়ত "অদ্ভুত সাগর" ও "দান সাগরের" মান বাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ সমূহের অনুলিপি নানদেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না"।[১০০]

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন[১০১]। "দান সাগর" স্মৃতি নিবন্ধ, এবং "অদ্ভুত সাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাঁহারা স্মৃতি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোনও কোনও লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেইজন্য সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না"।

"এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে যে "অদ্ভুত সাগরের" পুঁথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সহিত ভাণ্ডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। বোম্বাই এর পুঁথির মঙ্গলাচরণের প্রথম নয়টি শ্লোকেব পাঁচটি মাত্র দৃষ্ট হয় ; ২, ৩, ৪, এবং ৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোম্বাইএর পুস্তকে এই নয়টি শ্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল গ্রন্থ হইতে "অদ্ভুত সাগরেব" বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা-প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তালিকা এবং বিষয়সূচি অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির ভূমিকায় এই ১৯টি শ্লোকের একটিও স্থান লাভ করে নাই। এই সকল শ্লোকও কি তবে প্রক্ষিপ্ত?" বিষয়সূচির পর বোম্বাই-এর পুঁথিতে যে তিনটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত তিনটি শ্লোক এক সূত্রে গ্রথিত। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটিকে রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু

এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম দুইটি পরিত্যক্ত এবং তৃতীয়টি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায়, "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে" ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না"।

বল্লাল সেন রচিত দানসাগর গ্রন্থের দুইখানি পুঁথিতে সময় বিজ্ঞাপক শ্লোক আছে। ইহার একখানি ইণ্ডিয়া অফিসে সংগৃহীত হইয়াছে, অপরখানি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছে। এই শেষোক্ত পুঁথিখানিতে আরও দুইটি শ্লোক সন্নিবেশিত আছে, তাহা দ্বারা বল্লাল সেনের সময় আরও বিশদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক দুইটি অপর কোনও পুঁথিতে আছে বলিয়া জানা যায় না।

রবি ভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দান সাগরস্যাস্য।
ক্রমশোহত্র সম্পরিদানুপাদ্যা বৎসরা পঞ্চ।।
তদেব মেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রারেহণ্ঠিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ"।।[১০২]

দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগরের উপরোক্ত সময় জ্ঞাপক শ্লোক কয়টি দেখিয়া ডাঃ কিলহর্ণ তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন[১০৩]।

দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর নির্দিষ্ট শকাঙ্ক-দ্বয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন[১০৪], কিন্তু ঐ শকাঙ্ক দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার অছে, যদি ১০৯০ শকে বৃদ্ধ বল্লাল সেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও অদ্ভুত সাগর অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার তাহা দ্বারাই দান সাগর সম্পূর্ণ হইল কিরূপ? বলা বাহুল্য, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্টই তাঁহার হইয়া দান সাগর সমাধা করেন। দান সাগরের প্রথমাংশে বল্লাল সেন যেরূপ ব্রাহ্মণ ভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেষাংশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। শেষাংশে বল্লাল সেনের গুণ-গৌরব যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কখনই তাহা বিনয়ী বল্লাল সেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। অদ্ভুত সাগরের ন্যায় দান সাগরের শেষাংশও ভিন্ন হস্ত রচিত বলিয়া মনে করি"। দান সাগরে লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লাল সেন তদীয় গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের উপদেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১০৫]। বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে রচনা করিতে যত্ন করিয়াছিলেন[১০৬]। কিন্তু বল্লালের মৃতুর পর অসম্পূর্ণ দান সাগর গ্রন্থ যে অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

নগেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত দানসাগর পুঁথি প্রাচীন নহে। উহা তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। ইন্ডিয়া অফিসের পুঁথিখানিও ঐরূপ অক্ষরেই লিখিত[১০৭]। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত দানসাগর পুঁথিখানিও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুঁথিতে পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ সেন রাজবংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে[১০৮]। কলিকাতা ঠাকুর মহারাজের পুস্তকালয়ের পুঁথিখানি ১৭২৮ শকাব্দায় লিখিত হইলেও উহাতেও উক্ত শ্লোকগুলি লিখিত হয় নাই[১০৯]। এইরূপে প্রায় সমসাময়িক কালের লিখিত চারিখানি পুঁথির মধ্যে এক-খানিতে সময়জ্ঞাপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটি শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু অপর দুইখানিতে উহা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এতৎসুমদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে সম্ভবত অনুমিত হয় যে, সময়জ্ঞাপক প্রথম শ্লোকটি সর্বপ্রথমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এইজন্যই উহা দুইখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে; পরন্তু শেষ শ্লোকদ্বয় উহারও পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই একখানি পুঁথি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে উহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভাণ্ডারকার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও ঐ একখানি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে পরিলক্ষিত হয় না। অদ্ভুত সাগরের আরও

অনেকগুলি পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহার কোনও খানিতেই উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয় নাই। অদ্ভুত সাগরের যে যে পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

ক। কাশ্মিরের রঘুনাথ মন্দিরের পুঁথি[১১০]।

খ। বোম্বাই গবর্নমেন্টের পূর্ব-সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত পুঁথি[১১১]।

গ। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি[১]

ঘ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুঁথি[১১৩]।

ঙ। ইন্ডিয়া অফিসের পুঁথি[১১৪]।

ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দফার পুঁথিতে শ্লোকগুলি নাই।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে, মূলের অশুদ্ধতার জন্য অনেকগুলি শ্লোক বোধগম্য হয় না। আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে অশুদ্ধির পরিমাণ এত বেশি যে তজ্জন্য কোন্ অংশ আসল এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণে আধুনিক পুঁথিগুলিকে প্রমাণস্বরূপ ধরা যায় না।" সুতরাং দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের আধুনিক কালে লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেনের সময় নিরূপণ করা সমীচীন নহে!

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অষ্টগ্রামের দত্ত বংশের কুর্ষিনামার শিরোদেশে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথা লিখিত আছে বলিয়া জানা যায় ঃ—

"অষ্ট গ্রামের দত্ত বংশ।
শকাব্দাঃ ১০৬১। সন ৫৪৬, বঙ্গ গমন।

মাহে চন্দ্রর্ত্তুশূন্যাবনী সংখ্য শাকে, বল্লাল ভীতে। খল দত্তরাজ।
শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্ত প্রজগাম বঙ্গং"।।

শ্লোকটি অশুদ্ধ বলিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় "বল্লাল মোহমুদ্গার" গ্রন্থে শুদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন —

"চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্যশাকে, বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তঃ প্রজগাম বঙ্গং।।"

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় উহার শেষ চরণটির, "শ্রীমান নন্তৌ বিজহৌ চ বঙ্গং" এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কুর্ষিনামায় শ্লোকটি যেভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার লিখিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সমীচীন নহে।

সাম্রাজ্য বিভাগ :

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লাল সেন স্বীয় অধিকৃত রাজ্য, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, ও বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। প্রধান প্রধান নদীর স্রোতগতি দ্বারা স্বভাবত বা রাজকীয় রাজস্ব সুবিধা মতো আদায়ের জন্য এই পাঁচ ভাগে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয় তাহা জানা যায় নাই। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে হেমিল্টন সাহেব বল্লালকৃত এই দেশবিভাগের বিষয় সর্বপ্রথম উল্লেখপূর্বক সীমা নির্দেশ বিবরণ প্রকাশ করেন। তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমান বাংলাদেশ বল্লালের বহু পূর্ব হইতেই যে রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড, উপবঙ্গ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল তাহা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল সেনকে এই বিভাগের কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হেমিল্টন সাহেব কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। বল্লাল সেন গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড় বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসন সৌকর্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না

হইলেও, অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল চরিতের পরিশিষ্টে লিখিত আছে।—

"দান সাগর গ্রন্থস্য প্রণেত্রা লিখিতস্তথা।
বিজয় সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্ত সেন পৌত্রকঃ।।
বিখণ্ডিতং তেন বাজ্যং পঞ্চ খণ্ডেন তদ্ যথা।
বঙ্গ বাগড়ি বারেন্দ্র রাঢ়শ্চ মিথিলা তথা।
রাঢ়ী দ্বিজ কায়স্থানাং নিয়ন্ত্রা কুলকর্মণঃ।।
তেন সংস্থাপিতস্তত্র রাজধানী ত্রয়স্ততঃ।
সুবর্ণগ্রামে গৌড়ে চ নবদ্বীপে বিশেষতঃ।।"

গোপালভট্ট বিরচিত মূল বল্লাল চরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। আনন্দভট্ট গোপালভট্টের বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ প্রমাণের বলে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। সুতরাং পরবর্তীকালে রচিত আনন্দ ভট্টের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নহে।

কৌলীন্য প্রথা :

সকলেই বলিয়া থাকেন যে মহারাজ বল্লাল সেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। এ পর্যন্ত সেনরাজগণের প্রদত্ত যে কয়খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহাব কোনও উল্লেখ অথবা আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বল্লাল সেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন সমূহে তাম্রশাসন গ্রাহী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখকালে বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের কোনও কথাই নাই। বল্লালসেন যদি গৌড় বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোনও নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি করিযা থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা তাম্রপটে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লাল সেনের ১১শ রাজ্যাঙ্কের পরে এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ে এবং কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? * * * * বল্লালসেন সত্যই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিনা তাহার সত্যপ্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্যপ্রথা সম্ভবত মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কতৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোনও দিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি কবিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নতুন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে।"

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে ঃ—

"উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্বং মধ্যমেভ্যস্তু তো নৃপঃ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎদদৌ।।
তাম্র পাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্বং কলৌ বল্লাল সেনকঃ।।"

ইহা দ্বারাও বল্লালসেন যে কৌলীন্য প্রথাব প্রবর্তক তাহা প্রমাণিত হয় না।

উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে প্রসঙ্গত কুলীন অকুলীন

শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে যিনি বিদ্যা, সৌজন্য, বিনয়, সত্য ও আর্জব প্রভৃতি নানা গুণ বিভূষিত হইতেন, সমাজে তিনিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। রামায়ণে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন :—

"নিমর্য্যাদপুরুষঃ পাপাচার সমন্বিতঃ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্র দর্শনঃ।।
কুলীন মকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বা শুচিম্।।"

মানবধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা কুলের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে উত্তম কুলের সহিত কন্যাদানাদি কার্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; হীনকুল বর্জনপূর্বক উত্তমকুলের সহিত ক্রিয়া করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বিপরীতাচরণ করিলে ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে[১১৫]। আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ঃ—

"তদধ্যাস্যোদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপ সমন্বিতাং।।"

৭৭—৭ অঃ।

"পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি।।" ২৩৩—৮ অঃ।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীমান হয় যে মনুর সময়েই মহৎকুল ও কুলীন বলিয়া সমাজ-পার্থক্য জন্মিয়াছিল।

অমর কোষে লিখিত আছে, "মহাকুল কুলীনার্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ।" মহাকুল, কুলীন, আর্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু শব্দ একার্থ বোধক। যাজ্ঞ বল্কে উল্লিখিত আছে —

"মহোৎসাহঃ স্থূল লক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধ সেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্ব সম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।।"

৩০৯—১ অঃ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ঘটকর্পর বলিয়াছেন;—

"ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনাভবন্তি, ধনৈরাপদো মানবানিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবোনাস্তি লোকে, ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধ্বং।।"

কলাপ ব্যাকরণকার সর্ববর্মাচার্য্যও লিখিয়াছেন,— "ধনেন কুলম্।"

কেহ কেহ অনুমান করেন, "যাহারা বল্লাল সেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলীন্য মর্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার[১১৬] আছে, বল্লাল সেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময়ে রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদের অনুশীলন হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শক্তির উপাসক হইয়াছিলেন"[১১৭]। কিন্তু বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের যে কয়খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তান্ত্রিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বরূপ ও কেশব সেন শ্রুতিপাঠের জন্যই ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রশাসনে লিখিত আছে।

ঢাকুরে বল্লাল সেন সম্বন্ধে লিখিত আছে —

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীন পদ কাড়িযা লইল"।।

বৈদ্য কুলগ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলিয়াছেন —

"তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মানা।
স্থাপিতা কুলমর্যাদা সিদ্ধাদি বংশ জন্মনাং।
দুহি সেন প্রভৃতিনাং পুরাহি কৃত নিশ্চিতা"।।

পালবংশীয় রাজা নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপানি দত্ত ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত "চক্রদত্ত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যে মহারাজ বল্লালসেনের বহু পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই চক্রপানি দত্ত আপনাকে "লোধ্রবলী কুলীন" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন[১১৮]।

সুতরাং বল্লাল সেন যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক নহেন, তৎপূর্বেও যে দেশে কৌলীন্য সংবিধান ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্য :

বল্লাল সেন স্বয়ং বিদ্বান এবং বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। দান সাগর গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ১৩৭৫ প্রকার দানের প্রকার, সময় ও পাত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বরাহ, অগ্নি, ভবিষ্য, মৎস্য, কূর্ম, আদ্য প্রভৃতি পুরাণ, সাম্ব, কালিকা, নন্দী, আদিত্য নরসিংহ, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি উপপুরাণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাত্যায়ণ, জাবাল, সনন্দন, বৃহস্পতি, মনু, বশিষ্ঠ সংবর্ত, যাজ্ঞ্যবল্ক্য, গৌতম, যম, যোগীযাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, বৌধায়ন আঙ্গিরস, দানব্যাস, শঙ্খ, বৃহৎ বশিষ্ঠ, হারীত, পুলস্ত্য, শাতাতপ, আপস্তম্ভ, শাট্টায়ণ, মহব্যাস, লঘুব্যাস, লঘুহারীত, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সমূহ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অদ্ভুত সাগরে বৃদ্ধগর্গ, গর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, গার্গীয়, বার্হস্পত্য, বৃহস্পতি, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, কঠশ্রুতি, আথর্বন, অদ্ভুত, অসিত, ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণ, ঋষিপুত্র, গার্গী, অথর্ব, কালাবলি, সূর্যসিদ্ধান্ত, বিংধ্যবাসি, বাদরায়ণ, উশনা, শালিহোত্র, বিষ্ণুগুপ্ত, সুশ্রুত, পালকাপ্য, দেবল, ভার্গবীয়, বৈজবাপ্য, কাশ্যপ, নারদ, ময়ূর, চিত্র, চরক, যবনেশ্বর বরাহমিহিরাচার্য, বসন্তরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কান্দ, ভাগবত, আদ্য, আগ্নেয়, মৎস্যপুরাণ, রামায়ণ, ভারতাখ্যান, হরিবংশ, বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও শাস্ত্র সকলের প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বল্লাল সেনের রচিত একটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে[১১৯]।

বল্লাল সেনের ধর্মমত :

বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন সদাশিব মুদ্রাদ্বারা মুদ্রিত করা হইয়াছে[১২০], এবং বল্লাল সেন পরম মাহেশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন[১২১] তাম্রশাসনোক্ত ভূমি "শ্রীবৃষভ শঙ্কর সংজ্ঞক" নলের দ্বারা পরিমাণ করা হইয়াছে[১২৩]। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—"ওঁ নমঃ শিবায়। সন্ধ্যা কালীন নৃত্যকার্যে ভেরী-নিনাদ-তরঙ্গ দ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধ নারীশ্বর মহাদেব আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। যাঁহার নারীরূপ অর্ধাঙ্গে ললিত অঙ্গহার বলন দ্বারা এবং পুরুষাকার অর্ধাঙ্গে ভীমোদ্‌ভট্ট নৃত্যবেগ দ্বারা দ্বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হইতেছে"[১২২]। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বল্লালসেনদেব শৈব ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন[১২৫], 'রাজত্বের প্রথম সময়ে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে যে, সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্য তিনি জনৈক চণ্ডাল তনয়াকে অসদভিপ্রায়ে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। চণ্ডাল রমণীর বক্ষের উপর উপবেশন পূর্বক জপ করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় বলিয়া তারা বা বৌদ্ধ-শক্তির উপাসকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, রাজত্বের প্রারম্ভকালে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী না হইলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পরে, গাড়োয়াল প্রদেশান্তর্গত যোশীমঠ হইতে আগত সিংহগিরি নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর নিকট শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হইয়াছিলেন"। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বল্লাল চরিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বল্লালচরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে এবং শাসনলিপির প্রমাণে বল্লালচরিতের লিখিত বিষয়গুলি সমর্থিত হয় নাই। সুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার সন্নিকটবর্তী সীতহাটি নামক স্থানে বল্লাল সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লাল সেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্ধমান-ভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে বাল্লহিট্ঠ গ্রাম বরাহ দেব শর্মার প্রপৌত্র, ভদেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেব শর্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী-কৌথুম-শাখা-চরণানুষ্ঠায়ী শ্রীও বাসুদেব শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[১২৬]। বল্লাল সেন সম্ভবত ১১১৮ অথবা ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন :

বল্লাল সেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড় বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। "অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থে লিখিত আছে —

"গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জর পুরং ভার্যানুথাতোগতঃ।"

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনপূর্বক স্বীয় তনয়ের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া ভার্যাসহ গঙ্গাতীরস্থিত নির্জরপুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। দুর্লভ মল্লিক-কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "নদীয়া জেলার বাংলা মানচিত্রে (১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) বর্তমান নবদ্বীপের কিঞ্চিদধিক এক মাইল উত্তর পূর্বে "বল্লাল সেনের পুরাতন দীঘি" লিখিত আছে, ইহার নিকটে বল্লাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় ; অতএব বোধ হয়, এইস্থানে নির্জরপুর ছিল"। আবার নির্জরপুর শব্দের অর্থ স্বর্গপুর ধরিয়া কেহ কেহ উপরোক্ত শ্লোকের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, বল্লাল সেন স্বর্গপুরে গমন করিলে তদীয় ভার্যা সহমৃতা হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যে বৃদ্ধ বয়সে অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ রচনা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহা উক্ত গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। যথা —

"জ্যোতির্বিদার্য বচনানি বিচার্য তেষাং
তাৎপর্য পর্যবসিতৌ প্রথনানুপূর্বা।
বিপ্র-প্রসাদনবশানবসাদ-বুদ্ধি
র্নিশংক শংকর নৃপঃ কুরুতে প্রযত্নম্"।।

তিনি অদ্ভুত সাগরের রচনা কার্য সম্পূর্ণ করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন না ; আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—

"গ্রন্থেহ স্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্য রক্ষা মহা-
দীক্ষা পর্বণি দীক্ষাণান্নিজকৃতে র্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ সঃ"।

সুতরাং অদ্ভুত সাগর রচনারম্ভের অত্যল্প কাল পরেই যে তাঁহার দেহাত্যয় হইয়াছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সেন বংশীয় নরপতিগণ মধ্যে বিজয় সেনের পরে লক্ষণ সেনের ন্যায় বিপুল পরাক্রমশালী নৃপতি আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেশব সেনের তাম্র শাসনে উক্ত হইয়াছে[১২৭]—

"বাহূ বারণহস্ত-কাণ্ড সদৃশৌ শিলা সংহতং
বাণাঃ প্রাণহরদ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
'যস্যৈতাং সমরাঙ্গণ-প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধা চক্রেহনুরূপোহিপুঃ"।।

অর্থাৎ লক্ষণ সেনের বাহুদ্বয় বারণ-হস্ত-কাণ্ড সদৃশ, বক্ষঃ শিলাবৎ সংহত, বাণ শত্রু প্রাণহর ছিল ; লক্ষ্মণের হস্তিগণ, মদজল ক্ষরণ করিত। বিধাতা ঐ সকলকে সমরোপযোগী করিয়া তাঁহার অনুরূপ রিপু যে কোন স্থানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কে জানে?

লক্ষ্মণ সেন যে ধনুর্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন তাহা "সেক শুভোদয়া গ্রন্থে" উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি গঙ্গতীরে শরাভ্যাস করিতেন এবং তাঁহার শর গঙ্গার অপর তীরে গিয়া পড়িত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন :

লক্ষ্মণ সেন দেবের চারিখানি[১২৮] তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে একখানি সুন্দরবনের নিকট, একখানি দিনাজপুরের তর্পণ দীঘির নিকট, একখানি রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রামে এবং অপরখানি মাধাই নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনখানিই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সুন্দরবনের তাম্রশাসন—ইহা জগত্তর দেবশর্মার প্রপৌত্র, নারায়ণ দেব শর্মার পৌত্র, নরসিংহ দেব শর্মার পুত্র, গার্গ গোত্রীয় অঙ্গিরা, বৃহস্পতি শীলগর্গ ভরদ্বাজ প্রবর ঋগ্‌বেগাশ্বালায়ন-শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর দেব শর্মাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তন্তপাতী খাড়িমণ্ডলিকার মধ্যবর্তী তল্লপুর চতুরক গ্রামে; পূর্বে শান্তশাবিক প্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্ধ সীমা, পশ্চিমে শান্তশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব সীমা, উত্তরে শান্তশাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমি সীমা, চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি-কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমি উগ্রমাধব পাদীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্ত দ্বারা মাপ করা হইয়াছিল[১২৯]।

তাম্রশাসনে "সহ্য-দশাপরাধ" শব্দ আছে। যে দশবিধ অপরাধ করিলে ভূমির নিষ্করত্ব রহিত অথবা উহা বাজেয়াপ্ত করা হইত উৎসৃষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে গ্রহীতার সেই দশটি অপরাধও সহ্য করা হইবে, ইহাই "সহ্য-দশাপরাধ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে।

দিনাজপুরের তাম্রশাসন ঃ—এই শাসন দ্বারা হুতাশন দেবের প্রপৌত্র,মার্কণ্ডেয় দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভরদ্বাজ-অঙ্গিরা-বার্হস্পত্য-প্রবর সামবেদ কৌথুমশাখা-চারণানুষ্ঠায়ী হেমাশ্ব-রথ-মহাদানাচার্য ঈশ্বর দেবশর্মাকে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী পূর্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেয়াম্মণ ভূম্যাঢ়া বাপ পূর্বালিঃ সীমা, দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা, পশ্চিমে নন্দি হরিপা কুণ্ডী সীমা, উত্তরে মোল্লাণখাড়িসীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বিল্লাহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগ নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্যও যশোবৃদ্ধির জন্য হেমাশ্ব রথ মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ[১৩০] প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্তভূমিতে সম্বৎসরে দেড়শত কপর্দক পুরাণ[১৩১] মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত। রাজা লক্ষ্মণ সেন এক সময়ে যে স্বর্ণ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দান গৃহীতা ঈশ্বর দেবশর্মা তদুপক্ষে রাজার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দান ব্যাপারের দক্ষিণাস্বরূপ আচার্যকে বিল্লহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগনিষ্কর উপভোগের জন্য প্রদান করেন। ১২৫ আড়ত ধান্যবীজ দ্বারা বৎসর বৎসর তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইত।

আনুলিয়ার তাম্রশাসন —ইহা দ্বারা বিপ্রদাস দেবশর্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্মার পুত্র, কৌশিক গৌত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্বেদ কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটীস্থিত পূর্বে অশ্বত্থ বৃক্ষ

সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা, পশ্চিমে শান্তিগোপ শাসন সীমা, উত্তরে মালামঞ্চ-বাপী সীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাথুরিয়া খণ্ড ক্ষেত্র নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনভূমিতে সমবৎসরে একশত কপর্দক পুবাণ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।

মাধাই নগরেব তাম্রশাসন—এই তাম্রশাসন দ্বারা দামোদর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রামদেবশর্মার পৌত্র, কুমার দেবশর্মার পুত্র, কৌশিক গোত্রীয় * * * * প্রবর অথর্ব বেদ পৈপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্মাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রে কান্তাপুরাবৃত্ত রাবণ সরসিন্ধি স্থানে পূর্বে চড়স্পসাপাটক পশ্চিম ভূঃসীমা, দক্ষিণে গয়নগর উত্তর ভূঃসীমা, পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরাপাটক পূর্ব ভূঃসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দাপনিয়া পাটক নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি মানসে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসন গ্রামের বাৎসরিক আয় ১৬৮ "পুরাণ" (রৌপ্য মুদ্রা) ছিল।

চারিখানি তাম্রশাসনেই, তৃণ যুতি গোচরস্থ বা তৃণ যুতি গোচর পর্যন্ত, সসাট বিটপ, সজল স্থল, সগর্ত্তোষর, সগুবাক নারিকেল, ভূমির এক একটি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সমুদয় তাম্রশাসনেই চট্ট ভট্ট প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন মধ্যে অন্তত তিনখানির (সুন্দর বনের আনুলিয়ার এবং মাধাই নগরের) প্রতিগৃহিতা রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র পঞ্চ-গোত্র মধ্যে গার্গ ও কৌশিক গোত্রের উল্লেখ নাই। সম্ভবত সুন্দরবনের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা গার্গ গোত্রীয় ঋগ্বেদাশ্বালায়ন শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর গেবশর্মা শাকদ্বীপি, আনুলিয়াও মাধাইনগরের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা কৌশিক গোত্রীয় যজুর্বেদীয় কাণশাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা ও কৌশিক গোত্রীয় অথর্ব-বেদ পৈপ্পালাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্মা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বল্লাল সেন প্রবর্তীত কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন কেন তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

কামরূপ জয় :

মাধাইনগরের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেন "বিক্রমবশীকৃতকাপরূপাবনী-মণ্ডলৈক চক্রবর্তী গৌড়েশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ষণ সেনের সময়ে বঙ্গীয়সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার আভাস আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১০৭ শক সম্বতের (১১৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৩২]। বল্লভদেবেব পিতামহ রায়ারিদেব ত্রৈলোক্য সিংহের সময় বঙ্গাধিপতি কর্তৃক কামরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, "ভাস্করবংশ রাজতিলক রায়ারিদেব বঙ্গীয় মহাকায় করিবৃন্দের উপস্থিতি-নিবন্ধন বিষমযুদ্ধোৎসবে রিপুগণকে অস্ত্রচালনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন"[১৩৩]। রায়ারিদেব বঙ্গীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। "সুতরাং মাধাইনগর-তাম্রশাসনে উক্ত "বিক্রম-বশীকৃত কামরূপঃ" নিবর্থক না হইতেও পারে[১৩৪]। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেন কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়সেনের কামরূপ জয় স্থায়ী হয় নাই। সম্ভবত বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে অথবা বল্লালসেনের সময়ে কামরূপ-রাজ সেনবংশীয় নরপতিগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলে কামরূপ রাজ্য সেনরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্যই লক্ষ্মণ সেনকে পুনরায় কামরূপ রাজ্য জয় করিতে হইয়াছিল। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সম্ভবত প্রাগ্‌জোতিষেন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণ সেনের সংঘর্ষের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে[১৩৫]।

লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভা কবি শরণ-রচিত দুইটি শ্লোকের মধ্যে[১৩৬] একটিতে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রহিয়াছে। কবি উমাপতি ধর তিনটি শ্লোকে সেন বংশীয় কোনও রাজার সহিত কাশীবাসী প্রকৃতি-বৃন্দের প্রাগ্জ্যোতিষেন্দ্রের এবং ম্লেচ্ছনরেন্দ্র[১৩৭] সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শরণ-রচিত এই শ্লোকটিতে যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে। কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের শরণের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কামরূপে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গ সম্ভবত কাল্পনিক নহে।

আরাকান রাজ ও লক্ষ্মণ সেন :

১১৩৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবলপরাক্রমশালী মগরাজ গলয় আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[১৩৮]। বঙ্গেশ্বর উক্ত মগরাজকে পূজা করিতেন বলিয়া মগেরা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সময়ে লক্ষ্মণ সেন বঙ্গাধিপতি ছিলেন। তিনি দুর্বল হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন নাই। সুতরাং পরাক্রান্ত সীমান্তরাজের সহিত লক্ষ্মণসেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। আরাকানবাসী মগগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সময়ে সময়ে অশান্তি উৎপাদন করিত। সেনরাজগণের সময়ে এই উৎপাৎ প্রশমিত হইয়াছিল।

কলিঙ্গবিজয় :

মাধাইনগরের তাম্রশাসনের অন্যত্র লিখিত আছে, "যস্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি * * *: অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণ সহ কৌমারকেলি করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই সূচিত হয় ইনি কৈশোবাবস্থায়ই কলিঙ্গদেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয় সেন গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও বিজয় সেনের মৃত্যুর পর সম্ভবত চোড়গঙ্গ সেন রাজগণের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়সেনের জীবিতাবস্থায় বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করিতে সাহসী হন নাই। ফলে, পিতা বল্লাল সেনের আদেশে কুমার লক্ষ্মণ সেনই হয়ত কলিঙ্গাভিযানে গমন করিয়াছিলেন। শরণ বিরচিত একটি শ্লোকেও সেনবংশীয় রাজার কলিঙ্গে কেলি করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে[১৩৯]।

গোবিন্দচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেন :

লক্ষ্মণ সেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশীরাজের (কান্যকুব্জ রাজের) পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র দেব ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মগধ আক্রমণ করিয়া মুদ্গগিরি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন[১৪০]। দুর্বল মগধরাজ্যের প্রান্ত প্রদেশ লইয়া তৎকালে "অঙ্গেশ" পালরাজগণ, বঙ্গেশ্বর সেন রাজগণ এবং কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, সুতরাং কান্যকুব্জারাজ দুর্বল মগধরাজ্যে আপতিত হইলে, লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই বিরোধের ফলে হয়ত লক্ষ্মণ সেন বিজয় লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ :

বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসন দ্বয়ে লিখিত আছে, লক্ষ্মণ সেন, দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও গদাপাণির সংবাস বেদিতে, অসিবরুণার গঙ্গাসঙ্গম-বারাণসীক্ষেত্রে, ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণিতে, যজ্ঞযূপের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন[১৪১]। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, লক্ষ্মণ সেন একদিকে ত্রিবেণি এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র (বারাণসী) এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথক্ষেত্র (মুষলধর গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং) পর্যন্ত তদীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা প্রশস্তি কারকের অতিশয়োক্তি মাত্র, এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্তে কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে

স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসীক্ষেত্র কান্যকুব্জাধিপতি গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের এবং জগন্নাথক্ষেত্র কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মা চোরগঙ্গের শাসনাধীনে ছিল। উমাধিপতি ধর বিরচিত একটি শ্লোকে কাশীবিজয়ের ইঙ্গিত রহিযাছে। বলিয়াই মনে হয়[১৪২]।

বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় গোবিন্দপালদেব ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন[১৪৩]। উক্ত লিপিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, একদা গয়া, গোবিন্দ পালদেবের রাজভুক্ত ছিল। সম্ভবত লক্ষ্মণসেনই তাঁহার নিকট হইতে গয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়া-লিপিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে গয়া প্রদেশ সেনরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, কারণ তাহা না হইলে অশোকচল্ল দেবের ন্যায় একজন বিদেশী নরপতি লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহার করিতেন না।

বল্লাল সেনের মৃত্যু এবং লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনারোহণ কোন্ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে, বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণ সেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ; কারণ, লক্ষ্মণ সংবতের আরব্ধকাল নির্ণীত হওয়ায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দেই লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসম্বৎ :

লক্ষ্মণ সম্বতের সূচনা এবং প্রচলন সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরব্ধকাল সম্বন্ধে পূর্বে মতভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ [১৪৪] ও ডাক্তার কিলহর্ণের[১৪৫] সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধদ্বয় এবং আকবরনামায় উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে[১৪৬] প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসম্বৎ ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতে গণিত।

লক্ষ্মণ সেনের প্রচলিত অব্দ "লক্ষ্মণাব্দ", "লক্ষ্মণসংবৎ" বা "ল সং" নামে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে —

১ম—প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে সামন্ত সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অব্দ গণনার সৃষ্টি করেন এবং পরে ইহা লক্ষ্মণ সেনের নামে প্রচলিত হয়[১৪৭]।

২য়—তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে লক্ষ্মণাব্দ হেমন্ত সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে গণিত হইতেছে[১৪৮]।

৩য়—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে বিজয় সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইতেছে[১৪৯]।

৪র্থ—গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "পাল ও সেন রাজগণের সময় গৌড়মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না, নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছুদিন "বিনষ্ট রাজ্যের" বা "অতীত রাজ্য" সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অব্দের অভাব পূরণের জন্য লক্ষ্মণাব্দ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে"[১৫০]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লঘুভারতের একটি শ্লোকের[১৫১] উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনুমান করেন যে, বল্লাল নবজাত কুমারের নামে তাহার জন্মদিন হইতে এই সম্বৎ গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন[১৫২]। এই মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ দুইটি। প্রথমটি ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে গণিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে

মুসলমান বিজয়কাল হইতে গণিত হইয়াছে। সুহৃদ্বয়র শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীও এই মত সমর্থন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দই বর্তমান সময়ে "পরগনাতি সন" বা "সন বল্লালি' নামে বিক্রমপুরে প্রচলিত আছে[১৫৩]।

৫ম—ডাক্তার কিলহর্ণের মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে[১৫৪]। পূজ্যপাদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[১৫৫] এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১৫৬] এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,[১৫৭] "যে অব্দের নাম লক্ষ্মণাব্দ, তাহা লক্ষ্মণ সেনের কোনও পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনও রাজবংশের কোনও উত্তর পুরুষ, পূর্বপুরুষ-প্রচলিত অব্দ স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে লক্ষ্মণাব্দকে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তীত অব্দ বলা যাইতে পারে না। আর্যাবর্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্তৃক একাধিক অব্দ প্রচলনের একটিও দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের কালও হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে নাই"। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী তারিখ-যুক্ত যে সকল লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "অতীত" বা তদনুরূপ কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই[১৫৮]। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উক্ত প্রবাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরে উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ কবাই সঙ্গত। যদি লঘু ভারতের লিখিত প্রবাদকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন পূর্ণিয়া জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে স্থানীয় লোকের মুখে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মিথিলা বিজয় হইতে বিজয়ী নরপতি কর্তৃক এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়া ছিলেন তাহাই বা গৃহীত হইবে না কেন?

লক্ষ্মণ সেন প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত নরপতির দেহত্যাগ বা সিংহাসন-চ্যুতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য যে একটি শব্দের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপদ বলিয়া মনে হয় না ; বিশেষত কোনও রাজার মৃত্যুকাল হইতে বৎসর গণনা করিবার প্রথা অশ্রুতপূর্ব।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত "Notices of Sanskrit Mss" (in the Durbar Librady, Nepal) গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চারিখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিতে, "অব্দে লক্ষ্মণ সেন ভূপতি মতে"[১৫৯], "লক্ষ্মণাব্দে"[১৬০], "গত লক্ষ্মণ সেন দেবীয়"[১৬১] এবং "গত লক্ষ্মণ সেন বর্ষে"[১৬২] লিখিত আছে।

এ স্থলে "মতে" শব্দটি নিরর্থক বলিয়া মনে হয় না। "মতে" শব্দ ব্যবহার হওয়ায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণ সেন কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বল্লাল সেন বা সামন্ত সেন কর্তৃক হয় নাই এবং উহা যে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যলাভ এবং সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় হইতেই প্রচলিত ও প্রবর্তীত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদি লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতে প্রবর্তীত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতেও আর একটি অব্দের কল্পনা করিতে হয়। কারণ লক্ষ্মণসেনের যে কয়খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত তিনখানিতেও তারিখ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ তারিখগুলিকে লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজ্যাঙ্ক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং এক রাজার সময়ে দুই প্রকার অব্দ প্রচলিত থাকা প্রমাণিত হইতেছে। ইহাতে রাজকার্যে এবং প্রজাপুঞ্জের বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারেও গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্মণাব্দ এবং তদীয় রাজ্যাঙ্ক যে একই সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

বুদ্ধগয়ায় দুইখানি শিলালিপির[১৬৩] উপসংহারে লিখিত আছে ঃ—১ম—"শ্রমল্লক্ষ্মণসেন

স্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯।" ২য়—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ।" "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১"—ইহার অর্থ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সংবতে, অথবা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লোপের পরে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কিলহর্ণ এক সময়ে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১=১১২০+৫১-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পরে, মত পরিবর্তন করিয়াছেন। রাখালবাবু কিলহর্ণের পরিত্যক্ত মতই বজায় রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

অশোক-চল্লদেবের শিলালিপি-চতুষ্টয় :

গয়া জেলায় অশোক চল্লদেবের নামাঙ্কিত যে চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরোক্ত শিলালিপিদ্বয় তাহারই অন্তর্ভুক্ত। অপর দুইখানির মধ্যে একখানিতে তারিখ নাই, অন্যখানি ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উৎকীর্ণ। আমরা এই চারিখানি শিলালিপির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব ; কারণ এই শিলালিপি চতুষ্টয়ের তারিখ নির্ণীত হইতে বাংলার ইতিহাসের একটি বিবদমান বিষয়ে সুমীমাংসা হইবে।

১ম। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের সন্নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র সূর্য মন্দিরের গাত্রে-সংলগ্ন ১৮১৩ নির্বাণাব্দে উৎকীর্ণ লিপি[১৬৪]। এই লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কমাদেশাধিপতি পুরুষোত্তম সিংহ, বৌদ্ধ ধর্মের পতনোন্মুখ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া উহার পুনরুদ্ধার কল্পে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী সপদালক্ষ পর্বতের রাজা অশোক চল্লদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম সিংহ স্বীয় তনয়া রত্নশ্রীর গর্ভজাত মাণিক্য সিংহের মঙ্গল কামনায় একটি "গন্ধকুটী" মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির পুরুষোত্তমের গুরু শ্রমণ ধর্ম রক্ষিতের অধ্যক্ষতায় নির্মিত হয়[১৬৫]। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজি এই শিলালিপির অক্ষরমালা দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়। দ্বিতীয় শিলালিপির অক্ষর সমূহ দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতীয় পূর্বাঞ্চল-প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ[১৬৬]। এই শিলালিপির মর্ম এই যে, কতিপয় রাজপাদোপজীবীর প্রার্থনানুসারে রাজা অশোক চল্লদেব মহিপূকাল প্রাবিত্য বিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধ প্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহল দেশীয় সংঘেরা দীপ-সমন্বিত-চৈত্যত্রয়-বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এই লিপিখানিরই শেষ দুই পংক্তিতে লিখিত আছে — ,

"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১ ভাদ্রদিনে ২৯।"

৩য়। ইহার বর্ণমালাও দ্বিতীয় শিলালিপির অনুরূপ। এই শিলালিপি খানি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সহজপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের মানসিক দানের নিদর্শন। সহজপাল খস দেশাধিপতি মহারাজ অশোক চল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের একজন কর্মচারী ছিলেন। এই শিলালিপির সময়-জ্ঞাপক পংক্তি এইরূপ ঃ- -

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ"।

৪র্থ। এই লিপিখানিতে তারিখ নাই। কিন্তু ইহাতেও "রাজশ্রী অশোগচল্ল দেবের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "বুদ্ধকে নমস্কার জানাইয়া লিপিখানি আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং সম্ভবত ইহাতে কোনও দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাম্রশাসনাদিতে যেমন দানের নিয়মাদির উল্লেখ দেখা যায়, এই লিপির চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে সেইরূপ উল্লেখ আছে এবং অষ্টম পংক্তিতে অশোক চল্লদেব ও তাঁহার ধর্ম রক্ষিতেরও উল্লেখ আছে।" এই ধর্ম রক্ষিতের নাম প্রথম শিলালিপিতেও পাওয়া গিয়াছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পংক্তিতে সিংহলদেশীয় স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। এই স্থানেই সাধনিক ব্রহ্মচাট ও মাণ্ডলিক সহজপাল নামক দুইজন রাজ কর্মচারীর উল্লেখ আছে। তৃতীয় শিলালিপিতেও উহাদের নাম করা হইয়াছে। "সহজপাল,

যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামই ব্রহ্মচাট। তৃতীয় শিলালিপিতে "চাট ব্রহ্ম" বলিয়া লিখিত হইয়াছে[১৬৭]।

নির্বাণাব্দ : শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত চারিখানি শিলালিপির লিখিত অশোক চল্ল একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন[১৬৮]। সুতরাং এই লিপি চতুষ্টয়ের তারিখগুলি যে খুব কাছাকাছি সময়ের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই শিলালিপি চতুষ্টয় মধ্যে তিনখানিতে তারিখ দেওয়া আছে ; এবং তন্মধ্যে একখানিতে ১৮১৩ নির্বাণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্. এ মহাশয় নির্বাণাব্দের উপর নির্ভর করিয়া শিলালিপির তারিখ ঠিক করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির সম্পাদিত জগজ্যোতি পত্রিকার আবরণ পত্রে নির্বাণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা হইতে নলিনীবাবু প্রতিপন্ন করিতে চান যে, "১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ = ২৪৫৫ বুদ্ধাব্দ। সুতরাং ১৮১৩ নির্বাণাব্দ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২৪৫৫—১৮১৩ = ৬৪২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে ; কাজেই ১৮১৩ নির্বাণাব্দ ১৯১১—৬৪২ =১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সমান। এই ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ, ৫১ অতীত-রাজ্য-সন এবং ৭৪ অতীত-রাজ্য-সন পরস্পরের খুব নিকটবর্তী। সুতরাং ডাঃ কিলহর্ণ ও রাখাল বাবু "অতীত রাজ্যে" শব্দটির অর্থ যাহা ধরিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। "অতীত রাজ্যে" শব্দটির প্রকৃত অর্থ, "রাজ্যে অতীতে সতি," রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর। রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর একপঞ্চাশৎ এবং চতুঃসপ্ততিতম বৎসর যখন ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নিকটবর্তী তখন মিনহাজ যে লিখিয়াছেন যে, ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইয়াছিল, তাহাই ঠিক। ১৮১৩ নির্বাণাব্দ ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ অথবা ৬৯ অতীত রাজ্য-সন্ একই এবং এই ৬৯ অতীত-রাজ্য-সন ঠিক ৫১ ও ৭৪ অতীত রাজ্যের বৎসরের মধ্যে পড়িতেছে[১৬৯]।

নলিনীবাবু অনুমান করিতেছেন যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সপ্তম শতাব্দীতে নানা মত প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমস্ত মত দ্বৈধ পরিত্যক্ত হইয়া প্রবলতম মতের প্রচলন হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। কিন্তু নির্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা দ্বারা তদীয় অনুমান সমর্থিত হয় না।

নির্বাণাব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ : ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলীয় মতে নির্বাণকাল খ্রিঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ ; কিন্তু তিব্বতীয় মতে উহা ৯৪৯ ও ৮৮২ খ্রিঃ পূর্বে। অশোক স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, ঐ স্তম্ভ বুদ্ধ-নির্বাণাব্দের ২৫৬ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের রাজত্বকালে অর্থাৎ ২৭২—২৩১ খ্রিঃ পূঃ মধ্যে ঐ স্তম্ভ নিশ্চয়ই নির্মিত হয়। অতএব এই শিলালিপি মতে বুদ্ধ-নির্বাণ-সম্বৎ নিশ্চয়ই ৫২৬ হইতে ৪৮৭ খ্রিঃ পূঃ মধ্যে। এই মত সমর্থন করিয়া ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব বলেন, "The date must have been 487 B.C. approximately.[১৭০]

কিন্তু M. Abel Rernsut বলেন "He (অশোক) was the great grandson of King Pingcha pinposolo (বিম্বিসার) * * * and flourished a century subsequent to the Nirvan of Sakyamuni. * * * * * As the foundation of nearly all religious edifices in ancient India is attributed to this sovereign and referred to 116 years after the Nirvan, the ninth year of the Regency of Koungho, 833 B.C.[১৭১]। তাহা হইলে বুদ্ধ নির্বাণ সম্বৎ ৭৩৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে স্থাপিত করিতে হয়। আবার ইনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "Mahakasyapa the first Successor of Sakyamuni in the capacity of patrich, with drew to the hill Kakutapada to await the advent of Maitreya in the fifth year of Hiowang of the Cheon, 905 B.C., 45 years after Nirvan, when Ananda was 94 years old." ইহা সত্য হইলে, নির্বাণাব্দ ৮৬০ খ্রিঃ পূঃ ৯৯৯ অব্দে বলিয়া স্বীকার করিতে

হয়। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ খ্রিঃ পূঃ ৯৯৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং খ্রিঃ পূঃ ৯০৫ অব্দে মহাকাশ্যপের কাকুতাপাদ পর্বতে যাইবার সময় আনন্দের বয়ঃক্রম ৯৪ বৎসব হইলে নির্বাণাব্দ ৮৬০ খ্রিঃ পূঃ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধ্যাপক উইলসন আদি বুদ্ধাব্দ সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল —

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত পদ্মককর্নোর্পা নামক জনৈক ভূটান দেশীয় লামার মতে— ... ... ১০৫৮ খ্রিঃ পূঃ

রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কহ্লনের মতে	...	...	১৩৩২	" "
আবুল ফজলের মতে	...	...	১৩৬৬	" "
চীন দেশীয় ঐতিহাসিকগণের কবিতায়	...	...	১৩৩৬	" "
De Guigne গবেষণার ফলে	...	...	১০২৭	" "
Giorgi	..	...	৯৫৯	" "
Bailly-র মতে	...	...	১০৩১	" "
Sir William Jones	...	...	১০২৭	" "
Bentley-র মতে	...	...	১০০৪	" "
Jaehring	...	...	৯৯১	" "
Japanese Encyclopaedia	...	...	৯৬৩	" "
দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত চীন দেশীয়	...	...	...	
ঐতিহাসিক Matonan-lin	...	...	১০২৭	" "
M. Klaproth	...	...	১০২৭	" "
M. Remusat	...	...	৯৭০	" "
তিব্বতীয় মতে	..	...	৮৩৫	" "

দ্বিতীয় বুদ্ধাব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে ;—

ব্রহ্মদেশীয় মত	...	...	৫৪৪	খ্রিঃ পূঃ
সিংহলী মত	...	...	৫৪৩	" "
শ্যাম দেশের মত	...	...	৫৪৪	" "

অধ্যাপক উইলসন এই সঙ্গে নিম্নলিখিত তিনটি অব্দও উল্লেখ করিয়াছেন —

The Singhalee	...	...	৬১৯	খ্রিঃ পূঃ
The Peguan	...	...	৬৩৮	" "
The Chinese. According to Kalaproth	...	...	৬৩৮	" "

আবার M. M. Kalaproth লিখিয়াছেন. "This is Asoka (In Chinese Ayu) Who reigned one hundred and ten years after the Nirvan of Sakyamuni" ইহার মতে নির্বাণাব্দ ৩৮২ খ্রিঃ পূঃ হইতে আরম্ভ।

ফাহিয়ান ৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার সময় নির্বাণাব্দের ১৪৯৭ বৎসর অতীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। অতএব ফাহিয়ানের মতে নির্বাণাব্দ ১০৯৮ খ্রিঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "সিন্ধুতটের বৌদ্ধগণ বলিতেন যে, মৈত্রেয়ের বোধিসত্ত্ব মূর্তী স্থাপনের সময় ভারতের শ্রমণগণ কর্তৃক ঐ নদীর পরপারে তাঁহাদের ধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ মূর্তী স্থাপন, শাক্য মুনির নির্বাণের ৩০০ বৎসর পর Cheo বংশীয় Phingwing-এর রাজত্বকালে সম্পাদিত হয়"। Phingwing ৭৭০ খ্রিঃ পূঃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ৭২০ খ্রিঃ পূর্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহা হইলেও নির্বাণাব্দ ১০৭০—১০২০ খ্রিঃ পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ুনচোয়াং কুশীনগরে আগমন করিয়া বলিতেছেন, "এই স্থানে ইষ্টক নির্মিত সুবৃহৎ বিহার আছে, তন্মধ্যে তথাগতের নির্বাণ-মূর্তী প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মস্তক উত্তর দিকে ; দেখিলেই মনে হয় প্রভু আমার নিদ্রিত। এই বিহারের পার্শ্বেই মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ আছে। তথায় একটি প্রস্তর স্তম্ভও আছে, তাহাতে বুদ্ধ নির্বাণের ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে ; কিন্তু কোন্ বৎসরে বা মাসে ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি এই যে, বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং বৈশাখের শেষার্ধ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবস নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সর্বাস্ত বাদিগণ বলেন যে, তিনি কার্তীকের শেষার্দ্ধে নির্বাণপ্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, তাঁহার নির্বাণের পর ১২০০ বৎসর গত হইয়াছে, কেহ বলেন ১৫০০ বৎসর গত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পূর্ণ ১০০০ বৎসর গত হয় নাই"। খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩০-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে) য়ুয়ুন চোয়াঙ্-এর সময়ে যদি নির্বাণকালের ১০০০ বৎসর গত না হইয়া থাকে, তবে নির্বাণ সম্বৎ যে ৩০০ খ্রিঃ পূর্বের পর নয়, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু ১৫০০ বা ১২০০ বৎসর গত হইয়া থাকিলে ৮০০ ও ৫০০ খ্রিঃ পূঃ নির্বাণ অব্দের আরম্ভকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাবংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, ৫৪৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব মহা পরিনির্বাণ লাভ করেন[১৭২]।

ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেন, "Paramartha author of the life of Vasubandhu places the teachers vrishnugana and who flourished in the 5th Century A. D. as living in the tenth Century after the Nirvan"[১৭৩] এই মতানুসারে বুদ্ধনির্বাণ খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীরও পূর্বে হইয়াছিল।

৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রক্ষিত Canton এর "বিন্দু বিবরণে" (Dotted records) নির্বাণ বর্ষ পর্যন্ত ৯৭৫টি বিন্দু প্রদর্শিত হইয়াছে[১৭৪]। সুতরাং এই হিসাবে নির্বাণ-সম্বৎ (৯৭৫—৪৮৯) খ্রিঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে আরব্ধ হইয়াছিল।

অজাতশত্রুর যৌবরাজ্য সময়ে, বুদ্ধ নির্বাণের ৯/১০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের মাতুল-পুত্র ও শিষ্য দেবদত্ত বৌদ্ধ-সংঘ মধ্যে ভীষণ বিরোধ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এবং অজাতশত্রু তাঁহার সমর্থক ও সহায়করূপে দণ্ডায়মান হন [১৭৫]। এই কথা সত্য হইলে নির্বাণ সম্বৎ আরব্ধ হইয়াছিল ৪৯০ খ্রিঃ পূর্বে, কারণ সমুদয় ঐতিহাসিকগণের মতেই অজাতশত্রু ৫০০ খ্রিঃ পূঃ হইতে ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন।

ডাঃ ফ্লিট ৪৮২ খ্রিঃ পূর্বকে নির্বাণের আনুমানিক কাল মনে করেন[১৭৬]। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণাব্দের সূচনা সম্বন্ধে বহু মতবাদ বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন সময়ে এই সমুদয় মতভেদের নিরসন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ডাঃ ফ্লিট সাহেবের মতে ১১৭০—৮০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে নির্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত মত সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই সময় হইতেই সমুদয় বিভিন্ন মতাবাদের নিরসন হইয়া বুদ্ধের নির্বাণকাল ৫৪৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক ব্লাগডেন ডাঃ ফ্লিটের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া মনে করেন না। এতৎ সম্বন্ধে এই উভয় মহারথীব মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার কোনও সুমীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না [১৭৭-৭৮]। অধ্যাপক ব্লাগডেন ১৬২৮ নির্বাণাব্দের " মায়াজেদী লিপি", ১৭৯৬ ও ১৮৩৭ নির্বাণাব্দে বা "শক্করাজ" অব্দে উৎকীর্ণ ব্রহ্মদেশীয় লিপিদ্বয় হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে "মায়াজেদী লিপি" খোদিত হইবার দ্বিশতাধিক বর্ষ পরেই ব্রহ্মদেশে নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল ৫৪৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল[১৭৯]; কারণ ৫৪৪ খ্রিঃ পূঃ নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল ধরিয়া লইয়া উপরোক্ত লিপিত্রয়ের কাল গণনা করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অধ্যাপক ব্লাগডেনের মতে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ব্রহ্মদেশে নির্বাণাব্দ সম্বন্ধীয়

বিভিন্ন মন্তব্যদের নিরসন হইয়া ৫৪৪ খ্রিঃ পূঃ নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল না[১৮০]। এমতাবস্থায় অশোক চল্লদেবের উৎকীর্ণ শিলালিপির উপর নির্ভর করিয়া, এবং উহাকে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, "লক্ষ্মণসেনদেবস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১" বা "লক্ষ্মণসেনদেবস্যাতীতরাজ্যে সং ৭৪" কে ১২৫১ বা ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

অতীত রাজ্যাঙ্ক :

বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপিতে যে "অতীত" পদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যে কোনও বিশেষার্থ ব্যঞ্জক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ববুধমণ্ডলী নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অতীত", "গত" বা তদর্থবোধক অন্যান্য শব্দগুলির নরপতিগণের রাজ্যকালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। ডাঃ কিলহর্ণের উত্তর ভারতীয় খোদিত লিপির তালিকায় কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করা হইয়াছে[১৮১]। এতৎ সম্বন্ধে ডাঃ কিলহর্ণের মন্তব্যের অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।—"

"লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে, তাঁহার রাজ্যকালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে, "শ্রীমল্লক্ষ্মণদেবপাদানাং রাজ্যে" বা "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে সংবৎ"—এইরূপ বর্ণিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর ঐরূপ বর্ণনাই থাকে, কিন্তু "রাজ্যে" পদের পূর্বে "অতীত" প্রভৃতি পদ থকিলে এইরূপ অর্থ প্রদান করে, "লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ কাল হইতেই এ পর্যন্ত বৎসর গণনা হইয়াছে বটে,—কিন্তু সে রাজ্যকাল প্রকৃত প্রস্তাব অতীত হইয়া গিয়াছে[১৮২]। "অতীতে" শব্দের প্রয়োগ থাকায় তৎকালে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল যে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিলহর্ণ আরও বলেন,—"মিঃ ব্লকম্যান ১১৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্তৃক বাংলা জয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যখন বলেন, "শেষ হিন্দুরাজা লখমণিয়া (Lakhmaniya) ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিতেছিলেন",—ইহা দ্বারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায়না যে, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষ্মণ সংবতের ৮০ অব্দ চলিতেছিল,—"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পদানামতীতরাজ্যে সংবৎ ৮০?[১৮৩]

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "এখানে শব্দার্থ লইয়া কাট্যাংকুট্যাং না করিয়া, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুইখানি বুদ্ধগয়ার লিপির অক্ষরের (বিশেষতঃ প এবং দ এর) সহিত গয়ার ১২৩২ সম্বতের (১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দের) গোবিন্দ পাল দেবের গত রাজ্যের চতুর্দশ সম্বৎসরের শিলালিপির[১৮৪], অথবা বিশ্বরূপ সেনের তাঁম্রশাসনের[১৮৫] প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—১২৩২ সম্বতের গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের প এবং দ পুরাতন নাগরীব ঢঙ্গের ; পক্ষান্তরে, আলোচ্য বুদ্ধগয়ার লিপিদ্বয়ের প এবং দ বর্তমান বাংলা প এবং দ এর মত। ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দের (১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দের) তাম্রশসনে[১৮৬] দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে গৌড়মণ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প এবং দ ই যে প্রচলিত ছিল, বল্লভ দেবের "শকে নগ-নভো-রুদ্রৈঃ সংখ্যাতে" অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪ ৮৫ খ্রিষ্টাব্দের) আসামের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে[১৮৭]। সুতরাং "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১", ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া, (আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু ধরিয়া), ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে। লক্ষ্মণ সেনের "অতীত রাজ্য" হইতে কোনও সম্বৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বলা যাইতে পারে, গোবিন্দলাল দেবের "গতরাজ্য" বা "বিনষ্ট রাজ্য" হইতেও কোনও সম্বৎ প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দ পালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোনও সম্বৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই।

"গতরাজ্যে" "অতীত রাজে" বা বিনষ্ট রাজে" প্রভৃতি বিশেষণ পদের এইরূপ অর্থ প্রতিভাত হয়, গোবিন্দ পাল দেবের রাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল ; লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মগধে কেহ "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ" প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না ; অথবা যিনি মগধ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসীগণ তাঁহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিমিত্ত "গতরাজ্যের" বা "অতীত রাজ্যের" সম্বৎ গণনা প্রচলিত হইয়া থাকিবে[১৮৮]।

প্রত্যুত্তরে রাখালবাবু বলেন, "ভারতের ইতিহাসে সর্ব সময়েই দেখা গিয়াছে যে সভ্য জগতের প্রান্তে সভ্য জগতাপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আসামের বল্লভদেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিদ্বয়ের অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না, কিম্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। সাধারণত গৌড়বঙ্গে যে আকারের অক্ষর একাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই আকারের অক্ষর কামরূপে দ্বাদশ শতাব্দীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহা বঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা চট্টগ্রামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দেখিলে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না। একই ব্যক্তির তাম্রশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে , গাহড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষর তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গয়ায় অশোক চল্লদেবের শিলালিপি-চতুষ্টয় মধ্যেও দুই প্রকারের হস্তলিপি রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সম্বতের ৫১ অব্দের খোদিত লিপি ও বুদ্ধগয়া মন্দির প্রাঙ্গণের শিলালিপি অতি অযত্নের সহিত খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর "মহাজনী খতে" উৎকীর্ণ ; অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সূর্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরিনির্বাণাব্দের শিলালিপি ও বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার করা উচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মগধে মাগধী লিপির সূচনা দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহার অক্ষরের সহিত পূর্বোক্ত শিলালিপিদ্বয়ের অক্ষরের তুলনা হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য। অশোকচল্লদেবের সমকালীন গয়া ও বুদ্ধগয়ার শিলালিপি-চতুষ্টয় সম্ভবত কোন গৌড়বাসী কর্তৃক উৎকীর্ণ ; দেবপাড়া প্রশস্তির অক্ষরাবলীর সহিত উহার তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের ও গয়ায় সূর্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরি নির্বাণাব্দের শিলালিপি দ্বয়ের অক্ষরের সহিত ঢাকার নবাবিষ্কৃত চণ্ডী-মূর্তির পাদ-পীঠস্থিত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের খোদিত লিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "প" ও "দ" একই প্রকারের। এতদ্ব্যতীত "ল", "ণ", "শ", "স", "ক" প্রভৃতি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রমাণাক্ষর সমূহ (Test letters) তুলনা করিলেই বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিগুলি যে খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ সতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না"[১৮৯]।

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ ব্যবহারেও "অতীত" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিক্রম সম্বৎ সম্বন্ধে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত ডাক্তার কিলহর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন[১৯০]। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত ১৫০৩ বিক্রমাব্দে লিখিত "কালচক্রতন্ত্র" গ্রন্থের পুষ্পিকায়লিখিত আছে, "পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যদেব পাদানামতীত রাজ্যে সং ১৫০৩ ইত্যাদি"[১৯১]। ডাক্তার কিলহর্ণ পরে উত্তরাপথের খোদিত লিপি সমূহের তালিকা সঙ্কলন কালে "অতীত" শব্দ-যুক্ত বিক্রম সম্বৎসরানুসারে গণিত বহু খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন[১৯২]। আবার কতকগুলি খোদিত লিপিতে শক বা বিক্রমসম্বৎসর গণনা কালে লিখিত হইয়াছে --

"শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যোৎপাদিত সম্বৎসর সতেষু দ্বাদশসু ত্রিষষ্টিউত্তরেষু"[১৯৩]
"শক নৃপতি রাজ্যাভিষেক-সম্বৎসরস্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু"।[১৯৪]

কিন্তু চালুক্যবংশীয় সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে—

সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু।।
পঞ্চমৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চাশসু চ।
সমাসু সমাতিতাসু শকানামপিভূভুজাম্"।।[১১৫]

বাদামি গুহায় চালুক্য বংশীয় রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে সে শকাব্দ কোন শক নরপতির অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে[১১৬]। বর্তমান কালেও বঙ্গীয় জ্যোতিষীগণ "শক নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ" পদটি শকাব্দের মানাঙ্কের পূর্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, "অতীত" বা "গত" শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ব্যবহৃত অব্দ রাজ্যাঙ্ক নহে, কিন্তু কোনও অব্দ-বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং কোনও রাজার রাজ্যচ্যুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত নহে। ডাঃ কিলহর্ণের গণনায় ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ব্যবহৃত লক্ষ্মণ সম্বৎসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল, বোধ হয় গয়ার খোদিত লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত অব্দও সেই তারিখ হইতে গণিত হইয়াছে। আকবর নামায় লক্ষ্মণ সম্বৎ গণনারম্ভের যে কাল নির্দেশিত হইয়াছে, বুদ্ধগয়ার উৎকীর্ণ লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত অতীতাব্দও সেই সময় হইতে গণিত হইয়াছে, কেবল অতীত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা লিপি লেখক জানাইয়াছেন যে, তৎকালে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকাল শেষ হইয়া গিয়াছে।

নরপতিগণের রাজত্বকালে যদি "বিজয় রাজ্য" "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে" বলিয়া বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগের রাজ্যাবসানে "অতীত রাজ্যে" "গত রাজ্যে" বলিয়া যে বর্ষ গণিত হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। "অতীত" বা "বিজয়" শব্দ রাজ্যের বিশেষণ মাত্র। বিজয় শব্দের উল্লেখ থাকায় বর্তমান কাল সূচিত হইয়াছে। রাজ্যভ্রষ্ট গোবিন্দপাল বিনষ্ট রাজ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের "অতীত রাজ্য" লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রমাণ হয়, তিনি গোবিন্দ পালের ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হন নাই।

রাখালবাবুর মতানুসারে "বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপিদ্বয়ের তারিখে "অতীত" শব্দ থাকায় উহার ব্যাখ্যা তিন প্রকার হইতে পারে —

(১) উক্ত খোদিত লিপি-দ্বয় লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাবসানের পরে উৎকীর্ণ ও উহার তারিখ লক্ষ্মণ সম্বতের অব্দ।

(২) উক্ত খোদিত লিপিদ্বয় লক্ষ্মণ সেনের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ ও উহার তারিখের অর্থ এই যে উহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ বা ৭৪ রাজ্যাঙ্ক অতীত হইলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(৩) উক্ত খোদিত লিপিদ্বয় লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর ৫১ বা ৭৪ বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

তৃতীয় মতটি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ভগবান গৌতম-বুদ্ধ ব্যতীত অপর কাহারও মৃত্যুর পর হইতে মান গণনা আরব্ধ হয় নাই। নলিনী বাবু "অতীত রাজ্যে" শব্দটির, "রাজ্যে অতীতে সতী" — রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, —যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত নহে। উক্ত অর্থ করিলে রাজ্যাঙ্ক অতীত হইয়াছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অতীত শব্দটির পূর্ব-নিপাত হওয়ায় কিলহর্ণের অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেলে পর" এই অর্থই যদি লেখকের উদ্দেশ্যে হইত তবে অতীত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "লক্ষ্মণসেনস্যবিনষ্টরাজ্যে" লেখাই সুসঙ্গত হইত। অতীত শব্দের প্রয়োগ থাকায় নলিনীবাবুর ব্যাখ্যা ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় মতটি গ্রহণ করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় মতও গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কারণ, লক্ষ্মণ সেনের জীবদ্দশায় যদি উক্ত লিপিদ্বয় উৎকীর্ণ হইত, তবে "অতীত" শব্দটির প্রয়োগ থাকিত না। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভ হইতেই

যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রবর্ত্তীত ও প্রচলিত হইয়াছিল, ঢাকার জীবনবাবুর শিববাড়ি-স্থিত পাষাণময়ী চণ্ডিকা মূর্ত্তীর পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিই ইহার অন্যতম প্রমাণ। ঢাকার শিলালিপিখানি যে লক্ষ্মণ সেনের জীবিতাবস্থায় উৎকীর্ণ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; কারণ উহা তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং তদীয় রাজত্বের সপ্তম বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাখালবাবু এবং নলিনী বাবু এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। লিপিটি পরের পাতায় উদ্ধৃত করা গেল —

১ম অংশ :	১ম পংক্তি —	"শ্রীমল্লক্ষ্মণ
	২য় "	সেন দেবস্য সং
২য় অংশ :	১ম পংক্তি —	"মাল দেই সুত অধিকৃত শ্রীদামোদ্র
	২য় "	"ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমারদ্ধা তদ্‌ভ্রাদকনা"
৩য় অংশ :	১ম পংক্তি —	"শ্রীনারায়ণেন
		প্রতিষ্ঠিতেতি ৪।।"

অর্থাৎ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবের (রাজত্বের) তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই (দেব?) সুত অধিকৃত দামোদরচণ্ডী দেবীর (মূর্ত্তী) আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নলিনীবাবু বলেন, "সাধারণত খোদিত লিপি মাত্রেই রাজার নামের পূর্বে "পরম ভট্টারক" "মহারাজাধিরাজ" ইত্যাদি বিশেষণ থাকে। এই লিপিটিতে তাহা নাই। লক্ষ্মণ সেন তখনও রাজা হন নাই। কাজেই এই সকল রাজোপাধি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হয় নাই। লক্ষ্মণ সেন তখন তিন বর্ষ বয়স্ক মাতৃস্তন্যপায়ী কুমার মাত্র। এক বচনে লক্ষ্মণ সেনের নামের ব্যবহার তাহাই সূচিত করিতেছে"[১৯৭]। নলিনীবাবুর যুক্তি বিচারসহ নহে, কারণ, "পরম ভট্টারক", "মহারাজাধিরাজ" "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে", "কল্যাণ বিজয়রাজ্যে" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সমুদয় শিলালিপিতেই যে উল্লিখিত হইত তাহার কোনও অর্থ নাই। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নলিনী বাবুর যুক্তি অনুসারে ঢাকার চণ্ডীমূর্তী প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে লক্ষ্মণসেনকে "তিনবর্ষ বয়স্ক মাতৃস্তন্য-পায়ী কুমার মাত্র" অনুমান করিয়া লইলে, লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় ও সপ্তম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহাকে "পরমবৈষ্ণব" বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়।

"পরগনাতি সন," "সন বলালি" ও লক্ষ্মণ সম্বৎ :

পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, বিশেষত বিক্রমপুরে, প্রাচীন দলিলাদিতে "পরগনাতি সন" বা "সন বল্লালি" নামক একটি সন প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কোনও কোনও দলিলে বা হস্তলিখিত পুঁথিতে এই সনের সহিত শকাব্দ বা বাংলা সন তারিখও নির্দিষ্ট আছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিকচিত্রে "মহারাজ রাজবল্লভ" শীর্ষক প্রবন্ধে পূজাপাদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় সম্ভবত এই সনের প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পরে ১৩১৬ সনে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সনযুক্ত একখানি দলিল তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন[১৯৮]। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩১৮ সনের প্রতিভা পত্রিকায় সেন রাজগণ শীর্ষক প্রবন্ধে এবং Indian Antiquary পত্রিকায় Lakshman Sen of Bengal and his era প্রবন্ধে[১৯৯] পরগনাতি সন সম্বন্ধে এবং ১৩২০ সনের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থ পত্রিকায় পরগনাতি সন ও সন বলালি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩২১ সালের কার্তীক সংখ্যা ভারতবর্ষে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় পরগনাতি সন সম্বন্ধীয় দুই খানি দলিল প্রকাশ করিয়াছেন. এই দলিলের একখানি তদীয় বারভূঞা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে। ১৩১৯ সালের ঢাকা রিভিউ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়, ৪৬১ মানাঙ্ক-যুক্ত একখানি দাসখত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা "কোন্ সন?" পূজাপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়মহাশয় এই

সনটিকে পরগনাতি সন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক[২০০]। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, "লক্ষ্মণ সেনের জন্মবৎসর হইতে আরব্ধ লক্ষ্মণ সংবৎ যেমন এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইতে গণিত তেমনি এক সনও পূর্ববঙ্গে এই সেই দিন পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। অশোক চল্লের বুদ্ধ গয়া লিপির অতীত-রাজ্য-সন এই শোযোক্ত সংবতের মানাঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার ৫১ অতীতাব্দ এবং ৭৪ অতীতাব্দ যথাক্রমে ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ ও ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। পরগনাতি সনই এই অতীতাব্দ"[২০১]। "আমাদের ঘরের দলিল দুইখানির একখানি ১১৫২ বাংলা ও ৫৪৩ পরগনাতি তারিখ যুক্ত এবং অপর খানি ১১৫৮ বাংলা এবং ৫৫০ পরগনাতি তারিখযুক্ত। ইহার যে কোনও তারিখ লইয়া গণনা করিলেই দেখা যায় যে পরগনাতি সনের আরম্ভ ১২০০—১২০১ খ্রিষ্টাব্দে। কাজেই দেখা গেল যে ইহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাবসান বৎসর হইতে গণিত হইতেছে"[২০২]। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন "বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শৃঙ্খলা ও কর আদায়ের সুবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন, অদ্যাপি শতাধিক বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় [২০৩]। পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে "মোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্বত্র পরগনাতি সন নামে উল্লিখিত হইত"[২০৪]।

গত ১৩২০ বঙ্গাব্দের শারদীয় অবকাশের সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং আমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরের আখড়ায় পুরাতন পুঁথির স্তূপের মধ্যে "স্বপ্নাধ্যায়" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন খণ্ডা পুঁথি দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই পুঁথির শেষপাতায় লিখিত আছে ;—"রচিল নারায়ণে।। ইতি স্বপ্ন অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত।। ইতি সন ১১৭৬ সন.তারিখ ২২ ভাদ্র, রোজ মঙ্গলবার রাত্রি দুই ডণ্ড গতকালে মোকাম ইএবত নগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোসকঃ। স্বকীয় পুস্তক মিদং শ্রীযুগলকিশোর দাসক।। সন বলালি ৫৭০ শকাব্দা ১৬৯২ তিথি পূর্ণিমা"। আউটসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত বি. এ. বলিয়াছেন যে, বল্লালি-সন-যুক্ত একখানি দলিল মুন্সিগঞ্জের কোনও আদালতে তাঁহারা দাখিল করিয়াছিলেন।

নলিনীবাবুর মতে এই "সন বলালি" ও "পরগনাতি সন" অভিন্ন এবং ইহার আরম্ভকাল ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ[২০৫]। তিনি লিখিয়াছেন, "পরগনাতি অথবা বল্লালি সন বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণ,—মাধব, কেশব, বিশ্বরূপ কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রের দুর্ভাগ্যের স্মারক সনটিকেও পিতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন"[২০৬]।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাতীতাব্দ মুসলমান আমলে "পরগনাতীত সন" বা "পরগনাতীত সন" নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কাগজপত্রে এই "পরগনাতী সনের" উল্লেখ রহিয়াছে। ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া এই "পরগনাতী সনের" বর্ষ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এই অতীত রাজ্যাঙ্ক মুসলমানের গৌড়-বিজয় নির্দেশক ছিল বলিয়া "লক্ষ্মণ সেনের নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই "পরগনাতী সন" নামে চালাইয়া দিয়াছেন"[২০৭]।

পরগনাতি সন ও সন বল্লালি সম্বন্ধীয় যে কয়খানা দলিলের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহার একটি তালিকা এইসঙ্গে প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে যে সমুদয় দলিলে পরগনাতি সন বা সন বল্লালির সহিত বঙ্গাব্দ বা শকাব্দ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইল।

* পরগনাতি সন —	বঙ্গাব্দ ও তারিখ —	শকাব্দ —	খ্রিষ্টাব্দ —	আরম্ভকাল
৪৯৭—	×২৫শে আষাঢ়	×	×	×
৫০৯—	১১১৭, ২৫শে চৈত্র		(১৭১১)	(১২০২)
৫৪৩—	১১৫১ ×	×	(১৭৪৪/৪৫)	(১২০১/০২)
৫৫০—	১১৫৮ ×	×	(১৭৫১/৫২)	(১২০১/০২)
৫৫৪—	১১৬২, ৩রা মাঘ—		(১৭৫৬)	(১২০২)
৫৫৬—	১১৭৫, ২৩শে বৈশাখ, ১০ই জেলহজ্জ		(১৭৬৮)	(১২০২)
৫৭০ (সন বলালি)	১১৭৬— ২২শে ভাদ্র,	(১৬৯২)	(১৭৬৯)	(১১৯৯)
৫৭৪—	১১৮৩, ৯ই চৈত্র		(১৭৭৭)	(১২০৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন বলালি দলিলের তারিখ নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিলে ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দকে ইহার আরম্ভকাল বলিয়া নির্দেশিত করিতে হয়। পক্ষান্তরে পরগনাতি সন সম্বন্ধীয় যে কয়খানি দলিল পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ১২০২—১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে পরগনাতি সন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সন ও তারিখ যুক্ত দলিল আরও অনেকগুলি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পরগনাতি সনের আরম্ভকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। একখানা দলিলের তারিখের উপর নির্ভর করিয়া সন বলালি সম্বন্ধেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। তবে ইহা স্থির যে, ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে ইহার আরম্ভকাল নহে। এমতাবস্থায় সন বলালির পরগনাতি সনের যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চল হিন্দুনরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এই অব্দটি কেশব সেনের পরবর্তী কোনও সেনরাজা কর্তৃক প্রবর্তীত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগনা যদি পারসি শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরগনা বিভাগের সময়ে এই সনটিকে পরগনাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক :

কামরূপ কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ী বীরাগ্রণী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের শিরে যে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হইয়াছে, তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় না করিয়াই ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত হইয়াছে, "বল্লাল তনয় রাজা লক্ষ্মণ সেন মহাশয়, জন্মগ্রহ ভয়ে তাঁহার কলঙ্ক ঘটিয়াছিল"[২০৮]। হরিমিশ্র যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই কি তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক? আমাদের মনে হয়, উহা তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক নহে। সেক শুভোদয়া পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থানান্তরে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকগণ যে বীরাগ্রণি লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার আকর সুবিখ্যাত মোসলমান ইতিহাস লেখক মিন্হাজ-ই-সিরাজ-কৃত "তবকায়-ই-নাসেরী"। এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে গৌড়বঙ্গের কাহিনী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার অসম সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা, লক্ষ্মণাবতী, বিহার, বঙ্গ এবং কামরূপের অধিবাসিগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল[২০৯]। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বিহার জয় করিয়া ধনরত্ন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ দিল্লিতে সুলতান কুতুবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।[২১০]। "দিল্লি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিহার হইতে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন[২১১]। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দলবল তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছিল না।

নগরবাসীগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। তিনি রায় লখ্‌মনিয়ার প্রাসাদের তোরণদেশে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় রায় লখ্‌মনিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মোসলমানের আগমনবার্তা অবগত হইয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ, দাস দাসী পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া সঙ্কনাট ২১২ এবং বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন[২১৩]। ইহাই হইল মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণ। মিনহাজ এই ঘটনার চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩—৪৪ খ্রিষ্টাব্দে), গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের এই বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন[২১৪]।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,[২১৫] "মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু যেভাবে বিজয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন রাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা আগমনের পথ ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারে নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের গৌড় বিজয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। **** তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণ সেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া বিজয় কাহিনী সম্ভবত অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্বার হিন্দুরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ; কারণ, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অর্ধ শতাব্দী পরে বাংলার স্বাধীন সুলতান মুগীস উদ্দিন য়ুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন"[২১৬]।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন[২১৭], "সে আখ্যায়িকায় যে "নওদিয়ার" রাজধানী ও "রায় লছমনিয়া" নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসন-লিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, —"নওদিয়া" নবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, "লছমনিয়াও" তবে লক্ষ্মণ সেনের অপভ্রংশ! মিনহাজ লিখিয়াছেন,—"রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে বক্তিয়ার খিলজির দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল"[২১৮]। তদনুসারে আর একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল[২১৯]। কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না,—শৈশবে সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনুমান ও লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা বিনিময় হইত তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে[২২০]। এরূপ অবস্থায় একটি অসামান্য অনুমানের অবতারণা করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যাব্দ

গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল ;—লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে তাঁহার জন্মতিথি হইতে অব্দ গণনা করিবার একটি অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। "লক্ষ্মণ সংবৎ" নামক একটি অব্দ গণনা রীতি অদ্যাপি মিথিলায় কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে,—এক সময়ে নানা স্থানে এই অব্দ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপিতে এইরূপ অব্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,—"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব কোনও সময়ে লক্ষ্মণ সেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন[২২১]। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনিয়াকে" লক্ষ্মণ সেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।"

লক্ষ্মণ সেনের ধর্মানুরাগ :

লক্ষ্মণ সেনের, তপন দীঘি, সুন্দরবন ও আনুলিয়ার তাম্রশাসনে "পরম বৈষ্ণব" উপাধি এবং মাধাই নগরের তাম্রশাসনে "পরম-নারসিংহ" উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী ছিলেন। ধোয়ী-কবি-বিরচিত" পবন-দূতম্" গ্রন্থে লিখিত আছে, সুহ্মদেশের গঙ্গাতীরে সেনবংশীয় নরপতিগণের ইষ্টদেব মুরারি বিগ্রহ দেবরাজ্যে অভিষিক্ত আছেন[২২২]। কিন্তু কেশব সেনের তাম্রশাসনে তাঁহার "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে, বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে, "পরমসৌর মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে, তাঁহার শৈব ও সৌর মতানুরক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমে মহাদেবের বন্দনা দৃষ্ট হয়[২২৩]। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলি বৈদিক মার্গানুসরণকারী ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদের চর্চা পুনঃপ্রবর্তীত করিবার জন্য তিনি পুরুষোত্তম "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন। সৃষ্টিধর লিখিয়াছেন ঃ—

"বৈদিক প্রয়োগানর্থিনো লক্ষ্মণসেনস্য রাজ্ঞ আজ্ঞয়া প্রকৃতে কর্মণি প্রসজন্ বৃত্তেলর্ঘুতায়াং হেতুমাহ ভাষয়ামিতি"।

ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য লক্ষ্মণ সেনের অনুরোধে হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" এবং হলায়ুধের ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান "পাশুপত পদ্ধতি" ও "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিও তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। এজন্যই তিনি বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হলায়ুধ দ্বারা "মৎস্য সূক্ত" প্রচার করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের বিদ্যানুরাগ :

লক্ষ্মণসেনকে বাংলার বিক্রমাদিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত, কবি, ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সভাতেও পঞ্চরত্ন বিদ্যমান ছিলেন। "কবিরাজ প্রতিষ্ঠা" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডপ দ্বারে,

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।"

এইরূপ লিখিত দেখিয়াছিলেন। জয়দেবও তদীয় "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতি ধরঃ সন্তর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈবাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোহপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মপতিঃ।।"

এতদ্ব্যতীত পৃথ্বিধর, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র, অরবিন্দ ভট্ট, হলায়ুধ, শূলপাণি, পশুপতি, ঈশান ও আচার্য-গোবর্ধন-শিষ্য বলভদ্র, বেতাল (বেতাল ভট্ট বা রাজ বেতাল), ব্যাস কবিরাজ, পুরুষোত্তম দেব, সঞ্চাধর, উদয়ন, প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী কর্তৃক লক্ষ্মণ সেন সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা পুনঃ প্রবর্তীত করিবার জন্য অশেষ শাস্ত্র বেত্তা বেদবিদ্ পুরুষোত্তম দেবকে পাণিনির একটি বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন। ভাষাবৃত্তি ব্যতীত পুরুষোত্তম "ত্রিকাণ্ড শেষ" "দ্বিরূপ কোষ" "একাক্ষর কোষ" "দ্ব্যর্থকোষ" "উণ্মাভেদ" "কারক কোষ" "শব্দভেদ" "প্রকাশ কোষ" প্রভৃতি রচনা করেন। বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের অনুরোধে "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" এবং হলায়ুধের ভ্রাতাদ্বয় পশুপতি ও ঈশান "পাশুপতি পদ্ধতি" ও 'আহ্নিক পদ্ধতি" প্রভৃতি রচনা করেন। "মীমাংসা সর্বস্ব," হলায়ুধের রচিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পণ্ডিত প্রবর হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের আদেশক্রমে "মৎস্যসূক্ত" রচনা করিয়াছিলেন। রাজকবি গোবর্ধনাচার্য কাব্যভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন আর্যা সপ্তশতী[২২৪] এবং ধোয়ী কবিরাজ "পবনদূতম্" গ্রন্থ রচনা করেন। শূলপানি যাজ্ঞ্যবল্ক্য স্মৃতির "দ্বীপ কলিকা" নামক টীকা রচনা করেন।

হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সর্বস্বে লিখিত আছে লক্ষ্মণসেন, তাঁহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ, যৌবনাবস্থে মন্ত্রীর পদ, ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন।

নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণ সেনের মহাসান্ধি বিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত, শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিক, এবং মধু ধর্মাধিকারী ছিলেন।

ধোয়ী বিরচিত পবনদূতম গ্রন্থে লিখিত আছে, কবি লক্ষ্মণ সেনের নিকট হইতে "কবিরাজ" উপাধি এবং হস্তীদন্ত, হেমময়দণ্ড শোভিত চামরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথাঃ—

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মা ভৃতাং চক্রবর্তী
শ্রীধোয়ীকঃ সকল রসিক প্রীতিহেতোর্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব সতন্ মন্ত্র মেতজ্জগাত।।"

"সদূক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে" লক্ষ্মণসেনের রচিত নয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্লোকগুলিতে ভাব এবং কবিত্ব আছে।

১। "তীর্য্যক্ কন্ধরমংস দেশমিলিত শ্রোতাবতংস স্ফুরদ্বা-
হোত্তম্ভিত কেশ পাশ মনুজ ভ্রূবল্লরী বিভ্রমং।
গুঞ্জেদ্বেনু নিবেশিতাধরপুট বা কৃত রাধানন
ন্যস্ত মীলিত দৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতুবঃ।।"
বেণুনাদঃ—সদুক্তি কর্ণামৃতম—৭৩ পৃষ্ঠা।

২। "অবিরত মধু পানাগার মিন্দিন্দিবাণা
মভিসরণ নিকুঞ্জং রাজহংসী কুলস্য।
প্রবিতত বহুশালং মদ্যপদ্মালয়ায়া
বিতরতি রতিমঙ্কোরেষ লীলাতড়াগ।।"

৩। এতে পুরঃ সুরভি কোমল হোমধূম
লেখানিপীত নব পল্লব শোণি মানঃ।
পূণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতি সমীহিত সামগীতি
সাকৃত নিশ্চল কুরঙ্গ কুলাঃ স্ফুরন্তি।।

৪। "কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহকৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তল বর্হদাথ তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনা হখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিতস্মোরালসা দৃষ্টয়ঃ।।"

রাজ্যের অবস্থা :

কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীমতী বসুদেবী লক্ষ্মণ সেনের মহিষী ছিলেন[২২৫]। "সেক শুভোদয়ায়" লিখিত আছে রাজা শেষ বয়সে বল্লভা নাম্নী নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেবী সাধবী এবং পতিপরায়ণা ছিলেন বটে ; কিন্তু বল্লভা অত্যন্ত প্রগল্ভা এবং স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, এমন কি তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেন. রাজা ভয়ে কোনও কথা বলিতেন না। বল্লভার ভ্রাতা কুমার দত্ত লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিল। ইহার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বল্লভা ভ্রাতৃপক্ষাবলম্বন করিতেন। একদা মধুকর নামক বণিকের পত্নী মাধবীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ও রত্নালঙ্কার হরণের অভিযোগে কুমার দত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বল্লভা ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং বিচারে বাধা প্রদান করেন। দুর্মতি কুমার দত্তের শাস্তি হওয়া দূরে থাকুক, মাধবীর রত্নালঙ্কার বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং রাজসভায় তাহাকে অপমানিত করা হয়।

একসময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। জয়দেব-প্রমুখ পণ্ডিতগণও সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজমহিষী বল্লভা তৎকালে জনৈক নগর-বাসিনীর প্রকোষ্ঠ-শোভিত সুন্দর কঙ্কন বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং উহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। রাজসভার প্রধানগণ রাজমহিষীর এবম্বিধ ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন ; নগরবাসিনী রাণীকে "কাঠ কুড়ানীর বেটি" বলিয়া গালি দিল। সেক শুভোদয়ার এই সমুদয় উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু অধঃপতনের কালে রাজপরিবারে এবং রাজতন্ত্রে এইরূপ দুর্নীতিই প্রবেশ করিয়া থাকে। সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য হইলে, স্ত্রী ও শ্যালকের প্রতি পক্ষপাতিতাই লক্ষ্মণসেনের চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া অনুমিত হয়। হরিমিশ্র হয়ত এই কলঙ্কেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

"সায়ং বেশ বিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীরমঞ্জু স্বনৈ-
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ।।"

অর্থাৎ (লক্ষ্মণ সেনের সময়ে) বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিক্কণে চমকিত হইত। ধোয়ীকবি বিরচিত পবন দূতম্ গ্রন্থে রাজধানীর তাৎকালীন অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "রাজপথ বারাঙ্গনাগণের মঞ্জীরনিক্কণে চমকিত এবং নিশীথে স্বেচ্ছা-বিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্ভ্রান্ত"। যথা —

"বৃদ্ধোষ্মাণ স্তন পরিসরাঃ কুঙ্কুমস্যাঙ্গরাগা
দোলাঃ কেলিব্যসনরসিকাঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ।
ক্রীড়া-বাপ্যঃ প্রতনু-সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্থান জ্যোৎস্নামুদমবিরতং কুর্বতে যত্র ঘৃণাং।।
ভ্রাম্যন্তীনাং ভ্র (তঃ?) মসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্ক্ষিণীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌর-সীমন্তিনীনাং।
রক্তাশোকস্তবক ললিতৈর্বালভানোর্ময়ুখৈ-
র্নালক্ষ্যন্তে রজনি বিগমে পৌর মার্গেষু যত্র।।

রত্নৈ র্মুক্তামরকত মহানীল সৌগন্ধিকাদ্যৈঃ
শঙ্খৈর্ব্বালাবলয়রচনা বন্ধুভির্বিদ্রুমৈশ্চ।
লোপামুদ্রা রমণ মুনিন পীত নিঃশেষ বারঃ
শ্রীঃ সর্ব্বস্বং হরতি বিপদং (বিপুলং?) যত্র রত্নাকরস্য।।
মূকীভূতাং মরকত ময়ীং হারযষ্টিং দধানা
যস্মিন বালা মৃগমদ মসী পিচ্ছিলেষু স্তনেষু।
চেতোবর্ত্তি স্মরহুতবহং দীপিতং স্নেহপূরৈঃ
কৃত্বা যান্তি প্রিয়তম গৃহানন্ধকারে ধনেহপি।।
নীতং যত্নাদবিনয়লিপেঃ পত্রতামায়তাক্ষ্যা
নির্গচ্ছন্ত্যঃ সপদি হৃদয়ং ক্ষালয়িত্বের যত্র।
কান্তে পা-প্রণয়িনি মিলৎকজ্জল শ্যামলানা
মুন্মুচ্যন্তে নয়ন পয়সাং শ্রেণয়ো মানিনিভিঃ।।
অগ্রে তেষাং ব্যপগত মদঃ স্থাতুমেবাসমর্থা
দৃষ্টা কান্তিং কুসুম ধনুষঃ কা কথা বিক্রমস্য।।
সুভ্র (ভ্র) লীলা চতুর নয়ন-ক্ষেপরম্যৈর্বিলাসৈ-
যস্মিন্ যাতা স্তদপি সুদৃশাং কিং করত্বং যুবানঃ।।
ত্বয্যাসীনে মনসিজ গুরৌ যত্র সারিঙ্গ নেত্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে রচিত চতুরোদ্যান দোলাবিলাসাঃ।
অভ্যস্যন্ত্যঃ সরভসমিব ব্যোম-কান্তার-যানং
কন্দর্পস্য ত্রিদিব যুবতীং জেতু কামস্য সেনাঃ।।
প্রসাদানাং দিন পরিণতৌ গর্ভদগ্ধাগুরুণাং
জালোদ্গীর্ণঃ সজল জলদ শ্যামলো যত্র ধূমঃ।
সদ্যঃ ক্রীড়া কৃত (তু?) করভ সারুঢ় পৌরীমুখেন্দু জ্যোৎস্না সঙ্গ
প্রসৃমরতমঃ শ্রেণি শঙ্কাং তনোতি।।
ব্যর্থীভূত প্রিয় সহচরী চারু বাচাং নিশীথে
রোষাদস্ত্রীকৃত কুবলয়োত্তং সবিত্রংসি মাল্যং।
যূণাং যত্র প্রণয়-কলহং কেলিহর্ম্ম্যাগ্র ভাজা-
মিন্দুঃ প্রত্যাদিশতি সাবিধীভূয় শশ্বৎ করেণ।।
তত্র স্বেচ্ছা রতি বিনিময়ে চৈব সীমন্তিনীনাং
কর্ণস্রংসি প্রকৃতি সুভগং কেতকী-গর্ভ-পত্রং।
উৎপশ্যন্তি ব্যতিকর চলৎ কুণ্ডলা ঘট্টনাভি
ভিন্নং সাক্ষাদিব মুখ বিধৌঃ খণ্ডমেকং বিদগ্ধাঃ।।
বাচঃ শ্রোতামৃতমনুগত ভ্রূবিলাসাঃ কটাক্ষা
রূপং হস্তোচ্চয় সমুদিতং স্নিগ্ধ মুগ্ধাশ্চ হারাঃ (বাঃ)।
যাতং লীলাঞ্চিতমকৃতকং যত্র নেপথ্যমেতৎ
পৌরস্ত্রীণাং দ্রবিণ সুলভা প্রক্রিয়া ভূষণঞ্চ।।"

এই সময়ে দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কিরূপ রুচি ছিল তাহার স্পষ্ট চিত্র রাজকবি ধোয়ীর "পবন দূতম্," গোবর্ধনাচার্যের "আর্থাসপ্তশতী," কবিকুল-বরেণ্য জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" মধ্যে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজ্যকাল :

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তদীয় ধর্মাধিকারী

"ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"-প্রণেতা হলায়ুধ লিখিয়াছেন,—লক্ষ্মণ সেন তাহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতদের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও পৌঢ়াবস্থায় ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন, যথা—

"বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল
চ্চত্রোৎসিক্ত-মহা-মহত্ত্বনুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন-শেষ-যোগ্যমখিলক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ।।"

লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মাধবসেন :

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণের তাম্রফলকে লক্ষ্মণের পুত্রস্থলে মাধবের নাম বিবৃত নাই, কিন্তু কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের নাম আছে। গৌড়েব্রাহ্মণ-রচয়িতা কেশব সেনের তাম্রফলকের ১৫শ শ্লোক উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—"কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনা দ্বারা কেশব সেনকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেশব সেনের তাম্রশাসনের লিখন, কেশব সেনের পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধব সেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছে। সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্বেই মাধব সেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশব সেনের নাম যোগ করা হইয়াছে। মাধব সেন, কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

রামজয় কৃত কুলপঞ্জিকা, ইন্ডো-এরিয়ান এবং আইন-ই আকবরি গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের পর মধু সেন নামে একটি রাজনাম পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থসমূহে উহাকে কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত মাধবসেনই অন্যায়রূপে অক্ষরান্তরিত হইয়া মধু সেন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মধু বা মাধবকে কেশবের পিতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনকেই কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইদিলপুর শাসনে কেশবসেনের নাম দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখা যায় যে কোন একটি নাম চাছিয়া ফেলিয়া কেশব সেনের নাম পুনরায় খোদিত হইয়াছে। যে স্থানে এই রূপ করা হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি পড়িবার কোন কষ্ট নাই। মদন পাড় শাসনেও ঐরূপ বিশ্বরূপ নামটি দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থলেই ফলক-লেখককে স্থানের অসচ্ছলতার জন্য নামের অক্ষরগুলিকে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বরূপ" নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। সম্ভবত কোনও একটি তিন অক্ষরের নাম চাছিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে "বিশ্বরূপ" এই চারি অক্ষরের নামটি বসান হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। সুতরাং অনুমিত হয় যে মদন-পাড় শাসনে মাধবের নাম চাছিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে বিশ্বরূপ সেনের নাম বসান হইয়াছে। কোনও এক অজ্ঞাত-নামা-লেখকের পুস্তকে লিখিত আছে —

"তস্য বল্লাল সেনস্য পুত্রো লক্ষ্মণ সেনক।
মধু সেন স্তস্য পুত্রো নানাগুণ সমাযুতঃ।।"

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পরে মাধব সেন বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে মাধবের তিরোধান ঘটিলে কনিষ্ঠ বিশ্বরূপ সেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মদন পাড়ের তাম্রশাসন হয়ত মাধবের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল , কিন্তু দান সিদ্ধ করিবার পূর্বে মাধবের অভাব হইলে, বিশ্বরূপ সেনের নামই তাম্রশাসনে স্থান লাভ করিয়াছে। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্তী ডোগেশ্বর মন্দির-গাত্রস্থিত শিলালিপিতে

মাধবসেনের কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া এটকিনসন লিখিয়াছেন। "সেনবংশীয়গণ তৎকালে আত্মকলহে মত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আজও জানা যায় নাই, কিন্তু এই সময়ে মাধব সেনের কতিপয় অনুচর যে গাড়োয়াল প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে হিন্দু রাজগণের মধ্যে যে কোনও না কোনও উৎপাত চলিতেছিল, তাহা স্পষ্ট সূচিত হয় ; নতুবা মাধব সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অধিকারী ব্রাহ্মণ বিষয় সম্পত্তি ও রাজঅনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলিল দস্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়াছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গাড়োয়ালে পলাইয়া গিয়াছিলেন। একেবারে অত দূর দেশে পলায়নেরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে। অশোক চল্লদেব বা তাঁহার ভ্রাতা দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন হয়ত এই সেন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে বিপৎকালে সেই দূরাগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এ ঘটনা কনোজ ধ্বংসের পূর্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত উপদ্রব অশান্তিতে ডুবিয়াছিল। তুর্কিগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান।"

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেন নামীয় একটি এবং মাধব নামীয় পাঁচটি কবিতা উল্লিখিত হইয়াছে ; উক্ত উভয় মাধব একই ব্যক্তি অথবা পৃথক ব্যক্তি এবং এক হইলেও সেনরাজবংশের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় না।

বিশ্বরূপ সেন :

বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বসুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই এই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাম্রশাসন প্রদাতার নাম বিলুপ্ত করা হইয়াছিল ; সুতরাং ইহাতে মনে হয়, লক্ষ্মণ সেনেব মৃত্যুব পর সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃ বিরোধ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে বিশ্বরূপ সেন কর্তৃক মাধব সেন বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর কুমায়ুন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন তদীয় ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অন্তত ১৯ বৎসর কাল বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

মদনপাড়ে তাম্রশাসন : এই তাম্রশাসন দ্বারা বাৎস গোত্রীয়, ভার্গবিচ্যবন-আপ্লবত-জামদগ্ন্য-প্রবল পরাশর দেবশর্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেব শর্মার পৌত্র, বনমালি দেব শর্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেব শর্মাকে শিব পুরাণোক্ত ভূমিদান ফল কামনায় পৌণ্ড্রবর্ধন ভূক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ী পাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্ছোকাপী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকার্পা জঙ্গালসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোঞ্জীকাপী গ্রাম-মধ্যস্থিত কন্দর্পশঙ্করাশ ভূমি ও নাবাতর্প গ্রামস্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহাতে অনুমিত হয় দুইখণ্ড ভূমি দান করা হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে গৌড়-সন্ধি বিগ্রহিক কোপবিষ্ণুর নাম রহিয়াছে। কেশব সেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের মদন পাড়ে শাসনের সমুদয় শ্লোকগুলিই রহিয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও কতিপয় শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিশ্বরূপ কেশব সেনের অগ্রবর্তী ছিলেন।

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন, "গর্গ যবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্রঃ" এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি "গর্গ যবনান্বয়" দিগকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন। ঘোরদেশীয় তুরস্কদিগকেই সম্ভবত "গর্গ যবনান্বয়" বলা হইয়াছে।

বিশ্বরূপের সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ তনয় সুন্দর সেন সুবর্ণগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুন্দর সেন "কুমার সুন্দর" নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজ-নন্দনের নামানুসারে সুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমত কুমার সুন্দর এবং পরে কোণ্ডরসুন্দর বা কয়ারসুন্দর নামে অভিহিত হয়। এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। বিশ্বরূপ তনয় কোনও সময়ে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এবং তাঁহার নাম সুন্দর সেন ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় সেনবংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব নহে।

লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে কেশব সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদক কর্নেল জ্যারেট কেশব সেনের পরিবর্তে "কেশু" সেন নাম পাঠ করিয়াছিলেন। কেশব সেনের তাম্রশাসন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইবার পর, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রিন্সেপ সাহেবের পাঠ নির্ভুল নহে। তাঁহার মতে উক্ত শাসনের রাজনাম কেশব সেন স্থলে বিশ্বরূপ সেন বলিয়া পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। অবশেষে ডাঃ কিলহর্ন নগেন্দ্রবাবুর মতই গ্রহণ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত উত্তর-ভারতীয় উৎকীর্ণ লিপিমালার তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[২৩০]। নগেন্দ্রবাবু তাম্রশাসনের ১০ম কবিতায় ১৭শ পংক্তিটির যে সংশোধন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে, কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজনাম আছে তৎ প্রতি প্রণিধান করেন নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহা "কেশব সেন" বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন, দাতার নাম স্থলেও যে সেই নামটি রহিয়াছে, তাহা ৪—৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই হইবে। রাখালবাবুর মতে লিপিখানির প্রকৃত পাঠ এই[২৩১] —

"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাস-ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ।" তপনদীঘি এবং আনুলিয়ার তাম্রশাসনে "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব কুশলী" এবং মদনপাড়ের শাসনে "শ্রীবিশ্বরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ"—এইরূপ পাঠ আছে। সুতরাং ইদিলপুর শাসন খানি বিশ্বরূপ সেনের প্রদত্ত হইলে দাতার নাম স্থলে "শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ" এরূপ পাঠ না থাকিয়া "শ্রীবিশ্বরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ" এইরূপ পাঠই থাকিত।

"নগেন্দ্রবাবু ইদিলপুর-প্রাপ্ত শাসনখানির নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি সংশোধন কালে,—(পংক্তি ১৭) ...

"এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপু-বধূ বৈধব্য-বদ্ধ-ব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ" ইত্যাদি স্থলে, "এতস্মাৎঋ কথমন্যথা রিপু বধূ বৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন।

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, ইদিলপুরের শাসনখানিও বিশ্বরূপ সেন দেবের প্রদত্ত, কেশব সেনের নহে। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু বিশ্বরূপ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, লক্ষ্মণসেনকে করা হয় নাই। আর তাহা হইলে, তারাদেবী (তান্দ্রাদেবী) কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, লক্ষ্মণসেনের মহিষী বলিতে পারা যাইবে না। অবশেষে

ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরূপ সেন রাজা বিশ্বরূপের ঔরসে মহিষী তারাদেবীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।।[২৩২]

বস্তুত ইদিলপুরের শাসন খানি কেশবসেনেরই প্রদত্ত, বিশ্বরূপ সেনের নহে। কেশব লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুত্র। তাঁহার—"অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর" এই রাজ্যোপাধি ছিল। তাম্রশাসনে ইহাকে "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

সদাশিব মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে সদাশিব মূর্ত্তী নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে —

"বদ্ধ পদ্মাসমাসীনঃ সিত ষোড়স বর্ষকঃ।
পঞ্চবক্তঃ করাগ্রেঃ স্বৈর্দশভির্শ্চৈব ধারয়ন্।।
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীস্বরঃ।
দক্ষৈঃ করে বামকৈশ্চ ভূজগঞ্চাক্ষসূত্রকং।।
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূরক মূত্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তি স্ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ"।।
গরুড় পুরাণ পূর্বার্ধ ২৩শ অধ্যায়।

মহানির্বাণ তন্ত্রে সদাশিবের নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে ঃ—

"ব্যাঘ্র চর্ম্ম-পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতিনম।
বিভূতি লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কার-ভূষিতম্।।
ধূম্র পীতারুণ শ্বেত কৃষ্ণৈপঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজুট ধরং বিভূম্।।
গঙ্গধরং দশভূজং শশিশোভিত-মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিশকং পরশুং করৈঃ।।
বামৈ দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈ দেবৈ মুনিবরৈঃ স্তুতম্।।
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম্।
হিম-কুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃযাসন বিরাজিতম্।।
পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানুমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্ প্রিয়ম্।।

লক্ষ্মণ সেনের পর তদীয় পুত্রত্রয় গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর মধ্যে তিন জন সেন রাজপুত্রই একে একে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে —

"বল্লাল তনযো রাজা লক্ষ্মণোভূৎ মহাশয়ঃ।

* * * * *

তৎপুত্র কেশবো রাজা গৌড় রাজ্যং বিহায় সঃ।।
মতিং চাপ্য করোৎ দ্বন্দ্বে ডবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্লুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ।।"

বিশ্বকোষ এবং সম্বন্ধ নির্ণয় এই উভয় গ্রন্থেই উক্ত পাঠ অধ্যাহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় ইহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। কথা এই যে কেশব সেন, যবনের সহিত দ্বন্দ্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি যবন ভয়ে গৌড় (নদীয়া) পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র চলিয়া যান। কেন না, তাহা না হইলে তিনি তথায় থাকিতে পারেন না। এ অর্থ না করিলে সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হয় না, এবং তাহা হইলে "চাপ্যকরোৎ" কথাও রাখা যায় না, রাখিলে অর্থ হয়,

দ্বন্দ্ব করিতে মন করিলেন অথচ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রকৃত পাঠ ঃ—

"মতিং নৈবাকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ"।

হইবে ; এবং ইহার পর আরও একটি পংক্তি হইবে, যাহাতে রাজার স্থানান্তর গমন প্রতিপাদিত হয়। পরের যে পংক্তি আছে, উহার অর্থ এই যে, রাজা পলায়ন করাতে তদাশ্রিত ব্রাহ্মণগণও তথায় থাকিতে পারিলেন না।

কলাচার্য এডুমিশ্র লিখিয়াছেন —

"নৃপংতং কেশবো ভূপতিঃ সৈন্যৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈ রনৈশ্চ যুক্তোগতঃ। তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিত। ক্ষ্মাপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লাল সেন নৃপঃ। কীদৃগ্ বিপ্রকুলাকুলাদি নিয়মঃ কস্মাৎ কথং বা কুতঃ কেনোদ্যোগ ভরেণ বিপ্রনিকরৎ চক্রে তদাখ্যাহিমে। তংশ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ এড় মিশ্রমশেষ শাস্ত্রমখিলং বিপ্রং প্রথাপারগম্"।।

অর্থাৎ —রাজা কেশব সেন, সৈন্যগণ, পিতামত প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি, মহা আদর পূর্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার ও অনুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার পিতামহ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের কি প্রকার কুলকুলাদি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন? তাহা শুনিয়া কেশব, বহুশাস্ত্রবিদ্ বিপ্রপ্রথা পরাগ আপনার কুলপণ্ডিত এডুমিশ্রকে কুলকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন[২৩৪]।

কেশব সেন কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কোন কোন কুলাচার্য বলেন, এই রাজার নাম "মাধব সেন", আবার কেহ কেহ উহাকে দনুজ মাধব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উহার নাম বিশ্বরূপ সেন বলিয়া অনুমান করেন। রাখাল বাবু কোনও নৃপতির নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে "পূর্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবত কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছিল" এবং কেশব সেন গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া উক্ত পূর্ব দেশাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নৃপতি গৌড়েশ্বর সেন দিগের কোনও সামন্ত নৃপতি নহেন[২৩৫]। কিন্তু আমরা উক্ত কোনও মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দনুজমাধব কেশব সেনের বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং কেশব সেন যে দনুজমাধবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ইহারা সকলেই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মাধব এবং বিশ্বরূপের পর কেশব সেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশেষত এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, কেশব সেনের আশ্রয়দাতা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার বিষয় অনবগত ছিলেন। বিশ্বরূপ যে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও অনুমান করা যায় না। সুতরাং কেশব সেন যে বিশ্বরূপ সেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। তুর্কিদিগের ভয়ে পলায়মান কেশব সেন যে অপরিচিত, অজ্ঞাতপূর্ব দেশীয় স্বাধীন নরপতির রাজ্যে সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়াই উক্ত নরপতি কর্তৃক সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস্য নহে। তিনি যে নরপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহার সহিত সেনরাজগণের সৌহৃদ্য ছিল এবং হয়ত তিনি তাঁহাদিগের অধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজাই হইবেন।

কেশব সেন সুকবি ছিলেন। সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ কেশব দেব বিরচিত[২৩৬] ছয়টি এবং কেশব-বিরচিত একটি শ্লোক[২৩৭] দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় কেশব সম্ভবত

অভিন্ন। সদুক্তি কর্ণামৃতোক্ত শ্লোকের রচয়িতা কেশব ও কেশব সেন সেনবংশোদ্ভব বলিয়াই মনে হয়। কেশব সেনের একটি শ্লোকের সহিত লক্ষ্মণ সেন দেব ও জয়দেবের রচিত একটি শ্লোকের ঐক্য দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় কেশব সেন বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রকাশ করিয়াছেন।

"কৈলাসো নিহ্নুতশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন্ন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বু রাশি প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্ত্তু-
র্যৎ কীর্ত্তীনাং বিবর্ত্তে রজনি স ভগবানেক দন্তোহপ্যদন্তঃ।।"

১. গৌড়রাজ মালা-উপক্রমণিকা।। ৯পৃষ্ঠা
২. Epigraphia Indica, Vol. I Page 307.
৩. Journal Proceedings of the Asiatic Society of Bengal Vol V New Series P. 471.
৪. 'যঃ কর্ণং প্রতি জগ্রাহ তেন কর্ণস্ত সূতজঃ।
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।।
পৃথুসেনান্বয়ে বীরো বীর সেনা ভবিষ্যতি।
গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যাংষঃ সোমটামুদ্বহিষ্যতি'।।
বল্লাল চরিতম্, দ্বাদশ অধ্যায় ৪৭-৪৮ শ্লোক।
৫. গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা।
'সৌমিনী দেবতা ভক্তঃ শাণ্ডিলাখ্য-ঋষে কুলে।
মহারাজ ইতিখ্যাত স্ততোহভূদ্ভুব শঙ্করঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোহপিচ"।
সহ্যাদ্রি খণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪।২৫-২৬ শ্লোক।
৬. 'দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজশ্চৈ কোহশ্বপতি সেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্র কেতুসেনো মহাধনঃ।
তস্যবংশে বীর সেনঃ ভূপ পুরঞ্জয়ঃ।
বল্লাল মোহ মুদ্গার ৩৪৭ পৃষ্ঠা।
৭. গৌড়রাজ মালা উপক্রমণিকা। ৯ পৃষ্ঠা।
৮. 'স্ত্রীবিশ্বাসিনশ্চ মহাদেবী গৃহ গূঢ়ভিত্তিভাক্ ভ্রাতা ভদ্র সেনস্য অভবন অতাবে কালিঙ্গস্য বীরসেনঃ'-হর্ষচরিতম্ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), ষষ্ঠ উচ্ছাস, ৪৭৬ পৃষ্ঠা।
৯. হর্ষচরিতম (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), ষষ্ঠ উচ্ছাস, ৪৮১ পৃষ্ঠা।
১০. সাহিত্য, ২২ শ বর্ষ, ১৩১৮। পৃঃ ৫৭৬।
'বংশে তস্যা ভুাদায়িনি সদাচার চর্য্যা-নিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতরৈ ভূর্যস্তোহনু ভাবৈঃ।
শশ্ব দ্বিশাভয় বিতরণ স্থূললক্ষ্যা বলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।
তেষাম্বংশ মহৌজাঃ পরিতিভট-পূতনাম্ভোধি কল্পান্ত সূবঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয় কুমুদ বনোল্লাস-লীলা মৃগাঙ্কঃ,
আসীদাজন্ম রক্ত-প্রণয়িগণ-মনেরাজ্য-সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈল-সত্যশীলো নিরুপধি-করুণাধাম সামন্ত সেনঃ।।
বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন ৩ ৪ শ্লোক।
১১. Epigraphia Indica, Vol I Page 308
১২. 'উদ্গন্ধীন্যাজ্য ধুমৈর্মৃগশিশু রপিত খিন্ন বৈখানস স্ত্রী
স্তন্য ক্ষীরাণি কীর প্রকব পরিচিত ব্রহ্মপাবায়ণানি।

যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভব ভয়া স্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পুর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গা পুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি'।।
দেওপাড়া প্রশস্তি ৯ম শ্লোক
Epi. Indica vol I Page-308.

১৩. 'গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়স্তম্বে রমস্যাহবে
তস্যৌম্মূলিত কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্রঘোষ মুষিত-প্রত্যুষ নিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালয়ে শুদ্ধং যশঃ'।
বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতম্ ৩।৭৩।
অর্থাৎ 'সূর্যের রথ চক্রের শব্দে প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষার শুভ্র যশ গান করিয়াছিল'।
গৌড় রাজমালা ৪৬ পৃষ্ঠা।

১৪. 'বিহুন বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে' (১৮/১০২) স্বীয় প্রভুকে 'কর্ণাটেন্দু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহ্লন 'রাজতরঙ্গিনীতে (৭।৯৩৬) বিহুনেব যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'পর্মাড়ি ভূপতি' বা বিক্রমাদিত্যকে 'কর্ণাট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্যগণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই"-
গৌড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা

১৫. 'দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গ বীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্য বিহিত বসামাংস মেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্তজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেততর্ত্তা"।।
Epi Indica vol I Page-308.

১৬. গৌড় রাজমালা (৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা)।

১৭. J. A. S. B vol LXV pt I Page 241

১৮. গৌড় রাজমালা, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

১৯. 'আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবল প্রত্যুগ্রভগ্নাবৃতি
প্রাকারায়ত তোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতট স্থাত্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈর্যুধি জর্জ্জরী কৃতনমদ্রাধেয় গাত্রাকৃতি
র্স্মন্দারাধিপতির্গ্নতো রণ ভুবোগঙ্গে শ্বরানুদ্রুতঃ।। J. A. S. B. vol L X V pt I Page 241.

২০. কবি আর্য ক্ষেমিশ্বর কার্তীকেয় রাজার সভাসদ ছিলেন। কবির প্রপিতামহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়, এজন্যই তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদানকালে আপনাকে আর্যপ্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ণাট রাজের সহিত মহীপাল দেবের সংঘর্ষের ফলে মহীপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, এই বিজয়োৎসব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'চণ্ডকৌশিক' নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

২১. Introduction to Ramcarit by Mahamahopadhya H P. Shastri Page 10.

২২. গৌড়রাজ মালা-উপক্রমণিকা ৩ পৃষ্ঠা

২৩. South Indian Inscriptions, Vol. III No. 18 Page 27

২৪. প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৯,-৩৯৬ পৃষ্ঠা।

২৫. 'যদীয়ৈ রদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈঃ
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধাইব দিশঃ
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরম্ভোধি লহরী
পরিত্যোর্ব্বী ভর্ত্তাহজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী।"

২৬ 'লীলাগৈ (গা) রৈ রমব নগরস্যাপি গর্ব্বং হরন্তীং
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভুষণং দক্ষিণস্যাঃ।
নক্তং যত্র প্রহরিক উবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কুর্ব্বন্ প্রা (পা) ণি প্রণিহ (হি) ত ধনুর্জ্জায়তে পঞ্চবাণঃ'।

"হিত্বা কি (কা) ঞ্চী মবিল (ন) যবতী ভুক্ত রোধো নিকুঞ্জাং
তাং কাবেরী মনুসর খগশ্রেণি বাচাল কুলাং।।"

J. A. S. B. 1905 Pages 54 & 55.

২৭. 'অচরমপরমাত্মাজ্ঞান ভীষ্মাদমুষ্মান্নিজভুজমদমত্তারীতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্বিম্ননির্জিতত্তদ্‌গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্মহেমন্তসেনঃ।
মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচুড়ামণি চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবিভুজয়োঃ ক্রুয়মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জঙ্ঘে সতত মিয়দিদং রত্নপুষ্পাণিহারা
স্তাড়ঙ্কং নূপুরশ্রক্কনকবলয়মপ্যস্যভৃত্যাঙ্গনামাম্'।।

দেবপাড়া প্রশস্তি, ১০-১১ শ্লোক।

Epigraphia Indica Vol. I Page 308.

২৮. "মহারাজ্ঞী যস্য স্বপর-নিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্ন-শ্রেণিকিবণ সবণি স্মের চরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রত বিতত নিত্যোজ্জ্বল যশা
যশোদেবীনাম ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।।
ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমার কেলি ক্রমঃ।
চতুর্জ্জধিমেখলাবলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ট জয়সাম্বয়ো বিজয় সেন পৃথ্বীপতিঃ।।"

দেবপাড়া প্রশস্তি, ১৪—১৫ শ্লোক।

Epigraphia Indica Vol. I Page 309.

২৯. দেবপাড়া প্রশস্তি ৩৩ শ্লোক- Epigraphia Indica Vol. I Page 311.

৩০. দেবপাড়া প্রশস্তি ১৭ শ্লোক

৩১. 'বাহোঃ কেলিভিবদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং'।।

৩২. 'ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরচতুরম্ভোধিলহরী
পরীতোর্ব্বীর্ত্তাহজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী'।।

৩৩ বাংলার ইতিহাস-২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা।

৩৪. 'অভবৎ বিলাসী দেবী শূরকুলাম্ভোধি কৌমুদী তস্য।
নয়নযুগমঞ্জুখঞ্জন বিহার কেলা স্থলী মহিষী'।।
বাংলার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৯২ পৃষ্ঠা।

৩৫ কেহ কেহ 'তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো' এই পাঠও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতা এবং গৌড়ের ইতিহাস রচয়িতা 'নরেন্দ্রঃ' পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে গৌড়রাজমালা, প্রভৃতি গ্রন্থে 'ববেন্দ্র' পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৬. গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃষ্ঠা।

৩৭. 'তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিবামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগ সুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তে পবিপশ্বিপঙ্গজসরঃ স্যন্দস্যনৈঃ সন্ধিকৈ
রুদগীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্ত সেনোহজনি।'

বল্লালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেন বংশ বর্ণনা।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ-পরিশিষ্ট ২৬১ পৃষ্ঠা।

৩৮ বাংলার ইতিহাস-শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৯. গৌড়ারাজমালা-৬০ পৃষ্ঠা।

৪০ Epigraphia Indica. Vol I Page 309

৪১ Indian Antiquary Vol IX p 188 Vol XIII p 418. Keilhorn's List of Northern Inscriptions. Appendix Epigraphia Indica Vol V.

৪২ Deutsche Morganlandische Gessels chaft Vol II p 8

৪৩. গৌড়রাজমালা-পৃষ্ঠা

৪৪. 'শাকে শ্রীহরিসিংহদেব নৃপতের্ভূপার্কতুলেহজনি।
তস্মাদন্তমিতেহব্দকেবুধজনৈঃ পঞ্জী প্রবন্ধকৃতঃ।।'

৪৫. প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৯।
* তারকা চিহ্নিত তারিখগুলি ব্যতীত অপরগুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৪৬. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III page 52.

৪৭. Epigraphia Indica Vol. I. P 309, Verse 20.

৪৮. গৌড়রাজমালা ৫৩ পৃষ্ঠা।

৪৯. Epigraphia Indica Vol. II. P 349.

৫০. Epigraphia Indica Vol. IX. P 323-326.

৫১. অথ রক্ষতা কুমারোদিত পৃথু পরিপন্থি পার্থিব প্রমদঃ।
রাজ্যমুপভুজা ভরস্য সুনুরগমদ্দিবং তনুত্যাগাৎ।।' রামচরিত ৪।১১

৫২. 'ধাত্রী-পালন-জৃম্ভমান-মহিমা কর্পুর-পাংশুৎকরৈঃ-
র্দেবঃ কীর্ত্তিময়ো নিজ [ং] বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতম্।।

৫৩. 'অপি শত্রুঘোপায়াদ্গোপালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ।
হন্তু কুন্তীনসাস্তনযস্যো তস্য সাময়িক মেতৎ।।'
রামচরিত ৪।১২

৫৪. 'তদনু মদন-দেবী নন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈঃ
শ্চরিত ভুবনগর্ভৈঃ প্রাংশুভিঃ কীর্ত্তিপুরৈঃ।
ক্ষিতিমচরমতাতস্তস্য সপ্তাব্দিদাম্নী
মমৃত মদনপালো রামপালোত্মজন্মা।"
গৌড় লেখমালা-১৫২ পৃষ্ঠা।

৫৫. Epigraphia Indica Vol I. P 309. Verse 20

৫৬. বামচরিত ২/৫ টীকা।

৫৭ বামচরিত ১/৬ টীকা।

৫৮. Journal Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1905, Page. 49.

৫৯. J.A.S.B L XXII, Page 113

৬০. J.A.S.B New Series Vol. I. No 3. Page 49.

৬১. Epigraphia Indica Vol V Appendix, Pages 510-52.

৬২. Ibid.

৬৩. Ibid

৬৪. বল্লাল চরিত ১২/৫২

৫৬. বাংলার ইতিহাস শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৩৬. 'গৃহস্থিতস্য শব, ভুবনেশ্বাগোতমগঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পশ্যন্তু বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়প্রিয়া হব"।
J A.S.B 1896 pt. I P 239

৬৭. J A.S B 1896 pt I. Page 241

৬৮ 'যস্যানুত্তর বঙ্গ সঙ্গর জয়ে নৌবাটি হীহীরব
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদাশ্রভূঃ।
কিঞ্চোৎ পাতুককে নিপাত পতন প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী।।'
গৌড়লেখমালা ১৩০ পৃষ্ঠা।

৬৯. "তস্মাদ জায়ত নিজায়ত বাহুবীর্য্য
নিষ্পীত পারব বিরোধি যশঃ পয়োধিঃ।
নেদিষ্ট কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্র বধূ কপোল
কর্পূরপত্র মকরীষু কুমার পালঃ।।"

গৌড় লেখমালা ১৫২ পৃষ্ঠা।

৭০. "সুকলাপায়িত কুন্তলরুচিমাবিললাটকান্তিমবনমদঙ্গাং।
অধরিতকর্ণাটেক্ষলীলাধৃতমধ্যদেশতনিমানমপি।।" রামচরিত, ৩।২৪

৭১. "গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তাননেন প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ।।
সংখ্যাতীত কপীন্দ্র সৈন্য বিভুনা তস্যারি জেতু স্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডব চমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিত ভুজা মাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিত টীপিনদ্ধ বসুধা চক্রৈক রাজ্যং ফলম্।।
একৈকেন গুণেনযৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধত্ত্য পরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যান্যস্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ংতু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈ র্দ্ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থান পুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ।।
দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরী কুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্মিপিলাঞ্ছিতোহসিরমুন প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদম্মুখী
তত্রাকৃষ্ট কৃপাণ ধারিণি গতাভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ।।'

Deopara Inscription of Vijay Sena-verse 16—19—Epigraphia Indica Vol 1. P. 309.

৭২. মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসনের ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত "দিব্যপ্রজা" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন, "এই শ্লোকের দিব্যপ্রজা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক "দিব্য" তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করায়, অন্যান্য স্থলেও তাঁহার নাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজবর্মার তাম্রশাসনেও ভোজবর্মার পিতামহ জাতবর্মার প্রসঙ্গে "দিব্যের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৩. "অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাতাথ দিব্য বিষয়োপভোগ সুখং।
কচিদপি কদাপি দুর্জন দূ (ভূ) যিতচর্য্যাং [২] ন সা সেহে।।"

রামচরিত ৪।২

৭৪. রামপালের সাহায্যকারী সামন্ত-নৃপালগণ মধ্যে "নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ" নামক এক সামন্ত রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু তাহাকেই বিজয় সেন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৭৫. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩০২—৩০৩ পৃষ্ঠা।

৭৬. "তস্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজ বিক্রম তিরস্কৃত-সহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পাল চক্রপুট ভেদন গীত কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতি বিজয়সেন পদপ্রকাশঃ।।"
বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন, ৭ম শ্লোক।

৭৭. বর্ধমানের ইতিকথা—৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা।

৭৮. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

৭৯. "দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবাল বালবলভী তরঙ্গ বহলগলহস্ত প্রশস্তহস্ত বিক্রমো বিক্রমারাজঃ"—রামচরিত ২।৫ টীকা।

৮০. জটাধারের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিযান তন্ত্রে। "সাহসাঙ্ক" বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্যায় বলিয়া ব্যাঘাত হইয়াছে।

৮১. পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট বিশ্বক সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোহপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ।।"

৮২. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1907. Page 206

৮৩. পাশ্চাত্য জয় চক্র কেলিযু যস্য যাবদ্

গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভগ্র্গস্য মৌলি সরিদন্তসি ভস্ম পঙ্ক
লগ্নোজ্‌ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি।।"
—দেব পাড়া প্রস্তর লিপি ২২শ শ্লোক।
Epigraphia Indica Vol. I. Page 309.

৮৪. গৌড় রাজমালা—৬৫ পৃষ্ঠা।

৮৫. "অশ্রান্ত বিশ্রাণিত যজ্ঞযূপ স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্ব মানঃ।
যস্যানুবাবাম্ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেক পদোপি ধর্ম্মঃ।।
মেরোরাহৃত বৈরিসঙ্কুল কটাদাহূয় যজ্বামরান্‌
ব্যত্যাসং পুর বাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্তস্য চ।
উত্তঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তম্ভৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবা পৃথিব্যোর্ব্বপুঃ।।"
দেবপাড়া প্রশস্তি ২৪—২৫ শ্লোক।
Epigraphia Indica Vol. I. Page 310.

৮৬. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—৩০৫ পৃষ্ঠা।

৮৭. "মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈর্ম্মরকত শকলং সাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈরূপ্যানিরত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্‌।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিত কুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্‌।।"
দেবপাড়া প্রশস্তি ২৩ শ্লোক।
Epigraphia Indica Vol. I. Page 310.

৮৮. দেবপাড়া প্রশস্তি ২৯ শ্লোক।

৮৯. "চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মাহৃদয় বিনিহিত স্থূলহারোরগেন্দ্র
শ্রীখণ্ডাক্ষোদভস্মা করমিলিত মহানীলরত্নাক্ষ মালঃ।
বেষ স্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতাগোন সঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্যগ্রস্থিবিচ্ছাস মুচিত রচনঃ কল্প কাপালিকস্য।।"
দেবপাড়া প্রশস্তি ৩১ শ্লোক—
Epigraphia Indica Vol. I. Page 311.

৯০. অস্মাদশেষ ভুবনোৎসব কারণেন্দুর্বল্লালসেন জগতীপতিরুজ্জগাম।
যঃ কেবলং ন খলু সর্ব নরেশ্বরাণআমেকঃ সমগ্র বিবুধামপি চক্রবর্তী।।"
লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরের তাম্রশাসন—৮ম শ্লোক। J.A.S.B. 1909, Page 472.

৯১. "পদ্মালায়েব দয়িতা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল-রজনীকর-শেখরস্য।
অস্যপ্রধান-মহিশী জগদীশ্বরস্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিবাস বিলাস দেবী।।
এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত বল্লাল সেন মতুলং গুণ গৌরবেন।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তর মেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রি শিখরং নরদেব সিংহ"।
—বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, ১০-১১ শ্লোক।
সাহিত্য, ১৩১৮, কার্ত্তিক—৫২৪ পৃষ্ঠা।

৯২. "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা
বিজ্বক্‌ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।"
রামজয় কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জী।"

৯৩. গৌড়ের ইতিহাস ১৮৬ পৃষ্ঠা। প্রতিভা—১৩১৮, পৃঃ ৪৬৬।

৯৪. The Dynasties of the Kanarese Districts by J. F. Fleet Esqr.—The Hoysalas of Dorasamudra, page 493.

৯৫. গৌড়ে ব্রাহ্মণ—পরিশিষ্ট—২৯১ পৃষ্ঠা।

৯৬. "ধরা ধরান্তঃরপুর মৌলিরত্ন
চালুক্য ভূপাল কুলেন্দু লেখা।
তস্য প্রিয়ভূদ্বহমান ভূমি
র্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।।"
লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগর—তাম্রশাসন ৯ শ্লোক
J. A. S. B 1909, page 472.

৯৭. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1906, p. 17 note (India Government M. S. Fol, 52 a).

৯৮. দানসাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে "সময় প্রকাশ" প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ "নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) রচনা করেন —
"নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবেন।
পূর্ণে নবশশি দশমিতে শকাব্দে দান সাগরো রচিত।।"

৯৯. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Manuscripts 1894, page LXXXV.

১০০. প্রবাসী—১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

১০১. গৌড় রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা।

১০২. H. P. Shastri's notices of Sanskrit Manuscripts—2nd Series, Vol. I Page 170.

১০৩. Epigraphia Indica Vol. viii, appendix (Synchronistic List for Northern India).

১০৪. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা।

১০৫. "বেদার্থ স্মৃতি সংগ্রহাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বল বীচিনাশ নয়নঃ সারপূতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্মা ভবদার্যশীল নিলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিবগীষ্পতির্নরপতেরস্যানিরুদ্ধোগুরুঃ।।
আধ্যাত সকল পুরাণ স্মৃতিসারঃ শ্রদ্ধয়া গুরোরস্মাৎ।
কলিকল্মযোবদানং (?) দান নিবন্ধ বিধাকামপি"।।
"Danasagara,"—H. P. Sastri's "Notices," second Series, Vol. I. Page 170

১০৬. "জ্যোতির্বিদার্য্যবচনানি বিচার্য্য তেষাং
তাৎপর্য্য পর্য্যবসিতৌ প্রথনানুপূর্ব্যা।
বিপ্রপ্রসাদন বশানবসাদ-বুদ্ধি
নিশঙ্ক শঙ্কর নৃপ কুরুতে প্রয়ত্নম্"।।

১০৭ Eggelings India office Catalogue, pt III.

১০৮. Mss no II.

১০৯. Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanscrit Mss 1st Series Vol I Page 151.

১১০. Catalogue of Sanscrit Mss in Kashmir by M. A. Stain

১১১ Report on the Search of Sanscrit Mss in the Bombay Presidency, 1884-86 by R. G. Bhandarkar p. 84. No. 861.

১১২. Govt. No. 1193.

১১৩ H P. Shastri's Notices of Sanscrit Mss Vol II.

১১৪ Indica Office Catalogue, pt III No 712.

১১৫ "উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নির্ণীয়ুঃ কুলমুৎকর্যমধমানধমাঃস্ত্যজেৎ।।
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যলায়েন শূদ্রতাম্"।।
মনুপ—৪ অঃ ২৪৪।২৪৫

১১৬ "আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্।।"

১১৭. "অত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রাজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পাশ্চাত্যাদিভিঃবের্দাধ্যয়ন মাত্রং ক্রীয়তে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যনয়ং বিনা কিয়দেকদেশ বেদার্থস্য কর্ম-মীমাংসা দ্বারেণ যজ্ঞেতি কর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। নচৈ তেনাপি মন্ত্রকর্মবেদার্থজ্ঞানম্ যত স্তৎ পরিজ্ঞান এব শুভ ফলম। তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে"।

১১৮. গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারী পাত্র-
নারায়ণস্যতনয়ঃ সুনয়োহম্বরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিত লোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।
লোধ্রবলী কুলীমঃ—"লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃদত্তকুলোৎপন্নঃ" শিযদাস সেন।

১১৯. "বিরমতিমির সাহসাদমুষ্মা-
দ্দিনমণি নিরম্ভমুপাগতস্ততঃ কিং।
কলয়সি নং পুরোমহো মহোর্ম্মি-
প্লুত বিয়দভ্যুদয়ত্যয়ং সুধাংশু"।।

১২০. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৩ পৃষ্ঠা।

১২১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৬ পৃষ্ঠা।

১২৩. ঐ—২৩৭ পৃষ্ঠা।

১২৪. "ওঁ নমঃ শিবায়"।
"সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান-বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভি-
র্থিমর্য্যাদ-রসার্ন্নবো দিশতুবঃ শ্রেয়োর্দ্ধ-নারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ-
র্নাট্যারম্ভ-রয়ৈর্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধ-শ্রমঃ"।।
সাহিত্য ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৫২৩ পৃষ্ঠা।

১২৫. Introduction to Modern Budhism P. 21

১২৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ২৩৭—২৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৭. J. A. S. B. New Series vol X page. 100—101. Verse 13.

১২৮. সম্প্রতি লক্ষ্মণসেনের অপর একখানি তাম্রশাসন ২৪ পরগনার অন্তর্গত দক্ষিণ গোবিন্দপুর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

১২৯. উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয় মাপকাঠিটি দ্বাদশ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক ছিল এবং উহাতে উগ্রমাধব পাদীয়স্তম্ভ অঙ্কিত থাকিত। সম্ভবতঃ উগ্রমাধবের মন্দিরের সন্নিকটবর্তী কোন স্তম্ভের উচ্চতা-পরিমিত মানদণ্ড দ্বাবা ভূমির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপ করা হইত।

১৩০. লক্ষ্মণসেন হেমাশ্বরথ-মহাদানকর্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্মাকে আচার্যপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং আচার্য-দক্ষিণাপ্রদান করিবার জনাই সম্ভবত তাঁহাকে এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। সুক্তজপাঙ্গ দান মহাদান নামে পরিচিত ছিল। তাহারই এক শ্রেণি হিরণ্যাশবরথ নামে কথিত হইত।

১৩১. পুরাণ একটি পরিভাষিক শব্দ :—তাহা ষোড়শ পণেব সমান, সেকালের রৌপ্যমুদ্রার সমকক্ষ যথা—
"তো ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতং।
কার্যাপণস্তু বিজ্ঞেয় স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ"।।

১৩২. Epigraphia Indica vol V. Page 184.

১৩৩. "যেনাপাস্ত-সমস্ত-শস্ত্র-সময়ঃ সংগ্রাম ভূমৌ বিপু
শ্চক্রে বঙ্গ করীন্দ্র-সঙ্গ-বিযমে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে.
যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিত স্ত্রৈলোক্য সিংহো বিধিঃ
সোভূদ্ভাস্কর বংশ-রাজতিলকো রায়াবি দেবো নৃপঃ"।।

১৩৪. গৌড়রাজমালা ৬৭ পৃষ্ঠা।

১৩৫. "গন্ধেভস্কন্ধকণ্ডুমদগুরুমবন্দহিল্লোল লৌহিত্যা খেল
দ্বীচি বাচাল কালাচল বিপুল শিলাকেলিতল্পে নিষগ্নাঃ।
কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুত বিধুরতা ভীতয়ো গীতবন্ধৈ
যস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্র প্রণতি পরিগতং পৌরুষং প্রস্তুবন্তি"।।

J. A. S. B. 1906. Page 161

১৩৬. (ক) "দেবঃ কুপ্যত্তবা বিচিন্ত্য বিনয়ং প্রীতোস্তু বামাদৃশৈ
র্বাঞ্ছন্তিঃ প্রভুকীর্ত্তিমপ্রতিহতাং বক্তব্য মেবোচিতং।
সেবাভির্যদি সেন বংশ তিলকাদাসাদনীয়াঃ শ্রিয়ঃ
সঙ্কল্পানু বিধায়িনঃ সুরতরুস্তৎ কেন হার্য্যোমদঃ"।।
(খ) ভ্রুক্ষেপাদ্ গৌড় লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গাং
শ্চেতশ্চেদি ক্ষিতীন্দ্রো স্তপতি বিতপতে সূর্যবৎ দুর্জনেষু।
স্বেচ্ছাং ম্লেচ্ছান্ বিনাশং নযতিবিনযতে কামরূপাভিমানং
কাশী (ভর্ত্তুঃপ্র) ভর্ত্তুর্ব্বিকাশং হরতি বিহরতে মুর্দ্ধিযো (মাধবস্য) মাগধস্য।।

J. A. S. B 1906 Page 174.

১৩৭. "সাধু ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূ-
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ত্ততে।
দেব কুপ্যতি যস্য বৈরি পরিষম্মারাঙ্কমশ্বেপুরঃ (?)
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনা পত্রান্তরালে গিরঃ"।।

J. A. S B 1906 Page 161.

১৩৮. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩৯. J. A. S. B. 1906 Page 174

১৪০. ১২০২ বিক্রমাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়ায় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গাগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা তাঁহার মগধ অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। Epigraphia Indica vol vii P. 98.

১৪১. "বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরাগদাপাণি সংবাদবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরুণাশ্লেষ গঙ্গোর্ম্মিবাজি।
তীরোৎ সঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ সমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জযস্তম্ভ মালান্যধায়ি"।।
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1896. Pt I P. II

১৪২. "নখাঙ্কং নারীণামনিললুলিতং কেতক দলং
কলামিন্দোঃপত্রং পরিণতি বিশীর্ণং জলরুহাং।
নিরীক্ষ্যাগ্রে যস্য মিলিতানৌকাটক ঘটা
হঠা কৃষ্টি ভ্রাটাশ্চকিতমিব কাশীজনপদাঃ"।।

J A S. B. 1906, Page 161.

১৪৩. J. R. A. S. vol. III No. 18.

১৪৪. The Era of Lachhman Sen--H. Beveridge .—J As. B. 1888. Part I Page 2.

১৪৫. Indian Antiquary vol XIX P I

১৪৬. "In the Country of Bang (bengal) dates are Calculated from the begining of the reign of Lachhman Sen. From that period till now there have been 465 years"—Akbar Nama, Ed. Bibliotheca Indica vol II. P. 13.

১৪৭. J. A. S B New Series vol I P 50.

১৪৮. Early History of India. 3d Edition P 418.

১৪৯. Ibid Page 418—19

১৫০. গৌড়রাজমালা—৬৪ পৃষ্ঠা।

১৫১. "প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীণবার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালোহভূন্মৃত-ধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষণো জাতবানসৌ।" লঘুভারত।

১৫২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) ৩৫১—৫২ পৃষ্ঠা।

১৫৩. Dacca Review, 1912 P 88—93, গৃহস্থ—১৩২০— ফাল্গুন।

১৫৪. Indian Antiquary Vol XIX. P. I.

১৫৫. বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) ১৩১৫, পৌষ, ৪৪৪—৪৪৫।

১৫৬. J. A. S. B. New Series Vol. 9—P—271.

১৫৭. বাংলার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ৩০০—৩০১ পৃষ্ঠা।

১৫৮. J. A. S. B. Vol I. new Series Page 45.

১৫৯. Mss 787 খ, Page 22

১৬০. Mss 1577 ছ, Page 33.

১৬১. Mss 1113 ঙ, Page 35.

১৬২. Mss 13616. Page 51.

১৬৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭শ ভাগ, ২১৪ ও ২১৬ পৃষ্ঠা।

১৬৪. A. S. R. Vol III. P. 126 Part XXXV :—Indian Antiquary Vol X. P. 341. বঙ্গদর্শন ১৩১৬—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

১৬৫. "ভগবতি পরি নির্বৃতে সম্বৎ ১৮১৩ কার্ত্তিক বদি ১ বুধে।"
Indian Antiquary Vol X. Page

১৬৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭, ২১৩ পৃষ্ঠা।

১৬৭. বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৬। J. A. S. B.—1914—March.

১৬৮. বঙ্গদর্শন ১৩১৬, মাঘ ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

১৬৯. প্রতিভা ১৩১৮, পৌষ, ৪৭৪—৪৭৫ পৃষ্ঠা।

১৭০. Early History of India. Page—42

১৭১ Pilgrimage of Fahian. chap X. note 3.

১৭২. The Mahawanso by—Hon. George Turnour Esq. (1836). chap. III P. 12.

১৭৩. Early History of India.

১৭৪ J. R. A. S. 1905 P. 51.

১৭৫. প্রবাসী—১৩১৬, আশ্বিন—৪২৬ পৃষ্ঠা।

১৭৬ J. R A. S. 1906. P. 667.

১৭৭. J. R. A. S. 1909. J. R. A. S. 1910

১৭৮. J R A. S. 1911.

১৭৯ The Revised Budhist Era in Burmah by C. O. Blagden. J. R. A. S. 1909.

১৮০ Ibid

১৮১. Epigraphia Indica Vol V. Appendix no 166.

১৮২ "During the reign of Lakshman Sena the years of his reign would be described as "Srimallakshman devandanam rajya (or Prabardhamana-vojayarajue) sambat ." after death the phrase would be retained but atita prefixed to the word rajye to show that although the years were still contend from the commencement of the reign of Lakshman Sena that reign itself was a thing of the past."
Indian Antiquary vol XIX. Page 2 note 3

১৮৩ Ind Ant. Vol IXX. Page 7. বঙ্গদর্শন ১৩১৬ মাঘ।

১৮৪ Cunningham's Archaeological Survey Report Vol III.

১৮৫ J A S. B. 1896 Part I. plate I and II

১৮৬ J A S B. 1874 pt I. plate XVIII

১৮৭ Epigraphia Indica Vol V. plates 19—20

১৮৮. গৌড় রাজমালা ৬৪—৬৫ পৃষ্ঠা।
১৮৯. প্রবাসী—১৩১৬, শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।
১৯০. Indian Antiquary, vol XIX P. 2 note 3.
১৯১. Bendall's Catalogue of Budhish, Sanscrit Manuscripts in the Cambridge University Library. Page 70.
১৯২. Epigraphia Indica Vol. V. Appendix
১৯৩. Indian Antiquary vol VI. Page 194 : Dr. Kielhorn's list no 191--Epigiaphia Indica Vol V. Appendix page 28.
১৯৪. Indian Antiquary Vol III. Page 505. Vol VI, Page 363, Vol X page 58.
১৯৫. Epigraphia Indica Vol VI. Page 4.
Indian Antiquary Vol XIX, Page 7.
১৯৬. Ind. Ant. Vol VI. Page—363
১৯৭. প্রতিভা, ১৩১৮ পৌষ।
* প্রতিভা ১৩১৮ ভাদ্র।
১৯৮. বিক্রমপুরের ইতিহাস শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ৪৫ পৃষ্ঠা।
১৯৯. Indian Antiguary, July, 1912.
২০০. ভারতবর্ষ ১৩১২, কার্ত্তিক, ৭৮১ পৃষ্ঠা।
২০১. গৃহস্থ ১৩২০, ফাল্গুন, ৪২৬ পৃষ্ঠা।
২০২. প্রতিভা ১৩১৮, ৯ম সংখ্যা, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।
২০৩. বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।
২০৪. বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।
২০৫. গৃহস্থ ১৩২০ সাল ফাল্গুন পৃষ্ঠা।
২০৬. ঐ পৃষ্ঠা।
২০৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজকন্যাকাণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা।
এই দলিলগুলির মধ্যে দ্বিতীয়খানি বিক্রমপুর—মসূরা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অপরগুলি সাময়িক পত্রিকায় ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।
২০৮. "বল্লাল-তনয়ো রাজালক্ষ্মণোহ ভুম্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহ ভায়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোহ ভূদনন্তরম্"।।
(হরিমিশ্র)—বঙ্গের জাতির ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ ১৫২ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।
২০৯. Tabaqat-i-Nasiri (Trans, by Raverty) P. 554.
২১০. Ibid P. 552. & 556 Footnote 6.
২১১. Tabaqat-i-Nasiri (Raverty(P. 557.
পাঠান বিজয়ের সময় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। বুকানন সাহেবের মতে ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে, মেজর রেভার্টি ও মুন্সি শ্যামপ্রসাদের মতে ৫৯০ হিঃ (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) ডাঃ মিত্র ও কৈলাসবাবুর মতে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ (১১২৭ শকাব্দে), স্টুয়ার্ট ও ওয়াইজ সাহেবের মতে ৬০০ হিঃ (১২০৩—৪ খ্রিষ্টাব্দে) ডাঃ কিলহর্ণ (Indian Antiquary Vol. XIX.) ও বিভারিজের (J A. S. B. 1898 pt. I P. 2) মতে ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ; ব্লকম্যানের মতে (J. A. S B 1873 pt. I P 211) ১১৯৮—৯৯ খ্রিষ্টাব্দ। গৌড়রাজমালার লেখক ব্লকম্যানের মত সমর্থন করিয়াছেন (গৌড় রাজমালা ৭১ পৃষ্ঠা)। উইলফোর্ড সাহেবের মতে (Asiatic Researches Vol IV P 203) ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দ। টমাস সাহেবের মতে (Initial Coinage of Bengal P.) ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে (J A. S. B. 1898 P 31) ল ১১৯৭—৯৮ খ্রিষ্টাব্দ। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় (সাহিত্য ১৩০১, ৩ পৃষ্ঠাঃ সেক শুভোদয়ার লিখিত —
"চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাধিকে।
বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরস্কঃ সমুপাগতঃ"।।
শ্লোক দৃষ্টে পাঠান বিজয়ের কাল ১১২৪ শাক বা ১২০২—০৩ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

রেভার্টির মতে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। (Ravert's Tabaqat-i-Nasiri, Appd)।
গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রশস্তি অনুসারে গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (J. A. R. S. Vol III No. 18)। তাঁহার ৩৮ বৎসর রাজত্বের পরে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বিহার জয় করেন, (J. A. S. B. 1876 pt. I Page 331—32)। এই ঘটনার "দোয়াম সালে" গৌড়বিজয় হইয়াছিল। উপরোক্ত যুক্তির বলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠান বিজয়ের কাল ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (J. A. S. B. 1913 pp 277 & 285)। রাখালবাবুর অনুমানই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

২১২. প্রবীণ ঐতিহাসিক পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের মতে সঙ্কনাট ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত সমকোট অভিন্ন। রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থান Samkoot বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

২১৩. Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) P. 558.

২১৪. Ibid P. 552.

২১৫. বাংলার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৩২৪—২৫ পৃষ্ঠা।

২১৬. Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta Vol II, pt II, P 146. No. 6.

২১৭. বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায়, ১৩১৫, —পৌষ, ৪৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা।

২১৮. Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) Page—554.

২১৯. তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং পরবর্তী লেখকগণ ও উহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীটি এই :—"ইহলোক হইতে তাঁহার পিতার স্থানান্তর কালে লখ্মণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুট তাঁহার মাতৃগর্ভে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাঁহার আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াছিল। খলিফা বংশের ন্যায় হিন্দুরাজগণও ধর্মরক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লখ্মণিয়ার জন্মকাল নিকটবর্তী হইলে তাঁহার মাতা প্রসবের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া জ্যোতিষীগণকে আনাইলেন, তাঁহারা শুভলগ্ন ঠিক করিয়া একবাক্যে জানাইলেন যে, কুমার এখন জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নিতান্ত অশুভ হইবে, কখনই রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্ম হয়, তাহা হইলে ৮০ বর্ষ রাজ্য করিতে পারিবে না। জ্যোতিষীগণের মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া রাজ্ঞী আদেশ করিলেন যে, তাঁহার পা দুখানি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া মাথা হেট করিয়া রাখা হউক। তাহাই করা হইল। যথাকালে জ্যোতিশীগণ শুভ মুহূর্ত জানাইলেন। রাজমাতাও তখনই তাহাকে নামাইয়া প্রসব করাইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখ্মণিয়া ভূমিষ্ট হইলেন। কিন্তু রাজমাতা প্রসব বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সদ্যোজাত শিশু লখ্মণিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) p. 555। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড, ৩৩৭—৩৮ পৃষ্ঠা)।

২২০. লক্ষ্মণ। "শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈবসহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রুমঃ সুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপবে।
কিং বান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতি পদং ত্বং জীবনং দেহিনাং,
ত্বং চেন্নাচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ"।।

বল্লাল। "তাপো নাপগত তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলি তনো-
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলঃ কা নাম কেলী কথা?
দূরোৎ ক্ষিপ্ত করেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ"।।

লক্ষ্মণ। "পরিবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং,
অতথ্য তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণ স্যাপি প্রকটিত হতাশেষ তমসঃ,
রবে স্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ"।।

বল্লাল। "সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাতুর্দ্দোষোহয়ং ন চ গুণনিধে স্তস্য কিমপি।

স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হর চূড়ার্চ্চণ মণিং,
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি"।।

এই শ্লোকগুলি প্রকৃত পক্ষেই পিতাপুত্র মধ্যে লিখিত হইয়াছিল অথবা পরবর্তী সময়ে কোনও কল্পনা-বিনোদী কবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

২২১. "Muhammad-i-Bakht-yar-had [also] reached Rae Lakhmaniah ... who was a very great rae and had been on the throne for a period of eighty years"—Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) Page—554. "লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৮০।"

২২২. J. A. S. B.—1905.—Page 57 Verse 28.

২২৩. "বিদ্যুদ্ যত্র মণি দ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গ তরঙ্গিণী সিতাশ্চিরো মালাবলাকাবলী।
ধ্যনাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভুতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তি তাপভিদুরঃ শম্ভো কপর্দ্দাম্বুদঃ"।।

J. A. S. B. 1873, pt. I Page II & 1900 pt. I p. 61, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

"যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্ যস্যাতি চিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্ক দ্যুতি লোচন ত্রয় রূপ ঘোরং দধানো মুখং
দেবত্রা সনিবস্ত দানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ।।

মাধাই নগরের তাম্রশাসন—১ম শ্লোক
J A S B 1909, p. 471.

২২৪ আর্য্যাসপ্ত শতীতে সেন বংশের উল্লেখ আছে ঃ—
সকল কলাঃ কলয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদ বন্ধোশ্চ
সেন-কুল-তিলক-ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ"।।

গোবর্দ্ধনের শিষ্য উদয়ন ও সহোদর বলভদ্র দ্বারা আর্য্যাসপ্তশতী সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় ঃ—

"উদয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্য সোদরভ্যাং মে।
দ্যৌরিব রবি চন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলী কৃত্য"।।

২২৫. "যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণিরভবদ্ বেধাঃ সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈ বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যা সপত্নৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী বা ভূত্রিবর্গোচিতা"।।

২২৬. "গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২৫৭ পৃঃ টীকা।

২২৭. Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol Page

২২৮. Atkinson's Kumaun page 516 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ

২২৯. বঙ্গদর্শন, ১৩১৬, চৈত্র।

"যচ্চাণ্ডাল গৃহাঙ্গনেষু বসতিঃ কৌলেয়কানাংকুলো
জন্মস্বোদর পূরণঞ্চ বিদসৈর্ন্নস্পর্শ যোগ্যাং বপুঃ।
তন্মৃষ্টং সকলং প্রয়াদ শুনক ক্ষোণীপতে রাজ্ঞয়া
যৎ ত্বং কাঞ্চন শৃঙ্খলা বলিতঃ প্রাসাদ মারোহতি"।
"ভ্রমতি ধরণী চক্রং চক্রে নভস্তলয়ন্তুণাৎ
প্রভবতি নাংগ পাত্রং কিঞ্চিৎ ক্রিয়াসু বিঘূর্ণাতে।
জলধি সলিলে মগ্নং বিশ্বং বিলোকম বেবতি
ত্রিজগদবতাজ্জল্লন্নেবং হলী মদ বিহ্বলঃ।।"

২৩০ Epi. Ind vol v App p. 88. No 649

২৩১. J. A S B 1941- P 102—103.

২৩২. বঙ্গদর্শন ১৩১৬ চৈত্র।

২৩৩. বল্লাল মোহমুদগর ৩৬১—৩৬২ পৃষ্ঠা।

২৩৪. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১৫৪ পৃঃ।

২৩৫. বঙ্গদর্শন, ১৩১৬, ৫৭৬ পৃঃ।

২৩৬ শ্রীমৎ কেশব সেনস্য ঃ—

(ক) আহুতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয় মিতি শ্রুতা যশোদাগিরো
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।।

(খ) "পাণ্ডুলক্ষ্মী কুচাভোগে নর্ত্তিতা হরিণা দৃশঃ!
ঔৎসুক্যাদিব তেনাদৌ নিহিতাবরণ স্রজঃ।।"

(গ) "লীলা সদ্ম প্রদীপ স্ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদী কেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাস বীজং রতিরসকলহ ক্লেশবিচ্ছেদ চক্রম্।
কহ্লারা দ্বৈত্য বন্ধুস্তিমির জল নিধেরুচ্ছিখো বাড়াবাগ্নি
র্লক্ষ্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জযতি ভুজভুবাং বংশ কন্দঃ সুধাংশুঃ

২৩৭. "সেয়ং চন্দ্র কলাতি নাকবনিতানেত্রোৎ পলৈরচিতা।
মন্ত্রারাপগমক্ষমেতি ফণিনা সানন্দ মালোকিতা।
দিঙ্‌নাগৈঃ সরলীকৃতায়ত করৈঃ স্পৃষ্টা মৃণালাশয়া
ভিত্ত্বোর্বীমভি নিঃসৃতা মধুরিপোদংষ্ট্র চিরং পাতুবঃ।।
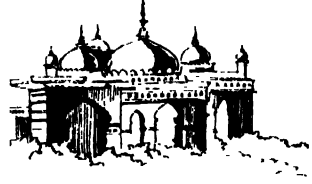
একাদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভূস্বামীগণ

লক্ষ্মণ নারায়ণ :

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সেনবংশীয় নরপতিগণের তালিকায় "নারায়ণ" নামে একজন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যকুলগ্রন্থে ও কেশব সেনের পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণের উল্লেখ আছে[১]। আইন-ই-আকবরি মতে ইনি ১০ বৎসব কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মধুসেন :

লক্ষ্মণ নারায়ণের পরে সেনবংশীয় মধুসেন নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত একখানি সংস্কৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে যানা যায় যে, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত "মধুসেন" ১১৯৪ শকে অর্থাৎ ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন[২]। কথিত আছে যে, এই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি তুরষ্কদিগকে বারম্বার পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রায় সমুদয় বরেন্দ্র ভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বাগড়ির পশ্চিমাংশ তুরষ্কগণেব অধিকৃত হইলেও মধুসেন বিক্রমপুর রাজধানী হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। এই সময়ে সমগ্র বাঙলা মধ্যে একডালা দুর্গ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং তিনি একডালা দুর্গ আশ্রয় করিয়া দুর্জয় তুরষ্ক বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমবারের আক্রমণ ব্যর্থ হইলে তুরষ্কগণ দ্বিতীয়বার এই একডালা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু মধুসেন আসাম রাজের সাহায্যে তাহাদিগকে পারজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে তোগরল বেগ নৌকা পথে একডালা আক্রমণ করিলে মধুসেন পরাজিত হইয়া ত্রিপুরাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে প্রবল ঘুর্ণাবর্তে পতিত হইয়া মধুসেনের নৌকা সলিল গর্ভে বিলীন হইয়া যায় ; তাহাতেই সপরিবারে মধুসেন মৃত্যুমুখে পতিত হন"। এই কিম্বদন্তী কতদুর সত্য তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

রূপসেন :

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেনরাজবংশের একটি শাখা, পরাধীনতার অসহনীয় ক্লেশ ও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বিক্রমপুর হইতে পাঞ্জাবে গমন করেন। রূপসেন এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের যে স্থলে অনুচরগণের সহিত প্রথমত বসতি সংস্থাপন করেন, তাহা তাঁহার নাম অনুসারে রূপারনগর নামে পরিচিত হইতে থাকে। শতদ্রু বা সট্‌লেজের তীরবর্তী এই রূপারে ১৮৩১ খ্রিঃ পাঞ্জাবের অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাক্ষাৎকার উপলক্ষে মহা জাঁকজমক ও সমারোহ হয়। মুসলমানদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের যে শাখা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাঁহারা এক্ষণে কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্টেবার নামক স্থানে বাস করিতেছে। অপর শাখা মুসলমান ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া, বাবু সেনের নেতৃত্বে পুর্বোত্তরস্থ পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালক্রমে বাবু সেনের বংশধরেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া

একশাখা সুখেত ও অপর শাখা মাণ্ডী (মণিপুর)[৩] রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে। মণ্ডী ও সুখেত, এই উভয় রাজ্যই শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্তী জলন্দর দোয়াবে অবস্থিত"[৪]। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "সেন রাজগণ" গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইহারা কেহই এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

দনুজ মর্দন :

"তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী" গ্রন্থে লিখিত আছে, দিল্লিশ্বর বুলবন পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসনকর্তা মখিসুদ্দিন তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইলে, সোনারগাঁয়ের "রায়" দনুজ রায় নৌ-পথে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। দনুজরায়ের সহিত বুলবনের সন্ধি হইয়াছিল[৫]। এই ঘটনা ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এক্ষণে এই দনুজ রায় কে? তিনি কোথা হইতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে যে সমুদয় মতবাদ রহিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া সবগুলি বিচার করিয়া দেখিব।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা এই দনুজ রায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। "দনুজ, দনৌজা, ধিনুজ রায় (Stewart), নোজা (Raja Niodja, Tieffenthaler), নৌজা (আবুলফজল), নুজ, দনুজ রায় (Jiauddin Barni & Elliot), দনৌজা মাধব, দনুজমর্দন, দনুজ দমন, এ সকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কেহকেহ বলেন ইনি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র, কেশব সেনের পর ইনি বিক্রমপুরের সিংহাসন লাভ করেন ; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, লক্ষ্মণ সেনের সদাসেন নামে অপর এক পুত্র ছিল। দনুজ মাধব কাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জানা যায়না তখন তিনি সদাসেনেরই পুত্র[৬]। কাহারও মতে, লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মাধব সেনই রাঢীয়কুলজি গ্রন্থে দনৌজা মাধব নামে উক্ত হইয়াছেন[৭]। ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে বল্লাল সেনের পৌত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া[৮] চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দনদের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন[৯]। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বিশ্বকোষ গ্রন্থেও উক্ত মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থকারিকার কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সুবর্ণগ্রামের দনুজ রায় কিম্বা দনোজ মাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইয়া পরিশেষে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন।

বিশ্বরূপের পরে দনুজ মাধব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি বিশ্বরূপের পুত্র হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। হরিমিশ্রের কারিকার লিখিত "পিতামহ" শব্দটি দ্বারা দনুজের পিতামহ বলিতে লক্ষ্মণ সেনকে না বুঝাইয়া বল্লাল সেনকেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং দনুজ মাধব যে কাহার পুত্র তাহাই এখনও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। আবুল ফজল লক্ষ্মণের পুত্র সদাসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে[১০], কিন্তু দনুজ মাধব যে সদাসেনের পুত্র তাহাও অনুমান মাত্র। তারিখ-ই—ফিরোজশাহীর লিখিত দনুজ রায় সেন বংশোদ্ভব ছিলেন কিনা, অথবা তাহার নাম দনুজ মাধব ছিল কিনা, তাহার প্রমাণও অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। সুতরাং "সেন বংশেই দনুজ মাধবের পুত্রত্ব যখন প্রমাণ-সাপেক্ষ ; তখন তাঁহার উপর আবার অন্য এক বংশের পিতৃত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে"[১১]।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "ঘটক কারিকা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দনুজ মর্দনের বংশীয় জয়দেবকে "চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভব" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে "পুনশ্চ" দিয়া ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের লিখিত বংশাবলী বইতে দেখাইতেছেন যে. উক্ত পংক্তি "চন্দ্র দ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ" এইরূপ হইবে[১২]।

এইরূপে নগেন্দ্র বাবু সেনও দেবের সমীকরণ ঘটাইয়াছেন। "সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত "দেব" ও যে দৈবাৎ "সেন" হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোট কথা শেষোক্ত পংক্তিতে "সেন" শব্দ যে প্রক্ষিপ্ত হইতেই পারে না, ইহা বলা যায় না"[১৩]। বিশেষত

"ভূপালো সেন" শব্দটি ব্যাকরণ দুষ্ট। ভূপালঃ + দেব = ভূপালো সেন, হয় না। "দনুজ মোসলমানের স্বভাব টের পাইয়া বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে গেলেন", বঙ্গীয় সমাজ প্রণেতার এবম্বিধ উক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না ; বরং উহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা সুবর্ণগ্রামের দনুজ রায় এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মাধবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের মতে, ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর বিংশতি বৎসরের মধ্যে, দনুজ মাধব চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই দনুজ রায়ই ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে (তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়), বুলবনের আক্রমণের বিংশতি বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তবুও সন বা পুরুষ হিসাবে গণনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বুলবনের আক্রমণের সময় দনুজ রায় অন্ততপক্ষে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন ; তাহা হইলে, ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মাধবের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ পরমানন্দের নাম আইন-ই-আকবরিতে উল্লিখিত হইয়াছে ; উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জল প্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্প বয়স্ক যুবরাজ[১৪]। তাহা হইলে ১৫৮৫—১২৫৫ = ৩৩০ বৎসরে ৬ পুরুষের অথবা প্রতি পুরুষে ৫৫ বৎসরের কল্পনা করিতে হয়!!!

শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে, লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের পর তাঁহার বংশীয়গণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন ; পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটা ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন[১৫]। ইহা দ্বারাও পূর্বোল্লিখিত অসঙ্গতির সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত চন্দ্রদ্বীপাধিপ দনুজ মর্দনের মুদ্রা সমুদয় সন্দেহের নিরসন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ও দনুজ মর্দন দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত মুদ্রাটির পার্শ্বের কিয়দংশ কর্তীত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার কার্য কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কর্তৃক একটি কবর খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয়কে দিয়াছিলেন। এই মুদ্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়ের লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল —

"দনুজমর্দন দেবের মুদ্রা

গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি সাড়ে তিন ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠা" ;—

সমভুজ সমান্তরাল যট্ কোণদ্বয় মধ্যে — (১) শ্রীশ্রী দ
(২) নুজমর্দ
(৩) ন দেব।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

বৃত্তমধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্ত খণ্ড সমূহ যোজিত করিয়া বৃত্ত।

তন্মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী
(২) চরণ প
(৩) রায়ণ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে "শকাব্দা ১৩০৯ চন্দ্র দ্ব (ী) প।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে· চন্দ্রদ্বীপাধিপতি দনুজমর্দন দেব ১৩০৯ + ৭৮ = ১৪১৭

খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। যে দনুজমাধব ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আরও ১৩৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৬২ বৎসর বয়সে, ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোনারগাঁয়ের দনুজ মাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মর্দন অভিন্ন হইতে পারে না।

বটুভট্ট-বিরচিত কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি হস্ত লিখিত কুলগ্রন্থ সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৬]। তাহা হইতে জানা যায়, "কর্ণস্বর্ণ রাজ্য-স্থাপয়িতা কর্মপুরাধিপতি কর্ণ সেনের বংশে বহুপুরুষ পরে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই সুরদেবের পুত্র দনুজারিদেব ও তৎপুত্র হরিদেব। দনুজারিদেবের সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সৌহাদ্য সম্পর্ক ছিল। দনুজারি কন্টক দ্বীপের অধিপতি বা সামন্ত রাজা ছিলেন। যখন লক্ষ্মণ সেন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দনুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণ-পুত্র মাধবসেনের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কণ্টক দ্বীপ মুসলমানের অধীন হইলে তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র নারায়ণ দেব ধর্মজ্ঞ ধর্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশ্রী তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাঁহার দুই পুত্র ;—পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পুরন্দর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র,—দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। রণচণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান দিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশক্তি মহাবীর দনুজমর্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্যাপুত্র সহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূল চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন। মধুমতীর পূর্ব হইতে লৌহিত্য বা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন। মধুমতীর পূর্ব হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পর্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল"[১৭]। সুতরাং বটুভট্টের দেববংশ হইতে দনুজমর্দনের নিম্নলিখিত বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় —
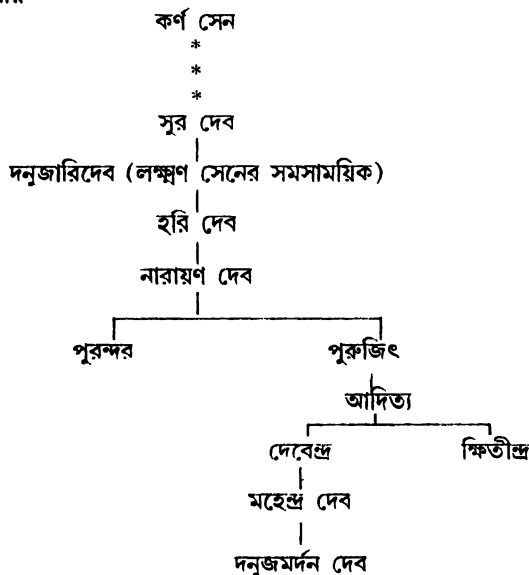
বটুভট্টের দেববংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "ইহা হয় খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত, নতুবা ইহা কৃত্রিম। বর্তমান যুগের শত শত কুল-পঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাচীনীকৃত"। দেববংশ হইতে জানা যায় যে, কর্ণপুরের রাজা কর্ণসেনের পুত্র বৃষকেতুর অন্নপ্রাশনের সময়ে লঙ্কেশ্বর বিভীষণ লঙ্কা হইতে কর্ণপুরে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু এই কেচ্ছার সমন্বয় সাধন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহা কোনও ঐতিহাসিকই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষত এই পুস্তকে তাম্রশাসনাদিতে ব্যবহৃত "ক্ষত্রপ" শব্দটির উল্লেখ থাকায় এই গ্রন্থখানির উপর একটি সন্দেহ জন্মিতে পারে। যাহা হউক, দনুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের অল্পকাল পরেই বটুভট্ট-কৃত দেববংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় দেববংশের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কতিপয় বৎসর পূর্বে মালদহের স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়া হইতে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় (১) ৩৩৬ শক এবং দনুজমর্দন দেবের মুদ্রায় (১) ৩৩৯ শক আছে[১৮]। এই উভয় মুদ্রায় "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" ও "পাণ্ডুনগর" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, দেববংশের মহেন্দ্রদেব এবং তৎপুত্র দনুজমর্দনের সহিত পাণ্ডুয়া ও বাসুদেবপুরের মুদ্রার লিখিত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "কিছুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রাজা মহেন্দ্র দেব কালকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার রৌপ্যমুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৩৩৬ শক বা ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দনুজমর্দন দেবকেই পাণ্ডুনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও স্বাধীন নৃপতিরূপে পাণ্ডুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন। মালদহ হইতে তাঁহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, আবার সুদূর বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতেও তাঁহার "১৩৩৯" শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনুজমর্দন দেব এবং তাহার ডান পাশে "১৩৩৯" ও "চন্দ্রদ্বীপ" এবং অপর পৃষ্ঠে "শ্রীচণ্ডীচরণ" অঙ্কিত আছে। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৩ বর্ষ মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন"[১৯]। নগেন্দ্রবাবুর এই অনুমান সমর্থন করিবার উপায় নাই। কারণ, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইনস্‌পেক্টর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ ষ্টেপলটন পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত দনুজমর্দন দেবের ১৩৪০ শকাব্দার মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[২০]। পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের ১৩৪০ শকাব্দর একটি মুদ্রা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে[২১]। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দন যদি পিতা-পুত্রই হইবেন, তাহা হইলে পিতার জীবদ্দশায় পুত্র স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। একই রাজধানী হইতে দুইজন রাজা একই সময়েই বা মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহাও বুঝা যায়না। পাণ্ডুনগরের দনুজমর্দন যে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং এই উভয় দনুজমর্দনকে অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

কবি কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে লিখিত আছে —

"পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থিব।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর।।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা বঙ্গাধিপতি বেদানুজের পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ এই বেদানুজকে দনুজমাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু বেদানুজ যে দনুজ মাধবের নামান্তর ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে —

"প্রাদুরভবৎ ধর্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব ভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ।।"

কিন্তু ইহাদ্বারা কেশবের পরে দনৌজা মাধবের অভ্যুদয় সূচিত হইলেও তিনি যে কেশবের পুত্র ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। আইন-ই আক্‌বরিতে কায়সু সেন বা কেশব সেনের পরে সদাসেন এবং তৎপরে নওজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবার কোনও কোনও কুলজিতে লক্ষ্মণ নারায়ণকে কেশবের পুত্ররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, যদি উত্তরাকালে দনুজ রায় সেনবংশীয় বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তিনি সম্ভবত কেশবসেনের প্রপৌত্রস্থানীয় বলিয়াই পরিচিত হইবেন।

(খ) অপর সেনরাজ-বংশ

রামপালের অনতিদূরে বাবা আদম সাহিদের সমাধিস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, এই বাবা আদম সাহিদ কর্তৃক বিক্রমপুরে মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। বল্লাল-চরিত গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, বল্লাল সেনের সহিত "বায়াদুম্ব" নামক জনৈক "ম্লেচ্ছের" বা "যবনের" সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং এই সংঘর্ষের ফলে বল্লাল সেন বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই রাজপরিবারবর্গ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন। বল্লাল ভূপতিও শোকে মুহ্যমান হইয়া ঐ অগ্নি কুণ্ডেই জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"বিপ্রকল্প-লতিকা" গ্রন্থে "বেদবহ্নিবাহুচন্দ্রমিতে শকে" অর্থাৎ ১২৩৪ শাকে বা ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে বল্লাল নামক এক গৌড়াধিপের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বল্লাল সেন বেদসেনের পুত্র। বেদসেন লক্ষ্মণসেনের বংশীয়া ভাগ্যবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন[২]।

সেনবংশীয় বিজয় সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের জনক প্রখ্যাতনামা মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে বঙ্গে মোসলমান আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিকগণ দুই জন বল্লালের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বল্লালচরিত ও বিপ্রকল্পলতিকার উক্তির সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার হয় নাই ; প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব সুষেণ, সুরসেন ও দ্বিতীয় বল্লাল সেনকে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের উত্তরপুরুষ এবং বিক্রমপুর ও সোনারগাঁর স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে নবদ্বীপ- পতনের পূর্ব হইতেই সোনারগাঁও সেনবংশীয়গণের অন্যতম রাজধানী ছিল। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাকালে ডাক্তার বুকানন সোনারগাঁ পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রথমে বল্লাল সেনের এই বংশধর সুষেণের নাম অবগত হন। সুষেণ সেন-বংশের শেষ রাজা বলিয়া তাঁহারা নির্দেশ করেন। তিনি স্ত্রীপুত্রে আকস্মিক আত্মহত্যার শোকে বিহ্বল হইয়া রামপাল নগরে যে অগ্নিকুণ্ডে আপনার জীবন বিসর্জন করে, ডাক্তার বুকাননকে তাহাও প্রদর্শিত হয়। বল্লাল-চরিত এবং অম্বিকাবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসে এই ঘটনা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময়ে মোসলমানেরা পূর্ব-বঙ্গ অধিকার করেন,—এই প্রবাদ বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর এবং সোনারগাঁয়ে প্রচলিত আছে।

ডাক্তার বুকানন ও এইরুপ প্রবাদ রামপাল ও সোনার গাঁও পরিদর্শনকালে অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুষেণই যদি বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা হন এবং তিনি যদি বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয় যে, সুষেণ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী বল্লালের উপরই অন্যায়রূপে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অস্তিত্বকল্পনার কোনও প্রয়োজন হয় না। কথিত আছে যে, "বাবা আদম সাহিদ নামে জনৈক মোসলমান পীরের দ্বারা পূর্ব-বঙ্গে মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎসঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। মোসলমানের প্রতি রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। একদা উক্ত পীর বল্লালের রাজবাটির বহির্ভাগে একাকি উপস্থিত হইয়া রাজাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজা পরিবার ও অনুজরবর্গের সমক্ষে একটি কপোত অঙ্গের বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া বাবা আদমের আহ্বান অনুসারে একাকি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়িয়া আসিলে রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, পরিবারবর্গ যেন মুসলমানের হস্তে কলঙ্কিত হওয়ার পূর্বেই সুসজ্জিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন,—যুদ্ধযাত্রার সময়ে রাজা সকলের প্রতি এই আদেশ দিয়া যান। রাজবাটির অনতিদূরে এক সুবিস্তীর্ণ জনহীন উদ্যানে প্রত্যূষকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তাহার অন্তে পীর সাহেব পরাজিত ও নিহত হন।"

প্রথমোক্ত কিংবদন্তীর প্রসঙ্গে বাবা আদমের বিক্রমপুরে আগমনের কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন তদীয় Notes on the Antiquities of Dacca গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রামপালের অদূরবর্তী কোনও গ্রামবাসী জনৈক মোসলমানের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি গোহত্যা করিয়া উহার মাংস দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। দৈবাৎ একখণ্ড মাংস শ্যেনপক্ষী কর্তৃক রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদোপরি নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বল্লাল তদীয় রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই মোসলমানটিকে সপুত্র ধৃত করিয়া পিতার সমক্ষে পুত্রকে নিহত করেন এবং উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। "নির্বাসিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্ত পিতা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানাস্থান পর্যটনপূর্বক মক্কায় উপনীত হইয়া বাবা আদমের সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁহার নিকট স্বকীয় মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে : এই মোসলমানের বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাবা আদম তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈন্য গঠন পূর্বক বিক্রমপুরে সমাগত হন।"

উপরি-উক্ত প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহা বিচার করা সুকঠিন। তবে, আদিশূর এবং শ্যামল বর্মা কর্তৃক বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নের মূলে যেমন রাজ-প্রসাদোপরি গৃধ্রপাতের অনর্থ একতর কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, বঙ্গে তুরুস্কগণের আধিপত্য দৃঢ়ীভূত হইবার প্রাক্কালেও তেমনি মোসলমান-নন্দনের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোহত্যা, অথবা পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজার প্রাসাদোপরি গোমাংস খণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ার কাহিনী এবং তাহার ফলে হিন্দু-মোসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার প্রবাদও এদেশে তদ্রূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাবা আদম নামক কোনও ধর্মোন্মত্ত দরবেশের সহিত বিক্রমপুরের হিন্দুনরপতির সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবত বিক্রমপুরাধিপতি ঐ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজার পরাজয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুর-মহিলাগণ কর্তৃক "জহর-ব্রত" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আনন্দভট্ট বিরচিত বল্লাল-চরিতে বল্লাল কর্তৃক নিগৃহীত ও নির্বাসিত ধর্মগিরি[২৩] বায়াদুম্বকে বিক্রমপুরে আনয়ন করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থান নামক স্থানে উগ্রমাধব-নামীয় একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই উক্ত মন্দিরে শিবপূজা করিতে যাইত। একদা বল্লাল-মহিষী বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিবপূজা করিয়াছিলেন। ফলে পূজার দ্রব্যের অংশ লইয়া মন্দিরের মোহন্ত এবং রাজ-পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মোহন্তরাজ পুরোহিতকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সে রাজ-সমীপে মোহন্তের ঈদৃশ আচরণের বিষয় জ্ঞাপন করে। রাজা মোহন্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসিত মোহন্তের নাম ধর্মগিরি। তিনি বৈরনির্যাতন-মানসে 'বায়াদুম্ব' নামক জনৈক মোসলমান পীরের শরণাপন্ন হন। ফলে পীর সাহেব বল্লালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিক্রমপুরে আগমন করেন। গোপালভট্ট-প্রণীত বল্লাল-চরিতে বায়াদুম্ব-প্রসঙ্গ নাই। অন্যান্য বৃত্তান্তেও অনৈক্য রহিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, "একদা শিব চতুর্দশী তিথিতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল। ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্যপূজা দানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে অনেক রত্ন দেখিয়া যোগীদিগের রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "এইস্থানে রাজা বা অপর কোনও লোকের নিত্য কাম্য, অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে, পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে, অন্য কাহারও এই দ্রব্যে অধিকার নাই'। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, 'হে যোগীরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না।' যোগীরাজ বলদেবের এই বাক্যে মর্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে স্বয়ং বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলা সমুদয় ব্রাহ্মণও বলদেবের অপমানের আপনাদিগকেও অবমানিত মনে করিয়া যোগীদিগের শাসনের জন্য রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ফলে রাজা যোগীদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কবুতর-প্রসঙ্গও বল্লাল-চরিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভট্টকবি যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বল্লালের পরিজনবর্গের সহিত বিদায়-ব্যাপার যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালের দৌর্বল্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা।।
বায়াদুম্‌নাম ম্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ।।
যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালো বিপক্ষসম্মুখং তথা।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গনচুম্বনম্।।
স্ত্রিয়োহব্রুবংস্তু রাজান বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ।।
যদি স্যাগদশিবং যুদ্ধ কিং নো নাথ গতিস্থদা।
ততো গদ্‌গদোহসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ।।
দুরাত্মযাবনাৎ ধর্ম সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্।
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকম্।।
পৃবচ্ছ্র প্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্টৈব মরণং ধ্রুবম্।।

গোপালভট্টের পরিশিষ্ট।

এই পরিশিষ্ট আনন্দ ভট্টের লেখনীপ্রসূত। গোপাল ভট্টের রচিত বল্লাল-চরিতে এতৎসম্পর্কীয় কোন কথাই নাই।

আনন্দ ভট্ট লিখিয়াছেন যে, পিতার সহিত মিথিলায় যুদ্ধযাত্রাকালে বল্লাল জনৈক

যোগীকে উল্লঙ্ঘন পূর্বক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত যোগী "সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিবে" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন ; সুতরাং মৃত্যুকাল উপস্থিত জানাইয়াই বল্লাল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন —

"শ্রূয়তেহত্র প্রবচনং পারম্পর্য্যক্রমাগতম্।
বল্লালোহনুযযৌ যুদ্ধে পিতরং শৌর্য্যশালিনম্।।
মিথিলায়াং স্থিতস্তত্র কশ্চিদ্‌যোগী ধৃত ব্রতঃ।
বল্লালো যুদ্ধযাত্রায়াং তরসা তমলঙ্ঘয়ৎ।।
অশ্বপাদেনাভিহতো বল্লালমশপন্মুনিঃ।
সকলত্রো বিহ্নকুণ্ডে পতিত্বা ত্বং মরিষ্যসি।।
তৎ স্মৃত্বা ব্রহ্মশাপং স বিজয়ং লব্ধবানপি।
চিন্তায়ামাস মনসি মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ।।
তেনৈব বিবশো রাজা ধ্রুবং জ্বলনমাবিশৎ।
ব্রহ্মশাপাদৃতে নৈব বিপত্তির্ভবেদীদৃশী"।।

বল্লাল পিতার সহিত মিথিলায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন কিনা, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। ব্রহ্মশাপের ফলেই সপরিবারে তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার কোনও মূল্য নাই।

এই সমুদয় বিবরণ বল্লাল-চরিত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লাল-চরিত বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্টের লেখনী-প্রসূত এবং গোপালের অনন্তর-বংশীয় আনন্দভট্ট-কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প। সেন-বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা বল্লাল-চরিতের উক্তিগুলি সমর্থিত হয় না। এমতাবস্থায় বল্লাল-চরিতকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। সাধারণত দুইখানি বল্লালচরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত[২৪]। একখানি যুগি-জাতীয় পদ্মচন্দ্র নাথের ব্যয়ে মুদ্রিত, অপর গ্রন্থ জনৈক সুবর্ণবণিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত। একখানিতে যুগিদিগের এবং অপরখানিতে সুবর্ণবণিক্‌দিগের পদমর্যাদার বিষয় লিখিত আছে। এই উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে[২৫]। সুতরাং কোন্‌খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব?

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকখানিকে কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর (রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায়?) নিকট হইতে প্রাপ্ত বল্লাল-চরিতের হস্ত-লিখিত পুঁথি দুইখানির উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বল্লালচরিতের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন," (১) Before I took up the work in right earnest, I was not without doubts as to its authenticity and genuineness. a Sunskrit work of that name was published some years ago by the Nathas the wellknown booksellers of Chinabazar in Calcutta. I pronounced it to be spurious and unreliable and I have had since no reasons to change my opinion The Charita which I was requested to translate might I thought turn out to be equally spurious and unreliable.

On a careful examinations however, of the manuscripts in the possession of my friend my doubts were removed and I found them to be genuine. One

manuscript was copied as appears from the colophon at the end of the book, in the year of the Emperor Aurangzeb's death, 1707 AC. The other as appears from a similar colophon was copied in the Bengalee year, 1198. The authenticity of both these manuscripts is vouched for by the correctness of the date of transcription and also by the mention of names of the persons for whose use the transcriptions were made. In one case the name of the copyist is given. The Mss also were obtained from different parts of the Country."

কিন্তু ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক কোনও রাজা ছিলেন কিনা শাস্ত্রী মহাশয় তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুস্তক দুইখানির মধ্যেও বিস্তর অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই পুস্তক দ্বয়ের মধ্যে, (ক) পুঁথির মতে সুবর্ণবণিকগণ রাজবাড়ি হইতে অভুক্ত গমন করায় এবং তজ্জন্য রাজ-বল্লভ ভীমসেন সহ বিবাদ ও বচসা করায় সুবর্ণবণিকগণ বল্লাল কর্তৃক যজ্ঞ সূত্র হীন হইয়াছেন। (খ) পুঁথির মতে সুবর্ণ বণিকগণ সর্বদা ব্রাহ্মণদিগকে "দাসী বংশজ" বলিয়া ঘৃণা করায় এবং ব্রাহ্মণগণ উপবীত দৃষ্টে ভ্রান্তি বশত সুবর্ণ বণিকদিগকে প্রণাম করায় ব্রাহ্মণের অনুরোধে বল্লাল সেন সুবণা বণিকদিগকে উপবীত ভ্রষ্ট করেন[২৬]। এই উভয় বিধ উক্তিই শরণ দত্তের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একই শরণ দত্তের দুই প্রকার উক্তি কেন অথবা উভয় পুস্তকে এরূপ পাঠান্তরই বা কেন হইল তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়।

সোসাইটির (খ) পুস্তকে লিখিত[২৭] —

"রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমাযদা।
মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ স পঞ্চ ষষ্ঠি হায়নঃ।"

এই শ্লোকটি (ক) পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। (ক) পুস্তকের লিখিত [২৮] —

"স্বর্ণদানং রৌপ্যদানং গোদানঞ্চ ধরাপতিঃ।
দানঞ্চ বিবিধঞ্চক্রে নিত্য নৈমিত্তকাদিকম্।।"

এই শ্লোক স্থলে (খ) পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে[২৯] —

"ততো লক্ষ্মণ সেনস্য রাজা জন্ম মহোৎসবে।
ব্রাহ্মণান্ ধনিনশ্চক্রে স্মৃত্বা যজ্ঞ কৃতস্তু তৈঃ।।"

তৃতীয় অধ্যায়ের "বিক্রমং পুরম্" স্থানে "চ পুরং নিজং"[৩০] চতুর্থ অধ্যায়ের "কাঞ্চীশত্বম্" স্থানে "দিল্লিশত্বম্"[৩১] "লক্ষ্মণং" স্থানে "লবণং"[৩২] ষড় বিংশ অধ্যায়ের "রামপাল পুরং" স্থানে "বল্লালস্য পুরং"[৩৩] প্রভৃতি পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

বল্লাল চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ খুব কমই আছে ; যাহাও দুই একটি আছে, তাহাও শাসন লিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। সোসাইটির বল্লাল চরিতের একবিংশ অধ্যায়ে শরণ দত্ত বল্লালের পিতার নাম মল্হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৩৪] ; কিন্তু তাম্রশাসনাদির প্রমাণে জানা গিয়াছে যে বল্লালের পিতার নাম বিজয় সেন। এই বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপিল প্রশস্তিকার উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনেরও অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের অপর সভাপণ্ডিত শরণ দত্ত কর্তৃক বল্লাল চরিতের ঐ অংশ লিখিত হইলে তিনি লক্ষ্মণ সেনের পিতামহের নাম ভুল করিবেন কেন?

সোসাইটির বল্লাল চরিতের ২৭ অধ্যায়ে বল্লালের মৃত্যু-তারিখ ১০২৮ শকাব্দা বা ১১০৬ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে[৩৫]। কিন্তু লক্ষ্মণ সংবতের কাল নিরূপণ হইতে জানা যায় যে, বল্লাল সেন ১১১৮ বা ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু, এক সময়ে ঐতিহাসিকগণ ১১০৬ খ্রিষ্টাব্দকেই লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভকাল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন!!

এই সমুদয় কারণে উভয় বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত

হয়। সুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেনের সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইতে পারে না।

বঙ্গরাজ্য ধ্বংসের কারণ :

খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরাকানের মগগণ বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরবর্তী বঙ্গরাজগণ দুর্বল হস্তেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, সুতরাং ইহাদের আক্রমণের স্রোত ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বঙ্গরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত কোচ, আহোম ও ত্রৈপুরগণও সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যবৃদ্ধির মানসে বঙ্গাধিপের সহিত সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সুতরাং একদিকে নববল দৃপ্ত তুরষ্ক বাহিনীর প্রবল প্রতাপ এবং অপর দিকে কোচ, আহোম ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই বঙ্গাধিপতিকে তুরুষ্কগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে হইবে।

(গ) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের স্বাধীন ভূস্বামীগণ

কাশিমপুর, তালিপাবাদ, ভাওয়াল, চাঁদপ্রতাপ এবং সুলতান প্রতাপ এই পাঁচটি পরগনার কতিপয় প্রাচীন নরপতির রাজত্ব কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অদ্যাপি এই পরগনাগুলির অন্তর্গত লোহিত মৃত্তিকাময় বনভূমির অভ্যন্তরে বিশাল দীর্ঘিকা, ইষ্টক স্তুপ, মৃৎপ্রাচীর প্রভৃতি বহু কীর্তিকলাপের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ফুলবাড়ি, সাভার, কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, কর্ণপাড়া, মঠবাড়ি, ছাইলা কলমা, মদনপুর, রাজাসন, কোটবাড়ি প্রভৃতি স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের, মাধবপুর, বঙ্খুরি, গণকপাড়া গৌরীপাড়াতে রাজা যশোপালের, দুরদুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট, শাইট হালিয়া প্রভৃতি স্থানে রাজা শিশুপালের এবং রাজাবাড়িতে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলেই উহাদিগের বহু শাখা গৌড়বঙ্গাধিপের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সমুদয় শাখার বিবরণ "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে[৩৬]। আমাদের মনে হয়, পাল সাম্রাজ্যের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়াই করতোয়া ও ইছামতী নদী অতিক্রম পূর্বক ইহাদিগের কয়েকটি শাখা কামরূপে এবং পূর্ববঙ্গের নিভৃত কোণেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের মধ্যে নদী-মেখলা-বেষ্টিত সাভার, ধামরাই এবং অরণ্যসঙ্কুল ভাওয়াল অঞ্চল যে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কথিত আছে রাজা হরিশচন্দ্র রাঢ় দেশ হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়া বংশাবর্তী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

> "বংশাবর্তী-পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরী।
> বৈসে রাজা হরিশচন্দ্র জিনি সুরপুরী"।।

হরিশচন্দ্র পাল :

এই কবিতাটি সাভার অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ লোকমুখে গীত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে জানা যায়, হরিশচন্দ্র নামক কোনও রাজা বংশাবর্তী বা বংশাই নদীর পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। সর্বেশ্বরের বর্তমান নাম সাভার। আবার কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ধলেশ্বরী ও বংশাই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে সাভার গ্রাম অবস্থিত। সাভারের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরীর তীরদেশে ফুলবাড়ি গ্রাম এবং ফুলবাড়ির বরাবর পূর্বদিকে এক ক্রোশের মধ্যে কোণ্ডা ও গান্ধারিয়া গ্রামদ্বয় অবস্থিত। ঢাকা

জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি তাহার সর্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই গ্রামগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়া সুপ্রসিদ্ধ মধুপুর গড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ"—প্রণেতা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাভার হইতে গত ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক খণ্ড আবিষ্কার করিয়া রাজা হরিশচন্দ্র পালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। "ইষ্টকখানা অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল। ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর "প" টি বেশ সুস্পষ্ট আছে"[৩৭]। এই ইষ্টক লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার হইয়াছে —

* * প

শ্রীশ্রী মদ্রাজ

রিশ্চন্দ্র পাল দ * *

এই ইষ্টকলিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাভারের হরিশচন্দ্র রাজা পাল বংশোদ্ভব ছিলেন।

আবির্ভাব কাল :

রাজা হরিশচন্দ্রের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ১৩১৯ সালের প্রতিভা পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় বিজয় কুমার রায় লিখিয়াছিলেন[৩৮], "আনুমানিক খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হরিশচন্দ্র আবির্ভূত হন। বংশ-পত্রিকা মতে হরিশচন্দ্র হইতে বর্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে রাজা এখন হইতে প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২—১৩০০=৬১২ সনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। * * * বৌদ্ধ রাজা হরিশচন্দ্রের শাসনকালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধান্যই সূচিত হয়। খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্য ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত করেন। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতে হরিশচন্দ্রের আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে। হরিশচন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনেয় রাজা দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ সৈন্যগণ সর্বেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আমরা খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে আসামরাজ হর্ষদেব কর্তৃক গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্তা পাইয়া থাকি। সম্ভবত ঐ সময়েই কোচ ও আহম সৈন্য সর্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩/৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজা হরিশচন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়"।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ-প্রণেতার মতে হরিশচন্দ্রপাল খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন[৩৯]।

সাভারে প্রাপ্ত হরিশচন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক লিপি হইতেই হরিশচন্দ্রের আনুমানিক আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই ইষ্টক লিপির "প", "র", "জ", কিছু পুরাতন ঢঙ্গের হইলেও বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাভারের লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট রহিয়াছে। এই ইষ্টক লিপির "প", "জ", "ল", "র" এবং "দ" প্রথম মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বালাদিত্য প্রস্তর লিপির "প", "জ", "ল", "র" এবং "দ" এর অনুরূপ হইলেও হইতে পারে। সুতরাং অক্ষর তত্ত্বানুশীলনের হিসাবে সাভারের লিপির কাল দশম শতাব্দীর শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্বে বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারেনা। শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, "দেব" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সাভারের ইষ্টক লিপিতেও পাল শব্দের পরে অর্ধভগ্ন "দ" অক্ষরটি স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং এই "দ" এর পরে স্থানে "ব" খোদিত ছিল, তাহা ক্ষয়

হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হরিশচন্দ্র পালকেও পাল বংশীয় নৃপতিগণের সগন্ধী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

"বজ্রযোগিনী গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণে রঘুরামপুরের একটি দীর্ঘিকা রাজা হরিশচন্দ্রের দীঘি বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে অদ্যাপি হরিশচন্দ্রের বাটির ভিটা দৃষ্ট হয়"। শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায়[৪০] শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,[৪১] আশুতোষ গুপ্ত[৪২] এই হরিশচন্দ্রকে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতি হরিশচন্দ্র বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী রঘুরামপুরের হরিশচন্দ্রের দীঘি বর্মবংশীয় হরিবর্মার অন্যতম কীর্তি বলিয়া অনুমান করেন[৪৩]। দীর্ঘিকা খনন ব্যাপারে সাভারের হরিশচন্দ্র পালের উৎসাহ[৪৪] এবং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত বিক্রমপুরের হরিশচন্দ্রকে পালবংশীয় হরিশচন্দ্র বলিয়া অনুমান করিবার অন্য কোনও প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বিশেষত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরেও স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

ধর্মপালের গড় হইতে ৭/৮ মাইল ব্যবধানে, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্বদিগস্থ চড়চড়া গ্রামে "হরিশচন্দ্রপাট" নামে খ্যাত একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশচন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই স্তূপটি হরিশচন্দ্রের সমাধিস্থান বলিয়া ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব অনুমান করিয়াছেন। "এই স্তূপ বিপর্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরিভাবে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থানজনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে"[৪৫]। মাণিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন। ফলে মাণিক চন্দ্র-মহিষী প্রখ্যাতনামা ময়নামতীর সহিত ধর্মপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং জামাতার সাহায্যার্থ হরিশচন্দ্র হয়ত ধর্মপালের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। ত্রিস্রোত বা তিস্তা নদীতীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবত হরিশচন্দ্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। এজন্যই যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে হরিশচন্দ্রের সমাধিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের হরিশচন্দ্র :

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এক হরিশচন্দ্র বা রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে হরিচন্দ্র বা হরিশচন্দ্র রাজার ধর্মনিন্দা, অপুত্রক হেতু মহিষী-সহ রাজার বনগমন, তাঁহার নানা দেব দেবীর উপাসনা, বন মধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগি, রাণীর ধর্মস্তুতি, ধর্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্মের বরে রাণীর গর্ভে লুইচন্দ্রের জন্ম, রাজা ও রাণীকে ধর্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরচ্ছেদ, রাণী কর্তৃক পুত্র মাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্মের মাংস ভোজন কালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও ধর্মের জন্য হরিশচন্দ্রের পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শূন্য পুরাণে এই সমুদয় প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই। "পরবর্তী কবিগণ ধর্মের মাহাত্ম্য-ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন" আমাদের মনে হয় শূন্য পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে পরবর্তী ধর্মমঙ্গল প্রণেতাগণ বর্ধিত এবং অভিনব বিষয় সংযোজনা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

কথিত আছে, পাটিকা নগরাধিপতি মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র অদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন[৪৬]। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে অধুনা পদুনার নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের সমগ্র ভাট, যোগি ও চারণ গণের গাথায় প্রচারিত হইত, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ বহুসংখ্যক কবি যাহাদের গুণগাথা গাহিয়াছেন, এবং যাহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে

বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল"[৪৭]।

অদুনা ও পদুনার রূপের খ্যাতি ছিল। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত হইয়াছে! (৫১ পৃষ্ঠা) —

"উদুনা পুদুনা রূপে জলন্ত আগুনী।
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী।।
অন্ধকারে শোবা যেন মাণিক উর্জল।
উদুনা পুদুনা রূপে লর্জ্জিত কোমল"।।

কিন্তু অদুনা ও পদুনা যে সাভারের হরিশচন্দ্র রাজার কন্যা, জনশ্রুতি ব্যতীত তাহার জন্য কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে হরিচন্দ্র বা হরিশচন্দ্র নামক একজন রাজার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে[৪৮]। কিন্তু তিনি কোন স্থানের রাজা ছিলেন তাহার পরিচয় জানা যায় না।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন[৪৯] —

"ধীমন্ত পুত্রো রণধীরসেনঃ সংগ্রাম জেতাইব কার্তীকেয়স্য
হিমনগ ব্যাপ্ত দেশং বিজিত্যা সম্ভারপুর্য্যামবসৎ প্রবীরঃ।।"
"যো জাতো বীরবর মহিতা ইন্দু বংশ বিশেষাৎ
ধীমন্তো বীরবর মুকুটাস্তীম সেনা নৃপেন্দ্রাৎ।
হরিশ্চন্দ্রো মহারাজো রণধীরস্য পুত্রক
ধর্মেশ ইব ধর্মাত্মা সমৃদ্ধ কুবেরাধিপ।:
যমুনায়া নদীতীরে বৌদ্ধাঙ্ক মঠ মন্দিরে
বীজনেচ স বাজর্ষি ধর্মার্থ ইব তিষ্ঠতে।।"

ইহা হইতে জানা যায়, "কার্তীকেয় সদৃশ সংগ্রাম-জয়ী প্রবীর ধীমন্ত-পুত্র রণধীর সেন হিমালয় ব্যাপ্ত দেশ জয় করিয়া, সম্ভার পুরীতে বাস করিতেন। চন্দ্রবংশ তুল্য শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে এবং বীরশ্রেষ্ঠগণের শিরোভূষণ স্বরূপ বীরবর পূজিত নৃপেন্দ্র ভীমসেন হইতে ধীমন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র রণধীরের পুত্র, তিনি ধার্মিক, এবং তিনি কুবেরতুল্য সমৃদ্ধবান ছিলেন। রাজর্ষি হরিশচন্দ্র যমুনা নদীতীরে বুদ্ধমূর্তী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জনে বসিয়া ধর্মপরিচর্যা করিতেন।" হরেন্দ্র বাবু কোন্ পুঁথি অবলম্বনে উল্লিখিত শ্লোকগুলি অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু "বহুকালের হস্তলিখিত পাঠ উদ্ধার করা সুকঠিন বিধায়" কিছু রূপান্তর করিয়াছেন। তাঁহার পুঁথি কত কালের প্রাচীন, উহার প্রামাণিকতাই বা কি, তাহা বিচার না করিয়া এই শ্লোকগুলি লইয়া কোনরূপ আলোচনা করা সমীচীন নহে।

হরিশচন্দ্রের তিরোধান :

কথিত আছে, সাভারের রাজা হরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াও পুত্র মুখ সন্দর্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেন, অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদরা রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। হরিশচন্দ্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ সাভার অঞ্চলে প্রচারিত রহিয়াছে,—"বৃদ্ধ বয়সে রাজা নিজপুরীস্থিত রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া সশরীরে স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান হরিশচন্দ্রের এতাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনে দেবগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজার অনুচরবর্গের কোলাহলে স্বর্গে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়া তাঁহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বকৃত পুণ্যবলে রাজা আর ধরাধামে পতিত না হইয়া তদবধি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় স্বর্গ ও মর্তের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন"[৫০]। এই প্রবাদ সম্ভবত অযোধ্যার সূর্যবংশীয় প্রখ্যাত নামা রাজা হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ কাহিনীর অনুকরণেই রচিত হইয়া থাকিবে। যাহা

হউক এই সমুদয় প্রবাদ বিনা বিচারে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। রঙ্গপুর জেলায় রাজা হরিশচন্দ্রের যে সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি সাভারাধিপতি রাজা হরিশচন্দ্রের সমাধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, এবং ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীদ্বয় অদুনা ও পদুনা যদি সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের কন্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তবে জামাতার সাহায্যার্থ ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাভারাধিপতি হরিশচন্দ্র যে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

রাজা দামোদর :

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা হরিশচন্দ্রের তিরোধানের পরে ভাগিনেয় দামোদর মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা দামোদর হরিশচন্দ্রের সহোদরা বাজেশ্বরীর গর্ভ সম্ভূত। স্থানীয় জনসাধারণ দামোদরকে "দামুরাজা" ও বাজেশ্বরীকে "রাজিরাণী" বলিয়া থাকে। রাজা দামোদর রাজাসনে থাকিয়াই রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। এজন্য রাজাসনকেই দামোদরের রাজধানী বলা হয়। রাজা দামোদর কর্তৃক রাজাসনের দক্ষিণদিকে রথখোলা নামক স্থানে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায়। রাজাসনের নিকট দামোদরের পিলখানা ও অশ্বশালার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাবণ রাজা :

রাজাসন হইতে প্রায় একক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুলবাড়িয়া হইতে এরক্রোশ পূর্বে, গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত। গান্ধারিয়ার পশ্চিমাংশ রাবণ রাজার বাড়ি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণ রাজা হরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় দামোদরের বংশোদ্ভূত। "সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তদীয় আবাস বাটিতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বহুব্যক্তি বসতি করিতেন। তৌর্যত্রিকি সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনার স্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশ বিখ্যাত ছিল"।

রাবণ রাজার বাড়ির পশ্চিমদিকে ঢালিপাড়া। প্রবাদ এই যে, ঢালিপাড়ায় রাবণ রাজার ৫২ হাজার ঢালি সৈন্য বাস করিত!!! ইহারা গান্ধারিয়া বা গান্ধার গড় রক্ষা করিত।

"দামোদরের সময় হইতেই রাজবংশের অবনতি আরব্ধ হয়। ফলে কোচগণ একদা রাজসৈন্য নির্মূল করিতে করিতে মধুপুর ও ভাওয়াল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিয়াছিল। সর্বেশ্বরের তদানীন্তন অধিপতি প্রাণপণ সত্ত্বেও রাজধানী রক্ষা করিতে না পারিয়া সপরিবারে সর্বেশ্বরের দক্ষিণ পূর্বস্থিত সুরক্ষিত গান্ধার গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপক্ষ দল মহোল্লাসে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজভবন ও পণ্যবীথিকা নিচয় লুণ্ঠনপূর্বক প্রাসাদ ও দেবালয় বিচূর্ণ এবং প্রকৃতিপুঞ্জের আবাসনিচয় অগ্নিসাৎ করিয়া প্রস্থান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাওয়াল অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে"। কিন্তু কিম্বদন্তী ব্যতীত এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ নাই।

"পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ প্রণেতা" শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাভার হইতে অপর একখানা খোদিত ইষ্টক লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

* * * বত ১২৫৪

* * * * পুরী"

উপরোক্ত খোদিত লিপির তারিখটি যদি সংবৎ হয়, তবে ১২০২ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত যে সাভারে পালরাজগণের অধিকার অক্ষুণ্ন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যশোপাল :

কাশিমপুর এবং চাঁদপ্রতাপ পরগনার সীমান্ত দেশে প্রবাহিত গাজি খালী বা কানাই নদীর তীরদেশে অবস্থিত বাইদগাও নামক স্থানে যশোপাল নামক জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যশোপাল রাজার সহিত পাল নৃপতিবৃন্দের কোনও সম্বন্ধ

ছিল কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে যশোপাল পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত কোণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে। যশোপাল ধামরাই এর সুপ্রসিদ্ধ যশোমাধবের আবিষ্কর্তা। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, "একদা যশোপাল নৃপতি একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরে একটি স্থানে উপস্থিত হইলে হস্তী আর অগ্রসর না হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইল, মাহুতের শত অঙ্কুশ তাড়নেও আর অগ্রসর হইল না। সুশিক্ষিত হস্তীর এবম্বিধ অদ্ভুত ব্যবহার দর্শনে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। কিন্তু ভক্ত নরপতি তাহাতে বিচলিত না হইয়া, "তুমি মোর ধন বংশ তুমি শিরোমণি" বলিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃহে আনয়ন পূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশোপাল নির্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু "বংশ গেল যশোনাম মাধবে মিলিল"। মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়া রহিয়াছেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্তটি এখনও বর্তমান এবং "মাধবের চৌবাচ্চা" নামে খ্যাত। মাধব মন্দিরের ভগ্নস্তূপটি অধুনা "মাধব চালা" বা "মাধব টেক" নামে প্রখ্যাত। কথিত আছে, পুরীধামের জগন্নাথ মূর্তীর প্রথম কলেবর নির্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তী গঠিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত কিম্বদন্তীর মূলে সত্য থাকিলে বলিতে হয় যে, রাজা যশোপালই মাধবের দারুময় মূর্তি আবিষ্কার বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং জগন্নাথদেবের প্রথম দারুময় মূর্তী স্থাপিত হইবার পরে যশোপালের আবির্ভাব হইয়াছিল। যশোমাধব মূর্তী প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উৎকল দেশীয় পাণ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চনার ভার ন্যস্ত ছিল। ইহা হইতে মনে হয় উৎকল দেশীয় পুরীধামের দারুময় জগন্নাথ মূর্তীর সহিত ধামরাই এর যশোমাধবের মূর্তীর কোনও সংশ্রব ছিল। জগন্নাথদেবের ভোগের ব্যঞ্জনাদির ন্যায় মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদিও বিনা সৈন্ধবে পাক হয়।

শিশুপাল :

ভাওয়ালের অন্তর্গত দুরদুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট এবং শাইট হালিয়া নামক স্থানে, শিশুপাল নামক জনৈক রাজার কীর্তি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। দীঘলির ছিট নামক স্থানে শিশুপালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। দুরদুরিয়ার দুর্গ শিশুপালের নির্মিত এরূপ প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত। এই দুর্গ স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক "রাণী বাড়ি" নামে অভিহিত। প্রবাদ এই যে, শিশুপাল বংশীয়া রাণী ভবাণী এই দুর্গে অবস্থান করিতেন, এবং মোসলমানগণ রাণী ভবাণীকে পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার টেইলার লিখিয়াছেন "মুসলমানগণ বোধ হয় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে ইহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মোসলমানগণ হয়ত রাণী ভবাণীকে পরাজিত করিয়াই ভাওয়াল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। কারণ এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও কয়েকটি নগর মাত্র মোসলমানগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। সমুদয় পশ্চিমবঙ্গ তখনও বিজিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ বিজয়ের বহুকাল পরে মোসলমানগণ পূর্ববঙ্গে অধিকারস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বানার নদীর পশ্চিম তীরে একডালা দুর্গের বিপরীতদিকে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বানারনদীর তীরে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের অনতিদূরে দুর্গাবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলাট গ্রামে শিশুপালের পুষ্পবাটীকা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

. ভাওয়ালের ভীষণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ কীর্তি কলাপের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। নানা জনপ্রবাদ এই শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী শিশুপালের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করে। এবম্বিধ বহু অদ্ভুত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়া শিশুপালের আবির্ভাবকাল এবং তাহার কীর্তি কাহিনীকে আরও দুর্বোধ্যও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় :

রাজেন্দ্রপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতি দূরে এবং আধুনিক জয়দেব পুরের দশক্রোশ উত্তর পূর্বে রাজাবাড়ি নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামধেয় চণ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেন। কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে এই চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় ভাওয়ালের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে। "পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, "গৌড়ের পাল রাজগণের রাজত্বকাল যেরূপ নানা নিম্ন জাতীয় ব্যক্তির বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎ বংশধরগণের রাজত্বকালেও আমরা তদ্রূপ চণ্ডাল বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনিতে পাই। শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে চণ্ডাল জাতীয় দুই ভ্রাতা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন[৫১]। শিশুপাল কোন সময়ে ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও অতীতের তিমির গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে। বিশেষত পাল রাজগণের সময়ে বরেন্দ্র যে কৈবর্ত বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবত কোনও জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। অত্যাচার প্রপীড়িত গৌড়ীয় প্রকৃতিপুঞ্জই কৈবর্ত্য রাজের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ভাওয়ালে এরূপ কোনও ঘটনার পুনরাভিনয় হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই"।

প্রবাদ এই যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে ভাওয়াল প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছিল। ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগণ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে মদবল দৃপ্ত চণ্ডাল ভ্রাতৃযুগল বল পূর্বক তাঁহাদিগকে অন্ন ভোজন করাইতে কৃত সংকল্প হইয়া একদা তাঁহাদিগের রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে ভ্রাতৃযুগলের স্ত্রীদ্বয় পরিবেশনার্থ অন্ন পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি জনৈক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "আমরা রাজার অন্ন গ্রহণ করিব"। কিন্তু উভয় ভ্রাতার মধ্যে কে প্রকৃত রাজা তাহা নির্ণীত হইল না। ফলে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই গৃহবিবাদের ফলে ভ্রাতৃদ্বয়কে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। এই প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা কঠিন। তবে ভাওয়াল অঞ্চলে একসময়ে যে সুব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল তাহা সম্ভবত সত্য। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রতাপ ও প্রসন্নরায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিনাশের পর তদ্ধর্মাবলম্বী নৃপতিকে বিদ্বেষ বশত চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা স্বাভাবিক[৫২], কিন্তু প্রতাপ ও প্রসন্ন রাজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা এবং এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নৃপতিদ্বয় কর্তৃক ভাওয়ালের হিন্দুগণ প্রপীড়িত হইয়াছিলেন কিনা তাহাও নির্দ্ধারণ করা শক্ত।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের মোগ্গী নাম্নী এক ভগিনীর নাম শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার বাটির ভগ্নাবশেষ এখন "মোগ্গীর মঠ" নামে খ্যাত হইয়া "চাড়াল-রাজার বাড়ির" পূর্বদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১. 'তারপুত্র নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয়।"
২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩৫৮ পৃঃ।
৩ "মাণ্ডী প্রাচীন কালে মণিপুর নামে পরিচিত ছিল"—সেনরাজগণ
কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত : ৫৪ পৃষ্ঠা।

৪. নব্যভারত ১২৯৯—অগ্রহায়ণ, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।
৫. Elliot, vol III. P. 116.
৬. Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LXV. Pt. I. Page 32.
৭. বাংলার পূবাবৃত্ত—৩২১ পৃষ্ঠা।
৮. This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have been a grandson of Ballal Sen"—J.A S.B.. 1874. P. 83.
৯. "It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Rai of Sunargaon, named Dhanuj Rai, who met Emperor Balban on his march against Sultan Maghisuddin in the year 1280." J.A.S.B. 1874. no 3 P. 206.
১০. Jarret.—Ain-i-Akbari Vol II. Page 146.
১১. প্রবাসী ১৩১৯,—শ্রাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
১২. J.A.S.B. 1896. no I, Page 33, 37.
১৩. প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
১৪. Glawdin's Ain-i-Akbari—Page 3, 4.
১৫. History of Barkergange—H. Beveridge Page 27.
১৬. প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "এই কুলগ্রন্থ খানি চারিশত বর্ষের আদর্শ পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হইয়াছে। অধুনা ময়মনসিংহবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুথিখানি পাঠাইয়াছেন। পুরুষাণুক্রমে এই কুলগ্রন্থ খানি তাঁহাদের গৃহে শ্রাদ্ধাদিকালে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কুলগ্রন্থ-রচযিতা কুলাচার্য্য বা ভট্ট কবিগণ অনেকে সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ বুৎপন্ন ছিলেন না। এ কারণ তাঁহাদের রচিত কুলগ্রন্থে যথেষ্ট ছন্দোদোষ ও ব্যাকরণ-দোষ লক্ষিত হয়। আলোচ্য কুলগ্রন্থেও এরূপ দোষের অভাব নাই।"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা—পাদটাকা।
১৭ বটুভট্টের দেববংশ, ২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।
১৮. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭—৭১ পৃষ্ঠা। প্রবাসী ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ।
১৯. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩৬/৯ পৃষ্ঠা।
২০. Dacca Review Vol 5 no I P. 26
২১. Ibid.
২২.
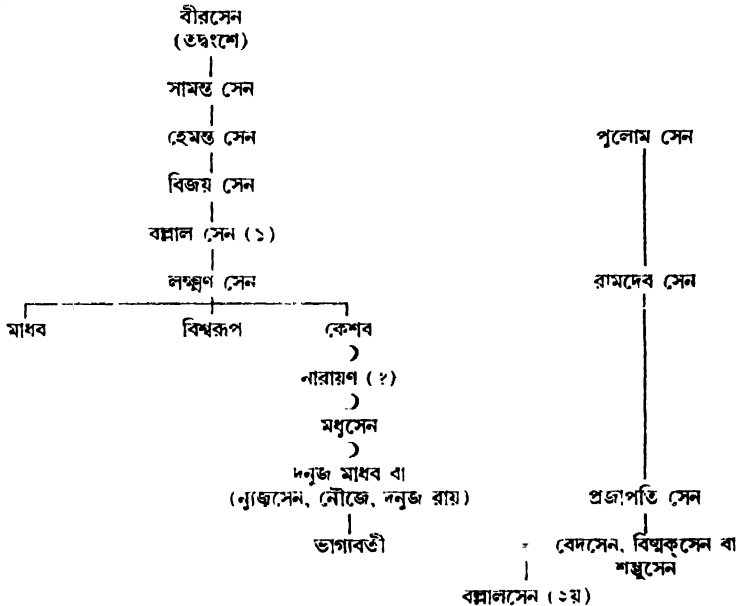
২৩. "অথ নির্বাসিতঃ পূর্ব গণৈঃ ধর্মগিরিঃসহ।
বৃত্তিহীনো যযৌ দুরং দেশদ্দেশান্তরং ভ্রমণ।।
রাজাজ্ঞায়া কৃতৎ ধ্যায়ন্নবমানং চ পীড়নম্।
স্বস্য ভ্রষ্টাধিকারঞ্চ ন লেভে নির্বৃতিং গিরিঃ।।
বৈরস্যান্তং চিন্তয়ান আবর্ত্তা বৎসারান্ ততঃ।
বায়াদুম্বং দদর্শাসৌ ম্লেচ্ছেশং স্বগণৈর্বৃতম্।।

বল্লাল-চরিতম্ ষড়বিংশোধ্যায়ঃ।

২৪. *হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিত ১৮৮৯ সনে এবং পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক অনূদিত বল্লাল-চরিত ১৯০১ সনে মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পূর্বেই এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯০৪ সনে প্রকাশিত শাস্ত্রী মহাশয়ের Notices of Sanskrit Manuscript গ্রন্থে বল্লাল-চরিত পুস্তকের উল্লেখ নাই।

২৫. (ক) এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃক মুদ্রিত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লভানন্দ ঋণ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে 'কিন্তু এই দোষেব জনা সুবর্ণবণিক্ সমাজকে পতিত করেন নাই। পক্ষান্তরে, *হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লভানন্দ ঋণ দান করিতে অস্বীকৃত হইলেই বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সুবর্ণবণিক্জাতির পাতিত্য বিধান করেন।

(খ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে সুবর্ণবণিক্গণ রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বল্লালের প্রিয়পাত্র ভীমসেনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং অপমানিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায় প্রস্থান করিলে, রাজা বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হন ও সমুদয় সুবর্ণবণিক্জাতিকে পতিত করেন। *হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে রাজপুরোহিত বলদেব যোগীরাজ কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি যুগিজাতি ও সুবর্ণ-বণিক্জাতির পাতিত্যবিধান জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন।

(গ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা —

"যদি দাম্ভিকান্ সুবর্ণান্ বণিজঃ শূদ্রত্বে ন পাতয়িষ্যামি, বল্লভচন্দ্রসৌদাগিরস্য দণ্ডং ন বিধাস্যামি, তদা গোব্রাহ্মণযাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন যাদৃশঃ শপথঃ কৃতঃ, এতেষাং পাতনায় শপথো মে তাদৃশো জ্ঞাতব্যঃ অদ্যাবধি এতে সর্বে শূদ্রবদ্গ্রাহ্যাঃ। ব্যর্থমেতেষাং যজ্ঞসূত্র-ধারণমতঃপরমেতেষাং যাজনাধ্যাপনে প্রতিগ্রহঞ্চ যে ব্রাহ্মণা করিষ্যন্তি, তে জ্বলত্যেহপি পতিষ্যন্তি, নান্যথা।

*হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা —

"যদি দুঃশীলান্ হিরণ্যবণিজঃ অধমজাতীযানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিতদণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, ধনগর্বিতানাং ভণ্ডযোগিনাঞ্চ উৎসাদনং ন করিষ্যামি, তদা গোব্রাহ্মণযোষিদাদিঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশী প্রতিজ্ঞামকরোৎ এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সব অদ্যাবধি একাসনোপবেশনম্, এতেষাং দানাদিগ্রহণং যজযাজনাদিকম্ সাহায্যমাত্রঞ্চা যে করিষ্যন্তি তেহপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদিধারণন্ ব্যর্থম্"।

(ঘ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লাল-মহিষী রাজপুরোহিত বলদেব সহ উগ্রমাধব শিবের অর্চনা করিবার জন্য গমন করিযাছিলেন।

*হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালসেনের কাম্য পূজা দিবার জন্য যোগীরাজ-পূজিত জটেশ্বর শিবের নিকট রাজপুরোহিত বলদেব একাকী গমন করিয়াছিলেন।

(ঙ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে যোগিবর রাজপুরোহিতের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন। *হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকের মতে পুরোহিতের অপমান করায় রাজপুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে রাজা যুগিজাতি ও সুবর্ণবণিক্দিগকে পতিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন।

(চ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে সেনরাজগণকে "ব্রহ্ম ক্ষত্রবংশ" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, *হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে লিখিত আছে, "পারম্পর্যক্রমাগত একটি প্রবচন আছে—যখন বল্লাল সেন মিথিলা হইতে অতিদ্রুতগমনে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময় একজন

যোগী বল্লালের অশ্বপদে আহত হইয়া "সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে পতিত্বা ত্বং ময়িষ্যসি" বলিয়া বল্লাল সেনকে অভিশপ্ত করেন।

ঁহরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত মতে যুগিজাতীয় পীতাম্বর স্বগণ সহ অপমানিত ও ধর্মচ্যুত হইয়া,

"যথাপমানদগ্ধোহস্মি দণ্ডিতশ্চ গণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি তথা দগ্ধঃ স্বগণৈজ্জ্বলদগ্নিনা।।"

বলিয়া বল্লালকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

(জ) এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে, "লক্ষ্মণ সেন তাঁহার বিমাতাকে নির্জন পায়ু-প্রক্ষালন-গৃহে একাকিনী পাইয়া অসৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করায় এবং কুচেষ্টা প্রদর্শন করায় বল্লাল সেন তাঁহার সেই পত্নীর কথানুসারে লক্ষ্মণ সেনকে দণ্ড করিবার জন্য ঘাতকের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। লক্ষ্মণ সেন সেই রাত্রিতেই তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নী সহ পরামর্শ করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। বল্লাল সেন পরদিন প্রত্যুষে দুর্গাবাড়ি যাইয়া সন্দর্শন করিলেন যে, পতি বিয়োগ বিধুরা পুত্রবধূ কর্তৃক—

"পততো বিরত বারি নৃতন্তি শিখিন মুদা।
অদ্য কান্ত কৃতান্ত বা দুঃখ শান্তি করতু মে"।।

এই কবিতাটি গৃহ ভিত্তিতে লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই বল্লালের মনে পুত্র স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং জালজীবী কৈবর্ত্ত দিগকে পুত্রানয়নের আদেশ দিলেন।

তাহারা অহোরাত্র মধ্যে দ্বিসপ্ততি ক্ষেপণী যুক্ত তরণীর সাহায্যে লক্ষ্মণ সেনকে তদীয় সকাশে আনয়ন করায় বল্লাল সেন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন, রত্ন, বস্ত্র ও হালিক্য উপজীবন দিলেন।

এই আখ্যায়িকাটি ঁহরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না।

(ঝ) বায়াদুম্ব প্রসঙ্গ উভয় বল্লাল চরিতেই স্থান পাইয়াছে। উহা আনন্দ ভট্টের লেখনী প্রসূত বলিয়া উভয় পুস্তকেই উল্লিখিত হইলেও একখানি পুস্তকের ভাষার সহিত অপরখানির কিছু মাত্র মিল নাই।

(ঞ) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক

"শকে চতুর্দশ শতে মনুষ্য রদনাযুতে।
পৌষ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং তজ্জন্ম তিথি বাসরে"।।

অর্থাৎ ১৪৩২ শকে (১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে) পৌষমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নবদ্বীপ-পতির জন্মতিথি বাসরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

ঁহরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক

"মানৈ রন্ধ্র রাজপুত্রৈদর্শনৈশ্চ নবাধিকৈঃ।
শাকেষু দর্শনে মাসে তারাভির্দ্দর্শিতে দিনে।
নবদ্বীপপতে রাজ্ঞাং ময়া বিধৃত্য মূর্দ্ধনি
অস্য চিত্ত প্রসাদার্থং তৎপাণি কমলার্পিতম্"।।

অর্থাৎ ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসের ২৭শ দিবসে নবদ্বীপের রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহার চিত্ততোষণের জন্য এই গ্রন্থ তাঁহার করপদ্মে সমর্পিত হইয়াছে।

একই গ্রন্থকারের একই বিষয় লিখনের সময়ের পার্থক্য ৬৮ বৎসর কেন হইল তাহা বুদ্ধির অগম্য।

(ট) ঁহরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত বল্লাল চরিতে লিখিত আছে :—

"বৈদ্যবংশাবতংসোহয়ং বল্লালো নৃপো পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃত মিদং বল্লাল চরিতং শুভম্।।
গোপাল ভট্ট নাম্না তদ্রাজস্য শিক্ষকেণ চ
অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সুযত্নেনার্পিতং ময়া।
অঙ্ক রাজক্রমানৈর্ব্বসুভির্বর্ণৈরধিক শাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মান সম্মিতৈঃ"।।

অর্থাৎ "রাজশ্রেষ্ঠ বল্লাল বৈদ্যবংশের মুকুট স্বরূপ, তাঁহার আজ্ঞায় এই বল্লাল চরিত নামে মঙ্গল কারক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট নামে উক্ত রাজার শিক্ষক আমি ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খ্রিঃ অঃ) ফাল্গুন মাসের ২৪শ দিবস, সেই রাজার সন্তোষের জন্য যত্ন পূর্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম"।

সোসাইটির পুস্তকে এই শ্লোকগুলি পবিলক্ষিত হয না।

Preface to Vallala charita in Sanskrit by Ananda Bhatta edited and translated into English by Mahamahopadhya Haraprasad Sastri, M. A.---Pages V. VI.

২৬. "তস্মিন্নবসরে কেচিম্মন্ত্রয়িত্বা পবস্পরং।
অভ্যেত্য কাস্যপীকান্তং ব্রাহ্মণা বক্য মব্রুবন্।।
ব্রাহ্মণা উচুঃ।
বয়ং শ্রেষ্ঠা হি বর্ণানাং জাত্যা চৈব কুলেনচ।
সুবর্ণা বণিজো দর্পাদেবং বদন্তি সর্ব্বদা।।
দাসী বংশজ ইত্যেবং বদন্তো মনুজেশ্বর।
ব্রাহ্মণান্ সদ্বংশ জাতানস্মানুপসহন্তি তে।।
যজ্ঞোপবীতিনঃ সর্ব্বে সুবর্ণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তান্ ভ্রান্তবুদ্ধ্যা নমস্কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা।।
তেযাং হি ধর্মহননং কর্তবাং পৃথিবী পতো
স্পর্দ্ধেযুর্ণ যথাস্মাভি বিপ্রৈঃ সৎকুলজৈঃ সহ।
ব্রহ্মক্ষত্র কুলে জাত মায়ুষ্মন্তং জনেশ্বর।
অবমত্য যদ্বদন্তি বক্তুং তন্নেহ সাম্প্রতং।।
সর্ব্বন্ যজ্ঞোপবীতেভ্যস্তান্ চ্যাবব মহীপতে।

সর্ব্বেতে ধর্ম্ম হননাৎ পরিষ্যান্তি ন সংশযঃ।।
এবমুক্তা মহীপালং বিরেমু স্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
নৃপতি মর্হতা বিষ্টঃ ক্রোধেনাসৌ জগর্জ্জহ"।।
বল্লাল চবিতম্ ১০৯---১১০ পৃষ্ঠা।

২৭. বল্লাল চবিতম্---১২১ পৃষ্ঠা।
২৮ বল্লাল চরিতম্---১১৩ পৃষ্ঠা।
২৯. বল্লাল চরিতম্---১১৩ পৃষ্ঠা।
৩০. বল্লাল চরিতম্---২৪ পৃষ্ঠা।
৩১. বল্লাল চরিতম্---২৮ পৃষ্ঠা।
৩২. সোসাইটির আদর্শ পুঁথির (খ) পুস্তকে সর্বত্রই "লক্ষ্মণ" স্থানে "লবণ" পাঠ লিখিত হইযাছে।
৩৩. বল্লাল চরিতম্---১২০ পৃষ্ঠা।
৩৪ "ততো বিপ্রা যথাকালে বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
দীক্ষয়ামাসুর্নৃপতিং বল্লালং মলহ্নোত্মজন্।।"
বল্লাল চরিতম---১০৩ পৃষ্ঠা।

সোসাইটির বল্লাল চরিতে শরণ দত্তের লিখিত বল্লাল চরিতের যজ্ঞোৎসব, বণিজাপমান ও জাতিগণের উন্নয়ন অবনয়ন অধ্যাযত্রয় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে, সোসাইটিব পুস্তকেব যেখানে "শরণ দত্ত উবাচ" লিখিত আছে, সোসাইটির আদর্শ (ক) পুস্তকে ঐরূপ উক্তি নাই। সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকে সুবর্ণবণিকদিগের পাতিত্যের কথা যে যে অধ্যায়ে লিখিত হইযাছে, কেবলমাত্র সেই সেই অধ্যায়ের শরণ দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত কেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

৩৫. সহস্রেহষ্ট বিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি।।"
বল্লাল চবিতম্---১২১ পৃষ্ঠা।

৩৬. "কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দৌ পুত্রৌ হরিপালোহহি পালৌ।।
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুব পশ্চিমে স্বনাম বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্ট বাপি সমন্বিতঃ।।

অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্তা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণি সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ।।
ডমুর দ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা।
অহি পালস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বেঘঘোষিৎসু জজ্ঞিরে।।
কৃতধ্বজো তনয়ো বিরলি সংজ্ঞকো বলিঃ।
সুগন্ধি গ্রাম মধ্যে চ চকার বসতিং মুদা।।
বিভাণ্ডো বাণ মন্ত্রী চ পূর্বপারে স্থিতঃ স চ।
জগদ্বলে মহা গ্রামে যস্য বংশোহপি বর্ততে।।
কেশিধ্বজো মহাগ্রামে চান্দোলাভিধেয়কে।
কায়স্থান্ বহুলান্ নীত্বা রাজত্বঞ্চ চকার হ"।।

৩৭. পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ—৮০ পৃষ্ঠা। প্রতিভা—১৩১৯, পৌষ ৫৩২ পৃষ্ঠা।
৩৮. প্রতিভা—১৩১৯, কার্ত্তীক, ৪২০ পৃষ্ঠা।
৩৯. পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ—৮৬ পৃষ্ঠা।
৪০. সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস—২২ পৃষ্ঠা।
৪১. বিক্রমপুরের ইতিহাস—৩৮৭ পৃষ্ঠা।
৪২. There is a comparatively small tank in the South West part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris Chandra's Dighi. * * * * * The tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the kings of the Pal dynasty.
J A S B. 1889, Page 22
৪৩. প্রবাসী—১৩২২, আষাঢ়—৩৯০ পৃষ্ঠা।
৪৪ কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে কুড়ি বুড়ি (৪০০) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটীর চতুর্দিকে ১২।।০ গণ্ডা (৫০), রাণীকর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক কর্ণপাড়ায়) ৭।। গণ্ডা (৩০) দীর্ঘিকা খনিত হয়"। পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।
৪৫ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫।
৪৬. গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন, ইহারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা। মাণিকচন্দ্র নামে এই রাজার নাম "হরিশচন্দ্র"। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে (৫৮ পৃষ্ঠা) ঃ—

"করিবে আমারে যোগি যদি ছিল মনে।
উদুনা পুদুনা তবে বিভা দিলে কেনে।।
উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান।।
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম"।।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে,—"অদুনকে দিয়া বিবাহ দিল পদুনাক দিল দানে"। শ্রীযুক্ত বীশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩১৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ময়নামতীর গান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, "হরিশ্চন্দ্র বা হরিশচন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে তাপনা রাটিয়া শুভদিন ধার্য্য করা হইল, "পঞ্চগাছি কলার গাছ, সোনালী চান্দনবাতি ও পঞ্চবৈবাতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল,—

অদুনকে বিবাহ কল্লে পদুনকে পাইলে দানে।
একশত বাঁদী পাইলে ব্যবহার কারণে"।।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ময়নামতীর গানেও লিখিত আছে (৮ পৃষ্ঠা) —

এক বিভা করাইল অদুনা পদুনা।
সে সব সুন্দরী জানে আস্কার বেদনা"।।

এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া অপর ভগিনীকে যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রথা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে (১২ পৃষ্ঠা) দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া।।
সূর্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুক লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা"।।

৪৭. প্রবাসী,—১৩১৯, আষাঢ়, পৃষ্ঠা।

৪৮. "রাজা হরিশচন্দ্র ধর্ম সেবা করিব"।।

শূন্য পুরাণ, রাজা হরিশচন্দ্রের ধর্মপূজা, ৫৯ পৃষ্ঠা।

"শূন্যে পূজ এ হরিশচন্দ্র বিসাদ ভাবিয়া মতি"।।

* * * * * *

"করহ ইহা হরিশচন্দ্র মানুষ পাঠাও জন দশ"।

শূন্য পুরাণ—৬০ পৃষ্ঠা।

"হরিশচন্দ্র রাজা তপে মহা তেজা
বারমতি ভরিল ঘর"। —১০০ পৃষ্ঠা।

হরিশচন্দ্র রাজা করে ধর্ম পূজা
ভর এ নবাহুতি ঘর।।

"চন্দ্র সূর্য আইলাক গ্রহ তারাগণ।
ধন্য হরিশচন্দ্র আমরা ভুবন"।।

"হরিশচন্দ্র মহারাজা রাজারাণী করে পূজা
উরিলেন ধর্ম জুগপতি"।।

" শূন্যে পূজ এ হরিশচন্দ্র বিসাদ ভাবিয়া মতি"।

৪৯. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩২১।

৫০. প্রতিভা—১৩১৯—কার্তীক, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৫১. পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ ২৪ পৃষ্ঠা।

৫২ পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ ২৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র
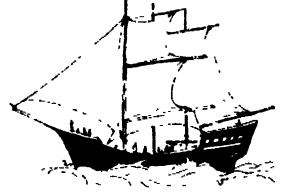
তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু রাজগণ শাসন সৌকার্যার্থ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পূর্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পালরাজগণের সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল ও মহান্তাপ্রকাশ বিষয়, আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল ও কোটিবর্ষ বিষয়, হলাবর্তমণ্ডল ও কোটিবর্ষবিষয়, চন্দ্ররাজগণের সময় নান্যমণ্ডল, বর্মরাজগণের সময় অধ্যপতন মণ্ডল, নিচক্রবিষয় এবং সেন রাজগণের সময়ে খাড়ি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্তিগুলি কতিপয় "মণ্ডলে" এবং মণ্ডলগুলি ভিন্ন ভিন্ন "বিষয়ে" বিভক্তি ছিল। মণ্ডলগুলি খুব বড় ছিল এবং মণ্ডলের শাসনকর্তা "উপরিক" বা "মহা মান্ডলিক" বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিষয়পতিগণকে উপরিকের অধীনে থাকিতে হইত। মণ্ডল বা বিষয়ের কার্যে উপরিকগণ সর্বেসর্বা ছিলেন। মহামান্ডলিকগণ মহারাজ বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দশখানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ হইত এবং যিনি দশ গ্রামের রাজস্ব আদায় করিতেন তিনি দশগ্রাথিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি দশ গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হইত ; প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব রাখার জন্য যে কার্যালয় ছিল, তাহার অধ্যক্ষ বিষয়পতি নামেই অভিহিত হইতেন। বিষয় কার্যালয়ে জমা ও জমির পরিমাণ রক্ষিত হইত। বিষয়পতিগণ রাজার নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। বিষয়কার্যালয়ের সর্বপ্রধান লিপিকর "জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" নামে পরিচিত ছিলেন। "করণিক" গণ আইন সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন এবং ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকরদিগের অধ্যক্ষ "মহাকরণাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইতেন। "দশগ্রামিক" কে সম্ভবত জ্যেষ্ঠকায়স্থের অধীনেই থাকিতে হইত। "অধিকরণের" অধীনে "সাধনিক", "ব্যাপার কারণ্ডয়", "মহত্তর", "পুস্তপাত", "কুলধার" প্রভৃতি ছিল। পুস্তপালের পদ মহত্তর দিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ সম্বলিত কাগজপত্রাদির রক্ষক ছিলেন। "বিনিযুক্তক" কর্মচারী নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার কারণ্ডয়ের" হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার অধীনে "ব্যাপারাণ্ডয়" পদ ছিল। "ব্যাপার কারণ্ডয়" হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। "দোঃ সাধসাধনিক" বা "দৌসাধিক", নিয়োজিত শ্রমজীবীদিগের পরিদর্শক ছিলেন। "ভোগপতি" খাদ্যদ্রব্যাদির সরবরাহক ছিলেন। বিচারকার্য একাধিক প্রাড়বিবাক কর্তৃক সম্পন্ন হইত এবং সর্বপ্রধান প্রাড়বিবাক "মহাধর্মাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইতেন। সন্ধি এবং বিগ্রহ নিপুণ সচিব "সান্ধিবিগ্রহিক" এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান ছিলেন, তিনি "মহাসান্ধি বিগ্রহিক" নামে পরিচিত ছিলেন। রাজকীয় শিলমোহর রক্ষাকারী কর্মচারী "মুদ্রাধিকৃত" এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ "মহামুদ্রাধিকৃত" বলিয়া অভিহিত হইতেন। গুপ্ত মন্ত্রণা সচিবকে "অন্তরঙ্গ" এবং তাঁহাদিগের অধ্যক্ষকে "অন্তরঙ্গোবরিক" বলা হইত। রাজ লেখ্য রক্ষকের পদ "অক্ষপটলিক" এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্মচারী "মহাক্ষপটলিক" বলিয়া পরিচিত ছিল। একাধিক পুররক্ষী বা দৌবারিকের পদ ছিল, ইহারা "প্রতিহার" নামে, এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ "মহাপ্রতিহার" নামে অভিহিত

হইত। নগররক্ষক "প্রান্তপাল" নামে, গ্রামাধ্যক্ষ "গ্রামপতি" বা "গ্রামিক" নামে, দূত "গমাগমিক" নামে, দ্রুতগামী দূত "অভিত্বর মান" নামে, দুর্গরক্ষক "কোট্টপাল" নামে, ক্ষেত্ররক্ষক "ক্ষেত্রপ" নামে পরিচিত হইত। ভাণ্ডার ও রাজকোষের ভার কোষপালের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কণকাধ্যক্ষ "ভৌরিক" নামে এবং এই শ্রেণিস্থ কর্মচারীগণের প্রধান "মহাভৌরিক" নামে অভিহিত হইত। ফৌজিদারি বিভাগের বিচারপতি "দণ্ডনায়ক" নামে এবং এই বিভাগের সর্বপ্রধান বিচারপতি "মহাদণ্ডনায়ক" নামে, কারাধক্ষ "দণ্ডপাশিক" নামে, দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্মচারী "চৌরোদ্ধরণিক" নামে অভিহিত হইত।

রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি "গণ" সংগঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে "গণস্থ" বলিত। এই শ্রেণির সর্বপ্রধান কর্মচারী "মহাগণস্থ" নামে পরিচিত হইত। রাজ্যের সুরক্ষা বিধানের জন্য বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন, পাঁচ কিম্বা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্বক এক একটি "গুল্ম" প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষ "গৌল্মিক" নামে অভিহিত হইত।

নৌসেনার অধ্যক্ষকে "নাকাধ্যক্ষ" বলা হইত। স্থলযুদ্ধে যিনি সৈন্য চালনা করিতেন তাঁহার পদের নাম "ব্যূহপতি" এবং এই শ্রেণির কর্মচারীগণের প্রধান "মহাব্যূহ পতি" নামে পরিচিত ছিল। সামন্তদিগের ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়কের পদের নাম "মহাসামন্তাধিপতি" ছিল। প্রধান সেনাপতি "মহা সেনাপতি" বা "মহা বলাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইত।

রাজার হস্তীশ্রেণি দূর হইতে জলদামালা বলিয়া বোধ হইত। সামন্ত রাজগণের অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। গজ সেনাধিকৃচ কর্ম সচিব "হস্তি ব্যাপৃতক" নামে এবং অশ্বারোহী সেনাধিকৃত কর্মসচিত "অশ্ব ব্যাপৃতক" নামে, অভিহিত হইত। গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ, "গো-মহিষ অজ অহিকাদি ব্যাপৃতক" বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরণের ও শান্তিরক্ষার জন্য "উপরিকগণ" নিযুক্ত হইতেন। উপরিকগণের এক একটি অধিকরণ বা কার্যালয় ছিল, এই কার্যালয়ের কর্মচারীগণ "অধিকরণিক" নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদিগের কার্যপ্রণালি পরিদর্শন করিবার জন্য রাজধানীতে "বৃহদুপরিকের" কার্যালয় ছিল।

"দণ্ডশক্তিক" দণ্ড প্রদান করিতেন। "দণ্ডপাশিক" দণ্ড দানের যন্ত্রাদির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। "মহাসামন্তাধিপতি" সামন্তদিগের ও সৈন্যের 'তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। "নাকাধ্যক্ষের হস্তে নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষতা ন্যস্ত ছিল। নৌকা বা জাহাজাদি নির্মাণ স্থান "নাবাতাক্ষেণী" নামে পরিচিত ছিল।

রাজা ভূমিদান বা নিবদ্ধ করিলে ভাবী সাধুরাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখ্য করাইতেন এবং কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজবংশ পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতিগৃহীতার নাম ও তাহার বংশপরিচয়, প্রতিগ্রহের পরিমাণ এবং গ্রামক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতেন। উহাতে কালের উল্লেখ থাকিত এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন করিয়া দিতেন[১]।

"রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া "মতমস্তু' ভবতাম্" বলিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতেন। কোন গ্রামে কাহারা বাস করিবে, কাহারা ভূমিকর্ষণ করিবে, কাহারা উৎপন্ন শস্য উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথম রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না ;—গ্রামের লোকেই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেকদিন পর্যন্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না ;—কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে

হইত" এবং গ্রামের মহত্তর দিগের মধ্যস্থতায় বিক্রয় কার্য নিষ্পন্ন হইত। ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে ভূমির স্বত্বস্বামীত্ব কোনও ব্যক্তিবিশেষের ছিলনা, উহা গ্রামের প্রকৃতিপুঞ্জের (প্রকৃতয়ঃ) এজমালী সম্পত্তি ছিল। ক্রেতা গ্রামস্থিত প্রকৃতিপুঞ্জের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেন, "আমার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ পূর্বক বিষয়াদি ভূমি বিভাগ করিয়া আমাকে প্রদান করুন।" প্রকৃতিপুঞ্জ পুস্তপালের অবধারণ অনুসারে দেশ প্রচলিত রীত্যনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতেন। ফরিদপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৎকালে ১৭ বিঘা জমির মূল্য ৪ দিনার অথবা ৩২ টাকা ছিল।

কেশব সেনের তাম্রশাসনোল্লিখিত "তৎ সজল নানা পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্‌গয়িত্বা পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপ ভোগেনোপ ভোক্তং" প্রভৃতি উক্তি—প্রণিধানযোগ্য ; বর্তমান সময়েও জমির পাট্টায় এইরূপ লিখিত হয়।

বিবিধ তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে নিম্নলিখিত কর্মচারীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় :—

রাজন্যক, রাজমাত্য, বিষয়পতি, ষষ্ঠাধিকৃত, সেনাপতি, দণ্ডশক্তিক, দণ্ডপাশিক চৌরোদ্ধোরণিক, দোঃ সাধ-সাধনিক বা দৌঃ সাধিক, দূত, গমাগমিক অভিত্বরমাণ, নাকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক ; ভোগপতি, মহামহত্তর, মহত্তর, দশগ্রামিক, বিষয় ব্যবহারিক, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহাসামন্তাধিপতি ; বিষয়পতি, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ. মহাসান্ধি বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাকর্তাকৃত্তিক, মহকুমারামাত্য, উপরিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোষপাল, দূত প্রেষনিক, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসেনাপতি, মহাকূটপাশিক, কোট্টপাল, বিষয়কার, মহাসামন্ত, অন্তরঙ্গ, মহামুদ্রাধিকৃত, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহগণস্থ, পুরোহিত, মহাপীলুপতি, মহাভৌরিক, দণ্ডনায়ক, মহাধর্মাধ্যক্ষ।

তাম্রশাসনোল্লিখিত রাজকর্মচারীগণের সংখ্যা পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্য সুরক্ষিত ও সুশাসিত করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ের কোনই অভাব ছিল না।

রাজন্যক—"রাজন্যানাং সমূহঃ" (এই অর্থে রাজন্য+কণ্—সমূহার্থে) ক্ষত্রিয় সমূহ, রাজক। শ্রীযুক্ত আপ্তে লিখিয়াছেন, "a collection of warriors of Kshatriyas."

রাণক—ওয়েষ্টমেকটসাহেব "রাজ্ঞী-রাণক" যুক্ত পদরূপে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন, "Ranak probably means queen's relation." অধ্যাপক বসাকের মতে, "রাণক" এক শ্রেণির সামন্ত নরপালের পদ বিজ্ঞাপক উপাধি মাত্র।

রাজামাত্য—প্রধানমন্ত্রী, Prime minister.

মহাধর্মাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি।

"কুলশীল গুণোপেতঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে"।।

ইতি চাণক্যম্।

তস্য লক্ষণং যথা —

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্ব শাস্ত্র বিশারদঃ।
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্মাধিকরণো ভবেৎ।।

সম্ভবত বিচারকার্য একাধিক ধর্মাধ্যক্ষ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত, সর্বপ্রধান প্রাড়্‌বিবাক বা ধর্মাধ্যক্ষ, মহা ধর্মধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইত। Chief Justice.

মহাসান্ধিবিগ্রহিক, সান্ধিবিগ্রহিক, —সন্ধি এবং বিগ্রহ নিপুণ সচিব প্রধান।

মিঃ ওয়েষ্ট মেকট লিখিয়াছেন, "a great officer for making treaties and declaring war."

অন্তরঙ্গ—ওয়েষ্টমেকটের মতে "servant of the interior, or perhaps confidential servants," গুপ্ত মন্ত্রণা সচিব।

অন্তরঙ্গোপরিক—গুপ্ত মন্ত্রণাসচিবগণের অধ্যক্ষ।

উপরিক, বৃহদুপরিক—স্থানীয় বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা। উপরিকদিগের এক একটি অধিকরণ বা বিচারালয় ছিল, এবং তাঁহারা শিলমোহর ব্যবহার করিতেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরণের এবং শান্তি রক্ষার জন্য উপরিকগণ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদিগের কার্যাবলী পরিদর্শন জন্য রাজধানীতে বৃহদুপরিকের কার্যালয় ছিল। অধ্যাপক লাসেন বলেন "Overseer of the offecers of criminal law" ; অর্থাৎ ফৌজদারি বিভাগের কার্য পরিদর্শক। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (অন্তরঙ্গানাং বৃহদুপরিকঃ) একটি পদের নাম। যাহারা রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভের অধিকারী সেই সকল ভৃত্যবর্গের অধিনায়কের নাম অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিকঃ।

রাজস্থানীয়োপরিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে "রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্তা" Viceroy।

সেনাপতি, মহাসেনাপতি—সেনাপতি লক্ষ্মণং যথা ঃ—

"কুলীনঃ শীল সম্পন্নো ধনুর্বেদ বিশারদঃ।
হস্তি শিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণ ভাষণঃ।।
নিমিত্তে শকুন জ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।
কৃতজ্ঞঃ কর্মণাং শূর স্তথা ক্লেশ সহ ঋজুঃ।।
ব্যূহতত্ত্ব বিধানজ্ঞঃ ফল্গুসার বিশেষ বিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহথবা"।

মৎস্য পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়।

"সেনাপতি র্জিতাবাসঃ স্বামিভক্তঃ সুধীরভীঃ।
অভ্যাসীবাহনে শস্ত্রে শাস্ত্রে চ বিজয়ী রণে"।।

কবি কল্পলতা।

প্রধান সেনাপতি মহাবলাধ্যক্ষ নামেও অভিহিত হইত।

মহাসামন্তাধিপতি—সামন্তদিগেরও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে The Generalissimo.

মহামুদ্রাধিকৃত—মিঃ ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন "Great mint master" কিন্তু 'মুদ্রা' শব্দ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রিকা অপেক্ষা শিলমোহর অর্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং মহামুদ্রাধিকৃত শব্দে রাজকীয় শিলমোহর রক্ষাকারী "Keeper of the Seal and the Exchequer, বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহাক্ষপটলিক—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ধর্মাধ্যক্ষ ; ওয়েষ্টমেকটের মতে "Chief Justice." পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। তিনি অক্ষপটল শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "law-suit and collection"। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, রাজ লেখ্য রক্ষক। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা বলেন, "তখন দ্যূতক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দ্যূতাগার সমূহের কার্যাধ্যক্ষকে "অক্ষপটলিক" বলিত। অক্ষপটলিকগণ দ্যূতাগার হইতে কর আদায় করিতেন ; রাজগণ সেই কর গ্রহণ করিতেন। "মহাক্ষপটলিক", অক্ষপটলিকদিগের প্রধান ছিলেন। দ্যূতাগারের প্রধান দ্যূত কারককে "সভিক" বলিত।"

মহাপ্রতিহার—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ বা, দৌবারিক-শ্রেষ্ঠ। ওয়েষ্টমেকট বলেন, "Great

door keeper, probably Commander of the body guards।" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, The grand warder. চাণক্য সংগ্রহে লিখিত আছে —

"ইঙ্গিতাকার তত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতিহারঃ স উচ্যতে।।"
মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে —
"প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে"।।

মহাভোগিক—ওয়েষ্টমেকটের মতে, An officer in charge of Revenue, from a special right over the land called "bhoga." কর সংগ্রাহক কর্মচারী। কিন্তু "ভোগিক" শব্দ অশ্বরক্ষককেই বুঝাইয়া থাকে।

মহাভৌরিক—"ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষো" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

মহা ভৌরিক, কনকাধ্যক্ষ শ্রেণিস্থ কর্মচারীগণের প্রধান।

মহাপীলুপতি—ওয়েষ্টমেকটের মতে, "Head of the Forest department of the Revenue." কিন্তু গজ রক্ষক অর্থেই পীলুপতি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। সুতরাং উহা প্রধান গজ রক্ষক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গৌল্মিক— "একে ভৈকরথা ত্র্যশ্বাঃ পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকাঃ।।
সেনা সেনামুখং গুল্মো বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী চ পত্তেঃ স্যাদিভাদ্যৈ স্ত্রিগুণৈঃ ক্রমাৎ।।" হেমচন্দ্রঃ।
"গুল্মঃ সেনা সংখ্যা বিশেষঃ। অত্র গজা নব রথা নব অশ্বাঃ
সপ্তবিংশতি পদাতয়ঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সমুদায়েন নবতিঃ। ইত্যমরঃ।
"দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রাম শতানাঞ্চ কুর্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্"। মনু, ৭ অ। ১১৪।

অর্থাৎ রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থে বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন কিম্বা পাঁচ অথবা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্বক একটি গুল্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠান নির্দেশ করা কর্তব্য।

মহাগণস্থ—গণং সেনা সংখ্যা বিশেষঃ। "গজাঃ ২৭ রথা ২৭ অশ্ব ৮১ পদাতিকা ১৩৫ সমুদায়েন ২৭০" । ইত্যমরঃ। রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি "গণ" সংঘটিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে "গণস্থ" বলিত। "মহাগণস্থ" সেই শ্রেণির কর্মচারিবর্গের প্রধান ছিলেন। একরথ, একগজ, তিন অশ্ব ও পঞ্চপদাতিক লইয়া যে একটি সেনাদল গঠিত হইত, তাহার নাম "পত্তি"। তিনটি পত্তি একত্র হইলে তাহাকে "সেনামুখ" বলিত ; তিনটি সেনামুখ মিলিয়া একটি "গুল্ম" এবং তিনটি গুল্ম লইয়া একটি "গণ" গঠিত হইত।

দণ্ডপাশিক—উইলফোর্ডের মতে "Keeper of the instruments of punishment". বধাধিকৃত পুরুষ ; সম্ভবত ফৌজদারি বিভাগের কারাধ্যক্ষ।

দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক,—"চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ সেনানী দণ্ডনায়কঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাদণ্ডনায়ক ফৌজদারি বিভাগের প্রধান বিচারপতি বলিয়া অনুমান করেন। ওয়েষ্টমেকটের মতে "দণ্ডনায়ক," দণ্ড পাশিকের অধীনস্থ কর্মচারী। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে মহাদণ্ডনায়ক শব্দে, The chief Criminal Judge বুঝায়।

চৌরোদ্ধরণিক—দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্মচারী বিশেষ।

ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন, "Thief catcher : this was probably a military appointment, established to cope with the predatory bands which infested the country."

নৌবল-ব্যাপৃতক—নৌসেনাধিকৃত কর্মসচিব। "নিয়োগী কর্মসচিব আয়ুক্তো ব্যাপৃতশ্চ সঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।।

হস্তি ব্যাপৃতক—গজসেনাধিকৃত কর্মসচিব।

অশ্ব ব্যাপৃতক—অশ্বারোহী সেনাধিকৃত কর্মসচিব।

গো ব্যাপৃতক—গবাধ্যক্ষ।

মহিষ ব্যাপৃতক—মহিষাধ্যক্ষ।

অজ ব্যাপৃতক—ছাগাধ্যক্ষ।

অবিকাদি ব্যাপৃতক—মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ।

মহাব্যূহপতি— যুদ্ধে সৈন্য রচনার নাম ব্যূহ। "শিবিরং রচনা তু
স্যাৎ ব্যূহো দণ্ডাদিকো যুধি"। হেমচন্দ্রঃ।
"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থান ভেদতঃ।
সব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবী ভুজাম্।।
ব্যূহভেদাস্তু চত্বারো দণ্ডো ভোগোহস্ত্র মণ্ডলম্।
অসংহতশ্চ নির্ণীতা নীতি সারাদি সম্মতাঃ।।
অন্যেহপি প্রকৃতি ব্যূহাঃ ক্রৌঞ্চ চক্রাদয়ঃ ক্বচিৎ।
তির্যগ্ বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাদ্ভোগোস্বাবৃত্তিরেবচ।।
মণ্ডলং সর্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্বৃত্তিরসংহতঃ।
সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যূহভেদাঃ সমীরিতাঃ"।। শব্দ রত্নাবলী।

এখন যেরূপ যুদ্ধে ব্যূহ রচনাদ্বারা সৈন্য সমাবেশ প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীনকালেও যুদ্ধে তদ্রূপ ব্যূহরচনার নিয়ম প্রচলিত ছিল ; মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিবরণ পাঠে তাহা বিশেষরূপ জানিতে পারা যায়। মন্বাদি ঋষিগণও যুদ্ধে বূহ্য রচনার বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও মনুসংহিতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে সূচিমুখ, বজ্রাখ্য, ক্রৌঞ্চাচরুণ, গারুড়, অর্ধচন্দ্র, ব্যাল, মকর, শ্যেন, মণ্ডল, সাগর, শৃঙ্গাটক, চক্র, চক্র শকট, পদ্ম, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যূহ রচনা দ্বারা যুদ্ধকালে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। যিনি ব্যূহ রচনাকারী সেনাপতিগণ মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন, তাহাকে "মহব্যূহপতি" বলা হইত। এই শব্দটি ভোজবর্মা ও হরিবর্মার তাম্রশাসনেই কেবলমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

পুস্তপাল—গ্রামের জমাজমির বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক। পুস্তপালের পদ মহত্তরদিগের অধীনে ছিল।

ব্যাপার কারণ্ডয়, ব্যাপারাণ্ডয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যাদি পরিদর্শনকারী প্রধান কর্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানতঃ অর্ণবপোতেই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল : উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার কারণ্ডয়ের" হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহার অধীনে "ব্যাপারাণ্ডয" পদ ছিল।

অধিকরণ—বিচারালয়।

অধিকরণিক—অধিকরণে অর্থাৎ ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত বিচার কর্তা।

শৌল্কিক—"শুল্কাধ্যক্ষস্তু শৌল্কিকঃ" ইতি হেমচন্দ্র। শুল্কাধ্যক্ষ। Toll Collector। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক, "শৌল্কিক শব্দটি আধুনিক Custom officer এর পদ বিজ্ঞাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Collectors of Custom.

মণ্ডলপতি—মণ্ডল, প্রদেশের অংশ ; পরগনা। হিন্দু শাসন সময়ে শাসন সৌকর্যার্থে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। মণ্ডলপতি কর্তৃক মণ্ডলগুলি শাসিত হইত। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগনায় পরিণত হইয়াছিল। "মণ্ডলঃ দেশঃ দ্বাদশ রাজকম্" ইতি মেদিনী।। "দেশো জনপদো নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গশ্চ মণ্ডলম্"।। হেমচন্দ্র। চতুঃশতযোজন

প্রদেশের অধিপতির নাম মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ বা মণ্ডলেশ্বর। "চতুর্যোজন পর্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। যো রাজা বহু তদ্ গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ"।। যিনি নৃপ ও মণ্ডলাধিপগণের শাসক এবং রাজসূয় যজ্ঞকারী, তাঁহার নাম সম্রাট। যথা—"যঃ সর্বমণ্ডলস্যেশো রাজসূয়ং চ যো যজেং। চক্রবর্তী সার্বভৌমস্তে তু দ্বাদশ ভারতে"।। হেমচন্দ্রঃ। 'অন্যো ভূম্যেক দেশধিপো মণ্ডলেশ্বরঃ স্যাৎ। মণ্ডলস্য অরিমিত্রাদি রূপস্য দেশস্য ঈশ্বরো মণ্ডলেশ্ববঃ। এক দেশাধিপ ইত্যর্থঃ। স্যান্মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকে চ দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ।" ইতি বিশ্বঃ।। তস্য লক্ষণম্—"চতুর্যোজন পর্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৮৬ অধ্যায়ঃ।।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, মণ্ডলাধিপতি দুর্গস্থ থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন। কামন্দকীয় নীতিসার হইতে জানা যায় যে, মণ্ডলাধিপতির কোষদণ্ড-অমাত্য-মন্ত্রি-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা—

"উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ"।। ৮।১

মণ্ডলাধিপতিগণ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন[২]।

বিষয়পতি—মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হইত। বিষয়গুলি শাসনের ভার "বিষয়পতির" হস্তে ন্যস্ত ছিল। উহারা "বিষয় মহত্তর," ও "বিষয়কার" নামেও অভিহিত হইত।

"বর্ষং বর্ষ ধরাদ্যঙ্কং বিষয় স্তুপ বর্তনম্।
দেশোজনপদো নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গশ্চ মণ্ডলম্।। হেমচন্দ্রঃ।

মহাসর্বাধিকৃত—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে ; মন্ত্রী প্রভৃতি।

ইহা হইতেই সর্বাধিকারী উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য।

কোট্টপাল—দুর্গরক্ষক। "কোট্ট দুর্গে পুনঃ সমে" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "কোট্টম্ দুর্গম্। কেল্লা, গড় ইতি ভাষা"—শব্দকল্পদ্রুম। কোট্ট —দুর্গপুরম্। ইতি লিঙ্গাদি সংগ্রহে অমরঃ।

মহাকরণাধ্যক্ষ, করণিক—ডাঃ কিলহর্নের মতে করণিকগণ আইন সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন। সুতরাং মহাকরণাধ্যক্ষ সম্ভবত ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকরদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহাকায়স্থ—সাধারণ লেখকদিগের অধ্যক্ষ। জ্যেষ্ঠকায়স্থ সম্ভবত "বিষয়" কার্যালয়ে থাকিয়া সাধারণ লেখকদিগের কার্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। "লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ"—হলায়ুধ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন, "কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ"। মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত হইয়াছে, "অধিকরণিক—ভোঃ শ্রেষ্ঠি কায়স্থৌ! "ন ময়েতি ব্যবহারপদং প্রথমভিলিখ্যতাম্।" কায়স্থ—জং অজ্জো আণবেদি। তথা কৃত্বা অজ্জ্! লিহিদং"। বিষ্ণুসংহিতায় (৭ অঃ—১) লিখিত হইয়াছে, "অত্র লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকম্ অসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতম, রাজসাক্ষিকম্"।

তরিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী উইলফোর্ডের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, "তরিক" নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষ, Chief of the Boats। কিন্তু মিতাক্ষরা হইতে জানা যায় যে, "তীর্যত্যনেন তরে নাবাদি স্তজ্জন্যং শুল্কং তদ্গ্রহণে অধিকৃত স্তরিকঃ"। সুতরাং "তরিক" শব্দ তরণার্থ দেয় শুল্ক গ্রহণে অধিকারী বা পার গমণের শুল্ক গ্রহণকারী ব্যক্তিকেই বুঝায়।

তদাযুক্তক—(তস্মিন আযুক্ত ৭৩৫ স্বার্থে কণ্) রাজপরিষদ।[১] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Inspectors of wards. উইলফোর্ডের মতে, Chief guard of the wards.

বিনিযুক্তক—কর্মচারী নিয়োগের অধ্যক্ষ। Superintendents of the appointments, উইলফোর্ড লিখিয়াছেন, Director of affiars.

ভোগপতি—ভোগ=স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, হস্তী, অশ্ব, কর্মকার প্রভৃতির বেতন। সুতরাং ইহাদিগের বেতনাদি বণ্টনের অধ্যক্ষকে সম্ভবত ভোগপতি বলা হইত। ভোগপতি শব্দে নগর বা প্রদেশাদির শাসনকর্তাকেও বুঝাইয়া থাকে।

দাণ্ডিক—দণ্ড ধাবক, দণ্ডধারি, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ˚রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে The mace bearers.

ক্ষেত্রপ—"ক্ষেত্রপঃ ক্ষেত্ররক্ষকে"। ˚ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Supervisors of Cultivation.

প্রান্তপাল—নগর রক্ষক। ˚ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Bourndary Rangers. উইল ফোর্ডের মতে, Guards of the Suburbs.

কোষপাল, কোশপাল—"কৃষ্যতে আকৃষ্যতে আয়স্থানেভ্যঃ কোষঃ। ইতি ভরতঃ। কোষ রক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক। Treasurers.

খণ্ডরক্ষ—˚ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Superintendents of wards. উইলফোর্ড লিখিয়াছেন, Guard of the wards of the City.

গ্রামপতি, গ্রামিক—গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত, গ্রামাধ্যক্ষ

"যানি রাজ প্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রাম বাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিক স্তান্য বাপ্নুয়াৎ"।।

দৌঃ সাধ সাধনিক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে দ্বারপাল বা গ্রাম পরিদর্শক। উইলফোর্ড-এর মতে "Chief obviator of difficulties" অধ্যাপক ল্যাসন, "Minister of public works" বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নাবাতাক্ষেণী—নৌকা বা জাহাজাদি নির্মাণ স্থান।

নাকাধ্যক্ষ—নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষ। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে "শান্তিরক্ষার্থ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ"।

মহাকুমারামাত্য—যুবরাজের প্রধান অমাত্য। Chief Minister of the heir apparent. উইলফোর্ডের মতে Chief instructor of children.

মহাকর্তা কৃত্তিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে, "সমুদয় প্রধান কার্যের তত্ত্বাবধায়ক"।

˚ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে The chief investigator of all works.

সৌনিক, শৌনিক—শিকারি কুকুরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

গমাগমিক—দূত, Messengers

অভিত্বরমাণ—দ্রুতগামী দূত। Swift messengers

দ্রুত পেসনিক—দ্রুতগামী দূতদিগের অধ্যক্ষ, Chief of swift messengers.

পীঠিকা বিত্ত—ভাস্কর। পীঠিকা—মূর্তী বা স্তম্ভাদির মূল ভাগ।

চট্ট ভট্ট—প্রায় সমুদয় তাম্রশাসনেই দেখা যায় যে, যাহাতে চাট ভাট অথবা চট্ট ভট্ট গণ, প্রদত্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই চট্ট ভট্ট শব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওয়েস্টমেকট সাহেব চট্ট ভট্ট দিগকে কৃষকশ্রেণির লোক বলিয়া অনুমান করেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে, ইহারা দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া গুপ্ত বার্তার সংগ্রহ করিত। তিনি বলেন "চট্ট শব্দে চাটগা অঞ্চলের ও ভট্ট শব্দে ভুটান অঞ্চলের লোকদিগকে

লক্ষ্য করা হইয়াছে, চাটিগাঁ ও ভুটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিত।"। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ চট্টগ্রাম ও ভুটান অঞ্চল যে বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সীমান্তবাসী জনগণ, ভিন্ন রাজার আজ্ঞা পালন করিবে কেন? ডাক্তার ভোগেল্ "চার" শব্দ হইতে চাট বা চট্ট শব্দ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে "চার" (পরগনাধিপতি) শ্রমজীবিদিগকে একত্র করিয়া দিত এবং দণ্ডনীয় অপরাধের নিবারণ করিত, চাট শব্দ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ অংশের আনন্দগিরি কৃত টীকায় লিখিত আছে ঃ—

"তস্মাৎ তার্কিক চাট ভাট রাজা প্রবেশ্যং দুর্গমিদম্।
অল্পবুদ্ধ্যগম্যং শাস্ত্র গুরু প্রসাদ রহিতৈশ্চ"।

আনন্দগিরি বলেন, "আর্য মর্যাদাং ভিন্দানাশ্চাটা বিবক্ষ্যতে ভাটাস্তু সেবকা মিথ্যাভাষিণঃ তেষাং সর্বেষাং রাজানস্তার্কিকাস্তের প্রবেশ্য মনাক্রমণীয় মিদং ব্রহ্মাত্মৈকত্বম্ ইতি যাবৎ"। আনন্দগিরির উক্তিতে বোধ হয়, চাট কোন অনার্য দুর্দান্ত বন্য জাতির নাম এবং ভাটশব্দে মিথ্যাভাষী রাজসেবককে বুঝাইয়া থাকে।

বহ্নিপুরাণে পাশুপত দানাধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—

"চাট চারণ চৌরেভ্যো বধ বন্ধ ভয়াদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।।
চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনং অপহরন্তি"।

মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ঃ।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যোদ্ধারস্তু ভটা যোদ্ধাঃ"। রাজসেনাগণ প্রায়ই দৌরাত্ম্যকারী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই হয়ত তাম্রশাসনে ভট্ট শব্দ লিখিত হইয়াছে।

---

১. "দদ্যাদ্ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামি ভদ্রনৃপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।।
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরি চিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানাঞ্চ মহীপতিঃ।।
প্রতিগ্রহ পরিমানং দানাচ্ছেদোপ বর্ণনম্।
স্বহস্ত কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্।."
যাজ্ঞ, ১অ। ৩১৮—৩২০।

২. সাহিত্য—১৩২০, বৈশাখ, ৪১ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম

সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যখন হিংসাবহুল বৈদিক-ধর্মতত্ত্ব উপেক্ষিত হইয়া শুষ্ক ও কঠোর ক্রিয়াকলাপে মাত্র পর্যবসিত হইতেছিল, সেই সময়ে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ভগবান গৌতম বুদ্ধ কপিলবস্তু নগরে আবির্ভূত হইয়া অভিনব কৌশলে জরা মরণসঙ্কুল সংসারে শান্তিময় নিষ্কাম নির্বাণ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্মমত অহিংসা ধর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; দয়া, সৌভ্রাত্র, একপ্রাণতা ইহার মূলমন্ত্র। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর প্রথম "ধর্মমহাসঙ্গতির" অধিবেশনের সময় হইতেই তদীয় শিষ্যমধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল বৌদ্ধধর্মের কঠোর নিয়মের শাসনাধীনে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের মতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে থাকিয়া মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ধর্মমত জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীদিগের মধ্যে সমভাবে কার্য করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং এই ধর্মমত কতকটা অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অপর সম্প্রদায় সমগ্র মানবজাতির মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। সর্বজীবে দয়া ও সর্বসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন ইহাদিগের ধর্মাঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদিগের মতে কেবল মাত্র আরাধনা দ্বারাই অতি সহজে এবং অতি ত্বরায় বোধিসত্ত্ব হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্যই এই সম্প্রদায় এদেশে সর্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা "মহাযান" সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিলেন এবং প্রথমোক্ত সঙ্কীর্ণপন্থী সম্প্রদায়কে ইহারা "হীনযান" নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে মহাযান সম্প্রদায় মধ্যেও বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া "যোগাচার" ও 'মাধ্যমিক' দলের উদ্ভব হইল। মাধ্যমিক সম্প্রদায় শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমশ এই সম্প্রদায় মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তীপূজারও ব্যবস্থা হইয়াছিল ; এবং ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব ও তারাগণের বিবিধ মূর্তী, ও বর্ণ এবং বাহনও কল্পিত হইয়াছিল। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় আবার "মন্ত্রযান", "কালচক্র যান" ও "বজ্রযান নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা হইতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হইয়াছিল। মাধ্যমিক পন্থীগণের উন্নতভাব ও চিন্তা বৌদ্ধধর্ম ও সমাজকে যে উন্নত ও উদার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানকারীগণ মহযানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল। হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মমত লইয়া বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের সম্মান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে করিতেন। কালক্রমে এই ত্রিরত্নও মূর্তী পরিগ্রহ করিয়াছিল। বুদ্ধের বামপার্শ্বে স্ত্রীবেশে ধর্ম এবং দক্ষিণপার্শ্বে পুরুষবেশে সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ত্রিরত্নের পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈদিক দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ছিল।

"যে বৌদ্ধধর্ম বিতত সহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় সমগ্র এশিয়ার মুক্তিকামী জনগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার প্রচারকেন্দ্রের উপকণ্ঠে, সমতট বঙ্গে, যে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দিব্যাবদান গ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক ভারতে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক যে

চতুরশিতি সমস্র ধর্মং রাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল সহায়ক পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম প্রবাহা পদ্মা মেঘনাদের ভীষণ তরঙ্গ ভীতিই হয়ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাইর ধর্মরাজিকা, পুষ্যমিত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্যই আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলাদিতেও ধামরাইর ধর্মরাজিকা নাম পাইয়াছি। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লিচ্ছবি বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত গোপনে সধর্মের অনিষ্টসাধন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, পরম তথাগত সম্রাট যশোবর্মনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সদ্ধর্মের প্রণষ্ট গৌরব পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। লৌহিত্যতীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের শোণিত পিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্মার ভয়ে ভীত শঙ্কিত চিত্তে গভীর নিশীথে, পশু হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনও মতে রক্ষা করিয়া চলিত। এই সময়ে মহাযান ধর্মান্তর্গত মন্ত্রযান এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকতামূলক ধর্মভাব ক্রমে ক্রমে সমাজমধ্যে লব্ধপ্রবিষ্ট হইতেছিল। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ শৈব ও শক্তিমূলক তান্ত্রিক ধর্ম রাজধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন জীবনের প্রথমাবস্থায় শৈব ধর্মে এবং প্রৌঢ়াবস্থার প্রথম সময়ে হীনযান, পরে মহাযান পন্থায় আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শিব, সূর্য ও বুদ্ধমূর্তী সমূহেরও পূজা করিতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং-এর গুরু, অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীলভদ্র খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের সর্বপ্রধান আচার্যের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগন্ত বিশ্রুত কীর্তি এই বৌদ্ধ মহাপণ্ডিতের জন্মস্থান বলিয়া সমতট এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পবিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সমতটের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধ ধর্ম) ও অপধর্ম উভয় ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় ২০০০ পুরোহিত অবস্থিত করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে ভগবান তথাগত এক সপ্তাহকাল দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তী প্রতিষ্ঠিত! এই মূর্তী আটফুট উচ্চ"।

অপর চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে সেঙ্গচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, যে তৎকালে তিনি হো-লো-শে-পো-তো" নামক একজন নিষ্ঠাবান "উপাসককে" সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক সদ্ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক এবং ত্রিবত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সমতটেব রাজধানীতে দ্বিসহস্র শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক নরপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া চতুঃসহস্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং প্রাচীন স্থবির মতাবলম্বী শ্রমণগণ মহাযান-পন্থী হইয়াছিল। পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল বা বঙ্গে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল।

হরিকেলের শিললোকনাথ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও জনসাধারণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত থাকিত। পণ্ডিত ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক বঙ্গাধিপতি খড়গরাজগণের বিবরণ জানা গিয়াছে। তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্মিত এবং আতপত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তী চতুষ্টয়, তন্নিম্নে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্তী এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন সংবদ্ধ বুদ্ধমূর্তী খোদিত আছে। আসরফপুরের উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই "অবিদ্যাহতি হেতু ভূত, সংসার মহাম্বুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মুনীন্দ্রের" এবং "অনুসয়ান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ বৈনায়িকদিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষকারী ভাস্কর প্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলীর" জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। উভয় তাম্রশাসনই "পরম সৌগতোপাসক" পুরোদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ। খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম, "সর্বলোক বন্দ্য ত্রৈলোক্য-খ্যাত-কীর্তি ভগবান সুগত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক" ছিলেন। আসরফপুরের প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি রাজকুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়ে এবং অপর শাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্পাটক ভূমি ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালি বর্ধকস্থিত আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, শাসনভূমির অনতিদূরে একটি বুদ্ধ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় প্রথম ভূপতি গোপাল মারিচী মূর্তীর উপাসক ছিলেন[১]। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার গ্রামে কয়েকটি মারিচী মূর্তী পাওয়া গিয়াছে। দেবপাল দেব সোমপুর বিহারের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন[২]। এই সোমপুর বিহার সমতটের অন্তর্গত ছিল। খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দী বা তৎসমীপবর্তী কোনও সময়ে "সামতটিক সোমপুর মহাবিহারের মহাযান মতানুবলম্বী বিনয়বিৎ স্থবির বীর্যেন্দ্র" [৩] বুদ্ধগয়াতে প্রস্তর নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তী প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহার এক পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর[৪] এবং অপর পার্শ্বে মৈত্রেয় মূর্তী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্তীর দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত আছে :—

"ওঁ অনেন শুভমার্গেন প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ।
অতশ্চ বোধিমার্গোহয়ম্ মোক্ষমার্গ প্রকাশকঃ"।

সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। পদ্মা মেঘনাদের ভাঙ্গাঘাতে বহু গ্রাম ও নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার বহু শতাব্দীমধ্যে স্থানের প্রাচীন নামও বিলুপ্ত হইয়াছে। বজ্রযোগিনী গ্রামে সোমপাড়া বলিয়া একটি পল্লি আছে। আবার রেনেলের ম্যাপে সোমাকোট এবং সামপুর নামক স্থানদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপুর বিহার উপরোক্ত স্থানগুলির কোনও একটির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা এখন অসম্ভব।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বজ্রাসন বিহারের পূর্ব-দিকস্থ বাংলা দেশের বিক্রমমণিপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[৫]। বিক্রমপুরে প্রবাদ, বজ্রযোগিনী গ্রামেই দীপঙ্করের জন্মস্থান। তাঁহার বাড়ি এখনও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ি বলিয়া নির্দেশ করে। তিনি বরদাতারা ও ষোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, এবং তিব্বতে তাঁহাদের পূজা প্রবর্তীত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ির সন্নিকটবর্তীস্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মূর্তী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারা মূর্তীটির পাদদেশে "কায়স্থ শ্রীসঙ্ঘেশ গু। প্র।" এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে।

ইদিলপুর ও রামপালে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্ররাজগণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। ধর্মচক্র মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া চন্দ্র রাজগণের বৌদ্ধ ধর্মানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রামপাল লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "যে ভগবান অমৃতরশ্মি চন্দ্রমা ভক্তিবশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণচন্দ্র-তনয় সুবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।"

মহাবোধি মন্দির মধ্যস্থিত বুদ্ধমূর্তী বৌদ্ধজগতের সর্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে শিল্পীগণ মন্দির মধ্যস্থিত ধ্যান মগ্ন বুদ্ধমূর্তীর প্রতিকৃত পাষাণে বা মৃত্তিকায় নির্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রীগণকে বিক্রয় করিত। পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ বহু মূর্তী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব স্কুল ইন্স্পেক্টর স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় এইরূপ একটি পাষাণময়ী প্রতিকৃতি রামপালের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি ঢাকা গেণ্ডারিয়া হেরেল্ড পত্রিকার কার্যালয়ে রক্ষিত আছে।

সাভার অঞ্চলে বৌদ্ধমূর্তী খোদিত বহু ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাভারের অনতিদূরবর্তী বাজাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই বাজাসনের কিছু দূরেই ধর্মরাজিকা বা ধামরাই গ্রাম। বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী, বাজাসন হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, ও ভাওয়াল অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধমূর্তী পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং একসময়ে এই সমুদয় স্থানে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জয়দেবের অমরলেখনি প্রসূত গীতগোবিন্দে বুদ্ধদেব দশাবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। সেন রাজগণের অধঃপতন কালেও বৌদ্ধধর্ম সমতট-বঙ্গ হইতে বিদূরিত হয় নাই। ১১৯৪ শাকে বা ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন" সমতট বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সেনরাজগণ পরম মাহেশ্বর, পরম বৈষ্ণব, পরম নরসিংহ, পরম সৌর, বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহাদেরই বংশধর মধুসেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

১. Indian Antiquary Vol IV. Page 364.

২. Ibid Page 366.

৩. "শ্রীসামংটিকঃ প্রবর ম
হা যান যাযিনঃ শ্রীমৎ-সোমপুর মহ'-
বিহারিয় ব্রিনয়বিৎ স্থবির-বীর্যেন্দ্রস্য।
যদত্র পুণ্য স্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপা-
। ধ্যায় ।-মাতা-পিতৃ-পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল
। সত্ত্ব রাশে । বনুক্ত জ্ঞানা বাপ্তয় ইতি"।
Archaelogical Survey Reports 1908-09, Page 158
ডাঃ ব্লক এই লিপির কাল দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

৪. সোনারঙ্গগ্রামে একখানি অবলোকিতেশ্বর মূর্তী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের কোনও এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী, এবং মাতার নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র দানশ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পিতা মাতা শৈশব কালে ইহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। কৈশোরে ইনি জেতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর, হীনযান শ্রাবকের চারিশাখার ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযানীর ত্রিপিটক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার সম্প্রদায়ের ন্যায় দর্শন এবং চতুর্বিধ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিপুল যশ অর্জন করেন। অবশেষে তিনি পার্থিব ভোগৈশ্বর্য বিসর্জন করিয়া বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে লব্ধ প্রবিষ্ট হইবার জন্য কৃষ্ণগিরি বিহারের আচার্য রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এখানে তিনি গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ওদন্তপুর মহাবিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীল রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হন। একত্রিংশ বর্ষ বয়সে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম রক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্ব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। এইসময়ে তিনি মগধের সমুদয় প্রধান প্রধান আচার্যের নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্রের কূটার্থগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি সুবর্ণ দ্বীপের প্রধান আচার্য চন্দ্রগিরির নিকট দ্বাদশ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সুবর্ণদ্বীপই প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল ; এবং সুবর্ণদ্বীপের প্রধান আচার্য তৎকালে অসাধারণ মণীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তথা হইতে তিনি তাম্রদ্বীপ (সিংহল) যাত্রী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

মগধে পুনরাগমন করিয়া তিনি শান্তি, নবোপান্ত, কুশল, অবধূতি, ভোম্ভি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। এই সময় মগধের বৌদ্ধগণ দ্বীপঙ্করকে মগধের সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিতেন। বজ্রাসনের মহাবোধিতে অবস্থানকালে তিনি তিনবার তীর্থিক ধর্মাবলম্বী নাস্তিকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করিয়া বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। যখন তিনি মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিক ধর্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয় লাভ করিলে কর্ণ্যরাজের সেনাগণ যখন নিবৃত্ত হইতেছিল, তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারই যত্নে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধনকল্পে লামা কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং মহাযান মত প্রচার করেন। তিব্বতবাসীগণ বুদ্ধদেব হইতেও দীপঙ্করের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। দীপঙ্করের নামোচ্চারণ করিলেই তাহারা করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরের সুক্রেঠাং সংঘারামে অতীশের মৃত্যু হয়। তিব্বতে অতীশের যে মূর্তী আছে, তাহার মস্তক রক্তবর্ণ উষ্ণীশে পরিশোভিত। দীপঙ্কর, "বোধিপথ প্রদীপ", "চর্যা সংগ্রহ প্রদীপ", "সত্যদ্বযাবতার", "মধ্যমোপদেশ", "সংগ্রহ গর্ভ", "হৃদয় নিশ্চিত", "বোধিসত্ত্ব মণ্যাবলী", "বোধিসত্ত্ব কর্মাদি মার্গাবতার", "সরণ গতাদেশ", "মহাযান পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ, "মহাযান পথ সাধন সংগ্রহ", "সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ", "দস কুশল কর্মোপদেশ", "কর্মবিভঙ্গ", "সমাধি সম্ভব পরিবর্ত", "লোকোত্তর সপ্তক বিধি", "গুহ্য ক্রিয়া কর্ম", "চিত্তোৎপাদ সম্বর বিধি কর্ম", "শিক্ষা সমুচ্চয় অভি সময়", "বিক্রম বত্ন লেখন" প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীবিক্রমপুর
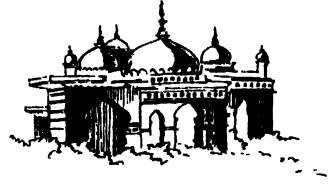
শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরি বর্মদেব, ভোজবর্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গরাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্মা, বজ্রবর্মা, সামলবর্মা, বিশ্বরূপ সেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্যন্ত বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গরাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন[১]। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিলসিক্ত ঢাকা বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূতসলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম বিক্রমপুর মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এতকাল কি আমরা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলানিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃতবাজার' পত্রিকায় নগেন্দ্রবাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ১৩২১ সনের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐস্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্রবাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘি, দেবকুণ্ড, কুলহ চণ্ডী প্রভৃতির বিবরণ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা একেবারেই অনবগত। গত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে "গৌড় রাজমালা" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুবার এই দেবগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কোনও কিম্বদন্তীর সন্ধান পান নাই। শুনিয়াছি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় না কি নগেন্দ্রবাবুর এই বিক্রমপুর আবিষ্কারের অনেক রহস্য অবগত আছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ববঙ্গ ব্যতীত অপর কোথায়ও হইতে পারে না। যাহা হউক এ

বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিব না। এস্থলে প্রথমত বর্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া পরে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকে চিত্রের সংযুক্ত পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার," বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার", "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপরাধার" সম্ভবত লিপিকর প্রমাদ। কারণ এই প্রস্তর খণ্ড আমি দেবগ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময় ভূগর্ভ মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। দমদমার ভিটা বা নগেন্দ্রবাবুর বল্লালের ভিটা হইতে এইস্থান অনেক দূরে অবস্থিত। সুতরাং ঐ ভিটার সহিত এই প্রস্তর খণ্ডের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

নগেন্দ্রবাবু, গোপাল ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এজমালিতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিতের—

"বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
গতাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে।।
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বর।।

এই শ্লোক দ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারিশত বৎসর পূর্বে রচিত আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতেও লিখিত আছে—বল্লাল সেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণ গ্রামে বল্লাল সেন রাজকার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না। পরন্তু বল্লাল চরিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আনন্দ ভট্ট বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা-বিক্রমপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণত দুইখানি বল্লাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। তন্মধ্যে একখানি ৺হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক সংশোধিত এবং যোগী জাতীয় ৺পদ্ম চন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে যোগী জাতীয় প্রাচীন সামাজিক মর্যাদার বিষয় বর্ণিত আছে। অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নাথ প্রকাশিত পুস্তকের বহু পরে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবর্ণবণিক জাতীয় প্রাচীন সামাজিক মর্যাদা বর্ণিত আছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অনুল্লিখিত নামা (আমরা শুনিয়াছি সুবর্ণবণিক জাতীয়) জনৈক বন্ধুর নিকট দুইখানি বল্লাল চরিতের হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ দুইখানি আদর্শ পুঁথির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একখানি ১৬২৯ শকাব্দে বা ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপরখানি ১১৮৯ বঙ্গাব্দে লিখিত। আচার্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া ১৯০১ সালে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তদীয় Notices of Sanskrit Mss. গ্রন্থের কোথায়ও এই পুঁথির বিষয় উল্লেখ করেন নাই। "আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশপত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যের অভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনীগণ যে কতশত কুলগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে।"

উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষত নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোক নাথ-প্রকাশিত বল্লাল চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং

কোনখানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে দুইখানি হস্ত লিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে লেখা, তালপাতার নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথি যে প্রাচীন নহে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদি নাথ-প্রকাশিত পুস্তক কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথিও যে পরবর্তীকালে রচিত হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? শাস্ত্রী মহাশয়ই বা তাঁহার বন্ধুর নাম গোপন রাখিলেন কেন তাহাও বুঝা যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক কথাগুলি যেরূপ সরল, বল্লাল চরিত্তের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি ও কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারিশত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রামচরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষত বল্লাল-চরিতেও এমন কোনও কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

নগেন্দ্রবাবু দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে কখনও যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্র-শাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর শহর দমদমার ভিটা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্রবাবু হয়ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ি ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্মিত হইত, বড়জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘি হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল হয়ত বল্লাল সেনেরই নির্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল?

নগেন্দ্রবাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক" পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া

প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন ; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই? নগেন্দ্রবাবু "দিক্" শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া "দিক্পাল চক্রপূট ভেগন গীত কীর্তি" পদের যে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তাম্রশাসনে কিন্তু দিক্পাল শব্দ স্পষ্টরূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা দিক্পাল গণের (বিভিন্ন রাজগণের) নগরে তাঁহার কীর্তি গীত হইত এইরূপই করিতে হইবে।

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বলবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বাংলার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

জয়স্কন্ধাবার শব্দ শিবিরার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কেশব বা বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্তে ফল্গু গ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিলে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোনও শহর বা গ্রামের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই যে মনে করিতে হইবে যে, মুসলমান অধিকারের পর দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব বঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে "বিক্রমপুর ভাগ" বা বিক্রমপুর পরগনা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নাই। বিক্রমপুর পরগনার কোথায়ও হয়ত বিক্রমপুর নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন নগর অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই কি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির বাহিরে পুণ্ড্রবর্ধন নগর আবিষ্কার করিতে হইবে? পুণ্ড্রবর্ধন নগরের ন্যায় বিক্রমপুর শহরের নামও হয়ত বিক্রমপুর পরগনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষত তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর যে পরগনা বা বিভাগ হইতে পারে না তাহাও স্বীকার করা যায় না। দনুজমর্দনের মুদ্রা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই চন্দ্রদ্বীপ একটি পরগনা মাত্র। চন্দ্রদ্বীপ পরগনা মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে কোনও গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, ভাওয়াল, তাঁলিপাবাদ, বড় বাজু, প্রভৃতি পরগনা মধ্যে ঐ নামের কোনও গ্রাম নাই। ত্রিপুরা প্রদেশের কোনও স্থানেই ত্রিপুরা শহর নাই ; অথচ ত্রিপুরা একটি জেলা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর যুক্তির কোনও মূল্য নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে রামপালের নিকটবর্তী জোড়াদেউল নাম স্থানে এক মোসলমান স্বর্ণনির্মিত একটি তরবারির খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল। রামপালে একবার সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন[৪]। রামপালের সন্নিকটস্থ ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে একখানা স্বর্ণপত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথির একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুঁথিখানা সমাপ্ত ছিল[৫]।

রামপালের পূর্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাকহাটির খাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গমাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টক গ্রথিত বলিয়াই মনে হয়। বরেন্দ্র ভিন্ন এরূপ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বাংলার অন্য কোনও স্থানেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে, ইহারই কোন স্থানে যে প্রাচীন বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ পালবংশীয় নয়পাল দেবের সমসাময়িক। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ি "বিক্রমণিপুর বাংলায়" ছিল বলিয়া তাঁহার তিব্বতিয় ভাষার জীবন চরিতে উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে উহা বঙ্গ দেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্মস্থান। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই যে বিক্রমপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন[৬] "দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণ সেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা। সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লাল সেন কৈবর্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে ; কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগনায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহার স্বীকার করিতে হইবে।"

নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত প্রবাদটি বাংলার সর্বত্রই প্রচারিত। তবে দুই একস্থানে তাঁহার শ্রুত প্রবাদটির সহিত অন্য স্থানে প্রচলিত প্রবাদের অসামঞ্জস্য আছে। নগেন্দ্রবাবুর প্রামাণ্য গ্রন্থ বল্লাল চরিতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে[৭]। তাহা হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া নবদ্বীপে যান নাই ; কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত হয় নাই। বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে এক রাত্রির মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দেয় নাই। দ্বিসপ্ততি ক্ষেপণি যুক্ত তরণির সাহায্যে ও লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুরে আনয়ন করিতে দিবসদ্বয় (দ্বাভ্যামমহোভ্যাং) অতিবাহিত হইয়াছিল। এ জন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধনরত্ন বস্ত্র এবং হালিক্য উপজীবন দিয়াছিলেন।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—[৮] খ্রিষ্টিয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে।—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীসু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতারূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসৃত পুরুষোত্তম"।।

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খ্রিষ্টিয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।"

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ব পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল[৯]। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্নের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে[১০], কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে[১১]। কিন্তু কি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্নের পাঠ, অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

"দেবগ্রামভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাহভবাৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য (নপত্য) য়া।।
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্মাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসৃত পুরুষোত্তমং তনরং।।

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

নগেন্দ্রবাবু কি উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভ লিপির শ্লোকটির এরূপ দুর্দশা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্রবাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। সুতরাং দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল তাহার প্রমাণ কি?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের[১২] নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[১৩]। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেহের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্তীকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না[১৪]। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্ত চক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে[১৫]। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ১০৫৫—১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়পুরে, ভোজবর্মা, সালবর্মা, জাতবর্মা, হরিবর্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

দেবগ্রাম বিক্রমপুরের অবস্থান লইয়া নগেন্দ্র বাবু একটু গোলে পড়িয়াছেন ; সেই জন্যই তিনি এই স্থানগুলিকে একবার রাঢ়ে, একবার বাগড়িতে, এবং আবার বঙ্গে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুৎসুক। ভাগীরথীর প্রাচীন খাড়ির চিহ্ন দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সমীপবর্তী স্থান হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই এবং এই স্থানগুলি যে ঐ খাড়ির পশ্চিমদিকে অবস্থিত তদ্বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পশ্চিমতীরবর্তী বলিয়া বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, এবং উহা বাগড়ি বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থা। এমতাবস্থায় দেবগ্রাম বিক্রমপুর কখনই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্ররাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বলবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল-রাজককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজ্যের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত "অভিধান চিন্তামণি"তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে[১৬]। রাজশেখরের কর্পূর মঞ্জরী গ্রন্থে কামরূপ ও রাঢ়ের সহিত হরিকেল রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে[১৭]। খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশ মতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্বসীমায় অবস্থিত[১৮]। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "ইৎ-চিং খ্রিষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় একবর্ষ কাল অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত।" কিন্তু আমরা ইৎচিং-এর বিবরণী অনুসন্ধান করিয়া এরূপ কোনও উক্তিই দেখিতে পাইলাম না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্বদিকের অধিপতি বর্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন।" বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্মাকেই এই প্রাগের্দেশীয় বর্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্মাও শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্মাকে প্রাগের্দেশীয় বর্মরাজ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল ; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল[১৯]। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে, করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[২০]। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত। রামপালের সমসাময়িক যে সমুদয় নরপতি কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহারা কেহই বর্মবংশীয় বলিয়া পরিচিত নহেন। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রগের্দেশীয় ভূপতি ভোজবর্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠপুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী

ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু বগুড়াজেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন[২১]। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত[২২]। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

১. অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত "বর্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে এবং পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যা "বর্ধমানের কথা, বর্ধমানের পুরকথা" প্রবন্ধে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত পুস্তকের কতকাংশ পাঠ করিলে, মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে আমি প্রতিবাদে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই শ্রীবিক্রমপুর শীর্ষক প্রবন্ধে পরিবর্ধিতাকারে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দ্বাবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া "কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে" আমার প্রতিবাদের উত্তর আমার প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ে নগেন্দ্র বাবু যে যে নতুন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহারও আলোচনা করিয়াছি।

২. দেবগ্রাম নিবাসী যে সমুদয় বৃদ্ধ ভদ্র মহোদয়গণ দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সহিত বল্লালের বংশ সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নগেন্দ্র বাবুকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার উক্তি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোনও সংশ্রব নাই। তাঁহারা নাকি বংশপরম্পরা ক্রমেই শুনিয়া আসিতেছেন যে, দেবগ্রামস্থ দম্‌দমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সম্প্রতি নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত কুলবরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত আচার্যপাদ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে যে বল্লালের কোনও প্রসাদ বর্তমান ছিল, তাহা দেবগ্রামের কোনও ব্যক্তিই অবগত নহেন। দেবগ্রামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কুটুম্বিতা আছে, সেই সূত্রেই অনেকবার তিনি তথায় যাইয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ নিবাসী মুঙ্গের জেলা স্কুলের অ্যাসিষ্টান্ট হেড মাস্টার, অতীত পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি. এ মহাশয় বহুবার দেবগ্রামে গিয়াছেন ; তিনিও জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সর্বৈব মিথ্যা, ইহা নাকি সম্প্রতি রচিত হইয়াছে।

৩. বল্লাল চরিত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বিশ্বকোষে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "গোপাল ভট্ট কর্তৃক দুইখানি বল্লালচরিত রচিত হইয়াছে। এই দুইখানিই আধুনিক গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হইবে।"

8 Taylor's Topography of Dacca Page 101

৫ প্রবাসী ১৩২২, আষাঢ়, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠা।

৭. "শ্রুত্বা স্বসা বধা দেশং তপস্বী লক্ষ্মণ সুতঃ।
ব্যাকুলো মন্ত্রয়ামাস কাণ্ডার' সহ নির্জনে ।
রজন্যাং গাহমানায়ানামন্ত্র্য বহসি প্রিয়ম্।
গুপ্তাং তরণি মারুহ্য পলায়িত মহাভয়াৎ ।।
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং জ্ঞাত্বা তস্য পলায়নম্।
দুর্গাবাড়িং যযৌ রাজা চিন্তাজুষ্ট বিলোচনঃ।।
প্রবিশ্যন মন্দিরং তত্র ভিত্তি কায়াং মহীপতিঃ।
শ্লোক মেতং বাচয়িত্বা বল্লালো ধরণীপতিঃ।
পুত্রয়েত চলচ্চিত্তঃ কৈবর্তানাজুহাবহ"।।
নাবিকা উচুঃ।
"ইত্যুক্ত্বা চাভিবাদ্যাথ রাজনং নায়িকা মুদা।
আনেতুং লক্ষ্মণং জগ্মুঃ কৃত্বা কোলাহলং ভৃশম্।
অরিত্রাণাংদ্বি সপ্তত্যা বাহয়ন্ত স্তরীং দ্রুতম্।
আনিন্যুলক্ষ্মণং দ্বাভ্যামহোভ্যাং জালজীবিনঃ।।

স্বস্নুষা লিখিতং শ্লোকং দৃষ্টে মমপঠৎ স্বয়ম্।। তত স্তেভ্যো দদৌ রাজা সন্তোষ বিমলাননঃ।
পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা। ধন রত্ন বস্ত্রভারান্ হালিক্যঞ্চোপজীবনম্।।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ স্যান্তং করিষ্যতি।।

বল্লাল চরিত—সোসাইটির সংস্করণ, ৫ম অধ্যায়।

৮. বর্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।
৯. J. A. S. B. 1874. Page 356-358.
১০. Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.
১১. গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।
১২. "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবালভীতবঙ্গবহলগলহস্ত প্রশস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।
১৩. Memoirs of the Asiatic Society of bengal. Vol. III. p. 14. বর্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।
১৪. বাংলাব ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।
১৫. Archaeological Survey Report, 1991-12, Page. 162.
১৬. "বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া"—ইতি হেমচন্দ্রঃ।
১৭. "বৈতনিকঃ। * * * লীলাণিঞ্জিঅ রাঢ়দেশ! বিক্কমক্কমংত কামরূঅ! হরিকেলী কেলি আরঅ।" কর্পূরমঞ্জরী-জীবানন্দবিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ১৫ পৃঃ।
১৮. J. Takakusu's I-Tsing P. XLVI.
১৯. "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ"।।—রামচরিত, কবি প্রশস্তি, ১।
২০. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।
২১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।
২২. বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

ধামরাইর যশোমাধব

কালীবাগের আখড়া
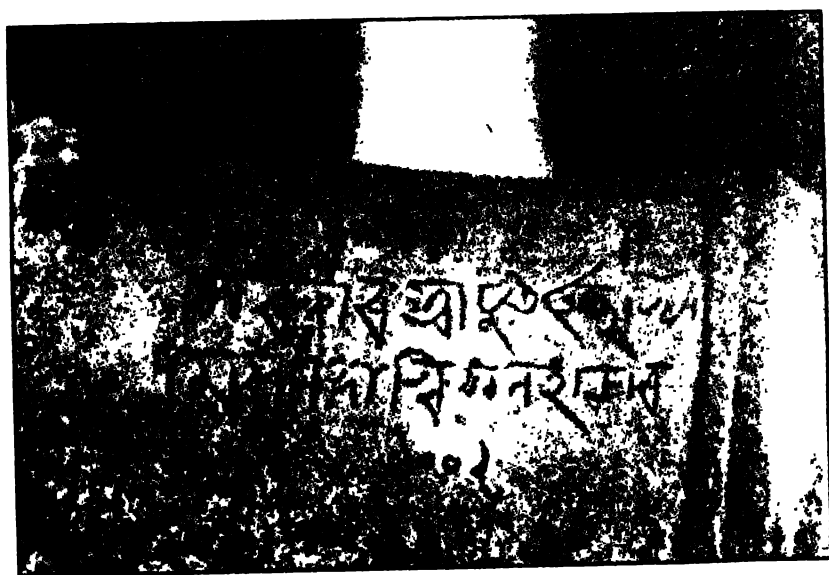
ঈশা খাঁর কামান

সুখবাসপুর গ্রামে প্রাপ্ত তারামূর্তি

মুন্সিগঞ্জে প্রাপ্ত নটরাজ গণেশ

মুন্সিগঞ্জে প্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট গণেশ

রামপালে প্রাপ্ত নটরাজ শিব

রানিহাটিতে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি
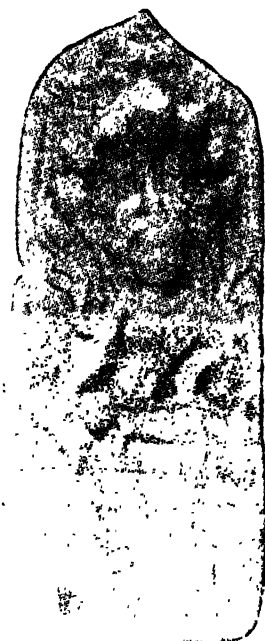
কোরহাটির মনসামূর্তি

কুকুটিয়ায় প্রাপ্ত মারীচি মূর্তি

সরস্বতী মূর্তি, বজ্রযোগিনী গ্রামে
দীপঙ্করের টোলবাড়ির সন্নিকটে প্রাপ্ত